



ਅਏਸ ਰਬ

ਵੈਸਾਖ

੧੯੭੬

756.3
.001/9





P24,053



॥ বার্ষিক সুচী ॥

॥ অষ্টম বর্ষ, ১৩৬২ ॥

॥ গল্প ॥

স্বপ্ন-সৌন্দর্য, গোখলির রং	মিহির মুখোপাধ্যায়	২, ২৬৬
কালোজল, অন্যদিন	সত্যপ্রিয় কায়	১৭, ২৬০
যশোদা, শ্রাবণ সন্ধ্যা	স্বামী বর্ষ	৩২, ২৭২
একটি কৌপুরুষের কাহিনী, পর্বত-কন্যা, তেল রং : দেবকুমার মৈত্র	অমল ভৌমিক	৮৬, ৩১৩, ৬৪১
স্বপ্ন-সৌন্দর্য	আন্তন চেহব, অঃ বীথি বসু	৩৩৭
প্রাণে একদিন	সমীর মুখোপাধ্যায়	১৬৮
সমান্তরাল	সুবোধনোহন ঘোষ	২৯৯
অশ্রুধারা	গরলা বসু	২৩৩
শাকওয়ালী	মিহির আচার্য	৩০৭
প্রতিমা	আনন্দ দাশগুপ্ত	৩২৭
একফালি আকাশ	সুবোধনোহন ঘোষ	৩৩৮
জোয়ালা	সুবোধনোহন ঘোষ	৩৬৯
তিন মাসের মিছিল	বাণীর আলহেলাল	৩৮৯
বন্দর	মদন দাস	৪৫৩
মেয়েটা	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	৪৬২
এক নায়িকা	সুরজা সেন	৫১৫
আকর্ষণ	রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৩৪
তুই আকাশ	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৫৮৫
শীতের ওক	মুর্তি নজিবিন, অঃ কক্সলাল মুখোপাধ্যায়	৬২০

॥ উপন্যাস ॥

অজমতী, তুর্গেনিভ, অঃ মিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্ত ভাট্টা	১০ ২৯, ১৫৬, ২১৫, ৪১৮
খাল-বিল-পারের কাহিনী, কণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৪৭৪, ৫৪১, ৫৯৫ ৬৮০

॥ ভ্রমণ-কথা ॥

জনপদের ছন্দ	রাহুল	১১৫, ১৭৮
-------------	-------	----------

॥ প্রবন্ধ ॥

জিহ্বা, তারা তারাশঙ্কর	সুধীরচন্দ্র রায়	৪৬
‘অগ্রণী’র এক বছরের গল্প	অচ্যুত গোস্বামী	৫০
রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি	শ্রীঅমিত সেন	৬৬
বাংলা প্রথমপার্ঠের পরিচয়	সুধীরচন্দ্র রায়	৭৭
সংস্কৃতের আসর	বৈষ্ণবনাথ ঘোষ	১৩১, ১৮৮
এক বছরের কবিতা	সুধীরচন্দ্র রায়	১২৬
সিনেমার কাহিনী ও অভিনয়	সুধীরচন্দ্র রায়	১৪৮

বৈজ্ঞানিক মণ্ডলার শাস্তি আন্দোলন	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	১৯২
ভাষা বিচার	অনাদি মণ্ডল	২৪০
সোভিয়েট রাশিয়ার চাষ-আবাদ	নরেন্দ্র দেব	২৭৬
রবীন্দ্র নাটোর বৈশিষ্ট্য	দিগিজিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৫
কুটি মার্জনীয়	অনাদি মণ্ডল	২৯৬
বিষ্ণুদেব শ্রেষ্ঠ কবিতা	জ্যোতির্ষয় গঙ্গোপাধ্যায়	৩২২
ইন্দোচীনে আনানের রাষ্ট্রীয় প্রভাব	প্রভাত ভাট্টা	৩৩৩
প্রাচীন বাংলা কাব্যের আঙ্গিক	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	৩৪৬
ভারতীয় সংগীতের আসর	বৈষ্ণনাথ ঘোষ	৩৮০
ব্রহ্মবংশগায়চ	মুকুল চট্টোপাধ্যায়	৩৫৫
বিশিষ্টতা	অনাদি মণ্ডল	৪৩৩
কবিতাপাঠে আপত্তি কেন	সুধীরচন্দ্র রায়	৪৯৩
হাসি	অনাদি মণ্ডল	৪৬৯
একটি অবিস্মরণীয় দিন	অ, ন	৪৯৮
২৯শে নভেম্বর	অনামিকা গুপ্তা	৫০০
নুবন্ধীবনের পথে জাপ্রত তিক্তত	ইল্ফায়েন এপ্‌স্টেন	৫২৭
'না' নয় 'হ্যাঁ'	অনাদি মণ্ডল	৫৬০
সংস্কৃতি ও ভাষাগত রাজ্য	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	৫৭৯
কর্কটরোগে পত্রাক্ষয় বরণ করিবে	ডি, হার্বোডিংস্কি	৬০৬
যাত্রা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র	আশীষ বর্মণ	৬১১
সংস্কৃতির তত্ত্বকথা	ভারতী চৌধুরী	৬৩২
চলচ্চিত্রে ব্যক্তিস্বরূপের সমস্যা	আশীষ বর্মণ	৬৭৪
ভাষা ও রাষ্ট্র	বুদ্ধদেব বসু	৬৯২

॥ কবিতা ॥

রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা কিতাবে অভিভূত করেছিল ?	বিষ্ণু দে	১৯
ঈগল	এলফ্রেড লর্ড টেনিসন, অ:	৩৮
এই তো সুমায়	ঐ	৩৮
ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো	ঐ	৩৯
সময়	বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত	৪০
হে মমতা	আলোক সরকার	৪১
রূপান্তর	জ্যোতির্ষয় গঙ্গোপাধ্যায়	৪২
অন্ধকারে	শম্ভু ঘোষ	৪৩
বাউল	মানস রায়চৌধুরী	৪৪
বহু বৃত্ত	শিবশঙ্কু পাল	৪৫
প্রতিষ্ঠা	মানিক মুখোপাধ্যায়	১১১
দূরের কান্না	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	১১৯

দুই দিন	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	১১৩
কাল প্রেমসী	উৎপলকুমার বসু	১১৪
এক-ঘর	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	১৭৪
পুরসী	মানস রায়চৌধুরী	১৭৫
রূপান্তর	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৬
আলো, আর আলো	দীপংকর দাশগুপ্ত	১৭৭
আজ রাতে	শিশিরকুমার দাস	২৩৭
ফল	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	২৩৮
দক্ষিণ যাত্রা	চাই কুও, অঃ রামেন্দ্র দেশমুখ্য	২৩৯
যুক্তির প্রতিষ্ঠা	বিষ্ণু দে	২৫৯
মাইকেলের সমাধি	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬৮
শান্তির স্তম্ভ	রামেন্দ্র দেশমুখ্য	২৭৯
অনন্তা	আলোক সরকার	৩০২
অনন্তর	সত্যজিত ঘোষ	৩০৩
গোধূলি	মানস রায়চৌধুরী	৩০৪
কখন সে চলে গেছে	দীপংকর দাশ গুপ্ত	৩০৫
ছলনা	উৎপলকুমার বসু	৩০৬
চতুর্দশ	জ্যোতির্ষ্য গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬২
ভাইটিকা	অঃ অমিত্যভ চট্টোপাধ্যায়	৩৬৪
বেলা অবেলায়	ভরুণ সাহা	৩৬৫
দূরের দিগন্ত	শঙ্খ ঘোষ	৩৬৮
সকলের হাত পেলে	অজিত মুখোপাধ্যায়	৪২৬
তোমার জন্যে	গৌরীপদ দত্ত	৪২৮
উপমা হয়ে থেকে	মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৪৩০
কবিগান	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	৪৩১
রাগিনী	মাণিক মুখোপাধ্যায়	৪৩২
প্রাকৃত সংলাপ	শিবশঙ্কু পাল	৪৮৫
একটি মানুষের কাহিনী	সরিৎ শর্মা	৪৮৬
ভয়	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৮৭
আজ্ঞার আকাশ থেকে	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	৪৮৮
উৎস	অরুণ গুপ্ত	৪৯০
ভিনদেশ	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	৪৯১
সজাভী	সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৫৬
নিষ্ঠুর নায়িকা	রায় বসু	৫৫৭
কথা কও	জ্যোতির্ষ্য গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫৮
খানিকটা বাতাস	অমর গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫৯

(৪)

নির্জনতা	মানস রায়চৌধুরী	৬১৮
কুল বলে	শিবশঙ্কু পাল	৬১৯
নেপথ্যনাটক	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৮৮
কোথা যাই	মানিক মুখোপাধ্যায়	৬৮৯
ঐতিহাসিক	রামেন্দ্র দেশমুখা	৬৯১

॥ চলচ্চিত্র ॥

নতুন ছবির খবর		৭৩, ১৩৬
হিন্দী ও বিদেশী ছবির খবর		৭৪
চিত্র সমালোচনা		৭৫, ১৩৫, ২৪৮, ৫৬৬
স্টুডিওর খবর		৬২৬, ৬২৬
হিন্দী ছবির প্রসঙ্গে	চিত্রদর্শক	১৯৫, ১৯৬
আলোচনা	অজয় রায়চৌধুরী	১৯৭
ডকুমেন্টারী ছবিতে বুদ্ধের জীবনী	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	৪৪০
চিত্রলোকের খবরাখবর	বিনয় চট্টোপাধ্যায়	৪৪১
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি	চিত্রভাষী	৬২৫

॥ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥

রানায়ণ প্রদর্শনী	)	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	৪৪৭
ফালভর কিলিয়ন ল্যান্সনেস্			

॥ রংগমঞ্চ ॥

বনহংসী	সত্যভাষী	৬৩৮
--------	----------	-----

॥ সাংবাদিক সম্মেলন ॥

এন, এন্, বুলগ্যানিন ও এন্ এস্ ক্রুশ্চেভ		৫০৩
---	--	-----

॥ বিয়োগপঞ্জী ॥

রামনাথ বিশ্বাস	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	৪৪৭
দত্তাশ্রয় বিষ্ণু পানুসকর	মানস রায়চৌধুরী	৪৪৮
মেঘনাদ সাহা	অজয় রায়চৌধুরী	৬৩৬

॥ গ্রন্থ পরিচয় ॥

নীল ভূইয়া	অনিল চক্রবর্তী	২৪৩
স্বদেশী বৌ	রামেন্দ্র দেশমুখা	২৪৫
বিশ্বসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	২৪৬
উলুখড়ের কবিতা	কল্যাণ কর	২৪৭
নুইত পারের গাথা	রামেন্দ্র দেশমুখা	৫৭২
জনসমুদ্র	কাতিক লাহিড়ী	৫৭৩
স্বভাষী	গুরুদাস ভট্টাচার্য	৬৩৯
টনির স্বপ্ন, আমার বাংলা	নীলরতন মুখোপাধ্যায়	৭০১, ৭০২

অঙ্গী

॥ অষ্টম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৬২ ॥

রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা কিতাবে অতিভূত করেছিল ?
বিস্ময় দে

এ প্রশ্নের কি উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন্ কণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
কিছু কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ-উজ্জ্বল
মধ্যাহ্নে উষ্ম স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?
আশ্চর্য যে আলোর রোদ্দেখর আভাস পাণ্ডুর
নিশ্বাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাহীন,
কখনো বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
এক সূর্য-রথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে ;
আমরা কেমন করে' দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাশি কোন্ সূর্যের নির্ঘোষে
কবে বা কখন কিসে করে' দিলে রোদ্দে রোদ্দে ধনী ।
আমাদের সূর্য দেখা সূর্যালোকে প্রজ্যুষে প্রদোষে ॥

মৃগতৃষ্ণা

মিহির মুখোপাধ্যায়

দরজার কড়া নাড়লো কেউ—খটখট্। আকাশ কিছু ফর্সা হয়েছে। রাস্তার গ্যাস বাতিগুলি সব চোখ বুজেছে। কর্পোরেশনের হোস-পাইপে জল-ঢালার ছড় ছড় শব্দ। আশ-পাশের ঘরে ঘুম-ভাঙার সাড়া আগে। রাত ভোরের আয়োজন।

শকটা বেন আরও একটু জোর হ'ল—খটখট্-খটখট্। কড়াটা ভেঙে ফেলবে নাকি! এই অসময়ে কে এলো আবার! আড়মোড়া ভেঙে কাপড়টা গুটিয়ে নিল সুরবালা। তারপর দরজার খিলে হাত রেখে ঘুম-ঘুম গলার জিজ্ঞেস করে—“কি গা?” —“এজ্ঞে আমি।” —দরজাটা খোলা হয়েছে ততক্ষণে। বৈটে-খাটো কাঠ-খোটা চেহারা। মিশকালো কাকের ডানা গায়ের রং। মাথার ঠিক মধ্যখানে লম্বা সিঁধি, ছ'পাশে ভেল-মাথা চুলের বাহার। একগাল হেসে বললে—“আমি গো লক্ষ্মর পেছাদা চন্দোর, ছি'চরণের দাসামুদাস।”

নামের আগে পদবী বলা প্রহ্লাদ চন্দ্র লক্ষ্মরের, “এস্টাইল”—শহুরে কারদা। একপা পিছিয়ে গেল সুরবালা। অবাক চোখের ক্যান্‌ফেলে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকসেকেন্ড। একটু ভয়ও হয়েছে বুঝি। কাঁপা কাঁপা গলার তার নিশানা পাওয়া গেল—“তুমি! এ সময়ে কুথেকে এলে, হেথা কি জন্মি এয়েচ?”

প্রহ্লাদ নির্বিকার। বীরে-সুস্থে পাম্প-সু খুলে দাঁড়ায় একপাশে রাখলে। জামাটা খুলিয়ে দিলে বেড়ার গারে তারপর একটা চ্যাটাই টেনে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বিড়ি আর দেশলাই বার করলে।

হাব-ভাবখানা বেন খুবই জানামোনা এ জায়গা—রোজই আনাগোনা আছে তার এ-অঞ্চলে।

—“বলছি—বলছি সব, একটু জিরুতে দাও আগে। গোলাপকে দেখছিনা যে—ঘুমুচ্ছে বুঝি?”

মেয়েকে টেনে তোলে সুরবালা—“এই গোলাপ! গোলাপ! উঠ্ উঠ্ কত ঘুমুবি আর।”

দশ-এগারো বছরের শ্যামলা-রং ছিপছিপে মেয়েটি—গোলগাল মুখখানি। জড়সড় হয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সুরবালার বুক চিপ্‌টিপ্‌ কমেছে একটু। বিছানা-পাট তোলার সময় প্রহ্লাদের গলা কন্‌তে পায়—“ইস্! কতবড় হয়ে গিইছিস্ যে, তা বেশ, বেশ—গড় করো—বাপকে গড়

করতে শেখেনি।”—মেয়ের ভুলটা নিজেরই শুধরে দেয়। দায়-সারা গোছের একটা প্রণাম
ঠুকে দরজার কাছে গুটিগুটি মেরে বসে গোলাপ।

সুরবালা যুধ বাড়িয়ে বামোকা একটা ধমক দিল—“চোখে-মুখে জল দি'গে যা—
আবার ঢং করে বসলি ক্যানে, হতভাগী।”

হঠাৎ একবছর বাদে বাপকে দেখে গোলাপও কম অবাক হয়নি। মানুষটার
মন-মেজাজ কোনোদিনই খুব ভাল লাগে না তার—দেশে থাকতে তাড়ির ভাঁড়, ঘেনো মদের
বোতল ভাঙা আর মাকে ধরে ঠেড়ানোর কথাটাই ঘন ঘন মনে আসে।

বাসি উহুনের ছাই ভুলে, বর কাঁট-পাট শেষ করে—করসা শাড়ি-সেমিজ পরে নিল সে।
চুল বেঁধে কিছু ফিটকাট হয়ে দাওয়ায় এসে দাড়াইল—ঠোটুটি পানটুকটুক—সিঁথিতেও
সেই বং সিঁহুর টানা। ইচ্ছেটা মনে মনে একটিবার চোখ ভুলে ঠাট-ঠমকটা একটু দেখে
নিক প্রহ্লাদ।

হেসে-ভুলে সিঁড়ির ওপর একপা নামিয়ে বুলে—“আমি বেরুচ্ছি—গোলাপ বইল
আরা করে দেবে—চাটি খেয়ে নিও। আমার ফিরতে সেই বেলা দুটো-তিনটে হবে।”

এতক্ষণ আড় চোখে-চোখে সব কিছুই দেখেছে প্রহ্লাদ। এবার একটু চমকে ওঠার
ভান করে বুলে—“ও! তুই কাজে বেরুচ্ছিস্ বুঝি! ইস্কুলে কাজ নিইচ্ছিস্ সে আমি
তিনিছি।”

—“কার ঠেঙে শুন্লে?”—যাই-যাই করেও সুরবালা যুধ ফিরিয়ে ভুরু কঁচকে তাকায়।

—“তিনিচি পাঁচীর মার ঠেঙে—আমি এরেছিষ্ কালীঘাট পূজো দিতি।”—মুখে
পান্বে হাসি টেনে জবাব দেয় সে—“কাল আত্তিরে ছিষ্ ভুষণের ঘরে। সেই মাঝিরের ভুষণ,
কালীঘাটে পান-বিড়ির দোকান দিয়েচে—তা ভেইবে দেখষ্ কাছেই যখন এরেচি তোর
খোজটা একবার নিয়েই যাই।”

সত্য-মিথ্যা যাই হোক—ব্যাপারটা এতক্ষণে একটু পরিষ্কার হ'ল। আরও ছ'একটা
কথা বুলবে ভেবেছিল—কিন্তু আর সময় নেই। রোদ উঠেছে। বস্তির ঘর-গেরস্থালী জীবন
শুরু হয়েছে, বাস্তায় লোক-জনের আনাগোনা—ট্রাম-বাস। সুরবালা পথ চলে আর ভাবে,
ভাবে আর বিড় বিড় করে। মেনীমুখো মিন্বে এলো কোন মৎলবে! ফিরিয়ে নিরে যেতে
চায়—উহু। আবার ওমুখো! মরে গেলেও না। আনমনেই বাড় নাড়ে সে।

নানাজনের মুখে-মুখে খবর শুনে দেখতে এসেছে আজ একবছর বাদে। আহা! কি
দরদ! দেখা হয়েছিল বটে পাঁচীর মার সঙ্গে—সে তো অনেকদিন আগে। তখন সবে এই
কাজটা জুটেছে। সব কথাই তার কাছে বলেছিল সুরবালা—গোপন করেনি কিছুই।

নিজের পারে দাঁড়িয়ে রোজগার করবে। একটা তো মেয়ে, ছ'জনের পেট চলেই
যাবে কোনোরকমে। সোয়ামীর লাধি-কাঁটা খেয়ে আর নয়।

পরেশবাবুর বাড়ির সামনে এসে ভাবনা-চিন্তার রাশ টেনে মনের মুখে ছিপি এঁটে দিল।
তারপর রোজকার নিয়মমতো হাঁক দেয়—“কই গো দিদিমনি! শিগ'গিরই এসো—

ইস্কুলের বেলা হ'ল।" হাসিমুখে পরেশবাবুর ছোট মেয়ে এলো ছুটে-ছুটে। শিশিরধোয়া সুইকুল মুখখানি, বব-ছাঁট চুল। স্কুলের ফ্রক সব মেয়েদেরই এক রংএর—একরকম ছাঁট-কাট, জুতো-মোজা—কাঁধে বইপত্রের ব্যাগ। এরপর মিস্তির-বাড়ির রোয়াকের সামনে একটু সময়—তারপর চৌধুরীদের গাড়ী-বারান্দার নিচে। দস্তবাড়ির একতলা থেকে একটি মেয়ে আসে—দোতলা থেকে নামে আরেকটি। এখার-ওখার ঘুরে সবশুদ্ধ দশ-বারোজন। সারবন্দী মেয়েদের আগলে নিয়ে স্কুলের পথে পা-চালায় সে। কিশোরগাটেন স্কুল। দূরের মেয়েরা আসে গাড়ী চেপে। কাছে-পিঠের মেয়েরা যাওয়া-আসা করে সুরবালার চোখে চোখে।

কেমন স্কটস্কুটে মেয়েরা সব। তার গোলাপের বয়সী প্রায় সবাই—কিছু ছোট-বড়ও আছে। গোলাপের রং যদিও কালো তবু মুখের আদলতো ওদের মতই। ওকেও যদি ইস্কুলে দেওয়া যেত—কিছু লেখা পড়া শিখত তা হলে, গান-বাজনা একটু। আবার ঐ মেয়েদের মতই খেলা-ধুলো ছটো-পুটিও করত। সে সব কি আর হবে কোনোদিন—আবোল-তাবোল ভাবনাই সার।

মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে—স্কুলের বারান্দায় একবার কাঁটা বুলিয়ে জল-ঘরে গিয়ে ঢোকে সে। এখানেই তার কাজ।

মাটির কলসী কটার জল ভরে কাঁচের গেলাসগুলো ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখে। এতক্ষণে একে একে দিদিমণিরা আসেন। প্রায় সব ক'জনই মেম-সারের। স্কাট হুলিয়ে, উঁচু হিল খুঁটখুঁট করে যে যার ক্লাস-ক্রমে ঢোকেন। ওদের ইঞ্জিরী বুলি আর ভাঙা-চোরা হিন্দী—সবটা বোঝে না সে। হাত-মুখ নেড়ে হাব-ভাবে কাজ চালায়। এরপর আসেন মাজাজী দিদিমাণি মিস্ আয়ার। একটু ছটফটে স্বভাব—বাংলা বলার দিকে খুব ঝোক। কিন্তু তার উচ্চারণের নমুনা শুনে সুরবালার মত মুখা মানুষও মুখ টিপে হাসে। সবশেষে আসেন নীলিমাণি—প্রায় রোজই একটু দেবী করেন। এই একজন দিদিমণিই বাঙালী, বাংলা পড়ান। সুরবালার পছন্দসই মানুষ। কথা বলে সুখ আছে, হৃদয় সুখ-হৃৎখের আলাপ করা যায়।

নীলিমাণির জন্য একটি বিশেষ গেলাস আলাদা করে ধুয়ে মুছে রাখে সে। কিন্তু ঠোট ছোয়ান না দিদিমণি।

বা-হাতে ভারী খোঁপাটা চেপে ধরে মুখ উঁচু করে গলায় জল ঢালেন। শেষে চোখ নাড়িয়ে বলেন—“বা গেলাসের ছিঁর। মুখ দিতেও ঘেরা লাগে—স্তাষ্টি। তুইও তো হাতে জল দিস্না, সুরো। ভারী নোংরা তুই।”

—“নাগো দিদিমণি। রোজ সাবুন দিয়ে হাত ধুই আমি।”

মোলায়েম-সুরে জবাব দেয় সে।

একটু নাক সিটকে ঘেমাকী চালে চলেন নীলিমাণি—খুঁতখুঁতে বাই আছে বটে। তা' হোক তবু মানুষ ভাল। চাল-চলনে বেশ একটা কায়দা-কাহুন আছে। মেমসারেরগুলোর

সঙ্গে স্বর স্বর করে ইঞ্জিরী বলেন—সাজ-পোশাকে সমানে পাল্লা দেন। এক বংএর শাড়ী-ব্রাউজ ছ'দিন পরেন না, খোঁপার ছাঁদও নিত্য-নূতন।

আর একজন বাঙালী আছেন, অনাদিবাবু। স্কুলের প্রোপাইটর ও সেক্রেটারী। গম্ভীর ভারিকী চালের মানুষ। সুরবালার ছোয়ার বাইরে—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতেই কেমন গা-ছম্ছম করে।

আজ কিন্তু নীলিমা দি তাকালেন না। স্কুলে এসেই সোজা চলে গেলেন ক্লাশে। রোজদিন এদিকপানে তাকিয়ে একটু মিষ্টি করে হাসেন, কিংবা কখনো কোনো কাজের জন্য ডাকেন—“এই সুরো! এদিকে শুনে যা”—

সে সব কিছু হ'ল না আজ। অথচ দিদিমণির সঙ্গে অনেক কথা ছিল—একটা বুদ্ধি নিতে হবে। আজ ভোরের কথা বলতে হবে। এখন কি করলে ভাল হয়, মুখপোড়া মিন্বে হঠাৎ বিনি-খবরে এলোইবা কেন? ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝা দরকার। চান্দ্রিক সামলে সাবধানে চলতে হবে। টিকিনের সময় কিন্তু নীলিমা দি এসে বললেন—“এক গ্লাস জল দে।”

মুখ বুজেই জল দিল সে।

—“কিরে! মুখ-ভার করে আছিস কেন?”

—“বলুনি।—বেন আপন জনের মতই অভিমানের ভান করে সুরবালা।

—“ও বাবা! তোর আবার রাগ হ'ল নাকি?” দিদিমণির ঠোঁটের কোণে, চোখের পাতায় মজা-দেখার হাসি।

—“না আগ করিনি।”—সেও হেসে ফেলে—“বড্ডো ভাবনা নেগেচে—আমার নোক এয়েচে গো—সেই মুখপোড়া মিন্বে।”

—“সোক এসেছে! কে সে?”—নীলিমা দি রাম-ধনু বাক্য ভুরু ভুলে বললেন—“ও। তোর বর এসেছে বুদ্ধি! তা বেশ তো—এবার দেশে গিয়ে বরসংসার কর। পুরুষ মানুষ একটু-আধটু নেশা করলে কি হয়—এবার থেকে রাশ টেনে সামলে চলবি।”

ওইটুকুই শুধু জানে দিদিমণি। মাতাল সোহ্রামী যার-ধোর করত সেই জন্তাই সে রাগ করে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু ওটাইতো সব নয়—ঘর ছাড়ার আসল কারণ প্রহ্লাদের তিন নম্বর বৌ—এখন যে আবাগী সংসারের গিন্নী হয়ে বসেছে।

সব কথা তো আর বলা যায় না দিদিমণিকে।

প্রহ্লাদ যখন তিন নম্বর বিয়ের তোর-জোড় লাগিয়ে দিল—সুরবালাও অসুখের নাম করে পালালো রাপের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে সোজা ক'লকাতা, যাস ছ'রেক খুঁজে খুঁজে এই চাকরী।

এতটা যে হবে বুঝতে পারেনি প্রহ্লাদ। ভেবেছিল বিয়ের হাজায়া মিটে গেলে—একদিন গিয়ে বুদ্ধিয়ে-সুজিয়ে ছ'নম্বরকে ফিরিয়ে আনবে। মেয়ে-মানুষের মনতো! একখানা বলমলে ছাপা শাড়ী কিংবা গিল্টি করা গয়না দিলেই গলে যাবে। না হয়—

সুরবালার সখের জিনিস সেই সোনার নাক-কুসটাই দেওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা পড়ানো অন্তরিক।

আসলে ওর ভাইদের কিছু কারসাজী আছে এর মধ্যে। ওই শালা-গুটির কান-কথায় ভুলে এই পথে নেমেছে ও, না হলে একটা মুখা মেয়েমানুষের এতটা সাহস হয়।

হুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে। সুরবালা ঘরে এসে দেখে, দাওয়ায় ছড়ানো রয়েছে—চুলের ফিতে, কাঁচের চুড়ি, ফুল-ফুল গন্ধ তেল, গায়ে মাখা সাবান, জিনিসগুলো খুশিমনে উন্টে-পাণ্টে দেখছে গোলাপ। আগের জায়গায় সেই খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে বসে আছে মানুষটা মুখে মিটমিটে হাসি।

—“এতো জিনিস! এসব আনলে কে?”—যেন নাবোকার ভান করেই কথাটা জিজ্ঞেস করে সে।

বিশেষ কাউকেই উদ্দেশ্য করে বলা নয়—কাছাকাছি হু’জনের যে কেউ জবাব দিক।

জবাব দিল আলুগা হাসি-মুখ মানুষটা—“এনেছি আমি, গিয়েছিলাম কালীঘাটের বাজারে—শিখান খেইকে দেখে-শুনে নিয়ে এলাম। হাজার হোক আমারই তো মেয়ে—মাথায় তেল নেই, গায়ে একটা ভাল কাপড় নেই।” মুখের চেহারা বদলে গেল প্রহ্লাদের। এখন ধমধমে ভাব—“আমি লক্ষ্মী পেল্লাদচন্দ্র—জয়নগর থানার দারোগাবাবু ইস্তক আমায় খাতির করে চলে। আর তুই কিনা এমন ধারা কাণ্ড করে চলে এলি! গাঁয়ের মধ্যে আমার মুখ দেখানো ভার—সবাই শুধোর পেল্লাদ! তোমার বৌ গেল কুথাকু—ছি! ছি!”

—“কেন! ঘরে যে আছে তাকে দেখালেই পারো—আমি তো মরার সামিল—ঘরে গিইছি বলেই হয় সবাইকে।”

—সুরবালা আর চুপ করে থাকতে পারে না, গলাটা কেমন ধরা-ধরা মনে হয়।

—“সিঁটা কি কোনো কাজের কথা হ’ল।”—মুখে আলুগা হাসি টেনে কেমন ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় মানুষটা,—“বারো বছর বয়স হয়েছে—বিয়ের যুগি মেয়ে, এই কুঁড়ে ঘরে একলাটি পড়ে থাকটা কি আর ভাল দেখায়, এখন তো মেয়ের বে-খা দিতে হয়।”

অনেক ভেবে-চিন্তে জমিয়ে রাখা কথাগুলো বেশ সাজিয়ে শুছিয়ে বলে গেল সে।

—“বারো নয় মোটে দশ ছেড়ে এগারো হ’ল। ওকে এখন বে-দোবনি।”—মেয়ের মা ঘন ঘন মাথা নাড়ে—“বিয়ের কি জালা সে আমি বুঝিচি।”

—“বে না দিলে কি আর চলে—নিশ্চয় হবে যে।”—বিড়িতে জোরে-জোরে টান দেয় প্রহ্লাদ। কথার সুরে বেশ একটু বিরক্তিভাব। আর কাঁহাতক সহ হয়।

—“বে না দিয়ে করবি কি? এমনি ধারাই কি চলবে?”

—“ওকে!—ওকে আমি নেকাপড়া শেখাব।”—একটু ভেবে ফস্ করে কথাটা বলেই ফেলল সুরবালা।

—“বলিস্ কি তুই!”—বিড়িতে শেষটান ভুলে প্রহ্লাদ হাঁ করে থাকে।—“নেকাপড়া

শিখুবি কি ! ওসব মেমসায়েরী ঢং ছাড় ! আমি পাকা কথা দিয়ে এয়েছি ভূষণ মাঝির ছোট ভাই নেতাই চরণের সঙ্গে—তিনকুড়ি টাকাও দেবে বলেছে—এই বোশেখ মাসেই লাগিয়ে দিই—কি বলিস্ ?”—একদমে কথাগুলো শেষ করলে ।

এবার সুরবাসাই হতভম্ব । বিড়ে-পাকানো সাপটা ঘেন আচম্কা কণা তুলে ছোবল দিলে ।

আসল কথা ফাঁস হ'ল এতক্ষণে । বিয়ের বাজারে মেয়ের দাম অনেক । একটু চাপ দিলেই আরও বেশি টাকা পাওয়া যায় । অথচ ভূষণ মাঝি মহাজন লোক—তার সঙ্গে টাকা-পয়সার লেন-দেন অনেক দিনেরই ! সুতরাং অল্প টাকার রফা হলে কাজ-কারবারেও কিছু সুবিধে হবে । এই বুঝি ভেবেছে প্রহ্লাদ !

কিন্তু কি আশ্চর্য ! নেতাইচরণের বয়স হ'ল ছ'কুড়ি বছর—একবৌ সেদিন মরেছে—পুরো ছ'বছরও হয়নি । তারসঙ্গে ফুলের মত ছোট্ট মেয়ে গোলাপের বিয়ে ! অসম্ভব । সমস্ত ভাবনা-চিন্তার খেই হারিয়ে কোঁকে ওঠে সুরবাসা—“এই মতলব কেঁদে এয়েচ তুমি ? আমিও তো ভাবি—কি জন্মি এলো মানুষটা ! দরদ দেখাতে এয়েচ—ভেবেচ আমি কিছু বুঝিনি ।” কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিল, নাকের ডগা ফুলে ওঠে, হাত নেড়ে চেষ্টা সে—“অলপে মিন্‌সে ! ওসব চালাকি হেথাক চলবেনি । বেরোও একখুনি, দূর হও বুলছি—দূর হও তুমি ।”

প্রহ্লাদ উঠে দাঁড়ায় । ইচ্ছে হ'ল চুলের মুঠি ধরে কয়েকটা চড়-চাপড় লাগিয়ে দেয় । কিন্তু গোলমালের গন্ধ পেয়ে অনেক-লোকের ভিড় জমতে শুরু করেছে—বস্তির মানুষ সব । সুতরাং সে ইচ্ছেটা আপাতত চাপা দিয়ে, জামাটা কাঁধে ফেলে উঠোনে নামল সে । যেতে যেতে মুখ কিরিয়ে জবাব দিল—“বাচ্ছি বটে, কিন্তু আবার আসব আমি—কাল বাধে পরন্তু আসব । পুলিশ ডেইকে আনব—হাতে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নে যাব ।”

মনে মনে ভয় পেলেও সুরবাসা কথা বলতে ছাড়েনা—“আচ্ছা ! আমিও দেখে নোব—মেম-সায়েরের ইস্কুলে কাজ করি আমি—তাদের দরওয়ান ডেইকে এনে মার দোয়াবো—এই সব নোক সাক্ষী রইল, মামলা করতে আমিও জানি ।”

গোলাপকে ঘরে ঢুকিয়ে—দমকরে দরজাটা এঁটে দিল সে । আরো কি সব বলতে বলতে চলে যায় প্রহ্লাদ—সবটা পরিষ্কার শোনা গেল না । পাড়া-পরশীরাও একে একে ভিড় ভেদে দেয় । সময় কাটে । সন্ধ্যা পেরিয়ে অন্ধকার ঘন হয়ে আসে । তারা বলমলে কালো আকাশ । শিরীষ-ডালে কিরকির বাতাসের অস্ফুট আনাগোনা । আচম্কা একটা কুকুরের করুণ কান্নার রেশ একটানা অনেকক্ষণ কেঁপে কেঁপে একসময় চূপ করে । বড়-রাস্তার আর ব্যস্ততা নেই । নিরুন্ম রাত—বস্তি নিঃসাড়ে ঘুমোয় । কিন্তু জেগে আছে সে । ঘরের এককোণে টিম্‌টিম করে কেরোসিনের টেমীটা জ্বলছে । বিছানার একপাশে ঘুমিয়ে পড়া গোলাপকে ঘিরে তার আশাতরা দৃষ্টি অনেকক্ষণ জেগে থাকে । মেমসায়েরের ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেই নিশ্চিন্দ । ওরাই তখন দেখানো করবে—ধোঁকখবর করবে । ওখান

থেকে ধরে নে যাবার সাধি পুলসের বাবারও নেই। খাস বিলিভী ইস্কুল, চালাকি নয়। কালবাধে পরও প্রহ্লাদ আসবে। আমুক না! সেও দেখে নেবে।

গোলাপকে লুকিয়ে রাখবে অনাদিবাবুর বাড়ি কিম্বা নীলিমাদির ওখানে। একবার ইস্কুলের খাতায় নামটা তুলতে পারলেই হ'ল। কিন্তু অনাদিবাবু যদি রাজী না হ'ন—যদি ওকে ভতি না করেন। তার হাতে-পায়ে ধরতেও রাজী আছে সুরবালা। কিন্তু সব কথা খুলে বলতে পারবে কি সে? কেমন যেন লজ্জা লাগে। হাজার হলেও ঘরের কথা, সোয়ামী তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আবার বিয়ে করেছে একথা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে বলা যায় না। প্রহ্লাদের প্রথম বোয়ের মত যদি সে মরেই যেত—সেও ছিল ভাল।

এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—অনাদিবাবুকে যে-ভাবেই হোক রাজী করাতেই হবে—না হয় নীলিমাদিকেও বলে-কয়ে সঙ্গে নেবে—সাহায্য চাইবে। সে থাকলে বেশ একটা জোরও হবে। একবছরে অল্পস্বল্প করে দু'কুড়ি দশটাকা জমেছে তার। ওই টাকা খরচ করেই ভতি হবে গোলাপ। একটা ভাল ফ্রকও কিনে দিতে হবে। পরেশবাবুর ছোট মেয়ের মতো ববছাঁট চুল, কাঁধে বইপত্রের ব্যাগ—কেমন দেখাবে তখন। জুতো কি আর পায়ে দিতে চাইবে সে, বা লজ্জা মেয়ের! এখন ভালয় ভালয় ভতি করিয়ে দিতে পারলেই হয়। —হে মা কালী! তুমিই জানো।—দুই হাত জোড় করে মাথায় ছোঁরায় সুরবালা। কেমন যেন ধোঁয়াটে, স্বপ্নের মতো মনে হয়। এসব কি আর হবে—তার এত আশা বৃষ্টি মিথ্যেই হয়ে যাবে। শেষে ঐ আধবুড়ো নিতাইচরণের সঙ্গে তার স্কুলের মত ছোট্ট মেয়ে—আর ভাবতেও ভয় হয়। কেমন যেন ক্লান্ত লাগে—সমস্ত শরীরে অচেনা অবসাদ। চোখের পাতার কখন ঘুম জড়িয়ে এলো।

পরদিন বেলা নটা নাগাদ—গোলাপকে সাজিয়ে-ওছিয়ে সঙ্গে নিয়ে স্থলে গেল সুরবালা। নীলিমাদি এখনো অসেননি—সে এলে আরও ভাল হ'ত। মেয়েকে দোর-গোড়ায় দাঁড় করিয়ে অফিস-ঘরের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢোকে সে।

অনাদিবাবু কাগজ-পত্রে চোখ ডুবিয়ে বসে আছেন। ওখানে আর একটা টেবিলে প্রিন্সিপাল মিসেস্ কেনিয়ন—সুরবালার বড়দিদিমণি।

—“কি চাই?”—অনাদিবাবু চোখ তুললেন।

—“আ-আমি এয়েছিলাম।”—একবার চোক গেলে সে, হাত-পা কেমন অসাড় মনে হয়। ডান হাতের আঙ্গুল মটকে সমস্ত জোর দিয়ে গলা থেকে আওয়াজ বের করে—“মেয়েটাকে ইস্কুলে ভতি করাতে। একটাই মেয়ে আমার—নেকাপড়া শেখাব মনে করেছি, আপনি যদি নেন্ দয়া করে।”

অনাদিবাবু অবাক—চশমার আড়াল থেকে গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে রইলেন।

মিসেস্ কেনিয়ন ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলেন—সুরবালা বলতে চায় কি?

অনাদিবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই মুখে ক্রমাল তুলে নিলেন তিনি। হাসি-চাপা

সুরে বললেন—“মাই গড্! হ্যালো সুরোবাল! ডু ইউ লাইক টু গেট্ ইওর ডটার এড্ মিটেড ইন্ মাই স্কুল—হাউ ফানি!” স্কটল্যান্ড-মেয়ের নীল-চোখে হাসির ছটা উপচে ওঠে।

ওই নোলক-পরা, ডুরে-শাড়ী জড়ানো, কালো রং হাবাগোছের মেয়েটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়তে চায়। এমন অদ্ভুত কথা কেউ শুনেছে কোনোদিন। সুরবালার কি মাথা ধারাপ হ'ল।

গভীর-মুখ অনাদিবাবুও বুঝি একটু হাসলেন—স্বাভাবিক মোটা গলায় বললেন—“ভাখো সুরো! তোমার মেয়েকে আমাদের এখানে নেওয়া যাবে না—এটাতো কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুল নয়, আমি দেখব চেষ্টা করে সেখানে ওকে ভর্তি করানো যায় কিনা। এখন নিজের কাজে যাও।

মুখ অঙ্ককার করে বেরিয়ে এল সে। হাতে-পায়ে ধরার ইচ্ছেটা আর কাজে লাগাতে পারল না। দরজার বাইরেই নীলিমাди দাঁড়িয়ে—এইমাত্র স্কুলে এসেছেন, ওদের সবকথাই শুনেছেন নিশ্চয়। সুরবালার হাত ধরে বারান্দার একপাশে টেনে নিলেন।

—“তুই ফেপেছিস্ নাকি! ওদের কাছে গিয়ে ওসব কথা বলছিস্ কেন? এখানে একটা মেয়ে পড়াতে কত খরচ—জানিস্ কিছু তুই! মাইনে তো পাস্ মোটে তিরিশ টাকা।”

কোনো জবাব দেবার নেই। দিদিমণি তার মুখখানি খুঁটিয়ে দেখে নিলেন—“ওসব বুঝি ছাড়—এখন একটি ভাল ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দে। তোদের মধ্যে এই বয়সেই তো মেয়েদের বিয়ে হয়। ভাল জামাই পেলে তোরও একটা বল-ভরসা হবে।”

একটু দম নিয়ে দরদ-মাথা গলায় বললেন—“মেয়েকে লেখা পড়া শিখিয়ে কি লাভ হবে তোর? শুধু পরসার শ্রাঙ্ক। তার চেয়ে ভাল অবস্থা দেখে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর।”

এবার সত্যিই ভয় পেলো সে। সেই অলপ্পে মিনুষে প্রহ্লাদ নক্করের কথা শুনেছেন। হাত-পা যেন হিম-হিম পাথর মনে হয়, শুধু ঠোঁট ছুটি একবার কাঁপলো বুঝি। দিদিমণির এমন সুন্দর মুখখানি আজ তারি বিত্ৰী দেখায়। তার মিষ্টি গলার কথাগুলি আরো ধারাপ লাগে আর লাল টক্টকে আগুনে রঙ্ সিকের শাড়ীখানা যেন চোখ বলসে দেয়।

অশ্রুপতী

ভূর্গেবিভ

অনুবাদ : শিল্পির সেনগুপ্ত, জয়সুকুমার ভাদুড়ী

॥ ১৬ ॥

মাঝে তিনটে দিন কেটে গেল। একবার সুসানাদের বাড়ি ঘুরে আসার জন্যে মনের মধ্যে জোর ত্যাগিদ অনুভব করতে লাগলাম। আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল, যে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছি আমি ওদের বাড়ি গেলেই তার সমাধান-সূত্র পাওয়া বাবে। কিন্তু ওর বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই।....ভাবনায় বেশ উৎসাহের জোয়ার এস মনে। বেশ মনে পড়ছে।

সেদিন কেবলকারীর এক ঝড়লাগা সন্ধ্যা। ক্রুদ্ধ বাতাসের তাণ্ডবনৃত্য চলেছিল বাইরে। বলশালী হাতে ছোঁড়া বালির চাপড়ার মত জমাট তুষার স্তূপ থেকে থেকে জানলার শাসিতে এসে যা দিচ্ছিল। 'নিজের ঘরে বসে ছিলাম একলা। কি একটা পড়তে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় চাকর ঘরে ঢুকে রহস্যময় গলায় খবর দিলে যে একজন মহিলা আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। একটু অবাকই হলাম আমি। মেয়েটা সাধারণত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে না। আর বিশেষ করে এই অসময় রাত্রে। বাই হোক তাকে ঘরে নিয়ে আসতে বললাম চাকরকে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের বেগে হলদে শাল মুড়ি দিয়ে একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। গায়ে তার একটি মাত্র আচ্ছাদন—তাও গরম কালে পরার। ঘরে ঢুকেই ভাড়াভাড়ি কোট আর শাল গা' থেকে খুলে ফেললে সে। দেখলাম ছোটোই ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে।

তার অন্ধাবরণ খুলে দাঁড়াতেই দেখলাম আমার সমুখে দাঁড়িয়ে সুসানা। এখন বলতে পারি যে সেই মুহূর্তে এমন চঞ্চল হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হয়নি। জানলার কাছে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মৌনমুখী দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। আমি শুধু চোরে চোরে দেখতে লাগলাম তার দুটি মধুময়ী স্তনের ছরস্ব ওঠাপড়া। একবার মুখ তুলতেই দেখলাম তার চোখ দুটি অস্থির চঞ্চল। তার দুধআলতা ঠোঁটের প্রান্ত থেকে যে ক্ষীণ নিশ্বাস নির্গত হচ্ছিল তা যেন চাপা কান্নার মত শোনাল আমার কানে। গুরুতর এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্যে সে এইভাবে এখানে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। আমার অন্তঃকরণ যৌবনের স্বপ্ন অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এটা

স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার দৃষ্টির সামনে যে একটি জীবনের চরম ভাগ্য, আশ্রয় নির্মম পরিণতি, এই মুহূর্তে নিক্রান্ত হতে চলেছে চিরকালের মত ।

‘সুসানা’, বললাম আমি, ‘তুমি এখন—’ হঠাৎ ওর হিমশীতল হাতের স্পর্শ পেলাম আমি । কত আগ্রহে হাত দিয়ে সে আমার হাত চেপে ধরল । কি যেন বলতে চাইলে সে আমার । কিন্তু তার গলা দিয়ে সামান্য আওয়াজ বের হল না । শুধু বুকফাটা একটা ভাঙা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল । মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে । তার ঘন কাল কেশের তার স্তবকে স্তবকে তার চোখে মুখে এসে পড়তে লাগল । সারা মুখখানিই যেন আড়াল করে দিলে । সেই চুলে তখনও সাদা সাদা তুষার কণা লেগে রয়েছে ।

‘কেন অত উতলা হয়েছ সুসানা । এসে বোসো সোফায় ।’ তাকে সাধুনা দেবার প্রস্তাব অমূল্য করলাম আমি । বললাম—‘আমায় বলো কি হয়েছে । আগে বোসো । তারপর ধীরে শ্বশ্বে শুনব ।’

—‘থাক’—অর্ধশুটকণ্ঠে জবাব দিলে সে । সেইখানে জানলার ধারে বসে পড়ল সুসানা । বললে—‘এখানেই বেশ আছি আমি । আমাকে এখানেই থাকতে দিন । ...আপনি হয়ত আমাকে এ সমস্ত আশা করেননি । কিন্তু যদি জানতেন...যদি জানতেন—কিন্তু কেন অমন হল—কেন—’

কতরকম করে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল সুসানা । কিন্তু বাঁধভাঙা বস্তার মত চোখের ছ’কুল ছাপিয়ে অশ্রু নেমে আসতে লাগল । সারা দেহ কাঁপতে লাগল ধরধর করে । কান্না, বুকফাটা করুণ কান্নায় ঘরের বাতাস যেন বিষম হয়ে উঠল । আমারও বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল—আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম । সবশেষে ছবার মাত্র সুসানার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে । আমার ধারণা ছিল ওর প্রতিদিনের জীবন যাত্রা হয়ত শ্বশ্বে নয় কিন্তু গরবিনী মেয়েটির মন পাষণকঠিন । কিন্তু এই উচ্ছ্বসিত নিরাশাস্কর চোখের জল...উঃ একমাত্র নির্মম মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ এমনি ভাবে কাঁদতে পারে ।

মৃত্যুর রাগ পাওয়া আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি ।

‘ক্ষমা করবেন আমার’—অশ্রু সংবরণ করার নিষ্ফল চেষ্টায় অনেকবার চোখ মুছে শেষে বললে—‘এখনি সামলে নিতে পারব আমি । আপনার কাছে এসেছি...’ তখনও কাঁদছিল সে কিন্তু চোখে আর জল ছিল না । অশ্রুহীন তার কান্না ।

—‘আমি এসেছি...আপনি জানেন বোধ হয় কান্ডোত চলে গেছে ।’

এই একটিমাত্র কথায় সুসানার সমস্ত বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে গেল । সে এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যেন বলতে চায়—‘আপনি সব বুঝতে পারছেন । আমার ছুঁড়াপ্যে আপনার করুণা হবে ।’

হতভাগিনী । ওর পক্ষে এরকম করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না । এ-কথার যে কি জবাব দেব আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না ।

‘ফাস্তোভ চলে গেছে। চিরকালের মত চলে গেছে। ওর কথা বিশ্বাস করবার আগে আমাকে একবার দ্বিজ্ঞাসা করারও দরকার বোধ করল না সে। ফাস্তোভ ভেবেছে আমি বুঝি তার কাছে সত্য গোপন করব। আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে পারলে সে। যেন এতদিন আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছি।’

‘ঠোট কামড়াতে লাগল সুসানা। তারপর নত হয়ে জানলার শাঙ্গিতে যে ডুয়ার ধমেক্কে নখ দিয়ে তাই ঝাঁচড়ে আলপনা ঝাঁকতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে চাকরকে অন্ত্র পাঠিয়ে দিয়ে তক্ষুনি ফিরে এলাম। আরো একটা মোমবাতি জ্বলে দিলাম ঘরে। আমি যে কি করছি সে-সম্বন্ধে কোনোই ধারণা ছিল না আমার। এমন ধারা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি।

তখনও সুসানা জানলার ধারে ভেমনিভাবে বসে ছিল। এইবার প্রথম আমার নজরে পড়ল সুসানা কত সামান্য কত হালকা পোশাক পরে এসেছে। সাদা বোতাম লাগানো ছাই রংয়ের একটা গাউন। কোমরে চামড়ার বেল্ট। পোশাক বলতে এই। আমি ওর কাছে সরে গিয়ে দাঁড়িলাম তা সে লক্ষ্যও করলে না। আপন মনেই বলতে লাগল—‘এ কথা কি করে বিশ্বাস করলে—কি করে বিশ্বাস করতে পারলে?’

ঐ এক কথা কতবার করে উচ্চারণ করলে সুসানা। নিজের প্রশ্নের জবাবে অল্প করে তার শরীর হুলতে লাগল—‘একটুও তব সইল না। আমাকে সে শেষ আঘাত—চরম আঘাত করে গেল।’

হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরে বললে—‘আপনি জানেন তার ঠিকানা?’

—‘জানি। ওদের বাড়ির চাকরদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু ফাস্তোভ তার সংকল্পের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি আমাকে। দুদিন ওর সঙ্গে দেখা না হওয়ার ওদের বাড়িতে থবর নিতে গিয়েছিলাম। শুনলাম—ও মল্কা চলে গেছে।

‘আপনি জানেন তার ঠিকানা?’—যেন একটা আশ্রয় পেলে সুসানা। অধীরকণ্ঠে বললে—‘তাহলে আপনার বন্ধুকে লিখে দিন—ও আমাকে যেতে কেললে। আমি জানি আপনি খুব ভাল লোক। আমার সম্বন্ধে ও হয়ত কিছুই বলেনি আপনাকে কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি ওর মুখ থেকে। আপনি দয়া করে লিখে দিন—লিখে দিন এই অভাগিনীর জবানীতে। আমার যদি জীবন্ত দেখতে চায় সে, যেন ও শিগগীর ফিরে আসে। কিংবা কি জানি—আমার ও আর জীবন্ত দেখতে পাবে না।

প্রতিটি কথার সঙ্গে সুসানার কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্থিত শান্ত হয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ও নিজেও শান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কান্নার চেয়ে তার এই চিত্রাপিত শান্ত মূর্তি আমাকে বেশি বিক্ষুব্ধ করে তুলল।

‘ওর কথা বিশ্বাস করলে ফাস্তোভ’—অঙ্গুলীবদ্ধ হাতের উপর খুঁতনি রেখে সুসানা চুপ করে বসে রইল ধানিকন্ধণ।

হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপট তীক্ষ্ণ আওয়ার ডুলে জানলার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সেই সঙ্গে তুষারপাতের শব্দ । ঘরের মধ্য দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল । কেঁপে উঠল বাতির আলো । আর সেই সঙ্গে সুসানার সারা শরীরও শিহরিত হয়ে উঠল দেখলাম ।

আবার আমি ওকে সোফায় বসার জন্যে অনুরোধ করলাম ।

—‘না না যেখানে আছি সেখানেই থাকতে দিন আমার । দয়া করে দিন’—

জানসার শাসির গায়ে আরো জড় সড় হয়ে বসল সে । বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে আশ্রয়কার বুঝি এইটাই ওর নিরাপদ আশ্রয় ।

—‘শীতে কাঁপছে তোমার শরীর’—প্রতিবাদ করলাম আমি—‘জুতা ভিজে মগসপে । তুমি যে ভয়ে যাবে সুসানা এই ঠাণ্ডার বরফে ।

—‘আমার দিকে আর তাকাবেন না । এই আমি বেশ আছি ।’

কাতর মিনতি জানাল সুসানা । ধীরে ধীরে ওর চোখের পাতা দুটি বুজে এল । দেখে একটা অশরীরী আতঙ্ক গ্রাস করল আমার ।

—‘সুসানা’—আমি যেন প্রাণের তাগিদে চেষ্টা করে উঠলাম । বললাম—‘অমন করে বসে থেকে না তুমি । এস, উঠে এস । তোমায় মিনতি করছি সুসানা । উঠে এসে সোফায় বস । এত হতাশ হয়ে পড়ছ কেন ? একটা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে মাত্র । জলভরা মেঘ চিরদিন থাকবে না । মেঘ কেটে যাবে । কান্তোভ শিগগীরই ফিরে আসবে । সব কথা পরিষ্কার করে লিখে আমি তাকে চিঠি দোব । তবে তুমি যে কথা বললে তা আমি লিখতে পারব না । ও কথা আমার কলমে আসবে না ।’

‘আমার আর সে দেখতে পাবে না’—তেমনি স্তিমিতকণ্ঠে ফিসফিস করে বললে সুসানা । ‘যদি না জানতাম যে পৃথিবীতে আমার বাঁচার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাহলে কি একজন অপরিচিত লোকের কাছে এমনভাবে অঙ্ককার রাত্রে ছুটে আসতাম ।’ আমার অতীত ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । সে সব দিন আর ফিরে আসবে না । মরতে বসেছি আমি । সর্বনাশ বা হবার তা হয়েই গেছে । কাউকে একথা না বলে আমি কিছুতেই মরতে পারতুম না । তাই আপনাকে এমন করে ছুঃখ দিতে এলাম ।

অঙ্ককার রাত্রির পটভূমিকায় তুষারচাক শাসির স্নানাত আলোর সেই মুখ সেই বিষাদ মূর্তি আমি জীবনে ভুলব না । তার সেই নিখর চোখের নির্ধাপিত জ্যোতি—শ্বেতপাখরের তৈরী সেই মুখধানার বিষমতা ঘিরে ঘন কালো অবিচ্ছিন্ন কেশপাশ—আমি জীবনে ভুলতে পারব না । তার সেই জড়োহয়েবসা দেহটাকে ঘিরে পরনের ছাই রঙের পাতলা গাউনটার ভাঁজগুলি মনের পরতে পরতে অক্ষয় দাগ রেখে গেছে । আমি ত জানতাম ঐ স্তিমিত দেহের অন্তরালে একটি অনুরাগবিধুর তরুণ প্রাণ স্পন্দিত । যে প্রাণ ভালবাসার কাঙালিনী । প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে যে প্রাণ বিপ্রলক্স ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি ছই-হাতে প্রতিবাদ জানালাম । বললাম—‘মরার কথা কেন বলছ সুসানা । মরতে তুমি পাবে না । তোমার বাঁচতে হবে । বাঁচতেই হবে ।’

একথা শুনে সে আমার দিকে দৃষ্টিপ্রদীপ তুলে ধরলে। আমার কথায় তার বিষয়ের সীমাপরিসীমা রইল না যেন।

‘আপনি জানেন না’—অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বললে সুসানা—‘আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বড়ো দুঃখের জীবন আমার। সারাটা জীবন ধরে কেবল দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছি। কিন্তু এত দুঃখেও বেঁচে ছিলাম—শুধু একটি আশা তরুকে আশ্রয় করে। কিন্তু যখন সেই আশ্রয়ও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল—’

বলতে বলতে সে ঘরের ছাতের দিকে চাইলে একবার। তারপর আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। আর কথা কইল না। গভীর বেদনা ও বিরক্তির যে রেখা ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল, তখন ওর সর্বাঙ্গে তা বিস্তৃত হয়ে গেল। বিষণ্ণ মেহুর হয়ে এল কোমল মুখখানি। সুসানাকে দেখে মনে হল যেন কোনো পাষাণ প্রতিমা। যার শরীরের রেখায় রেখায় অবিনশ্বর বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছে কোনো জীবনশিল্পী।

সুসানা তখনও তেমনি আচ্ছন্নের ঘোরে ছিল। সেই দমআটকানো নৈঃশব্দ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমি বললাম—

—‘শোন সুসানা। আমি বলছি ও ফিরে আসবে।’

শুনে আমার দিকে শূন্যগর্ভ শীতল দৃষ্টিতে চাইলে বিরহিনী।

—‘কি বলছেন?’

যেন কত চেষ্টা করে বললে কথা কয়টি।

—‘আমি বলছি তোমার ফাস্তোভ ফিরে আসবে। নিশ্চয় ফিরে আসবে।’

—‘ফিরে আসবে বলছেন? কিন্তু ফিরে এলেও এই অপমান অবিশ্বাসের জন্ত আর তাকে ক্ষমা করতে পারব না।’

সুসানা অস্থির আবেগে দু’হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল।

‘হায় ভগবান। এসব আমি কি বকছি। কেন আমি এলাম এখানে? কেন এ বিড়ম্বনা। কিসের আশায় এসেছি এখানে! কেন, কেন? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে গেছি।’

ওর দৃষ্টি আবার যেন নিখর হয়ে এল।

‘ফাস্তোভকে চিঠি লেখার কথা বলতে এসেছেন’—আমি তাড়াতাড়ি ওকে মনে করিয়ে দিলাম কেন ও এসেছে এখানে।

চমকে উঠল সুসানা।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—লিখে দিন তাকে—যা মন চায় লিখে দিন।’

এই বলে ও তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনেকগুলো হাতে লেখা কাগজ বার করলে।

‘এটা তার অন্তেই লিখেছিলাম—। তার চলে যাবার অনেক আগে থেকেই

লিখছিলাম—কিন্তু সে ওরই কথা বিশ্বাস করলে। পরখ করলে না, খতিয়ে দেখলে না, বেরবাক্য বলে যেনে নিলেন।

সুসানা যে ভিক্টরের কথা বলছে তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধা হল না। ভিক্টরকে ও এত ঘৃণা করে যে তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলে না।

—‘কিন্তু ফাস্তোভের সঙ্গে তোমার ভাইয়ের এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে এ কথা ধরে নিচ্ছই বা কেন?’

—‘ধরে নোবো কেন? ও ত বাড়ি এসে নিজেই আমাকে সব কথা বলেছে। গলা ফুলিয়ে খুব দস্ত করলে তা নিয়ে। ওর বাপ যেমন হাসে তেমনি করে সেও হাসলে।’

পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সুসানা বললে—‘এটা নিন পড়ে দেখবেন। ওকে পাঠিয়ে দিন, পুড়িয়ে কেনুন, ফেলে দিন যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু এভাবে কাউকে কোনো কথা না জানিয়ে মরতে আমি পারব না।...সময় হয়ে এসেছে—এবার আমাকে যেতে হবে।’

সুসানা যাবার ক্ষণে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু আমি বাধা দিলাম ওকে।

—‘এখন কোথায় যাবে? বাইরে ভীষণ ভূমির ঝড় হচ্ছে। তাছাড়া তোমার গায়ে গরম জামা নেই। অনেকটা পথ যেতে হবে। দাঁড়াও অন্তত আমি একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করি।’

—‘না না আমি কিছু চাই না’—মেরেটা যেন মরীয়া হয়েই নিরন্তর করলে আমাকে। তারপর শাল আর কোট হাতে তুলে নিল।

‘দোহাই আপনাকে, আমার বাধা দেবেন না। সব কিছুর অবাবদ্বিহি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার পায়ের তলার গভীর অন্ধকার খাদ। আমার কাছে আসবেন না—স্পর্শ করবেন না আমার।’

বিকারগ্রস্ত রোগীর অদ্ভুত ত্রস্ততায় সুসানা শালটা গুছিয়ে নিলে। তারপর বললে—‘বিদায়—চিরবিদায়। আমার আত্মীয় বন্ধু জনের নিকট চিরদিন আমি অপরিচিতই রয়ে গেলাম। কাউকে চিনলাম না। ভগবানের অভিষাপ আছে আমাদের ওপর। আমার ক্ষণে কেউ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। ভালবাসা পাইনি। সেও ভালবাসেনি’—এই বলে হঠাৎ থামল সে—‘না না কেউ আমার ভালবাসেনি কোনোদিন।’ হাত মোচড়াতে মোচড়াতে আবার বলল সে—‘আমার চারিদিকে মৃত্যুর গভী—মুক্তি কোথাও নেই। এবার আমার পালা পড়েছে। আমার পিছু পিছু আসবেন না যেন’—ভীকৃকণ্ঠে বলল সে—‘আসবেন না বলছি। আসবেন না।’

আমি কেমন যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সুসানা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত পরেই বাইরের ভারী দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম। ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটার আনলগ্নলো ধর ধর করে কেঁপে উঠল।

সন্ধ্যা ফিরে পেতে বেশি দেরী হল না আমার। জীবনের যাত্রাপথে তখন সবে পা

বাড়িয়েছি ! প্রেম কি তাই জানতাম না । প্রেমের দুঃখ কেমন তা আমার যৌবন তখনো জানেনি । কোনো মেয়ের অনুরাগবিরাগের পরিচয়ও পাইনি তখনো । কিন্তু সেদিন যা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হল তার অকপটতা আমার মনের মণিকোঠায় চিরসঞ্চিত হয়ে রইল । পাণ্ডুলিপিটি যদি হাতে না থাকত তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নদেখাঘটনা বলে মনে করতাম । আত্মসম্বন্ধ সবকিছুই কেমন যেন অবাস্তব অসম্ভব মনে হতে লাগল । বুঝি বা হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেছে ঘরের মধ্যে দিয়ে । মাকরাত অবধি জেগে সেই পাণ্ডুলিপি পড়লাম । চিঠির কাগজের পাতায় ঠাসবুনানি লেখা । কোনো লাইনটিই সমান্তরাল নয় । দেখলেই মনে হবে, যে-হাত দিয়ে লেখা হয়েছে সে-হাত গভীর উত্তেজনায় কেঁপেছে সারাক্ষণ । পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা আছে তা এই । আজও পর্বস্ত পাণ্ডুলিপিটি আমি ধর করে রেখে দিয়েছি ।

(ক্রমশ)

কালো জল

সত্যপ্রিয় ঘোষ

যরে ঢুকেই চমকে ওঠে প্রভাত। কুসকাকীয়া! আবার এসে হাজির হয়েছেন!
কদিনের মনে কে জানে!

খিলখিল হেসে উঠে তখন বসছে মাধবীলতা, 'না দিদি, আজ তো আমি থাকতে পারব না। থাকতে আসিনি। মনটা বড্ড উদাস হ'য়ে গিয়েছিলো। কাল মাঝ রাস্তিরে ভারী বিশ্রি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে অন্ধি সেই যে ঘুম ছুটে গেলো। চোখ থেকে, কিছুতেই যেন মনের মধ্যে আর শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যদিকে তাকাই কেবল মৃত্যুর বিষণ্ণতা। ঘরের মধ্যে চারদিকের দেয়ালগুলো যেন আমার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে আমাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে। মেয়ে তিনটেকে নিয়ে তখন কী করি, ছুটে চ'লে গেলাম ছাতে। কিন্তু দিদি সেখানেও আশ্রয় পেলাম না। ছাতের বাইরে যদিকে তাকাই—পাষণ-কায়া! হায় রে রাজধানী, পাষণ-কায়া! বিরাট মূর্তিতে চাপিছে দৃঢ়বলে, ব্যাকুলা বালিকারে নাহিক মায়া! হুপুরবেলা আর থাকতে না পেরে বললাম মাকে, মা আর তো পারিনে মা, আমার বুকের মধ্যে অশান্তির ঝড় উঠেছে, দিদির বাড়িতে একবার যেতে না পারলে এ ঝড় শান্ত হবে না। আশালতা স্বর্ণসীতা ঝরাপাতা তিনটেই আমার সংগে আমার ক্রোড়ে বারনা ধরলো। তা আমি বললাম, বাবি তো চল, অনেকদিন দেখিসনি তোদের জেঠিমাকে, দেখে আসবি চল। কিন্তু বাগড়া দিলে মা। আমাকেই আটকে দিয়েছিলো আরেকটু হ'লে। তা আমি তখন কী আর করি, চালাকি ক'রে কঁাকি দিয়ে একাই পালিয়ে এলাম। আর এলাম ব'লেই না মনটা হাক্কা হ'লো, মনের বোঝা নামানো গেলো। কিন্তু দিদি, থাকবার উপায় নেই আজ।'

'তবু ভালো'—বলেন প্রভাতের মা হিরণ্ময়ী, 'তা'লে এখন ভূমি ওঠো। বেলা থাকতে থাকতে ফিরে যাও। রাত হ'য়ে গেলে যা মুসলমানী গুণাপাড়া গুনি তোমাদের, কামেলার প'ড়ে যাবে।'

'কামেলা কী আর দিদি, একা তো আর ফিরব না। আসবার সময় কে আমাকে নিয়ে আসে তাই একাই আসতে হ'লো। প্রভাত ফিরুক আপিস থেকে, সে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কখন ফেরে ও?'

হিরণ্ময়ী তাকালেন প্রভাতের দিকে। বিরক্তির ধাক্কা প্রভাত কী করবে ঠিক করতে না পেরে, বেতের চেয়ারটাই সশব্দে টেনে নিয়ে, টেবিলের ওপর রেডিওর চাবিটা খুলে দিলে রেডিওটার দিকেই চোখ পাকিয়ে রইলো।

আর তখন বাড়ি ফেরার মাধবীলতা। প্রভাতকে দেখতে পেয়েই উঠে পড়ে এগিয়ে আসে ব'লতে ব'লতে, 'ওমা তুমি এসে গেছে! ? কখন এলে বলো তো, আমি তো একদম টের পাইনি'—কাছে এসে সে প্রভাতের পিঠে-মাথায় একটু হাত বোলায়, ততক্ষণে রেডিওটা গান গাইতে শুরু করেছে, কয়েক মুহূর্ত রেডিওটার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে ব'লে ওঠে সে, 'কী গান রে বাবা! এই কি গান না বেড়ালের কান্না! একে আধুনিক গান বলে, না? এগুলো শুনেই না আমার বড়ো বিরক্তি বোধ হয়। বন্ধ ক'রে দাও না প্রভাত, তোমার ক্রটি তো এর'ম ছিলো না, তুমি কি বদলে গেলে? আচ্ছা আমি বন্ধ ক'রে দিচ্ছি, কোন্ চাবিটা খোঁজাও?'—ব'লেই একটা হাত এগিয়ে দেয় মাধবীলতা।

পাছে বিগড়ে দেয় রেডিওটা এই ভয়েই প্রভাত চট ক'রে বন্ধ ক'রে দেয় রেডিওটা। দিয়েই সতর্ক থাকে সে যাতে ছুঁতে না পারে ফুলকাকীমা রেডিওটা। অবিশ্রিত তাই ব'লে তার হাতের সংগে ছোঁয়াছুয়ি না হ'লে যায় ফুলকাকীমার বাড়িয়ে-দেয়া হাতটার—সে-বিষয়েও সে সতর্ক থাকে।

মধুর হাসি কোটে মাধবীলতার মুখে, পরম স্নেহে প্রভাতের জামার কলারের কাছ থেকে একটা ছারপোকা টেনে বের ক'রে সেটা পায়ের তলায় পিষে ফ্যালে, একটা হাত প্রভাতের কাঁধে রেখে বলে, 'রেডিওটা কত পড়লো প্রভাত?'

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে নিরুন্তরে উঠে পড়ে প্রভাত, জামাটা খুলে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে চ'লে যায় হাত-মুখ ধুতে বাইরে, বারান্দায়।

যখন ফিরে এলো, গামছায় জলটা মুছে ফেলতে ফেলতে শুনলো ফুলকাকীমার মুখে রেডিও-প্রসংগ তখনো চলছে।

'আমি একটা রেডিও কিনব। এটা কী মডেল? প্রভাত, কী মডেল এটা?'

'সে শুনে আপনার কী হবে!—এবার খিটখিট ক'রে ওঠে প্রভাত।

অবাক হ'লে থাকে মাধবীলতা প্রভাতের দিকে তাকিয়ে আর তারপর হেসে ওঠে খিলখিল, 'ওমা, শোন ছেলের কথা! কী আবার হবে, আমি যে কিনব রেডিও। সারাটা দিনরাত প্রতিটি মুহূর্ত ব'সে-ব'সে শুনেই হয় আমার। কী যে ক্লান্ত লাগে তখন। বুকের মধ্যে আমার মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস ওঠে হা-হা, ব'সে-ব'সে তাই শুনি! তার বদলে না হয় তোমার ঐ আধুনিকই শুনব!—ব'লেই হঠাৎ আবার খিলখিলিয়ে ওঠে মাধবীলতা, 'তা কত দাম পড়বে একটা ভালো রেডিও? তোমাদের এটা কতয় কিনেছো?'

'হাজার টাকা!—বলে প্রভাত ঠক ক'রে।

'হাজার?—একটু যেন চিন্তায় পড়লো মাধবীলতা, বললে শেষে, 'সার্ভিস ভালো পাচ্ছে কি? পাচ্ছে—তাহ'লে বেশ আমাকে এই মডেলই দাও একটা কিনে। কিন্তু হাজার টাকা তো তাই আমার হাতে আর নেই এখন। গয়নাগুলো বিক্রি করে অনেকগুলো টাকা হাতে এয়েছিলো বটে, কিন্তু তার এককাঁড়ি টাকা তো বেরিয়ে গেলো একটা তরফদার সেতার কিনতে। আমার কাছে আর খুব জোব সাতশো টাকা মত আছে। বাকি তিনশোটা

টাকা দিদি আপনি চালিয়ে দিতে পারবেন না এখনকার মত ? আমি তিন মাসের মধ্যে ঠিক শোধ করে দেব। আমি একটা টিচারি পাচ্ছি কিনা আসচে মাস থেকে, আমাদের প্রতিবেশী রসময়বাবু ঠিক ক'রে দেবেন বলেছেন, একশো টাকা করে মাইনে দেবে বলেছে—

‘নে প্রভাত’—ডাক দিলেন হিরণ্ময়ী, কুটি আর কলের প্লেট এগিয়ে দিলেন—এগিয়ে গিয়ে প্রভাত ফুলকাকীমাকে পেছন-ক'রে বসে যায় খেতে।

‘তুমি কিছু খাও না ?’—বলেন হিরণ্ময়ী মাধবীলতাকে, ‘দেব কেটে দুটো শশা আর ফুটি ?’

‘তা দিন দিদি। কিছু না খাইয়ে কি আর ছাড়বেন। দিদি, আজ পেরান্সুলেটারটা নিয়ে বাব ভাবছি। কোথায় ওটা ?’

‘বারান্দায় আছে’—বলেন হিরণ্ময়ী অপ্রসন্ন মুখে, ‘নিয়ে যাবে ভালোই—তবু একটা উৎপাত থেকে রক্ষ পাওয়া যায়। কিন্তু কেমন ক'রে নিয়ে যাবে ? এতটা রাস্তা ?’

‘আপনিও যেমন দিদি’—খিলখিলিয়ে ওঠে মাধবীলতা, ‘এটা যে ক'লকাতা শহর—সেটা ভুলে গেলেন ! গাঁটের কড়ি ফেললে এখানে যে চোখ বুজে আপনার এই মেছো-বান্ধাবের বাসা থেকে সৃষ্টির জিনিসপত্র ভুলে নিয়ে যাওয়া যায় আমাদের বেলঘাটার বাসায় ! কিসে সুবিধে হবে প্রভাত ? ট্যাক্সি ? না ঘোড়ার গাড়ি ? ট্যাক্সিতে কি পেরান্সুলেটর ধরবে ? তারচে' ঘোড়ার গাড়িই বেশ। কতদিন চড়িনি ঘোড়ার গাড়ি—কেষ্টনগর ছেড়েছি পর থেকে আর চড়িনি। আঃ, কতদিন হবে সে—এখন আমার ধরুন চৌত্রিশ বছর চলছে, বিয়ে হ'লো আঠারোয়, তা'লে ধরুন গিয়ে’—কর শুনে হিসেব করে মাধবীলতা, ‘ঘোলো বছর। ঘোলো বছ—র !—চড়িনি ঘোড়ার গাড়ি ! উঃ, কী অদ্ভুত এই জীবন ! কেমন বেমানাম ভুলে গিয়েছিলাম জিনিসটা। অথচ কত প্রিয় ছিলো আমার ঐ ঘোড়ার গাড়ি চড়া। জানেন দিদি, আমার তখন তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স হবে, আমার জন্মদিনে বাবা জিপ্সো করলেন আমাকে, মাধু কী তুমি চাও বলো, আমি বললাম সবাই মিলে চলো বাবা একটা টমটমে করে নদীর পাড় থেকে হাওয়া খেয়ে আসি। সবাই তো সে-কথা শুনে হেসেই খুন। বাবা বললেন, পাগলী মেয়ে !’—ব'লতে ব'লতে হঠাৎ দেখা যায় মাধবীলতার চোখে জল, চোখের কোল বেয়ে পড়ছে জল, কিন্তু মুখে কোন বিকৃতি নেই, বারান্দার দিকের আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন আর এ-জগতে নেই সে এমন-ক'রে ব'সে বইলো চুপচাপ।

‘আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো নিয়ে দশখানা !’—ছড়া কাটেন প্রভাতের ঠাকুমা সুনয়নী যিনি এতক্ষণ জুবুজুব ব'সেছিলেন গালে হাত দিয়ে মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে রোষকষায়িত নেত্রে, বললেন মুখ নেড়ে, ‘হ্যাঃ ! বলে, উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজার নিজে ! কপালে দু-বেলা ভাত জুটত না আর জন্মদিনে কিনা টমটম হাঁকানোর বিস্তার ! আরো কতই শোনাবি রে বাছা !’

কিন্তু এসব বুঝি শুনতে পার না মাধবীলতা। নিজের মনেই বলে সে একটু পরে,

‘প্রদ্যোৎ, তোমার দাদা তো আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তুমি কী করবে তোমার ফুল-কাকীমার জন্যে? তুমি না হয় ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসো একটা।’

নিরুত্তরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো প্রদ্যোৎ, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সন্দেহ হয় হিরণ্ময়ীর, বলেন তিনি তাড়াতাড়ি চেষ্টা করে উঠে, ‘গাড়ি আনতেই যাচ্ছিস তো তুই?’

‘সময় নেই আনার এখন। একটা মিটিঙে যাচ্ছি’—ব’লে বেরিয়ে যায় প্রদ্যোৎ।

‘আমারো একটা কাজ আছে’—কঠিন চোখে মুখে বলে প্রভাত, ‘আমাকেও বেরুতে হবে এখন অন্য কাজে’—ব’লে উঠে প’ড়ে জামাটা টেনে নেয় সে।

এমনি সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকেন শাস্তিদেব। চুকেই মাধবীলতাকে দেখে ধমকে যান। যেন চমক ভাঙে তাঁর যখন দেখলেন এগিয়ে আসচে মাধবীলতা তাঁর দিকে হাসিমুখে। ‘দাঁড়াও দাঁড়াও’—ব’লে শব্দবাস্তে তিনি চটিকোড়াটা খোলেন আগে ওর প্রণাম নেবার জন্যে। প্রণাম ক’রে উঠে মাধবীলতা ওঁর হাত থেকে ছাতাটা গলা থেকে মটকার চাদরটা নিয়ে রাখে যথাস্থানে আর তারপর বলে, ‘ভাগ্যিস এলেন দাদা, আরেকটু পরে এলেই আর দেখা হ’ত না আমার সংগে আজ।’

‘মেরেরা কই? আনোনি?’—বলেন শাস্তিদেব।

‘না দাদা, আজ আমি ঝাড়া-হাত-পা এসেছি’

‘সব ভালো তো ওরা? তোমাকে দিয়ে আসবে কে?’

‘প্রভাত। পেরাখুলেটারটা নিয়ে যাব আজ তাই ঘোড়ার গাড়ি আনতে যাচ্ছে ও’

‘ঘোড়ার গাড়ি? সে তো অনেক টাকা নিয়ে নেবে। তা বেশ, যা ভালো বোঝো করো’—বলেন শাস্তিদেব, ‘কিন্তু তুই কি চিনিস ওদের বাড়ি? ঘোড়ার গাড়ির দর ঠিক করবি কী ক’রে?’

শব্দ চোখে মুখে তাকায় প্রভাত ফুলকাকীমার দিকে।

বলে মাধবীলতা, ‘বোলো বেলেঘাটা সরকার-বাজারের বগলে, তা’লেই বুঝবে’

বেরিয়ে যায় প্রভাত।

অনেক দরাদরি ক’রে শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকায় একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে সে।

ঘরে চুকেই সকলের চোখে মুখে কথাবার্তার ধরনে বোঝে সে, কিছু কেলেকারি ইতি-মধ্যে ক’রে বসেছে ফুলকাকীমা। কিন্তু কী সে তা আর জানতে প্ররুত্তি হয় না তার। ঘরের মধ্যে দেখতে পায় না সে ফুলকাকীমাকে। বারান্দায় গিয়ে দেখলো সেইখানে সে দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত বিশ্রি অবস্থায়। বিশ্রি অবস্থা বলতে বুকের কাপড় তার হাওয়া খেয়ে লুটোচ্ছে পায়ের তলায়, কিন্তু সে-সব কিছু খেয়াল নেই তার, আকাশে সূর্যাস্তের রঙের খেলার দিকে তাকিয়েই বোধ করি আপন মনে সে গান ধরেছে, মোটামুটি গলা খুলেই সে গাইছে :

‘বাহির হইতে দেখো না এমন ক’রে

আমায় দেখো না বাহিরে !....’

সেখান থেকে ছিটকে এসে বলে প্রভাত খিটখিট ক'রে তার মাগের কাছে, 'ডেকে আনতে পারছো না ওঁকে ওখান থেকে। পাড়ার লোকেরা সব বলবে কী ছি ছি ছি'

ঘরের মধ্যে সকলেই প্রায় এই নিয়ে নানান মন্তব্য ক'রতে লাগলো, হিরণ্ময়ী চ'লে গেলেন বারান্দায়।

একটু পরে দেখা গেলো মাধবীলতাকে আসতে ঘরে। হাসিমুখে এটা-সেটা ব'লতে ব'লতে সে প্রণাম ক'রলো গুরুজনদের, একদম ছোটদের ক'রলো আদর আর তারপর বললে প্রভাতকে, 'পেরাষুলেটরটা নেবে না ভাই?'

বিনা বাক্যব্যয়ে তিরিকি মেজাজে চলে যায় প্রভাত বারান্দায়, পেরাষুলেটরটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ঘরে ঢোকে, ঘর থেকে বেরোয়, আর তারপর তেতলা থেকে সেটা একতলায় নামাতে যেমে অস্থির হয় সে। তুলে দেয় সেটা গাড়ির মাথায়।

কিন্তু ফুলকাকীমার আর দেখা নেই! একটা ডিনামাইটের মত যদি কাটতে পারত সে তবে তাই বুকি কাটত প্রভাত এবার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এলো মাধবীলতা এবং উঠে বসলো গাড়িতে। আর প্রভাতকেও উঠতে হ'লো।

চললো গাড়ি।

'তুমি ডগ-সিটে বসেছো!—'ঠাট্টা করলো মাধবীলতা প্রভাতকে।

বলা বাহুল্য, কথাটা কানে গেলো প্রভাতের এমন বোঝা গেলো না।

'আরে আরে, মাংস! এই গাড়োয়ান, জেরা বোক্কো এক মিনিটকে লিয়ে, বোক্কো না'—টেচিয়েই ওঠে মাধবীলতা।

ধামে গাড়ি।

'কী করতে হবে?'—দাঁতে চেপে প্রশ্নটি করে প্রভাত।

প্লাষ্টিকের হাতব্যাগ থেকে পাঁচটাকার একটি নোট বের ক'রে দেয় মাধবীলতা, বলে, 'ঐ যে মাংস। যাও ভালো দেখে সেরখানেক নিয়ে এসো'

'ঐ গোরুর মাংস?'

'গোরুর? ওকি গোরুর? এ-মাগো ওয়াক্, বমি আসচে আমার, এঃ কী দেখলাম। কিন্তু ভালো মাংস নেই এখানে? এটা তো বাজার। ভেতরে নিশ্চয়ই পাবে, যাও না ভাই, নিয়ে এসো না একটু কষ্ট ক'রে। আজ কতদিন পরে তোমাকে পেলাম, আমি নিজে-হাতে বেঁধে খাওয়াব তোমাকে। যাও যাও'—ঠেলতে লাগলো সে প্রভাতকে।

বাক্যব্যয় অর্থহীন হবে ভেবে নেমে প'ড়ে সে চ'লে যায় বাজারের ভেতরে। মিনিট দশেক পরে ফিরে আসে শালপাতার ঠোঙার আধসের মাংস নিয়ে। বাকি পয়সা আর ফেরত দেয় না ফুলকাকীমাকে, হয়তো রেখে দেয় গাড়িভাড়া বাবদ।

গাড়ি চললো আবার।

আর সেই সংগে চললো মাধবীলতার মুখখানা। আপনার মনে বিভোর হ'য়ে কত কথাই যে সে ব'লে যেতে লাগলো, অতীতের কত স্মৃতিচারণাই যে সে করলো প্রভাতের

কাছে ! প্রভাত যে এ-সব কিছু শুনতে রাজী নয় তা বোঝার মত মনের অবস্থা তো তার ছিলো না ।

শুধু একটিবার মুখ খুলতে হ'লো প্রভাতকে । আর তাও বোধ করি হঠাৎ জিভ থেকে উত্তরটা কসক বেরিয়ে গেলো ব'লেই ।

প্রশ্ন করেছে মাধবীলতা, 'তোমার সেজোকাকার কোন খবর মাসখানেক পর্যন্ত কিছু পাই না । তোমার সংগে দেখাটেখা হয় না ?'

'হয় । রাস্তাঘাটে । কিন্তু তাঁর দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন আমি বোধ করি না !'

ধানিকণ নিশ্চুপ হ'য়ে থাকে মাধবীলতা বাইরের দিকে তাকিয়ে । আর শেষে বলে ফের, 'তুমি ভুল করেছো ভাই । ওঁর বাইরের আচরণ দিয়ে ওঁর ভেতরটা বিচার কোরো না । ওঁর অন্তঃকরণটা খুব মহৎ । কিন্তু জীবনের কোথাও জরী হ'তে পারেননি ব'লে বাইরের আচরণে উনি হীন হ'য়ে পড়েছেন । সেটা ওঁর দোষ কী । আমি জানি তুমি ভগবান মানো না, ভাগ্য মানো না, কিন্তু'—মধুর হাসলো মাধবীলতা, 'আমি ভাই ও-সব মানি । সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি হৃদয়ে অনুভব করি । যদিও বিপরীত তিনি ললিতে-কঠোরে ! মানুষের জীবন দোলায়িত করছেন তিনি দুঃসহ স্বন্দ । কিন্তু তাই নিয়ে ভাই আমি কিন্তু কোনদিন ক্ষোভ করিনি । এই তো, মাস খানেক আগে তোমার সেজোকাকা গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি । আমার কোন অপরাধ ছিলো না, কিন্তু তবু, ব্যাপারটা না বুঝেই, আমার সব কথা না শুনেই, উনি আমাকে লাধি মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন । কিন্তু আমি জানি, ওঁর ভুল ভাঙবে, উনি আবার আসবেন ।'

'তা বটে । কিন্তু আমরা ঠিক রাস্তার বাচ্ছি কি ? এই রাস্তাই তো ? আপনি চেনেন তো ঠিক ?'

বাইরের দিকে তাকিয়ে মাধবীলতা বুঝবার চেষ্টা করে রাস্তাটা, কিন্তু বেশ বোকা যার কিছুই মাঝুম নেই তার ।

'সরকার বাজার চেনে না গাড়োয়ান, কীর'ম গাড়োয়ান, তবে—সরকার বাজার চেনে না—ব'লেই টেচিয়ে ওঠে মাধবীলতা, 'এই গাড়োয়ান, তুমি সরকারবাজার পচন্তা নেহি ?'

'হাঁ, হাঁ, বিলকুল'—সাদা আসে ওপর থেকে ।

'তবে ? ও তো চেনে'—ব'লেই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মাধবীলতা, বলে চোখ পিট-পিট ক'রে, 'আসলে তুমিই একটি বুড়ু ছায়, একদম আনাড়ী ছায়'—ব'লে মাধবীলতা প্রভাতের খুতনিটা ধ'রে নেড়ে দেয় ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারবাজারের কোন বগলে গাড়ি যাবে তার কিছুই ঠিক ক'রে বলতে পারে না মাধবীলতা । এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত খিচখিচ শুরু ক'রে দেয় গাড়োয়ান । আর প্রভাত তো সপ্তমে চড়ে আছেই । শেষ পর্যন্ত রাস্তার নাম আর বাড়ির ঠিকানা ব'লে ব'লে 'রাস্তার লোকের সাহায্যে ঠিক-গলি এবং ঠিক-বাড়িটি শেষ পর্যন্ত বের করা গেলো ।

পেরাশুলেটরটা নামিয়ে দিয়ে ভাড়া চায় গাড়োয়ান।

মাধবীলতা তখন এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়ছে দরজার। প্রভাত এগিয়ে গিয়ে বললো, ‘গাড়িভাড়ার জন্যে তিনটাকা বারো আনা আছে আমার কাছে, আরো পাঁচসিকে লাগবে।’

‘পাঁচ সিকে ? ঠিক আছে, আমার কাছে নেই, দরজা খুলুক মা তারপর দিচ্ছি’—বলতে বলতে মাধবীলতা কড়াটা নাড়তে থাকে যেন গায়ের সমস্ত শক্তিতে।

কিন্তু কে বলবে এ বাড়িতে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব আছে! মিনিটের পর মিনিট অতিক্রান্ত হ’তে থাকে, কিন্তু না একতলা কি দোতলার বন্ধ জানালাগুলি খুললো, না সদর দরজা খোলার কোন লক্ষণ বোঝা গেলো।

‘এ আর কিছু না, বুঝলে, এ হচ্ছে আমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! নিজের মা হ’লে কি হবে ভাই, আমাকে দু-চক্ষু দেখতে পারে না, আমি হচ্ছি সকলের দু-চক্ষুর বিষ!’

ছিটকে স’রে যায় প্রভাত গাড়োয়ানের কাছে, যে ইতিমধ্যে হাঁকডাক ক’রে সেখানে ছোটখাটো একটি জনতাই সৃষ্টি ক’রে কৈলেছে।

অগত্যা নিজের পকেট থেকে টাকাটা পুরিয়ে ভাড়া মিটিয়ে বিদেয় করে সে গাড়োয়ানকে। আর তারপর নিজেও সটকে পড়বে কিনা ভাবে।

‘ও প্রভাত, এসো, খুলেছে দরজা। এসো বাঃ দাঁড়িয়ে কেন ওখানে ? কী মতলব আঁটছো মনে মনে ?’—এগিয়ে এসে মাধবীলতা একেবারে অড়িয়ে ধরতে যায় প্রভাতকে, প্রভাত স’রে গিয়ে নিষে-ধেকেই এবার এগোয় দরজার দিকে।

পেরাশুলেটরটা নিয়ে ঢোকে প্রভাত ভেতরে। শুনতে পায় কানের কাছে ফুলকাকীয়ার চাপা ফিসফিস কথা, ‘ছিঃ প্রভাত, ফুলকাকীমাকে ঠকানোর মতলব মনে রাখে না। কত সাধ ক’রে মাংস নিয়ে এসাম, না খেয়ে পালাও যদি তো সে-দুঃখ আমার সমস্ত জীবনেও যাবে না ভাই। আচ্ছা দাঁড়াও, উঃ কী অন্ধকার, কতদিন বলেছি মা নিচে একটা বাল্ব লাগাও তা কিপটেমি ক’রে বাড়িটাকে একেবারে প্রেতপুরী ক’রে রেখেছো।’

‘চাবিটা দে না আমাকে, খুলে দিচ্ছি দরজা, তোর যক্ষের ধন আমি খেয়ে ফেলব না। আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবি পরের বাড়ীর ছেলেকে এই অন্ধকারের মধ্যে’—বললেন মাধবীলতার মা।

‘যথেষ্ট মা যথেষ্ট! যথেষ্ট বলেছো!’—বলতে বলতে এতক্ষণে সে খুলতে সমর্থ হয় নিচের একটি ঘরের দরজার তালা। ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলোটা জ্বলে, ডাক দেয় প্রভাতকে, ‘ঢোকাও তো প্রভাত ওটা।’

পেরাশুলেটরটা ভেতরে ঢোকাতো গিয়ে ছোট ঘরখানার অবস্থা দেখে চক্কু চড়কগাছ হয় প্রভাতের। গুদামঘর বললে কম বলা হয়। রাজ্যের জিনিসপত্র এবং কতরকম জিনিসপত্রই যে ছুপ করা ঘরটার মধ্যে একটার ঘাড়ে আরেকটা, দেখে অবাক লাগে প্রভাতের।

‘কী দেখেছো অমন চোখ বড়ো বড়ো ক’রে ? ডাকাতির মতলব, না ? যাও বাপু, বেরোও তো এবারে, আর দেখে না—’

ঘরের দরজার আবার ভালোচাষি পড়লো ।

‘প্রভাত, তোমার কথা অনেক শুনেছি । আজ তোমাকে দেখলাম’—বললেন মাধবীলতার মা, ‘তা পরীক্ষার বাড়িতে যদি এলেই, চলো ওপরে, খেয়েদেয়ে তারপর যাবে ।’

‘হ্যাঁ খেয়েই যাব’—বলে প্রভাত ঢোক গিলে, আর এতক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হরায় তাঁকে একটা প্রণামও সেরে ক্যালে সে, আর তারপর বলে, ‘কিন্তু আমি একটু ঘুরে আসি । কাছেই আমার এক বছর বাসা আছে, সেখান থেকে ঘুরে আসি একটু । এই যাব আর আসব ।’

খপ করে চেপে ধরে মাধবীলতা প্রভাতের একটা হাত, বলে, ‘ফুলকাকীমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু’

অন্ধকারের মধ্যে তাকায় প্রভাত মাধবীলতার দিকে, হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ কথা দিয়ে যাচ্ছি । আমি আশ্বিনটার মধ্যেই আসছি । হ্যাঁ ঠিক আসব’—বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ে প্রভাত বাড়ির বাইরে, হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে পেছনের দিকে একবারও না তাকিয়ে ।

পেছনে তাকানোর সাহস হয় তার গলিটা পেরিয়ে গিয়ে বড়ো-রাস্তায় প’ড়ে । আর একমাত্র তখনই, কিছু ভাববার মত মানসিক অবস্থা আস্ত ক’রতে পারে সে ।

এবং তখন, তার হৃদয় বেন তার মস্তিষ্কে ফরমাশ করে ফুলকাকীমা সম্বন্ধে পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছও ।

সুতরাং, হাঁটতে হাঁটতে, মনটাকে বেশ ক’রে খিতিয়ে নিতে সচেষ্ট হয় সে ।

প্রথমেই মনে ভেসে ওঠে তার তাদের রাজসাহীর বাড়ির চিলেকোঠার একটি দৃশ্য । সে অনেক বছর আগেকার কথা । ফুলকাকীমার বিয়ের মাস পাঁচ-সাত পরেই । সে আর তার দিদি পড়ার নামে গুলতানি করছিলো চিলেকোঠায়, সকালবেলা । তার বয়স তখন কত হবে ? বারো বড়ো জোর আর তার দিদি মণিকার চোদ্দ । এসে উপস্থিত ফুলকাকীমা সেখানে । তার সেদিনকার সেই মুখখানা প্রভাত জীবনে ভুলতে পারবে কি । দাছ ঠাকুরমার হাজার অত্যাচারেও, দুচোখে মুখভাসানো জলের ধারা ব’য়ে গেলেও—যে-মুখে দুঃখের, ব্যথার বিকৃতি কখনোই দেখেনি তারা—সেই মুখে সেদিন কি সর্বনাশা দুঃখের চিহ্নই দেখেছিলো সে । ‘কী হয়েছে ফুলকাকীমা ?’ ‘আমাকে ওরা বা-খুশি তাই বলুন না’—বলেছিলো ফুলকাকীমা, ‘কিন্তু আমার বাবা মা’র সম্বন্ধে মন্দ কথা বললে আমার বড়ো কষ্ট হয় । আর এসব ব’লে ওদেরই বা কী লাভ । আজকে বললেন তোমাদের ঠাকুরমা, আমার নাকি জন্মের ঠিক নেই ।’

মনটা আরো পিছিয়ে যায় প্রভাতের । ফুলকাকীমার বিয়ের দিন পাঁচ-ছয় পরেই । ‘সেজকাকী, প্রভাতটা বলে কী জানো’—বলেছিলো দিদি, ‘সেজকাকীমাকে আমার খুব

ভালো লাগে' ! 'খুব ভালো লাগে ?'—প্রভাতের দু-গাল টিপে ধ'রে বলেছিলো ফুলকাকীমা, 'তোমাকেও ভাই আমার খুব ভালো লাগে । মনে হচ্ছে তুমি আর তোমার দিদিই এখানে আমার সমস্ত দুঃখের সাক্ষীনাশ্বল হবে । তা ভাই, আমাকে তোমরা দুজনে অন্তত সেজকাকীমা না ডেকে ফুলকাকীমা ব'লে ডেকো । কেমন ? ফুল আমি বড্ড ভালোবাসি কিনা ।'

'আমার একটা কথা মনে হয় কি জানিস'—এই সময় মনে পড়ে প্রভাতের তার এক সাহিত্যিক বন্ধুর কথা, 'অন্যায় অবিচার যারা কেবলই সহ করে মুখ বুজে কথাটি না ব'লে, তাদের একমাত্র পরিণাম পাগল হয় ।' উন্মাদাশ্রম থেকে ছাড়া পাবার পরে প্রথম যেদিন দেখা হ'লো তার সঙ্গে ফুলকাকীমার, বলেছিলো সে ফুলকাকীমাকে, 'এইখানে আলাদা বাসা করেছেন এই ভালো হয়েছে । রাজসাহীতে দাদু-ঠাকুরমার সংস্পর্শে আর গিয়ে কাজ নেই আপনার । আই, এ, পড়বেন ব'লে ঠিক করেছেন যখন, ঠিক আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করব 'খন । আর আপনার কবিতার খাতাটা দিন তো, আমার এক কবিরন্ধ আছে তাকে দেখাই দেখি কী বলে ।' 'না ভাই, সে কাউকে দেখাতে আমার বড়ো লজ্জা করে । ও আমার গোপন কথা । নিজের সংগে নিজের কথা ।' কিন্তু পরে কিন্তু ফুলকাকীমা সেই সব কবিতা ছাপানোর জন্তে, ফের পাগল হয়েই উঠেছিলেন যেন একেবারে । কিন্তু সেজকাকা আর সে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে-সবের একটি কবিতাও কোন পত্রিকাতেই ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারেনি । শেষ পর্যন্ত সেজকাকা অবিশ্রি বলেছিলেন, কবিতাগুলো একটি বই ক'রেই ছাপিয়ে দেবেন তিনি । দিয়েছিলেন কি ? সে খবর আর জানে না প্রভাত ।

বি, এ, পরীক্ষার পর কলকাতায় এসে সে ফুলকাকীমাকে নিয়ে সেজকাকার সেই আলাদা বাসায় ছিলো কিছুদিন । আশা ক'রেছিলো সে ফুলকাকীমার সঙ্গে গল্পেগল্পে দিন-গুলো তার মন্দাক্রান্তায় ব'য়ে যাবে । কিন্তু কী দুর্বিষহই হয়েছিলো তার সেই একটা মাস—ভেবে এখনো হৃৎকম্পই লাগে তার ।

ভাবতে ভাবতে এই সময় প্রভাত তার সিদ্ধান্তটা নিয়ে কলে । হিসেব ক'রে দেখে আর মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটলেই সে শেয়ালদায় পৌঁছে যাবে—বাড়ি ফিরবার বাকি পথটাও সে হেঁটেই ফিরবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন ।

'ফুলকাকীমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু'—খট ক'রে লাগে তার মনটায় ।

'পাগলকে আবার কথা দেওয়া !'—তার মনের মধ্যে কে হেসেও ওঠে অমনি ।

নজের বাড়ির দিকে গতিবেগটা আরো কিছু বাড়িয়ে দেয় প্রভাত ।

মাসখানেক পরে আবার একটি দিন ।

সেদিনও প্রভাত আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল—ফুলকাকীমা শুয়ে আছে ঘরের মধ্যে, খালি মেঝের ওপরই, আলুলায়িতকুস্তঙ্গা, বিপ্রস্তুতবসনা, আর তার গা ঘেঁষে ব'সে আছে তার পাঁচ-ছ বছরের মেয়ে ঝরাপাতা । চোখ খোলাই ফুলকাকীমার, তার দিকে চোখ পড়লোও, কিন্তু সে-চোখ যেন দৃষ্টিহীন, নির্বিকার ! যেন দেখতেই পেসেনা তাকে !

‘কী ব্যাপার!’—উমা প্রকাশ করে প্রভাত তার মায়ের কাছে।

‘এই তো ব্যাপার!’—হাত নেড়ে মুখ বাঁকিয়ে বলেন হিরণ্ময়ী, ‘এবার পার্মেনেন্ট হ’য়ে বসলেন ইনি। ও-বাড়ি নাকি নরক আর এ-বাড়ি স্বর্গ! তাই স্বর্গে এসে খুঁটি গেড়ে বসলেন এবার!’

‘তা আর বসবে না কেন—আপন ভালো যে পাগলেও বোঝে! ও কি কম সেরানা’—ঝেঁকে ঝেঁকে বলতে থাকেন সুনন্দনী, ‘গোটা সম্ভারটা জালিয়েপুড়িয়ে ধ্বংস, এখন হৃদিশ পেয়েছো এইটে তোমার স্বপ্ন! ঝাড়ু মারো কপালে। ঘেন্না ঘেন্না! ত্যাগো এখন কী হয়—এ গরার পাপ বিদেহ করতে ভোগ আছে বাছা এই ব’লে দিলাম।’

ঘণ্টা দুই পরে শাস্তিদেব এলেন! তিনি সমস্ত দেখে শুনে ঘরের লোকদেরই ধমক দিলেন, বললেন থাকতে এসেছে থাক না ছুদিন, বেচাল কিছু করবে হয়তো—তার আর কী করা যাবে, হাজার হোক ঘরের বো।

বেরিয়ে যায় প্রভাত বাড়ি থেকে, কোন এক সাক্ষ্য আজ্ঞার।

ফিরে আসে রাত এগারোটায়।

ভাত ঢাকা ছিলো তার। ঢাকা খুলে নিয়ে ব’সে যায় খেতে।

ঘর এদের ছুটো। রান্নাঘর বলতে কিছু নেই। সবাই শুয়ে পড়লে আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না। শুয়েই পড়েছে সবাই। মেঝেতে ঢালাও বিছানা দু-ঘরেই। শুয়ে পড়লেও দু-ঘরেই আলো জ্বলছে এখনো। কেননা ও-ঘরে হিরণ্ময়ী হয়তো পড়ছেন কিছু আর এ-ঘরে তো থাকে প্রভাত।

সকল মাধবীলতার বিছানা হয়েছে ও-ঘরে, হিরণ্ময়ীর পাশে। মাধবীলতারই ইচ্ছে অনুসারে।

যা ভর করছিলো প্রভাত একটু পরে তাই হ’লো। দেখলো ফুলকাকীমা উঠে এসে বসলো তার সামনে।

খালার ওপর ঝুঁকে প’ড়ে ধৈর্যে চলে প্রভাত।

‘আরো দুটি ভাত লাগবে তোমার। ওকি, ওর’ম ক’রে মাছ খোঁটে নাকি। কাঁটা বেছে মাছ ধোঁতে এখনো পর্যন্ত শেখোনি! বিয়ে হ’লে স্বশ্রুতবাড়ি গিয়ে দেখছি তুমি একটা কাণ্ডই করবে। দেব আমি কাঁটা বেছে?’

ইচ্ছে হয় প্রভাতের ভাতের খালা ফেলে উঠে যায়। কিন্তু অতটা করা বোধ হয় উচিত হবে না ভেবে মুখ গোঁজ ক’রে মাথা নাড়ে সে, মাছটা চটপট সেরে ক্যালে। গোত্রাসে কোনরকমে খাওয়াটা শেষ ক’রে ছিটকে বেরিয়ে যায় সে আঁচাতে, ফিরে এসে দেখে ফুলকাকীমা ততক্ষণে তার এঁটো বাসন নিকিয়ে ফেলেছে, এঁটো বাসনকোসন নিয়ে বেরিয়ে যায় সে বারান্দায়।

এই দৃশ্যটায় একটা মোচড় লাগে প্রভাতের মনের মধ্যে। এক মুহূর্ত বুকি-বা ভাবে, মোলারেম-কিছু বলা যায় কিনা ফুলকাকীমাকে শুয়ে পড়বার আগে। কিন্তু কী বলবে কী করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না সে, একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়ে।

মিনিট দশেক পরে যেই দেখলো কুলকাকীমা চুকছে ধরে শুকতকে বাসনগুলো নিয়ে, অমনি প্রভাত বই ফেলে দিলে ঘুমের ভান করলো। মিনিট দুস্তিন পরে শুনলো বলছে কুলকাকীমা গলা তুলে, 'দিদি, এরা তো এ-ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আলোটা নিবিয়ে দেব ?'

'দাও। ওদিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছো তো'—হিরণ্ময়ী বললেন।

'দ্বিচ্ছি'—ব'লে মাধবীলতা বন্ধ করে দরজা, সুইচ টিপে আলোটা দেয় নিভিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়ে প্রভাত একসময়।

কিন্তু তখন মধ্যরাত—হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তার। শুনে পায় কুলকাকীমার কান্না! আলোটাও জ্বলছে ও-ঘরে। একটু পরেই শুনলো সে বাবা ধমকে উঠলেন কুলকাকীমাকে, ধমকে উঠলেন ঠাকুমা, ধমকে উঠলেন না। কিন্তু কুলকাকীমার সেই বুক-খালি-করা কান্না সমানে চললো। কী তার কারণ বোঝার কিছুমাত্র আগ্রহ হয় না প্রভাতের, কেননা এরকম উপদ্রব যে হবেই মাঝরাতিরে, সেটা তো তার জানাই ছিলো।

বালিশে এক কান আর হাতের তেলোর আরেক কান চেপে ধ'রে প্রাণপণ চেঁচা করে প্রভাত ফের ঘুমিয়ে পড়তে, কিন্তু সেই চেঁচা শুধু আরো বেশি ক'রে জ্বালা ধরিয়ে দেয় তার চোখে, কানে, মাথার মধ্যে, সমস্ত শিরা-উপশিরায়। একটি অগ্নিপিশু পরিণত হ'য়ে সে উঠে বসে।

'উঃ উঃ ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, ও মাগো, আমি কি মানুষ না, ও মা'—আর্ডনাট্টা শুনে বেশ বোঝে প্রভাত এ-ঘর থেকেই—ঠাকুমা নিশ্চয়ই চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকান্ধেন কুলকাকীমাকে।

'ওকি মা, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও'—কঠোর ধমক শুনলো বাবার।

'কল্লার ষাড় বোজায় ভাঙে!'—শুনলো ঠাকুমার খলা, 'ফের কোসকোসানি! ফের কোসকোসানি! চুপ চুপ মাগী, খোতা মুখ ধোঁতলে ভোঁতা ক'রে দেব একেবারে হামানদিস্তে দিয়ে।'।

'যথেষ্ট হয়েছে'—এবার মার গলা, 'এবার শুয়ে পড়ো তো। নাও শুয়ে পড়ো—আলো নেবাব।'।

'আপনার ছুটি পারে পড়ি দিদি, আলো নেবাবেন না। আলো নেবালে আমার বড়ো ভয় করে। মনে হয় কালো কালো ছায়ারা সব আমার চারদিকে ভিড় করছে, কঙ্কালের মত সব হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমার গলা মুখ চেপে ধরছে, আর আমার করাপাতাকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ধাবার জন্তে ওরা যেন ফিসফিস ক'রে কী সব বলাবলি করে। আলোটা জ্বালানো থাক, আপনার ছুটি পারে পড়ি দিদি।'।

কিন্তু এইসময় খুট ক'রে আলোটা নিভে যায়—জ্বাখে প্রভাত।

আর সংগসংগে সব চুপ।

কিন্তু সে মিনিট কয়েক মাত্র। ফের জ্বলে ওঠে আলোটা। ফের শুরু হয় গোলমাল। কিছুক্ষণ খিটিখিটি চোঁচাখিচির পর আবার নেভে আলো। আবার জ্বলে। আবার নেভে।

আবার জলে। এমনি ক'রে বারকয়েক। এমনি ক'রে দেয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে তিনটে বাজতে শুনলো প্রভাত।

শেষবার আলো নিভবার আগে দেখলো প্রভাত, ফুলকাকীমার লম্বা চুলের গোছা ধ'রে টানতে টানতে ঠাকুমা তাকে দরজার কাছে নিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই নেই ফুলকাকীমার, শাওড়ীর দয়ার উপর যেন নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে সে। দুহুটা দেখেই চোখ ফিরিয়ে প্রভাত ফিরে আসে নিজের বিছানায় আর শুনতে পায় :

‘বাইরে বের করে দিয়ে কী সুবিধেটা হ'লো ? চেষ্টা করে বাড়ি মাথায় ক'রলে ইজ্জৎটা কি বাড়বে !’—বাবা।

‘আবে থাক না ছদ্ম বাইরে। দেখচিস না, বাইরে বের ক'রে দিয়েছি আর টু শব্দটি করছে না ! কুকুরের লেজ ঘি দিলে সোজা হয় না, বুঝলি, কুকুরকে চাই যুগুর’—ঠাকুমা।

‘বস্তিরও অধম হ'লো !’—মা।

প্রভাত বেশ বুঝতে পারে ঘরের মধ্যে আরো কেউ কেউ জেগে আছে। অন্ধকারের মধ্যে তাদের বিরক্তিসূচক নড়াচড়া, অর্ধোচ্চারিত অব্যয় আর ও-ঘরের কথাবার্তা—সব মিলিয়ে তার মনের মধ্যে সংসারতত্ত্বসম্বোধি উথালপাথাল হ'য়ে ওঠে। দার্শনিক সত্যায় সে নতুন ক'রে একটা চেষ্টা পায় ঘুমের।

কিন্তু হায় রে ঘুম !

‘আলোটা নিবিয়ে দেব রে শাস্তি ?’—ঠাকুমা।

‘কী পাগলের মত করছো ! আলো নেবাবে কি। ওদিকে ও সাড়াশব্দ করছে না, ওর কী হ'লো একবার দ্যাখো’—বাবা।

‘দেখতে হয় নিজেই দেখুক না ! সব বিষয়েই আলাগা-আলাগা ধাকাটাই আসলে বুদ্ধিমানের !’—মা।

‘একটা ধাবড়া দিলে তবে ঠিক হয়। ইডিয়ট কোথাকারে !’ বাবা।

এর পরবর্তী শব্দপ্রণালী থেকে অনুভব হয় প্রভাতের, বাবা দরজাটা খুললেন, গেলেন বাইরে,—‘কোথায় ও ? কোথায় মাধবী ? আরে মাধবী গেলো কোথায় ?’—বাবার চেষ্টামেচি শুনে তখন ছুটে যেতে হয় প্রভাতকে বাইরে। আরো কেউ কেউ আসে ছুটে। পাশের ঘরগুলির লোকেরাও ক্রমশ বেরিয়ে আসে। কিন্তু সারা তিনতলার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না মাধবীলতাকে। সারা বাড়িটাই খোঁজা হ'লো—কিন্তু না, কোথাও কোন চিহ্ন নেই মাধবীলতার।

‘তারপর ? এখন তোমরা সবাই মিলে একটা একটা ক'রে চুল উপড়ে ফ্যালো আমার মাথায়। ওঃ’—দাঁতে দাঁতে ধ'ষে অস্থির উন্মাদ গলায় বলেন শাস্তিদেব।

‘কী দেখচিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে’—বলেন শাস্তিদেব প্রভাতকে, ‘পুলিশের হাতকড়া পড়বার আগে যা ছুটে রাস্তায়, দ্বাধ পাস নাকি কোথাও। ট্রামের তলায় না বাসের তলায়

মাথা দিয়েছে দেখে। পারিস তো উদ্ধার ক'রে নিয়ে আস, আর নয় তো বা জাহান্নামে। ওঃ, মানসম্মান ইচ্ছা সব আমার গোলায় গেলো এদের হাতে প'ড়ে। আর দেখচিস কী হাঁ ক'রে, দে জামাটা দে, দেখি শেষ চেষ্টা ক'রে নয়তো তোরাও গেলি আমিও গেলাম—হা !, ব'লতে ব'লতে শাস্তিদেব পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে পাগলের মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

প্রভাতও ছোটো তাঁর পেছন-পেছন শাটটা টেনে নিয়ে।

রাস্তায় নেমে শাস্তিদেব নিজে যান কলেজ স্কয়ারের দিকে, প্রভাতকে পাঠান চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর দিকে।

ভোর হ'য়ে এসেছে তখন। তাড়াতাড়িতে প্রভাত চশমাটা ফেলে এসেছে। একবার ভাবলে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি চশমাটা, কিন্তু দেখা গেল, তার বদলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর দিকেই ছুটেছে সে তখন। অথচ দূরের জিনিসই ভালো দেখতে পায় না সে! চশমার পাওয়ার তার মাইনাস তিন।

আরে ঐ তো ফুলকাকীমা! দেখতে পায় প্রভাত রিক্সা ক'রে চলেছে সে কিন্তু পাশে ঐ পুরুষটি কে? ছুটে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে যায় রিক্সাটার সামনে। রিক্সাওলা সমরমত সামলে নেবার কলে কোন দুর্ঘটনা অবিশ্রি ঘটে না, কিন্তু লজ্জা পায় প্রভাত যখন ডাখে সে রিক্সার ভদ্রমহিলা তার ফুলকাকীমা নয়।

‘পাগলা ছায়’—ব'লে রিক্সাওলা প্রভাতকে পাশ কাটিয়ে দৌড় দেয় রিক্সা নিয়ে।

এরপর একটু সতর্ক হয় প্রভাত। হনহন হাঁটতে থাকে চারিদিক দেখতে দেখতে। খানিকটা পরে লক্ষ্য পড়ে তার আর একটি নারীমূর্তির দিকে। গতিবেগ বেড়ে যায় তার। কিন্তু হঠাৎ এক কলার-খোসায় পা পড়তেই তার পা হড়কে যায়, কাত হ'য়ে পড়ে যায় সে রাস্তার ওপর। আর তাই দেখে কুটপাথে-শোয়া এক পাগলী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে—স্পষ্টই চোখে পড়ে প্রভাতের।

কিন্তু ক্রম্পেপ করে না সে। প্রায় ছুটেই সে তখন কাছাকাছি হয় সন্দেহভাজন সেই নারীমূর্তিটির। কিন্তু বৃথা।

এমনি ক'রে রাস্তায় রাস্তায় বহুক্ষণ পর্যন্ত বৃথাই সে হয়রান হয়।

শেষ পর্যন্ত গোটা সাতেক যখন বাজে, ফিরে আসে সে বাসায়।

তখন আরো কেউ কেউ হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছে যারা গিয়েছিলো খুঁজতে। আটটা নাগাদ এক শাস্তিদেব ছাড়া আর সবাইই ফিরে এলো।

শাস্তিদেব যখন টলতে টলতে এলেন ফিরে তখন গোটা সাড়ে আটেক বাজে। এসেই তিনি এলিয়ে পড়েন আরামকেদারার। কিন্তু তার আগে বলেন, ‘পেয়েছি দেখা, কলেজ স্কয়ারে বড়িটার কাছে এক বেকিতে ব'সে আছে ডাখগে যা। যা ছুটে যা কেউ কেউ। যা দেবি করলে আবার কোথায় চ'লে যায় কে জানে’—ব'লতেই প্রভাতের ছোটকাকা আর বড়োকাকা ছুটে চলে যান।

আর তখন এক গ্রাম জল খেয়ে নিয়ে শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে যা বলতে থাকেন শাস্তিদেব সবিস্তারে তাঁর চারপাশের রুদ্ধশ্বাস মানুষগুলির কাছে (ঝরাপাতাকে তখন হিরণ্যরী একবাটি মুড়িতে ভুলিয়ে রেখেছেন পাশেই), তার সার মর্ম হচ্ছে এই :

অনেক ধোঁজাখুজির পর তিনি শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে গিয়ে বসেছিলেন কলেজ স্কোয়ারের এক বেঞ্চিতে। হঠাৎ আশ্চর্য হ'য়ে দেখতে পান তাঁর পাশের বেঞ্চিতেই ব'সে আছে মাধবী চুপচাপ। তিনি তখন লাক্ষিয়ে উঠে গেলেন তার কাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মাধবী একবার একটু চমকে উঠে তাকালো তাঁর দিকে, কিন্তু তারপরে চোখ ফিরিয়ে সে আকাশের দিকে মুখ ক'রে বসেই রইলো নির্বিকার ভঙ্গিতে। যেন চেনেই না সে তাঁকে, যেন জীবনে কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত। কিন্তু শাস্তিদেব যখন উঠবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন তাকে, সে বারকয়েক যেন অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বললে, কেন বিরক্ত করছেন আমাকে, কে আপনি, স'রে যান এখান থেকে। অবাক হ'য়ে, শেষ পর্যন্ত কোন উপায়ান্তর না দেখে, শাস্তিদেব তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে আসবার জন্যে তার হাত ধ'রে টানাটানি করতে থাকেন। আর তখন কলেজদারী শুরু ক'রে দেয় মাধবী—চিৎকার ক'রে ওঠে সে, চিৎকার ক'রে ক'রে তাদের চারপাশে মেলা লোক জমিয়ে ফ্যালে। আর সেই এক হাট লোকের সামনে ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে বলতে থাকে সে, সে নাকি কলেজ-স্কোয়ারে হাওয়া খেতে এসেছে আর এই কোথাকার-কে উটকো বুড়ো লোকটা এসে তাকে নানারকম ক'রে ফুসলছে, বলছে তার সংগে পালিয়ে যেতে। এরকম অভিযোগের পর জনতা মারমুখী হ'য়ে ওঠে শাস্তিদেবের ওপর। তিনি স্বত তাদের বোঝাতে চান আসল ব্যাপারটা ততই তারা আরো ক্রোধে উঠে যা-তা-সব বলতে থাকে, হু-একজন হু একটা ধাকাটাকাও তাঁকে মারে। এমনি সময় কপালক্রমে সেই ভিড়ের মধ্যে এসে উদয় হয় তাঁর একটি ছাত্র, ছেলোট খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অনেক কষ্টে সে সেই মারমুখী জনতাকে বুঝিয়ে উঠতে পারে যে ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং আদর্শবান চরিত্রের একে শিক্কক সমাজে উনি একজন অত্যন্ত মাননীয় বরেণ্য ব্যক্তি। যাই হোক, মাধবীকে নিয়ে আসা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব বুঝে শাস্তিদেব তখন সেই জনতাকেই তাকে কিছু ক্ষণের জন্যে আটকে রাখতে অনুরোধ জানিয়ে চ'লে এসেছেন।

বর্ণনা চলছে এমনি সময় ফিরে আসেন অনন্তদেব, প্রভাতের বড়োকাক, একা।

তাঁর মুখে ফের জানা গেলো, তাঁরা গিয়ে দেখতে পাননি মাধবীকে, তবে দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলো তারা বলেছে সেই মেয়েলোকটি কারো বাধা না মেনে ঐ রাস্তার দিকে চ'লে গেছে। সোমদেবকে সেই রাস্তায় ফের খুঁজতে পাঠিয়ে অনন্তদেব ফিরে এসেছেন।

তারপর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং অবশেষে বছরও ঘুরে গেছে—কিন্তু মাধবীলতাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খোঁজা হয়েছে কিন্তু তাকে কম না। কাশীর দশাশ্রমেঘ বাটে তাকে ভিক্ষে করতে দেখা গেছে ধবর পেয়ে অমনি লোক ছুটেছে সেইধেনে, কলকাতার অমুক গলির অমুক বাড়ির ছাতে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে—অমনি খুঁজে দেখে আসা হয়েছে সেই বাড়ি, আর এমনকি পুলিশ হেপাজতের অসনাক্ত লাসগুলির মধ্যেও মাধবীসতাকে আঁতিপাতি ক’রে খোঁজার ব্যাপারে একটুও ক্রটি রাখেনি ওর আত্মীয়স্বজনরা।

খুঁজেছে প্রভাতও কম না। নিজের মনের মধ্যে, মনের সুবিস্তীর্ণ সীমাহীন মণ্ডলের মধ্যে, অনেক খুঁজেছে সে তাকে, কিন্তু কোথায়—হুলকাকীমার কোন চিহ্নমাত্র সে খুঁজে পায়নি কোথাও।

যশোদা

আশীষ বর্মণ

বাত গেছে প্রায় অনিচ্ছায়। ওয়াড়হীন পুরোনো বালিশটা ভিজেছে ঘামে, গন্ধ লেগেছে নাকে বাসি, বোটকা। খুতনির তলায় গলাটুকু চটচটে হয়ে উঠেছে বারবার, তারপর টের পেয়েছে ঘাম গড়াচ্ছে চুপে চুপে পিছন দিকে, বাড় থেকে বালিশে। ছ'একবার পট্ করে ও উপুড় হয়ে খুতনির তলাটুকু মুখ উঁচু করে বালিশে মুছেছে। তারপর আবার বালিশ রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছে। তাকিয়ে থেকেছে অন্ধকারে। প্রথমটা একটু ভালো লেগেছে, গলা চটচট করেছে কম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কের গরম-গরম অনুভূতি হয়েছে গলার স্বপ্ন রেখাগুলোয়, বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন ভর্তি হয়ে গেছে।

পিঠের তলায় ফুটিকাটা সতরঞ্চির ওপর পেতেছিল ছোঁড়া, ময়লা খুতির টুকরো। এদিকটা বেশি ভিজে গেলে ওদিকটা উন্টে পেতে নিয়েছিল একবার। ছ'দিকই পরে সমান ভিজে গেছিল। পাতা ঝাকড়া তুলেই গামছার মত মাঝে মাঝে পিঠটা সে মুছে নিচ্ছিল। তারপর পেতে শুচ্ছিল কের। পাশের ঘুমন্ত ছোট বোন থেকে থেকে বেকে গিয়ে ওর ঘাড়ে পা তুলছিল, কিংবা, একটা হাত এসে পড়ছিল গলায় বুকে। সমস্ত শরীর তখন নরেনের অস্থির অস্থির হয়ে আসছিল, দেহটা যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছিল ভীষণভাবে। ভাড়াভাড়ি ও বোনের হাত পা সরিয়ে দিচ্ছিল গায়ের ওপর থেকে।

জল ধোয়েছিল উঠে একবার। ঘরের কোণের কুঁজোর কাছে অন্ধকারে যেতে গিয়ে কার পা মাড়িয়েছিল। ঘুমের বোরে সেজপিসী নড়ে উঠেছিল, বলেছিল—হঁঃ...

নরেন চকিতে পা সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু জমে দাঁড়িয়ে ছিল ঠায় একজায়গায়, অন্ধকারে প্রায় দম বন্ধ করে। পিসী একটু উঁ-আঁ করে পাশ ফিরে আবার স্থির হবার পরও সে কয়েক নিমিষ নিখর রইল। শেষে যখন আর কোনো সাড়া পেল না, অস্ত্র কেউও উঠল না, ঘর শুক থাকল—শুধু শোনা গেল অনেকগুলি নিশ্বাসের ওঠা-পড়া—তখন ও চোখসইয়ে দেখার চেষ্টা করল ঘরভর্তি ঘুমন্ত লোকের কার কোথায় হাত পা রয়েছে ছড়িয়ে। দেখতে পেল না কিছুই, কিন্তু অভ্যাসের অনুমানে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল পা পা। জানালার তলায় কুঁজোর সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসল। অন্ধকারে, খুব সতর্ক নৈঃশব্দ্যে হাত বাড়িয়ে অনুভব করল জায়গাটা। আলতোভাবে হাতে ঈষৎ ঠাণ্ডা লাগতেই ও ভালোভাবে ধরল কুঁজোর গলাটা। তারপর বুঁকে, বড় বড় চোখে আর অনুমানে, ঢাকা গেলাস তুলে জল গড়াবার চেষ্টা করল। অতিসাবধানেই কুঁজো কাৎ করেছিল গেলাস মুখে ধরে; কিন্তু হঠাৎ বকুবকু করে উঠল জলের চাপ শব্দহীন শূন্যে। সমস্ত ঘর যেন ধড়ফড়িয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে

কঁজোটা ও তুলে ধরে সোজা ; সমুচিত, অনড় হয়ে বসে থাকে একহাতে গেলাস ও অঙ্গহাত কঁজোর মুখে রেখে । কিছুই না, কোনোরকম আওয়াজই নয়, তবু সূচাগ্র মুহূর্তটিতে মনে হল কেউ যেন ডেকে উঠল—কে, কে ওখানে ?

ধরে শুধু নিশ্বাসের অস্ফুট ওঠা-পড়ার অনুভব, যেন গায়ের পাশ দিয়ে ঘোরে আবছা আড়ালে । অশ্রুকোনো শব্দ নেই, ফিসফাস নেই, হঠাৎ হঠাৎ শুধু আরশোঙ্গার কিপ্র দৌড়ের খসখসানি নৈঃশব্দ্যটুকুকে আরো সঘন করে তোলে । নরেনের টানটান ভীক্স অনুভূতি ও গোটানো শরীর নিউরোয় । গায়ে বুটি বুটি অঙ্গুর কঁটা ওঠে ।

গেলাসে যেটুকু জল পড়েছিল সেটুকু সে মুখে ঢালে । চট করে কিন্তু ঢোক গিলতে পারে না ; আচমকা ভয় হয় গিলে নামার সময় পেটে আওয়াজ হবে, কলকলিয়ে উঠবে জল-স্রোত ভিতরে ! কঁজোর গেলাস ঢাকা দিয়ে নরেন উঠে দাঁড়ায় । জানালায় বাইরে মুখ বের করে জলটুকু গিলে নেয় ।

বাইরেটা একটু ঠাণ্ডা, মুহূ হাওয়া যেন হাত বুলিয়ে যায় মুখের ওপর । গলির মাথার গ্যাসবাতিটা বুকলে চোখে পড়ে । গলিটা কঁকা, শুক ; অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে । কেউ হেঁটে গেলে তাকে দেখা যাবে না শুধু বাজবে জুতোর শব্দ ছ'পাশের চাপা দেয়ালে লেগে, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে টুকরো আওয়াজগুলো অতিকার হয়ে আসবে কানে । গ্যাসবাতির নিচে পৌঁছলে একমুহূর্ত চোখে পড়বে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি । তারপর থাকবে কেবল বাতিটা শূণ্য আধারে, বৃষ্টিতে ঝাপসা সন্ধ্যার ক্ষীণ আভার মত ।

নরেনের মন বেদনার আঁট হয়ে আসে । এতক্ষণ যা সুপ্ত ছিল একান্তে এখন তা কেমন চেপে ধরে ভিতরে ভিতরে । ইচ্ছে যায় চলে যেতে এসব ফেলে চুপে চুপে নেমে নিচে । গলিটুকু হেঁটে, গ্যাসবাতি পেরিয়ে অদৃশ্য অন্ধকারে মেলাতে । কেউ কি থাকবে তখন পিছনে এই জানালায় নিঃশব্দে মুহূর্তটুকু সত্যায় মেখে ইন্দ্রিয়বেদনে গম্ভীর ? সবাই ঘুমবে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়, নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়বে সমতালে নীরব বিশ্রামে । বোনটা বঁকে তার কঁকা বিছানার অর্ধেকটা জুড়বে, অর্ধেকটা থাকবে নিজের জায়গায় । পিসী ঘুমবে সোজা চিৎ হয়ে হাতের ভাঁজে চোখ ঢেকে । আর মা একটু কঁকড়ে—যেন পৃথিবী থেকে ওটিয়ে নিজের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টায়, শাস্ত, ঘুমের ঘোরেও স্নান বিষাদাচ্ছন্ন । সব সময়েই মা স্নান, ক্লিষ্ট । মুখ যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে মার জীবনে ।

হঠাৎ গম্ভীর মমতায় নরেনের অন্তর ভরে যায় । একটু ফিরে তাকায় ভিতরে, চোখে পড়ে অদৃশ্যপ্রায় কয়েকটি নক্সা, আচমকা মনে হয় না যানুয । এই শুক, সুপ্ত অন্ধকারে ভিতরের ঘুমন্ত ছায়ামূর্তি লাগে সম্পূর্ণ অসহায় । নরেন তাকিয়ে থাকতে পারে না । চোখ ফিরিয়ে আকাশের পানে চায় । হাওয়া এসে লাগে মুখে । কাদের ছাদের গদাগুলোর ট্যাঙ্ক ভরে জল পড়ে অশ্রান্ত ছরছর স্বরে । ভোর হতে এখনো অনেক দেরী । কালো, নব্র আকাশে ছড়ানো সাদা ফুল ।

জানালা থেকে ফেরে ও । ঘরের ভিতরের ঘুমন্ত লোকগুলোর হাত-পা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে

সস্তর্পণে নিজের জায়গায় আসে। খুব আন্তে আন্তে শোয়, একটুও যাতে শব্দ না হয়। কিন্তু আচমকা হাঁটুর হাড় কোটে সজোরে, ঘর ভরে যায় আওয়াজে। একটু অপ্রস্তুত লাগে নিজের, তাড়াতাড়ি ওয়ে পড়ে সে একপাশে কাৎ হয়ে। মনে মনে নরেন কিন্তু কথাটি বলে না, নড়ে না। মা কপালের তাপ পরীক্ষা করে হাত সরিয়ে নেন। চূপচাপ কাটে কিছুক্ষণ। নরেনের মন কেমন আগোছালো হয়ে যায়। স্তব্ধ অন্ধকারে সে তাকিয়ে থাকে। মা বলেন, খুব যুহুস্বরে একান্তে—কিরে, ঘুম আসছে না?

হঠাৎ যেন সব গুলিয়ে যায় নরেনের, কিছু বলতে পারে না তখুনি। একটু চূপ করে থেকে শেষে শুধু বলে—না।

—জ্বর-টর হয়নি তো?

—না মা।

তারপর ফের চূপচাপ। শুধু হৃৎকনের নিশ্বাসের শব্দটুকু শোনে স্পষ্ট। নড়েও না কেউ। এই অটুট নৈঃশব্দ্যও সত্যায় ভীষণভাবে বাজে। মনে হয় শব্দের থেকেও সব পরিবেশ। খুব নিচু স্বরে, শোনা যায় না এমন গলায়, নরেন ডাকে—মা।

—হঁ?

—চাকরীটা আমার হয়নি।

মা কিছু বলেন না। নরেনের মাথাটা দপদপ করে, গলা কাঁপে একটু। কপালের সীমানার চুলের গোড়া ঘামে ভিজে ওঠে।

আবার সে কথা বলে, গলার স্বর মোটা, অসমান শোনায়—বিকেলের বলতে পারিনি, ওরা সব...

কথা শেষ হয় না, গলা বুজে আসে। বিকৃত, কর্কশ লাগে নিজের স্বর নিজেরই কাছে।

মা শুধু ওর হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখেন, বলেন তেমনি যুহুস্বরে, ধীরে, —এখন ঘুমো...কথা নয়।

হঠাৎ নিজেকে দুর্বল লাগে নরেনের। অত্যন্ত শ্রান্ত। অবসরের মত নিশ্চুপ শুয়ে থাকে। মাও কিছু বলেন না। পিসী বোধ হয় পাশ ফেরেন, শব্দ হয় ওদিকে। ছোটবোন মাথাটা ঘুঁজরে আসে ওর বাড়ের কাছে। মনের উত্তেজনা, মিশ্র বেগাঙ্ক আবেগ মন্থর হয়ে আসে। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে ক্রমে। প্রথমটা ভাবে মা হয়তো কিছু বলবেন। অপেক্ষায় থাকে। কিছুই বলেন না উনি। এমন কি বোঝা যায় না মা জেগে না ঘুমিয়ে। যেমন ছিলেন তেমনি নিথর পড়ে থাকেন। একটি হাতও সরে না। গোড়ায় নরেনও ছিল নিশ্চল। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত আন্তে সে মাকে একটু দেখার চেষ্টা করল। অনড়, অস্পষ্ট শরীরটা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে শূন্যদৃষ্টিতে আলোহীন উপর দিকটার। চোখের সামনের নিরেট অন্ধকারে দৃষ্টি টাটিয়ে ওঠে। তখন সে ক্রান্ত চোখ দুটো বুজল।

বেলা হয়ে গেছে কখন টের পারিনি। অন্তরদিন খুব ভোরে একবার ঘুম ভাঙে আজ সে মড়ার মত ঘুমিয়েছে। ঘুম ভাঙল অনেকক্ষণ ধরে কি যেন শুনতে শুনতে, হঠাৎ। চোখ মেলে দেখল পিসী ঘরের কোণের ভাঁড়ারের সামনে বসে জিনিসপত্র নাড়ছে আর বক্বক্ব করছে একটানা; লবাব! ঘুম ভাঙবে দশটায়...তা'পর বিছানা তোলো সাফসুফ করো চা দাও। উনি গিলে বেরবেন রাজ্য দেখতে; ফিরেই ভাতটি চাই, ঘুমটি চাই, আয়েস চাই...মরণ! পুরুষ মানুষ, কাজ কস্মো নেই শুধু বসে বসে বাবুগিরি। ঘুম! অমন ঘুমের মুখে আঙুন...লজ্জাও নেই কি গো...এ'য়া? মানুষের ঘেন্না পিস্তি তো থাকে...হাজার হোক বুড়োখাড়ি ছেলে তুই, বাড়ির বড়। চেষ্টা চরিত্তির কর, লেগে থাক, হাট-বাট চষে ফ্যাল, তা না, ঘুম; পড়ে পড়ে নাক ডাকা...কপাল আমার।'

পিসীর বকবকরের মধ্যেই রান্নার জায়গা থেকে মার ডাক আসে—

—সেজদি, অ সেজদি।

পিসী হঠাৎ চুপ করে যান। কোনো জবাব দেন না, হাতের কাজও বন্ধ করেন এক নিমেষ। তারপর মাটিতে খেবড়ে বসেন ভালোভাবে, দেখে মনে হয় আর উঠবেন না কিছুতেই।

—সেজদি, অ সেজদি কৈ গেলে....ছাখো না একটু। মা আবার ডাকেন।

পিসী অকস্মাৎ সশব্দে, ঠুকে, সিগারেটের খালি কৌটোটা রাখেন তাকে। গলা নামিয়ে, দাঁতে দাঁত পিষে বলেন—আদিখ্যেতা!

—গ্যালো-গ্যালো, পুড়ে মোলো মেয়েটা...কী' জালা! মার গলা হঠাৎ উচ্চ হয়ে উঠল খুব। সন্ধে সন্ধে পিসী উঠে পড়েন। হস্তদস্ত হয়ে ডাকলেন—এ'য়াই খুকী, খুকী... কি হল কি, এ'য়াই খুকী।

উনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। একটু হাসি পেল নরেনের, এই এক দুর্বলতা পিসীর। খুকী—ছোটো বোন—রয়েছে ওঁর সর্বস্ব জুড়ে, খুকীকে মারতে পারবে না, বকতে পারবে না, চটাতে পারবে না, খুকীর কিছু হলেই পিসী যায় যায়। খুকী দীর্ঘ টাক ছেড়ে কান্না ধরলেই পিসী পড়ি কি মরি হয়ে হাজির হবে।

নরেন উঠে বসে বিছানায়। ফাঁকা, সংজ্ঞাহীন মাথায় অপলক দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকে ক্ষণকাল। কোনো চিন্তা নেই, দৃষ্টি বোধহীন, শূন্য। হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে সে শুয়ে পড়ে আবার। পিসীর গলা শুনতে পায় :

‘চল, নিচে দিগে আসি তোকে...কেবল জালাবি, এ'য়া? এক আঙুল মেয়ে তবু শরতানি তো কম নয়...কোথায়, কোথায় দেখা তো তোর মত আর একটা আছে কি না আশেপাশে। যেমন চেহারা ভেমুনি স্বভাব...আহা-হা, আবার মুখ ভাঙায়! কী রূপইরে...শাকচূনি...তাড়কা। মেথর, ঝাড়ুদার মেথর জুটবে তোমার কপালে, দেখো, বলে দিলুম।

...এসো, তখন এসো পিসীর কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে, নাকি কান্না কাঁদতে...আবার! দেবো ছ' বা'।

ওরা সিঁড়ী দিয়ে নেবে যাওয়ার পরও নরেন শুয়ে রইল। শুধু পিসীর গলার স্বর ক্রমাগত দূরে সরে গেলে বন্ধ চোখ দুটো ও খুলল আবার। উঠতে ইচ্ছে করে না বিন্দুমাত্র। মন আর শরীর দুই ভাঙা। কি করে উঠে? ভেবেই পায় না কি করবে কি করতে পারে। যে আশায় চার পাঁচ মাস ঘুরেছে সমানে দিবারাত্রি তাও মিটল কাল, খবর পেয়েছে অন্য লোক নিয়েছে ওরা। অথচ তাকে কি ঘোরানই ঘোরালে, প্রায় কথাও দিলে, যখন মনে হল হয়ে এসেছে ব্যাপারটা, কাজ পেল বলে, তখনই সব ডুবে গেল। ভাল লাগে না ভাবতে। শুক, বিশ্বাস ঠোঁটে একটু জ্বিল বোলায় ও। সারা দিনরাত ঘুমুতে পারলে বেশ হত। নিশ্চিন্ত!

মা বারান্দা দিয়ে কলতলায় যেতে যেতে একবার ঘরের পাশে তাকান। নরেনও সোজা চেয়েছিল বাইরে, হঠাৎ দুজনের চোখাচুখি হয়ে যায়। কেমন ঝাপটা লাগে মনে আচমকা। মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে ওঠে নরেনের। মা তখন চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন, চলে গেছিলেন আপন কাজে। কিন্তু নরেনের অন্তরে যেন কঁকড়ে যায় মুহূর্তেই। গভীর ও পীড়াদায়ক সঙ্কোচ আচ্ছন্ন করে ভিতরে ভিতরে। লজ্জা হয়, অবুধ যুক্তিহীন ব্রীড়া। মন শক্ত করার চেষ্টা করে নরেন, ঝেড়ে ফেলতে চায় ব্রীড়াটুকু। উঠে বসে সে। শেষ দাঁড়িয়ে বেছানো ছেঁড়া শ্রাকড়টা কাঁধে নেয় এবং সতরঞ্চিটা ছ' হাতে তুলে পাট করে রাখে কোণায়। মা কলতলা থেকে ফিরে যান রান্না ঘরে পদশব্দে টের পায় সে, তাকান না, পিছন ফিরে সতরঞ্চিটা রাখতে ব্যস্ত থাকে। পায়ের শব্দটা মিলিয়ে গেলে মন তার কেমন তিক্ত হয়ে ওঠে, অকস্মাৎ একটা তীব্র রাগের চোট আসে মাথায়। ছ' চোখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে, কান গরম।

ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে পায়খানার নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেয় নরেন। ভাবনা তখন তার অন্ধ, বোবা ঘুরপাকে মরে। রাগ যায় মিলিয়ে ক্রমশ, ধীরে ধীরে, দ্বিধা থাকে অন্তর্লীন, আর ব্যর্থতা। নিষ্ফল, রিক্ত, আশাহীন লাগে ভীষণ। বেরিয়ে মুখ ধোয় কলতলায়, ঝেড়ে জল দেয় বেশি করে, মাথা ভিজিয়ে নেয়। জল মুখে গামছা টাঙানো দড়ির সামনে আসে, চোখে পড়ে মা দেখছেন, উলুনে চায়ের জল। মুখ মুছে গামছা রেখে যখন শোবার ঘরের দিকে আসে তখন মা অন্য দিকে ফিরে কাজে ব্যস্ত। নরেন মা ফিরে তাকানোর আগেই টুক করে ঘরে ঢোকে, কাপড়টা সামলে পরে নেয়, তারপর পেরেক খোলানো সার্টটা গায়ে চড়ায়। সন্তর্পণে আসে বারান্দায়, দেখে মা পিছন ফিরে রয়েছেন। ছ' এক পা এগিয়ে যায় সে সিঁড়ীর দিকে, প্রায় নিঃসাড়ে। মা একইভাবে বসে থেকে কাজ করতে করতে বলেন—চা খেয়ে যেও।

নরেন থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ নিজেকে নিদারুণ অবসন্ন লাগে। ছ' একটি নিমেষ কাটে সম্পূর্ণ অনড়, স্থির। মা ফিরে তাকান না, উলুন থেকে জল নামিয়ে কালো কেঁলিটায় ঢালেন। ভাঙা হাতলওলা পেয়ালাটা টেনে নেন কাছে। নরেন আবার পা টিপে টিপে এগোর সিঁড়ীর মুখে রাখা চটিটার দিকে, অত্যন্ত সাবধানে, চোবের মত। ছ' তিন পা গেছে এমন সময় মা বলেন—দেবী নেই... যেও না এখন।

নরেনের সমস্ত আয়োজন যেন যুহুর্ভে ধবসে গেল। মনে হল সে নয়, উন্মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকসম্মুখে। মাথাও তার অবিচলিত হয়ে আসে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে—একটু কাজ ছিল...

—বেণু'ধন....এই নাও, বস এসে।

মা হাতগড়া রুটি ও একটুখানি শুড় এনামেলের প্লেটে এগিয়ে দিলেন। নরেনের পাশে না তাকিয়ে অন্য পাশে ফিরতে ফিরতে বললেন—চা-ও হয়ে গেছে।

নরেন এক পা এক পা এগিয়ে এলো। বসল খাবারের সামনে, মুখ নিচু করে একটা গ্রাস মুখে দিল। চিবুতে থাকল অচেতন ভাবে। মা পেয়ালার চা ঢেলে চিনি দিয়ে হাতার ডাটি দিয়ে গোলালেন একটু। কোনো কথা হল না ছ'জনে। অথচ কানে যেন তাল লাগে গেল। চিনি গুলিয়ে, মা পেয়ালটা দিলেন ওর সামনে এগিয়ে, চোখ তুলে তাকালেন না। তারপর অন্য পাশে ফিরতে ফিরতে, কেঁলিটা সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলেন, আস্তে, মুছ ভৎসনার—তুই কি আমার কাছ থেকেও লুকিয়ে বেড়াবি, হ্যা-রে ?

আর, সংগে সংগে, নরেনের সমস্ত সত্তা উচ্ছসিত হয়ে ওঠে বাষ্পে। ছুই চোয়াল বেয়ে গলা পর্যন্ত বিদ্যুতের তড়িৎ বয়। হঠাৎ টপ্ টপ্ করে চোখ থেকে বড় বড় কয়েকটা কঁোটা পড়ে। মাথা আরো নিচু হয়ে যায়।

মা চান একবার, দেখেন আনত মুখ ও সামনেরাখা এনামেলের প্লেটে গোটা অশ্রুকণা। তাড়াতাড়ি উনি চোখ সরান, বসেন ঘুরে ব্যথিত মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে।

এলফ্রেড্‌ লর্ড্‌ টেনিসন ঃ

ঈগল

পাহাড়ের চূড়া আঁকড়ে থাকে সে বক্ষিম নখস্বারে
নির্জনদেশে সূর্যের গায়ে গায়ে,
নীলিম বিশ্ব চারিদিকে তার ছায়।
নিচে তার গুটি গুটি চলে ঐ সাগর অকুণ্ঠিত,
পাহাড়ে কেমনা থেকে চোখ রাখে তীক্ষ্ণ ও সচকিত,
তারপরে নামে বজ্রের মতো এবল আচম্বিত।

এই তো ঘুমায়

এই তো ঘুমায় রাঙা পাপড়ি ঘুমায় এই শাদা,
এখন দোলে না আর চেনার তো প্রাসাদবীথিতে,
মিটিমিটি তাকায় না সোনা মাছ মর্মর-আধারে,
জোনাকিরা জেগে ওঠে, জাগো তুমি আসছে আমার।

এখন আচুল হৃৎকল কেকা যেন প্রেতছায়া,
এবং ছায়ার মতো তারও প্রভা ডাকে যে আমার,
এখন অহল্যা পৃথ্বী মেলে আছে সহস্রতারায়,
তোমার সারাটা মন মেলে রাখো আমার আসায়।

এখন স্বরিতে নামে শুক্ক উকা আর বেধে যায়,
সীতা এক দীপ্ত রেখা, চিন্তা যেন তোমার আঘাতে,
এখন কমল তার সব মধুরিমা মুড়ে নেয়
এবং দীঘির নীল বক্ষে নেমে পড়ে চুপিসাড়ে

ভূমিও মিলেছে মুড়ে', প্রেরণী, ভূমিও তবে এসে
আমার এ বক্ষে নেমে এবং আঘাতে একাকার।

ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো

ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো

তব হিম ধূসর পাথরে, হে সাগর ।

আমারও যে সাধ যায় রসনায় ভাষা পাক
যে ভাবনা হৃদয়ে জাগর ।

আহা বেশ আছে ঐ জেলের ছেলের
ভাইবোনে খেলে মহা আনন্দচিৎকারে
আহা বেশ আছে ঐ মাস্কির জোয়ান
তরী বেয়ে গান করে দরিয়াশ্যকারে ।

এদিকে জাহাজ চলে গম্ভীর মন্থর
পাহাড়ের ছায়ায় আশ্রয়ে,
তবু সেই নিরুদ্দেশ হাতের ছোয়াচটুকু আহা
আর সেই কণ্ঠস্বর গেছে শুক হয়ে ।

ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো হে সাগর ।
তোমার শিলার পায়ে পায়ে
যদিও যে দিন গত, সেই কাঁচা অজের লাবণি
কভু আর ফিরবে না মোর কাছে হার ।

অনুবাদ : বিকু দে



ସମୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ

ଉଢ଼େ ସାମ୍ବ
ଏখানে-ଓখানে ଆଡ଼ିନାମ୍ବ
ବିରିବିରି ହାଲୁକା ହାଓମ୍ବ
ଧୁଲୋ-ଛାହି, ପାତା ।
ଗାଛ ଛାଡ଼ା ଯାଏ
ହସ । ଏକରାମ୍ବ
ରୋଦ-ପୋଡ଼ା ସାମ୍ବ ।

ସା କିଛି ପୁରୋନୋ—
ମାନ୍ଦୁସେର ଯନଓ
ବଦଳାୟ ।
ନାଡ଼ା ଧାୟ ।

ଗାଛେ-ଗାଛେ ଶାଖାର ଶିଖରେ
ଆସାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧରେ ।
ଏକଟି ନତୁନ ଦୋଳା—
ଶିହରଣ
ବ'ସେ ସାମ୍ବ,
ଏକଟି ମୋଲାପୀ ଟୋଟ
ଛୋରାୟ ସେମନ
ଆଚନ୍ଦ୍ରକା ଯନ ।

ଆହା, ଆସେ ନତୁନ ସମୟ
କୁଢ଼ି କେଟେ ଫେର କୁଳ ହସ—

ଯନ-ଓ କି ପ୍ରଜାପତି ନୟ ।

হে মমতা আলোক সরকার

সহসা শ্রামল সুর আকাশ সাজালো
বিনম্র আবেগ ।

সচ্ছল মাধুরী নিয়ে বিকেলের অনিকেত যেশ—
দরজা খুলে দিলে বলি তুমি এসো এসো
অক্লম্ন আলো ।

বাসের রাস্তার বুকে নামে
সহজ প্রণামে

হাওয়ার হাওয়ার যায় দূরদেশে । শোনো হে মমতা
বিদেশী পথের ছেলে মুগ্ধ চোখ তাকে ভালোবেসো ।
কী জানি জীবন কার অসীম বহন করতলে
কখন হারায় স্রোত সাহসিক সংবৃত্ত অনলে
ছুরারে-ছুরারে ফিরে আসো দূর সহদর স্রোতা ।
বুকের গভীর অঙ্ককারে

নিবিড় প্রণয়ী তারে-তারে

চকিত কংকার যেন বিশ্বাসের সপ্রতিভ শিখা
মুহূর্ত তুলেছো যবে কোঁড়হলী মগ্ন কনীনিকা ।
আবার পরম ক্ষণে দুই চোখ মেলে প্রত্যাশায়
বিবর্ণ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছি বিনীত হাওয়ার ।

এপার গিরেছে মিশে ওপারের দেশে
যদি কল্পনার পাখা মেলে দিই সান্ত্বনিক দেশে
অস্থির কান্নার যদি ভাসাই পথের সব ধুলো
নিদ্ভিত হলুদ ফুল পাবে দীপ্ত সন্তত সন্মান ?
(উভাসী মুহূর্তে যেন তুমি মুগ্ধ তুলো)

রৌদ্রের হৃপ্পুর জলে অবহেলা হীন অপমান
সহসা শ্রামল সুর বৃত্ত নীল অক্লম্ন আলো
আনত দীপের শিখা অকল্পিত এইখানে আলো ।
প্রার্থনার শান্ত দিঘি আজো প্রতীকার এসো এসো
দূরের হাওয়ার নয় । শোনো হে মমতা
বিদেশী পথের ছেলে মুগ্ধ চোখ তাকে ভালোবেসো ।

রূপান্তর

জ্যোতির্ময় গলোপাখ্যায়

তার ছায়া তাকে অঙ্ক করেছে

সে আঁক মুহূ

বৃত্তের মতো তার চারিপাশে

পরিধা এঁকেছে

তার গতিবিধি

ঋধা পড়ে আছে ওই ছায়া বিরে

কোমলশ্রামলনীলিম সে-ছায়া

তার ছুটি চোখে নিজা এনেছে

শুধুই-নিজা

তাই

তার এতো

ক্লান্তি ক্লান্তি ।

তাকে আনো

এনে

বন্দী করো এ-রৌদ্রের নিচে

তার যতো ভয়

স্বপ্নায়ু শত কুসুমের মতো

ঝরে বাবে

হবে নিস্ত্রাণ,

রৌদ্রের এতো যন্ত্রণা

সে কি

স্বপ্নেছে কখনো ?

আর সে কি জানে

সাম্রাজ্য পাবে

নির্মোক তার খসে গেলে

যতো

কোমল শ্রামল নির্মোক খসে গেলে ।

অঙ্ককারে

শব্দ ঘোষ

যখন দিনের আচ্ছাদন সরে যায় তোমার মুখ থেকে
একটা পবিত্র ক্রান্তি নব্র চেতনার মতো গলে পড়ে সমস্ত অবয়বে ;
ইটুতে মুখ রেখে বসে থাকো অঙ্ককার করে
গ্নান প্রদীপের মতো—
মতো গ্নানি, মতো স্নিগ্ধ তাপ
কৈপে ওঠে দক্ষিণ হাওয়ায় ।

আমি দূরান্ত থেকে করে ফিরে আসি
হাসি, খেলি, কথা বলি,—তারপর
কয়েক দণ্ড তাকিয়ে থেকে আমার বিস্তৃত আকাশের দিকে
মধুরা আমার মধুরা—
তোমার মুখের গ্নান শিখা থেকে মশাল জ্বলে নিয়ে
পথ ধুঁজতে বেরোই, অঙ্ককার
অঙ্ককার সমুদ্রে—

তারাগুলি তাকিয়ে থাকে শান্ত প্রতীকার ।

বাউল
মামল রায় চৌধুরী
(আশীষ বর্মণ, সহদয়েষু)

কাদে প্রাণ সারা রাত, পেতে হবে তাকে পেতে হবে,
বেদনার অঙ্ককারে জীবনের সকল গৌরবে ।
অনিঃশেষ আতি বুকে—আসবে সে কবে এই পথে
মগ্ন এই চেতনার, সম্মোহিত প্রেমের স্বগতে ।
শূন্যবোধে দিন কাটে, স্পর্শহীন সে ব্যথার তল
উতল চৈত্রেয় হাওয়া এলোমেলো মোছে অশ্রুতল ।

ধুলোকে সে ফুল মেনে হৃদয়ের উদাসী বাউল
নেমেছে পথের মাঝে খুঁজে তবু পায়না হুকুল ।
কই সে প্রণয়ী যার আঁখি জুড়ে সদা অভিমান
ছলোছলো । কালো মেঘে আকাশ ছেয়েছে বলে যার
বুকে ওঠে ব্যথানীল ঢেউ । সে যে অশ্রুতরা গান
মেলেছে আকাশ পানে—কবে মন দেখা পাবে তার ।

অস্থির, থাকেনি ঘরে অবিশ্রাম পথিকহৃদয়
তাকে যে পেতেই হবে জীবনের অরূপকমল,
কোথায় পথের বাকি দিখিছুড়ে নীল শতদল ।
ঐতিময় দৃষ্টি যার, প্রেম যার সহজ সঞ্চয়
দূরযাত্রী সে চেতনা খুঁজেছে ইশারা সবখানে,
পূর্ণতার লগ্ন তবু আসে কই দিন অবসানে ।

বহুমূর্ত্য শিবশঙ্কু পাল

যেখানে ব্যাকুল মন স্তব্ধগতি—অবরোধে বাঁচে,
শাস্ত হ্রস্ব বারবার অবসাদক্লীর্ণ ছায়াঘবে
অথবা যেখানে সুর রাশি রাশি কান্না হয়ে নাচে
বুকের নিভৃত নাচে ; তিমিরের উচ্চকিত স্বরে
যেখানে কালের ব্যাধ মুখরিত জয়ের গৌরবে,
বহুমূর্ত্য সেখানেই । প্রহরে-প্রহরে জমা হবে

তার ভার, নিভে যাওয়া চেতনার ; সেতো স্বাভাবিক ।
তার আসা বারবার ঘরোয়ার অন্ধকূপে ; পথ
ক্লান্তির ঝরানো ফুলে বিস্ময়িত, জানি কাল্পনিক
শান্তির নির্মাণ সেতো । তাই বিলয়ের জয়রথ
তাকে নিয়ে বাধাহীন গতির পতাকা তুলে ধরে’
সোজামুজি এনে দেয় হৃদয়ের নিভৃতির দোরে ।

তার থাকা ততদিন, যতদিন তার অধিকারে
না আসে আরেক মূর্ত্য অগ্নিগর্ভ প্রাণের উচ্চাবে ॥

ত্রিশের তারা তারাশঙ্কর

সুধীরচন্দ্র রায়

॥ আলোচনা ॥

॥ এক ॥

অগ্রণীতে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে যে সম্যক আলোচনা অচ্যুত গোস্বামী মহাশয় ক'রেছেন, তা পড়ে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়েছি, একথা বলাই বাহুল্য। তারাশঙ্করের মনের দিকটি নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা আমার মনেও একটি সাড়া বা উদ্দীপকের ধর্ম জাগিয়েছে ; মনে হয় এমনি অল্প পাঠকের মনেও হয়েছে ; এইজন্য অধিকতর আলোচনার প্রয়াসী হয়ে ঐ প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অনেকদিন আগে বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখায় জেনেছিলাম, কবি মাত্রেই কালের পুতুল। কথাটিতে আজও আমার আপত্তি আছে। ত্রিশের তারা কাথাটিতেও আমার কিন্তু আপত্তি। লেখকের লেখা কালাতীত হয়ে পড়বেই—এমন কথাও যেমন আমি স্বীকার করি না, তেমনি লেখক কেবল একটি কালের মধ্যেই সীমিত এমন কথাও ভাবতে পারিনে। নিউটনের বিশেষ দর্শন নিয়ে একটা উপমা দেওয়া যায়। ধরুন একটা লোহার বলকে এক জন ধানিকটা ঠেলে দিল ; এমন অবস্থায় অমুকুল আদর্শ-সংস্থায় ঐ বলটি অনন্তকাল গড়িয়ে চলত ; কিন্তু সত্যিই আর তা হয় না ; হয়ত বা সেই আদর্শ-সংস্থা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই বলটিকে অনন্তকাল গড়াতে হ'লে আরও লোকের দরকার, কিংবা বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল। সাহিত্য-কর্মেও বোধ হয় তাই। কোন লেখক যেমন চিরন্তন নন, তেমনি কোন বড় লেখকই ব্যর্থ নন। আজকের কবির মধ্যে মধুসূদন নেই, কিংবা আজকের ঔপন্যাসিকের মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্র নেই একথা সত্য নয় ; অথচ পাঠ্যপুস্তক আর গবেষণা ছাড়া ওঁদের লেখা আমরা ক'জনেই বা আগ্রহ নিয়ে পড়ি। উন্নত সমাজমন এবং সাহিত্যের ধর্মই এই যে, নানারকমের অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রে ক'রে সে এগিয়ে চলে। সমাজই বলুন আর সাহিত্যই বলুন সে এগোবেই, কারণ মানুষের মন এগিয়ে চলবেই। অবশ্য এগোনো অর্থ সরলরেখা আকারের নয়। সমাজ বা সাহিত্যের পরিবর্তন কেবল এক রেখা সরল-ক্রিয়ামিত্তির নিয়মে তো চলে না। সমাজ বা সাহিত্য-কর্মের নানা দিক আছে ; কোন দিক এগিয়ে চলে, কোন দিকের কোন পরিবর্তনই হয় না, কোন দিকটি বন্ধ। 'প্রগতি' কথাটিকে যদি এমনিভাবে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি তবে আলোচনা অনেকাংশে সরল হয়ে আসবে।

সমাজের এবং সমাজমনের যখন এই অবস্থা তখন সমাজ-ব্যক্তি সেই অবস্থাকে যে কেমনভাবে গ্রহণ করবেন তা কিন্তু ঠিক ক'রে বলা যায় না। ঠিক করে বলা যায় না।

বলেই, রাজনীতিতে যাকে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল আর প্রগতিবাদী বলি, সাহিত্যে সেই আলোচনা টেনে আনা সাহিত্য-আলোচনার পক্ষে খুব সুস্থ ব'লে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না। কবি বা সাহিত্যিক সমাজমনের কোনটিতে জোর দিবেন তা বোধ হয় তিনি নিজেই জানেন না।

ঠিক এই কারণে কোন তত্ত্ব, তা সে সামন্ততন্ত্রই হোক আর গণতন্ত্রই হোক, কোন সময়ের সমাজব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে তার দর্শনের বিশিষ্টতার চিহ্ন ঐকে দিতে অক্ষম। কাজেই গোস্বামী মহাশয় যেখানে বলেছেন, 'সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দুটো জীবনযাত্রা, একটি বনেদী আর একটা বাঘাবরী'—এমন সহজ বিভাগ কিন্তু মেনে নিতে পারিনি। সামাজ্য হঠাৎ চলতে চলতে সামন্ততান্ত্রিক স্তরে এসে দুটো ভাগে বিভক্ত হয় পড়ল—একথা সমাজ-তাত্ত্বিকেরা স্বীকার করবেন কিনা জানিনে, কিন্তু বর্তমানে আমি কিন্তু পারছি। 'শোষণ প্রধান সমাজব্যবস্থা' কাকে বলে তা কিন্তু বোধগম্য হ'ল না। আর্থিক শোষণব্যবস্থা চরম, এ ব্যাপারটি মানুষের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় সন্দেহ নেই কিন্তু মানুষের রক্ষণশীল মন তাকে বাঁচাবার জন্যে নানাবিধ প্রণালীও আবিষ্কার করে।

হঠাৎ উন্নত সমাজ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে, এ-কথাও যেমন সত্য তেমনি ঐ সমাজ-অঙ্গের মধ্যে প্রাথমিক-গোষ্ঠী যেটি থাকে সেও কঠিন আবরণ নিয়ে স'রে থাকে তাও সত্য। ভারতবর্ষে নানা গোষ্ঠী আছে। প্রাথমিকগোষ্ঠী আর বৃহত্তরগোষ্ঠী অবিরাম সংগ্রাম করছে, বৃহত্তরগোষ্ঠী প্রাথমিককে গ্রাস করতে উগ্ধত! কিন্তু প্রাথমিকের মরুগ্রাসও খুব সহজ নয়। বৃহত্তরগোষ্ঠী রাজনীতিতে-অর্থ বৈষম্যে যেমন সহসাই পরিবর্তিত হয়ে চলে তেমনি নানাস্থানে ফাঁক রেখে যায়; সেই ফাঁকে ফাঁকে প্রাথমিক চিন্তাধারা আচার-আচরণ এসে জোড় বাঁধে ফাঁক ভরাট হয়। আজও আমরা যাদের অনগ্রসর বলি তাদেরই নৃত্যপদ্ধতি সংগীত-শিল্প মেজে ঘসে কেমন সুন্দর পাচ্ছেই না আমাদের উন্নত সমাজে পরিবেশন করছি, আমরা উপভোগ করছি। যে-সমাজ অনগ্রসর তাদেরই সৃষ্টি আমাদের কৃষ্টিবর্ধন করছে। এমনি রীতি সামন্ততন্ত্রেও ছিল না, এমন কথা কি সরবে বলা যায়? ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানেন, আমাদের সভ্যতার মূলে যে-সব আবিষ্কার তা অনেকটাই এসেছিল সুসভ্য মিশর ব্যাবিলন থেকে নয়, হিট্টাইট সাম্রাজ্য থেকে।

কোন একটা তত্ত্ব নিয়ে সমাজবৈশিষ্ট্যের মোটামুটি ধারণা অবশ্য করা যায়, কিন্তু সেই মোটামুটি ধারণাকেই একমাত্র ক'রে ব্যাখ্যা ক'রতে গেলে বোধ হয় সত্যসন্ধান হয় না। অঙ্গকের তারিখের হিসাব যীশুখৃষ্টের নামের সঙ্গে, কিন্তু যীশু ছাড়া সময় এগোত না—একথা কিন্তু ভুল। অলঙ্কার দিয়ে কাব্য রচনা করি, কিন্তু অলঙ্কারের অর্থ বুঝতে পারলে কবির বক্তব্য বুঝতে পারা যায় এ কথা কিন্তু ঠিক নয়।

কাজেই বাঘাবরী সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি একথা মানতে পারছি। মানতে পারছি বলেই—ঐ চিন্তাধারা রীতিনীতির উদ্ভাবন ক'রে তারা বাঘাবরী হ'য়ে পড়েছে—একথাও মানা যায় না। প্রাথমিক আর বৃহত্তরগোষ্ঠী দুইটির ও-একরকমের বন্দ, অন্তর্দ্বন্দ্ব

বলতে পারেন। ঐ সম্বন্ধে সমাজের মানুষ বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন সময়ে অংশ গ্রহণ করছে।

যাযাবরী প্রেমের প্রধান ধর্ম জৈবিক আকর্ষণ—এমন কথাও তাই সহসাই বলা যায় না। আমার তো যাযাবর কথাটিতেই আপত্তি। সমাজে যাযাবর আছে, প্রেম আছে, প্রেমে জৈবিক ধর্ম আছে সবই সত্য কিন্তু তিনটি একত্রে আছে- কথাটা কতখানি প্রজ্ঞাসম্মত ভেবে দেখা দরকার। অচ্যুতবাবু যাকে যাযাবর বলছেন, আমি তাকে প্রাথমিক আর বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী সমাজ-মন ব'লে মনে করছি। প্রেমে জৈবিক দিক না-থাকা অসুস্থতা বা অতিমানবিকতা। কিন্তু জৈবিক দিকের পূর্বে ও পরে শরীর-মন প্রভৃতিতে এমন সব প্রভাব এসে পড়ে যে তার জন্ত নানারকমের ব্যবহার-আচরণ বা অনুষ্ঠান ক'রে থাকে মানুষে। এই আচরণ-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতাই যা কিছু সমাজে সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এই আচার-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সমাজের প্রভাবও এসে পড়ে। ঐ আচরণটুকুর পার্থক্য একজনকে রোমানধর্মী আর একজনকে জৈবিক-ধর্মী করে বলে আমার ধারণা হয় না। এই দিকটা টেনে নিয়ে অচ্যুতবাবু তারশব্দের যে-ক্রটিতে পৌঁছেছেন, তাকে আমি তাই স্বীকার করিনে।

মূলত, কোন শিল্পী উদ্দেশ্য-পরিচালিত হ'য়ে সমাজের কোন বিশেষ অঞ্চল বা বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করেন একথাও যেমন সত্য, তেমনি কোন বিশেষ অঞ্চল বা বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন এ-কথাও তেমনি সত্য। কোন্টি আগে আর কোন্টি পরে, সে-কথা ছক কেটে ব'লে ওঠা যায় না। শাহজাহানের প্রজ্ঞানিপীড়ন নিয়ে যখন ভাবি তখন তাজমহলকে দেখি, আবার তাজমহলকে দেখে শাহজাহানের মানসিক দিকও বুঝতে চেষ্টা করি। প্রথম দিকটি শরৎচন্দ্রের কমলকে প্রভাবিত করেছিল; আবার তৃতীয় একটি মানসিক আদর্শ রবীন্দ্রনাথের তাজমহল বা শাহজাহান বর্ণনায় পাই। যে বিলম্ব নদী 'বলাকার' উদ্ভোধন করল সেখানে বিলম্বও নেই, বলাকাও নেই; রবীন্দ্রনাথই আগে থেকে ব'সেছেন। অবশ্য শিল্পী মনোজগত সৃষ্টির জন্ত দায়ী অনেকটা সমাজের প্রকৃতি। কিন্তু সমাজের কোন্ প্রকৃতি, কতকাল দুবের প্রকৃতি, সে-কথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। শিল্পীর মন পরতে-পরতে গ'ড়ে ওঠে। এইজন্ত একটা কালের সমাজ প্রকৃতি নিয়ে তাঁর মনকে ব্যাখ্যা করে ওঠা মুশ্কিল। তবু বলব, এমন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সেই আলোচনার প্রতিমুহূর্তে সংশয় নিয়ে চলা ভালো; এক নিঃশ্বাসে কোন এক বিশেষ সূত্রে না পৌঁছানোই মঙ্গল।

সমাজে রাজনীতিক বা অর্থনীতিক যুগ-বিভাগকে আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু রাজনীতিক প্রভাবকেই সমাজ স্বীকার ক'রে নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে এমন কথাও মানিনে; তা যদি হ'ত তবে রাজনীতিকযুগকে কেউ কাটিয়ে উঠতে পারত না, রাজনীতিও নয়। কাজেই, অচ্যুতবাবুর এই যুগবিভাগ অবলম্বন ক'রে সাহিত্য-আলোচনাকে আমি একান্ত ক'রে ধরতে পারছি। এই পদ্ধতি মেনে নিলে তারশব্দকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে হয়ই;

সে অপবাদ অচ্যুতবাবু শত চেষ্টা ক'রেও কাটাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বর্তমানে সন্তুষ্ট না হয়ে সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, বিপ্লবকে অস্বীকার করতে চায়। মধ্যবিত্তের এই মনকে অস্বীকার করা যায় না। অচ্যুতবাবুর বিশ্লেষণ মানলে তারাশঙ্করকে প্রতিবিপ্লবী বলতে হয়ই। কিন্তু যতদূর বুঝতে পেরেছি, অচ্যুতবাবু সেই অপবাদকে স্বীকার করতে চান না। এখানে অচ্যুতবাবু ব্যর্থ হয়েছেন।

কোন শিল্পী প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রগতিবাদী একথা আমিও স্বীকার করি না। একথাও সত্য, সাধারণভাবে শিল্পকৈবল্যবাদ আমারও মনোবৃত্তি অনুযায়ী নয়। শিল্প সমাজ-নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন সমাজের সাপেক্ষ তাই নিয়ে আছে আমার মতভেদ। কোন বিশেষ সমাজীয় অংশ থেকে সমাজের ধারাকেই আমি স্বীকার করি বেশি। ধানক্ষেতে বহু যত্ন ক'রে আমরা ধান বুনি বটে, কিন্তু কিসানেরা জানে সেই ক্ষেত নিড়োনা কত কষ্ট। অর্থাৎ সেখানকার মাটির স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে আরও কোন কোন গাছের আত্মীয়তা আছে। বহু যুগ থেকে সেই শক্তির ক্ষুদ্রণ ঘটে আসছে। বিশেষ সমাজ-মানসের পক্ষে কোন শিল্পী হয়ত আগাছা; প্রয়োজনের মাপকাঠিতে তারা অপাত্তের। কিন্তু সমাজের কোথায় লুকিয়ে আছে তাদের প্রাণশক্তি। সেই বিকাশকে আপনার প্রয়োজনে আনতে পারছেন না ব'লেই তারা নেই—এমন কথা ভাবা যায় না।

তারাশঙ্করের মধ্যে আছে মাটির সেই শক্তি সহজ শক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে যে-রূপটি প্রকাশ করলেন না অথচ আকাঙ্ক্ষা ক'রে গেলেন, রবীন্দ্রনাথও কাব্যে শতধারায় যে-বাণী বহন করলেন—শরৎচন্দ্র সমাজের বিভিন্ন রূপকে একটি মূর্তিতে কল্পনা ক'রে তার অসম্পূর্ণতা আর সমস্তা দেখিয়ে গেলেন, তারাশঙ্কর সেই প্রাথমিক আর বৃহত্তরগোষ্ঠীর দৃষ্টিকে স্পষ্ট ক'রে তুললেন। তারাশঙ্করের এই জ্ঞান পুঁথিগত বিদ্যার মারফৎ নয়, সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ফলও নয়, এ জ্ঞান তাঁর 'ক্যামেরা'র জ্ঞান। যে-কানিসটিকে আমরা প্রতিমূর্তিতে দেখি অথচ তার শৌন্দর্য দৃষ্টিকে কিছু অগত নই, যে-দৃশ্যমান জগত প্রতি মূর্তিতে আমাদের মন তোলায়—অথচ তার রেখা-বিস্তার আমরা ভেমন লক্ষ্য করিনা কিন্তু 'ক্যামেরা-ম্যান' সেই অকসটিকে তুলে ধরেন। তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গিতেও সেই কথাই পাওয়া যায়।

কেন তারাশঙ্কর গ্রামের সমাজের অবজ্ঞাতদের লক্ষ্য করলেন, কেন যুহুন্দরায় 'কালকেতু'র সমাজ-কে বর্ণনা করেন সে উত্তর দেওয়া অসম্ভব এ চিঠিতে আর প্রয়োজন নেই। তারাশঙ্কর আজ যদি সমন্বয় সাধনের পরিচ্ছেদে এসে থাকেন তবে তা স্বাভাবিক। দ্বন্দ্বই ত' একমাত্র নয়, সে সমন্বয় ক'রেও চলেছে। সেই সমন্বিত সমাজরূপের ভেতর তারাশঙ্কর দৃষ্টিকে দেখেছিলেন, কাজেই পরিশেষে তিনি সমন্বিতরূপ দেখতে বাধ্য। আমার ব্যক্তিগত ধারণা তারাশঙ্কর যে চিন্তারূপ নিয়ে এগিয়েছিলেন তার প্রায় সমাপ্তি ঘটে গেছে। এখন হয় তারাশঙ্কর পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন, না হয় ভিন্নপথ ধরবেন, নতুবা ছুরিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি ছুরিয়ে গেলেও এই পথকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে হবে—হয়ত আর কেউ করবে।

কারণ, তারারশব্দর যে-বিষয়বস্তু আর যে প্রকাশভঙ্গি নিয়েছেন তার মধ্যে ভবিষ্যৎদৃষ্টি কম; সার্থক সাহিত্যিক তিন-কালেই বিচরণ করেন; সেই ক্ষুদ্র কাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল না পোলে তাকে আমরা মনীষী বলি না। তাই তিনি নতুন দৃষ্টি দিয়েছেন, কিন্তু কবির দৃষ্টি নয়—কবিরও নয়। তবে আজ সে আলোচনা থাকুক।

॥ দুই ॥

তারারশব্দর সংক্রান্ত আলোচনার প্রতিবাদ হিসাবে শ্রীযুত সুধীর রায় যা লিখেছেন তার জবাব দিতে বসে প্রথমেই আমি সুধীর বাবুকে ধন্যবাদ জানাই। আমার অনেক পরিশ্রম করে লেখা প্রবন্ধটি যে প্রিন্টার কম্পোজিটার এবং আমি ছাড়া আরও একজন যত্ন করে পড়েছেন এটা আমার পক্ষে কম সান্ত্বনার কথা নয়।

এ-ধরনের আলোচনার মতভেদ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা যদি প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করার জন্য মনকে উন্মুক্ত রেখে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হই তাতে পরিণামে উপকৃত হব বলেই আশা করা যায়। আমার আজকে যে-মতটা রয়েছে সেইটেই যে কালকেও আমার মত থাকবে এ কথা আমিও জোর করে বলতে পারি না। সেই জন্যই সুধীরবাবুর আলোচনার উপর আমার একটা জবাব দেওয়াই দরকার এটা আমি মনে করেছি। তবে জবাব দিচ্ছি, এই সুযোগে আমার বক্তব্যটা আরও একটু সুপরিষ্কৃত হয়ে উঠতে পারে এই ভরসা।

আমার মনে হয় আপত্তির কেন্দ্র হচ্ছে ‘যাযাবর’ কথাটা নিয়ে। আমি লিখেছিলাম সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দুটো জীবন-যাত্রা—একটা বনেদী, একটা যাযাবরী। অবিশ্যি এ প্রসঙ্গে ‘সমাজ হঠাৎ চলতে চলতে সামন্ততান্ত্রিক স্তরে এসে দুটো ভাগ হয়ে গেল, বা ‘যাযাবরী সম্প্রদায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি’,—এ ধরনের কথা আমি বলিনি। কাজেই এ কথাগুলির দায়িত্ব সুধীরবাবুর। বনেদী আর যাযাবরী এ দুটো অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগের কথা নয়; যদিও অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য এই বিভাগের পিছনে রয়েছে। শোষণপ্রধান সমাজে এই ক্রিনিসটা চোখে পড়ে এইজন্য বলেছিলাম যে মানব-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অবদমনমূলক সমাজ-নীতি এই সমাজের বিশেষত্ব, আর তারই ফলে কিছু কিছু মানুষ সমাজের সোজা রাস্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রয়োজন বোধ করে। এই মনস্তাত্ত্বিক কারণ যেখানেই বর্তমান সেখানেই যাযাবরী বলে আখ্যাত করা যায় এমন একশ্রেণীর মানুষকে চোখে পড়া সম্ভব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চোখে বেদেনী, বৈরাগী, বোষ্টম সাপুবে, সাধু সন্ন্যাসী—প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব যদি এইভাবে এক কথায় ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে যে খানিকটা সরলীকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়, তা আমি জানি। কিন্তু বিষয়টির জটিলতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানীর, সাহিত্য-সমালোচকের নয়। আমি শুধু সমাজতত্ত্বের সেইটুকু অংশ গ্রহণ করেই সুধী বা সাহিত্যকে বোঝার জন্য আমি প্রয়োজনীয় বলে বোধ করি।

আমরা যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, ধনিক, বা অন্য কোন সামাজিক বিভাগের কথা উল্লেখ করি তখন আমরা একথা মনে রাখি যে একটা বিশেষ শ্রেণীর সংগে ~~আমরা~~ ^{আমরা} ~~নৈতিকতা~~ ^{চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি} ~~অভিহিত~~ ^{অভিহিত} বলে আমরা কল্পনা করি—ঐ শ্রেণীর কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে তা পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা জানি কোন ভারতীয় শিল্পপতি তার কারখানার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও বাড়ির মেয়েকে কালেভদ্রে গংগা স্নানে পাঠাতে হলে মোটরের চারদিকে পর্দা টাঙিয়ে দিতে পারেন অনায়াসে। এই জটিলতা না থাকলে সমাজসত্যকে জানবার জন্য গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে কোন আবশ্যকতা থাকত না। মার্কসের ‘ক্যাপিটাল’ পড়লেই সব জ্ঞান শেষ হয়ে যেত। তবু আমরা এইসব abstraction গুলে সব সময় উল্লেখ করি আলোচনার সুবিধার জন্য।

তারাশঙ্করের প্রসংগটাই ধরুন না। তারাশঙ্করকে যে যাযাবর-ধর্মী বলছি তার মানে আমি নিশ্চয়ই এ কথা বলতে চাই না যে সামন্ততান্ত্রিক বিচারে তারাশঙ্কর যে শ্রেষ্ঠ বংশসম্মত এটা দেখার ভুল, আসলে তিনি কোনো যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক। এ কথাও নিশ্চয়ই আমি বলতে চাই না যে, একজন বেদে বা একজন বৈরাগীর সংগে পরিচিত হয়ে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখলেই তারাশঙ্করের চরিত্রকে আমরা বুঝতে পারব। তারাশঙ্করের যাযাবরত্ব নিশ্চয়ই একটা abstraction. কিন্তু তাই বলে এই abstractionটা বায়ুচারী এ-কথাও বলা চলে না। আমাদের সমাজমানসের মধ্যেই কোথাও না কোথাও তারাশঙ্করের বিশেষ মানসিকতাটা ছড়িয়ে রয়েছে, এবং একটা খুব কাছাকাছি (approximate) নিদর্শন হিসাবে যাযাবর সম্প্রদায়ের মানসিকতার (এটাও একটা abstraction) সংগে তাকে যুক্ত করতে চেষ্টা করছি।

তারাশঙ্করমানসকে কেন আমি একটা বিশেষ নামে অভিহিত করতে চাইছি? নিশ্চয়ই শুধু এই জন্য নয় যে তিনি কতকগুলো যাযাবর এবং অর্ধযাযাবরশ্রেণীকে তাঁর কতকগুলো লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তাজমহল নিয়ে লিখলেই কোনো লেখকের কোনো বিশেষ প্রকৃতি ধরা পড়ে না। সেটা ধরতে গেলে দেখতে হয় লেখক তাজমহলকে কোন্ চোখ দিয়ে দেখেছেন। সাহিত্যআলোচনার এ-সব সাধারণতত্ত্বগুলো আমি জানি বলে সুধীরবাবু ধরে নিলেন আমার উপর সুবিচার করা হত।

কিন্তু তারাশঙ্করকে ক্যামেরাম্যান বলে গ্রহণ করতেও আমি রাজী নই। ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা এমন একটা জিনিস যা বাংলাদেশে কোনোদিনই ভিৎ গাড়েনি। আর তারাশঙ্কর-সাহিত্যের বর্ণ বৈচিত্র্য, অতিরঞ্জন, কাছের জিনিসকে দূরের জিনিস বলে প্রতীতি জন্মানোর চেষ্টা, প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর রোমান্টিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। তিনি কখনোই তাঁর বিষয়ীভূত গোষ্ঠীসমূহের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, সামাজিক লক্ষ্য ইত্যাদির আত্মপূর্বিক পরিচয় দিতে চাননি। বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের জোয়ারের মধ্যেও এইসব গোষ্ঠীগুলি কেন নিষেদের কুপমগ্নকতার অবিচলিত থাকে, তারাশঙ্কর তাই অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। রোমান্টিক সরলীকরণের দ্বারা তাঁর অনেক সময় পদাঙ্কন

হয়েছে। কিন্তু শুধু রোমাটিক বললেই কি তারাশঙ্করকে সবটুকু বোঝা যায়? এই রোমাটিক-সিদ্ধমের কি আর কোনো বিশেষত্ব নেই?

তারাশঙ্করসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি তার মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত স্ব-বিরোধ ধরা পড়ে। তিনি বিদ্রোহী কিন্তু বিদ্রোহের চেতনাশূন্য। তিনি শোষিতের যুক্তি চান কিন্তু শোষকের প্রতি তাঁর মোহের অন্ত নেই। তিনি পরিবর্তনকে স্বীকার করেন; এমন কি, কামনাও করেন, কিন্তু পরিবর্তনের ফলে যে সব নতুন মানুষের দল আসে, তাদের প্রতি তাঁর অসীম অবজ্ঞা। বড় প্রবন্ধে এ-নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করেছি; পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। এই স্ববিরোধগুলোকে চিন্তার জড়তা বা অপরিপক্বতা বলে ধরা চলে না। কারণ, দেখা যায় যে এর মধ্যে বেশ একটা method বা শৃঙ্খলা আছে। এই method-টা আমার কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হয়েছে যখন আমি বোধ করেছি এর পিছনে লেখকের কোনো সচেতন প্রয়াস নেই। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের অগ্রগতির মধ্যে এই methodটা রয়েছে অবিচলিত।

এই কারণেই তারাশঙ্করমানসকে একটা নিছক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলে অনুমান করতে পারিনি। নিশ্চয়ই সমাজমানসের কোনো একটা দিক তারাশঙ্করের মধ্যে প্রতিকলিত হয়েছে। এই বিশেষ দিকটাকেই আমি মাথাবরী বলে অভিহিত করতে চেয়েছি জ্ঞানসন্মত কারণে।

তারাশঙ্করসাহিত্যের স্ব-বিরোধগুলির জন্মই একসময় তাঁকে প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল; আবার এখন তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যা করাও চলছে। বলা বাহুল্য এ-উভয় ব্যাখ্যাই রাজনৈতিক প্রভাবাধীন আলোচনার ফল। সুধীরবাবু ঠিকই বলেছেন, এ ভাবে অগ্রসর হলে আমার পক্ষেও তারাশঙ্করকে প্রতিক্রিয়াশীল বলাই সংগত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যের বিচার অত সরলভাবে সম্পাদন করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না; এবং তাতে লাভবান হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তারাশঙ্করসাহিত্যের অনেক জিনিস যেমন আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তেমনি তার অনেক জিনিস আবার আমাদের বিরোধীপক্ষের কাছেও প্রচারের খোরাক জোগাতে পারে। তাতে আমাদের কী আসে যায়? আমরা তাঁর থেকে যেটুকু সমাজবাস্তবের সত্য পাচ্ছি তা-ই কেন কৃতজ্ঞ চিন্তে গ্রহণ করব না। তারাশঙ্কর যা লিখেছেন তা জাতীয় সম্পদ, তিনি নিজেও তা ফিরিয়ে নিতে পারেন না বা বাজেরাপ্ত করতে পারেন না।

প্রগতিশীল কথাটা আপেক্ষিক। সমাজঅগ্রগতির লক্ষ্য সম্পর্কে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করলেও তিনি যদি প্রকৃত শিল্পী হন তবে তাঁর মধ্যে অনেকখানি বাস্তবসত্য প্রতিকলিত হতে পারে। এবং যা সত্য, তাই প্রগতিশীল। তারাশঙ্করের মধ্যে শিল্প কৈবল্যবাদী প্রবণতা সত্ত্বেও, রোমাটিক অগভীরতা সত্ত্বেও, আমার বিশ্বাস, তাঁর সাহিত্যের শিল্পমূল্য নিছক তাঁর শিল্পনৈপুণ্য বা জৈবিক বৃত্তি কণ্ডুয়ন-জাত নয়। বৃহত্তর বাংলাসমাজের পরিচয়কে তিনি প্রসারিত করেছেন। সমাজবাস্তবের এই প্রতিকলন যদি আরও সর্বাঙ্গীন

অনতিবিক্রান্ত এবং সুসামঞ্জস হত, এবং যদি সমাজের ভবিষ্যতের আভাস তাঁর লেখার দ্বারা পড়ত তবে আমি নিঃসন্দেহে আরও খুশি হতাম। কিন্তু যা পাইনি তার জন্য আপশোস করব না।

তারাকরদের সময়বাদের দর্শনকে সুদীর্ঘাবু যতখানি স্বাভাবিক মনে করেছেন, আমি তা করতে পারছি না। 'আরোগা নিকেতন'-এর কবিতাক্রমশাই আমলে জমিদারসংস্কৃতির প্রতিনিধি। কিন্তু তারাকর ঠিক জমিদারসংস্কৃতির প্রতিনিধি নন। একজন জমিদারের চেয়ে একজন যাযাবর নিঃসন্দেহে অনেক অনেক বেশি ভাল মানুষ। এই বই-তে সর্বপ্রথম তারাকর একজন বুর্জোয়া-ধর্মী স্বাভাববাদী ডাক্তারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারাকরের শেষের লেখা বইগুলোতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি প্রতিক্রিয়ানীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন। তাঁর সময়বাদের দর্শন তাঁদেরই স্বার্থের খাতিরে তৈরী হয়েছে। তারাকর যদি অকালে কুরিয়ে যেতে না চান তবে তাঁকে প্রতিক্রিয়ানীদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। প্রগতিশীল সাহিত্য না লিখতে পারা মানে শিল্পবলেন্দ্রাহ সাহিত্য না লিখতে পারা, —তারাকরকে আশা করি এ-কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া অনাবশ্যক।

বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক বিশেষত্বের জন্য অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি দেখা যায় বলেই সময়বাদের দর্শন সত্য নয়। এমন কি ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সেও সহ-অবস্থির দৃষ্টান্ত পাওয়া চুক্কাহ। সভ্যতার অগ্রগতির পথে নিশ্চয়ই এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন সহ-অবস্থিতির কোনো লক্ষণ আর চোখে পড়বে না। অতীত তাই বলে মুছে যাবে না; শুধু তা বর্তমানের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবে। সময় নয়, যৌগিক মিশ্রণ।

পরিশেষে সুদীর্ঘাবুর সর্বপ্রথম কথাটার জবাব দেই। কোনো লেখককে কালের দ্বারা চিহ্নিত করতে দোষ কি? যে কোনো লেখকের শিল্প তো তাঁর কালের বাস্তবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর এই ভিত্তিটা যদি শক্ত হয় তবে এর জোরেই লেখক কালজয়ী হয়ে অমরত্ব বা অন্তত দীর্ঘজীবন লাভ করে থাকেন; কারণ ভবিষ্যতের উন্নততর সমাজের মধ্যেও বর্তমান বাস্তব লুকিয়ে থাকবে।

অচ্যুত গোস্বামী



ফোনঃ
৫৩২

সুধারবন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কো: লি:
৩৪.সি. আনন্দ পালিত রোড. কলিকাতা-১৪
এজেন্ট আবশ্যক

‘অগ্রণী’র একবছরের গল্প

অদ্যুত গোস্বামী

এক বছর ধরে ‘অগ্রণী’তে যে-সব গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর আলোচনার ভার পেয়েছি। কাজটা শক্ত। আরও শক্ত এইজন্য যে যে-কোনো একজন লেখকের দু’টে একটার বেশি গল্প সাধুনে পাচ্ছি না; অথচ দু’একটা গল্পের উপর নির্ভর করে কোনো লেখক সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কোনো সিদ্ধান্তে এলেও সে-সিদ্ধান্ত অগভীর হতে বাধ্য। আর লেখককে বোঝার চেষ্টা না করে তাঁর লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করার কাজটা বড় অস্বস্তিকর।

মাসিকপত্রিকাগুলির আনুকূল্যে বাংলাদেশে অনেক ছোট গল্প লেখা হয়। ভালো গল্পের সংখ্যা অবিশ্রুতি খুবই কম, আর তার সংগত কারণও আছে। ছোট গল্পের লেখক একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ঘটনাকে উপস্থিত করতে পারেন। কোনো চরিত্রের একটিমাত্র সমস্তার উপর তিনি তাঁর ষোলআনা মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য হন। অথচ সেই একটি ঘটনার সংগে যে আর পাঁচটি ঘটনার যোগাযোগ ও টানাপোড়েন আছে, চরিত্রের সেই একটি মাত্র সমস্তা যে আরো অন্তান্ত সমস্তার সংগে পরস্পর সংঘাতশীল, এ-সত্য কাহিনীতে অনুপস্থিত রেখেও লেখককে বুঝিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যেও একটি নিম্নতম জগৎ সৃষ্টি করতে হয়, যার মধ্যে পাঠক তাঁর ষোলআনা মনোযোগ আর অনুভূতি-প্রবণতাকে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হবেন।

ছোট গল্পে একটি নাটকীয় পরিসমাপ্তির উপর জোর দেওয়া হয়, আর সাধারণক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয়ও। কিন্তু সেই গল্পই শ্রেষ্ঠ যেখানে কোনো জনকালো পরিবেশ না থাকলেও পাঠক মনে কোনো ক্ষোভ বোধ করেন না। সেটা সম্ভব গল্প যদি ঘটনার উদ্দেশ্য উঠতে পারে। আর তা তখনই উদ্দেশ্য ওঠে যখন চরিত্রের গভীরে দৃষ্টিকোণ প্রধান হয়ে ওঠে।

ছোটগল্পের এই প্রয়োজনগুলির কথা মনে রাখলে ছোটগল্পকে নিশ্চয়ই সহজ-সাধ্য শিল্পকর্ম বলে মনে হবে না।

ছোট গল্পের সম্বন্ধে এই যে সামান্য আলোচনা করলাম এরই ভিত্তিতে যে আমি ‘অগ্রণী’র গল্পগুলোর আলোচনায় অগ্রসর হব তা নয়। কোনো পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এতজন বিভিন্ন লেখককে বুঝতে চেষ্টা করাটা একটু বিপজ্জনক কাজ। তবু উপরের কথাগুলো মনে রেখেই আমি আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

আলোচনার সুবিধার জন্যে আমি গল্পগুলোকে বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুযায়ী কতকগুলো শ্রেণীতে ভাগ করছি। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোনো গভীরতর তাৎপর্য আছে বলে অনুমান না করাই বাঞ্ছনীয়।

১৯৫১ সন্যাসবাস্তবের চিত্র। বেশির ভাগ গল্পই এইশ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু এর মধ্যেও দুটো উপবিভাগকে স্বীকার করা সুক্টিসংগত বলে মনে করি। কতকগুলি গল্প শুধুই দুর্দশাগ্রস্ত আধুনিক সমাজের বাস্তবকে চিত্রায়িত করেছে। আবার কতগুলো গল্প বাস্তবসচেতন মানুষ সাহস করে এমন পন্থা গ্রহণ করেছে যা হীন না হলেও এককাল পর্যন্ত সমাজ অনুমোদন করেনি। অর্থাৎ পরিবর্তনের চিত্র।

প্রথম বিভাগের মধ্যে পড়ছে বীরেন্দ্র নিয়োগীর ‘পর্দা’, কালচাঁদ চক্রবর্তীর ‘মাকি’ এবং ভানু দেবীর ‘হুপুর’।

পর্দা গল্পটি একজন দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যবিত্তের কাহিনী। লোকটি একটি বস্তির বাড়িতে বাস করত। সেখানেই আর্থিক অনটনের দরুন। একদিন তার এক বন্ধু বাড়িটা হঠাৎ ফেললে সেখানে থেকে সে প্রথমটার হল লজ্জিত। পরে খুব উৎসাহের সংগে প্রমাণ করতেন যে বাড়িটা বন্ধুকে সে এ বাড়িতে থাকে তা নয়। এ বাড়ির কতকগুলো সুবিধাও আছে।

অর্থাৎ বস্তিবাসীর সমাজ অর্ধনৈতিক পর্যায়ে নেমে এসেও মধ্যবিত্ত চেষ্টা করেন মাঝখানে একটা পর্দা টেনে দিয়ে নিজের অন্তর্মিত আভিজাত্যকে বজায় রাখতে।

‘মাকি’ গল্পটিতে এক মাকি আশা করেছে সে তার এক পরমাওয়ালা যাত্রীর কাছ থেকে বকেয়া দশটি টাকা পেয়ে তাই নিয়ে যাবে বৌ-এর কাছে। লোকটা একখানা নোট দিল ঠিকই এবং সে-ও খুশি হয়ে নিল সেটা, কিন্তু পরে দেখল সেখানা একটি ছ’টাকার নোট। অর্ধবানেরা গরীবের স্রাব্য টাকাটা সময় মত না দিয়ে যে কতখানি হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন এটা তার একটি বাস্তব চিত্র।

‘হুপুর’ একজন জেলের কয়েদীর গল্প। শুরুর ভাঙতে ভাঙতে সে সংগীর কাছে তার অতীত কৃষিজীবনের গল্প বলছে। কত ভালবাসত সে তার জমিকে কিন্তু সেই জমি জমিদার কেড়ে নিলেন বাকী খাজনার দায়ে।

এই তিনটি ঘটনাই আমাদের সমাজের অত্যন্ত পরিচিত বাস্তব চিত্র। বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পাঠকরাও রাতদিন আলোচনা করছি। সেইজন্তেই এসব নিয়ে স্বার্থক গল্প লেখা কঠিন। যা পাঠক নিজেই খুব ভাল করে জানেন তা-ই পড়ার ক্ষেত্রে পাঠক গল্প পড়েন না। তাছাড়া এ-ঘটনাগুলো এমন যে সোজাসুজি বললে এগুলো উপদেশের মত শোনায়। আর আধুনিক পাঠক এমন সুবোধবালক নন যে গায়েপড়া উপদেশ হজম করবেন। এসব অত্যন্ত পরিচিত জিনিস নিয়ে স্বার্থক গল্প লিখতে হলে এর মধ্যে এমন একটা দিক বের করতে হবে যা পাঠকের কাছে অভাবনীয়। অথবা জিনিসটাকে উপস্থিত করতে হবে কোনো চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে বা বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাতের ভিতর দিয়ে। কিন্তু তা হলেই সেই কথাই এসে যাক্কে, ঘটনাটা নয়, চরিত্রটার উপর বেশি প্রাধান্য দিতে হবে লেখককে।

দেবকুমার মৈত্রেয় ‘ব্রজকবচী’ এবং সত্যপ্রিয় ঘোষের ‘চিঠি’ও এই উপবিভাগের

অন্তর্গত ! গল্প দুটির মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে । ‘রক্তকরবী’ গল্পটিতে লেখক সোম্যের জীবনযাত্রার পাতাগুলো থেকে শুধু কয়েকটা তারিখ তুলে দিতেছেন, সে তারিখগুলোকে নিচে লাল কালিতে দাগ দিয়ে রাখা যায় । ক্যালিডোনেস্ক পের ছবির মত সোম্যের জীবনে পর পর কতকগুলো দৃষ্টটনা ঘটে যাচ্ছে । সোম্যের বাবা মারা গেলেন, সোম্যের বোঁ আত্মহত্যা করল, সোম্যের চাকরী গেল, সোম্যের বোন করবী দেহকে বাঁচাবার জন্যে দেহবিক্রয়ের সুলভ রীত্যাটি গ্রহণ করল, সোম্য হত্যা করল নিজের বোনকে, আর আত্মসমর্পণ করল পুলিশের হাতে । ছাত্রোদ্যোগ সামাজিক রোগ দারিদ্র্যকে চিত্রিত করার জন্য লেখক যে কাহিনী বিজ্ঞানের কৌশলটি অবলম্বন করেছেন তা উপভোগ্য এবং নাটকীয় । দারিদ্র্য নিয়ে এবং দারিদ্র্য যে ‘গুণরাশীনামী’ এ-নিয়ে বাংলাদেশে অনেক গল্প লেখা হয়েছে ; কিন্তু দারিদ্র্যকে সামাজিক ব্যাধি হিসাবে চিত্রিত করার জন্য বর্তমান লেখকের এই প্রয়াসও নতুন । লেখক তাঁর গল্পে তাই নিজেকে নৈরাশ্রবদী এবং অদৃষ্টে বিশ্বাসী বলে প্রতিপন্ন করেছেন ; কিন্তু এটা হরতো তাঁর মনের অভীপ্সা ছিল না । মোটা হরকের অমূল্যকালো নাটকীয় ঘটনার সাহায্যে কাহিনীকে উপস্থিত করার চেষ্টা লেখকের অন্তর্ভুক্তও দেখেছি । কিন্তু এই ঘটনাগুলোর পিছনের যে অনুচ্চারিত ইতিহাস লেখকের মনে আছে, পাঠক যাতে সেইটেই অত্রাস্তভাবে অনুমাণ করে নেন, লেখক তার জন্যে যথেষ্ট সতর্ক নন । এই নাটকীয়তাব্রীতি বাস্তববাদের বিরোধী এবং মূলত রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত । ঘটনার শেষ পরিণতির চেয়ে ঘটনাগুলিই বাস্তববাদীর কাছে বেশি প্রয়োজনীয় ।

সত্যপ্রিয় ঘোষের ‘চিঠি’ গল্পটিতে লেখক তাঁর স্বভাবমূলত হাকা রচনাতঃগীতে মধ্যবিস্ত পদ্বিবারের একটি মধ্যান্তিক চিত্র উপস্থিত করেছেন । জামাই তাঁর চিঠিতে জানিয়েছেন, তাঁর বোঁএর চিঠি তার নিজের লেখা কিনা এবিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে । তাই নিয়ে শান্তভী জামাই-এর উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠেছেন, মেয়ে সামনে উপস্থিত জেনেও । আবার এই মা-বাবার মেয়ে বেখানে আছেন সেখানে তাঁরা অবস্থিত, এবং তা নিয়েও একটা জটিল দ্বন্দ্ব এবং অবিবাহের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে । এক কথায় একটা সামান্ত বৈঠকী আলাপনের মধ্যে একটা গোটা পরিবারের ইতিহাসের যে দ্বন্দ্ব, স্বার্থপরতা, অবিবাহ, আর বিবাহের কাহিনী জমে রয়েছে তা অল্প তৎপরতার সংগে উপস্থাপিত করা হয়েছে । একটি লঘু আবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক মধ্যবিস্তময়াজের জটিল গ্রন্থিগুলোকে উন্মোচন করে ধরায় লেখক যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য । গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট গল্প হতে পারত, যদি লেখক ইংরাজিতে থাকে বলে ‘কিনিস’ সেইটে সম্পর্কে আর একটু অবহিত থাকতেন । যদি ভাষা সম্পর্কে আর একটু সতর্ক হতেন, এবং বৈঠকে উপস্থিত চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক রূপায়নের দিকে আর একটু নজর রাখতেন ।

দ্বিতীয় উপবিভাগটিতে পড়ছে মিহির মুখোপাধ্যায়ের ‘নিচু আকাশ’ এবং ‘ভুল হিসাব’ । ও নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ‘উত্তরবরণ’ ।

‘ভুল হিসাব’ গল্পটিতে একজন পুরোহিত অনেক দারিদ্র্যের মধ্যেও তাদের পৈতৃক

প্রথা। অল্পস্বামী ঠিকুজী কুটীর বিচারের জন্ত পয়সা নেন না। কিন্তু একদিন তাঁকে এই অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে পয়সা নিতে হল। লেখক পরিবর্তিত বাস্তবকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত এই তত্ত্বটাই উপস্থিত করতে চেয়েছেন গল্পে। কিন্তু গল্পের নামকরণে যে তাৎপর্য রয়েছে তা কাহিনীতে ঠিক প্রতিকলিত হয়নি এই জন্তে যে পরিবর্তনের স্বীকৃতি এসেছে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে, নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নয়। পরিবর্তিত বাস্তবের স্বীকৃতির মানসিক ইতিহাসটা কাহিনীতে রূপায়ন করা খুব কঠিন কাজ বলে এ নিয়ে বাংলাদেশে খুব কমই ভাল গল্প লেখা হয়েছে। লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

‘নিচু আকাশ’ গল্পটিতে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে অর্থ উপার্জনের পথে পা বাড়তে চাইছে আর তাই নিয়ে ঘরের লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বিষয়নস্তুটা অপেক্ষাকৃত পুরোনো বলে চরিত্র চিত্রায়নের দিকে আর একটু মনোযোগ দিলে ভাল হত। এ গল্পটা প্রথম গল্পটার মত ভাল হয়নি, তবে যে জিনিসটা লেখক এই গল্প দুটোর মধ্যে চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন, সেটা নিয়ে আরো পর্ববেষ্টিত কাহিনী চালালে তিনি হয়তো পরে আরো কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন।

উত্তরণ গল্পটি একটি দুর্দশায় পতিত পরিবারের মেয়েকে নিয়ে। প্রতিবেশীরা এবং পরিচিতরা একরকম ধরে নিয়েছে মেয়েটি ভদ্র মেয়ের জীবন-যাত্রা ছেড়ে আর এক ধরনের জীবন-যাত্রার পথে নেমে এসেছে, এবং ওকে সহজলভ্য ভাবে চারদিক থেকে লোভী হাত বাড়িয়েছে উপবাসী চাতকের দল। একদিন মেয়েটি সম্পর্কে শেষ ভরসাও চূর্ণ হল, জানা গেল একটি ছেলের সংগে সে উধাও হয়েছে; তার জীবনের একটি অধ্যায়ের উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ল এতদিনে। কিন্তু—এইখানেই গল্পের সূচরুর নাটকীয়তা—অনেক প্রসাদ লোভীর নৈরাশ্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার হল, মেয়েটি পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক পথে একটি ছেলেকে বিয়ে করে তার সংগে। ছেলেটি জাতিতে নিচু; তবু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মেয়েটি জাতিসংস্কারের উদ্দেশ্যে উঠতে পেরেছে। এই বহুলাংশে সার্বিক গল্পটিতে লেখক একটি ক্রটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েটি নিচে নেমে এসেছে এই চেতনার থেকে সে মুক্ত নয়। কিন্তু লেখক যদি এই দৃঢ়চিত্ত সাহসী মেয়েটির চরিত্রকে গোড়া থেকে আর একটু মনোযোগ দিয়ে চিত্রিত করে তুলতেন তবে অনায়াসে দেখাতে পারতেন, মেয়েটির আপাত অবতরণ আসলে বৈষম্যহীন সুস্থতর সমাজ জীবনের পক্ষে সহায়ক। মেয়েটির পূর্ববর্তী স্থলিত আচরণটা স্বর্ধবোধক, সাধীরা তার অর্থ করেছে অধঃপতনের ইংগিত বলে; কিন্তু আসলে সেটা মেয়েটার আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণের আকৃতি। এই চমৎকার নাটকীয় দ্বৈততাকে (dualism) লেখক না ধরতে পেরেছেন এমন নয়। কিন্তু জিনিসটাকে আরও অনেক চমৎকার করে তিনি উপস্থিত করতে পারতেন। এককথায় লেখক একটি ভাল গল্পের মালমশলা নিয়েছিলেন; কিন্তু চিত্রায়নে তিনি বঞ্চিত যত্ন নেননি।

২। নরনারীর সম্পর্ক-ঘটিত গল্প। এই জিনিসটাকে একটা ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলার মানে এই নয় যে, জিনিসটা সমাজবাস্তবের বাইরের কিছু। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রের এই

অতি-প্রিয় বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব বিবেচনা করলে এটাকে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যৌক্তিক। আর বিশেষ করে সমাজবাস্তুবকে ফাঁকি দিয়ে বস সৃষ্টি করতে হলে এর চেয়ে ভাল বিষয়বস্তু আর নেই।

প্রথমেই নাম করতে হয় গুণময় মান্নার লেখা 'দাঁড়কাকের কাটুয়' নামক বড় গল্পটির। ছ'কোড়া মিলনাস্ত প্রেম এবং তার অন্তর্বর্তীকালীন ভুল-বোঝা বুঝি, এই হল এ-গল্পের বিষয়বস্তু। অনেকটা ববীন্দ্রনাথের 'গোড়ার গল্প' গোছেব গল্প। গল্পটার মধ্যে একটা ভাল সম্ভাবনা ছিল; লেখক সেটাকে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেননি। এ-গল্পের নায়ক নায়িকারা প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে আহ্বির করার জন্যে, বা নিছক ভাবানুভূতির জন্যে, একটু আঁধাটু সৌখীন গোছেব রাজনৈতিক কর্মের মধ্যে ঝুঁকে পড়েছে। রাজনীতি চর্চার জন্যে যে আর একটু দৃঢ়তর ভিত্তির দরকার আছে এই জিনিসটা প্রতিপন্ন করার জন্যে যদি উপরোক্তদের একটা ব্যাংগাস্থক চিত্র উপস্থিত করতেন লেখক তবে গল্পটা উপভোগ্য হতে পারত। কিন্তু লেখকের নজর প্রেমের কাহিনীটার দিকে। আর এসব কাহিনীতে সাধারণত বা হয়, কাহিনী এগিয়ে চলেছে শ্রেফ কতকগুলো accident বা দৈবাৎ-ঘটনার ভিত্তির দিকে। পাঠকের মনে সূড় সূড়ি দেওয়াই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে চরিত্রচিত্রায়নের দিকেও তিনি মনোযোগ দেননি। লেখক মনে রাখেননি যে লঘু গল্প ভাল সাহিত্য হতে পারে শুধু তখনই যখন লেখক নিজে সেই লঘুতার উদ্দেশ্য থাকেন। লেখকের পূর্বপ্রকাশিত রচনাগুলি তাঁকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছিল এই গল্পটা সেই আসনের বিস্তারকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেনি।

পরবর্তী আলোচ্য আশীষ বর্মণের চিত্রনাট্য 'নিরুদ্ধেণ'। শিল্প-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে লেখাটিতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আছে। লেখকের মাত্রাবোধ, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গনা-দানের ক্ষমতা, সিনেমার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে স্থানীয় কতৃহল সৃষ্টি করার ক্ষমতা, লেখাটাকে উপভোগ্য করে তুলতে সাহায্য করেছে। চিত্রনাট্যটির কাহিনী একটি একরোখা যোগেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মায়ের অনুমোদিত পুরুষকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে মায়ের রাগের সময়ের আদেশকেই আক্ষরিকভাবে পালন করেছিল সবিতা। বাড়ি থেকে বের হয়ে সে প্রথমে গিয়েছিল তার প্রেমাস্পদের কাছে। প্রেমাস্পদ এই বাড়ি থেকে পালানোর ব্যাপারটার উপর কোনো গুরুত্ব না দেওয়ায় নিজের অজান্তসারে সে সবিতার মনের আকাশ থেকে ঝসে পড়ল। সবিতা গিয়ে উঠল ট্রেইনে; এবং নানা অবাস্তব ঘটনার মধ্যে পড়ে সে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল বিনয়বাবুর অকুণ্ঠ সাহায্য ও আশ্রয়দানের ফলে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে বিনয়বাবুর প্রতি সবিতার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেল, এবং সেই পক্ষপাতিত্ব অপরাধের স্বীকৃতি লাভ করে খত্ব হল। এই কাহিনীতে একরোখা সবিতার এবং সংস্কৃত, রুচিবান বিনয়বাবুর চরিত্রের দুটি ছবি পাঠকের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই চরিত্র চিত্রায়ন অগভীর, এবং শেষ মন দেওয়া-নেওয়ার দৃশ্যে তাদের মনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গনার অভাব। এই ক্রটির জন্যে দায়ী লেখকের কাহিনী পরিকল্পনা বা পাঠকের কাছে

প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ওঠেনি। সমাজ যখন নিস্তরঙ্গ থাকে, যখন মানুষ মানুষকে সহজভাবে বিশ্বাস করে, শুধু তখনই মাত্র কয়েক বণ্টার আসাপের ভিতর দিয়ে প্রেম জন্মলাভ করতে পারে। কিন্তু আধুনিক সমাজ বিক্ষুব্ধ, অশান্ত। এই সমাজে প্রত্যেক মানুষকে প্রত্যেক মানুষ সন্দেহ আর অবিশ্বাসের চোখে দেখে। সমাজজীবনে চলাফেরা করার সময় প্রত্যেক মানুষই মুখে একটা করে মুখোশ এঁটে নেন, এবং আরও মুখিলের কথা এই যে, এই ওস্তুটা সকলের জানা। সবিতার মত মানুষ মেয়ে, যে ইতিপূর্বেও প্রেম করেছে, এবং নিঃসন্দেহে অনেক পুরুষের সংগে মিশেছে, সে নিশ্চয়ই আধুনিক মানুষের এই ঘোমটা-ঢাকা রূপটির খবর রাখে। বিনয়বাবুর কয়েকঘণ্টার ব্যবহার মত ভালই হোক, তাই যে তার সত্যিকারের প্রকৃতির পরিচয় বহন করেছে এ কথা বিশ্বাস করার মত মেয়ে সবিতা নয়। কাজেই আধুনিককালের গল্প হিসাবে এ গল্প প্রত্যয়সিদ্ধ নয়। আর কালের প্রশ্ন যদি নীতুলি, তবে এ গল্প তো পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। এমন ধরনের গল্প বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে অনেক লেখা হয়েছে। আর সেরকমটা না হয়ে উপায়ও নেই। যে-প্রেমের গল্প বা অন্য যে কোন গল্পকে লেখক যদি তাঁর কালের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত না করেন, তবে তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি না হয়ে উপায় নেই। মানুষের কল্পনা সীমাবদ্ধ; প্রাকৃতিক কল্পনার সীমা নেই। প্রত্যেকটা যুগই অভিনব, সেই যুগের অভিনবতাকে গ্রহণ না করলে মানুষের প্রত্যেকটি শিল্পকর্মই একবোঁয়ে হয়ে উঠত।

সত্যেন্দ্র আচার্যের 'একাংকিকা' এবং বীরেন্দ্র নিয়োগীর 'হৃতগরল'; এই দুটোই প্রায় একই ধরনের গল্প। প্রেম যে একান্তভাবেই অর্থনৈতিক বিবেচনার উপর নির্ভরশীল তাই প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা রয়েছে দুটি গল্পেই।

'একাংকিকা' গল্পের মূলভা শুনেছিল লাতু কোথায় ছবি আঁকার কাজ করে। যখন সে জানতে পারল সে আসলে এক অফিসের বেয়ারা মাত্র তখন সেই মিথ্যাবাচনের অপরাধে অপরাধী প্রেমাস্পদের উপর তার আর বিতৃষ্ণার অবধি রইল না। অবিভি বলা বাহুল্য আবিষ্কারটা যদি উণ্টো রকমের হত, অর্থাৎ লাতুর কাজটা ছবি-আঁকার কাজের চেয়েও অধিকতর কৌশল্য গৌরব থাকত, তবে এই মিথ্যাবাচনের জন্য অনুরাগের পরিমাণটা বরং বৃদ্ধিই পেত। কাজেই বিতৃষ্ণার কারণটা মূলত অর্থনৈতিক।

'হৃতগরলে' বিধবা হরিমতী যখন বেকার আশ্রয়হীন, তখন আশ্রয়দাতা সত্যের প্রতি তার আসক্তি আর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। চাকরী পাওয়ার পরে কিন্তু তার আসক্তি অনাস্রাসে পাত্তাস্তবিত্ত হল। যখন সে পুনরায় বেকার হয়ে পড়ল, তখন আবার সত্যের দিন এস।

প্রেম জিনিসটার সংগে রোমাণ্টিকতা কল্পনার জাল বুনে বুনে তাকে প্রায় বর্ষ আর দ্বিধরের কাছাকাছি পর্ষায়ে নিয়ে গিয়েছেন। প্রেমের এই কল্পনা নিশ্চয়ই সত্য নয়; মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর প্রেম নিশ্চয়ই নির্ভরশীল। তবু গল্প দুটি স্বার্থক হয়ে ওঠেনি লেখকদের ঘটনা বিশ্বাসের মূলভার দরুন। প্রেমের অর্থনৈতিক নির্ভরতাকে লেখকদের মত রেখায় চিত্রিত করেছেন বাস্তবে জিনিসটাকে অত সোজামুজি দেখা যায়না। অসম-অবস্থার

মানুষদের মধ্যে অনেক প্রেমের ঘটনা ঘটে, এবং সে-প্রেম যে কখনোই টেকে না এমনও নয়। আধুনিক সমাজে প্রেম একটা অতি জটিল ব্যাপার। এটা মানুষের দ্বিতীয় প্রধান জৈবিক বৃত্তি এবং অন্তত দু'জনের মরিকানা ছাড়া এ-জিনিসটা কখনোই সম্ভবপর হয় না বলে সমাজের স্বত জটিলতা আর পংকিলতা এর উপর প্রতিফলিত হয়। কাজেই প্রেম-সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করতে হলে বাস্তব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তা না করে শুত্র মাস্টিক সরলতার সংগে প্রেমের ব্যাপারকে উপস্থিত করলে পাঠকদের প্রত্যয়বোধে বিষ আশংকা ঘটে, এবং অনাবশ্যকভাবে লেখকের 'শৌনিক' মনোবৃত্তিটা অনাবৃত হয়ে পড়ে।

প্রেম-জাতীয় গল্পগুলোর মধ্যে সত্যপ্রিয় ঘোষের 'নীতি' গল্পটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিপূর্বে এই লেখকের আর একটি গল্প 'চিঠি'র আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করেছিলাম মধ্যবিত্ত পরিবারের জটিল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আর রিক্ততাকে খুব সহজে উপস্থিত করার যোগ্যতা আছে লেখকের। এই গল্পে আর একবার করে তার প্রমাণ মিলল। কাহিনীর বিষয়বস্তু হল, এক পরিবারের কয়েকটি মেয়ে বাইরে কাজকর্ম করে বা পড়াশুনা করে, আর অবসর সময়টা স্বামী শিকারের প্রচেষ্টায় ব্যয় করে। এদের কনিষ্ঠ বোন নীতি দিদিদের স্বামী শিকারের দৌত্য কার্যে অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী। সে তার এক দিদির জন্ত কেশনসপের থেকে গল্পের নায়ককে প্রাইভেট শিক্ষক হিসাবে ছুটিয়ে এনেছে; এবং তাদের একান্ত সং অভিপ্রায়টি হল শিক্ষক আর ছাত্রীর মধ্যে চার হাতের মিলনের কাজটি ঘটিয়ে দেওয়া। পরিবারটির মধ্যে সংস্কৃতির অভাবের দরুন নায়ক তাদের অভিপ্রায়টি সহজে ধরে ফেলে এবং স্বধার্মীতি ক্রমসংগত রাগে স্থানত্যাগ করে। কিন্তু নীতির দৌত্য নৈপুণ্যকে ধন্যবাদ, নায়ককে শিগগিরই আবার জালের মধ্যে এনে ফেলা হয়, এবং বিয়ের ব্যাপারটাও পাকাপাকি হয়ে যায়।

প্রেম জাতীয় কোনো দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র ইংগিতও সেখানে নেই, সেখানে গল্পের এই পরিসমাপ্তিটা একটু বিম্বিত করে। বোকা যায় গল্প লেখায় লেখক ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর পথ ধরে চলার পক্ষপাতী। কিন্তু শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত রাস্তাটিই সবসময় নিরাপদ রাস্তা নয়। তাছাড়া আগের গল্পটির ক্ষেত্রে যা বলেছিলাম, এ গল্পটিতেও 'ফিনিসের' অভাব আছে। সামান্য সামান্য ছোটখাটো ক্রটির জন্ত একটা গল্প তার সম্ভাবনার শেষ প্রান্তে উন্নীত হতে পারে না, এটা আপশোষের কথা।

৩। রোমান্টিক গল্প। রোমান্টিক শব্দটাকে অবিম্বিত এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি। জন্মকালো এবং চমকপ্রদ বিষয়বস্তু নিয়ে যে-সব লেখা হয়েছে আমি সেগুলোকেই রোমান্টিক গল্প হিসাবে এখানে শ্রেণীবদ্ধ করছি। দেবকুমার মৈত্রেয় 'শোক', নমিতা দত্তের 'প্রদীপের তলে' দেবকুমার মৈত্রেয় 'স্বাক্ষর', প্রভৃতি গল্পকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলে।

'শোক' গল্পটিতে কোন কার্যের জনপ্রিয় ম্যানেজারের মৃত্যুতে নায়কের ম্যানেজার হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। ম্যানেজারকে নায়কও ভালবাসত, কিন্তু তার শোক-

প্রকাশটা তবু কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। লেখক এখানে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সুখ দুঃখের আপেক্ষিক দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এ পথে না গিয়ে লেখক যদি দেখাতে পারতেন যে নায়কের শোক বোধটা যেমন আস্তরিক, তার নতুন পদোন্নতির সম্ভাবনায় তার আনন্দ বোধটাও তেমনি আস্তরিক, তবে মানব-প্রকৃতির একটি গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারতেন। মানুষের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার অনেক ঘটনাকেই গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের বিপরীত মনোভাবটাও একই সংগে মনে উপস্থিত রয়েছে। এটা মানব প্রকৃতির ডায়ালেক্টিকসের একটি প্রমাণ। বোধ করি রবীন্দ্রনাথই ভিন্ন ভাষায় এক জায়গায় বলেছেন, গভীর দুঃখ নিজেই নিজের সাস্থনা নিয়ে আসে।

নিছক একটি ঘটনার নাটকীয়ত্ব যে-গল্পের একমাত্র উপজীব্য, সে-গল্প কখনোই খুব উচ্চস্তরের শিল্পকর্ম হতে পারে না। লেখকের নাটকীয়ত্বের মোহের উচ্ছেদ ওঠা প্রয়োজন।

দেববাবুর 'রাজসূয়' গল্পটি সত্যিই গল্পের বাজারে রাজসূয় যজ্ঞের অভিশাপ নিয়ে আসরে নেমেছে। গল্পটির বিষয়বস্তু খুবই চমকপ্রদ, আর প্রায় 'ঈডিপাসের' গল্পের মতই লোমহর্ষক। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ তার অসামান্য রূপসী বৌকে খুবই ভালবাসতেন। রাজা যখন তখন তার ভালবাসাটাও খুবই হওয়া স্বাভাবিক। সেই বৌ যখন দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আর অংগহীন হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না, তখন সেই খুব ভালবাসার ঋতিরেই রাজা তাকে হত্যা করলেন। নিখুঁত সুন্দরীর অংগহীন বিকৃত ধ্বংসাবশেষকে বাঁচিয়ে রেখে ভালবাসার জীবন্ত সমাধি রচনা করতে চাইলেন না প্রেমিকশ্রেষ্ঠ।

ভালবাসার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থায় এই ধরনের জিঘাংসাবৃত্তি নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থনীয় কিনা খুব সম্ভব লেখকের সেটা সমস্তা নয়। ভালবাসার মনোবৃত্তি মানুষকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে কিনা তার মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও লেখকের উদ্দেশ্য নয়। ভালবাসা যদি এই রকমের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ব্যাপারটা কী চমৎকার জয়কালোরকমের চমকপ্রদ জিনিস হয় লেখকের সেইটেই উপজীব্য বিষয়। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-পাঠক নিছক ঋণিকটা চমক অবেষণ করে বেড়ায় আমি তার দলের নই।

'রাজসূয়' যেমন, তেমনি প্রদীপের তলের গল্পটির মত গল্পও বাংলা দেশে অনেকবার অনেকভাবে লেখা হয়েছে। কোনো মেয়েকে মন্দিরের সেবাদাসী করে নিয়ে মন্দির রক্ষকের অটবধ যৌন জীবন যাপনের মধ্যযুগীয় ঘটনাটি এই গল্পটির বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তু পুরানো বলে এ-সব গল্পের এখন চমক লাগানোর ক্ষমতাও নিঃসন্দেহে হ্রাস পেয়েছে। কাজেই এ গল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা করা অনাবশ্যক।

শ্রী আশীষ বর্মণের 'স্মার উইলিয়াম পাওয়েল' গল্পটি চমকপ্রদ এবং চিন্তাকর্ষক। গল্পটির কাঠামোর মধ্যে একটু কৃত্রিমতা আছে, অনেকটা সুবোধ বোধের গল্পের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। কৃত্রিমতার উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর নাটকীয়তাকে আরও ধারালো করে তোলা এবং তাতে যে আশীষবাবু কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন এ কথা নিঃসন্দেহ। গল্পটার মধ্যে

দেখানো হয়েছে কী ভাবে স্বাধীন ভারতে ইংরেজদের দাপট আর অহংকার নবজাগ্রত জাতীয় সন্ত্রম বোধের কাছে হার মানছে। এক সাহেব কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার মর্মমুতি অবহেলিত হয়ে পক্ষীর পুরীষ নিক্ষেপের অন্তান্ন হয়ে উঠেছিল মর্দানে। ম্যানেজার তাকে অফিসের সামনে স্থাপন করে তার মান রক্ষা করলেন! কিন্তু একদিন যখন সাহেবের অপমানের প্রতিবাদে সারা অফিসের কর্মচারীরা বিক্ষোভ আর প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তখন ম্যানেজার দেখলেন সেই মর্মমুতিটি দিকি বিক্ষোভকারীদের বক্তৃতামঞ্চের কাছ করছে।

৮. যে গোরবটা হারিয়ে গেছে, কোনরকমে একটা সুযোগ এঁটে অন্তর বাইরের দৃষ্টে সেটাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টাটা সরস ব্যাংগের ভিতর দিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন লেখক। কিন্তু লেখটার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে ম্যানেজারের শেষ কথা কয়টি—‘Good Lord! even the old chap is helping them’—এর মধ্যে কতখানি তাৎপর্য আছে তার উপর। খানিকটা তাৎপর্য আছে—সেটা কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কথাটার মধ্যে কি এমন তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে যে একদিনের গোরবের আরক চিহ্ন আর একদিনের অগোরবের ভিত্তি রচনা করে,—এম্মি করেই ইতিহাস প্রতিশোধ নেয়? এমন ধরনের কোনো তাৎপর্য যদি পরিস্ফুট হয়ে থাকে তবে তা গল্পের উৎকর্ষকে বাড়িয়ে তুলেছে (অবিশিষ্ট প্রসংগত বলা ভাল, গল্পের এই বিস্তারিতটি উপভোগ্য হলেও এটাকে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করাটা নিরাপদ নয়। নাটকীয়তা ঐতি অনেক সময় লেখককে সত্য বিকৃতির পথে প্রলুব্ধ করতে পারে।)

ভারাপদ কর্মকারের ‘গৃহপালিত জন্তু’ গল্পটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভব্দের উপরে লেখা। কাহিনীটার পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কয়েকটি বিভ্রাটও অন্তর্গত বলে গল্পটিতে রূপক কাহিনী আর পশুর কাহিনী সমন্বয় ঘটেছে। সেইজন্যই এটাকে জমকালো গল্পের শ্রেণীভুক্ত করেছি। রূপক আর বাস্তবের সংমিশ্রণটা বাস্তবীয় নয় এইজন্য যে রূপক লেখক মানুষের তত্ত্ব প্রাধান্যের আরক, অথচ বাস্তব কাহিনীতে তত্ত্ব থাকলেও সেটা আসে পিছনে পিছনে। রূপকটুকু গল্পটাকে অভিনব দান করেছে; কিন্তু তা ছাড়া এর আর কোনো তাৎপর্য চোখে পড়ছে না। শুধু অভিনবত্বের জন্যই অভিনবত্বের গুরুত্ব খুব বেশি কি?

আলোচনা শেষ করার আগে লেখকদের কাছে আমার একটি বক্তব্য আছে। দেখছি এক আশীষ বর্মন বাদে আর প্রায় সব লেখকই ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক নন। এমন নয় যে ভাষার সঠিক ব্যবহারটা তাঁরা জানেন না। কিন্তু তাঁদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে কথাসাহিত্যে ভাষার অভিনবত্ব না দেখাতে পারলে লেখা জমে না। অনেক সময় তাঁরা সার্থকতার সংগে ভাষার মধ্যে শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এক আধ সময় তাঁরা ভাষা স্ফটকে একেবারে গাড্ডায় নিয়ে ফেলেন; আর সেই সংগে তাঁদের অনেক বারের স্বার্থক প্রয়োগও সেই গাড্ডায় তলিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আমার মনে হয়, একটি পুরোনো অবহেলিত নীতিকে অনুসরণ করাই নিরাপদ। ভাষা ভাবের বাহন; তাই যখন ভাবের গভীরতাকে প্রকাশ করার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে শুধু তখনই ভাষার কোণাল বা অলংকারাদির প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য। অর্থময়তাই ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এক বছরের প্রচেষ্টার ‘অগ্রনী’ অন্তত দু’ তিনজন সম্ভাবনাময় লেখককে উপস্থিত করতে পেরেছেন। সাহিত্যের বর্তমান বাজারে এককটি নেশাও উপেক্ষণীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও অগ্রগতি

শ্রীঅমিত সেন

সমসাময়িক বাঙ্গালীর মানসিক বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কতখানি স্থান পূর্ণ করেছিলেন তার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় দেশব্যাপী এই অমূল্যত্বিত্তে যে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অবসানও অকালমৃত্যুর মতন অসহনীয়। বাস্তব জীবনে অথবা তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাদের তাঁকে নিত্যস্ত কাছে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, আজ রবীন্দ্রনাথের অভাব তাঁদের পক্ষে অতি আপন জনকে হারাবার দুঃখের সমতুল্য। কিন্তু সে-গতির বাইরের বিরাট বাঙ্গালী জনসাধারণও এই শোকের অংশীদার। এই অগাস্টের সুবিশাল জনতা এর সাক্ষ্য দিয়েছিল—সে-জনসমুদ্রের বিশৃঙ্খল ব্যবহার আমাদের জাতীয় দৌর্বল্যের পরিচায়ক, কিন্তু আন্তরিক আবেগই যে তাঁর মূল প্রেরণা ছিল, এ-কথা অস্বীকার করা অসম্ভব হবে।

বাংলা বা ভারতের জীবনে রবীন্দ্রনাথের সার্থক প্রভাব সম্বন্ধে বিচার এখন সম্ভব নয়, কিন্তু সে স্বীকারোক্তির পরও আমরা এ-সম্বন্ধে না ভেবে এবং আলোচনা না ক'রে থাকতে পারি না। অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাই এই বিষয়ে চিন্তা ও চিন্তাকে রূপদান চারদিকে দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন জটিল ব'লেই এখানে উত্তরের খসড়া প্রয়োজনীয় হ'তে পারে—tentative আলোচনাও সেইজন্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং সে-চেষ্টায় নিজেদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হওয়াই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত প্রবন্ধের বস্তার এই বোধ হয় যথেষ্ট কৈফিয়ৎ।

আজকের দিনে অগ্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কতখানি, সম্প্রতি অনেকের মনেই এ-প্রশ্ন উঠেছে। দশ বা পনের বছর আগে বাংলাদেশ তাঁকে হারালে নিশ্চয়ই এ কথাটা এতখানি মনকে নাড়া দিত না। ইতিমধ্যে এক নতুন হাওয়া, নূতন এক চিন্তাধারা দেশে বইতে আরম্ভ করেছে। অগ্রগতি কথাটা অনির্দিষ্ট, তার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিপুল পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই বোধ হয় অগ্রগতির সব চেয়ে নিরপেক্ষ ও নিবিশেষ প্রতিশব্দ। কিন্তু ঘটনাচক্রে সারা জগতে আজ এর একটা বিশিষ্ট আধুনিক রূপ ফুটে বেরিয়েছে। আজকের দিনে অগ্রগতির স্বার্থ বাস্তব রূপ হচ্ছে সাম্যবাদের আকর্ষণ, সাম্যত্বের প্রস্তুতি। শ্রেণীবর্জিত নূতন সমাজ গঠন আমাদের দেশেও বহু নরনারীর কাম্য হ'য়ে উঠেছে, তাই পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরানো ধারণাগুলি অনেকাংশে স্তান হ'য়ে আসতে বাধ্য। এটা ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের কথা, এখানে বিভিন্ন সংজ্ঞার মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের দেশে অগ্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নির্ণয় করতে হ'লে তাই আজ এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় থাকা অত্যাৱশ্যক। ভুল বোঝার সম্ভাবনা যাতে

ক'মে আসে সেইকাল প্রথমেই এই ভাবে অগ্রগতির সংজ্ঞানির্দেশ করা। লেখকের প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, দেখতে হবে দেশে গত অর্ধ শতাব্দীর পরিবর্তন-ধারা এবং আগামী কালের উপর তাঁর প্রভাব কতখানি, এবং আমার বিশ্বাস সেই দেখাতে সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নেওয়া অনিবার্য। শুধু রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশ্লেষণ এখানে উদ্দেশ্য নয়, কারণ একথা বোঝা সহজ যে বিরাট প্রতিভাও যুগধর্মের বিরোধী হ'তে পারে।

আমার সাম্যভাবাপন্ন বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ দেখতে পাই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রামাণিক আচার্যদের লেখায় সাহিত্য বা শিল্পের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দর্শন, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতিই তাঁদের প্রধান আলোচ্যবস্তু ছিল। আজ তাই একদিকে শুনি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিতের কবি ছিলেন, জনসাধারণ এমন কি প্রলেটেরিয়াটের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় যোগ ছিল। অন্যদিকে একথাও শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়াধর্মী আভিজাত্যের প্রতীক, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বললেও বিশেষ অস্বস্তি হয় না।

উপরোক্ত উভয় মতের মধ্যেই কিছু সত্য রয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। সূত্রান্ত সমস্তা এই যে আংশিক সত্যগুলিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ায়। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই লক্ষ্য করবেন যে এই পদ্ধতিই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের স্বরূপ। সাম্প্রতিক সাম্যভাবের প্রাণবন্ত যে-মার্কসবাদ, বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এমন কি রাশিয়া-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বয় অবধি তাঁকে সেদিকে টানতে পারেনি। কিন্তু এই সর্বস্বীকৃত সত্যটি আমাদের প্রশ্নের উত্তর নয়। সামাজিক চেতনার যে-স্তর থেকে মার্কসপন্থার উদ্ভব, তার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হ'লেও কোনো চিন্তা বা কর্মধারা যে পরিবর্তন অথবা প্রগতির সহায় হ'তে পারে, এমন দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে বিরল নয়। মার্কস-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এটা একটা খুব বড় কথা। অতীতে প্রগতির রূপ নির্দেশের সময় এই সূত্রটি বিশেষ কার্যকরী হ'তে বাধ্য; আর মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেকখানিই সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তের চাইতে অতীত কাহিনীরই পর্যায়ে পড়ে। সমসাময়িক ইতিহাসেও অবশ্য তাঁর স্থান রয়েছে, কিন্তু এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থাৎ সমগ্র দেশের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা কোন স্তরে পৌঁছেছে তা' স্বরণ রাখতে হবে। লেনিনের ভাষায় ডায়ালেক্টিক্সের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হ'ল বহুমুখী বিচার। এর অভাবে অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একদেশদর্শী হ'য়ে পড়বে। আলোচ্য প্রশ্নের এক কথায় কাটাছাঁটা উত্তর তাই অসম্ভব ব'লেই মনে হচ্ছে।

আমি নিম্নে মনে করি যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রগতিবিরোধী ধারণার অসম্ভাব নেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে তাঁকে অগ্রগতির সহায়ক-রূপেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কিছুদিন আগে যখন ভারতীয় সাম্যবাদী দল তাঁর উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল তখন তার পিছনে সাময়িক উচ্ছাস বা ভ্রান্ত যুক্তি ছিল ব'লে

মনে হয় না। যে-বিশ্লেষণের উপর আমার এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তার কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়াই এই এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই মনে পড়ে যে প্রগতিবাদী মহলে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে Progressive মনোভাব আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকে বিশেষ কয়েকটি রচনার উপর অবধা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বহুকাল আগেকার ‘এবার ফিরাও মোরে’ ও অতি-আধুনিক ‘আরোগ্যে’র দশ নম্বর কবিতার উল্লেখ চলে। প্রথম কবিতাটির গোড়ায় মৃত স্নান জনগণের মুখে ভাষা দেবার সংকল্প আছে, কিন্তু তার পরিণতিতে যে-বিশ্বাসের ছবি দেখতে পাই তার মধ্যে প্রধান কথা হচ্ছে অজানা বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতাকে বলিদান দেওয়া। তেমনি ‘আরোগ্যে’র কবিতাটির সারমর্মও এক অতি পুরাতন সত্য—শত শত সাম্রাজ্য ওঠে, আবার নিশ্চিহ্ন হ’য়ে যায়, কিন্তু যারা কাজ করে সেই জনসাধারণ চিরকালের। মনে রাখতে হবে যে এই জাতীয় সমস্ত লেখা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মহত্ব খর্ব হয় না, এমন কি এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্থক্য রচনার মধ্যে গণ্য নাও হ’তে পারে। সকল মহাকবির মতন রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নানা কল্পনা মূর্তি পেয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ কোনও একটি moodএর দিকে অতি-মনোযোগ সঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদের কথাও আসে। এখানেও আমরা শিল্পীর ঈপ্সিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই মাত্র, প্রগতি বা যুগান্তরের কোনও কথা এখানে ওঠে না। • নিহক সামাজিক অত্যাচার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্যরচনায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বরণ রাখতে হবে যে এই প্রবন্ধে প্রগতির সাম্প্রতিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞাটুকুই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে। তাই আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনও লেখার নিবিড় যোগ দাবী করা চলে না।

মুখ্যতঃ কবি হ’য়েও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনও নিজেকে সাহিত্যরচনায় আবদ্ধ রাখেননি। স্বদেশী যুগে, এবং তার আগে বা পরেও, দেশের নানা আন্দোলন থেকে তিনি আপনাকে আর্টের খাতিরে বিচ্ছিন্ন রাখবার সাধনায় মগ্ন হতে পারেননি। তাঁর মতন মহাকবির পক্ষে কর্মী হিসাবে নিজের মনের পূর্ণতাসন্ধান নিশ্চয়ই বিশ্বয়জনক। স্বদেশী-আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক’রে রয়েছে। তাঁর তখনকার লেখা রাষ্ট্রিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির দৃষ্ট তেজ ও সরল ভঙ্গী বরাবরই পাঠকের

• **শ্রীযুক্ত বসুধা চক্রবর্তী ‘পরিচয়ে’** লিখেছেন যে তিনি রবীন্দ্ররচনায় শ্রমিকের স্বীকৃতি দেখতে পাননি। ‘স্বীকৃতি’ কথাটি এখানে নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সমাজগঠনে শ্রমিকের দাবী স্বীকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ‘কেরানী রবীন্দ্রনাথ’ পুস্তিকার কিন্তু শ্রীযুক্ত অমল হোম বসুধা বাবুর লেখার তীব্র প্রতিবাদ ক’রে দেখাতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য সাধারণ মানুষের সুখহৃৎকের চিত্রে পরিপূর্ণ। পরবর্তী লাইনেই বসুধা বাবু লিখেছেন—‘দেখলুম শুধু উদার অহুকম্পা।’ এই অহুভূতি ও স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্যটুকু অমলবাবু বুঝতে চাননি।

মন মুগ্ধ করবে। কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা বিশেষ ছাপ রেখে যায়নি, কাজেই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সার্থকতা লাভের দাবী এ-ক্ষেত্রে বোধ হয় অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় মতামতের অনেকখানি প্রগতিবাদীদের তৃপ্তি দিতে পারে না, একথা স্বীকার করাও নিশ্চয় দোষের নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করব, যদিও এসব ধারণা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনে অচল ছিল কি না সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ আছে।

স্বদেশী আমলে রবীন্দ্রনাথ ‘সরকার’ বা স্টেট থেকে সমাজ অর্থাৎ সোসাইটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাববার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমটি উদ্দেশ্যে স্থিত শাসকসম্প্রদায়ের শক্তি, ভারতের ইতিহাসে বার বার তার পরিবর্তন হয়েছে; দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ আত্মশাসিত জনসমষ্টি, যুগ যুগান্তে তার প্রকৃতি অবিকল থেকেছে। ইংরাজ শাসনে নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় যে এই ভেদরেখা লুপ্ত হ’তে বাধ্য মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় মানরের মতন ভারতীয় Village Communityর দিনও যে ফুরিয়ে গেছে—এই চিন্তা তখন তাঁর মনে স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশী সমাজকে পুনর্জীবিত করবার প্রস্তাব করলেন, এখন বোঝা সহজ তাঁর এ-ধারণা কতখানি ইউটোপীয় অর্থাৎ অবাস্তব, ইংরাজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ হ’ল তার স্বাতন্ত্র্য স্বভাব, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক লুপ্তপ্রায়। কিন্তু বিদেশী শাসনের আর্থিক চাপের তুলনায় তার নৈব্যক্তিক রূপটা নিশ্চয়ই অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে ইতিহাসের দ্বারা এক স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য আছে, বৈচিত্র্য নষ্ট না ক’রে বহুর মধ্যে ঐক্যস্থাপন হ’ল তার বৈশিষ্ট্য। তাঁর এ-কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে অল্প সত্যতার মধ্যেও কি এর অনুরূপ ঐক্যসন্ধান নেই? তাছাড়া বিবিধকে ধ্বংস না ক’রে এক করবার ভারতীয় প্রণালী কি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল? আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের অভাবই হয়ত প্রাচীন বা মধ্যযুগের সামাজিক স্থিতির মূল কারণ। দেশীয় রাজা জমিদারদের সম্বন্ধে যে-মতামত তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাকে পেট্রিয়ার্কাল আখ্যা দেওয়া চলে। সেকালের আদর্শে ভপোবনাপ্রিত যে-শিক্ষাপদ্ধতি তিনি একদা সমর্থন করেছিলেন, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। তেমনি পল্লীসংস্কার ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মণ্ডলীবদ্ধ কয়েকটি কর্মীর উদ্যমে এবং আদর্শ গ্রাম-সংগঠনের দৃষ্টান্তে দেশব্যাপী এমন প্রেরণা আনা সম্ভব যাতে অবস্থার আবুল পরিবর্তন আসতে পারে। তের বছরে রাণিরার পল্লীসমাজে রাষ্ট্রশক্তি যে-যুগান্তর এনেছে তার অতিষ্ঠতা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল, কিন্তু তিনি প্রকাশে তাঁর পূর্বমত পরিহার করেননি।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক চিন্তা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ থাকে নি; সারা জগতের সমস্তা তাঁকে পীড়া দেওয়ায় এক বিশিষ্ট বিশ্বদর্শন তাঁর নানা লেখায় মূর্তিগ্রহণ করেছিল। পশ্চিমের ভাষায় উদার হিউম্যানিস্ট হিসাবে তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত। কিন্তু আজকের দিনে প্রগতিবাদে হিউম্যানিজম মূল্যবান হ’লেও যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের

দেশায়বোধ থেকে পৃথক গণ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন, সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হওয়া তাঁর বাস্তবীকৃত মনে হয় নি। কিন্তু শ্রাশনালিঙ্গম্কে বিকৃত বা ব্যাধি আখ্যা দিলেই সমস্তা সমাধান হয় না, কেন না যুগ বা অবস্থাবিশেষে এই জাতীয়তাবোধ লোকের কাছে স্বাভাবিক ব'লেই গণ্য হয়, আমাদের দেশেও গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শ্রাশনালিঙ্গমের পরিণতি ইম্পিরিয়ালিজমে! সেই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ তার মূল খুঁজেছেন লোভের মধ্যে। কিন্তু মানুষের এক সনাতন প্রবৃত্তি হঠাৎ এ-যুগে এত প্রবল হ'য়ে উঠল কেন এ-প্রশ্নকে তিনি আমল দেন নি। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিহলে তিনি আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অভিব্যক্তিকে গ্রাহ্য না ক'রে রিপূর তাড়নার উপর জোর দিয়েছিলেন—প্রতিকারের আলোচনায় তাই তাঁকে চিন্তাচকিত উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যক্ষ্মধর্ম বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কোনও কর্মপ্রণালী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাসত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঠিকই লিখেছিলেন যে কল্লান্তে বিকোভ পর্যন্ত তাঁকে সংস্কারমুক্তির যথেষ্ট প্রেরণা যোগায় নি। জীবনের উপাস্ত্রে এসেও তাই 'কালান্তর', 'সত্যতার সঙ্কট' প্রভৃতি বিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর স্বভাবজাত মানবধর্ম বিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশ্বাস অগ্রগতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনেক পৃথক। পূর্বদিগন্তে পরিভ্রাণকর্তা মহামানবের সম্ভাবনাকে অবশ্য কবির আন্তরিক আবেগ হিসাবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে ক্রমশঃ নূতন সমাজের জন্মকে যখন তিনি স্বয়ং, প্রত্যক্ষ ক'রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখনও কেন এই পরিবর্তন সম্ভব হ'ল, এর মূল প্রেরণা কোথায়, সে-সমস্তাকে তিনি সমস্তে এড়িয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক বিশ্বাসকেও অগ্রগতির অনুরূপ বলা চলে না। এখানে শুধু মেটরিয়ালিজম-বিরোধী আদর্শবাদই বড় কথা নয়, পাসেনালিটিই রবীন্দ্রদর্শনের মূলবস্তু। যক্ষ্মধর্মের পরিপূর্ণ সাধনা কবির জীবনাদর্শ ছিল না, religion of man-রূপে এই সাধনাকে তিনি ধর্মের উৎস ভাবে দেখেছিলেন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সত্যতার মর্মকথা, আধুনিক যান্ত্রিকতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, অথচ সেই যন্ত্রবিলাসিতার আড়ালে রয়েছে পুঞ্জীভূত অবসাদ আর গ্লানি—'রক্তকরবী' রূপকের বিষয়টি সম্ভবত এই। কবি পাসেনালিটির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বন্দনা করেছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের সাধনা এখন অল্ললোকের পক্ষেই সম্ভব, কাজেই তাতে সমাজের সমস্তা মিটতে পারে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সমষ্টির পক্ষে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ আনতে হ'লে প্রথমে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, সেক্ষেত্রে কাজেই আবার সেই মূল ভাবনা সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকগুলি মতামতের সঙ্গে অগ্রগতিবাদীদের পার্থক্য উপরে একটু ব্যাপকভাবেই আলোচিত হ'ল। কিন্তু তবুও আমাদের অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস যে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য ব'লেই

গণ্য হবে। বিশিষ্ট কতকগুলি মতের চাইতে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় ছিলেন, মহাকবি এবং মহৎ শিল্পী তাঁর প্রকৃত পরিচয় ব'লেই তাঁর স্বকীয় রাষ্ট্রিক, সামাজিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বাংলার জীবনে তাই মনে হয় তিনি যুক্তির সহায়ক রূপেই অগ্রণীয় থাকবেন। তাঁর কয়েকটি বিশ্বাসের সম্বন্ধে মনে যে-সংশয় ও তর্কের উৎপত্তি হয়, শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োগে সে সেই ভক্তদের বিরুদ্ধেই যারা রবীন্দ্রনাথের এই মতামত আঁকড়ে ধরে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মতসমষ্টির কতগুলি অপরের মধ্যে কতখানি সঞ্চারিত হয়েছে সে-বিষয়ে প্রবল সন্দেহ অযৌক্তিক নয়। পক্ষান্তরে অন্য অনেকদিকে তাঁর প্রভাব অবিসংবাদিত সত্য। সেই প্রভাবই ভবিষ্যতে অধিকতর কার্যকরী হবার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে তার শুধু আংশিক পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথমেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্প সাধনার কথা মনে আসে। ভাষা আঙ্গিক ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্বন্ধে আজ মতভেদ অসম্ভব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান উৎস তিনি—পৃথিবীতে অমূরূপ অন্য কোনও সাহিত্যে একজনের সৃষ্টি এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তাঁর সৃজন-প্রতিভা সর্বতোমুখী। প্রাক-রাবীন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য তাই আজ আর বাঙ্গালীকে তৃপ্তি দেয় না, ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না। আগামী কালে বাঙ্গালীর আশা ভরসা প্রকাশ পাবে যে-ভাষাতে, সে-ভাষাই ত' তাঁর হাতের গড়া। আঙ্গিকের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাফল্য অতুলনীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর লেখায় বাংলা ছন্দের রাজ্যে বিপ্লব-সাধনের উল্লেখ অপরিহার্য। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন যে তিনি যোগ্য কথার সঙ্গে যোগ্য সুরের মিলন ঘটিয়ে একটি বিশেষ আনন্দরসের সৃষ্টি করেছেন, নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের এই দানও অবিস্মরণীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রকলাও ভারতশিল্পের একদিককার দৈন্ত্র ঘোচাতে সহায় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করলে আজকের দিনের বাংলা সংস্কৃতির শুধু অন্ধহানি হয় না, তার প্রাণ পর্যন্ত বাদ পড়ে।

অবশ্য এ সব ত' সর্বস্বীকৃত, কিন্তু বাংলা কালুচারের সঙ্গে প্রগতির সংশ্রব কতটুকু? অনেকের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের সংস্কৃতি পুরাতনকে একেবারে বাদ দিয়ে গ'ড়ে উঠবে। এ-বিশ্বাস ডায়ালেক্টিকাল অগ্রগতির রূপের সঙ্গে খাপ খায় না। ডায়ালেকটিকে ক্রমবিকাশ সরল রেখা ধরে অগ্রসরণ হিসাবে কল্পিত হয় না বটে, কিন্তু ক্রমোন্নতির পথে পূর্বগামী লাইনের সম্পূর্ণ লুপ্তিও এখানে স্বীকৃত হয় নি। পুরাতন সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটবে, তাকে নতুন ভাবে দেখবার চোখ খুলে যাবে, অনেক প্রাচীন আবর্জনা লোপ পেতে পারে,—আর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির নতুন সম্ভাবনা পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু শ্রেণীবিহীন সমাজের সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া কালুচারের সমস্ত কীর্তির উচ্ছেদ হবে, এ-বিশ্বাসের ডায়ালেক্টিকাল সমর্থন কোথায়? সোবিয়ৎ রাশিয়ার অভিজ্ঞতাও উক্ত বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত। সেখানে একদিকে প্রাকবুর্জোয়া লোকসংস্কৃতির, অন্যদিকে শেক্সপিয়ার থেকে রুশ সাহিত্যস্রষ্টাদের

সকলেরই, অর্থাৎ বুর্জোয়া কালচারের প্রধান প্রতিনিধিদের, যোগ্য সমাদরের অভাব হয় নি। •

বুর্জোয়া সংস্কৃতির আলোচনার দুটি বড় কথা আছে। প্রথমত, যুগান্তরের মুখে এর মধ্যে একটা স্বভাবজাত ভয় ফুটে বের হয় ভবিষ্যতের সম্বন্ধে। কলে স্থবিরত্ব এর উৎস রুদ্ধ ক'রে ফেলে, সমস্ত সংস্কৃতি হ'য়ে পড়ে পশু ও বিপন্ন। বুর্জোয়া প্রতিবেশ রবীন্দ্রপ্রতিভাকে ধ্বংস করেছিল কিনা এ-আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা। কিন্তু আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীন নানা সংস্কার তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি নির্ভীক ছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'র তৃতীয় সংখ্যায় সেই বিখ্যাত 'ভয় কিসের' তাঁর অন্তরের কথা, এবং সে-বাণী তাঁর দেশবাসীর কানে বাজা উচিত। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়া-সংস্কৃতি স্বভাবতই ক্ষুদ্রগতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রান্তবাসের আঁঙ্গে জীহ্ব বলেছিলেন যে আজকের দিনের সংস্কৃতি ছোট উদ্ভানের মতন সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। শ্রেণীবিহীন সমাজ গ'ড়ে উঠলে সে-প্রাচীর অবশ্য ভেঙ্গে যাবে। আমাদের দেশে তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্যাদা নিশ্চয় বাড়বে বই কমবে না, কারণ ভাষা, আদিক ও সৌন্দর্যবোধের রাজ্যে তাঁর কীর্তি অনবদ্য। ভবিষ্যতের বাংলা কালচার তাঁকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে উঠতে পারে।

ভবিষ্যৎ সমাজে পুরাতন সংস্কৃতি পুরানো ব'লেই পরিত্যক্ত হবে না, তাকে নতুন ক'রে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় সমৃদ্ধি বাড়বারই সম্ভাবনা। অথচ বলা চলে না যে সকল রচনাই কালোত্তীর্ণ হয়। তা'হ'লে এসুথেটিস্ বা নন্দন-তন্তুই কি শেষ পর্যন্ত ঠিক করবে কোনটা ঠিকবে আর কতখানি লোপ পাবে? কতকটা তাই বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এসুথেটিস্ ও সাহিত্যের মূল্যবিচার কোনও স্থির যান্ত্রিক অচলা বিদ্যা নয়। তারও বিবর্তন আছে, এবং যুগে যুগে নূতন standard-এর উদ্ভাবন হয়, অর্থাৎ দেখবার ভঙ্গীটাই নির্ভর করে অনেকখানি সামাজিক পারিপার্শ্বিকের উপর। সুতরাং বুর্জোয়া সংস্কৃতির ঠিক কতখানি ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হবে, একথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না। কিন্তু ভাষা, আদিক ও সৌন্দর্যবোধে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এত বেশি যে যতদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায় তাতে মনে হয় না যে তাঁকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলার পরিশীলন-সম্পদ গ'ড়ে উঠতে পারবে।

* 'আশার কথা' নিবন্ধিকায় শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন এই ভেবে যে টলস্টয়ের ধর্মপ্রবণ রচনাগুলির প্রচার সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হ'ল কি ক'রে। প্রাচীন লেখকদের নিয়তি, সমাজধর্ম ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা বিশ্বাস আগেকার পাঠকদের মন নিশ্চয়ই অভিভূত করত; স্বতন্ত্র পরিবেশে বাস করি ব'লে আমাদের আর সেসব ধারণা সে-ভাবে স্পর্শ করে না, অথচ প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্যরসে আমরা বঞ্চিত নই। রুশদেশে বিশাল পরিবর্তনের পর টলস্টয়ের বিশিষ্ট কয়েকটি মতামতে বিশ্বাসী না হ'য়েও পাঠকদের পক্ষে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগ কেন অসম্ভব হবে বোঝা শক্ত। তবে লীলাময় বাবুর বোধ হয় পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের ফলে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

Others abide our question. Thou out free.

অগ্রগতির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলাতে আবদ্ধ নয়। কথাটা আশ্চর্য শোনালেও মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মধ্যেও সে-গতির সমর্থন পাওয়া যাবে। আধুনিক ইতিহাসে ধর্মব্যবস্থা বলতে যা' বোঝায় সেই সংজ্ঞাবদ্ধ ধর্মচার (organised religion) নিশ্চয়ই অগ্রগতির বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনায় ধর্মবিশ্বাস অনেকখানি কবিত্বময় আবেগে রূপান্তরিত হওয়ায় সে-বিরোধ বড় হ'য়ে ওঠেনি। সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে তাই মনে হয় যে ধর্মের প্রচলিত ঐতিহাসিক রূপের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকখানি অগ্রগমনের পরিচায়ক, যদিও দার্শনিক আইডিয়ালিজম, আত্মার অস্তিত্ব ও ভগবানের ব্যক্তিত্বে একটা মজ্জাগত বিশ্বাস নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। অগ্রগতিবাদের চোখে, এ-সত্ত্বেও তাঁর অগ্রসরণ মহত্বের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্মের যে-সংগঠিত মূল্য সামাজিক রক্ষণশীলতার অঙ্গ, তাতে তিনি বরাবর পীড়া অনুভব করেছিলেন। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, সম্প্রদায় তাঁকে টানতে পারে নি, সুনির্দিষ্ট মতবাদ অর্থাৎ ক্রীড়কে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না, এমন কি আচারবিধির প্রতিও তাঁর বিশেষ আস্থা দেখা যায়নি; অথচ ধর্ম যাত্রাই এর কোনও না কোনটিকে আশ্রয় করে। ইতিহাসে পুরাতন ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্য বার বার বিদ্রোহ দেখা গেছে, কিন্তু স্বভাবতই সে-বিদ্রোহ নূতন কোনও ব্যবস্থার পর্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সে-পর্যায়ে পড়ে না—তাঁর প্রকৃতি প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ধর্মের পুনর্গঠনের অভিযান নয়। রামমোহন রায় হরত পৃথক সম্প্রদায় স্থাপন করতে চান নি, তবুও ব্রাহ্মসমাজ তাঁর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, মতবাদ ও আচারবিধির গতি ছাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোনও নূতন ধর্মের উৎসরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে মিষ্টিসিদ্ধ-এর একটা ধারা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু মিষ্টিকের চাইতে হিউম্যানিষ্টই কি তাঁর সত্যতর পরিচয় নয়? ইতিহাসে দেখি হিউম্যানিজম পুরানো ধর্মের অবসান সূচনা ক'রেও সাধারণত ধর্মের পুনরুত্থানের প্রেরণা জোগায় না। সংগঠিত ধর্মের ক্ষয়প্রাপ্তি, তার withering away অগ্রগতির কাম্য ব'লে, পরিবর্তনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এদিক দিয়েও একটা নিগূঢ় যোগ আছে মনে হয়। অনেকে বলবেন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ব্যক্তিগত, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়; আসলে শিল্পীর আন্তরিক আবেগ ও সৌন্দর্য উপলব্ধিই তাঁর প্রাণ ছিল। সমাজসংশ্লিষ্ট ধর্মবোধ আর চরম সত্যে আশ্রয়ের চাইতে রূপকার ও কবি-মানসের অনুভূতিই এখানে অনেক বড় হ'য়ে উঠেছে। উপনিষদ তাঁকে বরাবর ভূষিত করেছে, কিন্তু উপনিষদের অসাধারণ সৌন্দর্য ত' সর্বজনবিদিত; তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস ও মূল তত্ত্বকথার চাইতে এদিকটাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করত। সকলে কখনই এখানে একমত হবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মূল প্রকৃতি ভেবে দেখার কথা। ধর্মসংশ্লিষ্ট ও ধর্ম-সংক্রান্ত সব রচনায় তিনি বারবার যে-মূল সুর ধ্বনিত করেছেন, আমি মনে করি যে organised religion, এমন কি সাধারণ personal religion থেকে তা'

স্বতন্ত্র। সেইজন্য সম্প্রতি কেউ কেউ যে তাঁর মধ্যে secular ভাবের অতিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ বোধগম্য। এই বন্ধনমুক্তি ও ধর্মভাবের রূপান্তরকে অগ্রগতির সহায়ক রূপে মানা উচিত।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে এমন অনেক কিছু শেখাতে চেয়েছিলেন যার স্বতি সহজে ম্লান হবে না। সে-সব দিকেও তাঁর শক্তি জাতীয় জীবনে বিশাল পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রথম থেকে ভিত্তিবস্তির তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন; যে-আত্মশক্তির উদ্বোধন তাঁর অবিচল লক্ষ্য ছিল, পলিটিক্সে তার মূল্য অসীম। সেকালের পোলিটিকাল প্রচেষ্টার প্রধান দুর্বলতা তিনি ধরতে পেরেছিলেন—জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বর্ধার সংযোগের অভাব তাঁকে ক্রমাগত পীড়া দিত। বরকটের উন্মাদনার মধ্যেও তাই তিনি 'সুপার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে স্বদেশী কর্মীরা সাধারণ লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না করেও আত্মীয়তার দাবী আনছে। চাষীদের অর্থকষ্ট যে দেশের এক গুরুতর সমস্যা, এ-কথা তিনি কখনও ভোলেন নি; গ্রামসংস্কারের উদ্যম তাই তাঁকে টেনেছিল প্রথম থেকেই। বাংলা দেশে মেলার মধ্য দিয়ে সহজে কিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, 'স্বদেশী সমাজ'-এ কর্মীদের প্রতি তাঁর সেই উপদেশে বুঝতে পারি যে প্র্যাক্টিকাল ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু যে শিক্ষার প্রকৃত বাহন হ'তে পারে না, পঞ্চাশ বছর আগে তিনি একথা সজোরে প্রচার ক'রে গেছেন। একদিকে হিন্দুর সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ববাদকে তিনি বিজ্রপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিমের গুণমুগ্ধ হ'য়েও তিনি তার রাষ্ট্রসর্বস্ব চিন্তাবস্তির তীব্র নিন্দা করেছিলেন; সেই ঝোঁকই অবশ্য পরবর্তী ফাশিজমের অন্ততম উপাদান।

রবীন্দ্রনাথে অগ্রগতির সমর্থক অন্য একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রেই প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি তাঁর রচনায় বারবার গতির বন্ধনরূপে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে পরিবর্তনের প্রবহমান স্রোতে তাঁর অন্তর সর্বদাই একটা সাড়া দিত। ভবিষ্যৎ সমাজের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাঁর মন ছিল গতিশীল আর পথের সীমানির্দেশ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। মনের অসাধারণ সৌকুমার্য আর শিক্ষায় প্রাচীন সংস্কারের বোঝা নিয়েও, বাণিরার প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার আবর্তের মধ্যে গিয়ে প'ড়ে মুগ্ধ হবার মতন মনের বলিষ্ঠতা ও ঔদার্য তিনি দেখিয়েছিলেন। ভয়শূন্য চিন্তের আদর্শ সহজে ভুলবার নয়; বলা যেতে পারে যে শুধু লেখায় নয়, কাজেও তিনি সে-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'ন নি। গণজাগরণের বিরোধীরূপে তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। সেদিকে ভারতের রাষ্ট্রনেতা মহাত্মাজীর চাইতে তাঁকে অনেক বেশি অগ্রসর মনে হয়। বার্ষিকের ছায়ায় এসে পশ্চাদ্-গমন সাধারণ নিয়মের সামিল—রবীন্দ্রনাথের বেলার দেখি তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অগ্রগতির টান শেষের দিকে প্রবলতর হ'য়ে উঠছিলই ব'লে মনে হয়। যে-সত্যতাকে তিনি মন থেকে বিশ্বাস করেছিলেন, জীবনের প্রান্তে এসে 'সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল' এই স্বীকারোক্তি অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের সাহিত্যিক মূল্য

হয়ত বেশি না, কিন্তু তার মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও জনসংযোগের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, অন্তত তাই নিয়ে তাঁর মনে স্বপ্নের ও সংশয়ের উদয় হয়েছিল। জগৎ-জোড়া দুঃখীর মিলন সম্বন্ধে কোরীয় যুবকের আস্থার যে-কথা তিনি একদিন শুনেছিলেন, তার বক্তারও তিনি ভুলতে পারলেন না।

মিউনিসিপাল গেজেটে ভ্যানগার্ডের লেখা প্রবন্ধে পড়লাম এক বামপন্থী স্প্যানিশ বোদ্ধা প্রশ্ন করছেন, টেগোর কি সেইজাতীয় লোক যারা সাক্ষাৎভাবে নূতন সমাজ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে না পারলেও আগামী কালকে বুঝবার ও অভিনন্দন করবার মতন মনের ছোর ও স্বাধীনতা রাখেন? নাৎসি-অধ্যক্ষানের পর রুল। যেমন লিখেছিলেন—
'Working men here are our hands. We are yours. Humanity is in danger'—জানি না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন কোনও কথা বলা সম্ভব ছিল কিনা। কিন্তু শেষ সংস্কারের বেড়াঙ্কালের মধ্যে থেকেও চিরজীবন যিনি নূতন নূতন পথে এগিয়ে চন্বার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন, মনে হয় তাঁকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথেও সহায়ক হিসাবে তাববার যথেষ্ট হেতু আছে।*

* বহুকাল পূর্বে, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ সালে ত্রৈমাসিক পরিচয় পত্রিকায় শ্রীঅজিত সেন লিখিত প্রবন্ধটি আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এখনো কিছু কিছু প্রগতিবাদী মহলে যে যান্ত্রিক তথা অমার্কণীয় চিন্তাধারা বর্তমান তা তাদের সমালোচনা পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। তাঁরা কবিকে প্রগতিশীল আখ্যা দেওয়ার সময় কয়েকটি বিশেষ কবিতার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন, রবীন্দ্র সাহিত্যের আশ্চর্য বিবর্তন ও অবিদ্বান্য ঐশ্বর্যের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণই যে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার একমাত্র কষ্টিপাথর, যুষ্টিমের কয়েকটি কাব্যই শুধু নয়, তা তাঁরা বিশ্বত হন। তাই, আমাদের মনে হয় আজো আলোচ্য প্রবন্ধের কিছুটা মূল্য বর্তমান, আংশিক বিচারের কাঠামো হিসাবেই, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও বোধের জন্য।

সঃ অঃ।

॥ চন্দ্র ॥

। নতুন ছবির খবর ॥

দুজনায় : প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী মনোজ বসুর 'এক বিহঙ্গী' উপন্যাসকে ভিত্তি করে রচিত 'দুজনায়' ছায়াছবিটি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে। জানা গেল, ছবিটির প্রধান দুটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন উত্তমকুমার ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন অরুণাচলী মুখার্জী, বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। নির্মল দে ছবিটি পরিচালনা করছেন এবং একটি ভূমিকায় তিনি অংশ গ্রহণও করবেন। আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন খ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান দেওজীতাই। অনিল বিশ্বাস ঐ ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন।

দুটি জীবনী চিত্র : ইরানীং বাংলাদেশে ঐতিহাসিক জীবনীচিত্র তোলার বেশ প্রত্যাশা দেখা যাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দুটি জীবনীচিত্রের প্রস্তুতি চলছে। ত্রিগণেশ ফিল্মসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, গত যুগের বাকালী মনীষী রাজমোহন রায়ের ঘটনাপ্রধান জীবন অবলম্বনে রচিত একটি ছায়াছবির কাজে তাঁরা হস্তক্ষেপ করছেন। ভূমিকালিপিতে বহু প্রখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রয়েছেন এবং তাঁরা সংখ্যায় প্রায় একশত জন।

অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ, গায়ক-অভিনেতা কুন্দলাল সাইগলের জীবনী অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে একটি ছবি তোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ছবিটির শুভ মহরৎ গত ২৩শে মে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি হিন্দীতে রচিত হবে এবং পরিচালনা করবেন নীতিন বসু। ছবিটি সরকার পিকচার্সের প্রযোজক বি. এন. সরকারের আনুকূল্যে গৃহীত হচ্ছে।

ঝড়ের পরে : রাজশ্রী পিকচার্স এতদিন পর্যন্ত হিন্দী ছবিই পরিবেশন করতেন। সম্প্রতি এঁরা বাংলা ছবি তোলার দিকে মনোনিয়োগ করেছেন। প্রথম প্রয়াস হিসেবে এঁরা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ঝড়ের পরে' ছবিটি তুলবেন। এর পরিচালনা করবেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন মলিনা, প্রণতি, ছবি বিশ্বাস, রবীন, তুলসী লাহিড়ী, জহর রায়, ত্রিমান বিজু প্রভৃতি শিল্পীরা। কণ্ঠসংগীতের দিকেও পরিচালক বিশেষ নজর দিয়েছেন। সত্যীনাথ মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী, গায়ত্রী বসু প্রভৃতি সুখ্যাত শিল্পীরা এ চিত্রে সংগীত পরিবেশন করবেন। সুরারোপ করবেন নচিকেতা ঘোষ। ছবিটির প্রযোজনা করছেন এস. এল. কারনানী।

জ্যোতিষী : বিনায়ক চিত্র প্রোডাক্সনের উদ্যোগে চিত্রায়িত গজেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের

‘জ্যোতিষী’ ছবিটির মুক্তি আসন্ন। চিত্র বন্ধু পরিচালিত এই ছবিটিতে প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন বিকাশ রায় ও সন্ধ্যারানী। এরা ছাড়া দীপক, প্রশান্ত, কান্নু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু, বেচু, সুপ্রভা, সবিতা, জয়ন্তী সেন, এবং নবাগতা মিত্রা বিশ্বাস প্রভৃতির অত্যন্ত ভূমিকায় আছেন। ছবিটিতে সুর জুগিয়েছেন গোপেন মল্লিক।

কালিন্দী : তারাকবরের প্রথম যুগের রচনা রাইকমলের চিত্র সাক্ষ্য, সম্ভবত প্রযোজক ও পরিচালকদের, তাঁর অত্যন্ত পুরানো রচনার দিকে আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি দীপলিখা চিত্র লিঃ তাঁর ‘কালিন্দী’ উপন্যাসটিকে চিত্ররূপ দিচ্ছেন। ‘কালিন্দী’র বিভিন্ন চরিত্রে আছেন নরেশ মিত্র, বিকাশ, দীপক, কমল মিত্র, মলিনা দেবী, দীপ্তি রায়, অম্বুতা গুপ্তা, সাবিত্রী প্রভৃতি। প্রবীণদের মধ্যে সরস্বতী ও নিভাননীও এতে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রকাশ, পরিচালক নরেশ মিত্র কিছুদিন আগে নবদ্বীপে গিয়ে কিছু আউট-ডোর শ্বুটিং করে এসেছেন।

দৃষ্টি : রাইকমল ছবিতে সাক্ষ্যের পর নবাগতা কাবেরী অল্প তিন-চারটে বাংলা ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে শোনা গেছে। সম্প্রতি পারিজাত থিয়েটার এক সংবাদে প্রকাশ করেছেন যে তাঁদের সচিব নির্বাচিত বাংলা ছবি ‘দৃষ্টি’-তে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন কাবেরী বন্ধু। এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন বিজয় ভট্টাচার্য। এই ছবিটিকে ধরলে, গত তিন মাসের মধ্যে উক্ত অভিনেত্রী পাঁচটি ছবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

চিত্র বন্ধু এই ছবি পরিচালনা করবেন। অত্যন্ত প্রধান ভূমিকায় আছেন নির্মল কুমার, ছবি বিশ্বাস এবং পাহাড়ী সান্দাল।

॥ হিন্দী ও বিদেশী ছবির খবরাখবর ॥

আজ-কি বাত : খ্যাতনামা অভিনেত্রী লীলা চিট্টনীসু সম্প্রতি একটি ছবির প্রযোজনা এবং পরিচালনা শেষ করেছেন। তিনি বর্তমানে ছবিটির সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত আছেন। ছবিটিতে তাঁর পুত্র অজিত চিট্টনীসু অভিনয় করেছেন বলে জানা গেল। তাঁর বিপরীত ভূমিকায় আছেন চিত্রা। লীলা চিট্টনীসুও ছবিটিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় আছেন।

গুমরাহা : রাজ খোসলার পরবর্তী ছবি গুরু দত্ত ফিল্মসের অধীনে গৃহীত হচ্ছে। সাময়িকভাবে ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘গুমরাহা’। ছবিটির চিত্র-নাট্য লিখছেন পরিচালক রাজ খোসলা স্বয়ং। ছবিটিতে একজন জুয়াড়ীর জীবনী প্রতিকলিত হবে এবং আশা করা যাচ্ছে সেই চরিত্রের নাটকীয়তা ও মানবিক আবেদন অভিনেতা দেবানন্দ ভালোই রূপায়িত করবেন।

জবাব : ইসমাইল ফিল্মসের আগামী ছবি ‘জওয়াব’-এর কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। সম্প্রতি বোম্বাই-এর গুরিসিতে একটি চিত্রাকর্ষক বহির্দৃষ্ট গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ দৃষ্টে

বলরাজ শাহনীকে মালপূর্ণ একটি রেলগাড়ী টানতে দেখা যায়। তিনি ছবিটিতে একজন মজুরের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। গীতাবাসী ও নাসির খাঁ প্রধান ভূমিকায় আছেন।

॥ আইনস্টাইনের জীবনী-চিত্র ॥

বিদেশী চিত্রপ্রতিষ্ঠান ওয়ার্নার ব্রাদার্স এক ঘোষণায় জানাচ্ছেন, তাঁরা অনতিবিলম্বে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী-চিত্রে হাত দেবেন। ইতিপূর্বে তাঁরা 'স্টোরি-অব লুই প্যাস্তর', 'লাইক অব এমিল জোলা' প্রভৃতি ছবি তুলেছেন। ডক্টর আইনস্টাইনের বিশেষ বন্ধু জে. ওয়ার্নার ঘোষণায় বলেছেন, আইনস্টাইনের জীবনী পৃথিবীর যে কোনো নাটক অপেক্ষা অনেক বেশি সংঘাতপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। তাঁর মতো মহান মানুষের জীবনীকে লোকচক্ষুর সামনে প্রতিভাত করে তোলার দায়িত্ব ওয়ার্নার ব্রাদার্স পালন করবে।

॥ কেন্স চিত্র উৎসব ॥

গত ২৫শে এপ্রিল থেকে শুরু করে দীর্ঘ সাতেরো দিন ব্যাপী ফ্রান্সে কেন্স চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চল্লিশটি দেশ এতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ছায়াচিত্র প্রদর্শন করে এবং চার শতাধিক মাইল পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনী শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত এম-জি-এমের 'ব্যাড ডে এট ব্র্যাক বক' দিয়ে। প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষিত হয় অটো প্রেমিংগারের ছবি 'কারমেন জোনস' ছবির দ্বারা।

হলিউডের খ্যাতনামা খ্যাতনামীদের মধ্যে ভ্যান ক্লিফ, এ্যাসথার উইলিয়ামস, গ্রেস কেলী, ওলিভিয়া ডি হেভিল্যান্ড, ইটালীয় চিত্রজগতের সিলভ্যানো মাস্কানো, পরিচালক ভিক্টরিও ডি সিকো, প্রভৃতির প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় জুরী হিসাবে যোগদান করেন, সোবিয়েৎ পরিচালক মার্জ শ্বুটেকভিচ, স্প্যানিস পরিচালক লুই বার্দেম, আমেরিকান পরিচালক আপটোল লিটভাক, ফরাসী লেখক ও চিত্রকার মার্সেল প্যাগনোল প্রভৃতি।

এই উৎসবে মার্কিন চলচ্চিত্র 'মাতি' সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। এই ছবিটি খুব অল্প খরচে তোলা হয়েছিলো। প্রতিযোগিতার বিচারকেরা ছবিটির চিত্রনাট্য, পরিচালনা এবং বিশেষ করে সম্পাদনার প্রশংসা করেন। ভারতীয় ছবি 'বুট পালিশ'-এর শিশু কলাকার বেবী নাজ এই উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন প্রেরিত ছবি 'রোমিও জুলিয়েট' এবং 'গ্রেট ক্যামিলি'ও দুইটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। নাটকীয় ছবি হিসাবে 'ইষ্ট অব ইডেন' পুরস্কার পায়। সোবিয়েৎ কার্টুন ছবি 'এন্টিলোপ'ও সম্মানিত হয়েছে।

॥ চিত্রসমালোচনা ॥

অপরাধী—খী এম প্রোডাক্সনের প্রথম নিবেদন; কাহিনী : কমল মজুমদার; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুশীল মজুমদার; সংগীত : গোপেন মল্লিক। ভূমিকায়—গীতা, শোভা, অনুভা, বসন্ত, রবীন, সুশীল এবং ভানু, কানু, জহর রায়, তুলসী চক্রঃ প্রভৃতি।

ছায়াছবির ব্যাপারে নতুন স্বাক্ষর করার প্রচেষ্টা সর্বদাই সমর্থনীয়, যদি সেটা শুধু এবং সঙ্গত হয়। শ্রী এম প্রোডাক্সনের মাধ্যমে সুপরিচিত পরিচালক সুশীলবাবু আমাদের যে তৃতীয় শ্রেণীর গৌজামিল ছবি পরিবেশন করলেন, তা তাঁর মতো অভিজ্ঞ লোকের কাছে আশা করা যায় না। প্রথম থেকেই কাহিনীটিকে অপরাধমূলক আধিভৌতিক কাহিনী হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অপরাধ কাহিনীতে যে-পরিমাণ যুক্তির প্রাবল্য থাকা প্রয়োজন, তা এখানে লজ্জাকররূপে অনুপস্থিত। একটি উদাহরণ দিই। গল্পের একটি চরিত্র (রবীন) যখন অরবিন্দ রায়কে গুলী করে হত্যা করার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করা হলো, তখন বলা হলো তারই পিস্তলে অরবিন্দ মারা গেছে। কিন্তু কাহিনীর শেষে মূল হত্যাকারী অভিযুক্ত করার সময় ব্যবহারজীবী (সুশীলবাবু) বললেন, অরবিন্দ গুলীতে মরেনি মেঝেতে পড়ে খাতা লেগে মারা যায়। তাহলে প্রথমে কোন অপরাধে সুশীলকে (রবীন) অভিযুক্ত করা হলো বা নিয়ম আদালত তাকে ফাঁসীর ছকুম দিলো। ইত্যাকার অসংখ্য অমৌক্তিক ও অবিজ্ঞান ব্যাপার কাহিনীটিতে ছড়ানো আছে। তাছাড়া ভাঁড়ামি ও অপরাধমূলক ছবির সাসপেন্স এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে, কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ও গতি হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধাবিভক্ত। অভিনয়ের ব্যাপারে নায়িকার ভূমিকায় গীতা সিং কাকুণ্ডের ব্যঞ্জন মুখে আনতে পারেন, কিন্তু আকর্ষণীয় প্রেমিকা চরিত্রে তিনি নেহাতই বেমানান। কয়েকটি শটে (যথা কান্নার দৃশ্যে) দৃষ্টিকটু দেখায়। ছবিটিতে বহু নামী কোঁতুক অভিনেতা এবং কোঁতুকদৃশ্যের সমাবেশ আছে কিন্তু হাতুরস বহুস্থানেই রসের পরিবর্তে ভাঁড়ামি বলে মনে হয়।

আলোকচিত্র ও সংগীতের কাজ নিতান্তই অশুল্লেখ্য। শব্দগ্রহণও খুব নিচু ধরের।

প্রতীক্ষা : প্রদীপ পিকচার্সের ছবি। **কাহিনী ও চিত্রনাট্য :** নীহাররঞ্জন ঘোষাল, **পরিচালনা :** ভাস্কর আচার্য, **প্রযোজনা :** মনীন্দ্র চৌধুরী ; **সুরকার :** গিরিন চক্রবর্তী। **ভূমিকায় :** বিকাশ রায়, অমীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, স্মৃতিবেশা, শিপ্রা দেবী, উমা, রেবা প্রভৃতি।

বাংলা ছবির মান যতোই নিচে নামুক না কেন, এ-জাতীয় ছবির কথা আমরা সহজে কল্পনাও করতে পারিনা। পরিচালনা, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা এবং বিশেষ করে কাহিনীর এ' প্রকার নিকৃষ্ট সমাবেশ ইতিপূর্বে বোধ করি কোনো ছবিতে নজরে পড়েনি। কৃষির সঙ্গে বহুশিল্পের চিরন্তন বিরোধ ও দ্বন্দ্ব—মাকাতা আমলের এই সমস্তকে নিয়ে কাহিনীকে খাড়া করা হয়েছে এবং ছবিটিতে দুই বিরোধী মতালম্বী পরিবারের ছেলে মেয়েদের প্রণয়, কান্না, ক্রাকাশ, তথাকথিত সাসপেন্স—কান্নাতে কান্নাতে নায়িকার সামনে নায়কের নাটকীয় দেহরক্ষা সবই আছে, নেই শুধু শিল্পমাত্রত আবেদন।

ছবিটির বিভাগে যেসব ক্রটি চোখে পড়েছে, খ্যাতিনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেন সেগুলোকে ষোলোকলায় পূর্ণ করেছেন। এরকম নিশ্চাপ ও অসহ অভিনয় সচরাচর চোখে পড়ে না। সংগীত পরিচালনাও তথৈবচ। ছবিটিতে ৩টি গান আছে, একটি আবার সংগীত পরিচালকের গাওয়া; সবকটিই অশ্রাব্য। সব মিলিয়ে এ জাতীয় ছবির জন্য, জাতীয় অর্থের অপব্যয় বলেই বোধ হয়েছে।

চিত্রদর্শক

ঐশ্বরী

॥ অষ্টম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ॥

বাংলা প্রথমপাঠের পরিচয়

সুধীরচন্দ্র রায়

বাংলা ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞানের কোনরকম চর্চাই এখন পর্যন্ত হয়নি। শিক্ষার প্রধান বিষয়-বস্তু ভাষা। বাংলাভাষা অনাদৃত অবস্থাতেই চিরকাল বেড়ে চলেছে, ইংরাজের পূর্বে ও পরে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে-ভাষাকে আনতে হয় তাকে স্তরে স্তরে ভাগ করতে হয়। শব্দচরন, বাক্য-গঠন এবং বয়স-ভেদে চিন্তাস্তরকে মান্য ক'রে বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট করা দরকার। কিন্তু এমন কোন-পরিকল্পনা বা পদ্ধতি আমাদের ভাষা-শিক্ষায় আজ পর্যন্ত দেখা গেলনা। তবু ভাষা শিক্ষা চলছে তার একমাত্র কারণ, বাংলাদেশে কয়েকজন পবিত্রমী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ইংরাজ-আমলেও আমরা পেয়েছিলাম, তাঁরা কেন জানিনা অনেক কাজ সত্ত্বেও শিশুদের শিক্ষা-কে উপেক্ষা করেননি। ইংরাজের আগে এই স্বতঃস্ফূর্ত কাজ যে ছিল না তা কিন্তু নয়। তবে তাঁরা বয়স্কদের শিক্ষা নিয়েই বেশি কাজ করেছেন। সেকালে ধর্ম-শিক্ষা ছিল বড়; তাই গান এবং ভজনগীতাবলীর মধ্যে মানুষের মনের আবেগ ও তাদের দিকটিকে সংহত করবার জন্ত ছিল প্রয়াস। মঙ্গলকাব্যে আর-একটি বিষয় দেখা গেল, কথাসাহিত্যের আগ্রহ মেটানো; তার মধ্যে বাহ্যত ধর্মের কথা থাকলেও, দেশের বিভিন্ন-ধরনের আচার-নীতি, মৌন-বিজ্ঞানের, পাকপ্রণালীর এবং নিসর্গ-বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মেটানো হ'ত। কিন্তু ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারক ইংরেজদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ইংরেজি-ভাষা এদেশের শিক্ষার স্থান জুড়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়, ইংরেজদের আগমন হয়ত দেশের কোন-কোন অঞ্চলের ভালোর জন্তই ঘটেছিল। প্রথম ভালোর দিক—প্রতিক্রিয়া। আমরা আশ্চর্য হয়ে উঠলাম। বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু তার পিছনে ছিল সংস্কারকামী মন; ভাষাকে সংস্কার করতেই হবে নতুবা ইংরেজিকে উৎসাদিত করা যাবে না। মাতৃভাষা ছাড়া যে শিক্ষা সফল হয় না, একথা তাঁরা অনেক আগেই বুঝে

ছিলেন। কেবল মমত্ব-ই সব কথা নয়, অল্প-দেশের শিক্ষা-ইতিহাসের খোঁজ-খবরও বোধ হয় তাঁরা রাখতেন। কিন্তু পিছনে ছিল একটি রক্ষণশীল মন আর বাংলাভাষার দারিদ্র্য সম্বন্ধে অহেতুক-ভীতি। ঝড় এলে ঘরের পেলার দিকে নজর পড়ে বেশি ক'রে। এই পেন্সা-দেওয়া মনই তাঁদের সংস্কৃতির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিল। তাই বাংলাতে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ঘটল। মধুসূদন বাংলাভাষার দুর্বলতাকে শুধরে দিতে শব্দের মধ্যে ধ্বনি সৃষ্টি ক'রে ওজঃ-শক্তির সৃষ্টি করলেন। এই সাফল্যও অনেকটা প্রলুব্ধ করল। বিদ্যাসাগরের ভাষার আবেগ-সঞ্চারী দিকও মনটিকে ঐদিকে টেনে নেয়। মদনমোহন বাসবদত্তায় সংস্কৃত ছন্দকে বাংলার রূপান্তরিত করে আরো আস্থা সৃষ্টি করলেন।

কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, হয়ত বা অজ্ঞাতে, বাংলাভাষার নিজস্ব-শক্তি আর কোথাও লুকিয়ে আছে। তাঁদের সংস্কৃতির দিকে আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তাঁরা ভাষার সেই অন্তর-স্রোতের টানে ভেসে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখনও প্রশ্ন আছে, ভাষার সেই স্রোতকেই আমরা সাহিত্যে স্বীকার করব, না, গঙ্গা বেয়ে ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে চলে যাব। সেই দ্বিধাই আমরা শিশুদের পাঠ্য পুস্তকে দেখতে পাই।

বাংলাভাষা নিয়ে শিশুদের জ্ঞান যে-কাজ করা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকখানি আজও বিশেষভাবে বেঁচে আছে! বর্ণপরিচয়, বাল্যশিক্ষা, সচিত্রবর্ণপরিচয়, হাসিখুসি ও সহজপাঠ; শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ আজকাল বাজারে মেলে না ব'লে তার কথা আমরা আলোচনা করছি না। পাঁচটি বই নিয়ে আমাদের আলোচনা। এই গ্রন্থগুলির গ্রন্থকারেরা সুপরিচিত; বিদ্যাসাগর, রামেন্দ্র বসাক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন সরকার এবং রবীন্দ্রনাথ।

সমস্ত বই মিলিয়ে প্রায় দুই হাজারের মতো শব্দ আছে। সর্বনাম, ধাতু প্রভৃতির মৌলিক শব্দ নিয়েই এর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে, নাম-বাচক শব্দ অর্থাৎ ব্যক্তির নাম প্রভৃতি আমাদের শব্দলিপি থেকে বাদ দিয়েছি। এই দুই হাজার শব্দের মধ্যে মাত্র ৫৬টি শব্দের পাঁচখানি বইতে মিল পাওয়া যায়, তার মধ্যে ক্রিয়া পদই রয়েছে ১৯টি। কাজেই এই সাধারণ শব্দসংখ্যা নিতান্তই সামান্য। বিভিন্ন পুস্তকের শব্দসংখ্যা এইরূপ : বাল্যশিক্ষা—১০৩১, বর্ণপরিচয়—৬২৭, সচিত্রবর্ণপরিচয়—৫০৮, হাসিখুসি—৩৭৮, সহজপাঠ—৬১৫। শব্দ-সংখ্যা বাল্যশিক্ষাতে সবচেয়ে বেশি, আর হাসিখুসিতে সর্বাপেক্ষা কম। সহজপাঠ আর বর্ণ-পরিচয়ে প্রায় সমান সংখ্যক শব্দ, সচিত্রবর্ণপরিচয়ে এদের চেয়ে কিছু কম। কিন্তু এই সংখ্যা দেখে একথা বলা চলে না যে, স্বাভাবী বা স্বমিতিক (normal) শব্দসংখ্যা হওয়া উচিত ৫০০ শব্দের কাছাকাছি। এই শব্দের প্রকৃতি ভেদ আছে। সে-কথা পরে আলোচনা করছি। আপাতত এইটুকু জানতে পারছি, শিশুদের বইতে কোন্ শব্দগুলি ব্যবহার করা উচিত সে-বিষয়ে সকলমুখিতাদের কোনরূপ মাপকাঠি ছিল না। এ-দোষ যে কেবল তখনকার দিনেই ছিল, তা নয়, এখন এই দিকে অস্থিরতা আরও বেশি।

মোট হাজার দুয়েক শব্দের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তৎসম শব্দ। এই শব্দপ্রকৃতির দুটি ভাগই কেবল কবেকিছুকাল আগের এবং (খ) তৎসম-ইতর। কারণ, তৎসমশব্দের

চরিত্র যেমন স্পষ্ট, তেমন তত্ত্ব-অর্থতৎসম বা দেশি শব্দের নয়। বিতর্ক থাকলেও, বর্তমানের আলোচনার এ বিতর্ক খুব বেশি স্থান দিইনি। তৎসম শব্দের পরিমাণ নিম্নরূপ :

বাল্যশিক্ষা—১১৬১, বর্ণপরিচয়—২১১, সচিত্রবর্ণপরিচয়—২১১, সহজপাঠ—২১১, এবং হাসিখুসি—২১১।

উপরের ভাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে (১) তৎসম শব্দের ভার আগের থেকে ক্রমেই কমে আসছে, (২) রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠে তৎসম শব্দসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প। অর্থাৎ যে-কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথ তৎসম-ইতর শব্দের উপর বেশি ঝোঁক দিয়েছেন। আর একটি লক্ষণও বেশ আনন্দদায়ক—বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের তৎসম শব্দ শতকরা ষাটের বেশি ব্যবহার করেননি। বাংলাভাষার আদিযুগের এই ঘটনা বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য।

স্বরবর্ণের মধ্যে ‘অ’ বা ‘আ’-কারাদি শব্দ বেশি। ‘অ’তে ৯৬ এবং ‘আ’-তে ৭৫টি শব্দ, তবে বাল্যশিক্ষা এবং বর্ণপরিচয়ে ‘অ’-কারাদি শব্দ যেমন বেশি অল্প তিনখানিতে তেমনি অতি অল্প! রামানন্দ বাবু ৮টি শব্দ নিয়েছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন বাদ দিতেই চেয়েছেন—মাত্র ২টি। কারণ, বাল্যশিক্ষা আর বর্ণপরিচয়ে ‘অ’-কারাদি শব্দের বেশি সংখ্যক শব্দেই ‘অ’ অর্থ অভাব ধরা হয়েছে। কিন্তু রামানন্দবাবু, যোগীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ঐ শব্দগুলি আনতে চাননি, কারণ (১) অর্থ পরিস্ফুট করবার জন্য, বিরুদ্ধ শব্দ তৈরী করতে—ঐ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োজন হয়; চিন্তারাজ্যে বেশ কিছু উন্নতি না ঘটলে এই শব্দ শেখানো যায় না, (২) ‘নিয়ম’ আর ‘অনিয়ম’ কথা দুটোর সঙ্গে পরিচয় ঘটালে, যদি বর্ণের দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়, তবে এমন কোন নতুনত্ব বেশি দেখা যায় না, (৩) বেশির ভাগ তৎসম শব্দই এই ‘অ’ দিয়ে গঠন করা হয়। উদ্দেশ্যগুলিকে আমরা শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত ও বলতে পারি; শব্দ পরিচয় ঘটানো যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে অনাবশ্যক শব্দের এত ভার না দেওয়াই ভালো। ‘আ’-কারাদি শব্দ-সংখ্যা সর্বত্রই প্রায় সমান। তবে বইগুলিতে মোট-সংখ্যার অর্ধেকেরও কম নিয়ে কাজ করা হয়েছে। সহজপাঠে ঈ, ঋ এবং ঌ-কারাদি শব্দ নেই, হাসি-খুসিতে ‘উ’-কারাদি শব্দ নেই; নামবাচক শব্দ বাদ দিয়ে বলছি। এই শব্দ এতই কম, মনে হয়, ঐ বর্ণগুলো বাদ দিয়েও যেন আমাদের চলতে পারে। স্বরবর্ণে অ, এ এবং ও বর্ণের উপর এঁদের সবারই ঝোঁক বেশি। বেশ বোঝা যায়, ঐ বর্ণের তৎসম আর প্রাকৃত শব্দ বেশ কিছু বর্তমান। ধ্বনিতত্ত্বের মতে বলা যায়, বাঙালী শব্দের আদিতে উচ্চ অপেক্ষা মধ্যাবস্থিত স্বরই বেশি পছন্দ করে। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, ‘উ’-কারাদি শব্দ মোটের উপর বেশি না হলেও, খুব নগণ্যও নয়। কাজেই আর একটি মন্তব্য আসে, জিহ্বার পশ্চাতের টান আমাদের বেশ কিছুটা আছে। মনের আবেগ প্রকাশ করতে উচ্চস্বরের সমকক্ষ কিছু নেই অথচ এই উচ্চস্বরটি আবার পশ্চাত্তানের। বাঙালীর স্বভাবে আবেগ এবং বিনয় যেন পাশাপাশি চলে।

ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ব (১৬২), প (১৫৯), ক (১৫৬), য (১২৬) এবং স (১২৬) বর্ণ নিয়ে গুরু বেশি শব্দের। বন্ধনীর মধ্যকার সংখ্যাটি নির্ণয় করে কতটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আদিতে সেই বর্ণ বসিয়ে। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যালিপিতে তাকালে একটি কথা বেশ

স্পষ্ট হয়। বাল্যশিক্ষাতে অত্যধিক শব্দ, তারপরের স্থান বর্ণপরিচয়ের ; কিন্তু সচিত্রবর্ণ-পরিচয় এবং হাসিখুসিতে শব্দের বহর কমে গেল, রবীন্দ্রনাথ আবার সংখ্যার দিক দিয়ে বর্ণপরিচয়ের কাছাকাছি গেলেন। বাল্যশিক্ষা আর হাসিখুসি যেন দুই প্রান্তের অধিবাসী, একটিতে শব্দ যেমন অতি বেশি, অন্যটিতে তেমনি অতি কম। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ব' এর কথাই ধরা যাক : বাল্যশিক্ষাতে—২৪, বর্ণপরিচয়ে—৪৫, সচিত্রে—৪১, হাসিখুসিতে—২৩, সহজপাঠে—৫৩।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যালিপিতে আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। মহাপ্রাণ বর্ণের (খ, ঘ, ছ, ঞ প্রভৃতি) সংখ্যা বাল্যশিক্ষা আর বর্ণপরিচয়ে যেমন অল্প, অন্য তিনখানিতে তেমনি অত্যধিক, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠে। বাল্যশিক্ষার লেখক বহু শব্দাঙ্কুর ঘটালেও এইসব স্থানে হার মেনেছেন। তার কারণ, এইসব বর্ণের তৎসম শব্দ খুবই কম, কিন্তু প্রাকৃত শব্দ বেশি। 'ঝ' বর্ণের কথাই ধরা যাক : বাল্যশিক্ষাতে—৪, বর্ণপরিচয়ে—৬, সচিত্রবর্ণপরিচয়ে—৬, হাসিখুসিতে—৩, সহজপাঠে—১১টি শব্দ। 'ঠ' বর্ণের কোন শব্দ বাল্যশিক্ষাতে পাওয়া গেল না। ওদিকে 'ষ' বর্ণের শব্দ মাত্র দুটি, তা-ও প্রত্যেকে এক-একটি ক'রে ব্যবহার ক'রেছেন, রবীন্দ্রনাথ তো ঐ বর্ণকে আমলই দিলেন না। ফলে মনে হয়, ষ-টির লোপ পাওয়া বিচিত্র নয়। অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যে ট, ড বর্ণের তৎসম শব্দ বোধ হয় নিতাস্তই নগণ্য। মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে 'ধ' 'ফ' 'ভ' বাল্যশিক্ষা আর বর্ণপরিচয়ে মন্দ ছায়াগা জুড়ে নেই। মনে হয়, ঐ গ্রন্থদুটির লেখকও প্রাকৃত বাংলাশব্দকে মাল্য করেছেন। এইপ্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন বর্ণের উচ্ছেদ কামনা করেছি, তার মানে এই নয় যে ওদের সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই ; শব্দের আদিতে ওরা না থাকলেও শব্দের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। উচ্ছেদ কামনা কববার মতো বর্তমানে আমার কোন উপকরণ নেই। ধারা বর্ণলিপির পরিবর্তন ঘটাতে চান তাঁদের একটু আভাস দিয়ে রাখলাম মাত্র।

এইবার শব্দ ব্যবহারপ্রণালীর কথা। বাল্যশিক্ষা আর বর্ণপরিচয়ে বেশির ভাগ শব্দ মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে ; কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বেশির ভাগ শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রামানন্দবাবুর পদ্ধতি অতটা স্বীকার করেননি। কতটা শব্দ ব্যবহার করেছেন তার সংখ্যা নিচে রেখে, কতটা শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন তার সংখ্যা উপরে বসিয়ে 'ব' বর্ণের দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি :

বাল্যশিক্ষা—১২, বর্ণপরিচয়—২৫, সচিত্র—১৩, হাসিখুসি—৩৬, সহজপাঠ—৩৬। এই পদ্ধতির কারণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি, তার আগে ক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ ক'রে নিই।

প্রায় উনিশটি শব্দ পাওয়া যায়। এই ক্রিয়া ব্যবহারে সমস্ত গ্রন্থকারেরই মিল আছে। মনে হয়, বাংলাভাষার ক্রিয়ার ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ নয়। কর্ণ শব্দটিই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ বৌদ্ধিক ক্রিয়ার প্রচলন বাংলাতে বেশি। উনিশটি তুলে দেওয়া যাক :

আছ, উঠ, কর, ধা, চল, ডাকা, থাক, দেওয়া, দেখ, ধর, পাওয়া, পড় (পতিত হওয়া), পড়া (পাঠ করা), বসা, চলা, যাওয়া, রাখা, হওয়া, হাস। রবীন্দ্রনাথ যাওয়া (৪০) এবং হওয়া (৪২) এত বেশি ব্যবহার করেছেন যে আর কোন লেখক অন্য কোন ক্রিয়াও অত বেশি ব্যবহার করেননি; একমাত্র বালাশিকার কর (৬২) খাতু ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ বে চলতাময়ী ছিলেন—তার একটি প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়; হওয়ার মধ্যেও তো জীবনের সেই গতিধর্মেরই আভাস পাওয়া যায়। সচিত্রবর্ণপরিচয়ে ‘হওয়া’ আর ‘কর’ খাতুর প্রয়োগ বেশি; মনে হয়, রামানন্দবাবু নীতিবাদী ছিলেন। কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয় যখন দেখি তিনি ‘খাওয়া’ খাতুটিও বেশ কাজে লাগিয়েছেন। এই তিনটির সমাবেশে বোঝা যায়, তিনি কর্মপ্রিয় ছিলেন। পড়া (পাঠ করা) ক্রিয়ার উপর ঝোঁক ছিল বিদ্যাসাগরের; তার চেয়েও বেশি প্রয়োগ করেছেন কর খাতুর। পড়াশুনা করা আর কাজ করা বা নীতিকে মান্য করা প্রভৃতি শিক্ষা আর নীতির দিকে বোধ হয় বিদ্যাসাগর বেশি মর্ষাদা দিতেন। এক হাসিখুসি ছাড়া হাস খাতুর প্রয়োগ অন্য বইতে নগণ্য। বাঙালী ‘হাসতে জানেনা’—সেই কারণ কিন্তু একমাত্র নয়; আসল কথা, হাসি দিয়ে খুব বেশি বাক্য গঠন করা যায় না; ‘মনে হয়, সুখ অতি সহজ সরল।’ আপাতদৃষ্টিতে ‘বলা’ খাতুকে বেশি মনে হয়েছিল, কিন্তু সংখ্যালিপিতে তার প্রমাণ মিলল না। ‘চল’ খাতুটি একমাত্র সহজপাঠে বেশি পাওয়া গেল।

যাই হোক, সংখ্যালিপি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি, প্রত্যেক গ্রন্থকারই এক-একটি স্বতন্ত্র মন নিয়ে শিশু-পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু এই স্বতন্ত্রমনের মধ্যে তৎকালের শিক্ষানীতির দিক যেমন ছিল তেমনি ছিল, নিজেদের মনের প্রভাব। সেই নিজ-মন তাঁদের বাংলাসাহিত্য-বোধের উপর নির্ভর করত।

বিদ্যাসাগর যখন বর্ণপরিচয় লেখেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ করা শেখানো। একে সংস্কৃতপ্রিয় লোক, দ্বিতীয় তিনি ছিলেন বাংলাভাষাকে সুবিস্তৃত করতে আগ্রহী। বাংলাভাষার গতি কি নেবে তখনও ততটা বুঝতে পারা যায়নি; মনে হয়েছিল, বাংলাসাহিত্য বুঝি সংস্কৃত শব্দকে ধার করে নিয়ে সমৃদ্ধ হবে; এমন মনে করবার কারণও ছিল। তাঁর পূর্বে বাংলাতে যে কাব্যধারা ছিল—তা এমনই লৌকিক ভাষা ঘেঁষা যে বিষয়বস্তুর স্ফোতনা ঘটতে সেগুলি তেমন সক্ষম হয়নি। সংগীত হয়ত ছিল, কিন্তু যুক্তি তেমন গড়ে উঠেনি। কাব্যের ধ্বনির দিকও কেমন যেন পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। সাধারণ লোক সহজ ভাষাতে আমোদ পেত কিন্তু প্রেরণা পেতনা। গানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিপ্রয়োগের দিক সাহিত্যিকদের নজরে এল। বাংলার কবিতা তৎকালে বেশি কথা বলেছে, কিন্তু গদ্য আপন স্বভাবে পরিমিত বাক্য ব্যবহারের দিকে টান রেখে চলেছে। ভাষা একে তো প্রতীক, তার পরিমিত বাক্য ব্যবহারের তাগিদ—বিশেষণধর্মী শব্দের দিকে ঝোঁক দিল; আর এই বিষয়ে সংস্কৃতে যেমন অফুরন্ত ভাণ্ডার, বাংলা তেমনই দেউলে; তা ছাড়া, যুক্তি প্রয়োগই সব নয়, মনকে আকৃষ্ট করতে হবে। মনকে আকর্ষণ করা যায় যদি

ভাষা আবেগধর্মী হয়। আবেগের বড় দিক ভাবের প্রবাহ আর ইঙ্গিত সঞ্চার। শব্দ ধ্বনি আর সুর চলতে চলতে একটু ব্যবধান রচনা করে আবার তিনের গতি যুক্ত হয়ে ধুক্তধারায় চলবে—ভাষার এই ধর্মই আবেগ সঞ্চার করে। গানের মধ্যেও তাই কাব্য-সম্পদ বিলক্ষণ রয়ে গেছে। সেই ধ্বনির অন্তেই স্বরব্যঞ্জনের লীলা শব্দসম্পদে আনা চাই; অর্থাৎ শব্দসম্পদ চাই। এ দিক দিয়েও সংস্কৃত শব্দ মহিমাম্বিত। কাজেই বিদ্যাসাগর তৎসম শব্দ আর তার সঠিক উচ্চারণের দিকে ঝোঁক দিলেন। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগের ভূমিকাতে তিনি ব'লেই নিয়েছেন, সমস্ত শব্দের অর্থ ব'লে দেবার দরকার নেই—ওতে উভয়েরই বিপদ, শিক্ষকের এবং শিক্ষার্থীর। কেবল বিদ্যাসাগরই নয়, পাশ্চাত্যদেশেও শুদ্ধ উচ্চারণ করানো কুইটিলিয়ান, লুথার প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীদের অন্ততম পদ্ধতি ছিল। শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না শেবালে শব্দের ধ্বনিবোধ হয় না, শব্দ মনে স্পর্শ করেনা, বানান ঠিক হয় না। ভাষা প্রতীক—কাজেই, বানানটিও ঠিক হওয়া চাই। তবে শব্দচর্চার একটি দিক অর্থবোধ ঘটানো; কাজেই, ছোট ছোট বাক্যের মধ্যে এই শব্দ ব্যবহার করা দরকার। বিদ্যাসাগরও শিশুদের বইতে সাধারণত সরল বাক্য ব্যবহার করেছেন; এই রীতিই তিনি অবলম্বন করেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তবে, শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি বাক্য বন্ধন ভুলে ধরেন তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ কথা আর নীতির সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করানো। নীতির দিক দিয়ে ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্র তৈরী করেননি, সর্বকালে সর্বমানবের মধ্যে যে-নীতি দেখা যায়—তাকেই অবলম্বন করেছেন। এই জন্যই বর্ণপরিচয়ে একবার মাত্র ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা এত বেশি। তিনি চিত্রধর্মী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধ্বনি-ধর্মী। বারবার একই শব্দ চোখের সামনে এনে দেখানোর চেয়ে ভাষার আত্মার প্রতি শিশুদের মনকে আকৃষ্ট করতে চাইতেন বিশেষ ক'রে। পেন্ডালংকীও এই ধর্মে বিশ্বাস করতেন : 'শিশুরা কেমন ক'রে শেখে? অন্তলোকের চিন্তা-ভাবনা-অভিজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাকে পুনরাবৃত্তি ক'রে তারা শেখে না, তারা শেখে এই শব্দগুলো তাদের মনে ভাব ও চিন্তার যে ইঙ্গিত বহন ক'রে আনে—তাকেই।' পেন্ডালংকী প্রাথমিক শিক্ষার বুদ্ধি-চর্চার দিক বলতে চিন্তার দিককেই বুঝিয়েছেন। এই চিন্তার হার্বার্টের 'আগ্রহ'-দিকের থেকে 'অন্তরীক্ষণ' (intuition)-এর দিকে বেশি দোর পড়েছে। এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষার সুর যম্বর। যতক্ষণ না প্রাথমিক ধারণা (conception) স্পষ্ট এবং দৃঢ় হয় ততক্ষণ সেই বিষয়ে শিক্ষা চলতেই থাকবে। কিন্তু পেন্ডালংকীর সঙ্গে মিল তাঁর ঐটুকুই। ছেলেদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে আগে কাজে লাগিয়ে পরে চিন্তাশক্তির বৃদ্ধির কথা বিদ্যাসাগর ভাবেননি। সেই কালে আদর্শ-পুস্তক পাঠনার তিনটি ধারা প্রচলিত ছিল; (১) খুব দ্রুততার সঙ্গে এই পুস্তকটির আত্মোপাস্ত বারবার পড়তে হবে (২) পুস্তকের প্রত্যেকটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে সেইটিই বারবার পড়ে দেখতে হবে, (৩) শিশুরা প্রতিবারই গোড়া থেকে শুরু ক'রে কিছুটা দূর এগোবে; এমনি ক'রে সমগ্র বইটা তাদের পড়া হয়ে যাবে। শেষের পদ্ধতিটি ছিল 'জ্যাকোটাটে'র (১৭৭০-১৮৪০)। বিদ্যাসাগর কোন পদ্ধতি অনুসরণ ক'রেছিলেন জানা

নেই, তবে পুস্তক প্রণয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয়, জ্যাকোটোই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। যাই হোক, যে কোন পদ্ধতিতেই বারবার শব্দকে চোখের সামনে তুলে ধরবার রীতিকে স্বীকার করা হয়নি। বিভাগাগর তৎকালের এই রীতিকে মান্ত ক'রেই গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছিলেন।

বালাশিক্ষার লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্তরূপ। তাঁর পুস্তকে একবার মাত্র ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। তিনি শুদ্ধ উচ্চারণের দিকেও মন দেননি। তিনি শিশু শিক্ষার মধ্যেই পরিণত পাঠকের রূপ দেখতে চেয়েছেন। জ্ঞানলাভ করানো ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তখনকার দিনে এর প্রয়োজনও ছিল। কারণ, প্রাথমিক স্তরের পর সাধারণভাবে বেনির ভাগ লোকেই আর পড়াশোনা এগোত না। তিনি চেয়েছেন, এই বয়সেই তারা সমস্ত রকমের জ্ঞান এবং সংবাদ লাভ করুক—রামায়ণ, মহাভারত, ইংরেজি-বাংলা মাসের নাম, দিনের নাম, মুসলমান পর্বের নাম, ফলের নাম, ফুলের নাম, মাছের নাম ইত্যাদি। এই পদ্ধতিও শিক্ষানীতিতে এককালে খুব প্রচলিত ছিল। জ্যাকোটোটের মতো বালাশিক্ষার গ্রন্থকারও স্বতিশক্তির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন, মুখস্থ কর, মুখস্থ। এই পদ্ধতির যে-কিছু তা আস্চাম (Ascham) ব'লে গিয়েছিলেন : 'এই পড়ানোর তাদের পাট কেবল জিভ্ আর ঠোঁট পর্যন্তই বাঁধা, মস্তিষ্কে পৌঁছায় না।' তবে বালাশিক্ষার বেলায় এইটুকু বলা যায়, পাঠ্যপুস্তক যখন আছে তখন স্বতিশক্তির উপরই যে লেখক একান্ত নির্ভর ক'রেছেন তা নয়, বানান-বাক্যগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শন-প্রতীক এবং চিন্তার যোগ-কেও তিনি স্বীকার করেছেন। বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বৈচিত্র্য শুধু নানাবস্তুর ভার—এতে পাঠনার কাজ সহজ হয় ব'লে মনে হয় না। কিন্তু উপায়ও নেই, কারণ যুগের প্রয়োজন মেটাতেই হবে।

সচিত্র বর্ণপরিচয়ের লেখক ভিন্ন দিকে গেলেন। তিনি চান সচরাচর প্রচলিত শব্দের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটুক। এই পরিচয় ঘটাতে বারবার একই শব্দকে ব্যবহার করতে হয়, তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে হয়। কথার মধ্য দিয়ে সেই শব্দের অর্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো আবশ্যিক। কাজেই তাঁর বইয়ে একবার মাত্র ব্যবহৃত শব্দ-সংখ্যা নিতান্ত কম। শব্দ-পরিচয় করানোর এই পদ্ধতি বর্তমানের শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মতও বটে। রামানন্দবাবু 'সচিত্র' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। যদিও পুস্তকের অন্তর্গত ছবিগুলি তেমন স্পষ্ট আর যত্নে আঁকা নয়, তবু গ্রন্থকারের এই ইচ্ছাকে বরণ করতেই হয়। শিক্ষায় ছবির প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা ডক্টর ভোগেল এবং ভাটের উল্লেখ ক'রে গেছেন। সমস্ত শিক্ষকই যে বোর্ডে ছবি আঁকতে পারেন তা নয়; কিন্তু তাই ব'লে চিত্রাঙ্কন না-জানলে শিক্ষা দেওয়া যাবে না-এমন কথা সত্য নয়। সেই প্রয়োজন মেটায় গ্রন্থ। লাইপজিগের শিক্ষক ডক্টর ভাটের যে-পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশুদের পড়াতেন, রামানন্দবাবুর পুস্তকে শিক্ষকদের প্রতি সেই ইঙ্গিতই রয়ে গেছে। তা ছাড়া সচিত্রবর্ণপরিচয়ের শব্দগুলি পরিচিত পরিবেশ থেকেই আহরণ করা।

শিক্ষণরীতির আর-একটি দিকও আছে। তা হচ্ছে মনোজ্ঞধর্মিতা। শব্দ চয়ন করতে হবে শিশুদের পরিমণ্ডল থেকে, তাদের চিন্ত আকর্ষণ করতে হলে সেই পরিমণ্ডলের উপর কৌতুহল আর আগ্রহ বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। এই দিকটিই আনলেন যোগীন সরকার হাসিখুসি-তে। তিনি হাসিখুসির মধ্যেই নাটকের গুণ প্রয়োগ করলেন, অঙ্কে ছড়ার মধ্যে আনলেন। আর আনলেন শিশুদের যে-বিষয়ে বিশেষ কৌতুহল সেই জন্তুজগতের দিক। এতে একটা রোমাটিক দিক আছে যেন। একজন শিক্ষাবিদ বলেন ‘সত্যি কথা বলতে কি, সমগ্র দুশ্চলমান বস্তু বিশেষ করে জীবজন্তু শিশুদের কাছে বয়স্কদের চেয়েও বিশেষ আগ্রহের।’ কিন্তু যোগীন সরকারের বড় ক্রটি স্বল্পসংখ্যক শব্দ ব্যবহার। এত কম শব্দজ্ঞান পরবর্তীকালের পাঠের পক্ষে ব্যাঘাতকর। তা ছাড়া তিনি মনোজ্ঞধর্মিতার একটি দিকই মান্য করেছেন। শিশুদের যে-বিষয়ে আগ্রহ সেই বিষয়েই তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন; শিশুদের কৌতুহল চরিতার্থ করা ছিল তাঁর কাছে বড়, কৌতুহল সৃষ্টি করার দিকে তত নয়। এ বিষয়ে তিনি অনেকটা ফ্রয়েবলের নীতিতে বিশ্বাসী ব’লে মনে হয়। কিন্তু ফ্রয়েবলের একটি ধারাই তিনি অনুসরণ করেছেন—ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতির মর্মটি মানতে পারেননি: ‘শিশুদের মানসিক ক্ষমতা আপন কর্ম-ক্রীড়া থেকেই জাত হয়’ কিংবা ‘ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে শিক্ষার্থীকে চোখ এবং হাতের কাজ করতে শেখানো হবে।’ আসল কথা যোগীন সরকার পাঠ্যপুস্তককে শিশুদের চিন্তাকর্ষক ক’রেই তৈরী করতে চেয়েছিলেন; শিক্ষকের অংশ এখানে নিতাস্তই সামান্য। শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে যোগ ক’রে দিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকের পক্ষে এ এক বিশেষ যুগ সৃষ্টি করেছে যেন।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের পুস্তককে যেমন মনোজ্ঞ ক’রে তৈরী করলেন তেমনি পাঠ্যবিষয়-বস্তুতে কৌতুহলেরও সৃষ্টি করলেন। তিনিও শিশুদেরই পরিবেশ থেকে শব্দ চয়ন করলেন, শব্দসংখ্যাও খুব বেশি যোজনা করলেন। কিন্তু এই পরিবেশ এল প্রকৃতিরাজ্য থেকে; এখানে জন্তুজানোয়ারের প্রবেশ যেন নিষেধ। গাছ-লতা-ফুল-নদী-গ্রাম এবং গৃহস্থের পরিবেশ থেকে তিনি আহরণ করলেন শব্দ। সৌন্দর্য আর ধ্বনি-ছন্দের দিকে ছিলেন তিনি আসক্ত। সৌন্দর্যের সেই রোমাটিকতা আর ধ্বনি-ছন্দের অনুসরণ তিনি শিশুর চিন্তে সৃষ্টি করলেন। মানুষের নিজস্ব শিক্ষা বলতে তিনি চিন্তাশক্তি আর কল্পনাশক্তির বিকাশকেই বোঝাতেন। এ-বিষয়ে পাতলভ-ওয়াটসন্-থর্পডাইক-কাঙ্কা-কুহলারের বিড়াল-ইঁদুর-কুকুর-বানর-শিম্পাঞ্জীর উপকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে খুব বেশি আমল দেননি। তিনি মানুষের শিক্ষা-কে মানুষের মনের মধ্যেই খুঁজতে চেয়েছেন; প্রেতোর মতো তিনিও সৌন্দর্যের দিককে বড় ব’লে ধরেছেন লক্ষ এবং স্পিয়ারম্যানের মতো তিনিও চিন্তন-পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ ক’রে শিশুদের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। বর্তমানে, পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে বলে ওদেশের শিক্ষাব্রতীরা যে-কারণ নির্দেশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজে তা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মানুষকে বাদ দিয়ে আইন-প্রণয়ন হয়ত চলতে পারে কিন্তু মানুষের শিক্ষা সকল করা যায় না। মানুষের শিক্ষার মূলে আছে, মনের আবেগ—বেগ সংহত আর

সংবদ্ধ করা। কাব্য-পাঠের দিকে ওদেখে তাই এত ঝোক পড়েছে। স্বাদনা-পাঠের (appreciation lesson) দিকে এত যে-ঝোক তার কারণ এর মধ্য দিয়েই অশুভুতিগুলি বিকশিত হয়, গ্রন্থিত হয়। আধুনিক কালে মানসিক শক্তির রাশি-বৈজ্ঞানিকেরা (Psychometricist) সৃষ্টিধর্মিতার কোন ব্যাখ্যা করতে পারেননি ব'লে ঘোষণা করেছেন; কিন্তু প্রাচ্য দার্শনিকেরা সেই সৃষ্টিশীল মনকে খুঁজে পেয়েছিলেন চিন্তা আর কল্পনাশক্তির মধ্যে; তাই তাঁরা বর্ণকেও ব্রহ্ম ব'লে অভিহিত করেছেন। সৃষ্টি-ধর্মিতার আচরণ শিক্ষার্থীর মনের মানসাক করে বোকা যায় না—এ কথা সত্য হলেও মানুষের সৃষ্টিধর্ম নেই এ কথা তো সত্য নয়। কাছেই শিক্ষার্থীকে সেদিক দিয়ে তৈরী করাতে হবে। হয়ত সে শিক্ষা ব্যক্তিক (subjective) কিন্তু ব্যক্তিক দিককে বাদ দেওয়ার কথা জীন্স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকে তাই সত্য ও শাস্ত দিককে চোখের সামনে রেখেছেন। ছবিগুলিতেও সেই কল্পনাশক্তির খেলার সুযোগ রয়েছে। আকাশের গায়ে, মেঘের লীলায় আমরা কতরকম মনের ইচ্ছাই না আরোপ করি, এ ছবিগুলিতেও শিশুদের স্বভাবসুন্দর মনের সেই অভিক্ষেপ (projection) ঘটানোর সুযোগ রয়েছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় যেমন তিনি ছেলেরদের ধ্যানের অবসর দিতেন, পাঠ্যপুস্তকেও তেমনি কল্পনাকে উৎসারিত করবার সুযোগ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, বাংলার অতৎসম শব্দগুলির ব্যবহার। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সচিত্রবর্ণপরিচয় সহজপাঠের পূর্বে প্রকাশিত ব'লে দেখতে পাচ্ছি)। তবে সচিত্রবর্ণপরিচয়ের শব্দগুলি পড়লে মনে হয় তাদের স্বভাবে কোথায় যেন কৃত্রিমতা রয়েছে, কিন্তু সহজপাঠে এইগুলি এত সার্থক, সহজ আর সুন্দর যে মনে হয়, তৎসম শব্দ পরিহার করা বোধ হয় একেবারে অসম্ভব নয়; শুধু চাই রবীন্দ্রনাথের মতো আর-একজন প্রতিভার যিনি বাংলার সৌকিক কাব্য থেকে, লোকের ভাষা থেকে ভাষার সত্যকার ধ্বনি আর সুস্বাদু আবিষ্কার করতে পারবেন। তা সম্ভব কিনা জানি না।

যাই হোক, উপসংহারে বলতে চাই—এই পাঠ্য পুস্তকগুলি বাংলার শিক্ষাজগতে যেন আবির্ভাব। কিন্তু তবু শিক্ষার্থীর পক্ষে কেন তেমন উপযোগী হল না? সে বিষয়ে এ-প্রবন্ধে বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ নেই; সংক্ষেপে একথা বলা চলে, প্রাথমিকশিক্ষায় তেমন কোন প্রতিভার খবর পাওয়া যায়নি; শিক্ষক যদি প্রতিভাশালী হতেন তবে এই পাঠ্যপুস্তকের যে-কোন একটিকে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করতে পারতেন; তবে, প্রতিভার জন্মও ক্ষেত্র নির্মাণ করা চাই! এতৎসত্ত্বেও একটা কথা বলা দরকার, এর মধ্যেকার কোন-একটি গ্রন্থ কিন্তু ভাষা-শিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ নয়; সবগুলির মধ্যে যে-পদ্ধতি আছে তাকে একত্রে আনয়ন করাই হবে সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক।

একটি কাপুরুষের গল্প

দেবকুমার মৈত্র

[এ গল্প আমার অপৌরুষের। আর আমার অপৌরুষের গল্প আমাকেই লিখতে হবে একথা কোনোদিন চিন্তাই করিনি। মায়ার সাথে পাঁচবছর বাদে আবার দেখা যদি না হতো তাহলে এ-গল্প অন্ধদের মিছিলে পরিপূর্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করতো না। কিন্তু দ্বিতীয়বারও আমি কাপুরুষোচিত আচরণ করলুম। তারপর আমার সম্বন্ধে একটা অপরিণীম ঘণা হয়তো বহন করে নিয়ে গেছে মায়ার, হয়তো মনে মনে ধিকার দিয়েছে আমার কাপুরুষতাকে। সেই দৌর্বল্যের ইতিহাস অরণ করে আমার চেতনার নিস্তরঙ্গ তার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। মনের মানিকে তাই কাগজের পাতায় পাতায়, অক্ষরে আর ভাষায় ঢেলে দিলুম।]

একটি কলকাতাহিনীর ওপর যবনিকা পড়েছিল পাঁচবছর আগে। আবার ড্রপসিন উঠলো রাতের নাগপুর প্যাসেঞ্জারের ডেরা কামরায়। সারাদিন ধররোজের লেপিহান জিন্সা বিস্তৃত পথ পরিক্রমার পর পরিশ্রমে প্রায় ঝুঁকতে ঝুঁকতে চক্রধরপুর স্টেশনে এসে কিছুক্ষণের জন্তে নোঙর কেললো নাগপুর প্যাসেঞ্জার। পাহাড়ের ঢালু দ্বিগে গড়িয়ে গড়িয়ে তার কিছু আগে রাত্রি নেমেছে ঘন-আঁধার বেশে।

নীলাভ সিগারেটের ধোঁয়া জানালার বাইরে হাওয়ার ভাসিয়ে চার পয়সার এক ভাঁড় চা কিনলুম। ঝুঁজে ঝুঁজে কাঁকা দেখে এই কামরাতেই উঠলেন এক ভদ্রলোক সকুলি মালপত্র নিয়ে। চকোলেট বং সিনেনের ট্রাউজার্স, বাদামী হাওয়াই শার্ট পরনে, চোখে পুরু লেনসের লাইব্রেরী ফ্রেম চশমা। ভদ্রলোকের পিছন পিছন উঠলো এক তরী : দুধ ধবধবে কপালে কয়েক টুকরো উড়ু উড়ু চুল, গাঢ় লাল কনুই হাতা ব্লাউজের ওপরে পলাশবাঙা শাড়ীর আঙুন ছড়ানো, পায়ে স্কাল্পেট বং মধ্যমলের চটি, ঠোঁটে রক্ত-পদ্ম। কৃত্রিম উপায়ে কাঁপানো, ডেউ খেলানো চুল।

কামরার সকলেই অবাক বিষয়ে তাকালো সেদিকে, আমিও তাকালুম। তাকালুম আর শরীরের সমস্ত রক্তপ্রবাহ সেই মুহূর্তেই ঝাকি দিয়ে শুরু হয়ে গেল যেন : কে !!

কিন্তু মায়ার দেখতে পারিনি, খেয়ালও করেনি আমাকে। হাতে খবরের কাগজ ছিল, মেলে ধরে তার আড়ালে আত্মগোপন করলুম। সূযোগ বুঝে এক স্টেশনে নেমে পড়লেই চলবে, তারপর কামরা বদল। কিন্তু কামরায় একটি মাত্র দরজা আর তার মুখেই শুছিয়ে বসলো ওরা। তবু অপেক্ষা করতে হবে এখনই আত্মগোপন করে। রাত বাড়বে, তন্দ্রায় চলে পড়বে সকলের চোখ...সেই সময় অলক্ষ্যে অগোচরে পালাবো

অন্ত কোনো কামরায়। শরীরের কোষে কোষে এক অস্বস্তিকর নিরুশ্বাসি ছিলে। ছিলে পাকিয়ে পাকিয়ে ছমড়ে মুচড়ে বইতে লাগলো : চক্রধরপুর স্টেশনে মায়া হঠাৎ উঠবে, আর আমারই কামরায়—এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। ছুজনে একই কামরায় বিভিন্ন বেকিতে বসে রাত কাটাবো অথচ কথা বলতে পারবো না, আমি কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে বসে থাকবো আর মায়া জানবেও না তারই সাথে আমিও চলেছি। কিন্তু মায়াই সাথে ওই ভদ্রলোক কে! কাগজের আড়াল থেকে কণিক দুঃসাহসে উঁকি দিয়ে দেখলুম মায়াই সিঁথি নিরং নিদাগ।

প্রবাদবাক্য আছে যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই নাকি সন্ধ্যা নামে। লিনেন ট্রাউজার্স সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বসলেন, আপনার হাতে ওটা কি আজকের স্টেটসম্যান।

শুনতে পেয়েও যেন পেলুম না। শুনতে, গভীর অভিনিবেশে কাগজে মুখ ডুবিয়ে বসে বইলুম।

: আপনার হাতে ওটা কি আজকের স্টেটসম্যান?—আবার প্রশ্ন এস! এর পরেও উত্তর না দেওয়াটা অভদ্রতা। কামরায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির হাতে ধবরের কাগজ নেই! অতএব এ-প্রশ্নের লক্ষ্যস্থল যে আমিই সে বিষয়েও নেই তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ। কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে রেখেই জবাব দিলুম, হ্যাঁ।

ফার্স্ট শিফ্টে দেবেন কি কাইগুলি। ওটা তো পড়ছেন না আপনি!

স্বর বতটা সম্ভব গভীর রেখে বললুম, পড়বো এখনই।

: ও।

রাত বেড়ে চলেছে। ট্রেন চলেছে চিকিয়ে চিকিয়ে। মাঝে মাঝে ধামছে ছোট ছোট স্টেশনে।

রাজ বরসোয়ান।

উদগ্র আশঙ্কায় অস্থির মুহূর্তগুলি কাটছে। মুখের সামনে এখনো ধবরের কাগজের চৈনপ্রাচীর।

টাঁটানগর। ইম্পাত শহরের আকাশ ফানেসের আঙনের প্রতিকলনে লালে লাল। তজ্জায় ঢুলছে অনেকে। ওরা এখনো জেগে বসে আছে। চা পুরী মিঠাই কিনলো।

: তুমি এই বেঞ্চে শুয়ে পড় মায়া, রাত জাগলেই তো তোমার আবার মাথা ধরবে।

: না। বরঞ্চ তুমি শোও ওখানে। ট্রেনে আমার ঘুম আসে না।

কণ্ঠস্বরটা ছুরির তীক্ষ্ণধার ফলার মতো এসে বিঁধলো হৃদপিণ্ডে। সর্বনাশ! সমস্ত রাত এখন জেগে বসে থাকবে নাকি, দোর আগলিয়ে! ধবরের কাগজের আড়ালে কতোক্ষণ আর এমন আত্মগোপন সম্ভব! প্রতিটি লাইন, প্রতিটি অক্ষর তিনচারবার পড়া হয়ে গেছে। চোখের পাতা সীসের দলার মতো ভারী হয়ে উঠেছে, তজ্জায় আত্মর হয়ে আসছে সর্বাক।

ঘাটশিলা।

ঠিক এমনি এক আশঙ্কা-উদ্বেগ অস্থিরতা আগেও একবার অনুভব করেছিলুম। সে গল্প বলতে গেলে কিছু ভূমিকা অবশ্য প্রয়োজন। উদ্ঘাটন করতে হবে মায়া সেনের সাথে আমার পূর্বপরিচয়ের ইতিহাস।

দৈনন্দনের পৃথিবী চিরপুরাতন : অভাব অভিযোগের কালো পাহাড়ের চতুর্দিকে আমরা বোবা যন্ত্রণায় কঁদে মরি। তবু যৌবনের প্রভাত এখন আলো ছড়ায় আমাদের মনের অন্ধগলিতেও সিঁদুরারোয়ার লাগে তান। আমাদেরই চেতনার রংএ পালা হয় সবুজ, চুনী হয়ে ওঠে লাল। আমরা তাকাই পূবে পশ্চিমে, জলে ওঠে আলো। মায়া সাথে প্রথম পরিচয়ে তাই মনে ছোঁয়া লাগিয়েছিল উদ্বাস্তুত্বের বর্ণালী। রং রেখার বিস্তারিত গড়ে উঠেছিল বিচিত্র এক ছবি।

সকালবেলা খবরের কাগজে একদিন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল একটি : ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট চাই। বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়েছিল একবার দেখা করলে ক্ষতি কি! সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করে বেরিয়েছি, পুঁথিগত বোগ্যতা আমার আছে ওই পদের প্রার্থী হবার। যদি কপালে থাকে লেগেও যেতে পারে! সন্ধ্যাবেলা এক বছর সাথে আসোজনা করে পরদিন সোজা চলে গিয়েছিলুম বিজ্ঞাপনদাতার সাথে দেখা করতে।

একটি ছোট ওষুধের কারখানা। মালিক অমরেশ সেন দোতলায় বাস করেন সপরিবারে। একতলায় দু'টি ঘর আর একটি নাতিবৃহৎ করোগেটেড টিনের শেডে শুধু ওষুধ তৈরী সংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতি, শিশি বোতল, কেমিক্যালসের স্টোর, একটি ছোট ল্যাবরেটরি। করিডরের একপাশে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন প্লান্ট। বাইরের ঘরটি অফিস। এই নিয়ে 'নিও থেরাপিউটিক্স'।

অমরেশবাবুর প্রথম সাক্ষাতেই হয়তো আমাকে ভালো লাগে, আর সেই ক্ষণেই নিবৃত্ত করেছিলেন ওই পদে। মায়া সেনের সাথে আমার পরিচয় ওই নিও থেরাপিউটিক্সেই। ওকে প্রথমদিন দেখেছিলুম মুহূর্তের ক্ষণে। অফিসে বসে খাতাপত্র দেখছিলুম, যুগ তুলতেই দেখি একটি তরুণীর নীরব দৃষ্টি আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে করিডরের পাশে দোতলায় বাবার সিঁড়ির ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে। ধবধবে গায়ের রংএ নিপাড় হালকা সবুজ রংএর শাড়ী সতেজ পুঁইলতার মতো ঝড়িয়ে আছে। একবার চোখাচোখি হবার সাথে সাথেই যুগ বন্ধিম হাসির ঢেউ ছুঁড়ে দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি বেয়ে।

তার পরমুহূর্ত থেকে মেয়েটিকে আবার দেখবার আশায় আমি উদ্গ্রীব হয়ে রইলুম। এবার দেখা হলে ও যদি হাসে জবাবে আমিও হাসি ছুড়ে দেবো। সময়ের পাখা মেলে তিনচারদিন উড়ে গেল তারপর।

সেদিন বেলা প্রায় তিনটে তখন। ল্যাবরেটরিতে নিবিষ্টমনে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে কেমিক্যাল ব্যালান্সে ওজন করছিলুম। নর্মাল অ্যাসিড সল্যুশন তৈরী করতে হবে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ধোঁয়া নাকে ঢুক নিখাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে, ক্রমাগত কাশছিলাম।

কারখানা নিরুন্ম। শনিবার। অর্ধেক দিনে ছুটি হয়ে গেছে। যাত্রা ছুটি প্রাণী আমরা তখনো ছিলাম। আমি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কালোবাবু। জরুরী অ্যানালিসিস রিপোর্ট আজই তৈরী করা প্রয়োজন, সোমবার সকালে সরকারী দপ্তরে পাঠাতে হবে। কি একটা কাজে কালোবাবু বাইরে গেল। বলে গেল, এক্ষুণি ফিরবো।

শৌ শৌ। শব্দে বার্নার জলছে। বার্নারের ওপর ট্রিপড্ স্ট্যান্ডে ডিষ্টিলিং ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের মুখে কন্ডেন্সার লাগানো, কন্ডেন্সারের আর এক মুখে রবারের নল, তারপর ডেলিভারী টিউব। সেখানে রাখা হয়েছে মেজারিং ফ্লাস্ক। ডিষ্টিলিং ফ্লাস্কে ফুটন্ত ওষুধের আলোড়ন, আর মেজারিং ফ্লাস্কের টুপ্ টুপ্ ফোঁটার ফোঁটার করে পড়ছে ডিষ্টিলেট্ঃ অ্যালকোহল।

এমন সময় লক্ষ্য করলুম সেই তরুণী ধীর পদক্ষেপে এসে ল্যাবোরেটরিতে ঢুকছে। সমুদ্রনীল রংএর পাইপিং শাড়ী পরেছে, মুখে প্রসাধনের প্রলেপ, সূর্য্য টেনে আয়ত করে এসেছে চোখের ভলী। একবার মুখ তুলে তাকিয়ে হেসে আমি যেমন কাজ করছিলাম, করে চললুম।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

: এটা কি অ্যাসিড্?—হঠাৎ প্রশ্ন এস। ওজনের বাক্স থেকে একটি ওজন করসেপে তুলে নিয়ে ব্যালান্সের ডানদিকের প্যানে রেখে বললুম, এঁয়া, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

আবার নীরবতা। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে নাকে চুপতে থাকলো। আর হিসেবে কেবলই ভুল হতে লাগলো যখনই মনে পড়তে আরম্ভ করলো আমার পিছনে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী সর্কোভুক দৃষ্টিতে আমারই কাজ দেখছে।

মনের চকসতার সাথে তাল রেখে কেমিক্যাল ব্যালান্সের কাঁটাটা ছলে চললো। এভাবে আমার কাজের সময় ল্যাবোরেটরিতে আসবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই মেয়েটির! যখন কারখানা নিরুন্ম, মনপ্রাণীহীন! তবে কি ও জানেনা এখন কারখানায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই! কিন্তু কালোবাবু, কালোবাবুই বা এত দেরী করছে কেন ফিরতে? গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে যেন, এক মাস ঠাণ্ডা জল খেলে আরাম হয়।

ওর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই পাশের ঘরে গেলুম। জল খেয়ে অনেক আরাম বোধ হল। কিন্তু ফিরে এসে আবার বসতে হল সেই দৃষ্টির সামনেই : অ্যানালিসিস শেষ করা অত্যন্ত জরুরী।

: আপনার নাম অশোক?

কাজ বন্ধ করে ঘুরে বসলুম মুখোমুখি, কি করে জানলেন?

: কেন, যন্ত্রে!

বললুম, বাঃ! আপনি তো বেশ মজা জানেন দেখছি।

ও হাসলো আমার দিকে চেয়ে।

বললুম, আপনি তো না হয় মস্তেই আমার নাম জেনে ফেলেছেন। কিন্তু আমি তো মস্তভয় কিছুই ভেমন জানিনে, তাই আপনার নামটা—

: আমার নাম ?—ও আবার হাসলো, মায়া।

: মায়া!—সেবার হাসবার এবং হাসাবার পালা আমার। বললুম, একেই তো মস্তভয় মায়া বশীকরণে পারদর্শী, তার সাথে আবার মায়াও ?

হাসিতে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো মায়া।

তারপর দিন দুপুরে ল্যাবোরেটরিতে আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনায় সময় কাটলো আমার। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে বিকেল নেমে এস। একবারের জন্তেও ওর দেখা পেলুম না। কেমন যেন অর্থহীন মনে হল দিনটা। মনে মনে নানারকম যুক্তির চেউ তুললুম। যে মেয়ে গতকাল নিজে এসে যেচে আলাপ করলো সে আজ এলো না কেন! হয় তো কোন কাজে ব্যস্ত ছিল, আমার সময় পায়নি। আর হঠাৎ একটি চিন্তা ঝলকানি দিয়ে গেল, কালকে ল্যাবোরেটরিতে আমি ছাড়া কেউ ছিল না সেই জন্তেই ও এসেছিল নির্জনে আলাপ করতে। আজ কালোবাবু ছিল, অমিকেরা ছিল, ছিলেন অমরেশবাবু! শনিবারের আশায় দিন গুনতে লাগলুম।

এল সেই আকাঙ্ক্ষিত শনিবার। বেলা যখন বায়োটা বাজলো ল্যাবোরেটরিতে ঢুকে এ্যানালিসিসের যন্ত্রপাতি টেবিলে সাজালুম। ছুটোর পর কারখানা নিরুপস্থিত হয়ে গেল। আর জলন্ত বার্নারের শোঁ শোঁ শব্দের তালে ডিটিলিং ক্লাস্কে ফুটন্ত ওষুধের আলোড়ন দেখে চুপ করে বসে রইলুম।

অমরেশবাবু বেরিয়ে গেলেন কাজে। ল্যাবোরেটরিতে আমাকে দেখে বোধ হয় অবাক হলেন। বললেন, আপনি যাননি এখনও ? ছুটো তো বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

বললুম, এই এ্যানালিসিসটা প্রায় হয়ে এসেছে, শেষ হলেই বেরোব।

জানতুম মায়া আসবেই। এলও। আমাকে ল্যাবোরেটরিতে দেখে কপট বিষয়ে বললো, আপনি আছেন এখনও ?

ভাবলুম বলি, কেন বসে আছি তা ভুমিও জানো। কিন্তু তা না বলে বললুম, এই এ্যানালিসিসটা অত্যন্ত জরুরী, শেষ না হলে যাই কি করে।

সমস্ত শরীরে হাসির চেউ ছড়িয়ে মায়া বললো, সত্যিই জরুরী ?

বললুম, জরুরী তো বটেই নইলে—

বাকী কথা না বলে ইঙ্গিতে ঈষৎ হাসলুম।

তার পরদিনও মায়া এল দুপুরে, এবারে সকলের সামনেই। ছুতো হিসেবে একটা অঙ্ক নিয়ে এসেছিল। বললো, এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না কিছুতেই, বুঝিয়ে দেবেন একটু।

অমরেশবাবু ছিলেন বসে। বললেন, আপনি তো সচ পাশ করেছেন, নিশ্চয়ই মনে আছে ওসব। মাঝে মাঝে ওকে দেখিয়ে টেকিয়ে দেবেন একটু। আমার তো কিছুই মনে নেই।

অঙ্কটা সোজা। দু মিনিটেই শেষ করতে পারতুম, তবু দশ বারো মিনিট লাগলো। তারপর ও আরএকটা অঙ্ক বার করলো, তারপর আরএকটা, তারপরও।

এইভাবে নানা ছলে ছুতোয়, কখনও অঙ্ক, কখনও কেমিষ্ট্রি, কখনও কিজিঙ্গ নিয়ে পরিচয় অস্তরঙ্গ হয়ে এস। মায়ার সাথে আমার পরিচয় সহজ হয়ে গেল সকলের চোখেই। তারপর রোজই আসতো আমার ল্যাবোরেটরিতে যতক্ষণ থাকতুম আমার সমস্ত সময়টুকু ওই কেড়ে নিত। কাজ কিছুই হতো না। হয়তো কোন ওষুধের এ্যাসকোহল কন্টেন্ট বার করবার ক্ষেত্রে ডিষ্টিলিং ফ্লাস্ক সাজিয়েছি, বার্নার জ্বালবো মায়ী এসে গ্যাসের কানেকশান বন্ধ ক'রে দিল। হয়তো ওজন করছি কেমিক্যাল ব্যালান্স ও এসে দিল এমন নাড়া সব গুণগোল হয়ে গেল।

: আমার কাজ নষ্ট করলেন তো!—হয়তো বিরক্তির সাথেই বলতুম।

: ভারী তো কাজ।

: জানেন অত্যন্ত জরুরী এই এ্যানালিসিস্, সময় মতো সরকারী দপ্তরে রিপোর্ট দিতে হয়।

: আপনার ওই বাজে কাজ এখন না করলেও চলবে।

: কিন্তু এই বাজে কাজের ক্ষেত্রেই আপনার বাবা আমার মাইনে দিচ্ছেন।

: বাবা মাইনে দিচ্ছে তো হয়েছে কি, কীকি দিতে শেখেননি!

বলতুম, কিন্তু—

: কিন্তু না, তার চাইতে আশুন আমাকে পড়া দেখিয়ে দেবেন।

অতএব বই খাতা আসতো। ক্রমশ আলাপ গাঢ় হতে লাগলো, পরিণত হল অস্তরঙ্গতায়। আমার রসায়ণ গেল চুলোয়, মাস্টারিই হল নেশা এবং পেশা। অমরেশ বাবুরও এতে আপত্তি ছিল না কোনো। কেননা, আমার করবার কাজ খুব বেশি মেই। আইনে আছে একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধান ছাড়া লাইসেন্স দেওয়া হবেনা। আইন বাঁচানোর ক্ষেত্রেই আমার নিয়োগ। মায়াকে পড়ানোর ব্যাপারে তাই অমরেশবাবুর আপত্তি ছিলনা কোনো, ওটাকে মনে করতেন উপরি লাভ। নিচেরতলার কারখানার ল্যাবোরেটরি থেকে প্রমোশন পেয়ে উন্নীত হনুম দোতলায় মায়ার সুসজ্জিত পড়বার ঘরে। ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ানোর অজুহাতে উদ্দেশ্যহীন গল্প।

দিন যত এল, ততো গেল। ওর সান্নিধ্য আমার মনকে আকর্ষণ করতো আশ্চর্যভাবে, চুপক কখন টানে সৌহৃদ্যকে। চেষ্টা করতুম দূরে দূরে সরে থাকবার, এ দুর্বলতাকে রোধ করতেই হবে। তবু ও কাছে এলেই অকারণ পুলকে শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতো; ওর ধবধবে গায়ের রংএ উজ্জ্বল রঙান শাড়ীর বাহার, ওর চুড়িতে চুড়িতে নিকন আর সুর্মাটানা আয়ত চোখ, দেহকে ঘিরে আবছা আবছা কেসমিনের গন্ধ; একটি মেয়ে আমাকে সাহচর্য দিচ্ছে এই চিন্তা ছেয়ে কেসতো মন। কখনও কখনও চেষ্টা করতুম এই দুর্বলতা রোধ করবার। কিন্তু আমি যত সরে যাই ও ততো এগিয়ে আসে। আমি

যদি হই নিশ্চুপ, কথার ঝরণায় ও আমাকে সবাক হতে বাধ্য করে : সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি !

ছেলেদের সম্পর্কে ওর মতামত শুনে আশ্চর্য লাগতো। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের অন্তান্ত অভ্যাসের মতো, সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে গেলে, যৌনসম্পর্কটাও একান্ত প্রয়োজন। তা সে বৈধঅবৈধ যে উপায়েই হোক না কেন, বলতো মায়া। ছেলেদের ও মেয়েদের যৌনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার সম্ভবিশেষ ছাড়া কিছুই মনে করতো না। একটি শার্ট বা শাড়ী ছিঁড়ে গেলে আমরা যেমন নতুন কিনি তেমনই একটি ছেলে পুরনো হয়ে গেলে বা তার সাথে সম্পর্ক ছেঁদ হয়ে গেলে মেয়েদের মনে অন্য কোনো পুরুষ সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মানো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আমার কেমন অবাক লাগতো। কিছুতেই মেনে নিতে পারতুম না ওর মত। তাহলে মানুষের সাথে পশুর তফাৎ কোথায় ?

: এ তোমার অত্যন্ত অসুস্থ ধারণা।—বলতুম।

: কেন ?

: মানুষের সাথে পশুর তফাৎ তাহলে কি রইলো ?

: কোনোই তফাৎ নেই।—মায়া বলতো, আর এতে মানুষ পশুর তুলনাই বা আসে কোথেকে ? আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অন্তান্ত অভ্যাসের মতো এটিও একটি দৈহিক চাহিদা মাত্র। ইট ইজ্ নাইদার গডলি, নর বীস্টলি। ইট ইজ্ ম্যানলি।

তর্ক বাড়াইনি কোনোদিন। তবে তারপর থেকেই কেমন আশ্চর্য লাগতো যেয়েটিকে। অন্তত নিজের অভিমত না থাকিয়ে চুরিয়ে সোজাভাবে জানাবার মতো বলিষ্ঠ মন আছে। আমার অভিমত আমার নিজের, অন্যের সাথে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ কি ! তর্কে কখনও মীমাংসা হয় না।

আরও অবাক লাগতো মায়ার একদল ছেলে বন্ধর ও বাড়িতে অবাধ যাতায়াত দেখে। মায়া অস্মানবদনে গিশতো সকলের সাথেই : বৈচিত্র্যেই হয়তো ও আনন্দ পেতো। এর জন্তে মনে মনে জীর্ণাশ্রিত হতুম। ও আমার—একান্ত নিঃস্বভাবে আমারই হয়ে থাক, এই কামনা করতুম। ওর সাথে আমার যতটুকু বনিষ্ঠতা হয়েছে সেইটেতেই আশ্বস্ত মনে হতো। মিশুক না আর পাঁচজনের সাথে তাতে আমার ক্ষতি নেই কোনো। আমার দিকে নজর রাখলেই যথেষ্ট। আর মনে মনে ভাবতুম : যতই যুখে বলুক না মায়া, যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে ওটা কখনই ওর মত নয়। ধার করা, বিলিতি পুঁথিতে পড়া বুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ট্রাম রাস্তার ধারে ছোট ত্রিকোণাকার পার্ক, কয়েকটি আমগাছ। আমগাছগুলির নিচে ছোট ছোট সবুজ রংএর বেঞ্চি। এক একদিন বিকেলে কারখানা থেকে ফিরে স্বান জামাকাপড় বদলিয়ে আবার যেতুম, গিয়ে অপেক্ষা করতুম ওই পার্কের বেঞ্চে। এক এক মিনিট মনে হতো এক এক যুগ। আর ফুটপাথে চলমান মানুষের মিছিলের দিকে দৃষ্টি থাকতো নিম্পলক : দূরে, বহুদূরে দেখতে পেলেও, মানুষের ভীড়ের ভিতর থেকেই চিনে

বার করতুম মায়ার হাঁটার ভঙ্গী। উজ্জ্বল লাল পোশাকে ওকে মনে হতো। একগাছ বসন্তের কুসুমচূড়া।

বলতুম, উঃ! কতক্ষণ বসে আছি মায়ী, তোমার একেবারে সময়ের জ্ঞান নেই।

মণিবন্ধে কালো রেশমের ব্যাণ্ডে ছোট্ট হাতবড়ি। সেদিকে তাকিয়ে মায়ী জবাব দিত, দেখো ঠিক সাড়ে ছটা। আমি তো বলেইছিলাম ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে আসবো।

বলতুম, কিন্তু আমি যে পৌনে ছ'টা থেকে বসে আছি।

মায়ী মিষ্টিভাবে হাসতো, তোমাকে পৌনে ছ'টার আসতে কে বলেছে?

বলতুম, আর তোমাকেই বা সাড়ে ছ'টার আসতে কে বলেছে? ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা এর মানে নিশ্চয় এ নয় যে ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়েই আসতে হবে।

কলকাতার আকাশে তখন সন্ধ্যার স্নানিমা স্বপ্নের আমেজে ভরপুর। পথের ধারে বিজলী ঝলমলো দোকানের সারি, ট্রাম বাসের বাস্তব ঘর্ষন। ট্রামের ঘণ্টি, বাসের ভেঁপু, ফ্রিওলার হাঁক এ সবই দিনের অন্য সময়ে অত্যন্ত কর্কশ মনে হয়। অথচ গোপালির সেই নরম মুহূর্তগুলিতে আশ্চর্য মনোরম লাগতো।

পার্কের ঘাসের জাজ্জিমে ঝরাপাতায় মর্মর জাগিয়ে তারপর হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে কোনোদিন বলতুম রেস্টোরার কাঠের দেওয়াল দেওয়া কেবিনে। সাথে একটি মেয়ে থাকার সুবিধে কতো বোকা যেত তখন। ওয়েটারগুলো আমাদের হুকুম তামিল করবার জন্যেই যেন জীবনধারণ করে সৌভাগ্যবান হয়েছে। আর অন্যদিন একা গিয়ে দেখেছি সাতবার ওদের ডাকলে একবার সাড়া মেলে।

কাঠের দেওয়াল দেওয়া কেবিনের ভিতরে বসে মায়ী নিবিড় হয়ে আসতো আমার দিকে। একজনের বসতে-যতটুকু জায়গা লাগে সেটুকুতেই কুলিয়ে যেত আমাদের দুজনের। সোকার বাকী অংশ খালি পড়ে থাকতো।

সাধারণত আমি কম কথা বলতুম। বিশেষত মেয়েদের সামনে কথা বলতে গেলেই মনে হতো। বুকটা কেমন ধক্ ধক্ করছে, বেধে বেধে যাচ্ছে কথা, কান দিয়ে আগুনের হলুকা ছুটছে। কিন্তু মায়ার সাথে অন্তরঙ্গতা হবার পর থেকে আমার স্বভাবই যেন গিয়েছিল বদলে। সংযতবাক থেকে হয়েছিলুম প্রগলভ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথার স্রোতে ভাটিয়ে নিরুদ্ধেশ হয়ে যেত। এমন কথা, যার মানে নেই কোনো, প্রয়োজন তো নয়ই। কথা বলবার জন্যেই যেন সৃষ্টি করতুম কথা, মনের গভীরে।

একটি বৃষ্টিধোয়া বিকেলের কথা এখনও মনে আছে। আমরা লেকের মাঠে বসেছিলাম। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়ে শেষ বিকেলের হালুদ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, আকাশে রামধনু। নিশ্চুপ তাকিয়ে দেখছিলাম মায়ার কৃত্রিম কোঁকড়ানো চুলে আলোর খেলা, ম্যানিকিওর করা নখে ঘাস তুলে দাঁতে কাটছিল ও। আর আমি একলক্ষ্যে তাকিয়ে দেখছিলাম ওর শব্দশ্বেতগালে গোলাপী আভা, কাজল দিয়ে আঁকা একটি বিউটি স্পট।

তারপর সেই হালুদ আলো ধীরে ধীরে লাল হয়ে এল, মেঘে মেঘে দেখা দিল অন্তর্যর্ষের

রক্তরাগ। চিড়িয়াখানার দিক থেকে এক ঝাঁক বালিহাঁস উড়ে এসে আবার ঘুরে চলে গেল।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলেন সেই বিকেলের অল্পপম শান্ত সৌন্দর্য। মায়া আমার চোখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে। কথা বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, —এই রক্তরাঙা আকাশে রাখধনু ঝাঁক বিকেলে।

আর আমি সঙ্গে সঙ্গে কথা খুঁজে পেলুম। বললুম, নীল সমুদ্র।

তরল হাসিতে হিল্লোলিত হয়ে উঠলো ও। বললো, সর্বনাশ! লেকের জলকে তুমি সমুদ্র মনে করছো নাকি! বললুম, না লেকের জলে নয়। নীলসমুদ্র তোমার চোখের তারায়।

: কিন্তু আমার চোখ যে মোটেই নীল নয়। বাদামী। ক্রাসের মেয়েরা আমাকে আড়ালে বলে বিড়াল চোখি।

বললুম, ক্রাসের মেয়েরা যা বলে বলুক। আমার দৃষ্টিতে ও চোখ, চোখের তারা নীলে নীলে সমুদ্রনীল।

কতো অলস প্রহর মায়া'র সন্নিধ্যে এমন নিমেষে অতিবাহিত করেছি। রাজপথে বিচরণ করবার সময় অন্তের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিকে কল্পনা করতুম। এমন আশ্চর্যভাবে মায়া নিজেকে মাধুর্যময়ী ক'রে তুলতে পারতো, শুধু নিজের উপস্থিতি দিয়েই অন্তের মনে মাদকতা আনবার ক্ষমতা ওর করায়ত্ত। নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে ওর মত আমার বিপরীত-মুখি, কথায় বার্তায় সাজ-পাশাকে আচারআচরণে ও উগ্র আধুনিক, আধিক স্বচ্ছলতার কারণে স্বভাবে উগ্রাসিক, কচির দিক দিয়ে আমার সাথে ওর কোনো প্রকারেই মিল নেই। তবু অদম্য আকর্ষণে ওর সান্নিধ্য আমার মনকে টানতে। শুধু কাছে কাছে থাক। পাশাপাশি বস।, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছায় গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁ'য়ের লোভে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মানতে গেলে বলতে হয় এর সব কিছুর মূলেই ছিল যৌনশ্রাবকত্ব। এ-সিদ্ধান্তের কতটা সত্যি জানি না। তবে একথা জোর গলায় বলতে পারি যৌনকামন বা যৌনচিন্তাই যে সব সময় মনকে নাড়া দিত, তা নয়। ভালো লাগতো প্রহরের পর প্রহর কুঞ্জে মুগ্ধরিত করতে। মায়া'র দেহ সম্বন্ধে কৌতূহল কোনো সময়েই হয়নি একথা যদি বলি তাহলেও মিথ্যে হবে। দেহ সম্বন্ধে, অনেক সময়েই উদগ্র হতুম মনে মনে, কিন্তু মনের সে প্রবৃত্তিকে নিজের আবার নিষ্ঠুর শাসনে দমন করতুম যুক্তিতর্কের সাহায্যে।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম মায়া'র স্বভাব বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ক্ষণে ক্ষণে কারণে অকারণে ওর সেই প্রগলভ তরল হাসির চেউ গেল মিলিয়ে। কথায় আচরণে ক্রমে হয়ে এল নম্র নম্র, কেমন যেন শান্ত গম্ভীর। উদগ্র হয়ে হারিয়ে গেল ওর সেই একদল ছেলে বন্ধু। পোশাকে উগ্র রঙীন শাড়ীর বদলে স্থান ছেড়ে দিল দুধগুড় ভয়েলকে : একটি রক্তগোলাপ পরিবর্তিত হল একঝাড় রজনীগন্ধার। দিনে দিনে, তিলে তিলে নিজেকে আমার মনের

কেজের দিকে এগিয়ে দেবার প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে গেল মায়া। আর শরীরের প্রতিটি অণু দিয়ে আমি উপলব্ধি করলুম : এতদিনে সত্যিই একটি পুরুষকে ভালোবেসেছে মায়া।

আর মায়ার সাথে দৈহিক সম্পর্কের জন্মে যদিও আমি উৎসুক ছিলাম না, তবু দেহের তীরে তীরে হঠাৎ একদিন লোনা সমুদ্রেও জোয়ার উত্তাল হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে আমাকে আর মায়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্ত অতিক্রান্ত হবার পর নিজেই নিজেকে ঘূর্ণা করতে শুরু করেছিলাম : আমার শিক্ষিত আর মাজিত কচির দাম কতটুকু ? মুখে বতই বলি না কেন, মনে মনে আর পাঁচজনের মতো আমিও তো নারী-মাংসলোলুপ ! আমার ভিতরের পশুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে পরাস্ত করে ফেলেছিল আমাকে, অন্তত একদিন একটি বন্টার জন্মেও।

তারপর রোমকূপে কূপে আশকার রোমাঞ্চ-অবশ দিন কাটিয়েছি। অনেক রাত অতল চোখে ঘুমহীন বিছানায় কেটে গেছে, জানালায় ঢেউ দিয়ে গেছে নাগরিক আকাশের যুয়ুর্চাদ। অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে আমারই মতো জ্বগে থেকেছে বনআঁধার রাত্রি।

আশকার কুড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল একদিন, যে মুহূর্তে ল্যাবোরেটরির নির্জনে এসে ভীক-কপোতকণ্ঠে মায়া জানিয়েছিল অবাহিত মাতৃহের সংবাদ। আমার শরীরের শিরা উপশিরায় বয়ে গিয়েছিল হিমালয়ের বরফগলা স্রোত : চমকে উঠেছিলাম, কেঁপে উঠেছিলাম ! আর্তনাদ করতে গিয়েও হু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছিলাম টুলের ওপর। এই অবাহিত পিতৃ আমি চাইনি : না, না, না ! আমি চাই না, চাই না, চাই না !

ধরখর কেঁপে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরেছিল মায়া, নিশ্চেষ্ট ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, এখন কি করবো ?

বলেছিলাম, নিশ্চয় ভুল হয়েছে তোমার। এ কখনও হতে পারে না।

আবার ধরোধরো কাঁপ, গলায় ও বলেছিল, ভুল হয়নি। তারপর তো দুশাস কেটে গেছে, আর এরকম আমার কখনও হয় না।

ডুবন্ত মাস্ক খড়গ আঁকড়ে ধরে। বলেছিলাম, কখনও হয় না বলেই যে কখনও হবে না এমন কি নিশ্চয়তা আছে !

মায়া কোনো জবাব দেয়নি আর। দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল। তারপর এক সময় উঠে চলে গিয়েছিল ওপরে।

আর আমার চেতনায় দিনরাত তারপর থেকেই চলেছিল বিবেক এবং কর্তব্যবুদ্ধির লড়াই : কি উপায়ে এই দারিদ্রের হাত এড়ানো যায়। ঘূর্ণায় সর্বশরীর কুঞ্চিত হয়ে উঠতো, ঘূর্ণা করতে আরম্ভ করলুম নিজেকে, মায়াকেও। ওর সঙ্গ কামনা করেছি আমি, নিহৃত কুঞ্জে প্রহর অতিবাহিত করেছি, আশ্বাস করেছি একদিন ওর দেহের লবণাক্ত স্বাদ। কিন্তু। আর আবিষ্কার করলুম মায়া আমাকে ভালোবাসলেও আমি তাকে ভালোবাসিনা। যে মেয়ে এত সহজে নিজের দেহের আবরণ উন্মুক্ত করতে পারে তাকে কোনোদিন ভালবাসা সম্ভব হবে না। কতো তো ছেলেবন্ধ ছিল ওর, তাদের কাছেও হয়তো এমনই উন্মুক্ত করেছে দেহ।

কিন্তু অমরেশবাবু, অমরেশবাবু জানবেন এ সংবাদ। তারপর হয়তো অমরেশবাবু করবেন মাগাকে বিয়ে করতে, অমরেশবাবু কাজ না হলে আইনের ভয়ও দেখাবেন হয়তো। সমস্ত সত্য। প্রতিবাদ করে উঠেছিল : বিয়ের শুভ নদী এমন একটা কলককাহিনীর সাঁকো বেয়ে পার আমি কিছুতেই হতে পারবো না। অন্তায় আমার, মাগাও সমপরিমাণে দায়ী।

দিন তিন চার পরে মাগাকে তার পড়বার ঘরে একা পেয়ে বলেছিলুম, আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে শুধু নিয়ে এসেছি। খেয়ে নাও, সব দুর্ভাবনা মিটে যাবে। আর কাকপক্ষীতেও টের পাবেনা কিছু। একদিন কি দুদিনের জন্যে শরীর অসুস্থ হবে একটু, সেটা কোনো ছল ছুতোয় সামলে নিতে পারবে না তুমি ?

নিশ্চুপে নতনেত্রে মাগা শুনেছিল আমার কথা। যখন মুখ তুললো, দেখেছিলুম, কে যেন রক্ত শুধে নিয়েছে ওর মুখ থেকে। ধীরে ধীরে আবার রক্ত ফিরে এল ; যুগায় লাল হয়ে উঠেছিল মাগা।

ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, আমার ব্যক্তিত্ব যেন জলের গেলসে চিনির মতো গলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার ওই কথা বলতে আর সাহস পাইনি।

তারপর। ভাবভেও এখন লজ্জা বোধ হয়, বেত্রাহত কুকুরের মতো পালিয়েছিলুম মাগাকে ছেড়ে, 'নিও খেরাপুটিকস্' ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে। দুমাস অজ্ঞাতবাসে ছিলুম উড়িষ্যার নিভৃত অরণ্যরাজ্যের অন্তঃপুরে ছোট্ট একটি শহরে। তারপর চাকরী মিলে গিয়েছিল সেখানেই, এক ম্যাংগানিজ মাইনে। ডিনামাইটের বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে বেরিয়ে আসে কালো কয়লার মতো ম্যাংগানিজের চাঙর। তারপর কোল যুগা ভূঞা শ্রমিকেরা গাঁইতির আঘাতে আঘাতে সংগ্রহ করে সেই ধাতবপদার্থ। ল্যাবোরেটরিতে এ্যানালিসিস করে বিচার করা হয় বাতুর শতকরা পরিমাণ, মূল্য হয় নির্ধারিত। ওয়াগনে ওয়াগনে বোঝাই হয়ে চালান হয়ে যায় ভারতবর্ষের সৈকত পার হয়ে।

অরণ্য আর অরণ্য। শাল মহুয়া সবুজ। এক মাইল দু মাইল তফাৎ তফাৎ ম্যাংগানিজের খনি।

দিনে দিনে মাস কেটেছে, মাসে মাসে বছর, বছরে বছরে পাঁচ বছর। সময়ের ঢেউএ ধুবে ধুবে মাগার স্মৃতি একটি রোমাঞ্চকর দৃশ্য হয়ে এসেছিল।

এই কলককাহিনীর ওপর ছেদ পড়েছিল পাঁচ বছর আগে। আবার প্রপসিন্ উঠলো রাতের নাগপুর প্যাসেঞ্জারের ডেরা কামরায়। সারাদিন খররোজের লেলিহান জিহ্বা বিস্তৃত পথ পরিষ্কার পর পরিশ্রমে প্রায় ধুকতে ধুকতে চক্রধরপুর স্টেশনে এসে কিছুক্ষণের জন্যে নোঙর ফেলেছিল নাগপুর প্যাসেঞ্জার। পাহাড়ের ঢালু দিগে গড়িয়ে গড়িয়ে তার কিছু আগে রাত্রি নেমেছে ঘন আঁধার বেশে।

নীলাভ সিগারেটের ধোঁয়া জানালার বাইরে হাওয়ার ভাসিয়ে চার পয়সার এক তাঁর চা কিনেছিলুম। আর খুঁজে খুঁজে কাঁকা দেখে এই কামরাতেই উঠেছিলেন এক ভদ্রলোক : চকোলেটের লিনেনের ট্রাউজার্স, বাদামী হাওয়াই শাট পরনে, চোখে পুরু লেনসের লাইব্রেরী

স্রেম চশমা। ভদ্রলোকের পিছন পিছন উঠেছিলো এক তরী : দুধ ধবধবে কপালে কয়েক টুকরো উড়ু উড়ু চুল, গাঢ় লাল কনুইহাতা ব্লাউজের ওপর পলাশ রাঙা শাড়ীর আঙুন ছড়ানো, পায়ে স্কার্বেটরং মধ্যমলের চটি, ঠোঁটে রক্তপদ্ম। কৃত্রিম উপায়ে কাঁপানো, চেউ খেলানো চুল।

কামরার সকলেই অবাক বিষয়ে তাকিয়েছিল সেদিকে, আমিও তাকিয়েছিলুম আর শরীরের সমস্ত রক্তপ্রবাহ সেই মুহূর্তেই কাঁকি দিয়ে শুক হয়ে গিয়েছিল যেন : কে !!

কিন্তু মায়া দেখতে পায় নি, খেয়ালও করেনি আমাকে। হাতে খবরের কাগজ ছিল, মেলে ধরে তার আড়ালে আত্মগোপন করেছিলুম। সুযোগ বুঝে এক স্টেশনে নেমে পড়লেই চলবে, তারপর কামরা বদল। কিন্তু কামরায় একটি মাত্র দরজা, আর তার মুখেই গুহিরে বসেছিল ওরা। তবু অপেক্ষা করেছি অমনই আত্মগোপন করে। যখন রাত বাড়বে, তন্দ্রায় ঢুলে পড়বে সকলের চোখ সেই সময় অলক্ষ্যে অগোচরে পালাবো অন্য কোন কামরায়। শরীরের কোষে কোষে এক অস্বস্তিকর শিরশিরানি ছলে ছলে পাকিয়ে পাকিয়ে ছমড়ে মুচড়ে বইছে : চক্রধরপুর স্টেশনে মায়া উঠেছে, আর আমারই কামরায়—এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। ওর থেকে মাত্র কয়েক হাত তফাতে বসে আমি রাত কাটাচ্ছি অথচ মায়া ঘুনাঙ্করেও জানে না তা !

রাত গভীর হয়ে এসেছে। চক্রধরপুর থেকে ঘাটশিলা পৌঁছে গেছে নাগপুর প্যাসেঞ্জার। লিনেন ট্রাউজার্স গুয়ে পড়েছে, ঢলে পড়েছে ঘুমে। কিন্তু দরজার মুখে অতল চোখে জেগে বসে আছে মায়া, ওর নাকি টেপে ঘুম আসে না। আর এদিকে চোখের সামনে মেলে ধরা খবরের কাগজ ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে আমার। কতক্ষণ এমন আত্মগোপন সম্ভব ! প্রতিটি লাইন, প্রতিটি অক্ষর তিন চারবার পড়া হয়ে গেছে। চোখের পাতা সীসের দলার মতো ভারী হয়ে উঠেছে, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছে সর্বত্র।

তারপর কখন তন্দ্রায় ঢলে পড়েছিলুম খেয়াল নেই। প্রথ হাত থেকে ধসে পড়েছিল খবরের কাগজের ব্যাফল ওয়াল। • একটা হ্যাঁচকা কাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে যেতেই মায়ার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।

: অশোক, তুমি ?—মায়া হঠাৎ ক্রভজিমায় বললো, খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিলে কেন ?

চেপ্টা করে বিষয় দুটিয়ে তুললুম মুখের অভিব্যক্তিতে। বললুম, আমাকে বলছেন ?

একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেল মায়া। বললো শ্লেষযুক্ত স্বরে, আমাকে তোমার এত সহজেই তো ভুলে যাবার কথা নয় !

সেই বিষয়ের অভিব্যক্তিটা বজায় রেখেই বললুম, আপনি হয়তো ভুল করছেন। আমার নাম অশোক নয়।

এবার সত্যিই বিস্মিত হল মায়া। আমি ওর সাথে পরিচয়ের স্মৃতি এমন বিধাহীন

কঠে অস্বীকার করবো এটা হয়তো কল্পনাই করেনি। ওর ঘনপঙ্খ সূর্য্য টানা আয়ত কালো চোখে ধিকার এসে পুঞ্জীভূত হল। বললো, এই কায়দাটা বুঝি নতুন শিখেছো!

বললুম, গলায় বেশ ঝাঁজ এনেই বললুম, আপনি কি বলতে চান?

আর জবাব দিলনা যায়। নিম্পলক তীরের মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। ধারালো দৃষ্টির নীরব ধিকারে অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। কৈফিয়তের সুরে বললুম, আপনি সত্যিই ভুল করেছেন মিস্—। আমার নাম অশোক নয়, অসীম। অসীম রায়। আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি বলে স্বরণ হচ্ছে না।

তীরের মতো দৃষ্টিতে তবু তাকিয়ে থাকলো যায়। মূহু ব্যঞ্জে হেসে বললো, এত ভয় পাচ্ছ কেন আমাকে, আমি কিছু বাঘ ভালুক নই যে আত্মপরিচয় ঘোষণা করলেই তোমাকে খপ করে ধরে নিয়ে যাবো।—বলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল যায়। বাইরে যার চুলের মতো কালো আকাশে, ওর বাকী হাসির মতো এক টুকরো চাঁদ উঠেছে।

আমিও চুপ করে বসে রইলুম। আমার ছলনায় যায় বিভ্রান্ত হয়নি এতটুকু। ঘুণায় ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ। তবু যখন একবার আবৃত্ত করেছি শেখ পর্যন্ত বজায় রেখে যেতে হবে এই যুখোস, ও বিশ্বাস করুক আর নাই করুক।

আমার ওপরের বাঁকটা খালি আছে। বিছানা বিছিয়ে নিলুম। কাগজের আড়াল দিয়ে মুখ ঢেকে বসে এতক্ষণ যে উদ্বেগ বোধ করেছি পাছে যায় দেখে ফেলে এই আশঙ্কায়, বুক থেকে সেই ভারটা নেমে গেছে এখন। অসীম রায়ের যুখোস এঁটে নিশ্চিত্তে ঘুমোনো যাবে হাওড়া পর্যন্ত। কামরা বদল করবার আর প্রয়োজন নেই।

অশ্রমতী

ভূর্গেবিভ

অনুবাদ : শিশির সেনগুপ্ত, জয়সুকুমার ভাট্টা

॥ ১৭ ॥

এ বছর আমি আটাশে পড়েছি। শিশুকালের কথা যতটুকু মনে পড়ছে এই সঙ্গে লিখে রাখছি। এক মন্ত জমিদার বাড়িতে তখন আমরা থাকতাম। গ্রামের ভিতর মন্ত সেই বাড়ির ভেতালার একখানা ছোট্ট কুঠুরী ছিল আমার শৈশবের আশ্রয়নীড়। মাকে মনে পড়ছে আমার। তিনিও আমার সঙ্গে থাকতেন। মা আমার জাতে ইহুদী ছিলেন। আমার দাহ ছিলেন শিল্পী। ছবি আঁকার নেশায় ঘুরতে ঘুরতে মেয়েকে নিয়ে তিনি এদেশে এসে পড়েন। দাহকে আমি দেখিনি। আমার যখন জ্ঞান হয় তখন তিনি এ পৃথিবীর রূপলোক থেকে আর এক অপরূপ লোকে গিয়ে পৌঁছেছেন। মাকে আমি চিরকল্প দেখেছি। তার মুখখানি ছিল ভারী সুন্দর। কিন্তু সেই মুখ ছিল মোমের মত ক্যাকাশে। তার আয়ত চোখের আকাশ দুটি কেমন যেন একটা দুঃখের মেঘে ধম ধম করত সব সময়। ঐ দুটি কল্প চোখের দৃষ্টি মেলে মা যখন আমার দিকে নিনিমেঘে চেয়ে থাকতেন আমি তার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারতাম ঐ চোখ দুটি কী এক গভীর বেদনায় ধর ধর করে কাঁপছে। কী অপার দুঃখ নিঃশব্দে করে পড়ত ঐ চোখ দুটি থেকে। সে-বেদনার আতি বোঝাবার বয়স ছিল না তখন আমার। কিন্তু মার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কান্না পেয়ে যেত। ছুটে গিয়ে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আমি।

মাষ্টার এসে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন আমায়। পানবাঁজনা শিখতাম। বাড়িতে বখাষোপ্য আদরবয় ছিল। কারুর কাছ থেকে অনাদর পাইনি কখনো। খাবার সময় মনিবও থাকতেন টেবিলে। জমিদারবাবু ছিলেন দীর্ঘকান্তি সুপুরুষ মানুষ। বয়স হলেও তাঁর সারা চেহারায় একটা রাজকীয় আভিভাত্য জমজম করত। কাছে গেলেই তাঁর পা থেকে কি একটা মিষ্টি গন্ধ ভূর ভূর করে নাকে এসে লাগত। তাঁকে দেখলে ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে যেত। কেন যে অন্ত ভয় হত জানি না। কিন্তু তিনি আমার কখনো আদর না করে কথা বলতেন না। সজ্ঞান বলে আদর করতেন আমায়। তাঁর শিরাউপশিরা কণ্টকিত গুঁড় বাহুতে চুষন করতে দিতেন তিনি আমায়। কিন্তু তবু আমার ছেলেমানুষী ভয় যেত না। মায়ের সঙ্গে তিনি খুবই মিষ্টি ব্যবহার করতেন। কিন্তু কথাবার্তার মানুষটি ছিলেন অতি মিতবাক। তিনি হয়ত মিষ্টি করে দু' একটি প্রশ্ন করতেন। মা কোন মতে

জবাব দিয়ে যেন রেহাই পেতে চাইতেন। তারপর কথা ফুরিয়ে যেত। তখন নিঃশব্দের পালা পড়ত। নিঃশব্দের চারিপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মস্ত জমিদারী মর্যাদায় সোনার নস্তির কোঁটা থেকে এক টিপ নস্তি নিয়ে মোঁতাত করতে থাকতেন। ঘরের ভেতর একরাশ চুপচাপ থমকে এসে দাঁড়াত।

তখন আমার ন'বছর বয়স। সেইসময় এক আশ্চর্য খবর শুনলাম আমি। বাড়ির কিয়েদের মুখে শুনে পেলাম যে আমি নাকি যে সে বাপের মেয়ে নই। স্বয়ং জমিদার মশায় আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব। এর চেয়ে অবাক করা খবর আর কি হতে পারত সেদিন। তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হওয়া আমার বাকী ছিল তখনো। এই প্রফেসর যার কাছে আমি এখন রয়েছি তিনি তখন ছিলেন জমিদারের খাস খানসামা। আমার বাবার হুকুমে সেই দিনই এই লোকটার সঙ্গে মায়ের মস্ত পড়ে বিয়ে হল।

একি হোল মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমি। এমন যে কখনো হতে পারে তা আমার ন বছরের শিশু মন কখনো কল্পনাও করতে পারত না। মা আমার ছিলেন। বাবা আমি পেয়েছিলাম। তিনিও আমার আর দশজন ছেলেমেয়ের বাবার মত সাদামাটা নন। মস্ত জমিদার। সুপুরুষ। যার চোখের দিকে তাকিয়ে অস্ত্র সবাই সন্ত্রমে চোখ নামিয়ে নেয়। তিনি কি করে এমন হুকুম দিলেন ভেবে কুলকিনারা পাইনি সেদিন। তিনি থাকতে একটা খানসামার সঙ্গে মায়ের আবার বিয়ে হোল এ-কথা ভেবে আমার মন যেন বোলাটে কুয়াশায় দিশেহারা হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে মাকে হারানোর আশঙ্কায় আমি তার আশ্রয়েই ছুটে গেলাম।

‘এ কি সত্যি মা। বলো না, একি সত্যি।’ মাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—‘গায়ে বোটকা গন্ধ ঐ দৈত্যটা নাকি আমার বাবা হবে?’

আমার কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলেন মা। ধর ধর কাঁপা হুঁখানি হাত চাপা দিলেন আমার মুখে। যেন কত মিনতি করে বললেন—‘লক্ষ্মী মা আমার, ও কথা আর কখনো বোলে না। কাউকে বোলো না—’ তার নরম বুকের মধ্যে আমায় চেপে ধরে ধরা গলায় বার বার ঐ এক কথা উচ্চারণ করতে লাগলেন মা।

মা'র সেই বারণ আমি কোনোদিন অমান্য করিনি। সে কথা আমি কখনো কাউকে বলিনি। যত ছোটই হইনা কেন, মায়ের সেই নিষেধের কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম কিনা। বুঝেছিলাম যে চুপ করে থাকাই আমার একমাত্র কাজ। মা ত মিছিমিছি আমার বলেননি সে-কথা। সেই বোবা চাহনিতে মিনতি ছিল আজ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু সেদিনও যে বুঝিনি তা নয়। আর সেইদিন থেকে আমার হুঃখের পালা পড়ল।

জমিদারের হুকুম তামিল হোল। বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু প্রফেসর একদিনও মাকে একটুও ভালবাসত না। মাও ওকে দেখতে পারতেন না। লোকটা টাকার লোভে মাকে বিয়ে করেছিল। আর কি জানি কেন আমার হুঃখিনী মা এ বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাবা হয়ত ভেবেছিলেন এই ভাবেই তিনি সব দিক মানিয়ে দিতে পারবেন।

মনে আছে বিয়ের আগের দিন মা আর আমি গলা জড়াজড়ি করে অনেক কঁদেছিলাম। সারা সকাল অঝোর কান্না কঁদেছিলাম মায়েঝিয়ে। নিঃশব্দে, আকুল হয়ে কান্নায় গলিয়ে দিয়েছিলাম নিজেদের। মা যে নিঃশব্দে এ ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন, আমাকে একটি কথাও বলেননি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তখন আমার কী-ই বা বয়স। কী-ই বা তিনি বলতে পারতেন আমাকে? সেদিন মাকে যে আমি একটি প্রশ্নও করিনি তার ভিতর থেকে একটা পরম সত্য বড়ো আশ্চর্যভাবে প্রমাণিত হয়। দুঃখী ছেলেমেয়েরাই সংসারে তাড়াতাড়ি সেরানো হয়ে ওঠে। যারা সুখের ঘরে মানুষ হয় তাদের চেয়ে ঢের আগে।

মায়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে হোল বটে, কিন্তু আমার বাবা আগের মতই আমার শিক্ষায় সমান উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়। এতদিন আমায় স্নেহ করতেন আচার আচরণে কচিৎ কদাচিৎ। এখন ধীরে ধীরে তিনি যেন আমার আপনার করে নেবার জন্যে একান্তভাবে মনোনিয়োগ করলেন। কথা অবশ্য বেশি বলতেন না কোনদিনই। কিন্তু প্রতিদিন সকালসন্ধ্যা আঙ্গুলের নশ্টি নাকের ভিতর দিয়ে সেই আঙ্গুল ঝেড়ে নিয়ে আমার গালে টোকা মেরে আদর করতেন আমায়। কী ঠাণ্ডা হিম ছিল সেই ছোঁয়ায় এখনো যেন আমার গালে তার স্পর্শ পাই। কখনো কখনো স্নেহসিক্ত মুখে কি মিষ্টি খেতে দিতেন আমায়। সে সব মিষ্টিতে কি এক রকম গন্ধ ভুর ভুর করত বলে, সেগুলো মুখে দিতে কুচি হোত না আমার।

বার বছর বয়সে আমি তাঁর বই পড়ার একমাত্র সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়িলাম। গত শতাব্দীর ফরাসী মনীষীদের লেখা সাহিত্য থেকে পড়ে শোনাতে হোত তাঁকে। কিন্তু বা পড়তুম নিজে তার বিন্দু বিসর্গও বুঝতাম না। মানুষটি পুরোপুরি ফরাসী ছিলেন। বিপ্লব পর্যন্ত তিনি প্যারিসেই বসবাস করেছিলেন। ফ্রান্সের হতভাগিনী রাণী মেরী আর্ন্তায়োর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে-কালের প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মেয়েপুরুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল খুবই। কিন্তু তা নিয়ে কখনো আত্মগরিমা প্রকাশ করতে শুনিনি তাঁকে। মানুষটির মধ্যে যে একটি সত্যিকার অভিজাত ছিল তা আবিষ্কার করার মত বুদ্ধি আমার সেই বয়সেই হয়েছিল।

মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁর ঘোবন ঘায়নি। সে সুন্দর শরীরে জরা স্পর্শ করতে পারেনি কোনোদিন। গাল-দুটিতে গোলাপী আভা ছিল অল্পান। দাঁতগুলি ছিল মুক্তার মত। এক ছোড়া মোটা ভুরু ছিল যেন ঘন তুলিতে আঁকা। অপূর্ব ভাবময় দেখতে পরিষ্কার টলটলে চোখের কালো মণি দুটি। আর সেই চোখের দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ত স্নিগ্ধ প্রসন্নতা।

আমার বাবার চরিত্রে কোথাও খুঁত দেখিছি কোনোদিন। তাঁর সৌজন্য বোধ ছিল অতি প্রখর। এমন কি চাকরবাকরদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি সম্মম ভাষা ব্যবহার করতে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু আমার কি যে হোত। সেই মানুষটির কাছে বসে কি যে বিজ্ঞী লাগত আমার। তার কাছ থেকে যখন চলে আসতাম সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রফুল্লতা ফিরে আসত। আর ওঁর সামনে এলে নানা কুৎসিত চিন্তায় মন ঝুলিয়ে উঠত। কিন্তু এর জন্য কি একা

আমিই দারী ছিলাম। ঐ সব ভালো লোক একটি কিশোরী যেহেতু জীবন নিয়ে যে ভাবে ছিনিমিনি খেলেছিলেন তার কথা মনে পড়ছে আমার। তাদের জন্মেই ঐ কুস্ত্রীতা এসে বাসা বেঁধেছিল আমার মনে।

বিয়ের পর জমিদার বাড়ি থেকে অল্প দূরে একখানি বাসায় এই প্রফেসরের থাকার ব্যবস্থা হোল। মায়ের সঙ্গে আমিও চলে এসাম সেখানে। সে এক নিরানন্দ জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানো। এরই অল্প কিছুদিন পরে আমার মা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সেই ছেলেরই নাম হোল ভিক্টর। এই ভিক্টরই আমার চিরশত্রু। তাকে যে শত্রু ভাবি তাও অকারণ নয়। ভিক্টরের জন্মের পর মায়ের স্বাস্থ্য আরো ভেঙ্গে পড়ল। মায়ের আমার স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভালো ছিল না। কিন্তু এ ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগল না কোনোদিন। আজকাল প্রফেসর যেমন সদাপ্রকৃত হাসিখুশি জীবনযাপন করছেন, তখন তা করত না নানা কারণে। এমন ভাব দেখাত সব সময় যেন তার মনে সুখ নেই। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে ঘুরে বেড়াত সারাদিন। গোমরা মুখে সর্বদাই এমন একটা ব্যস্ততার ভাব থাকত যেন কত খাটতে হচ্ছে তাকে।

আমার উপর ছিল তার জাত আক্রোশ। ছুতোনাতার আমার সঙ্গে রুচ নির্ভর ব্যবহার করা যেন তার দিনরাত্রে অত্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জমিদারের চোখের আড়াল হতে পারলে যেমন খুশি হতুম তেমনি এ বাড়িটা ছেড়ে বাইরে থাকতে পারলেও মন খুশিতে ভরে যেত। আমার সে নতুন যৌবন দিন বড়ো হুঃখেই কেটেছিল। খালি এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে ভেসে বেড়িয়েছি—কোথাও নোঙর ফেলার ইচ্ছা হত না। শীতকালে পাতলা একটা ফ্রক পরে তুষার জমা উঠোন পেরিয়ে ছুটে যেতাম বড় বাড়িতে জমিদারকে বই পড়ে শোনাতে। যেন আনন্দ আহরণ করতেই ছুটে আসতাম—কিন্তু সেখানে এসে যেই বিরাট বিরাট নিরানন্দ কক্ষগুলি দেখতাম মনের সেই সহজ উল্লাস কোথায় অন্তর্হিত হয়ে যেত। চোখে পড়ত গলায় গলাবন্ধ আঁটা সেই মূর্তিটি। সিন্ধের ঢিলে আলখাল্লা পরে সেই হৃদয়হীন ভালো মানুষ বুদ্ধটি বসে আছেন। আমার লেসগুলো আঙ্গুলের ডগা অবধি পৌঁছেছে, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো—কপূরের ভারী গন্ধে আমার দম আটকে আসত, বুক ধম্মে যেত। একটি নিচু চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকতেন তিনি। পিছনের দেয়ালে একটা বড়ো ছবি ঝুলত। এক ঝলকে চোখে পড়ত বহুমূল্য পোশাকে ঢাকা সেই সুন্দরী তরুণীর সর্বাঙ্গের ঝলমল রূপ। মুখে তার অপূর্ব উজ্জল নির্ভীক দীপ্তি। গারে দামী হীরেমুক্তোর অলঙ্কার মোড়া। ঐ ছবিখানি দেখতে কি যে ভাল লাগত আমার। কতবার লুকিয়ে লুকিয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে দেখেছি। তখন জানতাম না তাকে সেই আমার অজানা মেয়ে। ভারী আশ্চর্য লাগত ভাবতে যে ঐ ছবিখানির দিকে আমার এত আসক্তি হবার কারণ কি? কে আমার উনি? কি সম্পর্ক আছে যে এমন করে আমার সে চানে। তখনকার অবস্থা ছেলেমানুষী মন নিয়ে একথাও ভেবে কুসকিনারা করতে পারিনি, কেন ঐ বুদ্ধ তাঁর বিগতযৌবনের আসক্তিতে ঐ স্মৃতির মায়া আঁকড়ে পড়ে আছেন।

ভেবেছি বটে কিন্তু নিজের মনের মধ্যে কোনো উত্তর পাইনি কখনো। পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে ঐ ছবিখানি আমার মায়েরই। যুবক জমিদারের অনুরোধে আমার জাত আটটি দাদামশাই একেছিলেন তাঁর মেয়ের ছবি। তারপর মায়ের চৈত্রফাগুনের জোয়ার ভাটা। আর চেনবার উপায় নেই সে মানুষটাকে আজ। সেই বয়সের ছেলেমানুষী মন নিয়ে কতবার ভেবেছি আমার মায়ের বিগতজীবনের কথা। ঐ যে মানুষটি পাথরের মূর্তির মত বসে আছে, তার হাতের পুতুল ছিল ঐ ফুলের মত অপাপবিদ্ধ রূপবতী মেয়ে। মমতাহীন হাতে কত ছলে ছলনায় তাকে বশ করেছে। জয় করেছে কোন দুর্বলমুহুর্তে। তারপর দিনে দিনে তার রূপ রস নির্ধাস শুধে নিয়েছে। দৃশ্যতা করেছে তার যৌবনের ধরে। তারপর ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে অবহেলে। তবু মা ওকে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন বৈ কি, মনে মনে ভাবতাম আমি। ভাবতে সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠত। ভাবতাম, এ কি করে সম্ভব! কি করে মা ভালবাসতে পেরেছিলেন ঐ বুড়োটাকে। তবু যখন মায়ের চোখের চকিত চাহনি দেখতাম, তার মুখের আধো উচ্চারিত হু' একটি কথার টুকরো ছিটকে আসত কানে, দেখতুম তার হঠাৎ বিহ্বল হওয়া শরীরের কোনো উন্মীলিত মাধুরী, তখন আর সন্দেহ থাকত না। ঐ বৃদ্ধের কথা জানি না কিন্তু মা আমার যে পুরোনো দিনের স্মৃতি যদি কোঠায় সমস্তে আড়াল করে রেখে আছেন আনন্দে, সে কথা সত্যি। তখন মনে হোত, হ্যাঁ মা ওকে ভালবাসতেন বই কি! এ সত্য নিজের মনে মনে নেওয়া যে কত মর্যাস্তিক তা, যে আমার অবস্থায় না পড়েছে সে বুঝবে না। মনে মনে নিরন্তর প্রার্থনা করি, হে ভগবান, নিজের মায়ের সম্বন্ধে এমন অশুচিচিন্তা যেন কোনো মেয়েকে কোনোদিন না ভাবতে হয়।

জমিদারবাবুকে রোজই এই পড়ে শোনাতেম আমি। কখনো কখনো একটানা তিন চার ঘণ্টা পর্যন্ত চলত পড়াশোনা। এতক্ষণ ধরে অত চেষ্টায় পড়া আমার কণ্ঠের পক্ষে ক্ষতিকর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জানতে পেরেই ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তারেরা আমার ফুসফুস সম্বন্ধেও ভয় দেখিয়ে গেল মনে আছে। বাবাকেও তারা জানিয়েছিলেন তাদের আশঙ্কার কথা। কিন্তু শুনে তিনি স্থিত হেসেছিলেন শুধু। পাথরের মুখে সে হাসি, মানুষের মুখে নয়। তাকে হাসি বললে ভুল বলা হয়। ভাবলেশহীন সেই মুখখানি শুধু পলকের ক্ষণ দীপ্ত হয়ে উঠল। অধরওষ্ঠে একটু কোথায় বিচ্যুতি ঘটল। চকিতের দৃষ্ট মনে হোল যেন ডাক্তারের কথায় অবিখ্যাসের হাসি হাসলেন তিনি।

তারপর ডাক্তারকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমার কোনো ভয় নেই হে ডাক্তার। আগে কি ছিল তার জন্মে মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই। এখন সে সবের আর বালাই নেই—

কিন্তু পড়া আমার বন্ধ হয়নি। তেমনিভাবেই পড়ে শোনাতে হোত তাঁকে। রাস্তিরে আর ভোরবেলার কাসিটা বড্ড বেড়ে যেত। কখনো কখনো তাঁর খেয়াল হলে আমাকে গিয়ানো বাজাতে বলতেন। বাজনার সুর যেন তাঁর শরীর মনে ঘুমের যাদু বুলিয়ে দিত। অলস আলস্তে চোখ দুটি বুজে আসত, সুরের ছন্দিত তালে তালে ছলত মাথা।

বাক্যতে বাক্যতে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তিনি আমাকে একটু হালকা সুরা পান করতে দিতেন।

এমনি করে আমার নিরানন্দ ভুবনে দিনরাতের পালা চলেছিল।

তারপর সেই রাত এসে আমার জীবনে। সে ত শুধু অন্ধকার রাত নয়, সেই অন্ধকারে আমার জীবনে অবিস্মরণীয় বিপর্যয় ঘটে গেল।

হঠাৎ মা আমার মারা গেলেন। তখন আমি সবে পনেরোয় পা দিয়েছি। সে-দুঃখ মানুষের ভাষায় বলবার না। যেন হিংস্র শ্বেনপাখীর মত নিষ্ঠুর নিয়তি আমার জীবনকে মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ছুড়ে ফেলে দিলে এক দয়াহীন সংসার আবর্তে।

মৃত্যুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আজ মনে পড়ছে কী এক সর্বনাশের সূচনায় সে রাত্রে বড়ো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। মা, আমার দুঃখিনী মাকে জীবনে আর দেখতে পাব না। এ কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি মন। আজ ভাবছি কী অবিশ্বাসীই না ছিল আমাদের মা মেয়ের সম্পর্ক। মায়ের আমার ভালবাসার কী আর সীমা ছিল! তাকেও আমি বড়ো ভালোবাসতাম। আমার ত মা বই আর কেউ ছিল না জীবনে। আমাদের সে ভালবাসা ছিল পাহাড়ী নদীর মত আপন আবেগে ছরস্তু। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিদিনের নৈরাশ্র জয় করার জোর ছিল না। কোথায় একটা বাধার পাহাড় ছিল, যা আমরা ঠেলে সরাতে পারতাম না। কত কি ছিল আমাদের মধ্যে, যা বলা যেত না। মনের তটে যতবার কুসপ্লাবী ঢল আসত নেমে, মুখে তাকে কিছুতেই প্রকাশ করার সাহস হত না। মায়েরও হাত না, আমারও হাত না। তাই কোনো কিছুতেই আমরা কেউ কাউকে প্রশ্ন করতাম না কোনোদিন। বোধ হয় নির্ধাক থাকাটাই স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে নিয়েছিলাম। মনের আগুন মনেই জ্বলত।

মা তার অতীতজীবনের কথা কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি আমায়। সে-সবক্কে কোনোদিন কোনো নালিশও শুনিনি তার মুখে। অথচ তার সমস্ত চেহারাটিই ছিল অভিযোগের একটি বাণীহারা প্রতিমা। সংসারের কোনো সমস্তা-কীর্ণ বিষয় নিয়ে কোনোদিন মায়ের সঙ্গে আলোচনা করিনি। ভয় হত পাছে মায়ের সঙ্গে আমার মনের সহজ স্নেহের সুরটি কোথাও কেটে যায়। সে সম্ভাবনাকে বড়ো ভয় করতাম আমি। মাও বোধ হয় করতেন। মনে মনে ভাবতাম এমন একদিন আসবে যে দিন মা নিজের থেকেই ছয়ার অব্যাহিত করবেন আমার কাছে। সেদিন আমিও আমার কোনো কথা গোপন রাখব না। দুজনেই দুজনের হৃদয়ের গোপন মহল উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সহজ হব। মাকে আমার সত্যিকার আপন করে পাব।

কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতে কোনো কথাই বলা হোল না। মায়ের সেই চাপা স্বভাব আর অসুস্থ দিনরাত্রি সে-সব কথাকে চিরদিনের মত

অবলা বেধে দিয়ে গেল। আর এই প্রফেসর! যতবার মায়ের সঙ্গে নির্জন হয়ে বসেছি, ভেবেছি হয়ত এবার মাকে পাবো আমার অন্তরঙ্গ আশ্রয় করে, ঐ প্রফেসর এসে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া মায়ের আমার সেই এক কথা ছিল মুখে—কি আর হবে? সবই ত গেল। বঙ্গা হয়ে ওঠেনি।

এমনি করে দিনে দিনে ফুরিয়ে গেল দিন। আয়ুর জীর্ণ তরলী চলমান জলস্রোতে কোথায় কোন মহাঅঙ্ককারে হারিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল সব। একটি মাত্র অশনি আঘাতে এক মুহূর্তে সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। যে সব কথা বলা হোল না, যার হ্রহ ভারে জীবন তার চুঃসহ হয়ে উঠেছিল, স্বীকৃতির অক্ষতলে তা হয়ত লঘু হতে পারত। কিন্তু মায়ের মুখ থেকে সে কথা শোনবার সৌভাগ্য হল না আমার। এমন কি মা শেষ বিদায় জানিয়েও যেতে পারেনি। আজ স্মৃতিসমুদ্র মন্বন করে শুধু এই কথাটাই মনে করতে পারছি, প্রফেসর এসে আমার ডেকে নিয়ে গেল—‘সুমানা, মা তোমায় ডাকছেন, আশীর্বাদ করবেন।’

বিছানা থেকে মা তার রক্তহীন ক্যাকাশে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। নিঃশ্বাস নিতে বেদনা বোধ করছেন তিনি। মৃত্যুবরণাকাতর দুটি চোখ। যেন নির্বানোমুখ প্রদীপশিখা। উঃ আর ভাবতে পারছি না। ভাবতে পারছি না।

মনে পড়ে সে কি রাগ আর মমতাতরঙ্গ কোতুহল নিয়ে আমি মায়ের মৃত্যুর পরের দিন আর তার সমাধির দিন বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আর কি আতঙ্কে আমার গলা বুঁজে এসেছিল সে কথাও স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার! এখানকার জমিদার তিনি। কিন্তু তিনিই ত আমার বাবা। মায়ের চিঠির বাক্সে মাকে লেখা বাবার হাতের অনেক চিঠি আমি পেয়েছিলাম। সেগুলি তাদের সম্বন্ধের সাক্ষী।

এই কদিনে বাবা যেন অনেক বদলে গেছেন। মুখের সে সৌম্য স্নিগ্ধ জ্যোতি নেই। শোকে তাপে তাঁকে কত ক্যাকাশে দেখব ভেবেছিলাম। হয়ত দেখব গাল দুটি করে গিয়েছে। এই বয়সে এত বড়ো আঘাতে হয়ত বা খুবই মুষড়ে পড়েছেন। কিন্তু ভুল আমার ভাবতে দেয়ী হোল না, দেখলাম কিনা সে পাথরের বুকে চিড় ধরেনি, ভাবের জোয়ার তাঁটারে দোল খায়নি মন।

এক সপ্তাহ পার হোল না। ঠিক আগের মতই তিনি আমাকে আবার তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। তেমনি ভাবলেশহীন নিরাবেগ শুক কণ্ঠে হুকুম দিলেন আমাকে বই পড়ে শোনাতে। চেয়ে দেখলাম তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিখানি তেমনি খেলানো রয়েছে, শুধনো সরানো হয়নি। কি জানি হয়ত বা সরাতে দেননি তিনি।

বই পড়া শেষ হলে চলে আসছিলাম, এমন সময় আবার আমাকে ফিরে ডেকে পাঠালেন তিনি। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দ্বিতীয়বার তাঁর হাতে চুষন করতে দিলেন। বললেন—মাকে হারিয়েছ—ভয় নেই আমি রইলাম। আমার আশ্রয়ে থাকবে তুমি। বলে আর এক হাতে আমার কাঁধে মৃদু ঠেলা দিলেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম তাঁর মুখের সেই সনাতন ভঙ্গীটি। ঠোঁটের দুপ্রান্ত শানিত করে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—যাও বাড়ি যাও।

কান্না আমার গলায় ঠেলে আসছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল চীৎকার করে বলি—চলে যেতে কেন বলছেন আপনি? আমি ত আপনাই মেয়ে। আপনিই ত আমার বাবা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কথাই বলতে পারলাম না আমি। সব কথা বুকে চেপে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে এলাম।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে মায়ের কবরের পাশে গিয়ে বসলাম। বসন্ত এসেছে পরিপূর্ণ মহিমায়, অক্স পত্রপুষ্পের সস্তার নিয়ে। নতুন কবরের সোঁদা মাটির গন্ধ বড়ো ভাল লাগল। মা আমার কত কাছেই ছিলেন, তাকে অত কাছে নিয়েও মন হু হু করতে লাগল। কবরের পাশটিতে আমি অনেকক্ষণ চুপটি করে বসে রইলাম। তবু মাতৃহারা অসহায় শিশুর মত কঁদতে পারলাম কই? পোড়া চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও ঝরল না আমার। মনে হোল বেদনার বোধই বৃদ্ধি লোপ পেয়েছে মন থেকে। শুধু একটি মাত্র চিন্তা মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত গুলন করে কিরতে লাগল। মাগো ঐ মাটির অন্ধকার থেকে তুমি কি শুনতে পাবে আমার কথা—তিক্ত বিষাক্ত কণ্ঠে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম আমি—শোনো মা, তিনি আমাকেও তার রক্ষাধীনে রাখতে চান। মেয়ে বলে আমার কোলে তুলে নিতে তার বাবল। আমার আশ্রয় দিতে চান শুধু। কিন্তু কেন? কেন এমন কথা তিনি বললেন মা?

সে আশ্রয় কিসের লোভে দেবেন সে কথা ভাবতেই ঠোঁটের কোণে আমার হাসি বিধিয়ে উঠল। নিঃশব্দ মেয়ের মুখে সেই হাসি দেখে মা যে আমার কবরেও শান্তি পেলেন না তা আমি জানি। নিরুপায় হয়েই মাকে আমার অত বড়ো দুঃখ দিতে হলো।

একটা দুর্বীর ইচ্ছা আমার মনে মোচড় দিত। ভাবতাম ঐ জমিদারবাবু যাকে আমি বাবা বলে জানি, তার কাছ থেকে একটা কথা আদায় করব। কোন স্বীকৃতি আদায়ের অভিক্রুচি নেই আমার। শুধু একটিবার আমাদের রক্তের সম্বন্ধের কথা তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই আমি। শুধু একটিবার তিনি বলবেন এই দুঃস্বপ্ন বাসনার উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম আমি। প্রতি মুহূর্তে সেই বাসনাবহি আমাকে দহন করত। তিনি মানুষটি কেমন তা জানতে আমার বাকী ছিল না। আমি ধীরে মেয়ে হবো, তিনি কতো বড়ো, কত মহৎ কত উঁচু হবেন তা আমার কচি মনের স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে উঠেছিল। আজ যাকে বাবা বলে জানলাম তিনি আমার ধ্যানমূর্তির চেয়ে কত ছোট হয়ে দেখা দলেন। কিন্তু তিনি যাই হোন, এ পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এ নির্দয় সংসারে আমি যে কত একা, কত অসহায় তা আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে? তবু একথা ভাবতে ভালো লাগে যে আমার মা এই মানুষটিকে ভালবাসতেন। তিনি নিশ্চয় এমন কিছু পেয়েছিলেন এই মানুষটির মধ্যে যার জন্যে মা আমার দেহমনের সর্বস্ব উদ্ধার করে দিয়েছিলেন এর কাছে। এ কথা ভাবতে ভারী ভাল লাগত আমার। এই অসুভূতি আমার হৃদয়কে নিরন্তর মধুর সিক্ত করত।

এমনি ভাবে তিনটি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। যে ছক কাটা এক ঘোঁরে জীবনের চাকায় বাঁধা ছিল আমার ভাগ্য, কোথাও তার চুলচেরা বিচ্যুতি ঘটল না, নিয়তির মত উদাসীন নিপুণতায় তিনি আমাদের জীবনের আনন্দ-বেদনাকে গ্রহিত করে রাখলেন।

আমার ভাই ভিক্টর দিন দিন বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে শিশু হোল কিশোর। ভিক্টরের চেয়ে আমি আট বছরের বড়। ওকে মানুষ করে তোমার ভাই আমি সানন্দেই মাথা পেতে নিতাম। কিন্তু ওর বাবা বাদ সাধলেন। তিনি চাইতেন না যে আমি ওর সঙ্গে মিশি। ভিক্টরের জন্য একজন নাস'রাখা হোল। তার উপর কড়া হুকুম হোল ও যেন কোনো মতেই আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে না পারে। আর কোলে কাছে না আসতে পারে। ভিক্টরও কেন যেন আমাকে দেখে ভারী লজ্জা করত। কিছুতেই আমার কাছে যেসতে চাইত না। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত সে।

এমনি যাচ্ছিল দিন। এরই মধ্যে একদিন আজকের এই প্রফেসর আমার ঘরে এলেন। বড়ের মত এসে ঢুকলেন অত্যন্ত হুসিহুসিত, উত্তেজিত ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায়।

আগের দিন সন্ধ্যায় তার সম্বন্ধে নানা অশ্রুতিকর গুজব কানে এসেছিল আমার। চাকরদের মহলে কানাঘুসা চলেছে লোকটা নাকি জমিদারের মোটা টাকা তহবিল তহরপ করেছে। এমন কি একজন ব্যবসাদারের কাছ থেকে ঘুষও নিয়েছে শোনা গেল।

আমার ঘরে এসে দারুণ অধৈর্যে টেবিল ঠুকে বললেন তিনি—

—‘আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমায়। আর দেবী করলে চলবে না। গিয়ে এখুনি আমার হয়ে তোমার জমিদার বাবুর কাছে তদবির করবে।’

—‘আপনার হয়ে তদবির করব? কেন?’ কিসের জন্য?’

—‘তদবির মানে মধ্যস্থতা করতে হবে। দাঁড়িয়ে বলতে হবে আমার হয়ে তোমার বাবুর কাছে। এ বাড়িতে আমি ত আর অপরিচিত আগন্তুক নইরে বাবা। স্বীকার করি আমি দোষী। কিন্তু সে ত কথা নয়—যদি তোমার বাবু আমায় তাড়িয়ে দেন আমার ত গিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। দুবেলা দু’ঘুঠো অন্নও না জুটতে পারে। আর আমি পথে দাঁড়ালে তোরও যে পথে ঘর হবে সে কথাটাও ভেবে দেখিস।’

—‘কিন্তু আমি তাঁর কাছে কি করে যাব? তাঁকে বিরক্ত করতে পারব না আমি।’

—‘জ্বাকা মেয়ে। তাঁকে বিরক্ত করতে পারব না আমি। সে অধিকার যে আছে তোর।’

—‘কিসের অধিকার?’

—‘চের হয়েছে, আর মিথ্যে জ্বাকামি করতে হবে না। অনেক কারণেই তিনি তোকে বিমুখ করতে পারবেন না। কেন করবেন না তা বোঝবার চের বয়েস হয়েছে তোর। আমার মুখ থেকে সে কথা নাই-বা শুনলি।’

মুখে এক কদর্য হাসি ফুটে উঠল তার। বিষ মাখানো দৃষ্টিতে তাকাল সে আমার দিকে। দেখে আমার গাল দুটো যেন আগুনে পুড়ে যেতে লাগল। একটা প্রবল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণার চেউ উঠতে লাগল বুক ছাপিয়ে। সে উত্তাল ভরসে আমি কোথায় ভেসে গেলাম, হারিয়ে গেলাম।

—‘হ্যাঁ, আপনার ইচ্ছিতের মর্ম আমি বুঝতে পারছি’—বললাম আমি। নিজের গলা

নিজের কানেই কেমন যেন বেসুরো ঠেকল। এই ঘৃণ্য মানুষটার দিকে তাকিয়ে বিত্ৰী কটু কণ্ঠে বললাম—‘তঁার কাছে আমি যাব না। তঁার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে কিছু চাইতে পারব না আমি। তাতে আমার কপাসে অন্ন জুটুক আর নাই জুটুক।’

শুনে রাগে কাঁপতে লাগল এই প্রফেসর। দাঁতে দাঁত পিষে ঘৃষি পাকিয়ে দাঁড়াল বেন সে। সাপের মত হিস হিস করতে লাগল তার গলার স্বর। যখন কথা কইলে জিভ দিয়ে বেন বিষ ছড়াতে লাগল আমার গায়ে। বললে—

—‘বহুৎ আচ্ছা। একটু সবুর করুন মহারানী। এ অপমান আমি সহজে ভুলব না।’

সেই দিনই জমিদার বাড়ি থেকে তলব এসেছিল সেই প্রবন্ধকের। জমিদারবাবু নাকি বেত উচিয়ে শাসিয়েছিলেন ওকে। এসব কথা পরে শুনেছি আমি।

তবে প্রফেসরের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত জমিদারবাবু ওকে তাড়িয়ে দিলেন না। এমন কি যে চাকরীতে ও বহাল ছিল সেখান থেকেও সরাননি ওকে। কিন্তু এই লোকটা যে সেদিনকার অপমানের কথা ভোলেনি সেটা বুঝতে তখনও আমার দেবী ছিল।

এই ঘটনার পর বাবার জীবনের দ্রুত পট পরিবর্তন হতে লাগল লক্ষ্য করলাম। তাঁর মন যেন একদম ভেঙ্গে গেছে। মনের সে ক্ষুধা উৎসাহ কোথায় যেন উবে গেল। তাঁর সেই গোলাপের মত রক্তাভ লাবণ্যময় গাল দুটো ক্রমশ নিশ্চিন্ত হলদে হয়ে উঠতে লাগল। এতদিন পরে মুখের চামড়াগুলো জরাস্পর্শে বেন কঁচকে যেতে শুরু করল। সামনের একটি দাঁত পড়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরোনো একদম বন্ধ করে দিলেন তিনি।

মাঝে মাঝে বাবা তাঁর প্রজাদের সঙ্গে দেখাশুনো করতেন। এইসব দিনগুলো ছিল এ বাড়ির উৎসব আনন্দের দিন। প্রজারা বড় হলঘরটার এসে জমায়েত হোত। তিনি ব্যালকনিতে, কখনো বা তাদের মাঝখানে হলঘরে এসে দাঁড়াতে। তাঁর কোর্টের বাটনহোলে থাকত একটি গোলাপ ফুলের বোকে। রূপোর পাত্রে ঢালা দামী মদে চুমুক দিতে দিতে বক্তৃতা করতেন।

—‘তোমাদের পরিশ্রমে উৎসাহে আমি ভারী ধুশি হয়েছি জানবে। আমার কাজেও নিশ্চয় তোমাদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছি। এই তোমরা সবাই ভাই ভাই, সবাই সমান। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা সব আনন্দ কর।’

মাথা নত করে তিনি নমস্কার জানাতেন সকলকে। প্রজারাও প্রতিনমস্কার করত। কিন্তু আভূমি লুপ্তিত হয়ে নমস্কার করা বিধিতে নিষেধ ছিল তাঁর। বলতেন ওতে মানুষের অপমান করা হয়। কোমর অবধি বঁকিয়ে তারা জমিদারকে মান দিত। বড়ো মিলি সম্পর্ক ছিল জমিদার প্রজায়। তবু যেখানে যাই হোক আগের মতই জমিদার বাড়িতে প্রজাদের খাওয়ান দাঁওয়ান আদর আপ্যায়ন চলতে লাগল। উৎসব পার্বণের কোথাও চিড় ধরল না। কিন্তু প্রজারা আর তাদের জমিদারের দর্শন পেত না। তিনি আর নামতেন না, দেখাও দিতেন না।

তার বগার ঘরে পড়া যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। শুধু সেই নিশ্চিন্ত মানুষটিকে ক্লান্ত মনে হোত আমার। পড়ার মাঝ পথে এক এক সময় তিনি যেন হতাশায় ভেঙে পড়তেন। আফশোস কেটে পড়ত তার কণ্ঠে। বলতেন—‘এতদিনের কল বিগড়ে গেল। সব ভেঙে চূরে তচনচ হয়ে।’

বাবার সেই দৃষ্ট চোখের দৃষ্টি যে দিনে দিনে দীপ্তিহীন হয়ে আসছে তা তার মুখের দিকে না তাকিয়েও আমি বলতে পারতাম। বিশাল আয়ত চোখ দুটি ছোট হয়ে থাকত ক্লান্তিতে জ্বরায়। আজকাল অধিকাংশ সময় তিনি কিম্বিয়ে কাটান। যুমান যখন জ্বরে নিঃশ্বাস নেন। যেন খাসকণ্ঠে বোধ করেন। শুধু আমি যখন বাই মানুষটি সজাগ হয়ে ওঠেন। আলস্বেড়ে ফেলেন শরীর মন থেকে। একটু যেন সৌজন্তের আতিশয্যই দেখাতে চেষ্টা করেন।

আমি ঘরে এসে চেয়ারে থেকে উঠে স্বাগতঃ করতেন তিনি। এ তার চিরকালের অভ্যাস। এর ব্যতিক্রম হয়েছে কোনোদিন তা মনেই পড়ে না আমার। কিন্তু আজকাল উঠে দাড়াতে তার বেশ কষ্ট হয় বুঝতে পারি। বাবার সময় আমার বাহুগুলোর নিচে হাত গলিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে দরজা অবধি পৌঁছে দেন। শরীরের কষ্ট মনে না। যেমন করে এসেছেন, সেই রীতিই-চালিয়ে নিয়ে চলেন।

আজকালই দেখেছি আমাকে তিনি নাম ধরে না ডেকে মাঝে মাঝে সোনামণি বলে আদর করেন।

মায়ের মৃত্যুর দু’বছর পরে এবার এক প্রিয় বন্ধু মারা গেলেন। এই বন্ধুটির মৃত্যুই যেন বাবার বুকে শেলবিদ্ধ করল। তিনি ছিলেন বাবার বিলিয়াড খেলার নিত্যসঙ্গী। তার সমসাময়িক কালের একজন চিরবিদায় নিল পৃথিবী থেকে এই চিন্তাটাই যেন তার বুকে বেশি করে বাজতে লাগল। আর দিনে দিনে তার জীবনশ্রোতে ভাটির টান লাগতে লাগল এ যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

বাবার শরীরে জ্বর এসে বাসা বাঁধলেও, মন তার ভাঙতে দেখিনি। সেইটুকু স্মরণ দেখে আমার মন ভরসা পেত। কোনো কিছুতেই হার না মানার প্রকৃতি ছিল তার। সেটুকু বজায় করে যাচ্ছিলেনও। দেখতাম কিনা সবসময় মুখে একটা স্নিত অভিজাত হাসি লেগেই থাকত। এমনিই চলছিল বেশ।

পৃথিবীতে থাকার মেয়াদ যে দুরিরে আসছে তার, মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে প্রথম তার সঙ্কেত পেলেন তিনি। ছপুরে খাওয়ার ঠিক পরেই হঠাৎ মাথা ঘুরতে লাগল তার। মারা শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। সে ভাবটুকু সামলে নিলেন বটে কোনোরকমে, কিন্তু সেই প্রথম তিনি ভাবতে বসলেন। বড়ো আশ্রয় কেদারায় চিন্তাক্রান্ত মুখে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে ফেললেন—‘আর কি! হয়ত এল।’

যাই হোক সে-যাত্রা কোনো মতে সামলে নিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে একমাত্র উত্তরাধিকারী ভায়ের কাছে একখানি চিঠি লিখলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে

এই ভাইটির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আজ কি মনে করে তাকেই কাছে ডাকলেন।

তাঁর অশ্রুধরেছে শুনে প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ জার্মান ডাক্তার ঘেঁষা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে। লোকটি একসময় নামকরা ডাক্তার ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে এই গ্রামের নিভৃত নিরাসায় নিম্নের ছোট বাড়িটিতে অবসর যাপন করছিলেন। কদাচিৎ এ বাড়ির চৌকাঠ মারাতেন তিনি। অথচ বাবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল গভীর। কালেভালো কখনো এ বাড়িতে এলে বাবা তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করতেন। পৃথিবীতে বোধ হয় তিনিই একমাত্র লোক বাবা যাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।

তিনি এসে বাবাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন, ‘এই সময় একবার গীর্জার পাশ্বকে ডেকে পাঠান।’ কিন্তু বাবা তাতে রাজী হলেন না। বললেন—‘তাঁকে আর বিরক্ত করে লাভ কি? আমাদের এমন কিছু নেই জীবনে যা তাঁকে জানিয়ে লাভ হবে। আপনি বরং অল্প প্রসঙ্গ পাড়ুন ডাক্তার।’

ভদ্রলোক বিদায় নিয়ে যাবার পর বাবা তাঁর খানসামা গোছের ঐ প্রফেসরকে ডেকে হুকুম দিলেন, এরপর আর বাইরের কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয় এ বাড়িতে।

(ক্রমশ)

প্রতিষ্ঠা

মানিক মুখোপাধ্যায়

(রমেন চক্রবর্তীকে)

আশ্চর্য উদাস্ত সেই সমুদ্রের ভাষা,
অমৃত তরঙ্গ চূড় চিরকূট তার ;
মেঘের অলিন্দ বেয়ে বারবার এসে
সংগীতের মতো এক মুগ্ধ ভালোবাসা
এ হৃদয় তটে ধোঁজে মুক্তির আশাট---
সপ্নে প্রাণন এসো নেমে এই দেশে !

রৌদ্রের আকর্ষণ ডাক প্রেমসীর মতো
মনে হয়। ক্লাস্তির আকাশ চিরে কেউ
ধেন এসো। এয়োতির কলোচ্ছ্বাস বিদে—
অদম্য আকাংক্ষা তার নিবিড় সংহত ;
মুক্তিকাম জীবনের লীলায়িত ঢেউ,
আজি সে প্রতিষ্ঠা পেলো সখিৎ গভীরে !

বিশাল বিপুল সেই সমুদ্রকে বেয়ে
শান্তির আবেশ নামে এ হৃদয় ছেয়ে !

দূরের কান্না মোহিত চট্টোপাধ্যায়

“From afar, moans a lovely woman who would like to struggle
And who cannot, lying at the foot of the hill.
And whether the sky be wretched or transparent
You cannot see her without loving her.”

Paul Eluard

আবার নিগূঢ় হৃৎখে তার কান্না মেঘের প্লাবনে
আদিগন্ত ধারাজল অন্ধকার প্রপাতের মত ।
সে যেন কোথায় শুয়ে অলক্ষিত তিমির-শয্যায়,
ভুলে গেছে রোদ-রং-এ সেই নিত্য সিঁদূরের ব্রত ;
যুক্তধারা তার মনে কল্লোলিনী জলের প্রয়াস
বিক্রপ কালের মস্ত্রে বাণুচারী—শীর্ণ হৃত-ভাষ :

যুগ্মের নিসর্গে তার যুত্ব-নীল চোখের আকাশ
সময়ের তীক্ষ্ণশর ভুরুর ছায়ায় গেছে একে ;
একদা কর্মিষ্ঠ হাত বিচূর্ণীত মেঘের রূপকে
শতধা বিদীর্ণ সুখ তারার প্রদীপ ভুলে দেখে ।

কোথায় অলক্ষ্যে তার ক্ষীণতোয়া জলের শরীর
সমুদ্রের তিস্তাপাত্র ! তবু তার কুটিরের খোঁজ
কখনো পাবেনা এই রাতের অরণ্য ঘুরে ঘুরে,
স্বর্ষের হিরণ্য-দীপে দিনের প্রাস্তর খুঁজে রোজ ।

কে যেন তাক্রণ্যে দীপ্ত স্ননিপুণ তিমির-শিকারী
তাকে পেতে সূর্য-শরে যুত্ব খোঁজে মায়াবী রাত্রির
তারপরে পরাভূত যৌবনের হৃৎখে হয় ধূলো
মাটির কান্নায় রাখে ইন্দ্রায়ুধ—মৌন-স্নান তীর ।

আগে তাকে ভালোবাসো সমুদ্রত শৌর্য তার পর
তবে তাকে কিরে পাবে—তার স্বচ্ছ মেঘের শরীর
মাটির দূরস্ত দেহে মিশে হবে নন্দ ভালবাসা—
সে-ই ভুলে দেবে হাতে তিমিরাস্ত সময়ের তীর ।

দুই দিন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

(করুণাশংকরকে)

অন্তরীক্ষে উদ্ভব গ্রীব যে আছে সে আছে :
কাছের আমরা নিত্য দুঃখ পেয়ে থাকি—
ব্যাধার বিপণি মাত্র সম্বল এ-কাঁচও,
ঋণগ্রস্ত পরিবেশে কত বাকি আজো কত বাকি !

উটের সারির রেখা চলে দূরপথে,
পাহাড় প্রবাস পথ ভগ্ন পায়ে চলি—
বিদেশীর তীরবদ্ধ অতি দ্রুত স্রোতে
আমার বন্ধুরা কত দিয়ে গেল রক্তের অঞ্জলি !

অন্তরীক্ষবাসী তুমি ভুলেছ আমায় :
সেইত যখন কাঁচ হীরা বলে হত প্রতিভাত
যখন রাজাই সাধ, জ্যোৎস্না স্বপ্ন ছিল ত্রিষামায়
হাওয়ায় তরঙ্গ যেন কুবলয়-শোভিত দুহাত ;

আনন্দে ছায়ার লগ্নে লতাগুন্ডা ভরা বনস্থলী,
অনুভূত স্তম্ভেখর্ষে পারিপ্লুত আমরা সবাই—
অলসের সহজ গতি বুকে নিয়ে কত পথ চলি
রোপ্যকণা চূর্ণ চূর্ণ পার হই চড়াই-উৎরাই !

ভারপরে ভিন্নমুখ । চেতনার মগ্ন মক্ষিকার
অস্ত্র রস আহরণ, ঋতুরঙ্গ হর্ষে-ক্ষোভে নীল
আকাশের গায়ে গায়ে, আর এক দুর্গ-পরিধার
চতুর্দিকে শুমরে মরি, কেন না এখন দেখি স্বপ্নে দৃশ্যে বহু গরমিল ;

লোমশ বিচ্ছিন্ন রাত, দুঃখময় ব্যাধের আকাশ,
তোমার একমুখী শুধু স্পষ্ট চেতনাই—
কতটুকু আলো আর কতটুকু ছায়া-প্রতিভাস
স্থিরাবাসে সব দেখি, সব কথা হবেও জানাই ।

কাল প্রয়সী উৎপলকুমার বসু

জ্যোতির সমুদ্রে দেখি তাকে
তার মুখে রোদ্দ ঝড়—বর্ষার মেঘ নত হ'লো
ঘন ঘন বিহ্বল স্মরণে চেনা যাবে থাকে ।

আমি সোকে সোকে অবিশ্বাস নিয়ে ফিরি
উন্মাদের কলরোল বারবার শুনেছি—যেনেছি
স্নানুতে স্নানুতে তারা অবিশ্বাস ভরে দিল
তবু জ্যোতির সমুদ্রে দেখি তাকে
যার মুখে রোদ্দ, ঝড়—বর্ষার মেঘ নত হ'লো
ঘন ঘন বিহ্বল স্মরণে চেনা যাবে থাকে ।

এইসব দিনগুলি রাতগুলি
কালের অমোঘচক্রে অগ্নির আঘাত হেনে
একবার শুক হতে বলে ।
তবু তার নিষ্ঠুর যুগলা
কণস্থির লীলা নয়—তাই তাকে এত ভালবাসি
যার মুখে রোদ্দ ঝড়—বর্ষার মেঘ নত হ'লো ।

জনপদের ছন্দ

রাহুল

॥ সূর্যের অন্ধকার ॥

নার্স এসে দেখে গেল রোগী ঘুমিয়েছে কি-না।

রোগী তখন হয়ত ঘুমিয়েছিল। নিঃশব্দে বাইরে এসে নার্স বললে, “অনেকক্ষণ ঘাপাদাপি করে ক্লান্ত এখন। মনে হয়, একটু ঘুমিয়েছেন। আপনি বরঞ্চ বিকেলে আসুন।”

“কিন্তু রোগ-নির্ণয়ের কি হল? ওটা কি মৃগী রোগ?”

নার্স বিনীতভাবে বললে, “বিকেলে এলেই জানবেন। এখনো দোষ করি রোগ-নির্ণয় হয়নি।”

ধানিক নিঃশব্দে থেকে বললাম—“আমি কিছু ফুল নিয়ে এসেছিলাম। শাদা ফুল ও বড় ভালবাসে। তার শিররে ফুলগুলো সাজিয়ে দিতে পারেন?”

নার্স ফুলগুলো হাত বাড়িয়ে নিয়ে জিগ্গেস করলে—“রোগী আপনার কি হয়?”

মান্ন হাস্তে বললাম—“আমার পরিচিত ব্যক্তি। এক হোটেলেই আমরা আছি। আমি অবশ্য এদেশে থাকিনা। নানা দেশ ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমাদের পেশা এবং নেশা প্রায় এক।”

“অর্থাৎ?”

“অর্থাৎ আর কিছুই নয়। রোগী বাংলা দেশের এক পথভ্রষ্ট কবি।”

“ওঃ, সেজন্যে অনেক বাংলা কবিতা কিছুক্ষণ আগেও তিনি আওড়াচ্ছিলেন।”

নার্স কথা কয়টি বলে হয়ত আমার চোখের দিকে চেয়েছিল। আমি তত লক্ষ্য করিনি। কিন্তু যুহুর্তে জলে ভরে-এল আমার চোখ। এও এক কবি। যেমন ছিল সুকান্ত। সুকান্তের মত দেয়ালে দেয়ালে কবিতা না লিখে, এ শুধু জংগলে জংগলে কবিতা আবৃত্তি করে। গল্পের চালাবরের নিচে একা একা বসে কবিতার পাদপূরণ করে। খাতাকলম নিয়ে কবিতা লেখার ফুরসুৎ কোথায়? বে-কলমে অনবরত কোম্পানীর টাকা পয়সার হিসেব কষতে হয়, সে-কলম দিয়ে কবিতার পাপড়ি ফোটাতে সে চায়নি।

“এখানে ওর কোন আত্মীয়ই নেই?”

“কেন, আপনারাইতো আছেন।”

আমার অবাবে মহসা নার্স হকচকিয়ে গেল। তারপর বললে “নার্স যে রোগীর

বোনের মতন, সে কথা বহুদিন ধরে ভুলে গেছি। শুধু ট্রেনিং-এর সময় এরূপ কথা শোনানো হয়েছিল।”

“মনে কিছু করবেন না। কবি বড় নিরাশ্রয়। আপনিই ওকে দেখবেন।” কথা কয়টি বলে হাসপাতালের সিঁড়ি কেয়ে মাটিতে নামলাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম—
“কাজের তাড়ায় যদি বিকেলে নাও আসতে পারি, আপনি কিন্তু ওকে দেখবেন।”

বেশিক্ষণ গেলনা। কবির ঘুম ভেঙে গেল। আন্তে আন্তে চোখ মেলে দেখলে আশে পাশে যারা খাটের উপর বসে কিংবা শুয়ে আছে, তারা রোগীর মত। রোগীর মত কেন, রোগীই। শেষ পর্যন্ত প্রত্যয় হল এটা হাসপাতাল বলে। ঔষধের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছিল মূহু বাতাসে। কিন্তু শুয়ে শুয়েই কবি আবার ফুলের গন্ধ পেল। সহসা মনের ভেতর বিদ্যুতের মত সঞ্চারিত হল টাকার কথা। গতরাতের টাকা। কবি তার কোটের গোপন পকেটে হাত দিল। পরমুহুর্তে অদৃত প্রসন্নতার ভরে উঠল অন্তর। না, গোপন পকেটে সেফটিপিন-মারা মনিব্যাগ ঠিকই আছে। খোয়া যায়নি।

নাস' এগিয়ে এল শিরের কাছ। ফুলগুলো এগিয়ে দিয়ে বললে—“আপনার হোটেলের এক চশমা পরা বাবু এসেছিলেন। আপনাদের দুজনের পেশা এবং নেশা নাকি এক। তিনিই ফুল দিতে এসেছিলেন বেলা বারটার। আপনি ঘুমিয়েছিলেন দেখে তিনি চলে গেছেন। বলেছেন, পারলে বিকেলে আসবেন।”

কবি চুপ করে কথাগুলো শুনল। পরে অসহায়ের মত শুধাল—“আমাকে বলুন না, আমার কি হয়েছে?”

নাস' রোগীর সামনে টুলটা পেতে বসল। নাসের ও ব্যয় বেশি নয়। তবু কর্তব্য পালন করতে সে যেন হুসু করে চল্লিশ বছরের হয়ে গেল।—“কিছু হয়নি। মাথা ঘুরেছিল বলে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর জ্ঞান হয়নি দেখে আপনাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।”

“কিন্তু এখন তো আমার জ্ঞান হয়েছে। আমাকে ছেড়ে দিলেই হয়।”

“ডাক্তার আশুন তো বিকেল বেলা। জ্ঞান হলে নিশ্চয় আপনাকে ছেড়ে দেবেন।”

“সেই বিকেল পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে?” শুধাল কবি।

নাস' হাসল মনোহরণ হাসি। মাথা নেড়ে বললে—“ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি তো আছি। তারপরে কানের কাছে মুখ দিইয়া সরিয়ে এনে বললে—“আপনিও বাঙালী আর আমিও।”

নাস' চলে গেল অন্য কাজে। কবি বিছানা ছেড়ে উঠল। শরীর বড় দুর্বল। কিন্তু দুর্বলতার কথা প্রকাশ করলেই হাসপাতালে থাকতে হবে। বড় ভয় ওর হাসপাতালকে নিয়ে। সেলসময়ানের হাসপাতাল-বাসকে কোম্পানী কথাটি মুনকরে দেখে। বিশেষত কোম্পানীর টাকার হিসেব যখন পর্যন্ত সমজানো হয়নি।

নাসের পরিত্যক্ত টুল সরিয়ে এনে বসল জানালার কাছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়

বিহারের কৃষ্ণ প্রকৃতিতে। জায়গাটা বিহারের। মাটি এখানে পদমাশ্চর্য। সহজে গলেনা, এমন কি বৃষ্টির পরেও। বাসি ও পাথরে ভূস্তর শুধু পিংগল নয়, কঠিনও বটে। ঠিক কোম্পানীর খোলসের মত।

কবিয়াল নয়, আধুনিক কবি। বাঙলা দেশের ছেলে দৈববিপাকে এসে পড়েছে বিহারের হাসপাতালে। এখানে আসবার কোন কথাই তো ছিলনা। বিস্তীর্ণ দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের ইতিহাস হাতড়াতে লাগল কবি। ধনতন্ত্রের এক অখ্যাত ভগ্নদূতের মাথুলি ইতিহাস শুরু হয়েছিল কলকাতার আই-এ পাশ করার পর থেকে যখন।

সম্প্রতি কোম্পানী তাকে বালেখরের জংগল থেকে এ-তল্লাটে বদলি করেছে। বিখ্যাত এক দেশলাই কোম্পানীতে কাজ করে সে। বালেখরে থাকতে শিমুলের কাঠ সংগ্রহ করত বনে বনে। কবি হয়ে পড়ল কাঠুরিয়া। তবু কান্ডনে শিমুলের পুষ্টিত বনে মাঝে মাঝে সে অস্থির হয়ে পড়ত। একবার ভাবত, কোম্পানীকে ধবর দেবেনা এমন পুষ্টিত গাছের। গাছ তাহলে তারা কেটে নেবে কসাইয়ের মত। কিন্তু আবার সে অস্থির হয়ে পদচারণা করত। শিমুল সাধারণত একা জন্মায়না। এক পিতামহ-শিমুলের অঙ্কশ্র বীজকে কত কালবৈশাখী এখার-ওখার ছড়িয়ে দেয়। তাতেই আশে পাশে শিমুলের তরুণ-গোষ্ঠী তৈরী হয়। যুথবদ্ধ শিমুল। তার নগর কাঠ যাবে দেশলাইয়ের কারখানায়। গাছের আড়কাঠি হয়ে এসেছে কবি। গাছের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত। যদি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারত গাছগুলি।

গাঁয়ের পর গাঁ। ঘুরত কাঠুরিয়া। আর খুঁজত কোথায় সেই শাল্মলী মহীকর, যার অনাবৃত, অঙ্কশ্র বাঁকাচোরা ডালে দূর থেকে দেখায় রাশি রাশি বস্তুর চেউ। আদিমকালের রক্তকবিতা বিশালকায় জানোয়ারের মত।

সেই কবি-কাঠুরিয়া এবার ভোল বদল করল। কোম্পানী দিল তাকে নতুন কাজ। দেশলাই বেচার কাজ নিয়ে কবি এল পূর্ব-বিহারে। জংগলে জংগলে সাঁওতালীদের হাটে বেচতে হবে দেশলাই। কবি এল সাঁওতাল পরগণায়। উত্তর রাড়ের বীরভূম অঞ্চলের সংগে মিলিয়ে যার মাটির প্রকৃতি প্রায় এক হয়ে আছে।

তবু ভাল। কবির ভাল লাগে সাঁওতালদের। বরফ, বিহারের অনেক জেলাই তার ভালো লাগেনা। যেখানে একেবারেই ফুল ফোটেনা, একেবারেই সবুজ বড় দেখা যায়না, এমন জায়গা কারই বা ভালো লাগে। দেহাতি গানের কলি ভাজতে ভাজতে অনাবৃত গাছের নিচ দিয়ে যায় যে রাধা, লছমী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণ, তাদের চাইতে ভালো লাগে সাঁওতালী মেয়েদের। কবরী বন্ধনে, নাচে এবং সর্বোপরি স্মৃতিম দেহের পতীর কালো বড় কোথায় যেন আভিগত সৌন্দর্য আছে।

সৌন্দর্যবোধটা ব্যক্তিগত। কিন্তু কানো রঙের উপরেই কবির একটা বিশেষ পক্ষপাত আছে। কারণ জিগগেস করলে কবি হঠাৎ আরক্তিম হয়ে উঠে। তার মনের আশীর্ষে ভেসে উঠে একখানি মুখ। সে মুখের বড় কালো।

কবি দেশলাই বেচে। পাইকারেরা এসে দেশলাই কিনে নিয়ে যায়। জামতাড়া কিংবা ছম্কার হাটে যখন হিলহিল করে সাঁওতালী মেয়ের কালো রুঙ, তখন কবিকে দেখে, সে সস্তা দামের সিগ্রেট ধরিয়েছে এক ছোড়া চোখ অরণ করে। আর যখন সারি সারি লঠন কিংবা মশালের আলো এদিকে ওদিকে নড়তে শুরু করে, যখন রাজমহল বা তিন পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে পশ্চিম পালামোর দিকে চলতে শুরু করে চাঁদের আকানী নৌকা, তখন ছম্কার আশে পাশে কোন এক গল্পে ভাঙা বেঞ্চ বসে কবি অরণ করে সেই কালো মেয়েকে। আবার কখনো উবু হয়ে দেশলাই বিক্রীর পয়সা মেলায়। কোম্পানীর পয়সার প্রতি পাইগুণা হিসেব দিতে হবে কোম্পানীকে।

পায়ের শব্দে চমকিত হয়ে উঠেছিল কবি। তাড়াতাড়ি চাপা দিয়েছিল কাগজের নোটগুলোকে। এত কাল রাতেরই কথা। একেবারে কাছে এসে গিয়েছিল সাঁওতাল তরুণীটি। খোঁপায় তার এক শুবক শাদা ফুল। লঠনের আলোতে কেমন মিষ্টি মনে হয়েছিল মুখখানি।

“একটা দেশলাই বেচবি বাবু, এই নে পয়সা।”

“না, না, খুচরা বিক্রী আমি করিনা। দোকানদারের কাছে যা।” আত্মসম্মানে যা লেগেছিল কবির। সে তো ছোট দোকানদার নয়। একটি বড় কোম্পানীর সেন্সম্যান। তাড়িয়েই দিয়েছিল মেয়েটিকে। গজগজ করতে করতে মেয়েটি চলে গিয়েছিল।

কবি বসেছিল আবার হিসেব মিসাতে। প্রতি পাই পয়সার হিসেব। যে হিসেবে ভুল হলে কোম্পানী মায়ামত করে না। গোটা কোম্পানীটাই যেন অন্ধ কসাই, কিংবা নিষ্ঠুর কবজ।

কিন্তু হিসেবে গোলমাল লেগেছিল তার। মানুষের মন তো। বয়স হয়েছে বত্ৰিশ তেত্রিশ। দশ বছর আগে ঢুকেছিল দেশলাই কোম্পানীতে। ভেবেছিল দশ বছরে যেমন করেই হোক, কিছু টাকা জমিয়ে ফেসতে পারবে। তারপর কলকাতায় বসে ঐ টাকার কোন একটা স্বাধীন ব্যবসা করা। তখন আর গোলামি থাকবেনা। ঝেড়ে ঝেলে দেবে দাসত্বের ছাই গা থেকে।

অথচ, দশ বছর তো দেখতে দেখতে কেটে গেল। একটি পয়সাও সে জমাতে পারেনি। একবার তার অসাবধানতায় তার জিন্মা থেকেই তিনশ' টাকা চুরি গেল। চুরি হলে কোম্পানী কি ছাড়ে? কোম্পানী লিখে পাঠাল, সেই নাকি চোর। শেষে সম্মান রাখতে মাসের বিয়ের গয়না বেচে টাকার ব্যবস্থা করতে হল। পারিবারিক শেষ সম্বল দিয়ে রক্ষা হল কোম্পানীর সংগে। সে ঘটনা ঘটেছিল বালেশ্বরে থাকতে।

তবু একটা স্বপ্ন ছিল। প্রদীপের সলুতের স্বপ্ন যেমন আলো, তেমনি তারও স্বপ্ন ছিল একদিন পদোন্নতি হবে। বছর বছর ধরে এই আশাই তাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পদোন্নতি আজ অবধি তো হলনা। আর মাইনে যা' বাড়ে, তা বলার মত নয়। অথচ, আধপেটা খেয়েও কোম্পানীর সম্মান বজায় রাখবার জন্যে প্যান্ট সার্ট পরে চলা কেবা

করতে হয়। সময় রক্ষার জন্যে হাতে হাতবড়ি লাগাতে হয়। ওতে খরচ কত। বারে বারে খরচ আছে ধোপার, আর বড়ির খরচ আছে মেরামতির।

কিন্তু সকল স্বপ্নের সেরা এক স্বপ্ন। প্রতিদিন কাকের শেষে খাটিরায় শুল বে স্বপ্ন হৃদয়কে মধুর করে। কলকাতার রাজা রাজকুমার ট্রাটে থাকে অপরাধিতা। সাত বছর ধরে প্রতি ছুটিতে যাকে সে একই কথা শুনিয়ে এসেছে। সেই ভালবাসা এবং বরবাধার কথা। তাকে সে সেলুন-গালের একটি চাকরিও জুটিয়ে দিয়ে এসেছে। একটি দ্বিতীয় কোম্পানীর তরল আলতা, সিঁহর ফেরী করে অপরাধিতা। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গৃহিনীদের কাছে ফেরী। বিক্রীর উপর কমিশন আছে অপরাধিতার। তাতে নিজের শাড়ি, স্লাউস, হাতখরচের পয়সাটা উঠে যায়। তত্পরি সামান্য মাইনেও আছে মাসকাবারে।

সেই কালো রঙের অপরাধিতাকে নিয়ে বরবাধার একটা দুর্ময় স্বপ্ন। ভাবতেও পুলকের তড়িৎ শিহরিত হয় মনে। আবেশে চোখ বুজে আসে। কিন্তু বউ হয়ে কোথায় এসে উঠবে প্রেমসী? এই বনে? এই নিকষ নৈমিষারণ্যে?

অপরাধিতা কয়েকদিন আগে গভীর অভিমানে একটা চিঠি লিখেছিল।

“আমাদের বিয়ের চিন্তা অত করোনা। তা ছাড়া আমিও ভেবে দেখলাম, চাকরিটা হারালে আর ফিরে পাবনা। তখন চলবে কি করে? তোমাকেও কোম্পানী যখন কলকাতায় বদলি করবেনা। সুতরাং যা হবার নয়। নাই বা হল বিয়ে। বিয়ের সাথ ধৈর্যেও পয়সা বড়। প্রেম আর উপোস পাশাপাশি চলেনা। তুমি বিয়ের চিন্তে করে শরীর পাত করোনা।”

এর কয়েকদিন পরেই আবার এল অপরাধিতার চিঠি। তাতে লিখেছে:

“তাই বলে মনে করোনা, আমি তোমাকে ভালবাসনা। আমার অপেক্ষার দাম কি দেবেনা?”

কবি জবাবে লিখেছিল—

“বউ”

আমি তোমার রাহ। তাই তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। আমরা উভয়েই চাকরি করি বটে, কিন্তু আমরা তবুও অভিশপ্ত। অর্থোপার্জন মত্রেও অর্থনৈতিক মুক্তি হল না। তাই অস্বস্তি করি, কোথাও উত্তম যোগাযোগ ঘটলে সুযোগ হারিয়ে না। বিয়ে করে ফেলবে।”

সে চিঠির জবাব আসেনি।

কবি ভাবতে লাগল। অপরাধিতার বয়েস হয়েছে আটাতের মত। প্রথম যখন দেখা তখন সে ছিল একুশ বছরের। চামড়ায় যে লাবণ্য ছিল, তা আর নেই। কালো রঙেও সে ছিল যেন নীলাভ। নীল পাখরের মত ছাতি ছিল চোখে। কিন্তু ক্রমেই সে হারিয়ে ফেলেছে, কাঁচা চামড়ার মাদকতা.....

অপরাধিতার চিন্তা আর বেশিদূর এগোলনা। একজন চৌকিদার লাঠি হাতে এগিয়ে এসে বললে—“হ্যাঁ বাবু, সব চলে গেল হাট থেকে। তুই যাবিনে।”

সত্যিই তো। অনেক রাত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সব নোট ও টাকা মনিব্যাংকে পুরে কোটের গোপন পকেটে রেখে দিল কবি। এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত সেফ্টি-পিন ঘেরে পকেট অল-বিস্তর সেলাই করে দিল। কোম্পানীর জিনিস কোম্পানীকে না-সমজানো পর্যন্ত ভারী হুশিয়ার।

অতঃপর লণ্ঠন হাতে করে ডাক বাংলোর দিকে রওনা হয়েছিল কবি। কিন্তু শেষে কি হল, তা আর মনে নেই।

কবি ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার।

ক্রমে বিকেল হল, সন্ধ্যা হল, রাত হল। তারা ফুটল আকাশে। দিনের রুদ্ধতা গেল মিলিয়ে। শালের বনে মর্ম্মরিত হল জ্যোৎস্নাসিক্ত বাতাস।

সন্ধ্যার ঋণিক আগে ডাক্তার এসেছিলেন, তখন রোগী ঘুমিয়েই ছিল। ডাক্তার নাড়ী টিপে অশুভব করেছিলেন, নাড়ীর স্পন্দন বড় দ্রুত। কিন্তু রোগী যখন ঘুমোচ্ছে, তখন ঘুমোক। ঘুমই সুস্থ করে তুলতে পারবে আর কোষের অস্বাভাবিকতাকে। ঘুমই মস্ত ঔষধ।

জেগে উঠলে আবার ঘাতে ঘুম হয়, সেজন্তে ঘুমের বড়ির ব্যবস্থা করে তিনি চলে গেলেন।

মফঃস্বল শহরের হাসপাতাল। একটু রাত হলেই নিরুন্ম হয়। একটু রাত হলেই আধাজীবন্ত রোগীগুলি ঝিমিয়ে যায়। অসময়ে প্রবেশাধিকার নিয়ে তেমন কড়াকড়িই বা আর কোথায়? আর হাসপাতালের আনাচ কানাচ আমি চিনি। গেটে সেই প্রকাণ্ড শালগাছ। অপারেশন-থিয়েটারের সামনে ঝাঁকড়া মাথা প্রাচীন নিম। লনের বুক চিরে লাল পথ। নার্সরা খটখট করে যখন ঐ পথ দিয়ে হাঁটে, তখন রোগীর রোগযন্ত্রণা বেড়ে যায়। অপারেশনে ঢুকবার আগে ডাক্তারদের হাসির যখন উচ্চরোল উঠে বারান্দায়, তখন বলির পাঁঠার মত রোগীর হাত-পা সঁধিয়ে যায়। পূঁষের গন্ধে যখন বাতাস গুমোট হয়ে উঠে, তখন ভিন্ন ওয়ার্ডের রোগিনীরা ফুলগন্ধী দিবাস্বপ্ন দেখে। দাইরা যখন কিসকিস করে কথা বলে, তখন গভিনীর উৎকর্ষা সহস্রগুণ বেড়ে যায়।

অথচ, হাসপাতালটির আনাচে কানাচে ফুল নেই। ঔষধ আর পূঁষের উগ্র গন্ধ দূর করতে হলে হাসপাতালের সর্বত্র যে-জিনিসটির অক্লপণ চাষ চাই, সেটিই এ-হাসপাতালে কারো মাথায় খেলেনা। রোগী-রোগিনীরা তাই সারাক্ষণ চোখের সামনে যে-ফুল দেখে, সে হল সর্ষে ফুল।

একটু রাত হয়েছে বৈকি। তবু দুখানি চিঠি এসে হোটেল পড়ে রয়েছে। একখানি কোম্পানীর রসমাধুর্ঘ্যহীন চিঠি। অপরখানি নীলরঙের মলাটে অর্ধাংশ খামে ঢাকা। চিঠি দুখানি দেবার জন্তে শাল গাছটার নিচ দিয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম। দুখানিই কবির চিঠি। হয়ত' জরুরী চিঠিও হতে পারে।

“জেনারেল ওয়ার্ডের বোল নম্বর বেডের রোগী কেমন আছে ?” মহুরগমনা একটি নার্সকে প্রশ্ন করলাম।

“আমি জানিনা। আমি অন্য ওয়ার্ডের” বলে নার্সটি পাশ কাটিয়ে গেল।

আর একটি নার্স এ পথ দিয়েই আসছিল। তাকে ডিগগেস করলাম, “জেনারেল ওয়ার্ডের বোল নম্বর বেডের রোগী কেমন আছে, বলতে পারেন ?”

“তিনি ঘুমিয়ে আছেন।”

ঘুমিয়ে আছেন, শুনে চকিতে একবার ভাবলাম, চিঠি দুখানি একেই দিয়ে যাই। কবি যদি রাতে জাগে, তবে দিয়ে দিতে পারবে। আর একবার ভাবলাম, নার্সের দায়িত্বে বিশ্বাস নেই। নানান কাকের কামেলায় ভুলেই যাবে চিঠির কথা। তার চাইতে বরং কাল একবার নিজেই এসে দিয়ে যাব।

নার্সের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, “ধন্যবাদ। আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না।”

লম্বা পা চালিয়ে গেটের সেই শাল গাছটার কাছাকাছি প্রায় বখন এসে পড়েছি, তখন পিঠের উপর কারো হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম।

খাড়া বাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, অলুপালু বেশে কবি। পরনে হাসপাতালের ডোরাকাটা পায়জামা। মুখে চাপ চাপ দাড়ি। কোটরাগত চোখ। গেটের সামনে অনুজ্জল যে-আলো জলছে, সেই আলোর স্নান ধারায় বিষয় দেখাচ্ছিল আগন্তকের মুখ।

“জানলা দিয়ে আপনাকে দেখে আমি বেড ছেড়ে উঠে এসেছি।” উত্তেজিত কণ্ঠে বললে কবি। “বিশেষ কোন প্রয়োজনেই এত রাতে আপনি এসেছিলেন।”

আমি মাথা নাড়লাম। ওর চিবুক নাড়া দিয়ে বললাম—“শুধু ছোটো চিঠি দিয়ে চলে যাব বলেই অসময়ে হাসপাতালে এসেছিলাম।”

“চিঠি ? দেখি, কোথায় চিঠি।”

কোম্পানীর খামের নিচে নীল খাম রেখে দুটি চিঠিই ওর সামনে ধরলাম।

হো মেরে চিঠি দুখানি ও হাতে নিল। বললে—“একটু দাঁড়ান, চট করে চোখ বুজিয়ে নিচ্ছি।” প্রথমেই সে তুলে ধরল নীল খামখানি। ওর চোখের উপর এক বলক আনন্দ শিহরিত হয়ে গেল মুহূর্তে। যেন এই চিঠির জন্তেই সে হাসপাতালের শয্যা ছেড়ে চুরি করে পালিয়েছে।

কিন্তু খোলার সময় দেখা গেল, কোম্পানীর খামখানিই প্রথমে ছিঁড়ছে। জীবনের বিবি যেন হার মানল জীবিকার টেকার কাছে। এই মুহূর্তে আর একবার।

কোম্পানীর চিঠি পড়তে পড়তে হাত মুণ্ডিবদ্ধ হয়ে এসে কবির। ঠোঁটের উপর দাঁতের দংশন শুরু হল। কয়েকটি কথার ফুল নয় যেন হল এসেছে কোম্পানীর কাছ থেকে।

“শালারা পাগল করে মারল।”

“কি হয়েছে ?” ডিগগেস করলাম।

“আর বলবেন না।” কিন্তু, কথা বলতে বলতে সহসা উদ্মনা হয়ে গেল কবি।
কিষ্টের মত কোমরে হাত দিল। সেখান থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে এনে বুক পকেটে হাত
রাখল। বুক পকেটেও নেই। তবে কোথায় গেল টাকা তার খলি? নিমিষে মুখখানি তার
বিস্তৃত হয়ে গেল। একখানি মড়ার মত মুখ।

পরমুহুর্তে সে ছুটল জেনারেল-ওয়ার্ডের দিকে। ছুটতে ছুটতে সে বললে—“দাঁড়ান,
যাবেন না যেন।”

নিমেষে মিলিয়ে গেল দ্রুত ধাবমান কবির ছায়া। হাসপাতালের অস্পষ্ট আলোর দেখা
গেল কবি জেনারেল ওয়ার্ডে চুকে পড়েছে।

উদ্ভেকনাময় বেশ কয়েকটি মিনিট। জায়গা ছেড়ে নড়ব কি-না, ভাবছিলাম। এমন
সময় দেখি কবি ফিরে আসছে। পিছনে পিছনে আসছে নাস।

কবি ঘুরে দাঁড়িয়ে নাসকে বলল—“দোহাই আপনাদের। জালাতন করবেন না।
আমি এখুনি আসছি।” নাস আর এগোলনা। কিন্তু রোগীর দিকে লক্ষ্য রেখে জেনারেল-
ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল।

কবি ফিরে এসে বললে—“পেরেছি। বালিশের তলায় আমার সার্ট রেখে এসেছিলাম।
তাতে কিছু টাকা ছিল কোম্পানীর। ভেবেছিলাম, টাকা হয়ত’ চুরি গেছে। চুরি সৈলে
কী সর্বনাশই না হত।”

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন খানিক বুঝলাম। কিন্তু কথা বললাম না।

ঈশ্বর স্বস্তিতে এবার নীল খাম খুলল কবি। বেশি নয়, মেয়েলী হাতে লেখা কয়েকটি
ছত্র। পড়তে সময় গেলনা তেমন। যদিও পড়তে পড়তে ক্যাকাসে হল কবির চোখ।

চিঠি পড়া শেষ করে কবি বললে—আপনাকে ধন্যবাদ দিই দাদা। এত কষ্ট করে
এমন অসময়ে চিঠি দুটো আপনি নিয়ে এসেছিলেন।”

“হয়ত’ জরুরী চিঠি হতে পারে ভেবেই না অসময়ে এসেছি। কিন্তু, এখন আমি যাই।
রাত অনেক হল।” এই বলে শাল গাছের নিচে কবিকে ছেড়ে দিলাম। উভয়েই বিপরীত
দিকে খানিকটা এগিয়েছিলাম। এমন সময় শুনি আবার ডাক।

“একটু শুকুন ভাই।”

পেছন করে আবার শাল গাছের নিচে এলাম। কবিও তখন গাছের নিচে এসে
বসেছে।

আমতা আমতা করে ও বললে—“বড় দুর্ভাবনায় পড়েছি। চিঠিটা পড়ে গোলমাল
বৈধে গিয়েছে। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি নে।”

“কিসের দুর্ভাবনা?” প্রশ্ন করলাম।

“ধলবার জন্তেই তো আপনাকে ডেকেছি, কিন্তু আগে কথা দিন, আমাকে পাগল
ভাববেন না, কিংবা বখাটেও ভাববেন না।”

“কথা দিলাম।”

“আচ্ছা বলুন তো, চাকরি বড়, না বিয়ে বড় ?”

“আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“কিছু না বুঝেই বলুন না, চাকরি না প্রেম, কোনটা বড় ?”

“সম্ভবত কোনটাই বড় নয়,” আমি উত্তর দিলাম।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে কবি বললে—“বিষম সমস্তায় পড়েছি নীল খামখানা পেয়ে। ওতে অপরাধিতা বলে একটি মেয়ে আমাকে জানিয়েছে যে, বাজার মন্দা বলে তার সেলুম-গার্লের চাকরিটা হঠাৎ কোম্পানী কেটে দিয়েছে। অপরাধিতা আমার কাছে এখন চলে আসতে চায়। আমার টেলিগ্রামের অপেক্ষা করে আছে সে। কিন্তু আমি তাকে এনে কোথায় রাখি ? থাকি হোটেলে। আর এখন তো হাসপাতালেই। তাছাড়া বিয়েও তো হয়নি আমাদের এখনো। আমি কি করি বলুন তো ?”

“এখন কোনমতেই ওর আসা চলেনা।” উত্তর দিলাম।

“ঠিক বলেছেন। আমিও তাই ভাবছিলাম। কালই টেলিগ্রামে জানিয়ে দেব যে, আসা কোনমতেই চলবেনা।” বলল কবি।

এর পরের দিন হাসপাতালে আমার যাওয়া সম্ভব হল না। নিজের কাজের তাড়ায় যেখানে স্রোতের শ্রাওলা হয়ে ঘাটে ঘাটে ভাসছি, সেখানে ছুঁদগের অবসর কোথায় ? তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে-আমাকে আর এক শহরে চলে যেতে হবে। সুতরাং, কাজের তাড়ায় আর সময় করে উঠতে পারলাম না।

তার পরের দিন, অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের বিকেলে। নিজের কাজে একটু বিরতি দিয়ে বিকেলে রওনা হলাম হাসপাতালের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে এসাম সেই শাল গাছের নিচে। ভাবছিলাম কবির কথা। এ-যাত্রা হয়ত’ হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়িই খাসাস পাবে কবি। কিন্তু যে-রক্তাক্ততা রোগ হিসেবে কবিকে আক্রমণ করেছে, তার থেকে সুস্থ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সময়ে ঔষধ না-পড়লে মজানদীর মতন একদিন ছেলেটি শুকিয়ে যাবে। অথচ, তাকে সুস্থ করে তোলার কোন ব্যবস্থাই তো নেই।

কোনদিন দেখিনি, তবু শুনেছি তিনি আছেন। কল্পনায় ভেসে উঠল কলকাতার কোন এক গলিতে কবির মায়ের প্রতিবিম্ব। চেহারা তার দেখিনি। তবু পরিচিত হাজার মায়ের চেহারা মনে করে তাঁর চেহারা যেন খুঁজে পেলাম। সারস পাখীর মতন করুণ চোখ। পাহাড়ীয়া সরোবরের মত নির্জনতা এবং নিঃসংগতা সে-চোখে। তাঁর যে-গয়নাগুলো বেচে কোম্পানীর ঘেনা শোধ করেছে কবি, সে শূন্যস্থান আর পূর্ণ হয়নি। যেন তাড়া দেয়াল ঠেস দিয়ে তিনি অবুকের মত আবহমান কাল ধরে বসে আছেন। ছেলের জন্ত কিছুই করার তাঁর ক্ষমতা নেই। তাঁর হাত একেবারে শূন্য। তিনি মধ্য বিংশ-শতাব্দীর নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মা। মায়ের গয়না-বেচার কথা কবিই আমাকে বলেছিল।

“মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলাম। এই যে আপনি।”

হঠাৎ কল্লনার দড়ি ছিঁড়ে গেল। চেয়ে দেখি সেই নামটি, প্রথম দিন যার হাতে কবির জন্মে ফুলের তোড়া দিয়ে বলেছিলাম, রোগীকে যেন আশ্বীয়ের মতন দেখাওনা করা হয়।

“কেমন আছে আপনার রোগিটি?” প্রশ্ন করলাম ঔৎসুক্যে।

সে যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে বলল—“আমিওতো আপনাকে এ প্রশ্নই করব বলে ভেবেছিলাম।”

“তার মানে?”

“আজ সকাল থেকে তিনি আর হাসপাতালে নেই।”

“আপনারা বুঝি ডিস্চার্জ করে দিয়েছেন?”

“না, না, ডিস্চার্জ করা হয়নি। আজ সকাল থেকে তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছেনা।”

“বলেন কি?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

“সত্যি বলছি, তাঁকে খুঁজেই আমরা পেলামনা।”

“কিন্তু আমরা তো একই হোটেলে থাকি। হোটেলে তো ও ফিরে যাবনি।

“কী আশ্চর্য, তবে কোথায় গেলেন? ডাক্তাররা বলছিলেন, ব্লাডপ্রেসারের গোলমাল রয়েছে ওঁর।”

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বাঙালী নাম বলে এই বিদেশে বাঙালী রোগীর জন্মে সেই কেবল দরদ পোষণ করছে। অন্য নাম সম্ভবত এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মনে করছেন। নামটি বললে—“তিনশ’ টাকার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার তিনি তাঁর মার কাছে কাস পাঠিয়েছেন। হাসপাতালের পিওন ঐ মনিঅর্ডার কাল করে এসেছে।”

“আর কোন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে কোথাও?”

“যতদূর জানি, তেমন কিছু পাঠাননি।”

“আপনার সংগে অন্য কিছু আলাপ হয়েছে ওর?”

“না, শুধু মার কাছে মনিঅর্ডারের কথাই বলেছিলেন। - এবং টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম।” নামটি বললে।

“তবে আমি বাই।” নামের চোখে চোখ রেখে বললাম।

“রোগীর খবর পেলে আমাকে জানাবেন। বাপরে, হাসপাতালে শুয়ে থাকতে ওঁর মৃত্যু হয়।” নামটি বললে।

সেখান থেকে বেরোলাম। ছাড়িয়ে এলাম গেটের দীর্ঘকায় শালগাছটি। সন্ধ্যার আর দেয়ী নেই। আবার ফুটতে শুরু করেছে বিলম্বিত তারা আকাশে।

চলতে চলতে ভাবলাম, কোথায় খুঁজব কবিকে? ওর দেশলাইয়ের যে অফিস আছে এই শহরে, তা আমি চিনি। কিন্তু সেখানে যাওয়াও এক মুশকিলের ব্যাপার। টাকা পয়সার গোলমাল থাকতেও তো পারে। আর হোটেলে তো সে যাবনি। হোটেলেও ওর দেনা আছে।

পথে পথে নয়, সেদিন প্রায় সারারাত মনে মনেই খুঁজলাম ছেসেটিকে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন রাত আসে, যখন কোন নিরুদ্দেশের উৎস ধরে আকাশপাতাল ভাবনা শুরু হয়। ছেসেটি তাহলে মায়ের ঋণ শোধ করেছে। যা কি আবার গয়না কিনবেন? এক সংগে অত টাকা তো কোনদিন ছেলে পাঠায়নি। মার কি তবে মনে সন্দেহ জাগবেনা?

পরদিন সকালের ডাকে চিঠি পেলাম। চিঠি আমাকেই লেখা হয়েছে। চিঠি লিখেছে কবি।

‘শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটাই বড় হল। চাকরি আর প্রেম, দুটোকেই ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি। কোম্পানী আমার নামে হয়ত’ ওয়ারেন্ট বের করবে। কারণ, কোম্পানীর টাকা আমি ফিরিয়ে দিইনি।

অপরাজিতাকে টেলিগ্রাম করা হলনা। সমাজের যে কাঠামোর ভেতরে আমি বাস করছি, তার ভেতর প্রেম সুস্থ হতে পারেনা। অন্তত আমার মত বিড়ম্বিত সেলুম্যানের জীবনে প্রেম কেবলই বিকৃত।

তাই বলে আমি যেমন চোর নই, তেমনি নৈরাশ্রবাদী নই।

মায়ের গয়নার ঋণ শোধ করলাম, এবং কোম্পানীকেই চাকরি প্রত্যর্পণ করলাম। আপাতত, আমি মধ্যভারতের দিকে ভাগ্যান্বেষণে চলে যাচ্ছি, ইতি।

চিঠি পাওয়ার পরদিনই কলকাতায় আমি চলে আসি।

তারপর কতদিন যে চলে গেছে। কিন্তু কবিকে আর দেখিনি। ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে, কোথায় যেন সে হারিয়ে গেছে। বহুদিনের স্মৃতিত প্রেমকে রাতারাতি বিকৃত প্রেম আখ্যা দিয়ে কোথায় সে সরে পড়েছে।

আর অপরাজিতা? হারিসন রোডে কিংবা বড়বাজারে মাঝেমাঝে যখন কোন সেলুম-গালকে দেখি, তখন মনে হয়, একবার নাম জিজ্ঞাসা করি। ‘চাই তরল আলতা’র চাকরিটা গেলেও অন্য কোন চাকরি নিশ্চয়ই এতদিনে মিলেছে। সম্ভবত কবি তার সংগে গোপনে আগের মতই যোগাযোগ রেখে চলেছে। সুদূর কর্ণাটক কিংবা মালাবার উপকূল থেকে চিঠি লিখেছে এখনো।^১ এখনো বিয়ের আশা ছাড়েনি।

আবার কল্পনা করি, অপরাজিতার বিয়ে হয়েছে অন্য কারো সংগে। বর্ধমান অনন্ত বিশ্বের কণাংশের কণা একটি মেয়ের প্রেমের কি মূল্য সৌরভগতের কাছে? প্রেম কেবলই উদ্ভাদনা, তার বেশি নয়। বিয়ে করে সে স্বস্তি পেয়েছে। সুখী ততটা নাই বা হোক।

আর অপরাজিতার বিয়ে যদি না হয়। নাই বা হল। মধ্যবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের ধরে ধরে হাজার হাজার অবিবাহিতা মেয়ে আছে। অপরাজিতা তারই একজন। ছাত্রাঙ্গান, স্ট্রাংস্ট্রেতে কোন বিবর্ণ গলির জানাসা দিয়ে সে আজ ছপুয়ে চোখ পেতে বসে বসে ভাবছে, মেয়ে হয়ে কতটুকু কী করতে পারলে তার মতন হাজার হাজার মেয়ের সত্যিকারের অর্থনৈতিক মুক্তি হয়।

এক বছরের কবিতা

গত বছর এই অগ্রণীর কবিতার সমালোচনা করেছিলাম। এবারও সেই ভার পড়েছে। কিন্তু এবারকার ভারটি দুর্বল না হ'লেও, অসুবিধের। কারণ গত বছর যে-কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম, এবারও তাঁদেরই কবিতা দেখছি অগ্রণীতে। ইতিমধ্যে তাঁদের সম্বন্ধে আমার মতের যে-খুব পরিবর্তন ঘটেছে, এমন মনে করতে পারছি। তাছাড়া, সেই একই অসুবিধে; অনেকেই একটি কি দুটি কবিতা মাত্র সারা বছরের অগ্রণীতে লিখেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত গ'ড়ে উঠাও মুশ্কিল।

একটি স্থানে মাত্র আমার কিছু সুযোগ আছে; আলোচনার ধারাটি পৃথক পৃথক কবিতার উপরই নির্ভর করানো। কিন্তু তাতে কবিদের সম্বন্ধে সুবিচার করা হয় ব'লে মনে করতে পারিনি। কাজেই এবারের আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত ক'রে প্রকাশ করাই যাক।

তার আগে একটা কথা বলে নিই। কবিতা-লেখা সাহিত্য-কর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব'লে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। অথচ কবিতার ও কবির সংখ্যার দিকে তাকালে সে-কথা প্রমাণ হয়না। তবু আমাদের দেশে কবিতার বই তেমন বিক্রী হয় না। এর জন্যে দরকার পড়ে 'কবিতা পড়ো আন্দোলনে'র, দরকার পড়ে বিশেষ-বিশেষ ব্যবসায়িক মুহূর্তে কবিদের পুরস্কৃত ক'রে সরবে ঘোষণা করা। দুটিই যে কৃত্রিম দিক সে-বিষয়ে আমার অন্তত সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এমন করতে হয়? পাঠকের সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়, অথচ কবিতা-পাঠকের সংখ্যা এত নগণ্য কেন?

এর অনেক কারণ আছে। কিন্তু প্রধান কারণটি আমার মনে হয়, কবিতা-পাঠে আগ্রহ জন্মানো বিশেষ হয় না। কেবল আমাদের দেশের সমস্ত এ নয়, অন্ত দেশেও। পড়া আমরা শিখি অনেকটা ইস্কুল কলেজের মাধ্যমে। ক্রটি-টা সেখানেই আছে। কিন্তু ক্রটি কেবল পড়ানোর দোষেই নেই, কবিদের ক্রটিও আছে। যে-সময়ে ছন্দের দিকে ছেলেমেয়েদের মন স্বভাবতই সাজা দেয়, তার ঠিক পরমুহূর্ত থেকেই বয়সোপযোগী ভালো কবিতার সংখ্যা প্রায় তারা পায়ই না। ইস্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কলনিতারা এ বিষয়ে এমন বিপদে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা নির্বিচারে সঙ্কলন করতে বাধ্য হন।

কবি খ্যাতির জন্য বয়স্কদের দ্বারস্থ হ'ন বিশেষ ক'রে। কিন্তু সেই বয়স্ক ব্যক্তি যে হঠাৎ গজায় না, সে দিকটি নজর দেন না। তাই মনে হয়, কবি যদি বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কবিতা লিখতেন তবে তাঁদের বৈষয়িক দিকও যেমন উন্নত হ'ত দেশের উপকারও তেমনি হ'ত। এ কাজটি হয়ত কঠিন, হয়ত সহজ হয়ে দৈনিক পত্রিকার শিঙ-পত্রের কবিতার রূপ

নিয়ে বসবে। এমন রূপান্তরও আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু ‘অগ্রণী’ যদি এক-একটি সংখ্যায় এক-এক বয়সের কবিতা লিখবার উৎসাহ সৃষ্টি করেন—তবে পাঠকদের মনে খুব বেশি আপত্তি উঠবে ব’লে আমার মনে হয়না।

‘ধান ভানতে শিবের গীত’ ক’রে নিতে হ’ল যে-কারণে ধান ভানবার সময় শিবের গীত সহজভাবে আসে—সেই কারণেই।

এবারে কিছু দে অগ্রণীতে অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে দুইটি স্বাধীন কবিতা, তিনটি অনুবাদ। এই পাঁচটি কবিতার মধ্যে রাগমালা কবিতাটি উত্তম। কবিতাটিতে বৈচিত্র্য আছে। প্রথম স্তবকে ক্রিয়াপদ একেবারে নেই। তারপর থেকে ক্রিয়াপদ একটু একটু ক’রে বাড়তে থাকে। প্রকোভের প্রথম যে-যুক্তি-তর্ক সমন্বিত চিন্তাধারা থাকে তা কিছুক্ষণ পর অস্তহিত হয়ে যায় প্রকোভের প্রবাহে। এই প্রবাহ-ও অসমান, স্তবকের কথাগুলিও তেমনি অসমান হ’য়ে চলেছে। বাইরের রূপ আর ভেতরের রূপ সুসম। মনের সহজদিকের সঙ্গে মিল রয়েছে কবিতার প্রতীকতায়; এমনটি লাগুন কবিতায় পাওয়া গেলনা। ‘লাগুন’ রবীন্দ্রনাথের ‘আফ্রিকা’ নয়। হ’লে ভালো হ’ত। অপরিচিত বিষয় বস্তুর সঙ্গে পাঠকের চিত্তকে পরিচিত করাতে হ’লে একটু বেশি বলতে হয়ই। মানসিক চিন্তাস্তরের বৈজ্ঞানিক দিকও সেই কথা বলে। একথা না-মানলে কবি নির্জন কবি বা নির্জনতম কবি ব’নে যান। কাব্যের প্রতীকতা আর প্রতিক্রমে অভিনবত্ব এবং কবির ঋষি-দৃষ্টি থাকুক আপত্তি নেই, কিন্তু বিষয়বস্তুকে যদি বিশেষ ক’রে চেনানো না-যায় তবে-তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনা। আবার তাঁর ‘নষ্ট নেতা’-তে স্বাধীন-অনুবাদ ঘটলেও, দেশের চিন্তারীতি-কে অনুসরণ করলেও, ভাব হৃদয়-গ্রাহ্য হয়ে উঠলনা। এখানে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও, ভাব-সৃষ্টিতে কোথায় যেন ব্যাঘাত ঘটেছে। ‘নষ্ট নেতা’র নামকরণ থেকেই আমার আপত্তি। ‘নষ্ট’ কথাটি ব্যাকরণ-সম্মত হ’লেও কেমন যেন এই প্রসঙ্গে যেমানান লাগল। ‘নষ্ট-নীড়’ ‘নষ্ট মেয়ে’ আমাদের পরিচিত, কিন্তু নষ্ট নেতা-কে মানতে পারছি না; কারণ বোধ হয়, স্থিতি এবং হওয়ার সঙ্গে ‘নষ্ট’ মেলে চলা এবং চালনার সঙ্গে নয়।

এর পরই আলোচনা করতে হয় আর্থকতা সোপায়ুজার কবিতা। ইনি অগ্রণীতে পাঁচটি কবিতা লিখেছেন। এর কবিতা ক’টির চলন সাধারণত ৮-১০ বা ১০-৮ মাত্রার। মাঝ মাসের ‘শুধু’ কবিতাটির চাল পৃথক। কিন্তু সবায়ের মধ্যে একটা ছোট্ট বস্তুর পরিধি আঁকা। পর্ব থেকে পর্বে উৎসারণ নেই। কিন্তু লঘু চাল হ’লেও কবিতাগুলি হালকা নয়। মনের ভাবনাটি ধিতিয়ে ধিতিয়ে বসতে চায় যেন। পাঠকের মন নিয়ে বসতে হলে বলব, ‘সে মেয়ে কোথাও নেই’ কবিতাটিই সেদিক দিয়ে উৎরে গেছে। এই কবিতা আর ‘সে’ প্রায় একই সুরের, অথচ ‘সে’ থেকে ‘সে মেয়ে কোথাও নেই’ যেন সাড়া বেশি আনে। একটা কথা কি, বৃষ্টি যদি মনের উপর প্রভাব আনতেই চায়, তবে বাংলা দেশে আষাঢ় শ্রাবণের অবিরল ধারাপাত-ই প্রভাব আনতে পারে; মাঘের শেষের বর্ষণ পুণ্য দেশে ঘটলেও মনে তার স্থান

খুব কম। ছন্দের বেলাতেও তাই, মনের আবেগ-প্রোতকে ত্রেক ক'সে কসেই চলুন আর কে-ভাবেনই চলন, হৃদয়ের বেগে অব্যাহত ভাবটি থাকে ; তাকে মানিয়ে চলতে হলে ছন্দের পর্বে-পর্বে, পদে-পদে প্রবাহ থাকতে হয় ; শুধু প্রধান তারে আঘাত করলেই চলবেনা, অক্ষর ভুলতে সক্ষম কিনা তা দেখতে হবে। 'সে মেয়ে কোথাও নেই' কবিতাটির মধ্যে সেই ধর্মটি অক্ষুণ্ণ আছে। তবে ৭ম পংক্তিতে 'স্নিগ্ধতার' শব্দটি কেন যেন তেমন ভালো লাগল না। এর পরই তাঁর 'শুধু' কবিতাটি মর্যাদা পায় ; তবে এখানেও ৪র্থ পংক্তির 'বিনে' কথাটি বেধামা। এই কবিতার যে-আকর্ষণ তাকে অমুসরণ ক'রে কবির মনের কাছে বেশ পৌঁছানো যায়।

সংখ্যার দিক দিয়ে অগ্রণীর তৃতীয় কবি 'শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়'। ৪টি কবিতা তিনি এ-বছরে লিখেছেন। সাধারণত তাঁর শব্দচয়ন ঘটে অতঃসম শব্দরাজ্য থেকে ; কিন্তু 'মধ্যবিস্ত' কবিতায় তিনি তৎসম শব্দের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। কেন এমন ঘটল সে-কথা আমার বলবার কথা নয় ; তবে একথা বেশ মনে হচ্ছে ৪টি কবিতার মধ্যে 'মধ্যবিস্ত' কবিতাটিই কিছু অস্পষ্ট। অন্য কবিতাগুলিতে সহজ-প্রকাশ ঘটেছে ; ঐ 'মধ্যবিস্ত' কবিতাটিরই শেষের স্তবক বেশ স্পষ্ট। মনে হয়, তৎসম শব্দ যখন আমরা ব্যবহার করি তখন শব্দের ব্যঞ্জনা আর প্রতীকতার দিকে বোধ হয় অতি সচেতন হয়ে পড়ি ; মধ্যবিস্তের 'বনের মর্মর নাকি স্নিগ্ধই সত্য' পংক্তিতে কোথায় যেন ছন্দের ধ্বনিতে বাধা ঘটে গেল ; 'সত্য' কথাটি বোধ হয় এর জন্য দায়ী। 'অজন্মা' পয়ারের খাঁটি চালে চলেছে ; তবে পয়ারের সে-সুর নেই ; সুর চাই-ও না। শংকরানন্দের 'বাঁচার কথা' কবিতাটিই ভালো লাগল। 'বাঁচার কথা'-র 'বড় বারোমাস' যেমন স্পষ্ট, তেমনি 'উছুন দীপের স্নিগ্ধতা' শব্দটিতে কেউ সন্দেহ দেবেন কিনা জানিনা। ছন্দের দিক দিয়ে পূর্ণতা ঘটেছে 'আলোহাওয়ার গানে।' শেষের ষণ্ডপর্বের (তাইত, নাইত-প্রকৃতি) বেশ এক মাধুর্য আছে ; আবার প্রথম স্তবকের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তবক সুবিস্তৃত আর সুস্বম।

তরুণ সান্তাল এবং জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ে তিনটি করে কবিতা লিখেছেন। হৃদ্যতের শিল্পী আছেন ; একজন রঙে-রঙে ছবিকে তরাট করেন, অন্যজন রেখার রেখার ছবির রূপ দেন। তরুণ সান্তালের মধ্যে প্রথম-ধরনের শিল্পী-মনোভাব আছে। ইনি শব্দ দিয়ে কবিতাকে তরাট করেন ; তাই ব'লে অতি-কথনের দোষ নেই। তা ছাড়াও, শব্দচয়ন থাকলেও তরুণ সান্তাল শব্দসর্বস্ব নন। যা বলছেন তার অতীত তাঁর কবি-মনটি। কবি যেন এক বিশেষ স্থানে ব'লে তাঁর দর্শনের ছবিটি এঁকে যাচ্ছেন, পাঠককে তিনি আকৃষ্ট হরষ করেন না, কিন্তু পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ঘনিয়ে যায় কবির মনোবৃত্তি অনুসারী হওয়ার জন্য। তরুণ সান্তাল 'তরুণ' কিনা জানিনা, তবে তরুণ-কবিদের মধ্যে তাঁর কাব্যে সার্থকতার চিহ্ন ফুটে উঠছে। কিন্তু ধ্যানী হওয়ার বিপদও যে নেই তা নয় ; তাঁর 'দীক্ষিতের কথা'র প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তি দুইটিতে বাক্য-গঠনের ত্রুটি ধরা পড়েছে। 'একটি মঙ্গলাচরণ' বিচিত্র চালে চলেছে। প্রত্যেক পংক্তির শেষে ষণ্ডপর্বের মতো বিশেষ মাত্রাগমটি ধরা পড়েছে ; এগুলোর

ধর্ম এই, প্রথম দিকের প্রবাহকে হঠাৎ একটু বৈকিয়ে দেয়, একটু মোড় ঘুরতে বলে—অথচ বিপথ নয়, কেমন যেন একটা ‘ভেবে নেওয়ার কোঁক’ বর্তমান। ছন্দোবিভাগে এ ব্যাপারটি ধরা পড়ে না বলে ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে পারছি নে, তবে বলা যায়, গানের বিষয়-ভাস্কর চলনের মতো—আগেকার দিনে হৃদয়-দীর্ঘ মাত্রায় ছন্দ রচনা করা হত ; ছন্দের দিক দিয়ে সেইটিই ছিল মাপকাঠি ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ছন্দে বিশেষ রকমের চলন লক্ষ্য হৈত কেন ? বর্ণবৃষ্টি ছন্দের অমন ব্যাকরণের নিয়ম কেন ; নিয়ম কেন এই ছন্দে এই ক’টি হৃদয় স্বর, এই ক’টি দীর্ঘস্বর দিতে হবে। কারণ বোধ হয় ছন্দের সঙ্গে বাস্তবের যে-সর সম্বন্ধ সেই সঙ্গকে মূর্ত ক’রে তোলা ধনি আর উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। তরুণ সাক্ষাৎ সেই ব্যাকরণ মানেননি, কিন্তু শব্দের চলনকে এমন ভাবে পায়ে-পায়ে জুড়েছেন যে সেই সুর-বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে, বিশেষ করে পংক্তিগুলির শেষের দিকে। জ্যোতিষ্মত গঙ্গোপাধ্যায় কবিতায় সহজ বলনের ভূমিকা আনতে চেয়েছেন ; গানের ভঙ্গিমায় বাক্যগুলি গঠিত। সহজ কিন্তু কবিতার সে-আবেদন নেই। তিনটি কবিতার মধ্যে তোমার সংবাদটি সংবাদকে ছাড়িয়ে একটু মনের বিশেষ ক্ষণের আভাস দিতে চেয়েছিল। মনে হয়, কবি ভাবের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারেননি। তাঁর কবিতা পড়বা-মাত্রই কেন যেন ফুরিয়ে যায়।

এঁদের পর ছোটো ক’রে কবিতা লিখেছেন, চিত্ত ঘোষ, বিমল ভৌমিক, উৎপল, বসু, শম্ভু ঘোষ, বীরেন্দ্র গুপ্ত, রাম বসু, শিবশঙ্কু পাল, সত্যব্রত ঘোষ, মোহিত চট্টো, অজিত মুখো, গৌর পাল প্রভৃতি এবং একটি ক’রে কবিতা লিখেছেন—চিত্ত দাস, আলোক সরকার, সত্যেন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণ ধর, মানস রায় চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাসগুপ্ত, তুষার চট্টোপাধ্যায়, সুভদ্রা জামাল, দীপংকর দাশগুপ্ত, মহিমরঞ্জন, গোবিন্দ মুখো, সলিল গঙ্গোপাধ্যায়; সুধীর সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য অরুণ গুপ্ত প্রভৃতি কবি।

এদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। নতুন কবিদের প্রতিও আমাদের অক্ষুণ্ণ আশা থাক’ল। দুই একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশংসার আতিশয্যে বা ক্রটি দেখানোর অবিবেকী সমালোচনা আর করতে চাইনে।

অনেক কবিতার মধ্যেই দেখলাম কবিরা বেশ আত্মমুগ্ধী কিন্তু কবির আপন দিকের ভাবনা যে কি তা কিন্তু বোধগম্য হ’ল না। কবিতার মধ্যে কবির বিশেষ পর্যবেক্ষণ শক্তি কথার মধ্য দিয়ে রূপ নেয়—পাঠক সেই অপূর্ব সুন্দরকে দেখে নিজের দেখবার ক্ষমতাকে উপলব্ধি ক’রে যেমন বিম্বিত হ’ন তেমনি কবির সর্বজনীন অমুভূতি পাঠকের সুপ্ত অমুভূতির তন্ত্রীতে আঘাত করবে তা-ও পাঠকের কাম্য। কবিতার মধ্যে এই ছুটিও চাই। নতুন কবির নিত্যন্ত স্বার্থ-কে নিয়ে পাঠকের কোন লাভ নেই। এই জন্যই কবিকে দার্শনিক হতে হয় ; তাঁর একটা নিজস্ব চিন্তাধারা থাকা উচিত—সেই চিন্তাধারাকে ধুঁজবার জন্য পাঠক সেই লেখকের কবিতা পড়তে আগ্রহী হয়ে পড়বে। সেই চিন্তাধারার বিশেষত্ব এক ঝলকেই পাঠককে আকৃষ্ট করবে। নতুন কবি যত সুন্দর শব্দ চয়নই করুন না কেন, ছবিই ফুটিয়ে

ভুলুন তা অনেকটা উদ্ভট কবিতার মতো হয়ে পড়বে। অগ্রণীর কোন কোন কবির মধ্যে এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে একটু বিমর্ষ হলাম।

উপসংহারে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে একটা কথা অগ্রণীর কবিদের কাছে জানাই—টুকরো টুকরো চিন্তাধারা নিয়ে এবং বিচ্ছিন্ন কবিতা নিয়ে কোন কবির সম্বন্ধে আলোচনা করা সুস্থতা নয়, কারণ এ অবস্থায় কবির মনোবাজ্যের চিন্তার উদয় আর অন্তকে ভেদন জানা যায় না; কবির বক্তব্য কোন বিশেষ শব্দের উপর তা ধরা যায় না; কোন শব্দের সঙ্গে কবির কিরকম আশ্রিততা এবং সেই শব্দের উপর কেনবা তাঁর আকর্ষণ তার ব্যাখ্যা ক'রে ওঠা যায় না। তবু প্রতি বছর অগ্রণীর সম্পাদক কবিতার হিসাব নিকাশের ক্ষণ্ট এই যে ব্যবস্থা করেছেন—তার প্রয়োজন কবি পাঠকের কাছে সমভাবে। ব্যক্তিগত ভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে হয়ত আমি ভুল করেছি, হয়ত কবি এবং অজ্ঞাত পাঠক আমার কথা মেনে নেবেন না—তবু আলোচনা করতে করতে আমরা কবিকে আর একটু বিশেষ ক'রে পড়তে শুরু করব এ কথা তো মিথ্যা নয়। কাজেই বর্তমান সমালোচনার অবতারণা করতে গিয়ে আমি ধ'রে নিয়েছি আমার পড়ার ভঙ্গি এবং আমার মনোভাবই প্রকাশ করব, এবং ভুল যদি কিছু করে থাকি তবে অন্তের সঙ্গে আলোচনায় তার সংশোধন করবার সুযোগ পাব।

সুধীরচন্দ্র রায়

সংগীতের আসর

বৈদ্যনাথ ঘোষ

সাহিত্যসঙ্গীতকলা বিহীনঃ। সাক্ষ্য-পশুঃ পৃচ্ছবিষাণ হীনঃ। বড় কড়া কথা। এ কথা কি খাটে এ-যুগের পরিবেশে? আজ মানুষের কাছে প্রয়োজনের তাগিদ সর্বপ্রধান। অপ্রয়োজনের ফাল্গু অবসর এ-যুগে শুধু আগামী প্রয়োজনপূরণের প্রস্তুতি মাত্র! ফুলের বাহার দেখতে গোলাপফুলের বাগান করে যে লোক, সে তো বিপথগামী! সর্ষে ফুল দেখাতে পারলে, তৈলাঙ্ক হ'তে পারতো, তৈলাদানেরও প্রয়োজন মিটতো। এ যুগে গোলাপের চাষ তাকেই মানায়, যে কুঁড়িতেই বাগান উজাড় ক'রে বাজার সাজায়। সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাবিহীনঃ লোকেরাও আজকাল নিজেদের—পৃচ্ছবিষাণহীনঃ পশু ব'লে মেনে নিতে রাজি নন বরং তেড়ে আসতে রাজি আছেন। অতি-উৎসাহিরা ব'লে থাকেন ও কথায় ফিউডলী গন্ধ আছে, ওটা সেকেন্সে কথা। সাহিত্য-সংগীত-কলাযুক্ত হওয়ার চেয়েও এ যুগের মাপকাটি স্বর্গমানযুক্ত হওয়া অনেক ভাল; তবে যদি সাহিত্য-সংগীত-কলা বাজারে চালু করার সুযোগ থাকে তো আপত্তি নেই, বরং কি ক'রে সহজে, সস্তায়, প্রচুর বাজার চালু কলাবিচার প্রয়োজন মেটাতে পারো, তার নানা বৈজ্ঞানিক পন্থা বাতলে দেবো।

এ যুগে সংগীত-কলাযুক্ত হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার! অতীতে কলা-রসিকের পক্ষে-ও যে সাধনা ও অনুশীলনের পথ নির্ধারিত ছিল তা কোনঅংশে কলাবিদদের চেয়ে সহজ নয় বরং কঠোর। কলাবিদের সৃষ্টির প্রেরণা সে-পথের পাথেয় জোগায়, কিন্তু রসিকের সে পথ-যাত্রার থাকে বিচারকের গুরুদায়িত্ব! তাই তো রসিক হওয়া ও রসিক পাওয়া অমূল্য বস্তু। তাই তো অরসিককে রস-নিবেদনে কবি, বা কলাকারের আপত্তি চিরন্তন সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, সাহিত্যে না হয় রসিক চাই-ই, কারণ ভাষাজ্ঞান, অলঙ্কার-জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশীল মন এ সবই অনুশীলনসাপেক্ষ, সহজাত নয়, কিন্তু সংগীত তো সহজ সার্বজনীন ধ্বনি-বিস্তার; সহজাত ভাবাবেগ যথা,—হৃৎকের আকুলতা, স্নেহের ব্যাকুলতা, ভক্তির তন্ময়তা, প্রেমের ভাবানুতা, বিরহের করুণতা, আনন্দের চঞ্চলতা, ইত্যাদি সবই ভাষার বাহিরে ধ্বনির বিচিত্র স্পন্দনে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে এবং বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রয়োজন কি? এতো মানুষের জন্মগত অধিকারভুক্ত! কথাটা ঠিক; এমন কি পশু-জগতে এ অধিকার আজও অক্ষুণ্ণ। কিন্তু মুস্কিল হ'লো মানবিক ক্ষেত্রে। মানুষ তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সেই সহজাত সার্বজনীন ভাবাবেগে এনেছে নব নব রূপমাধুরী। সৃষ্টির তাগিদে যাত্রা ক'রেছে, ক'রছে, ক'রবে, নানা নুতনদের পথে। সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় পুঁথির আকার বেড়েই চ'লেছে। একই প্রেমের আচ্ছাদন, যাতে যুগহরিণী চঞ্চল হ'য়ে ওঠে

তাই জানাতে প্রেমিক মানুষকে পুঁথির পাতা মুখস্থ ক'রতে হ'লো। এতো মানুষ স্বৈচ্ছায় ক'রেছে। সহজকে জটিল ক'রে মানুষ কি আনন্দ পেলো? বুদ্ধির আনন্দ? না সৃষ্টির আনন্দ? হয়তো বা ছ'য়েরি আনন্দে মশগুল হ'য়ে সহজ-কথাটা,—ছেনার-বড়া না ক'রে রস-গোলা ক'রে ফেললে। এতে মুক্তি হ'লো একদিকে। রসগোলা করার যে কারদা তা সার্বজনীন নাগালের বাইরে। এই ভাবেই ব্যক্তির আসর ঘুমিয়ে বসলো সার্বজনীন অধিকারের ক্ষেত্রে।

— সংগীতের ধারা সহজাত থেকে অধিকার ভেদের কোঠায় হাজির হ'লো, শুধু হ'লো নব নব অমূল্যমানের আয়াস-লব্ধ লক্ষ্যভেদ। অনায়াসলব্ধ ভাবাবেগ কোনঠেসা হ'য়ে রইল অধবিকশিত, অবজ্ঞাত, মানব সমাজে; সংস্কারবিহীন সহজ সরল ধ্বনি ঐশ্বর্যই তার একমাত্র সমল ক'রে।

সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপে সংস্কৃত সেই সংগীত যেদিন এসে দাঁড়ালো ক্লাসিক যুগে তখন তার পদক্ষেপ গরিত হ'য়ে উঠেছে আপন ঐশ্বর্যে; তখন থেকেই সে বলার অধিকারী হয়েছে—‘আমাকে নাওনি, বোঝনি, তুমি পশুর সমান!’ তখন থেকেই তার প্রার্থনা—‘অরসিকের কাছে রস নিবেদন আমার কপালে লিখো না, লিখো না, লিখো না!’

রসিক, অরসিকের, এই যে ভেদজ্ঞান এর ওপর সাম্যবাদ বা গণতন্ত্রের দাবী চাপাতে বাওয়া বিপজ্জনক! শুধু সহজাত হৃদয়বেগ নিয়ে সংস্কৃত মানুষের মন ওঠে না; চাই কি তাঁরা সংগীতের চেয়ে আঁকু কষা পছন্দ ক'রে ফেলবেন। মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্য-সংগীত চিত্রকলা সবই জটিল হ'য়ে উঠলো; রসিকের সংখ্যা কমে দিকে এগোল। কলাবিদরা নব নব অলঙ্কারে সরল গ্রাম্য বৈশুটিকে সাজিয়ে এমন মোহিনী সৃষ্টিতে ভুলে ধ'রলেন যার কলে সৃষ্টির বিচার করার ক্ষেত্রে অলঙ্কারশাস্ত্র তৈরি হ'লো; কলাবিদরা রসিক-শ্রণীর ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন। নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে বিকাশ পেলো কলাপদ্ধতি অনাগত কলাবিদের প্রস্তুতির ব্যবস্থা হিসাবে। সংগীতকলা, হ'লো ‘বিদ্যা’; ‘বিদ্যা’ অভ্যাস সাপেক্ষ; ‘বিদ্যা’ আয়াসলব্ধ; ‘বিদ্যা’ বুদ্ধি নির্ভর।

যাখে যাখে মানুষের মনে বিদ্রোহ জেগেছে শৃঙ্খল ছেঁড়ার। আকাংখা জেগেছে, নিয়মের দাসত্ব থেকে মুক্তির। হৃদয়কে প্রাধান্য দিয়েছে বুদ্ধির ওপর। তেবেছে মুক্তি হবে, কিন্তু তা তো হয় না। শুধু কলাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কারের বোঝা বাড়ে। নূতন নূতন টিকাকারের প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। কিংবা বিকৃত রুচির স্বৈচ্ছাচারী আঘাতে কলাদেবীর অঙ্গহানি ঘটে। এ আঘাত প্রতিরোধকল্পে নব ভাষ্যকারের আবির্ভাব হয়। কি সংগীতে কি সাহিত্যে এর সাক্ষ্য ভূরি ভূরি। সহজাত হৃদয়ের সরল আবেদন বড় সাময়িক বড় কণ-ধ্বনিত; এ যুগের তাই মস্ত সমস্তা কলাবিদ্যা নিয়ে; মস্ত সমস্তা রসিক হওয়ার! সংগীত-সাহিত্য-কলাযুক্ত হওয়া শক্তকথা। তার চেয়ে বিধাণ যুক্ত হ'য়ে বড়বাক্যে পরিচালনা নিরাপদ।

॥ চন্দ্র ॥ ৭

॥ নতুন ছবির খবর ॥

কালো-বো : নিউ থিয়েটার্স-এর কয়েকজন প্রখ্যাত কপাকুশলীকে নিয়ে গঠিত 'শিল্পী-সংঘ' প্রতিষ্ঠান 'কালো-বো' ছবিটির কাজে হাত দিয়েছিলেন। এক সংবাদে প্রকাশ ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিটিতে ষাঁচা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে জহর, সন্ধ্যারানী, বিকাশ, ছবি বিশ্বাস, শোভা সেন, পাহাড়ী সান্তাল, তপতী মোহ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিটিতে সুর যোগনা করেছেন অনিল বাগচী এবং কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখার্জী প্রভৃতি শিল্পীরা। পারবেশন করছেন ভারতী পিকচার্স।

উপহার : ছায়াবাণী লিমিটেডের আগামী ছবি হচ্ছে 'উপহার'। কাহিনীটি রচনা করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এবং পরিচালনা করছেন তপেন সেন। উত্তমকুমার, সাবিত্রী, অনুভা, মঞ্জু দে, ছবি বিশ্বাস, তুলসী, নৃপতি, কান্নু ও নির্মলকুমার প্রভৃতিকে এ ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে। সংগীত পরিচালনা করছেন কালীপদ সেন।

হে মহামানব : শ্রী গদাধর পিকচার্সের উদ্যোগে উক্ত ছবিটির শুভ মহরৎ গত বৃথষাট্যাব দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাহিনী রচনা করেছেন জীবানন্দ ঘোষ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অমর বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী (সংগীতে বিশারদ) এই ছবিটিতে সুরারোপ করবেন। সম্ভবত, শ্রীলাহিড়ী এই প্রথম ছায়াছবিতে সুর দেবেন।

ত্রুতচারিণী : এম. কে. বি. প্রোডাকশনের প্রথম ছবি 'ত্রুতচারিণী'-র কাজ রাধা ক্রিস্টিয়ান্টিও-র চত্বরে দ্রুতগতিতে চলছে। ছবিটির কাহিনীকার প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণিবর্মা। 'ত্রুতচারিণী'-র পরিচালনা করছেন কমল গাঙ্গুলী এবং সুর দিচ্ছেন কমল দাশগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার, সন্ধ্যারানী, মলিনা, সাবিত্রী, চক্রবর্তী, অরীন্দ্র, ছবি-বিশ্বাস, কান্নু বন্দ্যোঃ প্রভৃতি। কালিকা ক্রিস্টিয়ান লিঃ ছবিটির পরিবেশনা করবেন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : ভক্তিরসাপ্লুত বাংলা দেশের চিত্রজগতে সম্প্রতি ধর্মমূলক ছবি তোলার একটা প্রাবল চলছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের বিপুল সাহস্য দেখে ধর্মমূলক জীবনীচিত্র খাড়া করার প্রবণতা স্টুডিও চত্বরে বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত কথাসিঙ্গ প্রতিষ্ঠান "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ"র শুভ মহরৎ শেষ করেছেন। অমৃতানন্দ লেখক উপেন গঙ্গোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। ছবিটির উদ্বোক্তারা জানিয়েছেন, প্রকল্প চক্রবর্তী ছবিটির পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন ভূমিকালিপিতে আছেন ছবি বিশ্বাস,

অহর, চন্দ্রাবতী, নীতিশ, শোভা সেন, সুপ্রভা মুখার্জী। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করবেন একজন নবাগত অভিনেতা।

চোর : চিত্রাঙ্কসী প্রোডাকসন্স-এর উদ্যোগে 'চোর' ছবিটির কাজ শীঘ্রই নিউ-থিয়েটার্স স্টুডিও-তে শুরু হবে। ছবিটির কাহিনীকার শ্রীমণি সিংহ এবং সংলাপ রচনা করেছেন প্রখ্যাত লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল। অপরাধতত্ত্ব ও শিশু মনস্তত্ত্ব এই কাহিনীর বিশেষ অবলম্বন। শিশু চিত্রে কি ভাবে অপরাধের বীজ রোপিত হয় এবং কি ভাবে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে তাদের সেই অপরাধপ্রবণতা দূর করা যায় তা এই ছবিতে কাহিনীর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উপহার : শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে উক্ত ছবিটির চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিও-তে সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, নির্মলকুমার, মঞ্জু দে, অমৃতা গুপ্তা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অহমীয়া ছবি 'নিমিল অক্ষ' : গোহাটীর নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠান নীলাচল চিত্রপীঠ 'নিমিল অক্ষ' নামে একটি অহমীয়া সামাজিক চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন লক্ষ্য চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা করবেন পুরুষোত্তম দাস। ছবিটির বহির্দৃশ্য কিছু কিছু গৃহীত হয়েছে। রূপায়নে আছে—অমৃপমা ভট্টাচার্য, লক্ষ্য চৌধুরী, কমল চৌধুরী প্রভৃতি।

হিন্দী ছবি : ইনসানিয়াৎ : এম. এস. ভাসান পরিচালিত জেমিনীর এই ছবিটির চিত্র গ্রহণ জেমিনী ষ্টুডিওতে শুরু হয়েছে। গত তরা মে থেকে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'চন্দ্রলেখা' ছবিটির ব্যাপারে জেমিনী ষ্টুডিওতে যেমন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিলো 'ইনসানিয়াৎ'এ ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। খ্যাতনামা সংগীত পরিচালক সি. রামচন্দ্র সুরযোজনা করবেন এবং রাজেন্দ্রকৃষ্ণ গীতি রচনা করেছেন। অভিনয়্যাংশে আছেন দিলীপকুমার, দেবানন্দ, জয়রাজ, বীণা রায়, বিজয়লক্ষ্মী, শোভানা সমর্থ, আগা মোহনা, প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতৃবৃন্দ।

আনবান : রাজশ্রী পিকচার্সের নতুন ছবি 'আনবান'এর কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রযোজক ভি. ডি. কান্তপ। মধ্যযুগীয় রাজপুতদের শৌর্যবীর্ষ এবং রোমাঞ্চকর বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলী চিত্রটিতে স্থান পেয়েছে এবং সেই হিসেবে ছবিটি রোমাঞ্চলোভী সাধারণ দর্শকদের তৃপ্ত করবে বলে আশা করা যায়। ছবিটিতে কিছু বহির্দৃশ্যও আছে। মধ্যযুগীয় রাজপুতানা এই ছবিটির পশ্চাদপট।

অমরবাণী : অমরুপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস অবলম্বনে সরকার প্রোডাকসনের 'অমরবাণী' ছায়াছিত্রের কাজ শুরু হয়েছে। ছবিটি হিন্দীতে গৃহীত হবে। এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা করবেন হেমচন্দ্র এবং সুরযোজনা করবেন হেমন্ত মুখার্জী। ছবিটি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গৃহীত হবে।

চিত্রদর্শক

॥ সমালোচনা ॥

জ্যোতিষী : কাহিনী : গজেন্দ্রকুমার মিত্র ; চিত্রনাট্য : মুরারী সেন ; পরিচালনা : চিত্ত বসু ; সুর : গোপেন মল্লিক ; আলোকচিত্রশিল্পী : বিমল মুখোপাধ্যায় ; ভূমিকায় : বিকাশ, সন্ধ্যা, সুপ্রভা, প্রশান্ত, লীলাবতী, জয়ন্তী, কানু ও অনেকে ।

গল্পাংশটুকু বাংলা ছবির ক্ষেত্রে নতুন এবং উপযুক্ত চিত্রনাট্য ও পরিচালনার গুণে জ্যোতিষী অভিনব চলচ্চিত্র হতে পারত সন্দেহ নেই । কিন্তু চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সাধারণ গতানুগতিক নিয়মে বাঁধা, নানান স্থূল দুর্বলতার কণ্টকিত । কাহিনীর জটিলতা তৈরী হয়েছে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর আপন ভাগ্য গণনার ফলাফলের উপর । জ্যোতিষী আপন ভাগ্য লিখনে রয়েছে দেখলেন জীব কুসত্যাগিনী হয় এবং নিজের মাতৃঘাতক হয় । এই ভাগ্যলিপির সন্দেহে তিনি শতধা ছিন্ন হলেন । কিন্তু ছবিতে যেভাবে মায়ের মৃত্যু হল তাতে ছেলেকে মোটেই মাতৃঘাতক বলে প্রতিপন্ন করা হয়নি । দ্বিতীয়ত যে মহান জ্যোতিষী ভাবী স্বামী-জীব ভাগ্যগণনা করে বল দিতে পারেন যে জীব ভাগ্যজ্ঞের স্বামীর ভাগ্যদোষ খণ্ডাবে, এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেলে, তিনি যে কেন বিচার করে জীব ঠিকুজী কুষ্ঠি বিচার করেন না একবারও, বিচার করে ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসংশয় চিন্তা হন না, তা বোঝা ভার । ছবির শেষে যখন দেখা যায় স্বনামধন্য জ্যোতিষীর আপন জীব ঠিকুজী-কুষ্ঠি নিয়ে গুরুর কাছে দরবার করা, এবং গুরুজীর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে রায় দেয়া যে এ মেয়ে কুসত্যাগিনী হতে পারে না, তখন সমস্ত ছবিটাই বোকামীর চূড়ান্ত মনে হয় ।

আধুনিক শিক্ষিত ছেলে-মেয়ের প্রেম যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যে ভাষায় তারা কথা বলে, যে আঁখিভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করে, তা রুচিহীন সংলাপ ও পরিচালনার দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যায় । ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ের পক্ষে এ ধরনের ভাষা-ভঙ্গীমায় লিপ্ত হওয়া শুধু যে অসম্ভব তা নয়, দর্শক হিসেবে বসে ছবি দেখতেও পীড়িত হতে হয় । প্রেম মানেই ইয়ার্কি ও ন্যাকামী, মানুষের গভীর আবেগ নয়, বাচালতা, এ ধারণার হাত থেকে চিত্রপরিচালক ও নাট্যকাররা মুক্ত না হলে প্রেমের দৃশ্য বাংলা ছবিতে বাদ দেয়াই উচিত ।

বিকাশ রায়ের অভিনয়ই মোটামুটি ভালো হয়েছে, যদিও করুণাহীন পরিচালনার গুণে জ্যোতিষী চরিত্রের স্বন্দ কোনো সময়ই গভীর হয়ে উঠতে পারেনি । মাতৃঘাতক হবে এই যে স্বপ্ন তা এমন-কয়েকটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও বস্তুর দাপাদাপির মধ্যে দিয়ে চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, মেলোড্রামাটিক ও তরল লাগে । সন্ধ্যারাগীর অভিনয় বৈশিষ্ট্যহীন, একঘেয়ে । প্রশান্তকুমার ও তাঁর প্রেমিকাকে দিয়ে প্রেমাত্মিনয়ের নামে ভাঁড়ামি করানো হয়েছে । সুপ্রভা ও কানু গতানুগতিকভাবে উৎরেছেন ।

আলোকচিত্রশিল্পের কাজ ছবিটিতে প্রশংসনীয় । সুরসৃষ্টি বৈচিত্র্যহীন ।

চিত্রশাষী

ভ্রম সংশোধন

চৈত্র ১৩৬১, 'সে' কবিতার শেষ স্তবক, পৃষ্ঠা ৭৮২, পঞ্চম লাইন "মুদিত পদ মেয়ে"-র পর "সে তো নেই এখানে কোথাও" নতুন লাইন যোগ হবে। এর পরের লাইন "সে তো ওই মিশে আছে" হবে।

বৈশাখ, ১৩৬২, "যশোদা" গল্পে ৩৪ পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইনে : "তাড়া-তাড়ি শুয়ে পড়ে সে একপাশে কাঁৎ হয়ে।"র পরে

'মা পাশ থেকে আস্তে হাত রাখেন ওর কপালে। চমকে যায়' অংশটি বাদ গেছে। এই অংশটি যোগকরার পরে "মনে মনে নরেন"ইঃ চলবে।

বিজ্ঞপ্তি

গত ১২শে জুন ১৯৫০ তারিখে বাসে যাতায়াতের সময় আমাদের প্রতিনিধির কাছ থেকে অগ্রণীর ১৪৮০১-১৪৯০০ নম্বরের রসিদ বইটি খোয়া গিয়েছে। ঐ বইয়ের ১৪৮৭০ নম্বর পর্যন্ত রসিদের অর্থ অফিসে জমা হয়েছে ও গ্রাহকদের নাম ঠিকানা তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৪৮৭০ নম্বরের পর কোনো রসিদে কেউ টাকা জমা দিয়ে থাকলে কার্যাব্যককে জানানোর অন্তে অনুরোধ করা হচ্ছে। পত্রালাপের সময় রসিদ নম্বর, নাম ঠিকানা ও টাকার অঙ্ক জানাবেন।

কার্যাব্যক

অমল

॥ অষ্টম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬২ ॥

স্বপ্ন-সৌধ
অমল ঘোষ

টিফিনের আধঘন্টা ছুটিতে জড় হয়েছে ওরা ; দু'জন চারজন করে দানা বাগছে । জট পাকাচ্ছে । কিটিং সেকশনের ভিতরে আর দরজায় । ওয়েলডিং সেকশনের ভিতরে— সামনে চারহাত একফালি রাস্তায় আর কলতলায় ।

মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে জুট দিয়ে বসছে এ্যাসিস্টেন্ট-ফিটার রফি হাতের কালি ঝুলি । পাশে গোল করে দাঁড়িয়ে আরো তিন চার জন । পরনে কালি মাখা সাত-তালি দেয়া মোটা থাকী কাপড়ের হাক শার্ট আর হাকপেন্ট ।

কলতলায় ভিড় বেশি । বাড়ছে আরো । একে একে এসে জমাচ্ছে ।

সকলের এক কথা । কেউ বলছে, শুনছে বাদবাকী । একটা প্রশ্ন তুলে ধরছে তার মধ্য থেকে একজন, চোখ তুলে তাকাচ্ছে আর সব । বিরূপ মন্তব্য-ও করছে দু'এক-জন, কিন্তু তবু হাসি মুখ সকলের, উৎসাহে জলজল চোখ সবার । বাদী-বিবাদী, শ্রোতা-প্রশ্নকর্তা ।

কামাল কল থেকে এক আঁকলা জল নিয়ে হাতের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল, “দে, দে, খুব হয়েছে । আরেকটু হলে যে ‘সাইব’ বনে যাব শালা । সাবানটা এদিক দে দেখি ।”

মদন সাবানটা দেয় ওর হাতে । কামাল হাতে সাবান বসে, এগিয়ে দেয় নিধিরামকে । নিধিরামের হাত থেকে নেয় বাংগালী ।

আগে জুট দিয়ে কালি তোলে এক পৌচ । জল নিয়ে ভাল করে ভিজায় হাত । তারপর সাবান বসে কেনা তোলে, কলে হাত রেখে সাইব বনে যায় ।

বংশী বললে, “না, একদম পাকা খবর ।”

মদনের চোখ বংশীর চোখে, “কে বললে—”

চারছোড়া চোখ এসে পড়ল বংশীর চোখে। বংশী আঙুলের ফাঁকে ছুট ঘসতে ঘসতে বললে, “বোমেনবাবু—”

“বোমেনবাবু! কোন বোমেনবাবু!” লোটনের চোখের ঢেলা ছ’টি বোধ হয় ছিটকে পড়বে।

“বড় অকিসের বোমেনবাবু। নাটা মাকিক, চশমারাল।” উত্তর দিল হরিয়া।

চুপচাপ সকলে।

মদন বলল কিছুকণ পর, “ও, বোমেনবাবু! শালা একটা পরলানঘরী বোম ছোড় দিয়া।”

“একেবারে ম্যাকআর্থারী!” দোহার টানে রফি।

মদনের বলার ধরনে না-হেসে পারল না সকলে। ও নিজেও হাসল সংগ সংগে।

বোমকেশের বিকৃত উচ্চারণ বোমেন।

পাশ থেকে এসে ভিড়ল আরো ছ’জন, শুনছে সকলেই তবু আবার। যদি আরো কিছু থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে, প্রত্যেকটি কথা যেন গিলে ফেলছে। কুই কাতুলার সংগে যদি ছ’চারটে টেংরা-পুঁটি আসে, আশুক না।

“ক্যা বোলাবে—” ভোলা পিছন থেকে বললে।

“বোলা, ছাপরাওয়ালাকো টিকিট কাটাকে রেজ্কা ডাক্সামে তুল দে!” বংশী হাসল।

হাসল ওরা সকলে।

শহরের কোণ ঘেঁষে অবস্থিত ছোট এই মোটরের কারখানাটা। শ’তিনেক লোক কাজ করে। ক’দিন ধরেই কানাঘুসা শুনছিল খবরটা। কানাঘুসা শুনও তুলেছিল। রফি-কামাল-মদন-বোচন সকলের মনে একটা রঙিন প্রজাপতির ছায়া ঘুর ঘুর করছে ভ্রমব বাড়ার সংবাদে। মাত্র ছ’টাকা। পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ। পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন। বাহান্ন যে পার তবু হবে চুয়ান্ন। এত লড়ালড়ি, দৌড়াদৌড়ি, হাঁটাহাঁটির পর মালিক ছ’টি টংকা বাড়াতে সম্মত হয়েছে বলে ওরা উড়ু উড়ু শুনছে দিন কয়েক থেকে। আর শুনছে বাড়তি পাবে তিন মাসের, তিন হুণ্ডে ছয়।

যে যার ভাবতে ভাবতে পথ চলে। একবার গড়ে, আবার ভাংগে। দূর ঠিক হল না।

“ছ্যাওয়ালের জামা না কিনে মতিয়ার জন্তে একটা মোটা শাড়ী তিন টাকা, জবা আলতা একটা আট আনা, আর একটা গন্ধ তেল আট আনা, কত হল”—বলল ভাহু।

“আর ছ’টাকা”—নিখিরাম জিজ্ঞাসা করল।

“আর ছ’টাকা?” চোখ নাচিয়ে বলল ভাহু, “তোর মতো কি আর আমি নিরামিষ বে, পাঁচ সিকি রামবাবুর দোকানে, ফাস্কাস এক পাইট আর বাহো আনা টিকিটে

শালা একদিন বসতে হবে ছায়া ছবিতে।” বলে ভাছ একটা চড় বসিয়ে দেয় নিধিরামের পিঠে, “বুঝলি?”

নারায়ণ বললে—“আমি আর রামবাবুর ও-রাস্তা মাড়াচ্ছি না। আগে একে একে এদিক-ওদিক করে সব দেনা-ফেনা মিটিয়ে দি, তারপর দেখা যাবে—“নারায়ণ মনে মনে হিসাব কষতে থাকে, কে কত পাবে।

বোচন বলে উঠল, “আরে ছর বোকা, ধার কি আর মিটাতে পারবি। আজ মিটাবি তো কাল হাত পাতবি। কাল মিটাবি তো পরশু হাত পাতবি। ওসব মিটমাট করতে যাওয়াটাই বোকামি। তার চেয়ে যতদিন আছি স্থিতি করেনি।”

ছুটির পর দল বেঁধে বাড়ি ফিরছিল জনকয়েক। পথ চলতে চলতে বলা-বলি করছে নিজেরা। কাঁচা ধোয়ার চওড়া রাস্তা বাক নিল বাঁয়ে। ছ’ধারে বাধাচূড়ার গাছ সারি সারি থোকা থোকা বাধাচূড়া ভাঙি।

যে যার মনে মনে অনুপনাকল্পনা করছে। কি করবে ছ’টাকা বাড়তি পেলে। বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলির জামা কিনে নিয়ে যাবে। জেনানার জন্যে সুন্দর একখানা শাড়ী কিনবে, ম্যানেজারের সেজ মেয়ের মতো—কি রকম দেখাবে ওকে, সিনেমার মেয়েগুলির মতো। দূর, তার চেয়ে রামবাবুর দোকানে যার না অনেক দিন, যদিও বা যায় গলা ভেঙ্গে তো মন ভেঙেনা। সকলে মিলে একদিন আনন্দ করলে কেমন হয়, একটা কালী কি শেতলা পূজা লাগিয়ে দেবে, তারপর রাতে খাসী আর, ছ’, রামবাবুকে চাই ঠিক। ঢালা অর্ডার দিয়ে রাখতে হবে। যদি ছ’টাকা কম পড়ে বাকী দিয়ে যাও, পরের মাসে শুধবে, এখন থেকে তো নাকি হয় মাসেই ছ’টাকা ভলব বেশি মিলবে।

রামবাবু শালা আবার খচড়া আছে, এক ঘসা আধলা-ও বাকী রাখতে চায় না। যেমন ব্যাটার খুদে খুদে চোখ আর লম্বা লম্বা গাঁক, তেমনি চামার শালা, ছোটো লাল ভাবতে থাকে।

নারায়ণ বলে, “কি নিধিরাম, তুই চুপচাপ যে বড়, শুনি তোবটা।”

ভাছ বলে, “ও শালা কেপটা ওরটা আবার কি শুনবি, ওর কোন রস আছে—”

সত্যি নিধির রস নেই। চল্লিশের ছোয়ার সমস্ত গেছে শুকিয়ে। বাড়িরালী বুড়ী ট্যাক্ ট্যাক্ করছে, তিন মাসের ন’টাকা ভাড়া বাকী পড়েছে, আজ-ও সকালে এসে দাঁত খিঁচিয়ে গেছে। যেমন অধাতি মুখলী, তা যদি আবার খোঁচাতে শুরু করে, আর কথা বলার বা ধরন, মুখের যেন আর লাগাম নেই। বাবা মেয়েমানুষ কি করে বলে! ন’ টাকার জন্যে কত কি না বললে। তা-ও যদি ঘর ভাল হতো। ঘরের ভিতরে শুয়ে শুয়ে বেশ গোনা যায় আকাশের তারাগুলি।

ওরা বলে রস নেই। আরে রস কি আর রামবাবুর দোকানে, না ছায়াছবিতে। ওঃ, রসের কি বুঝিস তোরা, তারি তো ছুধের স্বাদ মেটাচ্ছিস ঘোলে। এখন আর, বরুণ থাকলেও, মনের অবস্থা নেই নিধিরামের। পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেয়ে কি আর স্বাদ আনন্দ

চলে। পেট পুড়ে খাওয়াই চলে না গণ্ডা আঠেক লোকের, কুঞ্জকে কি আর একখানা ভাল শাড়ী কিনে দিতে ইচ্ছে করে না ওর, এক লিপি গন্ধ তেল। কে আছে কুঞ্জের মতো অমন সুন্দর। যেমন রঙ, তেমনি চেহারার বাধুনী, আর মিঠে গলা। জানতে তো আর বাকী নেই, কার দরিয়ায় কত পানি।

নিধিরাম চুপ করে যায়। তাকায় ছ'পাশের বাধাচুড়া পাছের দিকে।

কত আর নেবে একখানা ভাল শাড়ী! ছ'টাকার সংগে না হয় আর ছ'টাকা। আট টাকার একটা রঙিন-শাড়ী নিয়ে দিতে হবে গিরিবালাকে। কি ভাবে ওকে। রফিউদ্দিন দিমাকুয়ালা আদমী। আজ না-হয় হাত টানাটানি। একপাল কাচ্ছা বাচ্চার বাপ, তবু রফি! আর দশজনের সংগে আলবাৎ ফারাক আছে রফির। গিরিবালা কি মনে করে, হাতি ছাগল এক দর! আমিনাটা আবার ধর ধর করে; মহা ঝগাট! তলব পাওয়ার সংগে সংগেই পকেট হাতড়িয়ে সব ফাঁকা করে রেখে দেবে। জানতে পারলে তো কান ঝালাপালা করে দেবে। বাড়ি টেকা-ই হয়তো দায় হয়ে উঠবে। সেবার গিরিবালাকে একটা আলতা আর এককোটা গন্ধ পাউডার কিনে দিয়েছিল মেলা থেকে ছ'টাকা দিয়ে, কি করে যেন পোড়ারমুখী শুনেছিল, এত টিপে টিপে সাবধানে চলছিল, তবু কি করে যেন টের পেয়ে গেল—সাতদিন বাড়িতে ঢুকতেই দেয়নি ওকে, বলেছে, “এখানে মরতে এসুছো কেন, কোনো ঘাটে ঠাই হলনা। বেড়-ও বেড়-ও—” একটা আধ-পোড়া কাঠ নিয়ে তেড়ে এসেছিল আমিনা।

কতদিন হল বাড়ি যাওয়া হয়না। কতদিন হবে, ছ'মাসের ওপর। প্রায় তিন সন ছুই ছুই। পদ্মিনীর খোকা কত বড় হয়েছে, কি রকম হয়েছে দেখতে। বাছারায়ের ছেলের মতো রোগা টুক টিকে, না কানাইবাবুর খোকার মতো দামাল। না তার ছেলে বাছার ছেলের মতো হয়নি, সেদিনও পদ্মিনী লিখেছে চিঠিতে। কি ছুই খোকা হয়েছে, বাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করলে গম্ভীর মুখে কিছুকণ তাকায় এদিক ওদিক তারপর খিল খিল করে হেসে মাটিতে লুটো পুটি খায়। প্রথম ছেলে কি চিনতে পারবে, বেয়াল্লিশ দিনের ছেলে আজ কত বড় হয়েছে, গায়ের রঙ কার মতো, তার মতো না পদ্মিনীর মতো। পদ্মিনীর চেহারাই বা কেমন হয়েছে, লেখে তো ভাল আছি, কিন্তু কি রকম হয়েছে দেখতে। কত ইনিরেবিনিরে অকুনয়বিনয় ক'রে বারবার মাথার দ্বিব্য দিয়ে লিখেছে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে। বাড়তি ছ'টা টাকা পেলে গাড়ী ভাড়াটাতো হবে। আর এখন টাকা দিয়েইবা কি দরকার, হাতে আসলেই তো ধরচা হয়ে যাবে, তার চেয়ে আর ছ'মাস পরে পূজার সময় না হয় মোট পাঁচ মাসের দশটা টাকা দিয়ে দিক, ছুটি তো আর এখন মিলবে না, সেই পূজার সময় ছাড়া। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে নীলমণি। উড়িয়ার কোন এক অজ গাঁ থেকে এসেছে কলকাতা মহানগরীতে কুটির সন্ধানে। মহানগরীর চিমনির ধোঁয়া আর পথে রানি

রাশি ধুলোবালি ভেদ করে চোখে ভাসে ছোট একখানা কুঁড়ে ঘর। আঙিনায় সুপরি গাছের পড়ন্ত বোদে ঝলসেওঠা একখানা গোল ফোলা কচিকচি মুখ, ছল ছল মিনতিভরা এক চোখ। ভরস্তু নদীর পাড় ছাপিয়ে ওঠা জলের কলকল্লোলের মতো কথা করে ওঠে চোখ জোড়া, শুনতে পায় নীলমণি।

বংশী এই ছোট দলটা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। হাঁটছে আলাদা, একাএকা। নিজের মনে বকুবকু করতে করতে। পিছন থেকে ভোলা এগিয়ে এল, “কি রাধেকেষ্ট, কি বকুবকু করছ একা একা।”

“শালা, সব শালা বেইমান। টাকা নেয়ার সময় বলবে ছ’আনা সুদ আর এখন বলে ছ’পয়সা।” বংশী রাগে ফেটে পড়ে।

ভোলা মুখ ভুলে তাকায় ওর দিকে। বংশী কারখানার সকলকে টাকা ধার দেয়, পঁচিশ দিয়ে পঁচাত্তর আদায় করে। নিষে এক বেলা চার আনার ছাতু খেয়ে কাটিয়ে দেয় দিন, মাসে দশ থেকে বার টাকার বেশি খরচা নেই। তাতেই চেষ্টামেচি শুরু করে, হা-ছতাশ করতে থাকে, “এ মাসে বহুৎ খরচা হোয়ে গেল। পরের মাইনে থেকে কাটাতে হবে।” অর্থাৎ পরের মাসে ছ’তিন দিন উপোস। ত্রিভুবনে বাতি দিতে ওর কেউ আছে বলে শুনিনি। না খেয়ে না দেয়ে টাকা বাঁচিয়ে সুদে ধার দেয়; কড়ায় গুণায় কি করে পাওনা আদায় করতে হয়, জানে। কাবলীরা ওকে দেখে হাত ভুলে বলে, “সেলাম হুজুর।”

“রাম, রাম।” বলে বংশী কারখানার ভিতর ঢুকে। কপালে চন্দন টিকা, পকেটে ক্রডাক্সের মলা আজীবন সংগী। সময় অসময়, বিশেষত পাওনা আদায় করতে যাওয়ার সময়, মালাটা হাতে নিয়ে শুনতে থাকে, আর বলে, “হরে রাম, রাম তোর ছে আমি এক পয়সা বেশি নেব না। একবারে দেখ ঠিক ঠিক হিসাব আছে আমার খাতায়, আর এ ঝগাট ভাল লাগে না, এখন বসে বসে রাম-নাম করব ভাবছি।”

ওর এত রামভক্তি দেখে কারখানার সকলে নাম দিয়েছে ‘রাধেকেষ্ট’, বলা বাহুল্য এখানে বংশী রেগে গিয়ে বলে, “হা’ রাম রাম বলো, ননী মাখন চোরের নাম বলবি না।”

যত ও রাগে তত বলে।

“দেখি, দেখি একটা বিড়ি দাও।” বললে ভোলা।

“বিড়ি নেই। শালারা টাকা নেবে ফেরৎ দেয়ার বেলা পেছনের দরজা দিয়ে কাটে। শালাদের—” বংশী আপন মনে বলে চলে।

“আহা, দাওনা একটা বিড়ি।” ভোলা আবার বলে।

“নেই, একটাও বিড়ি নেই—” বংশী চেষ্টিয়ে ওঠে।

“দেখি তোমার পকেট দেখি।” ভোলা হাত বাড়ায়। নাছোরবান্দা।

“আ-হা, দাঁড়া, দিচ্ছি দিচ্ছি।” বংশী একটা বিড়ি বের করে দেয়।

তারপর একা একাই বলতে থাকে ওর কাছে অত টাকা, এর কাছে এত

পাওনা। বোচন শালা এ-মাসে দেবে বলেছিল না। কানাই খাঁ ছ'আনা করে নিয়ে এখন বলে ছ'পয়সা। নগিনা এখন বলে অনেক দিয়েছি, আর পাওনা নেই। পাওনা নেই! পাওনা নেই তো আমি যেন ঘর থেকে বানিয়ে বানিয়ে চাইছি আর কি। সব শালা চিটিংবাজ, হারামি! এবার শুনছি ছ'টাকা করে তলব বাড়বে, তলবের দিন গিয়ে পাকড়াতে হবে, পুরো টাকা দিয়ে দাও। ছ'টাকা করে তো বেশি পাচ্ছ আর তাছাড়া বাড়তি পাচ্ছ ছ' টাকা—দিয়ে দাও সব।

মদনের চোখে ভাসছে লক্ষ্মীর মুখের আদল। কালোর পরে টানাটানা দীর্ঘাঙ্গিত চোখ জোড়ায় লজ্জাজড়িত চকলতা। চোখা গড়নের নাক, সরু ঠোঁটের ফাঁকে পাতলা মসলিন এক ফালি হাসি ভাসছে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো। মানানসই চেহারার পিছনে শরীরের সংগে আঁট করে লেপ্টে-পড়া আটপোড়ে কাপড়। গুণধর বলেছে সেদিন দুই হাত ওর চোখের সামনে তুলে ধরে, তিন কুড়ি নেব শুণে শুণে। ঘষা মাঝা চলবে না হে। অনেক ধস্তা ধস্তি করেও টাকা কমাননি, তবে সময় দিয়েছে তিন মাস আর বলেছে, কাঁটার কাঁটার তিন মাস, একদিন দোর হলোই আমি কামালকে ডাকব। ও এখনই গিয়ে কোলাঝুলি করছে, তবে তুমি, মদন যখন, আর তাছাড়া, লক্ষ্মীর মাও বলেছে—আচ্ছা যাও। সাবধান পাঁচ তিন মাস, গুণধর হাতের মোটা ধামপ্রমাণ মাদারের ডালটা নিয়ে দাঁতে ঘসতে থাকে। কথা হচ্ছিল ওরই বাইরের দাওয়ার বসে। মদন উঠে পা বাড়াতে পিছন থেকে গুণধর গলা বাড়িয়ে বলে উঠল, “দেখ হে, সাবধান তিন মাসের একদিনও বেশি পাবেনা কিন্তু। সাবধান সাবধান!”

কথার শেষে অহেতুক ছ'বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গুণধর গুরুত্ব আরোপ করল। মাদারের ডালটা নিয়ে আগের মতো দাঁতে ঘসতে থাকে। চোখ দুটি ছোট করে তাকালো, বোকা গেলনা এ দাঁতন করার প্রতিক্রিয়া কিনা। লক্ষ্মীর কথা ভাবতে গিয়েই গুণধরের চেহারা মনে পড়ে যায়, আঁতকে ওঠে মদন। বেসুরো লাগে বাহ্যিক অগততা। তিনকুড়ির মধ্যে মাত্র এককুড়ি জমিয়েছে হাতে এ ছ' মাসে। এখনো ছ'কুড়ি চাই। যদি না পারে, গুণধর তাও বলে দিয়েছে সাফ সাফ, কামালকে ডাকব। লক্ষ্মীর আয়ত চোখ জোড়া ভাসছে মদনের সামনে। এই দিন পাঁচেক আগেও দেখা হয়েছিল রাস্তায়। সন্ধ্যার আধো-আলো ছায়া গায়ে মেখে চলছিল রাধা গাছের ছায়ায় ছায়ায় জলের কলসি কাঁখে নিয়ে। মোড়ের টিউবকলে আসছিল জল নিতে, সেই ফাঁকে দেখা, আজকাল আর বাড়িতে চুকতে দেয় না গুণধর। টাকা জোগাড় না করতে পারা তকু বাত-চিত দেখা-শোনা সব বন্ধ।

পিছন থেকে পা টিপে টিপে গিয়ে মদন ওর খোঁপায় একটা মুছ ঝাঁকুনি দেয়, চমকে উঠল লক্ষ্মী, বলল, “বাক্সা! আমি ভাবলাম কে-না-কে। ভয় পেয়ে গেছিলাম, বুক কাঁপছে এখনো দেখ।”

মুচকি হাসছে মদন।

লক্ষ্মী বা হাতে খোঁপাটা ঠিক করে নিলে বললে, “যাও—”

বেশ লাগল লক্ষ্মীর এ বলার ধরনটা, কাছে বেসে এল মদন।

লক্ষ্মী বললে, “তারপর, তোমার খবর কি!”

এ’ খবর কি’র মানে বুঝলো মদন। কি জানতে চায় ওর লজ্জাভিত্তি চোখছোড়া।
বুক ছুঁ-ছুঁর ঘেন-ঘড়ির ডায়ালে কি বাজছে বুঝতে পারে ও।

ছাইরঙ হয়ে গেল মুখ। পাশকাটিয়ে দিবি চলে গেলেই তো পারতো। একটু
টিপে টিপে চিলে চিলে পা ফেললেই চসতো। এমনতেই তো ও দেখতে পায়নি, জোরে
জোরে পা ফেলে এসে না ধরলে পেতোও না। আর গোটা কয়েক পা এগিয়ে ডানহাত
রাষ্টাটার ডুব দিয়ে পরলেই তো চলতো, ওতো সোজা চলে যেতো, যেমন যাচ্ছিল।

সংগে সংগে ভাসলো গুপথরের দাঁতন করার ভাগটা। ব্যাটা দাঁতন করছে না যেন
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ভেংচাচ্ছে। ছুনিয়ায় যেন ও একাই দাঁত মাজে! আর তো কারও দাঁত
নেই। কিন্তু শালা বা চামাড় আর বা গোঁয়াড়। এক সংগে কাজ করছে আজ এতদিন
চিনতে কি আর বাকী আছে এক রস্তু। একবার বলেছে তো বলেইছে। পরমা কমানো
তো দূরের কথা, তিন মাসের একদিন এ-পার ও-পার হলে ঠিক বেকে বসবে, কার সাধ্য
তখন ওর বাঁকা ষাড় সোজা করে। কামালকে ঠিক ডেকে বসবে। বাকী বকেয়ার কারবার
নেই ওর কাছে। আগে নগদা-নগদা কড়ি গোনো, তারপর। কিন্তু এ-দিকে যে ছ’কুড়ি
আরো চাই, সময় তো মাত্র একমাস। কত সাধ্য সাধনা করে এ ছ’মাসে, এক পরমা আধ
পরমা করে করে তবে জমিয়েছে এক কুড়ি। পান খাওয়া তো প্রায় ভুলেই গেছে, বিড়ি পর্যন্ত
ভুলতে চলেছে, একটা বিড়ি তিনবারে খায়। সাবান না কিনে শুধু জলে জামা কাপড় কাচে।
দাড়ি গোঁক, আগে কাটতো সপ্তাহে একদিন আর এখন ছ সপ্তাহে, আড়াই সপ্তাহে একদিন।

বংশী পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো, শালা—। টাকা নেয়ার সময়
এসো শালারা কত হাতে ধরবে, পায়ে ধরবে। ইনিয় বিনিয়ে কাঁদবে। ছেলে মর মর।
জেনানা আর এবার বাঁচল না। শালারা সব গুণ্ঠি শুধু মর-মর। তিরিশটা টাকা ভাই,
সাত পরমা চাইছ, দেব। আচ্ছা পঞ্চাশ দাঁও ছ’ আনা করে পাবে। সামনে মাইনে পেয়ে
দেব অর্ধেক, বাদবাকী সব পরের মাসে। কোন শালা কথার খেলাপ করে।”

আর এখন শালাদের দেয়াতো দূরের কথা, টিকিটির পর্যন্ত দেখা পাওয়া ভার। দেখলেই
মুখ ঘুরিয়ে ওপাশ দিয়ে কাটে। আর বলে কিনা, ছ’ আনা না ছ’ পরমা পাবে শালা—
একটা মাছ। আদমী যদি থাকে ছুনিয়ায়। আবার বলে কিনা অনেক দিয়েছি, আর না।
দিতে পারবে না তো নিয়েছিলে কেন, ফকোটির কাম চায় সকলে। আমিও বংশী, ছ-এক
আনা কেন আখলাও ছাড়বো না কোনো শালাকে। ষাড় ধরে গলায় গামছা দিয়ে গুণে গুণে
কড়ায় গুণায় আদায় করব, তবে আমার নাম। আপন মনে বিড়ি বিড়ি করতে করতে হাঁটতে
থাকে বংশী।

বাড়ি ঢুকতে-না ঢুকতে রফির কানে আসল আমিনার গলা। গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে।

ক্রকুচকে বিরক্তির সংগে এসে দাঁড়ালো উঠানে। চারদিকে ছোট ছোট মাটির ঘর, ওপরে টিনের চাল। উঠান বলতে ছোট এক চিনুতে জায়গা। কোণে স্থপাকার আবর্জনা, আরেক দিকে চার পাঁচটি উলঙ্গ বাচ্চা ছেলের গোলাকার, পুতুল খেলছে, জল দিয়ে কাদা তৈরি করে দিচ্ছে পুতুলের বিয়ে। পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে নাচছে বোচনের ছেলেটি, বাঃ কি আনন্দ, উঠানের উপস্থিত হৈঁচৈ হল্লা, চেঁচামেচি যেন ওদের কানে ঢুকছে না। নিষেধ নিষেধের নিয়ে মত্ত।

আমিনা বললে, “তুই মাগী তো রাত-বিরাত ঘরে থাকিস না। আবার অন্তরে বলছিস। আমরা বুঝি আর কিছু জানি না। মুখে বিচিত্র ভঙ্গী করে গলার বিচিত্র শব্দ তুলস।

ভাছুর বউ মতিয়া গলা বাড়িয়ে বলে উঠল, “আ-হা, লম্বা লম্বা কথা! আমার সোয়ামী ঘরের বউ কেলে গিরিবালাকে নিয়ে ঘর করে না। জানা আছে!” বলে মতিয়া হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘরে ঢুকল।

ওর হাত পা ছোঁড়ায় লম্বা পেল রফি।

“হরি আমার দরজায় বার বার ঘুর ঘুর করে না।”

প্রতিপক্ষের গলা পরিষ্কার শুনতে পেল না রফি। ঝগড়ার কারণ বঝতে পারল কলের জল। বস্তির সামনে একটা কল, জল পড়ে স্রোতের মতো। বালতি কলসী জমা হয় পর্বত প্রমাণ। কে আগে লাইন লাগিয়েছে এ-নিরে শুরু হয়েছিল কথা কাটাকাটি। আর কথা কাটাকাটি একবার যখন শুরু হলই, গলগলিয়ে বেকরতে লাগল বার পেটে যা ছিল। কথা নয়, কুখ্যা। হাজার হাজার বার বলা, শুধু নতুন ঢঙে, কপাল মেলে বাজখাই গলার।

আমিনা কয়েক পা এগিয়ে এসে একটা উলঙ্গ ছেলের কান ঘরে টেনে ভুলে ছেঁটড়াতে ছেঁটড়াতে নিয়ে চলল ঘরের দিকে, “ওঠ্ হারামজাদা, ওদের সংগে খেলতে না কতদিন মানা করেছি।”

পাশের এক ঘর থেকে ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে আসে হরির বউ শোনা। ষোল সতের বয়সের কালো দোহারা চেহারা। বললে, “এই মুখ সামলিয়ে কথা বলবি। আমার নামে আবার কেন।”

রফিকে উঠানে দেখে মাথা নামিয়ে ঘরে ঢুকল গিয়ে আবার।

রফিরই কি সম্পর্কীয় আত্মীয় শোনা। মাঝে মাঝে আসতো রফির এখানে বেড়াতে। সেই তো একদিন হরির সঙ্গে চোখাচোখি হল, তারপর।

সোনার বাপ অবশ্য প্রথম একটু আপত্তি তুলেছিল, শত হলোও অকৃতজ্ঞতের।

রফি গলা চড়িয়ে বললে, “জায়ে বাবা রাখ তোমার কটি নটি। ওসব বারু লোকদের

বোধার! আসল কথা মেয়েকে পুছ্ মন মজ্জেছে কিনা। খেয়ে পড়ে থাকবে সুখে, ব্যাস্।

আমিনা খেঁকি শেয়ালের মতো ছুটে এসে ঘর থেকে, “কি, কি বললি! তুই মুখ ঠিক কর। মুলো দিয়ে দাঁত কটা ভেংগে দেব।”

সোনা নীরব। দরজায় দেখা গেল না।

রফি তাকালো আমিনার দিকে। কংকালসার কালসিটে চেহারা, চোঁচালে দেখায় আরো বিল্বী। মাগীর গলায় কি জোর! আছে খালি গান্ধা গান্ধা গিলবে আর বছর বছর বিয়োবে। দাঁত দাঁত ঘষল ও, এগিয়ে এসে বারান্দার কাছে। শুনতে পেল বোচনের বউ জানকীর গলা ছেড়ে কারা। কান্নার সংগে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বলছে জানকী। বোচন ঘরে এসেই শুরু করেছে মার-ধর, দূর শালা—

কাজ থেকে আসলেই যেন লোকগুলি কেমন হয়ে যায়। কারখানার বিগড়ানো মটর ঠিক করে করে যেন নিজেরাই বিগড়ে যায়। রোজ রোজ, নিত্য তিরিশ দিন। আজ এবর; কাল ও ঘর। তাই-বা কেন সব ঘরেই খচ্-খচ্ শুরু হয়। একটা দিন-ও যদি এসে দেখে সব চুপচাপ আছে। একদিন-ও তো গিরিবালার মতো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে পারে এরা; কেমন শান্ত, স্থির। না, শালা বড় বেইমান ছনিয়া!

বিড়বিড় করতে করতে ঘরের দরজায় পা রাখে রফি। বাইরে গলার শব্দ পেয়ে পিছন কেঁবে।

ছোটলাল টলতে টলতে ঢুকল ভিতরে, পিছন পিছন ভোলা। গলা ছেড়ে জড়ানো গলায় অস্পষ্ট শব্দ করছে। লাল ডগডগে চোখ। উঠানের মাঝে বাঁশের খুঁটিটা জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল ছোটলাল, কঁাদ কঁাদ গলায় বলতে লাগল যা-তা’। ভোলা এসে চড়ে বসল ওর মাথার পরে, সুরে সুরে মিলালো।

রফির গলাটা সুরসুর করে উঠল।

ঘর থেকে বোচন বেরিয়ে এল।

আন্তে আন্তে রাত নামল। চিলের ডানা ধামল। বস্তির সামনে জোড়া নারিকেল গাছটার বসে বসে বোঁজের গন্ধ মুছে ফেলল চিলের ডানা। পিছনে ঝাপড়া অশ্রু গাছটা—যার ডালপালা বস্তির পরে ছাদের মতো ছড়িয়ে—বাহুড়ের ডানা ঝাপটানি খেয়ে এল। ডালে ডালে লুকালো কাক। পথ-কুকুর মাঝে মাঝে ধমকে গিয়ে চিংকার করে উঠল। রাতের বাতাস চিড় খেল মুহুর্তে। তারপর আবার বুকিবা ভুল বুকতে পেরে শুয়ে পড়ল কুকুর। অন্ধকার জোড়া লাগল।

শুধু এক কোণের একটি ঘরে ফিশ্ ফিশ্ গলায় বললে আমিনা, “এবার আর কোথাও যেতে পারবে না। কোনো দিকে না। ও সব ছেড়ে ছুড়ে দাও।”

কাছে এগিয়ে এসে রফি, বলল, “কোথাও তো আজকাল প্রায় যাই না।”

তবু বলল আমিনা, “না একদম পারবে না। কমম—তোমার জন্তে কত কি শুনতে হয়। ও সব ছেড়ে দাও।”

রুফি বলল, “আচ্ছা, আচ্ছা, একদম যাব না। আর—”

নীরব শুধু অস্থগ গাছের বাহুড়গুলির ডানা ঝাপটানি শোনা গেল কিছুক্ষণ। অন্ধকার রাতে ভয় পেয়ে ছ’তিনটা ডাক দিয়ে উঠল কাক।

কোন এক সময় বুঝি-বা ধেমো এল তাও।

রুফির গলা শোনা গেল, “আমাদের নাকি ছ’টাকা করে তলব বাড়বে, শুনছি। মালিককে বোধ হয় এবার খোদায় পেয়েছে—তিন মাসের বকেয়া-ও নাকি দেবে।”

“সত্যি?” অন্ধকারে চোখ মেলে ধরল আমিনা।

“শুনছি তো তাই। সত্যি-মিথ্যা কে জানে।”

আমিনা এগিয়ে এল আরো আছে, গায়ের উকতা লাগল রুফির গায়, মনে লাগল তার ছোয়াচ। বলল, “যদি ঠিক ঠিক মেলে, বাড়তি টাকা ক’টা রইল তোমার শাড়ীর জন্তে বরাদ্দ।”

উকতা আরো গাঢ় অনুভব করল রুফি।

“আমার শাড়ী এখন না কিনলেও চলবে। তোমার-ই নেই। আর নেই ছ্যাওরাল পানগুলোর।”

ছ’তিনটে পঞ্চকুর একসঙ্গে গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল। শব্দ পেয়ে নারকেল গাছের চিলটা নড়ে চড়ে বসল, পাতার ধপ্‌ধপ্‌ আওয়াজ হল। চিৎ করে ডাক দিয়ে উঠল। গাছে চলল পাখা ঝাপটানি, ছটফট, চিঁ-চিঁ, কা-কা।

চলল অনেকক্ষণ।

একটা কুর ধামে তো আর একটা শুরু করে চেঁচাতে। আরেকটা ধামে তো আরেকটা।

আরেক কোণে আর একটা ছোট ঘরে শোনা গেল, “ইস্‌ রাগ হল বুঝি।”

“যা-ও—” জানকী পাশ ফিরে শোয়।

“মাইরী। বোচন আরো কাছে এগিয়ে এল।

জানকী, ধুরল, বোচনের হাত ওর গলায়; বলল জানকী, “তোমাদের নাকি তলব বাড়বে?”

“কে বললে? আমি তো ভাবছিলাম হঠাৎ একদিন কটা টাকা বেশি দিয়ে তাক লাগিয়ে দেব।” বলল বোচন।

হাসল ওরা দুজনেই।

“মতিয়া বলছিল সেরকম যেন কি—”

কেবল বস্তির ভিতরের লোকই শুধু জেগে না।

বাইরে সামান্য দূরে একা শুয়ে শুয়ে ছ’টি হাত ছুঁড়ে মরন। এপাশ ওপাশ করছে যাববার। উঠে গিয়ে রাজ্য পায়চারী করে আসছে। ওর ঘুম নেই। চোখ বুঝলেই লক্ষ্মীর মুখের আদল ওঠে ভেসে। ঘোহারা গড়নের শরীরে লেপ্টে, গড়া আটপোঁড়ে শাড়ী,

লক্ষ্যাকাতর দীর্ঘায়িত চোখ জোড়া। হাটু ছুইছুই চুলের গোছ। নিতহাস ঠোঁটজোড়া
ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে সব সময়।

সংগে সংগে ভাসে গুণধরের ধামপ্রমাণ মাদারের ডালটা দ্বিগুণ দাঁতন করার বিচিত্র
ভংগি। হাত দু'টি ওর নাকের ডগার সামনে কি রকম ভাবে মেলে ধরেছিল। তিন কুড়ি
চাই, বাস, আর কোন কথা নেই। কিন্তু দু'মাস এত টানাহেচুড়া করে হয়েছে এক কুড়ি।
এখনও বাকী দু'কুড়ি, আর এক মাস।

যদি কোম্পানী বাড়তি তিন দু'শুশে ছ'টাকা দেয়, তবে যা' হোটক কিছুটা এগোল।
ব্যাটা, গুণধর শালা একেবারে কষাই। এক কানাকড়ি ছাড়বে না, অপেক্ষা করবে না
একদিনও। শ্রেফ ডেকে বসবে কামাসকে, তবে!

একটা বিড়ি ধরাল মদন, বসল এসে দাঁওয়ায়। কালো ঘুটুঘুটে কাঁচা ধোয়ার সুরু পথ
সামনে। দু'তিনটা কুকুর গুয়ে। লক্ষীর সংগে সেদিন দেখা হয়েছিল। জলের কলসি কাঁখে
কি সুন্দর-ই না দেখাচ্ছিল ওকে। কি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। কত দূর কি হল, জিজ্ঞাসা
করছিল। কিন্তু যদি না পারে টাকা জোগাড় করতে, কি ভাববে তবে ও। অক্ষম।

না, না, তা হয় না। যে কোনো উপায়ে জোগাড় করতেই হবে। দু'কুড়িতো!

বাড়তি টাকাটা যদি মেলে তবে অনেক পথ সুরাহা। হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় পারবে তবে।
কত আর?

লক্ষীর লক্ষ্যজড়িত চোখজোড়া কি সুন্দর! চুলের খোপা বাঁধলে কত সুন্দর দেখায়
ওকে। কি রকম কাপড় পরলে মানাবে ওকে। টিয়া রঙ, না আকাশী। টকটকে লাল
পরলে দেখাবে কেমন। না ফিকে নীলেই ভাল মানাবে। সে না হয় পরে দেওয়া যাবে।
ওতো আর ভেমন নয়। কেমন শান্ত, স্থির, সুন্দর।

কিন্তু, যদি না মেলে বকেয়া টাকা। আগের মতো যদি এবারও খবরটা কাঁকা হয়।
আগেও তো বারকয়েক শুনেছে এরকম কত কিছু। হবে হবে। হলো বলে। সব শেষে
অষ্টরস্তা।

খবরাখবর শুনেছে শেষমেষ, একটা চাল মেরে ম্যানেকার তিন চার মাস ওদের উস্কিরে
রেখেছে, কাজ বেশি আদায় করেছে। তাই যদি হয় এবারও!

নিখাস ছাড়লো মদন বড় ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে। বড় অসহায়।

গুণধরের চেহারা দেখতে পেল সামনে, আঁতকে উঠল, গলায় অসুট শব্দ হল, “শালা
চামার—”

অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে এল।

সিনেমার কাহিনী ও অভিনয়

সুধীরচক্র রায়

সিনেমা-বিষয়ে বর্তমানকালে অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসায়িক বা অর্থনীতিক দিক তো আছেই; তা ছাড়া আছে (১) সিনেমার কাহিনী তেমন মিলছে না; (২) অভিনয় অংশে কথার সংখ্যা কমানো প্রয়োজন; (৩) সিনেমা শিক্ষামূলক হবে কিনা; (৪) শিশু ও কিশোরদের সিনেমার সঙ্গে বয়স্কদের সিনেমা-কাহিনী পৃথক হবে কিনা; (৫) যৌন-আকর্ষণের ভাগ এবং দুষ্কৃতিকারীদের চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গল কি না।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি প্রথম দুটির কারণ অর্থাৎ ‘কেন ওরূপ হয়’ তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই আমাদের ভাবতে হবে, কেমন গল্প দর্শকদের আকৃষ্ট করবে, কেমন গল্প সহজে সিনেমার শিল্পীরা সম্পাদন করতে পারবেন।

দর্শকদের কথা যদি ভাবি, তবে দর্শকদের মনোগঠনের কথাও ভাবতে হবে। সমাজের কোন্ স্তর বা শ্রেণীর দর্শক সিনেমা বেশি দেখেন, তাঁদের মনোগঠন কিরূপ, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি কতখানি সজাগ। গ্রামের আবহাওয়ার যারা মানুষ তাঁদের মনোগঠন একরূপ হয়, শহরের অধিবাসীদের অন্যপ্রকার। গ্রামের সমাজ অনেকটা সুসংবদ্ধ, মানসিক জটিলতা তাঁদের কম, দেশের প্রথা আর প্রাচীন চিন্তা-রীতিকে যেনে তাঁরা প্রায়শ চলে থাকেন। শহরের অধিবাসীরা ঘনবসতিতে বাস করতে অভ্যস্ত, কিন্তু বিভিন্ন সমস্তার দ্রুততার সঙ্গে মনটি হ’য়ে পড়ে বিক্ষিপ্ত, দ্বন্দ্ব-স্কন্ধ। উভয় পরিবেশের ব্যক্তির চরিত্রেই বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু দর্শকদের সংখ্যার দিকে তাকিয়ে সম্পৃক্ত কাহিনী এবং চরিত্র অবতারণা করতে হবে, তবেই তা হবে বাস্তব। কিন্তু সমস্তা হচ্ছে এই, বর্তমান যুগ সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে দ্রুত-ভাবে মিশিয়ে ফেলছে। কাজেই খাঁটি-খাঁটি ভাবে, অবিমিশ্রভাবে, কোনো একটি বৈশিষ্ট্য আজ আর দর্শকদের মধ্যে দেখা যায় না। এই বিপদের জন্তে, সাহিত্যিকেরা সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের মনের গতির উপর নির্ভর ক’রে গল্প-কবিতা-উপন্যাস রচনা ক’রে থাকেন। দেশের অধিকাংশ লোক হস্তত তা বুঝতে পারে না, কিন্তু মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের মতামতই অধিকাংশ লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার ক’রে নেয়। বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় ধর্ম এই তাঁরা নৈব্যক্তিক বা নিরপেক্ষভাবে কিছুটা বিচার করতে পারেন। সাহিত্যিকের মতো সিনেমা কাহিনীকার সমস্তাকে অত সহজে সমাধান করতে পারেন না। কারণ পড়তে না-জানলে পড়া যায় না, কিন্তু আনন্দ উপভোগের আগ্রহ সকলের সমান, এবং চোখ থাকলেই সিনেমা দেখা যায়। কাজেই সিনেমা-কাহিনীকারের বিপদ এখানে সমধিক। তারপর

আছে সিনেমা-শিল্পীদের কথা। সিনেমাশিল্পী হিসেবে আমি ছুড়িয়োর কারিগরীর দিকের কথাই বলছি। সিনেমার ছবি নির্ভর করে,—আলোকব্যবস্থা, ক্যামেরা, শব্দযন্ত্র, দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা, ল্যাবরেটরী এবং সম্পাদনা বিভাগ। তারপর অভিনেতা। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সিনেমার কাহিনী খাড়া হয়, বা গ্রহণ হয়। এই বিভাগে শিল্পীর চেয়ে যন্ত্রের প্রভাব বেশি। যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয় বৈজ্ঞানিক পন্থায়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি কত সহজে আর অল্প খরচে বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তুলতে পারবে—তার উপর নির্ভর করবে বিষয়বস্তু। নাটক বা উপন্যাসে আছে সাহিত্যগত টেকনিক—সিনেমার কাহিনীতে আছে যন্ত্রগত টেকনিক।

অভিনেতাকেও এমনভাবে মানিয়ে নিতে হবে ঐ যন্ত্রের কলাকৌশলের সঙ্গে। যাত্রা বা থিয়েটারের অভিনেতার মতো সিনেমার অভিনেতা অতখানি স্বাধীন নয়। অভিনেতা এখানে অনেকটা যান্ত্রিক। থিয়েটারে অভিনেতা চরিত্র মার্কিন নিজের মনকে গঠন করে নিতে পারেন। মন-মেজাজ সেখানে একদিনের মতো বজায় রাখতে হয়। অল্প সময়ে মন-মেজাজের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। চরিত্রের মধ্যে অভিনেতা নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারেন কিছুকাল। কারণ থিয়েটারে প্রত্যেকটি দৃশ্য মন্থর। সেই বিশেষ দৃশ্যের মতো চরিত্রের রূপ, এবং সামগ্রিক চরিত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া—এই দুইটি কাজের জন্যে অভিনেতা নিজেকে তৈরী করতে অনেকখানি সময় পান। কিন্তু সিনেমার দৃশ্য সমগ্র চরিত্রটি নিয়ে নয়। চরিত্রটি দৃশ্য বা অঙ্কে ভাগ-ভাগ করা নয়; ভাগ করা ‘সেট’ আর ‘শট’ এর ছেদে ছেদে। একটা সুর সমগ্র অঙ্কে জাগিয়ে রাখবার মতো অভিনেতার সুযোগ নেই এখানে। ক্যামেরার পরিমাপে ‘শটের’ ছেদে ছেদে চরিত্রকে ফোটাতে হবে, অথচ আগাগোড়া সামঞ্জস্য থাকা চাই। বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্যে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, একটি নায়ক বাড়ি থেকে ঝগড়াকাটি ক’রে বাইরে বেরিয়ে গেল, গেল নার্সিকাটির বাড়ি। এই দৃশ্যটি নাটকে যদি থাকে, তবে ঝগড়াকাটি এবং বেরিয়ে যাওয়া একটি দৃশ্যে অভিনেতা দেখাতে পারেন, এবং পরবর্তী দৃশ্যে নার্সিকার বাড়িতে পথে চলবার সময়কার মনের অবস্থার বেশ টেনে কথা জুড়তে পারেন। এই মনোভাবটি অভিনেতাকে মাত্র আধ ঘণ্টা হয়ত বজায় রাখতে হয়। কিন্তু সিনেমার চারটি ‘শট’ নেওয়া হয়; ‘সেটে’ ঝগড়াকাটি, বেরিয়ে যাওয়ার গতি এককভাবে, রাস্তার চলবার দৃশ্যটি, এবং নার্সিকার বাড়িতে উপস্থিতি। এই চারটি ‘শট’ একদিনে হয়ত নেওয়া যায় না, কারণ ঐ ‘সেটে’র গোলমাল। প্রায় সম্ভবতঃ অনেক ঐ মনোভাবটি নায়ককে অবলম্বন করে রাখতে হয়। এর মধ্যে অল্প দৃশ্যের ‘শট’-ও কিন্তু চলল। ধারাবাহিক নির্দেশে ঠিক ‘শট’ এবং সম্পর্কীয় মনোভাবটি তাঁকে হুকুম-মাত্র জাগাতে হয়। এখন এই ব্যাপারটি বড় অভ্যাসের ব্যাপার। মনোভাবটি অনেকটা যন্ত্রবৎ তাঁর মধ্যে কাজ করবে।

কাছেই সিনেমা-কাহিনীকারের পক্ষে এইসব বৈশিষ্ট্যের কথা জেনে কাহিনীতে হাত দিতে হয়। এইখানেই কিন্তু সব শেষ নয়; সিনেমার কাহিনী কেমন যেন ভরাট হয় না; একটা আলুগা-আলুগা ভাব থাকে। তার কারণ অনেকটা পরিচালক আর যন্ত্র-বিদদের

ক্রটি। নরেশ মিত্রের পরিচালনার ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’খানি বেশ ভরট, বিমল বারের ‘দো বিদ্যা অমিন্’ ভরট কিন্তু ‘চাষীর জীবন’ অংশ আর ‘রিক্সাওয়ালার’ অংশ পৃথক হ’য়ে আছে। সাধারণভাবে দেখা যায় ছোট গল্পের ধর্মবিশিষ্ট কাহিনী অংশই সিনেমাতে পরিমুদ্রিত হয় বেশি ; উপন্যাস—বেখানে গল্প বেশ আড়ে-বহরে বীরগতিতে অগ্রসর হয়—তেমন মুটে ওঠে না।

এমন দেখা গেছে, ভালো উপন্যাস সিনেমায় এসে যার খেয়েছে। ‘শেষের কবিতা’ ছোট-গল্প ধর্মী ; কিন্তু ‘অমিত রায়’ চরিত্রটি যদি বইয়ের মতো ছবিতে মুটে না ওঠে—তবে দায়ী করব কাকে ? অভিনেতাকে ? ‘গোরা’ উপন্যাস যদি ছবিতে সার্থক না হয় তবে কি অভিনেতা দায়ী ? বাক্কুশলী অমিত রায় এবং তাকিক গোরা চরিত্র সিনেমাতে ফোটাতে হ’লে বই ছটির গল্পাংশ এমন রাখলে চলে না। ওখানে কাহিনীকে সিনেমা-টেকনিক অনুযায়ী এমন ঢেলে সাজা দরকার, যে-ক্ষমতা খুব প্রতিভাশালী পরিচালক আর কাহিনীকার ছাড়া সম্ভব নয়, ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য চরিত্রটিকে ফোটানো সিনেমার ধর্মে সহজ ; তাই বলে যোগমায়ার চরিত্র তেমন সহজ নয়। যোগমায়ার চরিত্রে এমন একটা দিক আছে যা অভিনয়ে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ‘এতো আগমন নয়, আবির্ভাব’ ব্যাপারটি লেখক শব্দের উপর জোর দিয়ে যত সহজে বর্ণনা করতে পারেন, অভিনেতার পক্ষে তা সহজ নয়। এখানে পরিচালকের উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া বিশেষ প্রয়োজন। অথচ কেটি মিটার কত সহজ। তার আচরণ-ই তার চরিত্র ; কাজেই অভিনেতার পক্ষে প্রকাশ করবার সুযোগ থাকে। পরিচালকের কৃতিত্ব দেখতে পাই, ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ বইটিতে। ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ নার্সিকার ভূমিকা কম ; কিন্তু নার্সকের মনের সুরটি জাগিয়ে রাখল গীতাংশ। গানের ভূমিকা আর দৃশ্যসজ্জা ছবিটিকে ভরট ক’রে দিয়েছে। কিন্তু এই গান দিয়ে তো আর ‘স্বামীজী’র ছবিকে ভরট করা যায় না। ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ বইটি থিয়েটারে ফোটানো যাবে কিনা সন্দেহ, তর্কমূলক কাহিনী অংশ সিনেমায় ফোটানো যেমন সম্ভব নয়, দৃশ্যমূলক কাহিনীকেও তেমনি থিয়েটারে রূপায়িত করা সহজ নয়। ও-ছটির ধর্ম আলাদা। কাজেই, সিনেমার গল্পাংশ ভালো সাহিত্যিক হ’লেই যে সিধতে পারবেন, এমন কোনো কথা নেই। যন্ত্র মাধ্যমে কাহিনী বলবার ক্ষমতা যাদের নেই, তাঁদের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু কাহিনী গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকলেও যন্ত্রবিজ্ঞান জেনেও কিন্তু কাহিনী রচনা করা যায় না। কাহিনীর পর তাকে পরিবেশন করবার দায়িত্ব পরিচালকের। ‘অগ্নি-পরীক্ষা’ ছবির উপযোগী বেশ কাহিনী। আশাপূর্ণা দেবীর সংলাপ আর চরিত্রগঠন সিনেমাধর্মী। কিন্তু অগ্নি-পরীক্ষায় কোথায় যেন অভাব থেকে গেল। কারণ কি ? একটু আলোচনা করলেই ‘কারণ’ ধরা পড়বে। ‘অগ্নি-পরীক্ষা’র ঘটনা মুর্সোরীর পাহাড়ে আছে, গ্রামে আছে, শহরে আছে। কিন্তু বইয়ের দৃশ্যের প্রতি পরিচালক যতটা নজর দিয়েছেন, শহরের দৃশ্যে অতটা নয়। সবই আছে—কিন্তু সূক্ষ্ম নয়। বারবার মোটর ঘোরানো আর নার্সিকার বাড়িতে এনে দাঁড় করানো—পূর্বের দৃশ্যগুলির ধারার সঙ্গে খাপ খায়নি। অথচ ‘বকুল’ বা ‘ছেলে কান’ বই ছটিতে এই ক্রটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু ‘বকুলে’ ‘অগ্নিপরীক্ষা’র মতো আবেদন

সৃষ্টি করতে পারেনি। তার কারণ অবশ্য অন্তর্ভুক্ত। আবার, ‘শুভযাত্রা’তে আবেদন থেকেও তরাট হ’ল না। তার কারণ কাহিনী-অংশ মনের একটি বস্তুর উপরই পাক খাচ্ছে। ‘ছেলে কার’ ছবিতে সেই একটি বস্তু আছে—পাকও খাচ্ছে কিন্তু কত বিচিত্রভাবে ঘুরছে। এইসব স্থানে পরিচালকের দায়িত্ব অনেকখানি। কিন্তু বেশির ভাগ পরিচালক চিন্তাভীরু; তাঁরা একটা সোজা পথ বেছে নেন,—ক্ল্যাশ-ব্যাংক করা কিংবা ‘সুপার ইম্প্যাক’ করবার পদ্ধতি। সত্যি কথা বলতে কি, এই ‘ক্ল্যাশ-ব্যাংক’ বা ‘স্বপ্ন দেখা’ পদ্ধতি কাহিনীকেও যেমন দুর্বল করে, তেমনই অভিনেতাকেও বঞ্চিত করে। ‘ক্ল্যাশ ব্যাংক’ এবং ‘স্বপ্ন দেখা’ ছবির প্রাচুর্যে অভিনেতা অভিনয়ের সৃষ্টিশীল প্রকাশ-ক্ষমতা সম্বন্ধে পন্থ হ’য়ে পড়েন।

এত সব অনুবিধার বসেই সিনেমার কাহিনীকার সাধারণত ‘প্রেমের বিচিত্র গতি’কে নিয়েই গল্প লেখেন। দর্শকসমাজ এই বৃত্তিটির সঙ্গে অতিপরিচিত ব’লে কাহিনী অতি সহজেই আবেদন এনে থাকে। দেখামাত্রই দর্শক নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাড়া পায়। দর্শকদের আর শ্রেণীভেদ করতে হয় না; সমাজের জ্ঞান না থাকলেও কাহিনীকারের চলে। কিন্তু কোনো জিনিষ ‘আপ’সে’ হলেই যে তা স্বাভাবিক আর সুস্থ হবে সে কথা কিন্তু সত্য নয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সাহিত্য হিসাবে আমাদেরই বাংলাদেশে গল্পের উপাদান সমাজের কত বিভিন্ন দিক থেকে সংগৃহীত হচ্ছে; কিন্তু সিনেমায় সেই উপাদানপ্রাচুর্য নেই। দেশ বন্ধ্য নয়, যথেষ্ট সার্থকনামা কথাসাহিত্যিক আছেন; কিন্তু সার্থকনামা সিনেমা-কাহিনীকার নেই। প্রেমের ব্যাপারটি যেমন সর্বজনবোধ্য, তেমনই সমাজে আরও অনেক সর্বজনবোধ্য মনোভাব আছে। সিনেমা-কাহিনীকার বিশেষ ক’রে কথাসাহিত্যিকের আদিক অনুসরণ করেন ব’লেই, তাঁদের সৃষ্টি এমন ব্যর্থ হ’তে বসেছে। কথাসাহিত্যিকের প্রধান অবলম্বন কথা। যেখানে ঘটনা-সংঘাতে চরিত্র সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, সেখানে কথাসাহিত্যিক নিজের মস্তব্যে চরিত্র প্রকাশ ক’রে দেন, তাঁদের গল্পে নাটকীয় গুণের চেয়ে লিরিকের গুণ বিশেষ ক’রে থাকে। সিনেমা কাহিনীকারকে নাটকীয় গুণ, নৈর্যাত্তিকতা অর্জন করতে হবে। ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্র প্রকাশ করতে হবে। ঘটনাসম্মত অর্থ বহু ঘটনার সমাবেশ নয়; ‘চুলী’তে বহু ঘটনার সমাবেশ আছে, ‘মরণের পরে’ও বহু ঘটনা আছে। কিন্তু সেখানে ঘটনাসংঘাত নেই; তবু দর্শকেরা তৃপ্তিপেল কেন (জানি না তৃপ্তি সকলেই পেয়েছেন কিনা)। তার কারণ কোনোটাতে আছে ‘মেলোড্রামাটিক’ ভাব, কোনটিতে আছে ডিটেকটিভ গল্পের রহস্য-রোমাঞ্চ আর অভিনয়দক্ষতা। তবু অভিনয়কে ব্যাহত এসব অংশে করে। ‘তথাপি’তে যে প্রণতি ঘোষ ছিলেন, ‘মরণের পরে’ও তিনিই আছেন। কিন্তু ‘তথাপি’র অভিনয়-দক্ষতা তিনি এখানে দেখাতে পারেননি। দেখাতে পারেননি ভান্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-ক্রটি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নয়, ক্রটি আছে কাহিনী-গ্রন্থে। ‘চুলী’তে নীতিশ বুদ্ধোপাধ্যায় হেরে গেলেন, প্রশান্তকুমার ‘ট্র্যাভেলিং’র সুরে যা কিছু জিতে গেলেন। ‘চুলী’র কাহিনীতে অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়, নায়কের ভূমিকায়। ছোটবেলায় যে-ছেলেটি সমাজের সব নির্দেশ উপেক্ষা ক’রে মন্দিরের বেদীতে উঠে যায় সংগীতের আহ্বানে

সেই উদ্বেগ আর বাধাকে তুচ্ছ করবার ক্ষমতা পরিণতকালে দেখা যায়নি। কারণ পরিণত কালটি বেন নতুন ক'রে শুরু হ'ল। গেরো ভাব নিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে সে শহরের আবহাওয়ায় এল। 'দো বিঘা জমিন'এর কৃষক ছেলেটি শহরের সঙ্গে যেমন সুলভভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, চুল্লীর প্রতিভাশালী নায়কচরিত্রটি তেমন পারছেন না; একে দেখলে করুণা হয়, মন খুশি হয় না। অনেক ঘটনা আছে কিন্তু সংঘাত নাই। আবার বহুশব্দে ছবিতে নায়িকার চরিত্রটিও অমনি। অনেক সংঘাত আছে কিন্তু ঘটনা নেই। তাই 'নদ ও নদী'র অক্লান্ততা এখানে মানসিক দৃষ্টি কোটাতে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। সিনেমার কাহিনীকারকে এই দৃষ্টি-সংঘাত আর ঘটনা-সংঘাতকে মিলিয়ে নিতে হয়।

সিনেমার কাহিনীকার অজ্ঞাতসারে ঠিক পথে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু অজ্ঞাতসারে ক'লেই লক্ষ্যচ্যুত হ'য়ে পড়েন। সেই কথাটা কিছু বলা যাক। সিনেমা চলমান। বড় দ্রুত এর গতি। চোখ-কান-মন নিয়ে দ্রুত বুঝতে হয় এই চলমান ছবির বক্তব্য। তিনটির সহযোগ কিন্তু সহজ নয়। হয় চোখের ক্ষমতা বড় হবে না হয় কান অথবা মন। মন স্বভাবতই একটু ধীরে চলে; বিশেষ ক'রে অপরিচিত বস্তুর সংস্পর্শে। ধীরেটো মন সময় পায় ভাবতে। সিনেমায় চোখ সময় পায় না। চোখ সবসময় সজাগ থাকে এখানে, কিছু যাতে বাদ না যায়। কিন্তু মনকে তো উপেক্ষা করা যায় না; তাই দেখবামাত্র মনে পৌঁছে যায়, এমন অভিনয় ভঙ্গিমা, এমন ইঙ্গিত, এমন ঘটনাবিস্তার, এমন অভিজ্ঞতাই সিনেমাতে থাকতে হবে। কালেই বিষয়বস্তুতে প্রেমের দৃষ্টি, পরিচিত অভিনয় ভঙ্গিমা, পরিচিত সমস্তা সিনেমা কাহিনীকার অবলম্বন করছেন। পথটি নিঃসন্দেহে ভালো।

মনের কথা একটু বলি। 'চিন্তা' সৃষ্টি হওয়ার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরটি—পরিচিত বস্তুটিকে আশ্রয় ক'রে বটে—যেমন কুকুরকে দেখামাত্রই চিনতে পারলাম। কিন্তু শেয়াল যখন নতুন দেখলাম, তখন কুকুরের সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখি—সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে নতুন চিন্তা এল, এটি কুকুর নয়; এইটি চিন্তা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয়স্তর অল্পবয়স্ক প্রণালীতে চলে: পরিচিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে তৃতীয় স্তরকে কল্পনা করা হয়; যেমন জ্যামিতির উপপাদ্য থেকে অঙ্কনশিল্পীর সমস্তাকে সমাধান করা হয়। এই তৃতীয় স্তরটিতে প্রথম দ্বিতীয় স্তর থেকে অধিক সময়ের প্রয়োজন। সিনেমার কাহিনী এই তৃতীয় স্তরের চিন্তা বা অভিজ্ঞাকে ভাগাতে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। যেমন ব্যর্থ হয়েছে 'আওয়ারা' ছবিতে উত্তরাধিকার গুণ আর পরিবেশ সমস্তা বোঝাতে। 'আওয়ারা' হয়ত দর্শকেরা উপভোগ ক'রেছেন কিন্তু যে-সমস্তাকে বোঝাতে চেয়েছেন কাহিনীকার, তা বোঝা গেল না। অবশ্য বোঝানো যে যায়-ই না এমন কোনো কথা নেই। ভিখারীদের সমস্তাকে বোঝাতে 'মিরাকলুস অব মিলান' সার্থক সৃষ্টি। কিন্তু বলতেই হবে যে, সেখানে চিন্তা প্রক্রিয়ার তৃতীয় স্তরটি আছে। ঘটনাকে এমন বিস্তার করা হয়েছে যে যেটি দ্বিতীয় স্তরের চিন্তায় আসতে পারত, তাকেই অতিপরিচিত করে প্রথমে স্থান দিয়ে তৃতীয় প্রক্রিয়াটিকে দুইয়ের কোঠায় টেনে আনা হয়েছে। ঘটনাসংঘাতই এমন বিস্তৃত। চিন্তা-প্রক্রিয়ার এই

ব্যাপারটি জানলে সিনেমা-কাহিনীকার সিনেমার কাহিনীকে সাহিত্য করতে গিয়ে ভুল করবেন না। নাটক সাহিত্য, কিন্তু সিনেমার কাহিনী সাহিত্য হ'লে বিপজ্জনক।

অতএব সিনেমা-কাহিনীর সংলাপও সহজগ্রাহ্য হবে। ভাষা বা শব্দযোজনার কথাই কেবল বলছি না। সমাজের মানুষ যেকোন কথার আর কথার যেকোন ভঙ্গিমায় অভ্যস্ত তেমন কথা আর বাচনভঙ্গিই সংলাপে ব্যবহার করতে হবে। অপরিচিত শব্দ আর অপরিচিত বাক্যরীতি সিনেমার দর্শকের পক্ষে সহজ হবে না; সংলাপের আবেদন ব্যর্থ হবে। অতি সহজ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে অতি সহজ চিন্তাধারা আর সমস্তকে ফোটাতে হবে। 'ওরা থাকে ওধারে'-এর যে সংলাপ এত আবেদন এনেছে, তার কারণ ঐটি, 'রূপকথা'র সংলাপও এমন গুণ নিয়েই এসেছে। 'রত্নদীপে'র সমস্তা এমনি পরিচিতই। কিন্তু 'নদ ও নদী'র সংলাপ যতই সাহিত্যসমৃদ্ধ হোক সমস্তা আর চরিত্রকে ফোটাতে পারেনি। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র ব্রহ্মচারী সমস্তা পরিষ্কার হ'ল না; পরিচিত করার জন্য স্পষ্ট ক'রে তোলাও হ'ল না, অথচ অভী ভট্টাচার্যের অভিনয়ে তো কোন খুঁত ছিল না। ঐ ছবির নায়কও তেমন স্পষ্ট হ'ল না, কারণ দোষ ছিল সংলাপে। একথা কিন্তু ঠিক নয় যে, সমস্তার মধ্যে নতুনত্ব থাকবে না। শুধু বলবার কথা এই সমস্তাকে এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে সমস্তা-বোধটি চিন্তা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরেই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে যেতে পারে। সিনেমার দর্শক থিয়েটারের মতো 'দেখতে দেখতে ভাববে' না, বই পড়ার মতো 'ভাবতে ভাবতে পড়বে' না। এখানকার দর্শক দেখামাত্রই সমস্তাকে পরিচিত ব'লে মেনে নেবে—চিন্তার কোনো ধাক্কা লাগবে না; শুধু ছবির রেশ পরবর্তীকালে একটু ভাবতে পারে মাত্র।

অভিনয় অংশও সেই কথা। অতি-পরিচয় ভঙ্গি তাঁরা ছুটিয়ে তোলেন বটে কিন্তু সব বইতেই একরকমের ভঙ্গি দর্শককে আনন্দ দিতে পারে না; ঐ ভাবেই তো অভিনয়ের যুজ্জা-দোষ দাঁড়িয়ে যায়। কি করতে হবে তাঁদের তা হলে?

মনের আচরণের ছোটো ভাগ আছে; মনের ভেতর আবেগের কোন কিছু অবশিষ্ট না রেখে যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে তার সবখানি রূপ দেই তাকে বলতে পারি বহির্জগতির দিক আর, মনের গভীরে একটি ভাবের আলোড়ন চলছে তার অনেকটাই বাইরে প্রকাশ করতে পারছি নে বা চাইনে সেই ভঙ্গিমাতে বলা যাক অন্তর্জগতির দিকে। আচরণের বাইরের দিকটি দেখলে দর্শক মনোভাব সহজেই বুঝতে পারে। 'প্রেমে পড়া চোখ' দেখলেই বুঝতে পারলাম 'প্রেম হয়েছে।' কিন্তু সহজেই যা বুঝতে পারলাম তাই যে দর্শককে আনন্দ দেবে তা কিন্তু নয়; মনকে নিঃশেষ ক'রে প্রকাশ করলে দর্শকের চিন্তে আলোড়ন তোলে না। থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমার অভিনয়ের এখানে পার্থক্য আছে। সিনেমার থেকে থিয়েটারে একটু মোটা ভুলির প্রয়োজন হয়; কিন্তু সিনেমার ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রী একেবারে চোখের সামনে এসে পড়েন; চোখ-মুখের সামান্য পরিবর্তনও দর্শকের লক্ষ্য করতে বাকী থাকে না। এখানেও সমাজের মানুষের চিন্তাস্তরের সঙ্গে অভিনেতার প্রকাশ-যুজ্জার পার্থক্য ঘটবে। বাঙালীর স্বভাবটি একটু অন্তর্দর্শনের। উত্তর-ভারতের অধিবাসীদের মতো বাঙালী এতটা

বহিরুদ্ভি-স্বভাবের নয়। কাজেই হিন্দী সিনেমা-অভিনেতাদের হাত-পা নাড়াকে অনুকরণ করা বাঙালী সমাজের অভিনেতার পক্ষে সুস্থতা নয়। হিন্দীতে অভিনেতা-অভিনেত্রী সব কিছুই খোলাখুলি ব'লে দেয়। যেখানে সংলাপ নেই, সেখানে তাই গান আছে। সমাজের গুরু-ভেদে এই বাক্যবহুলতা এমনি ক'রে আসে। একসময়ে ইংরাজী নাটকেও তাই স্বগতোক্তি প্রচলিত ছিল। কিন্তু লেখক আর দর্শক যখন উপলব্ধির গুরে আর একটু এগিয়ে এসে তখন এই স্বগতোক্তি বর্জন করা হ'ল।

আমাদের বাঙালী দর্শকসমাজও তাই সিনেমা-অভিনয়ে কথার সংখ্যা আর মুদ্রা বাহুল্য বেশি পছন্দ করেন না। তবু এই ব্যাপারটি ব্যবহার করা হয় কেন? পরিচালনা আর যন্ত্র-কৌশলের যে-স্তরে আমরা আছি তাতে এইটাই সহজ। বিচ্ছিন্ন 'শটে'র মধ্যে যে মনোভাবের ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে তা কথার সাহায্যে সম্পন্ন করা সহজ। কথার ছন্দ অনেক সময় মনের আবেগ সৃষ্টি করে। কাজেই আমাদের সিনেমার অভিনয় অংশে কেবল ঠাসবুননী কথা।

এমনি ক'রে সহজপথে অভিনয়ে হস্তপদ সঞ্চালন, চোখের ভঙ্গি, আর বাক্যবিস্তার এসে জুটেছে। সহজপথ কিন্তু বড় গতানুগতিক। দিনের পর দিন সিনেমা তাই একঘেয়ে হয়ে উঠছে। সাধারণদর্শক প্রথমদিকে এই একঘেয়েমি ধরতে পারে না। কিন্তু সমালোচকেরা ধরতে পারেন, ধরতে পারেন অভিনেতা-অভিনেত্রী। ধীরে ধীরে ভট্টাচার্যের পোশাক বদলে—কিন্তু কথার ভঙ্গি নয়; অথচ শব্দ মিত্র সেই অভিনয় দিকে বেশ বৈচিত্র্য আনেন। উত্তমকুমার সিনেমার অভিনয় শুণ একটু বিলম্ব আদৃত করেছেন; তবু বঙ্গব তিনি বৈচিত্র্য আনেননি। নবীন মিত্রের 'অল্পপূর্ণার মন্দির' দেখলেই বোঝা যায় এই প্রবীন অভিনেতা অবিরাম কেমন গতিশীল মন নিয়ে এই শিল্পের দিকে এগিয়েছেন। অথচ গুপ্তদা-কে বাদ দিলে (বাদ অবশ্য দেওয়া যায়ই না) ছবি বিশ্বাস সেই একই ব্যঙ্গার পড়ে আছেন। জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় সিনেমার পক্ষে আজও স্বাভাবিক হ'ল না। অথচ এই স্বাভাবিক কত কাল আগে দুর্গাদাস আর প্রমথেশ বড়ুয়া ধরেছিলেন।

সিনেমা আলোক-প্রতিফলিত থিয়েটার নয়। থিয়েটারের চেয়ে সিনেমা ধারণা কি ভালো সে-কথা আলোচনা করছি না। থিয়েটারে কৃত্রিম বাচনভঙ্গি শিল্পসৌন্দর্যে প্রতিভাত। পাথরে-কাটা মূল আর সত্যিকারের মূলে পার্থক্য আছে। পাথরে-কাটা মূলে অনেক কৃত্রিম রেখা—তবু তা সত্যিকারের মূলে থেকেও মনোবয়। কিন্তু সিনেমার কৃত্রিমতা অত্যন্ত দৃষ্টিগোচর। জনসাধারণের সাধারণ ব্যবহার, বীচনভঙ্গির চিন্তাধারা প্রভৃতি একটু এদিক-ওদিক হলে আর উপায় নেই। সিনেমা বর্তমান যুগের নিজস্ব। অতি হিসেব নিকেশী ব্যাপার। সিনেমা কাহিনীকারকে সেইভাবে জনসমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বুদ্ধির সঙ্গে মিশে যেতে হবে।

'দো বিধা জমিন'-এ দুই বিধা জমি যে নেই—একথা দর্শকেরা ধরতে ভুল করেননি। কিন্তু কাহিনীর তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এবং মূল উপাদান বিষয়ে ঐ ছবিটির অনেক ক্রটি থাকলেও—অভিনয় আর যন্ত্রকৌশল এমন সহজ আর স্বতঃস্ফূর্ত যে পল্লের ঐ কাকি কেউ

ধরতে চাননি। অবশ্য যুগোপযোগী প্রকাশভঙ্গিমারও পার্থক্য আছে। ত্রিচৈতন্যের ছবিতে সূচিত্রা সেন 'হ্যাঁ বিষ্ণু প্রিয়া' যে ভঙ্গিতে বলেন তা মধুর এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ ভঙ্গিটিই যখন অগ্নি পরীক্ষাতে 'বীরভাব মেয়েদের ভালোই লাগে' কথা প্রসঙ্গে বসলেন তখন তা অস্বাভাবিক। অথচ 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' বা 'চুলী'-তে তাঁর কোথাও কৃত্রিমতা নেই।

বারবছর আগেকার সমাজরীতিতে অভিনয়ে যে আবেগ-প্রবাহ রাখা স্বাভাবিক ছিল, সুবেলা কথা-বা অমুদ্রিত পত্র, আজ কিন্তু তা অমুদ্রিত করা যায় না। এ-কথা পাহাড়ী সাক্ষাৎকার বাচনভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়; অথচ চরিত্ররূপায়নে তিনি কতই না স্বাভাবিক এবং দক্ষ। পাহাড়ী সাক্ষাৎকার সুরেলা বাচনভঙ্গি তখন অমুদ্রিত করেছে দর্শক সমাজ, কিন্তু দর্শক সমাজ নিজের অন্তরের সত্যটি দিয়েছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার ভঙ্গিটিকেই। বড়ুয়ার সেই সহজ বাচনভঙ্গি যুগ ছাড়িয়েও স্থায়ী হ'ল। তাই তাঁর ধর্মটি আমরা দেখতে পাই বিকাশ রায় আর অরুণাথী মুখার্জীর মধ্যে। অরুণাথী মুখার্জীর অভিনয়ে একটা সহজ দিক আছে যা সিনেমার পক্ষে সত্যিই উপযোগী। ঐ-যে বঙ্গবীর পূর্ব যুদ্ধের ভঙ্গিমায় বাচনের ধারাটি প্রকাশ করে দেওয়া ওর মধ্যে এমন একটা আবেদন থাকে যা দর্শকের অনুভূতিকে অভিনেত্রীর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়; এই কোণলই কিন্তু রয়েছে রাইকমলের কাবেরী বসুর অভিনয়ের মধ্যে।

উপসংহারে পূর্বের কথাগুলি জের টানছি, সিনেমা-কে সার্থক করতে হলে এর প্রত্যেকটি বিভাগের অংশগ্রহণকারীদের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন; তার সঙ্গে প্রয়োজন দেশের অতি-পরিচিত ভাব-ভাষা-ভঙ্গির ব্যবহার; এমন কি সিনেমার নাম-লিপিতে বানান ভুলও অঙ্গহানি ঘটায়।

অশ্রুপতী

ভূর্গেবিভ

অনুবাদ : শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাট্টা

অশ্রু শরীর একটু সামলে উঠতেই জমিদার মশায় আমার ডেকে পাঠালেন। তাঁকে দেখে সেদিন আমি ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম মনে আছে। চোখের কোলে কে যেন নীলের ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। সমস্ত মুখখানি ফুলে পড়েছে শিথিল হয়ে। শুধু সেই হাসিটি তখনও লেগে আছে মুখে। চিরদিনের মত সেদিনও হাসি মুখে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে, তবু বললেন—‘এবার তুমি সংসারে একা পড়বে সুসি। চালাক মেয়ে হয়ো—তাহলে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। সংসারের হাটে লেনদেন করে করে চুল পাকিয়েছি। বড়ো মানুষের কথাটা তুমি মনে রেখো। আমার ভাইকে তোমার কথা বলে গেলাম। সে তোমার দেখাশুনা করবে। তোমার সঙ্গে উইলে আমি কিছু সম্পত্তি লিখে দিয়েছি। তাইতে সামলেসুমলে চললে তোমার কোনরকমে চলে যাবে। যাই হোক সাবধানে থেকো। চিরকাল ত আর আমি থাকব না। মানুষের থাকার কথাও নয়। একদিন যেতে-ত হবেই। এই কথা তোমায় বলে গেলাম। আচ্ছা, সুসি তুমি যাও।’

মায়ের মৃত্যুর পর যেদিন আমাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেদিনও আমার মনে যেমন হয়েছিল আজও তেমনি হল। একবার ভাবলাম বলি—‘আমি ত আপনার মেয়ে। সেই কথা আমার বলে যান।’ কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবলাম হৃদয়ের এই আর্ত কান্নার ভাষা হয়ত তিনি বুঝবেন না। হয়ত ভাববেন আমি তাঁর সম্পত্তি, তাঁর ধনদৌলতে দাবী জানাতে চাইছি—আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। কিন্তু সে কথা আমি কি করে বলব? পৃথিবীতে কোনো কিছুর বিনিময়েও ত সে-কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না এই মানুষটির কাছে। এত বড়ো নিষ্ঠুর মমতাহীন পুরুষ, যিনি সব জেনে শুনে একদিনও আমার মায়ের নাম মুখে আনেননি আমার সমুখে, তাকে আমি উপযাচিকা হয়ে কি করে এত বড়ো কথাটা বলব? যার চোখে আমার উনিশ বছরের জীবনের কোনো মূল্য নেই, আমার পিছুলের কোনো পরিচয় জানি কিনা সে-সবকে যার এতটুকু কৌতুহল বা মাথা ব্যথা নেই, তার সামনে ভিকার অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে আমার মন বিজোহী হয়ে উঠল। হয়ত তিনি ভেবেছেন যে আমি জানি সব কথা। তাই তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। হয়ত বা চান না একটি ডাগর মেয়ের সুখ-সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হতে—তার তরুণী কণ্ঠের সুখ পাঠের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে। নিজের স্ত্রীকে মর্যাদা দেননি। নিজের মেয়েকে

মর্যাদা দিলেন না। না দিন। এত বড়ো অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে একদিন ঈশ্বরের দরবারে হাজির হতে হবে। কৈফিয়ৎ দিতে হবে সব কিছু।

যখন মানুষের শিওরে এসে দাঁড়ায় মৃত্যুদূত তখন ইহলোকের মায়াও তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরে। তখন মৃত্যুপথযাত্রীর পিপাসিত চোখ প্রিয়জনকে দেখতে চায়। পিপাসিত শ্রবণ শুনতে চায় প্রিয়জনের অমৃতভাষ। কিন্তু তিনি তা শুনতে পাবেন না। বেঁচে থাকতে কোনো দিন তাঁকে বাবা বলে ডাকতে দেননি আমার। আজ যত কষ্টই হোক মৃদু কানে আমি সেই মধুস্বর শব্দ পৌঁছে দেব না। মাকে যত কাঁদিয়েছেন তিনি, তার জন্তে ক্ষমা করব না তাঁকে। আমাকে যে-ভাবে সংসারের হাটে অবহেলায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছেন অমর্যাদায়, তার জন্তেও তাঁকে ক্ষমা করব না কোনোদিন। করতে পারব না। হয়ত আমার অক্ষম প্রয়োজনও ছিল না তাঁর। কোনো আসক্তি ছিল না মেরের ভালবাসার। কিন্তু কি জানি কেন বাববার আমার মনে হয়েছিল না সে হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। ক্ষমার প্রয়োজন নেই তাঁর এ কখনো হতে পারে না। তবু ক্ষমা তাঁর স্মৃতি পাওনা নয়— তা তিনি পাবেনও না আমার কাছে। শেষ অবধি পেলেনও না।

একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন শেষ পর্বস্ত আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারতাম কিনা। একটি কিশোরীর লুক মুগ্ধ কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হত কিনা জানি না। আমার লজ্জা গর্ব অভিমানকে শেষ অবধি আমি পরাস্ত করতে পারতাম কিনা সে সুযোগ আমার হল না। মায়ের মত আমার বাবাকেও মৃত্যু হঠাৎ রাতের অন্ধকারে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর এক রাতের মত সেবারও প্রফেসারই আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বাবার মৃত্যুসংবাদ দিলে। আমরা একসঙ্গে বড় বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলাম। মৃত্যুমুহুর্তের অস্তিম চিহ্নগুলি দেখা ঘটে ওঠেনি আমার ভাগ্যে। মায়ের অস্তিম মুহুর্তের ছবিখানি আজও অক্ষয় হয়ে আছে আমার মানসপটে। কিন্তু বাবার ঘরে ঢুকে প্রথম চোখে পড়ল জরীর ঝালর বসানো বালিসে শোওয়া একটি মনুষ্য মূর্তি। তীক্ষ্ণ তার নাক, ধূসর ক্র। বেন গাঢ় রংয়ের একটি মস্ত পুতুল। গা মুগ্ধ তার শুকিয়ে কঁকড়ে গেছে। দেখাচ্ছে বীভৎস এক প্রেতমূর্তি।

ভয়ে আতঙ্কে আমি কেঁদে উঠেছিলাম মনে আছে। ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিলাম দাক্ষণ বিতৃষ্ণায়। তারপর আর কিছু মনে ছিল না। কি করে যে সেই প্রাসাদের অলি পথ ঘুরে খোলা হাওয়ার চলে এসেছিলাম আজ তা আর কিছুই মনে পড়ে না। শুধু সেই আতঙ্কের কথাটাই স্পষ্ট মনে গেঁথে আছে আজো। মৃত্যুকে অমন বীভৎসতায় জীবনে কখনো দেখিনি।

পরে শুনেছিলাম প্রচণ্ড শব্দে বাবার খাস খানসামা তাঁর ঘরে ছুটে এসে দেখেছিল বাবা বিছানা থেকে কয়েক হাত দূরে মেঝেতে জড়সড় হয়ে বসে আছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছবার শুধু বলেছিলেন—‘আজকে আমার ছুটি ঠাকুমা। আজ বড়ো মজার ছুটি।’

সেই নাকি তাঁর শেষ কথা।

এরপর পুরো পনের দিন আমরা নতুন মনিবের জন্তে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম।

মনিবের কাছ থেকে হুকুম এসেছে, যেখানকার যে ভিনিস সেখানেই থাকে যেন। কোনো কিছু কেউ না যেন স্পর্শ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজে সব কিছু দেখছেন ততক্ষণ যেন কাউকে কাছে জবাব না দেওয়া হয়। তাঁর আদেশ মত আসবাব পত্র দ্রব্যের টেবিল সব তাল লাগিয়ে শীলমোহর করা হল। চাকর খানসামাদের মুখে মুখে অনিশ্চিত ভয়ের ছায়া। গা ছম ছম ভাব উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় যেন নিরানন্দ দিন গুনছে তারা।

সেই পালাতলের মধ্যে হঠাৎ আমি যেন এ বাড়িতে মত্ত একজন কেউ হয়ে উঠলাম। সবাই আমার সমীহ করতে লাগল। নতুন দিদি বলেই ডাকত সবাই। কিন্তু এতদিন যেন সেই চেনা কথাটার নতুন তাৎপর্য হতে লাগল। বিশেষ একটা ঘোর দ্বিগ্নে সবাই উচ্চারণ করতে লাগল কথাটা। চাকরদের মহলে কানাদুশা চলছে—‘বড়ো কড়া হঠাৎ মারা গেলেন। ধর্মযাজক ডাকারও পর্যন্ত সময় হয়নি। বহুদিন ধর্মযাজকের কাছে পাপ স্বীকারের সময় পাননি তিনি। অথচ একটা উইল তৈরী হতে একটুও দেরী হল না।’

সেদিনের বড়ো খানসামা এই প্রফেসরের আচার-আচরণও অনেক পাল্টে গেল। বহুদূর বা মধুর স্বভাবের ভান করলে না সে। এটা অবশ্য ভাল করেই জানত যে আমি তার কোনো কথা শুনব না, আমার উপর ঘোর খাটাতে গেলে পদে পদে লাহিত হতে হবে তাকে।

কেমন একটা হারমানা ভাব স্কটে উঠল তার মুখে। যেন ভাবেভজিতে বোঝাতে চায়—‘এই দেখো না আমি সরে দাঁড়িয়েছি।’

বাড়ির সবাই আমাকে সম্মান দেখাতে লাগল—কেমন করে আমাকে খুশি করবে সেই যেন একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল তাদের। ওরা যে আমাকে ওদের ব্যবহারে কতখানি আঘাত করেছে তা ওরা বুঝতে পারে না কেন? কেমন এই আশ্চর্যবিড়ম্বনা। এক এক সময় ভাবী আশ্চর্য লাগে।

এইসব পাঁচরকমের মধ্যে একদিন আসল মনিব এসে উপস্থিত হলেন।

জমিদারবাবুর চেয়ে নতুন মনিব বছর দশের ছোট। এতদিন একরকমভাবে জীবন কাটিয়েছেন। রাজস্বগুরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। থাকতেন পিটার্সবার্গে। বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু একটা মাত্র ছেলে রেখে বৌ বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই মারা যান। তারপর আর বিয়ে করেননি তিনি। ছ ভায়ের মুখেতে আশ্চর্য মিল আছে দেখলাম। ছোট ভাই দাদার তুলনার মাঝার খাটো কিন্তু বেশ দোহার গড়ন তার। মাথা ওড়ি টাক—দাদার মতই চোখের মণি দুটো উজ্জল কালো, আরো বেশি যেন জলজলে। ঠোঁট দুটি লাল টকটকে। দাদা যেমন ফরাসী বৈদ্য, ছোট ভায়ের মুখে তেমনি রাশিয়ান যেন খই কোটে। ছোট ভাই দাদাকে ফরাসী দার্শনিক বলে ঠাট্টা করতেন।

লোকটির মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। হাসেন যখন চোখ বন্ধ করে থাকেন আর হাসির গমকে সারা শরীর বিক্ৰীভাবে ছলতে থাকে। যেন অসহ্য রোষে কাঁপছে সারা শরীর। প্রতিটি ভিনিস নিজে দেখেন—অস্ত্রের মুখে কাল খাবার অভ্যাস নেই তার। আর

কাছের প্রতিটি খুঁটিনাটির হিসেব না নিয়ে কাউকে রেহাই দেন না কখনো। তার আঁটসাঁট কাছে এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও।

এসেই প্রথমদিন তিনি শাস্তি স্বস্তরনের ব্যবস্থা করলেন, শাস্তিবারি প্রতি ঘরে সব কিছু উপর ছিটিয়ে দিলেন—এমন কি ছাদ কড়িকাঠ পর্যন্ত বাদ গেল না। এইভাবে প্রেতাশ্বাকে বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে নির্বাসিত করার ব্যবস্থা করলেন।

তারপর বাড়ির চাকরবাকরদের উপর নজর দিলেন। দাদার প্রিয় খানসামাদের অদল-বদল করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। একজনকে মহলে পাঠালেন, কয়েকজন কঠোর শাস্তি পেল। জমিদারবাবুর একজন প্রিয় ভুঁকী খানসামা ছিল—তার উপর চক্ৰিশ ঘণ্টার মধ্যে এ-বাড়ির সীমানা ত্যাগ করার আদেশ হল। চাকরবাকরদের সামনে একটা আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই নাকি এরকমটা করলেন। নতুন মনিবের দাপটে চাকর খানসামারা আহি আহি ডাক ছাড়ল। মৃত মনিবের জন্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

একজন বড়ো ধুঁধুরে খানসামা একদিন আমার সামনেই কেঁদে ফেলল—‘জামা-কপড় ঘর বাড়ি পরিষ্কার তকতকে থাকলেই পুরোনো মনিব খুশি ছিলেন। তার চেঁচামেচি বরদাস্ত করতেন না তিনি। বাস, ঐ পর্যন্ত। তারপর কে কি করেছে তা নিয়ে একটুও মাথা গামাতেন না। একটা সাহিঁকেও কখনো কষ্ট দিতে জানতেন না। এত দয়ার শরীর ছিল তাঁর। আর এখন বড়ো হুঃসময় এস। বেঁচে থেকে আর কি লাভ—এখন মরাই ভাল।’

আমার অবস্থারও বদল হতে লাগল। জমিদারবাবুর কাগজপতর ঘেঁটে নাকি কোনো উইল পাওয়া গেল না। আমার স্বার্থের অমুকুল একটি চিরকুটও কোথাও লেখা নেই। এ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি বাড়ির সকলের ব্যবহারে আশ্চর্য বদল দেখলাম। আমার ছায়া কেউ মাড়াতে চায় না—বেন আমাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে তারা। প্রেক্ষাগারের কথা আমি বলছি না। বাড়ির অন্যান্য প্রত্যেকেরই কথায় এমন একটা উগ্রা প্রকাশ পেতে লাগল যেন আমি তাদের কত ঠকিয়েছি।

একদিন রবিবারে উপাসনার পর নতুন মনিব আমাকে ডেকে পাঠালেন। এতদিন আত্মা ইজিতেই তাকে দেখেছি। আমাকে যেন তিনি দেখেও দেখতে পেতেন না। তার পাঠাগারেই সাক্ষাৎ হল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। পঙ্কন ছিল সরকারী ইউনিকর্ষ। হুঁকাবে হুঁকো মধ্যদাস্ট্রক তারকা ঝকঝক করছে। আমি দরজার কাছে এসে দাঁড়লাম। আমার হৃৎপিণ্ডে দম-বন্ধ করা একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। কিছু যেন ঘটবে, এমনি একটা প্রাকসংকেত পাচ্ছিলাম।

কিন্তু সে কিসের তা বুঝিনি তখন।

দরজার মূলে গিয়ে দাঁড়াতেই নতুন কর্তা আমার দিকে ফিরলেন। প্রথমে দেখলেন আমার পা ছুঁনি। তারপর হঠাৎ চোখ তুলে আমার দিকে তাক'তেই সেই চোখ যেন আমার গালে সপাটে চড় মারলে।

‘তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম আমি’ বললেন তিনি, দেখতে চেয়েছিলাম এইজন্তে যে নিজের মুখে তোমায় একটা কথা জানাব। আমার কাছে থাকলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত্ব থেকে। আমি তোমার সংপিতাকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছি সে মতই সব চলবে এখানে। শুধু ছেনে যাও যে তোমায় দেখে আমার ভালই লেগেছে। কাঁচা ব্যেস তোমার, রূপও তোমার কম নয়, সুতরাং বুঝতেই পারছ ত পুরুষমানুষ’ বলে হি হি করে হাসলেন তিনি। সে হাসি শুনে সেদিন নারীত্বের অপমানে যতনা ব্যথা পেয়েছিলাম তার চেয়ে বোধ করি বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। এ সংসারে আমার নিজের বলে আর কেউ নেই। আমি একা—নিতান্তই একা, এই কথাটাই বড়ো নিষ্ঠুরভাবে সেদিন মনে লেগেছিল।

ড্রয়ার খুলে এক গোছা নোট তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, ‘এগুলো রাখো। তোমার হাত খরচা চলবে। আবার তোমায় আমি শিগগীর ডেকে পাঠাবো। তোমাকে ছেড়ে আমার চলবে না।’

হাত পেতে আমি সে টাকা নিলাম। তিনি যা দিতেন তাই আমাকে নিতে হোত। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় বসে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে আমি কেঁদেছিলাম। কখন হাতের মুঠা থেকে টাকার গোছটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, খেরাল ছিল না। এই প্রফেসর ঘরে এসে সেগুলো কুড়িয়ে পেলে। যা ইচ্ছে হবে খরচ করতে আমার বোলো, এই কথা বলে টাকগুলো নিজের কাছেই রাখলে সে।

এ বাড়িতে সবই পালটে গেল। এই খানসামাটির সঙ্গে কথাবার্তা করে ভারী ভাল লাগল আমাদের নতুন কর্তার। তাকেই তিনি তখন খাস খানসামা বহাল করলেন। সেই হোল নতুন কর্তার সর্বাধিক প্রিয়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হয়েছিল, কেননা কর্তা আমাদের ঘোর রাশিয়ান। যা রাশিয়ান নয় তাইতেই ছিল তার ঘোর বিতৃষ্ণা। এই প্রফেসর মানে আমার সংপিতা দিনে দিনে সব দিব্যি মানিয়ে নিলে। তখন আর কোনো অসুবিধে রইল না।

তখন তার হাসির পালা পড়ল। খুশির পালা। সেই পালা আজও অবধি চলছে। সেই সময় থেকেই মহা রাশিয়ান ভক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি।

রবিবারে গীর্জায় উপাসনা হত। নতুন কর্তা সাড়ম্বরে সেই সব উপাসনায় যোগ দিতেন। তারপর মেয়েরা নাচত গাইত। তাদের সঙ্গে গানে যোগ দিতেন তিনি। পা ঠুকে ঠুকে ভাল দিতেন। কোনো কোনো সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ের গাল টিপে দিতেন।

কিন্তু বেশিদিন এখানে রইলেন না তিনি। ফিরে গেলেন পিটার্সবার্গে। তখন সমস্ত জমিদারীর ভার পড়ল এই লোকটির উপর।

আর সেই সময় থেকেই দুঃখাগের মেঘ ঘনাল আমার আকাশে। শিশুকাল থেকেই গানে আমার ঝাঁক ছিল, সেই দুর্দিনে গানই হোল আমার দোসর। গান নিয়ে আমি দুঃখ ভুলে রইলাম। কিন্তু এই প্রফেসরের অত্যাচার দিনে দিনে আমার অসহ হয়ে উঠতে লাগল।

একদিন পুরোনো মনিবের কাছে তার হয়ে বসতে আমি নারাজ হয়েছিলাম, সে কথাটা তখনো ভোলেনি। সেই কথাটা সে বারংবার মনে করিয়ে দিত আনায়। নতুন কর্তার কাছে লম্বা লম্বা মিথ্যে কথা জানানো চিঠি আমাকে দিয়ে কপি করিয়ে নিত সে। রাজ্যের বানান ভুল তার আমায় সংশোধন করে দিতে হোত। রাশি রাশি ভুল হিসেব বানাতে হোত। 'তোমার মত মেয়েকে কি করে পোষ মানাতে হয় তা আমি জানি! মদের গেলাসে চুষুক দিতে দিতে ভয় দেখাত সে আমায়, অমন করে কি দেবছ আমার দিকে। ও সব ভয় দেখানো বড়ো পেরাহ করি কিনা আমি।'

এত অত্যাচার আমার সহ্য হোত না। এক এক সময় মন এমন বিষিয়ে উঠত যে বলে বোঝাতে পারব না। কি একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে সর্বদাই মন আমার সশঙ্কিত হয়ে থাকত। রাত্রে ঘরে আলো জ্বলত না। সেই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আমি তিমির মন্বন করতাম। ভেবে ভেবে রাত কেটে যেত। এক কোঁটা ঘুম আসত না পোড়া চোখে। আর সেই অগৎজোড়া অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আমার মন এক অসম্ভব সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠত।

এই সময় হঠাৎ নতুন কর্তা আবার ফিরে এলেন। শুনলাম এতকাল চাকরী করার পর যন্ত কিছু একটা খেতাব পাবার প্রত্যাশা তার সফল না হওয়ায়, বিরক্ত হয়ে তিনি চাকরী ছেড়ে চলে এসেছেন। এবার থেকে নিজের জমিদারীতেই থাকবার মতলব তার। এইখানেই জীবনের বাকি দিন কাটাবেন স্থির করেছেন।

এলেন একাই। ছেলে এল নতুন বছরের ছুটি বরাবর।

এই প্রকেসারের তখন কাজ পড়ল বিস্তর। সারাদিনই তার কাঁটত কর্তার ঘরে। তিনি শুনলাম এখানে একটা কাগজ কল তৈরী করবেন ঠিক করেছেন। প্রকেসারের সাহায্য দরকার। দুই মাসের তখন আর নাইবার খাবার অবসর রইল না। আমি আনেকখানি স্বস্তিতে রইলাম কিছুদিন।

এত বড়ো জমিদারীর কাজকর্ম, নতুন কারখানা তৈরী করা, তার ব্যবস্থা করা, নতুন অফিস কাছারির তত্ত্বির তদারক করা, এই নিয়ে দিনরাত মেতে ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেও আমার যে তার দরকার হতে পারে তা ভাবতে পারিনি আমি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা তার ঘর থেকে আমার ডাক এল।

তার বশার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার ওপর হুকুম হল পিরানো বাজানোর। মম দিয়েই বাজালাম। দেখলাম দাদার মতই এ' লোকটাও গান বাজানায় ভাল লাগালাগির কোনো খালাই নেই। তবু ভক্ততা করে তিনি আমার প্রশংসা করলেন। পরের দিন তার সঙ্গে খাওয়ার নিমন্ত্রণ হোল আমার।

খাওয়া হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে তিনি গল্প করলেন আমার সঙ্গে। অনেক কথা। হাসলেন খুব। কথা শুনতে শুনতে তার সেই চোখের অবাক চাউনি সেদিন আমার একটুও ভাল লাগেনি। অস্বস্তিতে সমস্ত শরীরটা ত্রি-রি করছিল যেন। আর এমন বেহারার মত কেউ কখনো মেয়েদের দিকে চায়? যেন সর্বদা মেখে নিতে চাইছেন

আমার। বড়ো বড়ো চোখের আলো পড়ছে আমার গায়ে, কিন্তু আমি ত দেখছি সেই আলোর আড়ালে কি এক কৃত্রী অন্ধকার ধমধম করছে তার মনে।

‘আমায় কিছু পড়ে শোনাবার দরকার হবে না। চোখ দুটো এখনো বেশ কাজ করছে আমার নিছেরই। কিন্তু বিকেলবেলা আমার এখানে আসবে তুমি বোঝ।’ বললেন তিনি—‘তোমার মিষ্টি হাতে বিকেলের কফির স্বাদ মুখে লাগবে অন্তরকম। আমি কফি খাবো, তুমি পিয়ানো বাজাবে। কেমন?’

সেই দিন থেকে বিকেল আমার বড় বাড়িতে বন্দী হল। বিকেলে যেতাম, আসতে কোনো কোনোদিন সন্ধ্যা উতরে যেত।

নতুন কর্তা আমার ভালবাসতেন, কিন্তু সে ভালবাসায় আমার আনন্দ ছিল না। ঐ মাহুঘটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি বসলে আমার কেমন বেন ভয় ভয় হোত। সে কেমন তার কথার কখনো প্রকাশ পেতো না, লগ্নি হোত তার চোখের চাউনিতে, তার নোংরা হাসিতে। আমার বাবা, যিনি তার দাদা, তার কথা কখনো কোন বলতেন না। ইচ্ছে করেই মনে হয় সে-সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন, কেননা তার মনের অভিপ্রায়ের পথে সে চিন্তা বোধ হয় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠত। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠত।

বড় দিনের ছুটির শেষে কর্তার ছেলে মিচেল এল।

এর পর আরও লেখা কি যে কষ্টকর সে আমি কাকে বলে বোঝাব। এতদিন ছিল আমার ছুঃখের দিন। একলা একলা সংসারের নির্ধাতন সহ্য করার দিন। কিন্তু এবার এলো আমার হাসিকান্নার দিনরাত্রি। আমার প্রথমযৌবনের আবেগধরধর মুহূর্তগুলির বর্ণালী। মিচেলকে আমি ভালবেসেছিলাম। সেও আমার ভালবাসত।

বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। বড় উঠেছে সন্ধ্যার মুখে। ডব্লিং ক্রমের পিয়ানোর বসে আমি ওয়েবারের সোনাটা বাজাচ্ছি। এমন সময় একটি তরুণ যুবক ঘরের ভিতর এসে ঢুকল। কি স্নানর দেখতে লাগল তাকে। কি একহারা সুপুরুষ চেহারা। সর্বাঙ্গে কণা কণা তুষার লেগে ছিল। ঘরের ভিতর এসে সেগুলো ঝেড়ে কেলে দিলে সে। তার পর বাবার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার দৃষ্টি বন্দী হোল পিয়ানোর সামনে বসে একটি তরুণীর চোখে। মুহূর্তে সেই তরুণ যুবখানিতে কি মাধুরী মুটে উঠল, জাগল কি পরমাস্চর্য অবাক সৌন্দর্য তা জীবনে আমি ভুলব না কোনোদিন। সেই মুহূর্তপুরুষ একযুগ যুগনেত্রে আমার দেখলে। আমি দেখলাম তাকে। তারপর তার সন্নিহিত ফিরল। পিতৃসমীপে গিয়ে দাঁড়াল সে। কথা কইলে যখন, আমার কানে অন্তত বর্ষিত হোল। কোমল তার গলার স্বর। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে মনের এক স্নিগ্ধ মাধুর্য করতে লাগল।

ছেলেকে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হলেন বাপ। বললেন, দিন পনেরোর মাত্র ছুটি?

ঐটুকু অবধি শুনলাম। তারপরই আমার ছুটি হোল সেদিনের মত।

নিছের ঘরের জানালার বসে রইলাম কত রাত অবধি। বড় বাড়িতে ঘরে ঘরে আলো।

জলছে। কাঁপছে তাদের আলো ঝড়ের হাওয়ার। আমার মন সেই সব আলোর শিখার মত কাঁপতে লাগল ধরধর করে।

সারা বাড়িতে আজ উৎসবের কলরব উঠেছে। অনেক চেনা গলার মধ্যে মাঝে মাঝে কানে আসছে একটি অচেনা মধুর গলা। এই নিবানন্দপুরীতে কোথা থেকে এল এই আনন্দের দূত, ভাবলাম আমি। যে মানুষ আমার মনের অন্তঃপুরেও উল্লাসের শিহরণ জাগালে।

পরের দিন খাবার আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হল। কথাও হোল প্রথম। আমাদের বাড়িতেই এসেছিল সে এই প্রফেসারকে কি খবর দিতে। বসেছিল আমাদেরই ছোট বসার ঘরে। দু'একটা কথার পর আমি উঠে যাচ্ছিলাম, সেই আমার বসালে। কি ভাল লাগল তার সঙ্গে কথা কইতে। শহরে থাকে। মনে মনে ভয় ছিল হয়ত বা শহরে ছেলেদের মত দাস্তিক হবে, হবে সবজাস্তা। আমার মত পাড়ারগেঁয়ে মেয়েকে হয়ত অবহেলা করেই পাশ কাটিয়ে যাবে। কিন্তু সেই পাড়ারগেঁয়ে মেয়ের ভীকৃতাকে সহজেই জয় করলে মিচেল।

কত লোক দেখেছি, মুখ হাসলেও ষাদের চোখ হাসে না। এই দুটি চোখ যেন সর্বদাই খুশিতে হাসছে। আর তার ঠোঁঠের দু'প্রান্তে দুটি স্নিগ্ধ বক্সিম রেখা। ওর মুখখানিকে কি যে অপক্লপ স্মন্দর করেছে তা বোধ করি ও নিজেই জানে না। একটি ঘণ্টা ধরে আমরা গল্প করলাম। তার মুখ থেকে একটি মুহূর্ত আমি চোখ সরাতে পারিনি। কি কথা হয়েছিল সব মনেও নেই, কিন্তু সেই একঘুঠো সময় আমার বড়ো আনন্দে কেটেছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি পিয়ানো বাজাতে বসলাম। নিচু আরাম কেরারায় বাজতে মাথা দিয়ে শুয়েছিল মিচেল। মাথায় তার একরাশ নরম কৌকড়ান চুল। চোখ বুজে নিঃশব্দে শুনছিল সে বাজনা। গান বাজনায় তার খুব সখ সে-কথা সকাল বেলাই বলেছিল আমার মিচেল। মুখে আমার প্রশংসা না করলেও তার মুখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বাজনা তার ভালই লাগছে। তাকে খুশি করার আনন্দে আমি প্রাণের আনন্দে বাজাচ্ছিলাম। কর্তা ছেলের কাছেই বসে ছিলেন। হঠাৎ কি হোল, তিনি সোজা হয়ে বসলেন। আমার বোতামগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—‘যথেষ্ট হয়েছে বাজনা। জলে ভেজা পাখী যেমন ডাকে তেমনি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কি যে বাজাচ্ছে, শুনে মাথা ধরে গেল। আমরা বুড়ো হাবড়া আমাদের সঙ্গে অত দরদ দিয়ে বাজিয়ে দরকার নেই তোমার। তুমি আজ যাও।’

লজ্জায় অপমানে আমি চলে আসছিলাম, মিচেল আমার সঙ্গে আসতে লাগল।

‘তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার আবার হোল কি?’ ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি। তারপর প্রফেসারকেও কি যেন বললেন নিচুকণ্ঠে, তা আর আমি শুনতে পাইনি। কিন্তু প্রফেসারের বিবাক্ত হাসি আমার কানে এল।

পরের দিনও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

দিন চারেক পরে একদিন কবিডরে আমার মিচেলের সঙ্গে দেখা হল। সে আমার হাত

ধরে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। এ ঘরখানিতে এই জমিদারবংশের পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙান থাকে।

মিচেলের হাতধরে যখন সেই নিরীশ্বর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, আমার অল্প বয়সের যৌবন যে সে যুহুর্তে শিহরিত হয়নি তা বলব না, কিন্তু কোনো ভয় হয়নি আমার। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই আমি মিচেলের সঙ্গী হয়েছিলাম। বোধ করি সেই যুহুর্তে তার সঙ্গে পৃথিবীর শেষ প্রান্তও চলে যেতে পারতাম আমি। তার কাছ থেকে আমার কোনো ভয়ের কারণ ছিল না।

এ সংসারে আমি ত একা। আমার কেউ নেই স্নেহ করার, দয়া করার, আশ্রয় দেবার। সংসারের শত্রুবাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম যুবতী মেয়ে আমি। দেবতার আশীর্বাদের মত এসেছিল মিচেল আমার জীবনে। তাকে ভাগবেসে জীবন আমার আশ্রয় পেয়েছিল। সারা মন দিয়ে আমি তাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। তাকে ছাড়লে আমার যে আর কিছু থাকত না সেদিন।

আমার দিকে তাকাতে পারেনি মিচেল। ধরাগলার সে আমায় আশ্বাস দিয়েছিল। এ সংসারে আমি যে কত অসহায়, তা একদিনেই সে বুঝেছে। তার বাবা আমাকে কষ্ট দিয়েছেন তার ক্ষেত্রে অনেক দুঃখ করলে মিচেল।

আমার একখানি হাত তার উচ্চ করতলে ধরে নিয়ে নিবিড় মমতার বললে মিচেল—‘আমায় তুমি বিশ্বাস কোরো সুসি। সংসারে যেখানে যত অবহেলাই পাও, একথা তুমি কোনো যে তোমার একটি ভাই আছে। ইয়া সুসি তুমি আমার বোনের মত আপনার।’

সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল আমার। লজ্জার আর আমি মুখ তুলতে পারলাম না। একথা শুনব বলে আমি তৈরী হয়ে আসিনি। আমার বেদনার্ত নারীত্ব যে পবিত্র সূক্ষ্মর দৈববাণীটির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিল দিনরাত্রি, এই আশ্চর্য লগ্নে সে কি এই? তবু তাকে ধন্যবাদ দিলাম আমি।

‘না, না, কিছু দরকার নেই’ বললে মিচেল—‘আমি তোমার ভাই। এ আমার দায় দায়িত্ব সবই। কোনোদিন কোনো কারণে যদি মনে করো বিপদে পড়েছ, আমায় তুমি জানিও নিশ্চিত মনে। আমি তোমার কাছে ছুটে আসব বোন।’

আর একবার আমার হাতে চাপ দিয়ে মিচেল বিদায় নিয়ে গেল।

এই একটি দিনের মধ্যে তার সঙ্গে জমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে কসুর করেনি প্রফেসার। কিন্তু ছরতিসন্ধি তার সফল হয়নি এই সোজা মানুষটির কাছে। তাই আরো সর্বনাশের চেষ্টায় মেতে উঠল প্রফেসার। কর্তাকে গিয়ে লাগালে তার ছেলের নামে। বললে, বড়ো দুঃখের কথা যে আপনার অবর্তমানে ঐ ছেলে যে কি করে জমিদারী রাখবে তাই ভাবি। এত হালকা মনোভাব, যার তার সঙ্গে কথায় আশ্বিত্যতা করছে।

কর্তার মনের অলিগলি চিনে নিয়েছিল প্রফেসার, তাই এক বড়ো সাহসের কাজটা করতে তার বাধল না। কর্তাও তাকে বিশ্বাস করলেন। এত বড়ো জমিদারী, কল

কারখানা এ-ছেলের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভাবনায় তার মন বিচলিত হোল। বয়স হলে মানুষের অমনিই হয় বুদ্ধি। যে তাকে ভেজাতে পারে খোসামোদ করে, খুব ভক্তির ভাব দেখাতে পারে, তাকেই সে প্রাণের চেয়ে মনে করে প্রিয়তর।

‘বলে তুমি ভালোই করেছ। সাবধান হয়ে চলতে হবে আমাকে।’

বিনীত হাতে যেন লুটিয়ে পড়ল প্রফেসর— ‘কর্তার হাতে মজল হয়—’

রক্তের ভেতর আগুন জ্বলছে আমার। লিখতে লিখতে হাত কাঁপছে। ভাবছি কি হবে আর সে সব কথা লিখে। কিন্তু তাকে যে আমার সব কথা জানাতে হবে। তা নইলে যে আমার শাস্তি নেই।

এইসময় প্রফেসরও আমাকে খুব স্তুষ্টিতে দেখত। তার মেয়ে হয়ে আমিও যে নতুন কর্তার মন পেয়েছি এ যেন তারই জিত। বাপে মেয়েতে আমরা যেন বিশ্ববিজয় করছি এই রকম ভাব তার। একদিন আমার আদর করে বললে—‘আমার খুব ভাল লাগছে তোকে। যে বয়সের যা বুদ্ধি না! অত রূপ তোর, ঐ সব বুটো নীতিজ্ঞান নিয়ে বসে থেকে নিজের আখের কেউ কখনো নষ্ট করে। আমাদের হোল কাজ শুছিয়ে নেওয়া। ও সব নীতি টিতি গরীবের জন্তে নয়—ও সব বড়লোকদের শোভা।’

কিন্তু আমি নতুন কর্তার বিষদৃষ্টিতে পড়ার পর, প্রফেসরের ওপর মিচেল যখন তার রাগ আর গোপন করে রাখলে না, প্রকাশ্যেই সে আমার হয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, তখনই আমার হুর্ভাগ্যের শুরু হোল আবার। নির্ধাতন বাড়ল ঘরে বাইরে। দিন রাত আমার পিছন পিছন লেগে রইল এই প্রফেসর। যেন আমি কোথাকার দাগী আসামী। যখন-তখন একটা খুন জখম করে ফেলতে পারি।

আমার ঘরের বন্ধ দরজায় একটা সাড়া দিয়ে চোকার ভয়তর বালাই রাখত না প্রফেসর। কাছা মাথা বুট পরে একদিন হঠাৎ এসে প্রফেসর যেন আশ্চর্য্যগিরির মত কেটে গড়লেন—‘কি ভেবেছ তুমি সূসি? এ বাড়িতে থেকে তোমার অত দেমাক চলবে না আমি বলে দিলাম। আমার ওপরও তুমি চালাকি করতে চাও। তোমার বিষদৃষ্টি আমি ভাবব।’

পরেরদিন সকালেই আমার কাছে খবর পাঠালে প্রফেসর যে আজ থেকে বিকেলে আর বড় বাড়ি যাওয়ার আমার দরকার নেই। দরকার পড়লে কর্তা নিজেই ডেকে পাঠাবেন।

আর এই সময়েই আমার ভাগ্যের ঢাকা এক চরম নিয়তির দিকে আমার টেনে নিয়ে গেল! মিচেলের ঘোড়ার সখ ছিল প্রবল। একদিন একটা বড় ঘোড়াকে চালু করতে গিয়ে, সে হঠাৎ এমন ভাবে লাফিয়ে ওঠে যে মিচেল পাশের ঝোঁপে ছিটকে গিয়ে পড়ে। হুর্ঘটনার একটা হাত ভেঙে গেল মিচেলের, সেই সঙ্গে বুকেও কিছু আঘাত লাগল তার। অজ্ঞান অবস্থায় সকলে মিলে ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে এল।

ছেলের ঐ অবস্থা দেখে কর্তা ভয় পেয়ে গেলেন। শহর থেকে বড়ো ডাক্তার এল।

ভাৱা বখাশাধ্য কৰলেন। একটা মাস বিহানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে গেলেন তাৰা ৰোগীকে।

ভাস খেলতে জানে না মিচেল। এক হাতে ধৰে বই পড়া অসম্ভব। তাই শেষ অবধি আমায়ই ডাক পড়ল বড় বাড়িতে।

সে-সব আনন্দ আমার জীবনকে অনেক সুখায় ভৰে দিয়ে গেছে। যাওয়ার পৰেই আমি গিয়ে বসতাম তার ঘৰে। বসতাম পর্দাটানা একটা জানালার ধাৰে গোল টেবিলের ধাৰে। মিচেল শুয়ে থাকত ঘরের আর এক প্রান্তে। আমি ঘৰে ঢুকলেই প্ৰসন্নমুখে সে তাকাত আমায় দিকে।

পাণ্ডুর মুখখানি এক ঝলক হাসিতে যেন আলো হয়ে উঠত। বড় বড় কঁকড়ান চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে নরম গলায় আমায় স্বাগত কৰত।

তখন স্তায় ওয়ান্টার স্কটের খুব সুনাম প্ৰতিপত্তি। তাঁর লেখা আইভান হো পড়তাম আমি। বেবেকার সংলাপ পড়তে পড়তে গলা আমার আবেগে ধরধর কৰে কাঁপত। বেবেকা ত আমিই। তার ভাগ্য ত আমার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। তার মত আমিও এক কুণ্ণ মাহুৰকে সেবা দিয়ে সারিয়ে তুলছি। বেবেকার কান্নার সঙ্গে আমার কান্না মিশে একাকার হয়ে যেত।

পড়া থেকে চোখ তুলে যতবার তাকাতাম আমার শ্রোতার দিকে, সেই উজ্জ্বল মুখের নরম হাসি আমায় আদর কৰত। কথা কইতে পারতাম না ভয়ে। ডব্লিং ক্ৰমের বাইবে সৰ্বদাই কেউ না কেউ থাকত।

কখনও হস্ত পাহাৰা নেই। বাইবে সব নিঃশব্দ। বই থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছি আমার মিচেলের দিকে। সেও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মুগ্ধ লজ্জায় মরছি মনে মনে, কিন্তু কিছুতেই চোখ নামিয়ে নিতে পারছি না যেন। সেই মৌন মুহূৰ্তে কত কথা কইছি। যে কথার বাণী নেই, ভক্তি দিয়ে কোন জানাজানি নেই। প্ৰাণ থেকে প্ৰাণে চলেছে এক মৌন তরলী। চোখে চোখে অলছে আৱতির দীপালী।

একদিন সে আমায় বললে—‘তুমি দাবা খেলতে পার ?’

‘একটু একটু পারি !’

‘তাহলেই হবে। কাউকে বলো না একটা দাবার ছক আর খুঁটি আনতে। টেবিলটা আমার কাছে সরিয়ে নিয়ে এসোনা লক্ষীটি।’

তার কাছে বসে লজ্জায় আমি যেন আর চোখ তুলতে পারলাম না। অৰ্ধচ জানালার কাছে বসে আমার অন্ত লজ্জা কৰত না।

ছক সাজাতে বসলাম আমি। দেখে চাপা হেসে বললে মিচেল—‘দাবা খেলাটা মিথ্যে। তোমায় কাছে পাণ্ডাটাই সত্যি।’

সাবা দিলাম না আমি। নিঃশব্দে একটা বোড়ের চাল দিলাম। কিন্তু মিচেল খেলছে না দেখে তার দিকে তাকাতাই সে কৰুণ মিনতি ভবে আমার হাতখানি আৱো কাছে চাইলে।

তার কথা বুঝেছিলাম কিনা আজ মনে নেই। কিন্তু মন্ত্রী তার দিকে ঠেলে দিতেই মিচেল দাবার ছকের উপর ঝুঁকে পড়ল। আমার আঙুলে তার ঠোট লেগে গেল। সেই মুখ আর তুললে না মিচেল। আমিও সরিয়ে নিতে পারলাম না হাত। এক হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম। আমার সেই সুখের কান্নার দাবার ছকখানি ভিজে সপসপে হয়ে উঠল। আর সেই আমি জানলাম কে আমার হাতখানি আদর করছে। জানলাম যে এতদিনে আমার জীবনে প্রথম প্রেম এস।

‘কাঁদছে কেন সুসি?’ মিষ্টি করে বললে মিচেল—‘কেঁদোনা লক্ষ্মী। আমার জন্তে কোনোদিন তোমায় কাঁদতে হবে না।’

কিন্তু সেদিন আমার মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিল মিচেল। আরো অনেক কান্না সে কাঁদিয়েছিল আমার। কিন্তু সে কান্নায় আনন্দ ছিল না।

কিন্তু আজ আর সে সব কথায় লাভ কি?

সেদিন আমার কথা দিয়েছিল মিচেল। তার বাবা যে আমাদের বিয়েতে মত দেবেন না, সে কথা লুকোলে না সে আমার কাছে। সে কথা আমিও ভাগ করে জানতাম। কিন্তু মিচেল যে আমাকে মিথ্যে প্রবোধ দেয়নি, সে কথা ভেবে আমার সুখের অন্ত রইল না। মিথ্যের বেসাত কোনোদিন করতে পারে না আমার মিচেল।

আমার নিজের সুখের জন্তে আমি কিছু চাইনি। সে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব আমি সানন্দে। যেমন রাখতে চায়, তেমনি থাকব।

‘তুমি হবে আমার বো।’ বললে মিচেল—‘আমি আইতান হো নই। সেডি রোয়েনাকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধব না। আমি তোমায় চাই সুখে।’

শীগগিরই সুস্থ হয়ে উঠল মিচেল। তখন আমার যাওয়ার আনন্দ বন্ধ হল। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। সে আমার কথা দিয়েছে, সেই কথাই আমার মন ভরে রাখলে। অনাগত দিন কি সুখের সাজি সাজিয়ে বসে আছে আমাদের জন্তে সেই হোল আমার দিবা-রাত্রির স্বপ্ন। অতীত বর্তমান আমার সব একাকার হয়ে গেল। এই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার পেরিয়ে চলেছে আমার জীবন তরুণী এক সোনালী উদয় উষার দিকে। রাত্রির অন্ধকারে সেই আমার সূর্যতপস্তা।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ আমার কপালে লেখেননি ভগবান।

(ক্রমশ)

গ্রামে একদিন

আশ্রয় চেষ্টা

সকাল আটটা থেকে নটার ভেতর।

একটা গাঢ় নীল-রঙা ভূপ আকাশে শুঁড়ি দিয়ে এগোচ্ছে সূর্যের দিকে। এখানে-ওখানে তার ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা লাল বিদ্যুৎছটা। দূরত্বটী একটা গর্জনের ধ্বনি আসছে। উক একটা হাওয়া ঘাসের ওপর ছটোপুটি করে, গাছগুলোর মাথা নোয়ায় আর ধুলো ওড়ায়। এক মিনিটেই মে-মাসের দমকা বৃষ্টি আসবে, আর উঠবে সত্যিকারের বড়।

ছ'বছরের বাচ্চা ভিথিরী মেয়ে কিওকলা গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটছে যুটি টেরেণ্ডির ঘোঁষে। সাদা-চুল, খালি-পা বাচ্চাটা ফ্যাকাশে, চোখ দুটো ড্যাভডেবে খোলা, ঠোঁট কাঁপছে ওর।

যাকে দেখছে তাকেই ও জিজ্ঞেস করছে : 'টেরেণ্ডি কোথায়, খুড়োমশায় ?' কেউই জবাব দিচ্ছেনা। সবাই ওরা আসন্ন ঝড়ে এক কুঁড়েতে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। শেষে ও দেখা পেলো গির্জার অধ্যক্ষ, টেরেণ্ডির বনিষ্ঠ বন্ধু সিলান্তি সিলিচের। হাওয়ার টলুতে টলুতে উনি এগিয়ে আসছিলেন।

'ও খুড়ো, টেরেণ্ডি কই ?'

'সজ্জি বাগানে,' জবাব দেয় সিলান্তি।

ভিথিরী মেয়েটি কুঁড়ের পেছন দিয়ে ছোট্ট সজ্জির বাগানে, টেরেণ্ডির দেখাও পেলো সেখানে। পাতলা বসন্তের দাগভর্তি মুখ, অত্যধিক লম্বা খালি পা আর মেয়েদের হেঁড়া অ্যাক্কেট-পর্যায় দীর্ঘ বুড়ো লোকটি সজ্জি খেতের কাছে দাঁড়িয়ে কালো ঝোড়ো মেঘ দেখছে চুপু চুপু চোখে। সারসের মতো লম্বা পায়ে ওপর ও ছলছে শালিখের মতো।

'টেরেণ্ডি খুড়ো।' সাদা-চুল ভিথিরী মেয়েটি ডাকে, 'খুড়ো, সোনটা।'

টেরেণ্ডি কিওকলার দিকে ঝোঁকে, হাসি ছড়ায় ওর মেশাতুর কঠিন মুখে।

'ও প্রভুর দাস কিওকলা' আধোবরে মিষ্টি করে ও বললো, 'কোথেকে এলে তুমি ?' যুটির কোর্টের একধার টেনে ধরে কিওকলা হুঁপিয়ে বললো, 'টেরেণ্ডি খুড়ো, শীগ্গির চলো, ভাই ভানিলকার দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'কেমন দুর্ঘটনা ? আঃ কী বজ্রপাত ! প্রভু, প্রভু, প্রভু...কীরকম দুর্ঘটনা ?'

জমিদারবাবুর চারাগাছের বাগানে একটা গাছের কোকরে ভানিলকা ওর হাত চুকিয়ে দিয়েছে, আর বের করতে পারছে না। 'এসোনা, খুড়ো—একটু দয়া করো, ওর হাতটা টেনে বের করে দাও।'

'কেমন ক'রে ও হাত চোকালো ? কিসের জন্তে ?'

‘আমার অন্তে গর্ভের ভেতর থেকে একটা কোকিলের ডিম বের করতে চেয়েছিলো।’

‘দিনটা এখনো ভালোভাবে শুরুই হয়নি আর তারিমধ্যে তোমরা কামেলার পড়েছো!’
মাথা ঝাকালো টেরেণ্টি। খুখু ফেললো ইচ্ছে ক’রে।

‘বেশ, এখন কী করতে হবে তোমার সংগে? আমি নিশ্চই আসবো...নিশ্চই, নেকড়ের উচিত টুপ ক’রে তোমাদের গিলে ফেলা, বুঝলে দুই খোকারা! এসো হে, অনাথ খুকু!’

টেরেণ্টি সজির বাগান থেকে বেরিয়ে এলো, ওর লম্বা পা দুটো উঁচুতে তুলে, গ্রামের পথ ধরে চলা শুরু করে। না-থেকে বা আশেপাশে না-তাকিয়েই ও চলে দ্রুত, যেন কেউ ঠেলছে ওকে পেছন থেকে বা ভয় পিছু নেওয়ার। ফিওকলার পক্ষে ওর সংগে তাল রাখা দায়।

ওরা গ্রামের বাইরে আসে, ধুলো-বোঝাই পথে এগোর দূরের গাঢ় নীল-হ’য়ে-ধাকা জমিদারবাবুর চারা গাছের বাগানের দিকে। ওটা প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। মেঘেরা ততোক্ষণে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে, আর তার একটুক্ষণের মধ্যেই আকাশে এক ফোঁটা নীলও বইলো না। অন্ধকার হ’য়ে আসে।

‘প্রভু, প্রভু, প্রভু....’ টেরেণ্টির পেছনে দৌড়তে-দৌড়তে ফিওকলা ফিসফিস করে। বড়ো ও ভারী বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো পড়ে ধুলো-বোঝাই রাস্তাটার ওপর। একটা বড়ো ফোঁটা ঝরলো ফিওকলার গালে, গড়িয়ে পড়লো এক ফোঁটা অশ্রুর মতো খুতনী বেয়ে।

‘বৃষ্টি শুরু হয়েছে’, মুচি বিড়বিড় করে, ওর শক্ত খালি পায়ে ধুলোর লাধি মারতে-মারতে। ‘বেশ হ’য়েছে, ফিওকলা, বড়ো মেয়ে। বৃষ্টি বাঁচার ঘাস ও গাছগুলোকে যেমন কুটি পেট ভরায় আমাদের। আর বাজের অন্তে ভয় পেওনা, বুঝলে অনাথ খুকু। তোমার মতো ছোট্ট জিনিসকে কেনো ও মেয়ে ফেলবে?’

বৃষ্টির শুরুতেই হাওয়া ধামে। শুক পথ আর কচি রাইয়ের ওপর হালকা কুচির মতো শব্দ শুধু বৃষ্টির টাপুর টাপুর।

‘আমরা ভিজে যাবো ফিউকলা’ টেরেণ্টি বলে ফিসফিসিয়ে, ‘আমাদের এক ফোঁটাও চিহ্ন শুকনো থাকবেনা। আহা, মেয়েটারে। আমার ঘাড় দিয়ে নামছে। ভয় পেয়োনা কিন্তু, মতো বাজ...আবার ঘাসগুলো শুকনো হবে, পৃথিবী শুকনো হবে, আমরাও শুকনো হবো। একই সূর্য তো আমাদের সবার অন্তেই।’

বিছাতির একটা ঝলক চোদ্দ ফিট লম্বা, ওদের মাথার ওপরে ঝিলিক দেয়। একটা তীব্র বাজের গর্জন। আর ফিউকলার মনে হলো যে কিছু একটা বিরাট, ভারী ও গোল আকাশের ওপর দিয়ে গড়াচ্ছে, ছিঁড়ে ফেলছে সেটাকে, ঠিক মাথার ওপর।

‘প্রভু, প্রভু, প্রভু....’ ক্রুশ চিহ্ন করতে করতে বললো টেরেণ্টি। ‘ওহে অনাথ খুকু, ভয় পেয়োনা। ঘুণা থেকে এটা গরজাচ্ছেনা।’

টেরেণ্টি ও ফিওকলার পা ভিজে, ভারী কাদার ভূপে মাথা। পিছল হ’য়েছে, চলা

দায়, তবু টেরেষ্টি ক্রমেই ক্রত চলতে থাকে। হুঁস, বাচ্চা ভিখিরী মেয়েটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, প্রায় পড়ো-পড়ো হয়।

শেষে এলো ওরা জমিদারবাবুর চারাগাছের বাগানে। ভিজে গাছগুলো, দমকা হাওয়ায় নড়ে, ওদের ওপর সত্যিই জলপ্রপাত ঝরালো। টেরেষ্টি গাছের গুড়িতে হোঁচু খায়, চলার বেগ কমাতে থাকে।

‘ভানিলকা কোথায়?’ ও জিজ্ঞেস ক’রে, ‘নিয়ে চলো ওর কাছে।’

ফিউকলা ওকে একটা ঝোপের মধ্যে নিয়ে যায়; সিকি মাইল চলার পর, ভানিলকাকে দেখায়। ওর ডাই, আটবছরের ছোট মানুষটি, গেরিমাটির মতো লালচুল আর কুণ্ডল ক্যাকাসে মুখ, গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাথাটা একদিকে হেলিয়ে আড়াআড়ি ভাবে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। এক হাতে ধরা ওর জীর্ণ পুরোনো টুপি আর অন্যটা লুকোনো বুড়ো একটা লেবু গাছে। ছেলেটা তাকিয়ে আছে ঝোড়ো আকাশের দিকে, সম্ভবত নিজের বিপদের কথা ভাবছে না। পদশব্দ শুনে, মুচিকে দেখে ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললো :

‘কী ভীষণ বাজ টেরেষ্টি...আমার সমস্ত জীবনে এতো বেশি বাজ শুনি নি আমি।’

‘তা, তোনার হাতটা কোথায়?’

‘গর্তে...টেনে বের ক’রে আনোনা টেরেষ্টি।’

গর্তের কিনারা ঘেঁষে কাঠ ভেঙে, ভানিলকার হাত চেপে আটকে রেখেছে : ভেতরে হাত আরো ঢোকাতে পারে কিন্তু বের করতে পারে না। ভাঙা অংশটা টেরেষ্টি ভেঙে সরিয়ে নেয়, ছেলেটার হাতটা, লাল ও হেঁচা, মুক্ত হলো।

‘কী ভীষণ লাগে, কেমন বাজ পরজাচ্ছে,’ হাত রগড়ে ছেলেটা আবার বললো : ‘টেরেষ্টি, বাজ ফেলছে কে?’

‘একটা মেঘ আর একটা মেঘের গায়ে ধাকা দিচ্ছে,’ মুচি জবাব দেয়। দলটা চারাগাছের বাগান থেকে বেরিয়ে এলো, তারই ধার বেঁধে চললো অন্ধকার পথটার দিকে। বাজের আওয়াজ একটু একটু করে ক’মল, গ্রামের সীমানার বাইরে অনেকদূর থেকে গর্জন শোনা গেল তারপর।

‘টেরেষ্টি, অন্তর্দিন এখানে হাঁসরা ওড়ে’, তখনো ওর হাত রগড়াতে রগড়াতে বলে ভানিলকা, ‘ওরা নিশ্চয়ই গিলায়া জাই মিশ্চার জলার বাসা বেঁধেছে।’

‘ফিউকলা, তোমায় একটা নাইটিংগলের বাসা দেখাবো?’

‘ধরোনা, ওদের বিরক্ত করবে তাহলে, টুপির জল নিংড়োতে নিংড়োতে টেরেষ্টি বলে : নাইটিংগল হলো গায়ক পাখি, নিম্পাপ। ওর গলায় এমন সুর দেওয়া হ’য়েছে ভগবানের স্তব করতে আর মানুষের মনকে খুশি করতে। ওকে বিরক্ত করা তাই পাপ।’

‘আর চড়ুই?’

‘চড়ুইয়ের কোনো মূল্য নেই। ওটা পাখী, ঘৃণ্য পাখি। ও একটা প্রায় পকেটমার।’

ওর ইচ্ছে নয় মানুষ সুখী হয়, এই চড়ুই ইহুদীদের পেরেক জুগিয়েছে আর চিংকার করেছে, বৈচে ! এখনো বৈচে !’

আকাশে উজ্জ্বল একটুকরো নীল দেখা গেলো ।

‘দেখো’ টেরেণ্টি বললো, বৃষ্টিতে পিপড়ের ডিপি ভেঙে গেছে । ভেসে যাচ্ছে ওরা, পাখীগুলো !’

ওরা পিপড়ের ডিপির ওপর ঝুঁকলো । দারাবর্ষণ ওটার ক্ষতি করেছে, পোকাগুলো এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে কাদায়, উত্তেজিত আর ব্যস্ত ভাবে নিমজ্জিত সংগীতের বয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ।

‘এ-ভাবে কাজে নাবার কোনো দরকার নেই তোমাদের, এতে তোমরা মরবে না,’ একগাল হেসে টেরেণ্টি বললো, ‘সুখ তোমাদের উত্তম ক’রে দিলেই, তোমাদের বুদ্ধিসূক্তি ফিরে আসবে ।.....বুঝলে সুখরা, এটা একটা শিক্ষা হলো তোমাদের । অন্তর আর নিচু জমিতে বাসা বাঁধবে না ।’

ওরা চলতে থাকে ।

একটা তরুণ ওকু গাছের ডাল দেখিয়ে ভানিলকা বললো, ‘এখানে কতোগুলো মোঁমাছি ।’ ভিজে ও ঠাণ্ডায়-জমে-যাওয়া মোঁমাছিগুলো গাছের ডালে জড়াজড়ি ক’রে মিশে আছে । ওরা এতো বেশি যে গাছের ছাল বা পাতা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না । অনেকেই আবার এর-ওর ওপর চেপেছে । ‘এক ঝাঁক মোঁমাছি ওখানে’ টেরেণ্টি ওদের জানায়, ‘আমার ঘোঁষে ওরা উড়ছিল । বৃষ্টি নামতেই আশ্রয় নিয়েছে । একটা ঝাঁক যখন উড়েছে, ওদের কোথাও বসাবার জগে ওদের ওপর জল ছেটানোই যথেষ্ট । এখন যরো, তুমি এই ঝাঁকটা যদি নিতে চাও, ওদের শুষ্ক ডালটা থলের ভেতর ঢোকাও এবং নাড়ো ওরা তখন ভেতরে পড়ে যাবে ।’

ছোট ফিওকলা হঠাৎ তরুণ কোঁচকার আর ভীষণ ভাবে বাড় বর্গড়াতে থাকে । ওর তাই বাড়ের দিকে তাকিয়ে একটা বড়ো ফুলো দেখতে পেলো ।

‘হা, হা,’ হাসলো মুচি, ‘ওগো বড়ো মেয়ে, জানো কেমন ক’রে ওটা পেলো ? বনে কোনো কোনো গাছে থাকে স্পেনের মাছি । বৃষ্টি ওদের গা দিয়ে গড়িয়েছে, তারই একটা কোঁটা ঝরেছে তোমার ঘাড়—সেই জগেই ফুলোটা ।

মেঘের পেছন থেকে সূর্য উঠলো, বনবাদাড় মাঠ-ঘাট আর ওই তিন বন্ধুকে উষ্ণ আলোর জোয়ারে ভাসালো । কালো ভয়ংকর মেঘটা অনেক দূরে সরে গেছে, সংগে নিয়ে গেছে ঝড়টাকে । বাতাসটা উষ্ণ ও সুগন্ধ । তরুণ চেরী, সন্তোষ মাঠ ও মাঠের লিলির গন্ধ চারপাশে । যখন তোমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তখন ওষধি দেওয়া হয়’, টেরেণ্টি বললো, ‘উর্ধসবৃশ একটা ফুল দেখিয়ে, ‘এটা উপকার করে ।’

ওরা একটা শিশু ও গুম্ব গুনলো, কিন্তু তেমনটি নয়, যা ঝড়ো মেঘটা বয়ে নিয়ে গেছে । একটা মালগাড়ি ভানিলকা, ফিওকলা ও টেরেণ্টির সামনে দিগে ছুটলো ।

ইনজিনটা হাঁপাতে হাঁপাতে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কুড়িটারও বেশি গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অসীম শক্তি তার। বাচ্চারা জানবার জন্যে মেতে উঠলো কেমন করে ইনজিনটা ঘোড়ার সাহায্য ছাড়া আর জ্বালন্ত না-হয়েই নড়ছে আর অতো ওজন টানছে। ব্যাখ্যার ভারটা টেরেন্টির :

‘বুঝলে ছেলেরা, সবই বাষ্পের কাজ। বাষ্পই করছে সব। বুঝলে, চাকার কাছে ওই জিনিসটার ভলয় এটা নড়ে, আর এটা...বুঝলে...কাজ...করে।’

রেল-লাইন পেরোলো ওরা। বাঁধ থেকে নেমে হাঁটতে থাকে নদীর দিকে। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটছে না—এমনিতেই যেমন খুশি, কথা বলতে বলতে সারাপথ...। ভানিলকা প্রস্র করে, জবাব দেয় টেরেন্টি।

সব প্রশ্নেরই জবাব দেয় টেরেন্টি, প্রকৃতির এমন কোনো রহস্য নেই যা ওকে ভড়কে দিতে পারে। সে সব কিছুই জানে। এই যেমন, সে সমস্ত বুন্দা ফুল, জন্তু পাখরের নাম জানে। জানে কোন গাছ গাছড়া রোগ সারায়, গরু বা ঘোড়ার বয়স বলতেও কোনো অসুবিধে হয়না। সূর্যাস্ত, চাঁদ অথবা পাখির দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারে পরের দিন কেমন আবহাওয়া থাকবে। অবশ্য টেরেন্টিই একমাত্র জ্ঞানী নয়। সরাইখানার মালিক সিলান্টি সিলিচ, বাজারের মালি, রাখাল এবং গ্রামের সবাই, সাধারণভাবে বলতে গেলে, তার মতোই জানে। এরা কেউ বই থেকে শেখেনি, শিখেছে মাঠ ঘাটে, বনেবাদাড়ে, নদীর তীরে। পাখিরাই এদের শিক্ষক, যখন তারা গান গায় নিজের জন্তু, অন্তঃস্বর্গের শেষ রক্তবর্ণ আভা, গাছপালা আর বুন্দা গাছড়া।

ভানিলকা তাকিয়ে থাকে টেরেন্টির দিকে, লোভীর মতো গেলে প্রতিটি শব্দ। বসন্তে কেউ, গরমে বা মাঠের একধেয়ে সবুজের হাঁপিয়ে ওঠার আগে, যখন সবকিছু সতেজ ও গন্ধময়, তখন তরুণ গুবরে-পোকা, সারস, নদীর কলধ্বনি আর শস্যের আকর্ষণ বিস্তার কে না শুনতে চায়।

ওরা দুজনে, মুচি ও অনাথ বাচ্চাটা, মাঠে ঘুরছে, কথা বলছে অনর্গল; কোনো ক্লান্তি নেই ওদের। উদ্দেশ্যবিহীন ওরা ঘুরতে পারে সমস্ত পৃথিবী। ওদের পথচলার আর পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথায় নজরে আসে না যে ছোট ভিথিরী মেয়েটি খুঁড়িয়ে চলছে পেছন-পেছন। দম আটকে যাচ্ছে ওর, হাঁটছে পা টেনে-টেনে। চোখে জল এসেছে, এই অশ্রাস্ত ভবঘুরেদের খামাতে পারলে ও খুশি হতো কিন্তু কার কাছে বা কোথায়ই বা যাবে। বরদোর নেই, স্বজন আত্মীয় নেই—তাই ভালো লাগুক বা না-লাগুক, ওকে হাঁটতেই হবে, শুনতে হবে যা-ওরা বলবে।

দুপুরের দিকে, ওরা তিনজনই বসলো নদীর তীরে। ভানিলকা ওর থলে থেকে ভিঞ্জে গলা এক টুকরো রুটি বের করে, তারপর খেতে আরম্ভ করে। রুটিটা শেষ করে টেরেন্টি প্রার্থনা জানায়, তারপর তীরের বালুর ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শোয়, ঘুমিয়ে পড়ে। ও যতোক্ষণ ঘুমিয়ে আছে, ছেলেটা জলের দিকে তাকিয়ে ভাবে। ভাববার ওর অনেক বিষয়।

কিছুক্ষণ আগেই তো দেখেছে ঝড়, মৌমাছি, পিঁপড়ে, গাড়ি। ওর চোখের সামনেই তো এখন গাছগুলো তিরবিড় করছে। কতকগুলো দু ইঞ্চি বা তার চেয়েও বড়, অন্যগুলো নখের চেয়ে বড়ো নয়। জলের ওপর মাথা তুলে একটা সাপ সাতরে চলেছে এক তীর থেকে অন্য তীরে।

শেষে সন্ধ্যার দিকে আমাদের এই ভবঘুরেরা ফিরলো গ্রামে। বাজারা একটা পরিত্যক্ত খামারে চললো রাতের জন্তে, যেখানে পকায়তের শব্দ রাখা হতো, আর টেরেণ্টি, ওদের ছেড়ে, চললো গুড়িখানায়। ঝড়ের ওপর জড়াজড়ি করে ওরা কিমোয়।

ছেলেটা ঘুমোয় না, অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয় : ঝড়ের শেষ, উজ্জ্বল সূর্যের আলো, পাখিরা, মাছ আর লম্বাটে টেরেণ্টি—যা কিছুই ও দিনভোর দেখেছে, এখনও দেখেছে যেনো। ওর ধারণার সংখ্যাগুলো, ক্ষিধে আর ক্লান্তির সংগে মিশে, ওর পক্ষে অত্যধিক। এসে উত্তপ্ত হয়েছে যেনো ও আগুনের ওপর আছে আর ছটফট ক'রে এপাশ-ওপাশ। কাউকে ও বলতে চায় এখন এই অন্ধকারে ওর যা কিছু মনে হানা দিচ্ছে আর উত্তেজিত ক'রে তুগছে। কিন্তু কেউ নেই যাকে বলবে। কিওকলা নিতান্তই ছোটো, কিছুই বুঝবে না।

‘আমি কাল টেরেণ্টিকে বলবো,’ ভাবলো ছেলেটা।

বাজাগুলো গৃহহীন টেরেণ্টির কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে টেরেণ্টি ফেরে ওদের কাছে, ক্রুশের চিহ্ন করে ওদের ওপর, কুটি রাখে মাথার নিচে। ওর স্নেহ কেউ দেখেছে না। দেখলো একমাত্র আকাশে ভেসে বেড়ানো চাঁদ, আদর ক'রে উঁকি দিলো পরিত্যক্ত খামার বাড়িটার দেয়ালের ফুটো দিয়ে।

অনুবাদ : বীধি বসু

এক-ঘর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সে যাবে না অন্তরে । কত রাত্রি, কত দীর্ঘ দিন
বলেছি, সময় ছুক, এর তীরে রুগ্ন বালিয়াড়ি
কী ক'রে যেটার, বল, লবণাক্ত সমুদ্রের ঞ্ণ ।
তবু সে অচল, তরু ; চিরকরু দীপান্তরে পাড়ি ।

সে যাবে না, তাই তার ডগডগে সিঁহুরে করুণ
ঝোড়াপট বুকে চেপে' যন্ত্রণার নগ্ন স্বাধিকার
নিমিষে সহজ করে, সকালের স্পর্শে মায়াকুণ
সে জানে উঠেই তরে খুশিয়াল আলোর বাহার ।

সহজ প্রশান্তি তার ছ' চোখের মগ্নতার মানে,
নিপুণ যুজায় তাই কল্যাণের জ্যোতির্গেখা হির
সে তোলে আলোকলগ্নে ; অনাদরে রুহু অভিযানে
কখনও বলেনা, চল, খুঁজে নিই অন্ততর নীড় ।

সে জানে আমার আতি, তাই তার কণ্ঠতরা গান—
যে ভালোবেসেছে তার একমাত্র, সহজ প্রমাণ ।

পূরবা মানস রায়চৌধুরী

মুহূর্ত এসেছে মনে । ক্লান্ত চোখে সামনে তাকাই
অবিশ্বাসী মেঘ সরে রহস্তের ছায়া অপক্লপ
মলিন দেওয়ালে কাঁপে । অশান্ত এ' মনের চড়াই
সহসাই শুরু হয়, মুগ্ধতার অপলক চুপ ।

ভাবলাম কুণ্ডতার এ-ও এক ভুল । কেননা সে
আসবেনা জানা কথা । সব কিছু চাইলে কি আসে ?
হৃদয়ের ভালোবাসা, ভালোলাগা সব সত্য জানি
তবু কেউ যদি যায় অন্তপথে, অসীম সন্ধানী
দৃষ্টি মেলে পেতে চায় নিরুপম কিছু, তবে তাকে
কেরাবো কেমন করে ? পার পাক্ সে চেয়েছে থাকে ।

চিহ্নিত পথের ছায়া ছুঁয়ে চলে গেছি কতোবার
অথচ ধামিনি কোনোখানে । আশকার ছিলো হেতু,
ভরে ভরে হেঁটে গেছি অন্তমন পাছে হয় হার—
পিপাসার পূর্ণকল্ল যদি তাড়ে, পারানীর সেতু
যদি ডোবে অতর্কিতে । চুপি চুপি ফিরে আসি তাই
পুরাতন বৃন্তে ফের—যন্ত্রণার নিষেকে হারাই ।

চিন্তার দাহনে জলি । চোখের ইশারা পড়ে মনে
আক্কেল যে বাসনা মূর্ত হলো, যে মেঘ বনালো
তাকে সরানোর মন্ত্র আছোত' শিখিনি । এই আলো
নিকটে নিয়েছে ডেকে । যাবোনা পুরোনো এই পথে
কি করে স্থির থাকি । ছায়া বেই ঘর ছুঁয়ে গেল
অমনি উধাও ভয়, বলি একবার বাছ মেলো ।

রূপান্তর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নাগিনীর মত এই পৃথিবীর মুগ্ধ বাহুপাশ
আমাকে জড়ালো বলে আমি এই দিনান্ত মলিন
প্রাত্যহিক মুক্তি খুঁজি, ভুলে যাই তোমার আশ্বাস
অবুঝ, অন্ধের মতো বৃত্তপথ করি প্রদক্ষিণ ।

অকস্মাৎ কখনো-বা মুহূর্তের মরীয়া আবেগে
লজ্জামুখ সাগাহের মোহমুগ্ধ বিষাক্ত অধরে
নিজেকে নিঃশেষ করি—আমর বর্ষার মত মেঘে
দূরস্ত বিহ্বল হানি । উল্লাস জানাই বজ্র স্বরে ।

ভাঙ্গপর ভোর হলে লজ্জার আক্ষেপে ঢাকি মুখ ।
আমার সে রূপ যদি ছুঁয়ে যায় তোমার বিশ্বয়
নাগিনীর বাহুপাশ খুলে দিয়ে আমার উৎসুক
হৃদয়কে আলো ক'রে—তুমি দিও অন্ত পরিচয় ।

আলো, আরো আলো

দীপংকর দাশগুপ্ত

যুহুর্তে গিয়েছি স'রে তোমার দৃষ্টির অন্তরালে,
বিস্মৃতির কালো মেঘ ছায়া ফেলে, মনের আড়ালে
আলোর স্পন্দিত লীলা খেমে যায়—শুক হয়ে আসে
তরঙ্গিত সুরকল্লোলিনী। কৃষ্ণচূড়ার উল্লাসে
যে-আকাশ উজ্জ্বলিত হয়েছিলো, বিষণ্ণ বিধুর
সে-ও আজ ঐশ্বর্যশেবে; নেই আর আত্মান সুদূর
দিগন্তের নীল থেকে, যন্ত্রের বিযাক্ত কালো ধোঁয়া
খণ্ডিত করেছে তাকে—করেছে মলিন, তার ছোঁয়া
সংক্রামিত প্রাণের পাপড়িতে। মূর্থ মস্ত কোলাহলে
আমার চেতনা যথ—ডুবেছি রাত্রির কালো জলে।

কেবল অস্তিত্ব আছে, নেই আর অস্ত পরিচয়—
মানুষ পতঙ্গ শুধু বেঁচে আছে। চলেছে সময়
লক্ষ্যহীন; চিন্তা বুদ্ধ জর মৃত্যু—এই পৃথিবীর
সবকিছু যেন। বিচ্ছেদের ভয়ে সমস্ত শরীর
আকুঞ্চিত।

যন্ত্রণার কাঁপে প্রাণ রাত্রির জঠরে।

আমাকে দুহাতে তোলো, নিয়ে চলো আলোর গ্রহণে।

জনপদের ছন্দ

রাহুল

॥ রিপোর্টার ॥

পথ-চলার কাহিনী আপাতত বন্ধ রাখি।

কেননা, বিপুল পৃথিবীর কোটি কোটি পথের কোন পথই আমি জানিনে। আমি যে কোন পথই ঘুরিনি।

সুমেরু আর কুমেরু বিন্দুর মাঝখানে কত কোটি কোটি পথ। কত ছবির মত শহর, কত সবুজ গ্রাম, নীলকান্ত হ্রদ, পীতবর্ণ নদী, বাসন্তী রঙের অরণ্য। উত্তর প্রদেশের চন্দন চৌকী থেকে বেরিয়ে পাখীর মত উড়ে চলুন উত্তর-মহাসাগরের তীরে তীরে। ঘুরে আসুন ইউরোপের তুল্লা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত। মানুষের আশী-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সব পথ জড়ানো। তরুণের দ্বীপ ত্রিনিদাদ, সৌন্দর্যের শহর মেক্সিকো।

আচার, আচরণ, চলনের নানা মশলা দিয়ে গড়া পৃথিবীর জনপদগুলি। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস হচ্ছে মানুষের ভালবাসা। সে ভালবাসা গুল্মের ফুল ফোটায়, স্টেপ অঙ্কলে ফসল ধরায়, মরুভূমিতে তুলো বোনে। সে ভালবাসার যেখানে অভাব, সেখানেই হিংস্রতা, ঘৃণা, অশান্তি।

কল্পনা করতে আমার আবেশ আসে। তবু আপনি কল্পনা করুন, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলগাড়ীতে শনিবারে গাঁয়ে ফিরছেন। কিছুক্ষণ চলার পর দেখলেন, আপনার গাড়ীর কামরা, গাড়ীর যাত্রি-যাত্রিনী, মায় বাইরের দৃশ্যপট সব পাল্টে গেছে। আচম্ভক্যবিভূতা স্নেহাংগিনী আপনার কোন সহযাত্রিনীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কোথায় এলেন।

তিনি সবিনয়ে বললেন—“গাড়ী আল্পস পর্বতমালার পাশ দিশে যাচ্ছে।”

ভানিলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, অদূরে কোন হ্রদের মত এক জলাশয়ের নিস্তব্ধ জলে হাঁসের মত চাঁদ ভাসছে। তবে রাত হয়েছে। আল্পসের পাদদেশে ফুলে-চাকা সমতল জমি থেকে অপরিচিত গন্ধ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

আপনার ফি শনিবারে ঘরে-ফেরা কেরানীর জীবনে খুশির জোয়ার লাগবে। ড্যালহৌসী জোয়ার থেকে বেরিয়ে এশিয়া অতিক্রম করে আপনি জেনেভা হ্রদের তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। সে মোতাত করেই হোক, আর পকেটের পয়সা খরচ করেই হোক। কিংবা, বই পড়ে কল্পনার জাল বুনেই হোক।

কিন্তু আগেই বলেছি, পথ চলার কাহিনী আপাতত বন্ধবন্দী।

তার চাইতে এক আজব শহরের গল্প বলব। যে শহরের অবস্থান সমুদ্র থেকে কিছু দূরে এক নদীর তীরে। শহরের নাম আমি করব না। সমুদ্র থেকে কিছু দূরে এবং এক নদীর তীরে কত শহরই না আছে। যেমন, টেম্‌সের তীরে লণ্ডন, টাইবারের তীরে রোম, ইরাবতীর তীরে বেংগল।

সেই আজব শহরে এক প্রকাণ্ড সংবাদপত্রের অফিস। সেখানে রাহুল রিপোর্টারের চাকরি করে। আর রাহুল নিজেকে ধন্ত মনে করে এই ভেবে যে সে, এমন একটি অফিসে ঢুকেছে, যেখান থেকে দেশের জনমত পরিচালিত হয় এবং তাও কলমের জোরে, তলোয়ারের জোরে নয়।

সেই আজব দেশের নিয়ম এই যে, যারা মহৎ কাজ করেন, তাঁদের মাইনে অল্প! অধ্যাপক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতির বেতন বড় অল্প। এত অল্প যে, ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন কোন মহাদয় ভদ্রলোক এদেশে বেড়াতে এসে ওদের মাইনের কথা শুনে চমকে যান।

রাহুলের মাইনেও অল্প। তাতেও রাহুল সন্তুষ্ট। সরস্বতী আর লক্ষ্মীর বিবাদের কথা শিশুকাল থেকেই শুনে এসেছে। সুতরাং স্বল্পেই সে সন্তুষ্ট।

কিন্তু ঘরের অসন্তুষ্টা জীকে বাগ মানাতে কষ্ট হয়। জী বুঝতে চায়না, অর্থের চাইতে যে আদর্শ বড়। জী বলে, শোষণের ফলি যারা করে, এসব তাঁদের বানানো কথা। কিন্তু জীর বলাবলির ধার রাহুল ধারে না। অতএব, জী আর কি করবে? আটপৌরে শাড়ি পরে অন্ধকার-ধূপরিতে কালো মুখ করে বসে থাকে। জী অনুভব করে, মোহর অর্থাৎ মুদ্রার একটা আলো আছে। শিশুর মুখ দেখতে তাই প্রাচীন ভারতে মোহরের রেওগ্লাজ ছিল। আজকাল, নেতাদের মুখ দেখতে সভাসমিতিতে টাকার তোড়া দিয়ে মুখ দেখা হয়।

উনিশশ' চল্লিশ সাল থেকে উনিশশ' পঞ্চাশ সালের মধ্যে ভারতে, পাকিস্তানে, বর্মায়, সিংহল প্রভৃতি দেশে ঘট করে যখন স্বাধীনতা উৎসবের মত একটা কিছু উৎসব অনুষ্ঠিত হল, তখন তার আজব শহরেও স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপিত হল। পথে কত জলল আলো, কত বাজল বাজনা, কত উড়ল নিশান, কত ঝরল গোলাপ জল। ধনীরা পরস্পর খরচ করে বাইজী নাচালেন ঘরে, মোসাহেবেরা বাগানবাড়ীতে মদ খেলেন।

একটা বিশেষ পরিবর্তন যে ওপরে ওপরে হয়ে গেল, রাহুল তা অনুভব করল। কিন্তু রাহুলের জীর কাছে তা' ধরা পড়ল না। পুরুষের হৃদয় চলে ছুঁগে, আর নারীর হৃদয় চলে বৃষ্টির তালে। জী বললে, এ আবার কি স্বাধীনতা? আমাদের কুটো সংসারে স্বাধীনতার মোঁচাক থেকে কোন মধুই যে বরছেনা।

রাহুল বললে, সবুর করো। সবুরে মেওয়া ফলবে।

হাঁ, রাহুল তার জীকে করুণা করে। গোটা জীজাতি সম্পর্কে তার ধারণা ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের মতই। পুরুষ চক্ষুমান, কিন্তু জী অন্ধ। অন্ধ বলেই ওঁরা বাস্তববাদিনী।

ওদের কল্পনাশক্তির বড় অভাব। তাই ওদের মধ্যে গল্পলেখিকা ভালোই আছেন, কিন্তু বড় কবি নেই। ওরা পাল'বাক হতে পারেন, কিন্তু টেগোর হতে পারেন না।

স্বাধীনতার মাহাত্ম্য জীকে বোঝাতে না পেরে এক একদিন রাহুল মনে মনে চটে যেত। মনে মনে ভাবত, স্বাধীনতা সম্পর্কে অবিখ্যাসিনী জী কী সাম্ভাবিতিক বস্তু। কিন্তু ধনীরা জীরা তো এ-ব্যাপারে বিষম পোষণ করেন না। তারা স্বাধীনতার স্বাদ তবে আগে ভাগেই পেয়েছেন। ওদের বিয়ে বাড়ীতে, গাড়িতে, অলিন্দে সব উৎসবেই যে জাতীয় পতাকা উড়ছে। কই, তেমন পতাকা তো গরীবের বস্তিতে, উদ্বাস্তর উপনিবেশে ওড়ানো হচ্ছে না।

নিজের মনে মনে রাহুল কঠোর হয়ে ওঠে। ভাবে, শহরে ঢোল পিটিয়ে দিলে কেমন হয়? স্বাধীনতা সম্পর্কে বারা অবিখ্যাসিনী, তাদের সমুচিত দণ্ড দেয়া হবে। আবার নিজের মনেনেই সে নিজের সমালোচনা করে। তাহলে তো ডিক্টেটরী হয়ে যায়। তাহলে যে, একেবারে মুঘল আমলে গিয়ে ঠেকা যায়।

মনে মনে রাহুল তর্ক করে। প্রায় দুশো বছরের ইংরাজ আমল অতিক্রান্ত হল। দুশো বছরের অন্ধকারে বাহুর পিতা-পিতামহের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরও চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা! স্বাধীনতার উষা কি করে ওরা অমৃতব করবে? তবে, দিনের আলো ক্রমে প্রখর হলে ওরা বুঝবে যে সত্যিই উষা এসেছিল।

জী তর্ক করে—“তবে কি মুঘল বা পাঠান আমলে ভারতীয়েরা স্বাধীন ছিল? জারের আমলে রাশিয়া, চিয়াং-এর আমলে চীন স্বাধীন ছিল?”

নির্ভীক সংবাদপত্র সেবী হিসেবে রাহুলের শিরদাড়া খাড়া হয়। জিগগেস করে—“তুমি কি বলতে চাও?”

জী বলে—“স্বাধীনতা বলতে আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বুঝি।”

রাহুল পাল্টা প্রশ্ন করে—“তবে কি আমাদের নেতারা স্বাধীনতা বলতে তুল বুঝেছেন?”

জী হেসে ফেলল। বললে—“পরের কথা কেন বলছ? সংবাদপত্রের রিপোর্ট করতে করতে কি নিজের স্বাধীন চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলেছ?”

ঠিক যখন তর্ক চলছিল, তখন নিজের কপালে করাঘাত করতে করতে একটি লোক ভিক্টর জন্ত ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সে বললে, সে উদ্বাস্ত-কলোনী থেকে এসেছে। তিনদিন পরে ছ'পরসা যোগাড় করতে পেরে আজ সে ভিক্টর বেরিয়েছে। ঐ ছ'পরসায় সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরনের কাপড়খানি ভাড়া করে এনেছে। সন্ধ্যার মুখে ঐ কাপড় অবশ্য ফিরিয়ে দিতে হবে। গত দু'দিন সে ভিক্টর বেরোতে পারেনি। আজ ভিক্টর কিছু পেনে বরের পোছা জী ও কস্তাকে গিয়ে খড়কুটো কিছু আহাৰ্য দেবে।

রাজবাড়ীর তোরণে যেমন থাকে নহবৎ-মঞ্চ, তেমনি রঙীন কাপড় দিয়ে নহবৎ-মঞ্চ সাজানো হয়েছে। ময়দানে বিরাট স্তার তোড়জোড়। বাশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে

ময়দানের ওপর এক ত্রিভুজ অট্টালিকা খাড়া করা হয়েছে। আজ ঐ অস্থায়ী অট্টালিকার চূড়া থেকে ভাষণ দেবেন এক বড় নেতা।

ময়দানের ঘাসের বুকে রাহুল ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। হাতে পেন্সিল আর নোট বুক। লক্ষ্য করছে, কোনদিকে নেতা আসেন। শাদা জমির ওপর লালপেড়ে ফর্সা শাড়ি পরে স্বেচ্ছাসেবিকারাও ঘুর ঘুর করে ঘুরছে ওদিকে। রাহুলের দৃষ্টি বাজ পাখীর মত। এখানে ওখানে ছোট ছোট রোমান্টিক ঘটনাও লক্ষ্য করছে। হবু ছোট ছোট নেতারা স্বেচ্ছাসেবিকাদের সংগে ঠাট্টা-ইয়াকি করছেন। ছোট ছোট নেতার হাতের গোলাপ ফুল কখন যে কোন স্বেচ্ছা-সেবিকার খোঁপায় গিয়ে উঠছে, রাহুল তা লক্ষ্য করছে।

অবশেষে নেতা এলেন। নেতা বক্তৃতা দিলেন। রাহুল সেই নেতার ভাষণকে দাড়ি, কমা, সেমিকোলন মিলিয়ে টুকে নিল। বারংবার তথ্যের ওপর জোর দিয়ে নেতা বলেছেন যে, মাচ্চা আজাদি মিলেছে।

সভা যখন সাংগ হল, তখন খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছে সেই খবর সাজিয়ে লিখে দেয়ার পালা। পরদিন কাগজে সে খবর বেরোবে। রাহুল অফিসের দিকে ছুটল।

রিপোর্ট তৈরী করতে বসে প্রথম খটকায় পড়ে গেল রাহুল। সভায় কত লাখ লোক হয়েছিল? পাছে অসুমানটা ভুল হয়, সেজন্য অন্য একটি দৈনিক কাগজের অফিসে সে টেলিফোন করে জানতে চাইল, সভায় কত লোক হয়েছে। টেলিফোনের অপর দিক থেকে জবাব এল—“আমাদের কাগজে চার লাখ লোকের কথা লিখছি।”

রাহুল তখন রিপোর্টে লিখল :

“গতকাল্য চারিলক্ষ জনতার এক বিপুল সমাবেশে...”

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। সরকারী দপ্তরখানার প্রচার বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হল যে, জনতার সমাবেশকে যেন ছ’লক্ষের হিসেবে ফেলা হয়।

অগত্যা রাহুল রিপোর্ট লিখল :

“গতকাল্য ছয়লক্ষ জনতার এক বিপুল সমাবেশে...”

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। কি ব্যাপার? রিপোর্ট লেখা আর এগোচ্ছে না। টেলিফোন এসেছে আরো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে। জনতার সমাবেশকে বেন আট লক্ষের হিসেবে ফেলা হয়।

রাহুল খানিকটা বিরক্তিবোধ করল বৈকি। তবুও রিপোর্ট লিখে দিতে হবে।

শেষে সে লিখল : “গতকাল্য আট লক্ষ জনতার এক বিরাট সভায়...”

মস্ত বড় রিপোর্ট লেখা শেষ করে রাহুল যখন বাড়ীর দিকে চলল, তখন আকাশের চাঁদ হেলে পড়েছে।

আজব শহরের পথ ঘাট নির্জন। শহরের ট্রাম-বাস কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পারে হেঁটে ক্লাস্ত হয়ে সে যখন বাড়ীতে পৌঁছল, তখন তার চোখ অন্ধকারে আলো দিচ্ছে। সেই আলোর সাহায্যে সে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল স্ত্রী ।

জামা কাপড় খুলতে খুলতে রাহুল তার স্ত্রীর কাছে নেতার বর্ণনা দিতে লাগল । কিন্তু স্ত্রী যেন ঘুমের চুলে পড়ছে । বরফের মত ঠাণ্ডা ভাত ডাল দিয়ে গিলতে গিলতে রাহুল জিগগেস করল—“তুমি কি স্বাধীনতার নামে কোন প্রেরণাই পাওনা ?”

সহজ কণ্ঠে স্ত্রী বললে—“প্রেরণা পেতাম, যদি তুমি লোককে ফাঁকি না দিতে ।”

ভাতের গ্রাস মুখে আর তোলা হলনা । রাহুল অবাক হয়ে শুধাল—“আমি ফাঁকি দিয়েছি ?” সংগে সংগে তার মনে পড়ে গেল, কেমন করে চার লক্ষ লোককে সে আট লক্ষ লোক বানিয়ে এসেছে । একজন বিশেষ নেতার সম্মান প্রদর্শনের জন্তেই তো একটু আগে তার রিপোর্টে কিছুটা ফাঁকির খাদ মিশিয়ে দিয়ে এসেছে ।

স্ত্রী বললে—“বাড়ী ভাড়া দু’মাসের বাকী পড়েছে । আজ সন্ধ্যায় এক মাসের বাড়ী ভাড়া নিয়ে যাবার জন্য তুমি যেয়াদ করেছিলে । লোকটা এসে তোমাকে না-পেরে আমাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে গেছে ।”

করুণ কণ্ঠে রাহুল বললে—“অফিসে বোনাস পাব পাব শুনেছিলাম । সেই আশায় আজ এনে একমাসের বাড়ী ভাড়া নিয়ে যাবার জন্য বাড়ীগুলোকে লোক পাঠাতে বলেছিলাম । কিন্তু বোনাস তো আমি পাইনি । কাজেই তোমার হাতে ভাড়ার টাকা রেখে যেতে পারিনি ।”

* * * * *

রাহুল ঠাণ্ডা ভাতের ওপর জল ঢেলে দিল । আর ভাত খাওয়া হলনা । অবশ্য, এমনিতেই সে জল ঢালত । রোজ রোজই ঠাণ্ডা ভাত খেতে হয় । আজ আরো বড় রিপোর্টের জন্য বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল ।

রিপোর্টার রাহুল সেই আজব শহরের প্রাদেশিক আইনসভার ভেতর গ্যালারিতে বসে রিপোর্ট নিচ্ছে । কিন্তু রিপোর্ট নেবে কি ? বাইরে জন সাধারণের কলরব ক্রমেই বাড়ছে । সরকারী নিষেধ অমান্য করে আইনসভার বাইরে প্রধান ফটকের সামনে জনতার ভিড় বাড়ছে ।

আইনসভায় ঢোকার সময়ই রাহুল অলক্ষণের আভাস পেয়েছিল । প্রথমে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত মানুষগুলি সরেও পড়তে পারে । কিন্তু ক্রমেই দেখা যাচ্ছে, লোকগুলির জিহ্বার অস্ত নেই । তারা যে শ্লোগান দিচ্ছে, তাতে ভিত কাঁপছে পাথুরে প্রাসাদের ।

কি হয়, না জানি কি হয় । তবে ভরসা এই যে, প্রাদেশিক আইনসভার যিনি নেতা, তিনি ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন করে এসেছেন নিজেই । সুতরাং আইন-অমান্য আন্দোলনের গুরুত্ব তিনি বোঝেন ।

আহা, এই অহিংস নেতার সংগে কতদিন রিপোর্ট করতে বস্তুতে বস্তুতে রাহুল ঘুরেছে । আজব-শহরের প্রাসাদগুলির পেছনে সর্বত্র বস্তু ছড়িয়ে আছে । শহরের উত্তরে

দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে কত বস্তিই না আছে। ঐ বস্তিগুলোতে প্রায় দশ-বারো লক্ষ গরীব বাস করে।

প্রাদেশিক আইনসভার যিনি আজ নেতা, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী, তিনি যদি আরোহণ করে প্রথমেই চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে যেমন জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তেমনি বস্তির দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

এমন একজন নেতার পেছনে কে কাদের উসুকে দিয়েছে বলেই না আজ এই আইন-সভায় বাইরে এত গোলমালের সূচনা। রাহুল মনশ্চক্রে দেখতে লাগল, প্রধান ফটকের সামনে ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। ভিড়ের লোকগুলির চেহারা ক্ষুধার্ত লাগলেও আসলে ওরা ক্ষুধার্ত নয়। তবে অসন্তোষের আগুন ওরা ধিকি ধিকি জ্বলছে।

কেন এসেছে ওরা? ওরা কোন বিশেষ আইনের প্রত্যাহার চায়। ওরা বলছে, এ আইন ওরা পাশ করতে দেবেনা। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওরা তাদের বিক্ষোভ জানাতে এসেছে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে, তিনি যা কিছু করেন, দেশের মংগলের জন্যই করে থাকেন। নেতার বুদ্ধি জনতার বুদ্ধির অনেক ওপরে।

রাহুল উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল দূরগত হংকারের মত মানুষের একত্রিত আওয়াজ। কী জানি কী হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চেয়ারে বসে অস্থির হয়ে উঠছেন। অস্থির হবার কারণ, লোকগুলি মুখ্যমন্ত্রীর দর্শন লাভ করতে পারছেন। তারা পুলিশ আর মার্জেন্টের প্রতাপে ফটকের বাইরে আটকা পড়ে গেছে। ওরা চীৎকার দিচ্ছে “ইয়ে আজাদি খুটা হায়।”

সহসা রাহুল লক্ষ্য করল, মুখ্যমন্ত্রী উঠে বাইরে যাচ্ছেন। রিপোর্টারের গ্যালারিতে গুঞ্জন উঠল। সভার অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুগ্ধবী রাখা হয়েছে।

বাইরে ছুটে এল রাহুল। এসে একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি দাঁড়াল। মুখ্যমন্ত্রীর চোখে মুখে কী উত্তেজনা। ফটকের বাইরে উত্তেজিত জনতার দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলতে লাগলেন, তিনি যা করছেন, দেশের মংগলের জন্যই করছেন।

কিন্তু কার কথা কে শোনে? সম্ভবত ফটক পর্যন্ত এগোবার আগেই জনতা কয়েকবার পুলিশের টিয়ার-গ্যাস খেয়ে এসেছে। কাছেই তারা উত্তেজিত।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। রাহুলের দৃষ্টি চক্রে ভাসতে লাগল পতনোন্মুখ জ্বরের প্রাসাদের ছবি। ছবিটি সে কোন এগজিভিশনে দেখে এসেছে। একদিকে ক্ষুধার্ত ঝাঁক ঝাঁক মানুষ। অন্যদিকে পালিশ, পরিচ্ছন্ন, শস্যপাণি-প্রাসাদরক্ষীরা।

রাহুল তাকাল মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। উত্তেজনায় তিনি কাঁপছেন। জনতা কোনমতেই বাগ মানতে চাইছেন। তিনি টিয়ার-গ্যাসের আদেশ দিলেন। মুহূর্তে হুঃসহ-গঞ্জে এবং ঘোঁয়ার আবরণে বাতাস বিকৃত হল। ঝাঁকঝাঁক টিয়ার-গ্যাস ফাটছে। জনতা বসে পড়েছে বাস্তার পাষাণের ওপর।

কিন্তু জনতা দমবার নয়। তাদের অনেকেই ভতকণে সামলে নিয়েছে। টিয়ার-গ্যাসের গুলী পাথরে পড়ে ফাটবার আগেই কিপ্রহস্তে আবার ওরা গুলীগুলো পুলিশের দিকে ফিরিয়ে দিতে লাগল। সম্ভবত ওটাকেই ওরা আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করতে লাগল।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু পুলিশের মাঝখানেই ছিলেন, তিনি সম্ভবত ভাবলেন, জনতা তাঁকেই ভাগ করছে। ভয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করে ধামের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু এ লড়াইয়ের শেষ কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত শত্রুপাণিদের অনুরোধে সত্যিকারের গুলী-চালনার নির্দেশ দিলেন। নকল গুলী থেকে এবার আসল গুলী।

ঝাঁক ঝাঁক ছুটল গুলী। মানুষকে হত্যা করার জন্য গুলী। মুখ্যমন্ত্রী চেয়ে দেখতে লাগলেন। পথের ওপরে অপরিচিত মানুষগুলির চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওদের পালাবার পথ নেই। চারদিকে প্রাসাদ। প্রাসাদগুলির সমস্ত দরজা বন্ধ। পালাবার সমস্ত পথকে নিশানা করে গুলী ছাড়া হচ্ছে।

মানুষের প্রাণ-পায়রা লক্ষ্য করে এমন ঝাঁক ঝাঁক গুলি জালিওয়ানাবাগেও হয়েছিল। সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী সে-দৃশ্যের কথা কল্পনা করতে লাগলেন।

রাহুলের মনে ফাটল ধরছে। তবু ফাটস সে জোড়া দিতে চায়। ভাবে অক্লান্ত দেশের কথা। সে শুনেছে, স্বাধীনতার পরের অবস্থা কোন কোন দেশে নাকি দুঃখের হয়েছে। ঠিক, দুঃখের বললে ভুল হবে। দুঃখ-বরণের হয়েছে। কিন্তু আত্ম-কুচ্ছুরতার দুঃখ-বরণকেও ঐ দেশের জনসাধারণ হাসি মুখে মেনে নিয়েছিল।

দুঃখের কথা মনে উদয় হলেই নিজের জীবন করুণ মুখখানি মনে হয়। স্ত্রী প্রায়ই দুঃখ করে আর বলে, সে আরও পঞ্চাশ বছর পরে জন্মালে এমন দুঃখ পেতনা।

রাহুল স্ত্রীকে বোঝাতে ক্রটি করেনি যে, ওর চাইতে সহস্রগুণ দুঃখী আজব শহরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ক্ষয় রোগে নিভস্ত যে-শিশু, উপবাসে মলিন যে-বধূ, হাজার চেষ্টায় বিকল-মনোরথ যে-বেকার, তাদের সংখ্যাভীত দীর্ঘশ্বাসে আজব শহরের বায়ুমণ্ডল যে অক্লান্ত ভাবে জ্বলছে।

স্ত্রী বোঝেনা। শিশু-রাষ্ট্রের অবস্থাটা সে বুঝতেই চায় না। বরঞ্চ বিজ্ঞপ করেই বলে—“দশ বছর পরেও দেখে নিও, তোমার রাষ্ট্র শিশুই আছে। জনসাধারণের দুঃখ যেমনি আছে, তেমনিই থাকবে।”

রাহুল বলে—“কিন্তু প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা পূর্ণ হোক। তখন দেখে নিও।”

স্ত্রী বলে—“কাগজে-কেতাবে পরিকল্পনার মাহাত্ম্য বুঝিনা। চোখের সামনে যদি দেখতে পাই, দেশে বেকার কমে গেছে, রোগ মরে গেছে, অশিক্ষা উবে গেছে, লোকের স্বাস্থ্য-স্ত্রী ফিরে এসেছে, তবে বুঝব। হ্যাঁ, সত্যিই কিছু হয়েছে।”

রাহুল স্ত্রীকে বোঝাতে পারে না। কি কবেই বা বোঝাবে?

সে বাস্তববাদিনী। স্বামীর মত কল্পনা-প্রবণতা তার নেই।

কিন্তু একটা জিনিস রাহুল সহ করতে পারে না। সেটা হল, গুলী। গুলীবর্ষণ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে নিজেই একদিন প্রায় গুলীর শিকার হয়েছিল। পুলিশ সম্ভবত জনতাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিল। কিন্তু ভিড়ের কঙ্গরবের মধ্যে সেসব সাবধান বাক্য শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তাই সে সরে যেতে পারে নি। এবং গুলী খেতে খেতে বেঁচে গেছে।

সেই ইংরাজ আমলে যেমন প্রাণের মূল্য ছিল না, তেমনি প্রাণের মূল্য আজো নেই। অথচ স্বাধীনতার সনদে প্রথম কথাই হচ্ছে বাঁচবার অধিকার। সে অধিকার কোথায়? দ্বিতীয় অধিকার হচ্ছে বসবার অধিকার। সে অধিকার কোথায়?

লোকটা গলা টিপে ধরেছে।

রাহুলের গলা টিপে ধরেছে লোকটা। কোন মতেই খাস নিতে পারছেন না রাহুল। কোন শঙ্কোচ্চারণেরও ক্ষমতা নেই। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে শরীর।

খুনে লোকটার সন্ধিৎ ফিরে এস। হঠাৎ সে অসুস্থত্ব করতে পারল যে, ধবরের কাগজের রিপোর্টারকে সে প্রায় খুন করে কেসছে।

তৎক্ষণাৎ সে রিপোর্টারকে ছেড়ে পালাতে শুরু করল। আর লোকটার হাতের বস্ত্র-বেষ্টনি শিথিল হতেই রাহুলও ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান আছে, কিন্তু উত্থান-শক্তি নেই রাহুলের।

আকাশের সূর্য তখন যাই যাই! আজব শহরের সেরা প্রাসাদগুলোর চূড়ায় তখন সূর্যের গাত্র-হরিজ্ঞার শেষ ছাপ! শুয়ে শুয়ে রাহুল শুনছে জনতার হুড়োহুড়ির শব্দ। কারা পালাচ্ছে? কারা তেড়ে আসছে? রাহুলের উঠবার শক্তি নেই।

এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। রাহুল অসুস্থত্ব করল, কার হাতের স্পর্শ যেন। অবশ্য ভাবে তাকিয়ে দেখল, সেই খুনীই ফিরে এসেছে।

খুনীর মুখ এবারে যমতায় ভরা। আগের মত পৈশাচিক নয়। রাহুলকে চোখ মেলে চাইতে দেখে লোকটি বললে—“আমাকে ক্ষমা করুন। অতটা শাস্তি আপনাকে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না।”

অস্ফুটকণ্ঠে রাহুল শুধালে—“আপনি কে?”

খুনী লোকটি বললে—“আমি একজন শিকক। গুণা নই, বাটপাড় নই।”

“আমার খাসরোধ করছিলেন কেন?” রাহুল শুধাল।

লোকটির মুখমণ্ডলে আবার একটা দৃঢ়তা ফিরে এস। দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে বললে—“আপনি নিতান্তই শুনতে চান?”

রাহুল উত্তরে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল।

লোকটি বলল—“প্রতিদিন প্রতিটি ধবর পথ থেকে আপনারাই সংগ্রহ করেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, বিষয় বা ঘটনা, অনেক সময় আপনারা তার উল্টো ধবর যেন?

জাহাঙ্গীৰ, আপনাদের কাগজের সম্পাদকীয় অনেক সময় জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যায়। কাগজের কাউকে স্বাধীন সামনে পাচ্ছি, অথচ আপনাকে সামনে পেয়েছি, তখন বহুদিনের ইচ্ছাকে সার্থক করেছে।”

রাহুল শুভাল—“আপনি কি জানেন না যে, খবর-রচনা করার ব্যাপারে কাগজগুলির নিজস্ব পলিসি থাকে?”

লোকটি বলল—“অত ভাববার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে হল, আপনাকে কিছু দ্বিধা দিয়ে দিই।”

রাহুল শুভাল—“যেতে যেতে আবার ফিরে এলেন কেন?”

লোকটি এবার রাহুলের পাশে বসেই পড়ল। বয়সে ত্রিশ-বত্রিশের মত। চেহারা খানি অভাবগ্রস্ত শিক্কের মতই। ঠুঁর কণ্ঠের ডানদিকের নীল শিরা কথা বলতে বলতে যারবার যে অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে ওঠে, তা সম্ভবত অতিরিক্ত টুইশানির ফল।

লোকটি বলল—“আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। সহসা রাগের মাধ্যমেই’ করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত।”

এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে পুলিশের একজন সাব-ইনস্পেক্টার ছুটে এলেন। তিনি এলেন রাহুল তাঁকে চেনে।

তিনি বললেন—“আমি দূর থেকে সব লক্ষ্য করছি। একে আমি খানার নিয়ে যেতে চাই।”

লোকটির চোখ ক্রমশ হয়ে এল। সম্ভবত খানার রাত্রি-খাপনের এক নিষ্ঠুর ছবি তার মস্তিষ্কপটে শিক্কের কবি-কল্পনার রঞ্জিত হল। লোকটি রাহুলের হাত চেপে ধরল।

রাহুলের শক্তি ক্রমেই ফিরে আসছিল। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশ-অফিসারকে বলল—“আমি বলছি, ইনি আমার বন্ধু। একে ছেড়ে দিন।”

পুলিস-অফিসার লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে আন্তে আন্তে অন্য দিকে চলে গেলেন। সম্ভবত তিনি খুব বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাহুল লোকটিকে বলল—“আপনি সরে পড়ুন। দেখছেন না, রাত্তার খমখম ভাব। আমিও চলি।”

দিনের থর মাস গেল পড়িয়ে। বছর ঘুরল।

রাহুলের সাংসারিক অভাব মিটল না। মনের স্বন্দ আরও বেড়ে গেল।

শের পরস্ব রাহুলের সাংবাদিক বৃত্তির কি হল, নাই বা শুনলেন।

তবে জেনে রাখুন, রাহুলের চাকরি গেল। কিংবা রাহুলই চাকরি ছাড়ল।

সে ভয়ানক দিনগুলোর ছবি আঁকবার মত নয়। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লিখলেই এদেশে চাকরি পাওয়া যায় না। চাকরির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই যেখানে, সেখানে চাকরি কি কয়েই বা বেবে সরকার?

জীব চোখের অন্ধকারের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এসে রাহুল গয়নাগুলো বেচতে শুরু করল। অনুভব করল, পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকারে আরও মানুষ আসে। বিবেক আছে, অথচ নিরুপায়। এমন কতশত মানুষ অন্ধকারে খিড়কির দরজা দিয়ে সেকরার দোকানে আসতে বাধ্য হয়।

বেকার জীবনে বৈরাগ্যের ডাক আসে। পথচলার নেশা পেয়ে বদল রাহুলকে। আর যোগাযোগ হয়ে গেল।

চলল রাহুল আজব শহর ছেড়ে। একদিন ট্রেনে উঠে সে গুড-বাই করল আজব শহরকে। ক্রমেই মিলিয়ে গেল পরিচিত শহরের পুলের শেষ চূড়া। মুখ ঝুঁকি বসে বইল গাড়ীতে সে। আর এক নতুন জীবিকা তাকে হাত ছানি দিয়েছে।

সেই রাহুল আজো পথে দোরে। ঘুরতে ঘুরতে সে গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী পেরিয়ে যায়। আর মনে মনে এখন তখন সে হিমালয়ও পেরোয়। কিংলা মনে মনে কাবুল, কান্দাহারের পথে, খোরাসান বোদকশানের পথে সমরখন্দের দিকে চলে।

শিশুরাষ্ট্রের বয়স তো কম হল না। কিন্তু পরিবর্তন এস কোথায়?

রাহুল পৃথিবীর ভূগোল উলটায়, ইতিহাস উলটায়। লক্ষ্য করে যে পৃথিবীর বহুদেশ জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের রেসের ঘোড়া আগেই বাজী জিতবে। কিন্তু তার আজব দেশের ঘোড়া চলছে বিলম্বিত লয়ে। এবং ঘোড়া যে কবে কোথায় পৌঁছবে, তীও ঠাহর করা যাচ্ছে না।

কিন্তু তবু রাহুল আশার আলো জ্বালিয়ে বসে আছে। তার আজব দেশের জনগণ নিশ্চয় একদিন লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া সে সামনে মেলে ধরে বসে আছে। সে অনুভব করছে কোথায় যেন আশার আশাবরী রাগিনী বেজে উঠেছে।

॥ বিষ্ণু দে-র কবিতার বই ॥

উর্বশী ও আর্টেমিস্,
পূর্বলেখ,
সন্দীপের চর,

চোরাবালি,
সাত ভাই চম্পা,
অশ্বিষ্ঠ,

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
শেষের তিনটি বই এখনও পাওয়া যায়

সিগ্‌নেট বুকশাপ

প্রথম চারটির কিছু কিছু কবিতা

নাভানা-প্রকাশিত

কবিতা সংকলনে আছে

সংগীতের আসর

বৈদ্যনাথ ঘোষ

‘শ্রাওড়া তলার আম গেলে, কে যায় মিছে আমতলে’। শ্রাওড়া গাছ সহজলভ্য তাতে আবার যদি আম পাই কি দরকার আমের বাগানে। বিজ্ঞানের যুগে শ্রাওড়া গাছে আম কলাবার সাধনা মন্দ কি? কিন্তু যুক্তিস এই এখানেও সেই ‘সাধনা’! তা হলেই এলো আবার সেই ছেনার বড়াকে রসগোল্লা করার কারদা! শ্রাওড়া গাছের আম কেমন হবে না কেনেও একদল লোক আম শ্রাওড়ার সাধনার মসৃণল থাকতে পারেন শুধু নূতন আশ্বাদের লোভে। আবার এমন কি একদল স্বভাবধর্মী এও বলতে পারেন ছেনার-বড়ার প্রয়োজনটা কৃত্রিম তার চেয়ে বিশুদ্ধ ‘ছেনা’ অনেক স্বাস্থ্যকর, সহজলভ্য স্বাভাবিক! আজকের এই সমস্তাকীর্ণ মানব সমাজে, কলা যদি দেখাও তো এমন কলা দেখাও যা টপ ক’রে গেলা যায়। যা গিলুলে পেটের উপকার হবে। শরীরধর্ম রক্ষা পাবে। এই যে রুচির পার্থক্য এও চিরকালের। তবু অতীতে ছিল অধিকার ভেদ, রসিক-অরসিকের গভী টেনে দেওয়া ছিল সহজ। সংস্কৃত কলাবিদ্যার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সংস্কৃতিবানদের ওপর।

অরসিকের কাছে রস নিবেদন ছিল দুর্ভাগ্যের কথা, কলাবিদদের কাছে। এ-যুগে এভাবে আর আশ্বরক্ষা করার অবকাশ নেই তাঁদের। তাই অনেক কলাকারের প্রচলিত পথ বদল ক’রে নয়া সড়ক বানাবার বাসনা জেগেছে। এ-সংকল্পের মধ্যে প্রেরণার চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদ বেশি। তাই সংগীতের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় সস্তায় আসর মারার কৌশল তা সে কি উচ্চাঙ্গ সংগীতে কি সাধারণ সংগীতে। কলাওয়াত কলাসৃষ্টির চেয়ে কলাকৌশল, ভাবের চেয়ে বুদ্ধি, লালিত্যের চেয়ে ক্রিয়নাট্যিককে প্রাধান্য দিয়ে চ’লেছে আসরে হাততালির মোহে। কারণ কি? কারণ এ না হলে তাঁর পাঁজিতে একাদশীর দিন বাড়বে। সাধারণ সংগীতে শৃঙ্খার রসের প্রাচুর্য কারণ এই রস গ্রহণে অধিকার ভেদ নেই বললেই হয়, গায়কের পাঁজিতে দুর্গোৎসবের দিনও বাড়বে। এখন প্রশ্ন হ’চ্ছে এ-বুদ্ধি কি কলাবিদ্যার ক্রমবিকাশের দ্বারা বিপর্যয় ঘটাবে না? নিশ্চয় ঘটাবে। শ্রোতার বিকৃত রুচি কলাবিদকে বিপথগামী ক’রে তুলেছে। ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিশ্ববিজয়ী গৌরব লুপ্ত হবে। রাগসংগীতের সহস্র সহস্র রসবৈচিত্র্য একাকার হয়ে যাবে। সুরভাগীরথীর স্রোত রুদ্ধ হ’য়ে পড়ল ক’রে তুলবে তটভূমি। সাধারণ সংগীতের বিপদের সম্ভাবনা কম কারণ সহজাত প্রাণশক্তি তার সম্বল আর সম্বল ভাষা বা কাব্য; দেশ-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা তার রক্ষাকবচ। কিন্তু যে সংগীত বলাকার মত

দেশ, কাল পাত্রের উদ্দেশ্য তার পক্ষ বিস্তারে অভিসারী, যে-সংগীত সৃষ্টির উৎস আবিষ্কার ক'রেছে সহস্র বৎসরের অব্যাহত সাধনার মধ্যে, নব নব রসসৃষ্টির প্রেরণা ও সম্ভাবনা যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে অনুরক্ত, সেই মহামূল্য সম্পদ যদি বিকৃত হয় এ কালের থাকায়, তার ক্ষেত্র কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি আগামীকালের কাছে ? উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সম্পদ উত্তরপুরুষের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কলাবিদদের এ-কথা কি তাঁরা ভুলে যাবেন একাদশীর আশঙ্কায় ? বিশ্বাস করি না। কারণ ইতিপূর্বে বহু ঝড়-ঝাণ্টা বহু রাষ্ট্র-বিপ্লব বহু বিকল-শক্তির সঙ্গে এ সংগীতের শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেছে। ভারতের মুসলমান বিজয় এই সংগীতের অধঃপতন ঘটতে গিয়েও একে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে, এর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে একে মাথায় তুলে নিয়েছে ; এ সংগীত জানতে গিয়ে এতে বিলীন হ'য়ে গেছে। ভারতের ইংরাজ বিজয় ভারতীয় সংগীতে এনেছিল বোর দুদিন। ইংরাজ তাঁর চক্চকে নূতন সভ্যতার তপোয়ারে প্রাচীন সভ্যতার মু'সাম্ভেদ করার অভিসারী ছিল। ইংরাজী শিক্ষার তাড়নায় সে-যুগে নব্য ভারতীয়রা প্রাচীন সব কিছুর ওপর হ'লেন বিতরণ। ভারতীয় সংগীত আশ্রয়কার আশ্রয় ছোঁগড় করলে ক-একজন দেশীয় রাজ দরবারে, অশিক্ষিত সংগীত-কলাবিদ মহলে, এবং বাঈজীমহলে। সেদিন ভারতীয় সংগীতের চরমতম দুঃখের দিন ; বিকাশ তো দূরের কথা আশ্রয়কার ক্ষেত্রে শামুকের জায় আশ্রয়গোপন তার বিধিসিপি। নূতন শিক্ষিত সমাজ তাকে অপাংক্তের ক'রে গর্ব বোধ ক'রলে। নিজেদের বিলাসকক্ষে বিদেশী যন্ত্র বিদেশী সংগীত বিজাতীয় ভাববিলাসের ভণ্ডামী তাদের কামনার বস্ত্র হয়ে উঠলো। তারপর ভিক্ষাপাত্রের শূন্যতা এই ভিক্ষুকদলকে ফেরালো স্বধর্ম। এতো বেশিদিনের কথা নয়। তাইতো বিশ্বাস হয় না আমাদের এই অমর কলাবিদ্যা কোনো দিনও লোপ পাবে। গত শতাব্দীর থাকা ভারতীয় সংগীতের মৃত্যু ঘটতে পারেনি সত্য কিন্তু কতকগুলি স্থায়ী আঘাতচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে কলাদেবীর অঙ্গে। অশিক্ষিত কলাবিদ-সমাজ আশ্রয়কা, আশ্রয়তুষ্টি, আশ্রয়গোপনের তাগিদে রসিকসৃষ্টির কর্তব্য ভুলেছেন ; আপন বিচার বিকাশ সীমাবদ্ধ ক'রেছেন ; নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য অন্তের প্রতি অবিচার ক'রেছেন, অন্তের সৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞার ইদিতে আশ্রয়তুষ্টিলাভ করেছেন। ঘরোয়ানা সংগীতজগৎ নিজ ঘরোয়ানার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে এতোই উদ্গ্রীব যে তাতে সংগীতকলাবিদ্যার অমঙ্গল হ'লেও তাঁরা দুঃখিত হতেন না। কোন কলাবিদের কোনো নিজস্ব ভাবব্যাঞ্জনা শুন্লে তাঁরা তাঁকে বিজোহী ব'লে কোণঠেসা করতে চেষ্টা করেছেন। অথচ প্রত্যেক ঘরোয়ানা তাঁদের নিজস্ব রীতিনীতিকে আসল প্রমাণ করার স্বপ্নে ব্যস্ত থাকতেন। যার ফলে কলাওয়াতদের মধ্যে আশ্রয়কলহ কলাবিদ্যার প্রতি রসিকশ্রেণীকে শ্রদ্ধাহীন ক'রে তুলেছিল। এ ছাড়া রাজ-আশ্রয়ে আশ্রিত কলাওয়াতগণ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে জনসাধারণকে বিকৃতরুচির দিকে ঠেলে দেবার সহায়তা ক'রেছেন। আজ যদি জনসাধারণ বলে উচ্চাঙ্গ সংগীত আমাদের ভাল লাগে না, সেটার জন্য উত্তরপক্ষ সমভাবে দায়ী নয় কি ? হয় তো দায়ী কিন্তু সে অপরাধের মূল সেই চরম

দুদিন যখন আশ্বরক্ষা কলাবিদদের একমাত্র লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, একথাও ভুলে চ'লবে না। আজকের সমস্ত প্রধানত উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে কি সেই দুদিনের মত ? নিশ্চয় নয় ! অর্বাচীন কালে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এমন ক-একজন মনীষীর আবির্ভাব হয়ে গেছে যার ফলে সংগীতকলার এনেছে নব প্রাণশক্তি, শৃঙ্খলা, ও ক্রমবিকাশের প্রেরণা। বহু শিক্ষিত কলাবিদ আজ জীবনধারণের সমস্ত ক'রেছেন সংগীতকে। সাধারণ জীবনে সঙ্গীত হ'য়ে উঠেছে অনিবার্য বিলাস ; এই বিলাসী জনসাধারণকে রসিকজনসাধারণে পরিণত করার দায়িত্ব কলাবিদদের ও সংস্কৃতিবান রসিকজনসাধারণের। কলাবিদরা যদি শুধু তাঁদের হাততালির মোহে মশগুল থাকেন এ-কর্তব্য থেকে তাঁরা বিচ্যুত হবেন, ফলে তাঁরা কোণঠেসা হবেন ; কারণ খুবই সহজে বোঝানো যেতে পারে একটি উদাহরণ দিয়ে যথা,—একজন সার্থক যন্ত্রবিদ তাঁর সেতারে যখন রাগ আলাপের বিচিত্র মাধুর্য সৃষ্টি করেন বা তাল, লয়, রাগের, শুদ্ধতার মধ্যে গৎ বাজান তখন বাহবা পান না সে রকম, যে রকম হাততালির বাহবা পান 'ঝালার' কাজের কেরামতির মধ্যে। আমার বিশ্বাস কোন সংগীতবিদ এতে সত্যিকারের আনন্দবোধ করেন না। তবু যদি এই ধরনের সহজ কাজের মধ্যে শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে থাকেন ভবিষ্যতে সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘোর দুদিন বনিয়ে আসবে। সংগীত ভাল লাগা না লাগা বা কোন কলাবিদ্যা ভাল লাগা না লাগার মধ্যে একটা মূল সূত্র আছে—সেই কলার সঙ্গে পরিচিতি বা একাত্মবোধ। শ্রোতা বা রসিক সৃষ্টি রাতারাতি সম্ভব নয়, কলাবিদ্যার বিকৃতি ঘটিয়েও নয়। কোন কলাবিদ্যা যদি স্বধর্ম নষ্ট করে শ্রোতার খাতিরে তাতে তার মধ্যে অরাজকতা অনিয়মিত বিক্ষিপ্ত সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ঘটবে। ক্রমবিকাশের দ্বারা বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে অক্ষম ; নব সৃষ্টির বদলে একঘেয়েমিতে ভ'বে উঠবে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যেও যে স্তর বিভাগ আছে তাকে বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। যথা—
 ঋপদ যেন ঋপদের মতই গাওয়া হয়। খেরাল খেরালের মত, ঠুমরী ঠুমরীর মত, টপ্পা টপ্পার মত। ঋপদ+খেরাল+ঠুমরী শ্রোতাদের মনোরঞ্জনার্থে বা কলাবিদদের অজ্ঞতার ক্ষেত্রে যদি প্রচলিত হয় সেটা সংগীতের সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ব্যাহত ক'রবে। সাধারণ শ্রোতাদের এ বিষয়ে অন্ত্যস্ত ক'রে তোলার উপায় হ'চ্ছে কলাবিদদের আত্মসংযম ও একতা এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা বোধ। ধাঁরা বছরের পর বছর স্বরসাধনার মধ্যে অমানুষিক নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন তাঁদের কাছে সংগীতকলার প্রতি নিষ্ঠার কথা অপ্রয়োজনীয় হ'লেও একথা বলা যায় অনেকক্ষেত্রে নিজেই কলাবিদ্যার ওপরে আসন দেবার অস্ত্রে তাঁরা ব্যগ্র হ'য়ে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভার সার্থক শিল্পসৃষ্টি সর্ব দোষ হরণ করে বটে কিন্তু সংস্কৃত কলাবিদ্যার দ্বারা অব্যাহত রাখতে হ'লে এ-ছাড়াও আত্মসংযমের, আত্ম-ত্যাগের প্রয়োজন আছে। কি ক'রে উচ্চাঙ্গসংগীতও সকলের মন মাতাতে পারে বা তাতাতে পারে তার উপায় আবিষ্কার আজ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে কলাবিদদের। কারণ রাজাজমিদার নেই ; রাষ্ট্র ক-একজনকে পুষ্ট ক'রতে পারে। কলাবিদদের ভরসা এক রসিকসমাজ। এবং সাধারণ শ্রোতাশ্রমী ; সংগীতকলার শুদ্ধতা বজায় ও শ্রোতার মনোরঞ্জন ছাড়া শুধু দায়িত্ব

কলাওয়াতদের স্বক্ষে । জাপানী গান যেমন বাঙালীর ভাল লাগা অস্বাভাবিক তেমনি উচ্চাঙ্গ সংগীতও এক জাতীয় শ্রোতার ভাল লাগা অস্বাভাবিক ; কারণ মূলতঃ একই, পরিচয়হীন মিলন । কিন্তু দরদী সংগীতশ্রোতা হুয়েরি মধ্যে রসের সন্ধান পেতে পারেন । অনেকের কাছে ভাষার ব্যবধান সংগীতরস গ্রহণের বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় । এ যেন বাহনের অভাবে দেবতাকে চিন্তে না পারা । বিগত সংগীত কখনই ভাষার বন্ধনে থাকতে পারে না । যদি কাব্যকে ছাড়িয়ে সংগীত যেতে না পারে, সংগীতের দামত্ব ঘটবে । যখন আমরা বীণার ধ্বনি শুনি ; তখন ভাষা থাকে না তবু শুনি কিন্তু কণ্ঠ-সংগীতের ভাষা বুঝতে না পারলে আমরা মারমুখি হ'য়ে উঠি । এ শুধু মনে হয় অনেকেই বিগত সংগীত শোনার অভ্যাস নই ব'লে । সংগীতের ক্ষেত্রে ভাষা যে একবারে ব্যর্থ তা ব'লতে চাই না ; কাব্য, সংগীতের রসস্থিতির সহায়ক ; চেতনাকে কোন একটি বিষয়বস্তুর মধ্যে তন্ময় ক'রে দেওয়ার পক্ষে সহায় অবলম্বন । তবু সংগীত এ ছাড়া আরো কিছু, যার আস্থানে বলাকার নিরুদ্দেশ যাত্রা । কলাবিদরা রাগ সংগীতের মধ্যে বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন রসের সন্ধান পেয়ে থাকেন । সেই রসের কৌশলী পরিবেশন শ্রোতার নিকট অনেক সময় জাপানীগানের মতই দুর্বোদ্ধ হ'য়ে ওঠে ; এর ক্ষেত্রে অবশ্য কলাওয়াতরা দায়ী নন কিন্তু যখন তারা কৌশলকে রসের ওপর স্থান দেন নিজেদের অজ্ঞাতে তখন অতি বড় রসিকও ব্যথিত হন । বুদ্ধি ও রস বা ভাবের নিখুঁত মিলন যে কলাবিদের কণ্ঠে সেই তো সার্থক মহাশিল্পী । এ বস্তু বড় দুর্লভ । এই ক্ষুরধারগতি বুদ্ধি ও ভাবের এ তো সকল কলার আদর্শ । কখন কলাবিদের কণ্ঠে এটা সম্ভব ? তবু শত সহস্র-কলাবিদের আমরণ এই তো সাধনার বস্তু । লক্ষ্যের গতিপথেই কলাবিদের আনন্দ । নিজের অসম্পূর্ণ সাধনার দারিদ্র্য উত্তরপুরুষের ওপর দিয়ে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি । দরদী শ্রোতা বা সংগীতরসিক যাঁরাই কলাওয়াতদের অন্তরের গভীরে যেতে পেরেছেন তাঁরাই এই ভাবের সন্ধান পেয়েছেন । বাহিরের আবরণে আচারে বিচারে যতই তফাৎ থাকে এখানে সবাই এক । ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগৎ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ ; বুঝতে হ'লেও সাধনা চাই । এ সহজলভ্য রসবস্তু নয় যে ডিনারের টেবিলে খেতে খেতে কিম্বা নাচতে নাচতে এ রসে সকলে মাতোয়ারা হ'য়ে উঠবেন । সার্থক উচ্চাঙ্গ সংগীতের আমেজে নৃত্যভূলে স্থির হয়ে যাবে সারা দেহ মন পাঁচ মিনিট দশ মিনিট নয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পারিপার্শ্বিকতা ভুলে সুরসমুদ্রে আত্মবিলুপ্তি এর চরম আনন্দ ।

(ক্রমশ)

বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শান্তিআন্দোলন

যুদ্ধোন্মাদ দেশগুলির যাবগাজ প্রস্তুতের উত্তোগ-আয়োজনে বিচলিত হয়ে মনশ্চক্ষে বিশ্বের বনামমান ভয়াবহতার ভাবী প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করে আগবিক শক্তির আবিষ্কারক মহাবিজ্ঞানী এ্যালবার্ট আইনস্টাইন আগবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে যে সতর্কবাণী জানিয়ে গেছেন, দেখা যাচ্ছে, তাঁর সেই সতর্কবাণী সম্পর্কে কার্যকরীভাবে সজাগ হয়ে উঠেছেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী—এ-যে কতবড় আশার কথা, সে-সম্পর্কে দলমতনিরপেক্ষভাবে যে কোনো সূহ্ম চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে একমত হবেন।

বিশ্বধ্বংসী হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে যে বৈজ্ঞানিকবৃন্দ একতাবদ্ধ হয়ে ক্রোধে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন : কিয়োটো ইউনিভারসিটির অধ্যাপক হিডেকি ইউকাবা ; হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান ; ওয়ারশ ইউনিভারসিটির অধ্যাপক লিওপোল্ড ইনফেল্ড ; ইণ্ডিয়ানা ইউনিভারসিটির অধ্যাপক ভেষজ ও শারীরবৃত্তে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এইচ. আই. মুলার ; ব্রিটল ইউনিভারসিটির অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সি. এস. পাওয়েল ; লণ্ডন ইউনিভারসিটির পদার্থবিজ্ঞায় অধ্যাপক জে. রটব্রাট এবং বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী অধ্যাপক জোলিও কুরী। আর এঁদের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বার্ট্রাও রাসেল।

জেনেভায় চারি-প্রধান বৈঠকের কয়েকদিন পূর্বে উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদের তরফ থেকে বার্ট্রাও রাসেল যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তাতে মানুষের সামনে সোজাসুজি এই প্রশ্ন হাজির করা হয়েছে : আমরা সূখ সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য বৈঃ থাকবো, না নিজেদের মধ্যে কলহের জন্য মৃত্যু বরণ করবো ?

শান্তির সপক্ষে এগিয়ে আসার কারণ হিসেবে বিবৃতি-প্রসংগে রাসেল বলেছেন, যদিও সরাসরি এ-কাজে অগ্রসর হওয়া বৈজ্ঞানিকদের কথা নয় তবুও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য শান্তি আন্দোলনে উত্তোগী হওয়া বর্তমান সময়ে তাঁদের কর্তব্য।

হাইড্রোজেন বোমার বিপদ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে বলে আমেরিকার মিথ্যা প্রচার ও অপব্যাত্য সঙ্কে উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য হাইড্রোজেন বোমার উৎকর্ষজনিত অবস্থায় আজ মনুষ্যত্ব যে কতখানি ভয়াবহতার সন্মুখীন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য বৈজ্ঞানিকরা একত্রে সম্মিলিত হোক।

এই বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, দেশ জাতি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে নয়—একমাত্র মানুষ হিসাবে মনুষ্যত্বের খাতিরেই আমরা মুখর হয়ে উঠেছি, কারণ মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

তারা বলেছেন, পৃথিবী আজ বন্দয এবং সমস্ত ছোটখাট বন্দকে ছাপিয়ে উঠেছে আজ কমিউনিজম ও অ-কমিউনিজম-এর প্রচণ্ড সংঘাত। আমাদের আজ নূতন ভাবে চিন্তা করতে হবে—আমরা যে দলেরই হই না কেন সামরিক প্রতিযোগিতায় না নেমে কোন্ পথে আমরা ধ্বংসলীলা এড়াতে পারি, সেই কথাই ভাবতে হবে।

পরমাণবিক যারণাত্ম প্রয়োগে যুদ্ধ বাধলে অবস্থা যে কতখানি সাংঘাতিক হতে পারে সে সম্পর্কে জনসাধারণতো দূরের কথা, বহু সুউচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও সে বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান রাখেন না! একটি অ্যাটম বোমা যদি হিরোশিমা ধ্বংস করতে পেরে থাকে, একটি হাইড্রোজেন বোমা লণ্ডন, নিউইয়র্ক এবং মস্কোর মত নগরীকে একসঙ্গে ধূলিস্থাপ্ত করতে সক্ষম হবে। সম্প্রতি বিকিনি দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার যে পরীক্ষা হয়ে গেছে তা থেকে এই ধারণা জন্মেছে যে, পরমাণবিক বোমা আমাদের যা ক্ষতি করবে তা কল্পনারও অতীত। যে বোমায় হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছিল তা থেকে বিশগুণ শক্তিশালী বোমা এখন প্রস্তুত হতে পারে বলে জানা গেছে—যার বিস্ফোরণ জলের নিচে অথবা স্থলে, যেখানেই হোক, সেই বিস্ফোরণের কণাংশগুলি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে বাতাসের স্তরে স্তরে মারাত্মক বর্ষা আর ধূসির রূপ নিয়ে—যে বিষাক্ত ধূলিকণা শুধু জাপানী মৎস্তেই নয়, জাপানী দীঘরের অজস্র মৃগ্যবান জীবনেও সংক্রামিত হয়ে বীভৎস তাণ্ডবলীলার বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। কেউ জানেন না রেডিও-একটিভ কণিকাগুলি কতভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা একমত হয়ে বলছেন যে হাইড্রোজেন বোমার একটিমাত্র বৃহৎ পৃথিবী থেকে সমস্ত মনুষ্যজাতিকে সম্ভবত একেবারে অবলুপ্ত করে দিতে পারে। অনেকগুলি হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহৃত হলে, সেক্ষেত্রে শুধু কিছু লোক সহসা অতর্কিত মৃত্যু বরণ করবে; আর পৃথিবীব্যাপী বাকী লোকগুলিকে একান্ত অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় ধুকতে ধুকতে ভবের খেলা সাক্ষর করতে হবে। বিবৃতিতে আরো বলেছেন যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরোক্ত যারণাত্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলে যারা এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন—তারাও সর্বাপেক্ষা শঙ্কাকুল।

হাইড্রোজেন বোমার এই অভাবনীয় সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক শক্তিকে উপলব্ধি করে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী উপরোক্ত তথ্যগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণকে জানিয়ে দিয়ে কি-ভাবে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতে পারে সে-সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন যুক্তভাবে এবং এই প্রদর্শনে বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক এবং জনসাধারণের কাছে তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর মতামত আহ্বান করেছেন।

সিদ্ধান্তটি এইরূপ : ‘ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যে-কোনো বৃহৎ হাইড্রোজেন বোমা মনুষ্য জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে—এই সত্যকে জেনে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলিকে আমরা অবহিত হতে বলছি; এবং একমাত্র আপস-মীমাংসা ছাড়া বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা কারো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হতে পারে না, একথা সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে বলছি জোরের সংগে!’

আমরা সৰ্বাস্তঃকরণে এই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী পরিচালিত মনুষ্যজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের এই শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে চাই : আমরা মানুষ, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব—একথা যদি সত্য হয় ; মানুষের ধর্ম জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি যদি সত্য মানুষের জ্ঞানের আলোকেই সূর্যসমুদায় হয়ে থাকে, তাহলে মনুষ্যজাতির ক্ষয় কখনোই হতে পারে না, ক্ষয় অসম্ভব। অজ্ঞের যা কিছু, শুভ প্রজ্ঞার বলে মানুষ তাকে পরাভূত করে মানবজাতির চিরন্তন জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবেই।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

কিশোর মাসিক

‘আগামী’র

প্রাৰণ সংখ্যা—‘সুকান্ত সংখ্যা’ হয়ে বেরুচ্ছে

- ★ কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন, কাব্য ও সাহিত্য আলোচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যায় সুকান্তর গল্প কবিতা প্রভৃতিও থাকবে।
- ★ এই সংখ্যায় যাদের রচনা থাকবে : বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা-শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহমদ, বিমলচন্দ্র বোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অরুণাচল বসু, অশোক ভট্টাচার্য, মিহির সেন, অশোক গুহ, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি।
- ★ এই বিশেষ সংখ্যায় অন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।
- ★ এমন একখানি সংখ্যা ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবার কথা প্রত্যেক অভি-ভাবক নিশ্চয়ই ভাববেন।

এজেন্টরা অগ্রিম অর্ডার বুক করুন

প্রতি সংখ্যা ছ’ আনা বাৎসরিক ২১০ আনা
বার্ষিক ৪ টাকা

কার্যালয় : ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

॥ শারদীয় অগ্রণী ॥

অন্যান্য বছরের মত এবারও
শারদীয় অগ্রণী প্রকাশের
আয়োজন চলছে

এই সংখ্যার অন্ত্যে রচনা পাঠাবার শেষ
তারিখ ৩১শে আগস্ট, ১৯৫৫

বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রালাপ করুন

এজেন্টরা তৎপর হোন

॥ কার্যাবলী ॥

॥ অগ্রণী ॥

১৩, শিবনারায়ণ দাস সেন, কলিকাতা-৬

॥ চলচ্চিত্র ॥

॥ স্টুডিওর খবর ॥

পাপ ও পাপী : বিজয় সেনের পরিচালনার উক্ত ছবিটি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সমাপ্তির পথে। ছবিটিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করছেন অসিতবরণ, শিশির মিত্র, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, অম্বুতা গুপ্তা, সবিতা চ্যাটার্জী প্রভৃতি শিল্পীরা। গোপেশ মল্লিক ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন। চিত্রটির সম্পাদনার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গেছে।

পুরুষ ও প্রকৃতি : অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে বিকাশ রায় প্রোডাকশন্সের চতুর্থ ছবি 'পুরুষ ও প্রকৃতি'-র কাজ শুরু হবে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ছবিটির পরিচালনা করবেন প্রযোজক ও অভিনেতা বিকাশ রায় স্বয়ং। কাহিনী রচনা করছেন পাঁচুগোপাল মুখার্জী এবং সংগীতাংশে আছেন নটিকেতা ঘোষ। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ছবিটির জন্ত গান রচনা করেছেন। ক্যামেরা এবং সম্পাদনার কাজে থাকবেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও কমল গাঙ্গুলী। ভূমিকালিপিতে বাদেও নাম সাময়িকভাবে স্থির করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্তাল, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, সাবিত্রী, সবিতা ইত্যাদি। কোড়ুক অভিনেতাদের মধ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, অহর রায় ও অজিত চ্যাটার্জীর নামও নির্বাচন করা হয়েছে।

ভালোবাসা : দিলীপ পিকচার্সের প্রথম ছবি 'ভালোবাসা'-র কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। দেবকী বসু ছবিটির পরিচালনা করেছেন এবং কাহিনী রচনাও করেছেন তিনি। এর প্রধান দুটি ভূমিকায় আছেন বিকাশ রায় ও সূচিত্রা সেন। অজ্ঞাত চরিত্রে আছেন, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, অহর, ভানু, মলিনা দেবী এবং অম্বাশ্রবা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানে সুরারোপ করেছেন নটিকেতা ঘোষ। প্রবোধ দাস চিত্রগ্রহণ করেছেন। শিল্পনির্দেশক হিসাবে আছেন সৌরেন সেন।

খেলোয়াড় ও গড়ের মাঠ : পিপলস্ পিকচার্সের নতুন ছবি "খেলোয়াড়" রাধা ফিল্মস্ স্টুডিও-তে দ্রুত সমাপ্তির পথে। ছবিটির একটি বিশেষত্ব হলো বিভিন্ন ভূমিকায় ক'লকাতার খ্যাতিনামা ফুটবল খেলোয়াড়েরা অংশ গ্রহণ করবেন। সচ্চিদানন্দ সেনের 'খেলা' নামক কাহিনীকে ভিত্তি করে ছবিটির চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে 'গড়ের মাঠ' নামে একটি ছবি গৃহীত হতে চলেছে। ছবিটিতে বহু খ্যাতিনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখতে পাওয়া যাবে।

উপহার : ছায়াবাণী লিঃ-এর পরবর্তী ছবি 'উপহার' মুক্তিপ্রাপ্তির রয়েছে।

শৈলজ্ঞানন্দের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত এই ছবি পরিচালনা করেছেন তপেন সেন। ছবিটিতে সুর দিয়েছেন কালীপদ সেন। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার, কানু ব্যানার্জী, ছবি বিশ্বাস, নির্মল কুমার, সাবিত্রী, রাজলক্ষী, অমৃতা ও অন্যান্যরা।

॥ হিন্দী ছবি প্রসঙ্গে ॥

আরব-কা-সদাগর : নিউ ওরিয়েন্টাল পিকচার্সের এই ছবি এস. ডি. নারাং-এর প্রযোজনা ও পরিচালনায় বোম্বাই-এর শ্রীকান্ত স্টুডিওতে নিয়মিতভাবে গৃহীত হচ্ছে এবং শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। ছবিটির আকর্ষণীয় চরিত্রলিপিতে আছেন প্রদীপকুমার, শশীকলা, হীরালাল, সুন্দর, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, পরিচালক নারাং এবং আরো অনেকে। হিন্দী ছবির দর্শকদের কাছে এই ছবিটি আরো আকর্ষণীয় হবে, কেননা এর সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখার্জী। সংবাদে প্রকাশ, স্মৃতি বিশ্বাসের একটি মনোমুগ্ধকর জিপসী নৃত্য দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেবে।

মিস কোকাকোলা : 'মঃ ও মিসেস '৫৫ তে সাকল্যের পর কারদার ফিল্মস 'মিস কোকাকোলা' নামে একটি ছবি তুসতে মনস্থ করেছেন। গীতাবালী ও শাস্ত্রী কাপুর এই ছবির প্রধান দুটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন, ওমপ্রকাশ, জনি ওয়াকার, ললিতা পাওয়ার, কমল কাপুর, বজ্রীপ্রসাদ প্রভৃতি অভিনেতৃবৃন্দ। কেদার কাপুরের পরিচালনায় গৃহীত এই ছবিটিতে ও. পি. নায়ার সুর যোজনা করবেন এবং চিত্রগ্রহণ করবেন ওয়াই. ডি. সরপাটদার।

শাহী মেহমান : নাজ ফিল্মস্-এর ঘটনাবহুল চিত্র 'শাহী মেহমান' প্রদর্শন অনতিবিলম্বে শুরু হবে। পরিচালক বলবন্ত ভাট দাবী করেন যে, 'আলীবাবা ও চল্লিশ চোর'-এর পর একাতীয় রোমাঞ্চকর ছবি প্রদর্শিত হয়নি। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রাবা, রঞ্জন, জনি ওয়াকার, উল্লাস, শাস্ত্রী প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতৃবৃন্দ। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিপিন বারু।

॥ চেক চিত্রপ্রতিনিধিদের ভারত আগমন ॥

এক সংবাদে প্রকাশ, চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রীয় ফিল্মস্ ডিভিসনের তরফ থেকে ছয়জন প্রতিনিধি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসবেন। তাঁরা ভারত ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে ফিল্ম শিল্পের আদানপ্রদানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এক মাসের এই পর্যটনে, ভারত সরকারের তরফ থেকে প্রতিনিধিদের যাত্রাজ, ক'লকাতা ও বোম্বাই-এ নিরে যাওয়া হবে। যাত্রায়ে মিঃ কে সুব্রাহ্মণ্যরম ও অন্যান্যরা, প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন।

কলকাতার থাকা কালীন তারা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' ছবিটি দেখবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় গৃহীত কিছু চেক ফিল্ম আনবেন বলে জানা গেছে।

ভারত পরিত্যক্তান্তে তাঁরা অনুরূপ কাজে ব্রহ্মদেশ অভিমুখে যাত্রা করবেন।

॥ বড়ুয়ার অসমাপ্ত ছবি ॥

সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গেছে, পরলোকগতশিল্পী প্রথমেশ বড়ুয়া মৃত্যুর কিছু আগে একটি সংগীত মুখর ছবি তোলাবার আয়োজন করেছিলেন। সেই ছবির জন্য নির্বাচিত চিত্রনাট্য, সংলাপ ইত্যাদির নির্ভর করে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার স্ত্রী যমুনা দেবী একটি ছবি তোলাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অসমাপ্ত সংলাপগুলি রচনা করবেন নিতাই ভট্টাচার্য। ছবিটির সংগীত পরিচালক হিসেবে অনুষম ঘটক কিংবা কমল দাসগুপ্তকে গ্রহণ করা হবে। ছবিটির বৈশিষ্ট্য হবে, বারোয়ারী উপজাতির মতো স্বর্গত বড়ুয়ার এক একজন সহকারী এক একটি অংশ পরিচালনা করবেন। এই পরিচালকমণ্ডলীর কর্ণধার থাকবেন ৮প্রথমেশচন্দ্রের সহকারী নীরেন সাহিড়ী। যৌথ পরিচালনার ছবি তোলার প্রচেষ্টা বাংলা ছবির জগতে এটি সর্বপ্রথম। ‘দেবী মালিনী’ ছবির কাজ সম্পূর্ণ করেই শ্রীসাহিড়ী এ-ছবিতে হাত দেবেন।

চিত্রদর্শক

॥ সমালোচনা ॥

জয়মা কালী বোর্ডিং : কাহিনী—শৈলেশ দে ; পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : সাধন সরকার ; পুরোপা : শ্রামল মিত্র ; আলোকচিত্রগ্রহণ : বিজয় দে ; শব্দযোজনা : শিশির চট্টোপাধ্যায় ; সম্পাদনা : ব্রজেশ ঘোষী। ভূমিকায়—ভানু, সাধনা অনুপকুমার, সুবাংগু মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, তুলসী সাহিড়ী, জহর রায়, অজিত, নবদ্বীপ, হরিধন, তপতী ঘোষ ও অন্যান্য।

হাসির ছবি নামকরে ভাঁড়ামীর সাহায্যে সেলুলয়েড ভরে তোলার কাজ বেশ কিছু দিন ধরেই বাংলা ছবিতে চলে আসছে। কিন্তু আগেকার সেই স্থলরুচিসম্পন্ন ছবিগুলিকেও হার মানাবে ‘জয়মা কালী বোর্ডিং’। কেননা শুধু ভাঁড়ামী হ’লেও নর কথা ছিলো, কিন্তু এ-ছবিতে হাসির নাম করে যেসব ইতর ঘটনাবলী ও সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে হাক-আখড়াই খেউড়ে পর্যায়ে ফেলা যায়। কোনো দৃষ্ট এতোটা অস্বাভাবিকতা ঘেঁষা এবং সংলাপ এতো কদরবী যে সজ্জন ভদ্রলোকের ছবি দেখায় বাধা জন্মায়। আরো অবাক লাগে এই ভেবে যে, সেলুল বোর্ডের কর্তাদের বিচারে এই ছবি “সর্বসাধারণের জন্যে” মার্ক পায় কি করে।

কাহিনীর পরিকল্পনার মধ্যে মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর ছিটে-কোঁটাও পেলো সুদী হস্তে পারতুম। কিন্তু কাহিনীকার আমাদের সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন। হাস্যরস বলতে যে স্বার্থক কাঁচা বসিকতা বোঝায় না, এ ধারণা কবে বাংলা ছবির পরিচালকদের মগজে প্রবেশ করবে, তা জানিনা। গল্পে কী জাতীয় ঘটনা থাকলে তা বিত্তহীন হাস্যরসের পর্যায়ে উঠতে পারে, তা-ও এসব তথাকথিত লেখকদের জানা নেই। হাসির কাহিনী লেখার জন্য যে যুগ্মিগানা প্রয়োজন তা অর্জন করতে সাধনা লাগে। রাতারাতি উঁচুদরের হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় না। শুধু কাহিনীর কথাইবা বলি কেন, কলাকৌশলের অভাব দিক যথা, সংগীতাংশ, শব্দগ্রহণ,

সম্পাদনা, প্রভৃতিও চূড়ান্তরকমের খেলোমির পরিচয় মিলেছে। সংগীত পরিচালক হিসাবে শ্রামল মিত্র, নিতান্তই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটির মধ্যে যেসব বিস্তার বিশেষ করে দৃষ্টিকটু তা হচ্ছে, তরুণবন্ধুদের স্ত্রী সাজিয়ে বাড়ী ভাড়া নেওয়ার ঘটনা এবং সেই ঘটনার মাধ্যমে রুচীহীন কিছু নোংরা ইয়াকী দর্শকদের মাঝে উপস্থিত করা। কাহিনীর সুবিধার্থে যেখানে যা খুশি তা-ই সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। মনে হয়, বাংলাছবির দর্শকদের মগকে “যুক্তি” পদার্থটি একেবারেই নেই এমন একটি ধারণা করা হয়েছে। তাই ছবিতে দেখা গেছে, বন্ধুদের স্ত্রী সাজানোর সুবিধার্থে বাড়ীওয়ালার ভদ্রলোক অসুস্থ, তাঁর স্ত্রী চোখে ঝাপসা দেখেন। ছবিটির আরেকটি গৌণমিল হ’লো, কল্যাণের বাবার ঠিক করে পাত্রী হিসাবে শেকালীকে মিলিয়ে দেওয়া। ছোটোখাটো দু-একটি নিজের জ্যেষ্ঠামশায়ের মেয়েকে পাত্রী হিসাবে নির্বাচন করতে যাওয়া। উল্লেখ করতে শুরু করলে আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা’ প্রয়োজনহীন বলেই নিরন্তর হচ্ছি। একটি সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করছি, তা থেকে ছবিটির ভঙ্গীমায় পরিচালকদের বিকৃতির নজির মিলবে।

বন্ধুদের মধ্যে একজন তার স্ত্রীকে (আসলে সেও পুরুষ বন্ধু ও বাড়ী ভাড়ার লোক স্ত্রী সেজেছে) কাছে টেনে বলছে, ‘কাছে আর, তোকে সোহাগ করি।’ মস্তব্য স্বভাবতই নিশ্চরোজনীয়।

অভিনয়-এর দিক থেকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাবলীলতা মাঝে মাঝে তৃপ্তি দেয়। অবশ্য তাঁর সংলাপের কথা কিছু বলার নেই, কেননা সে কৃতিত্ব পরিচালক ও কাহিনীকারের। স্ত্রী ভূমিকার সুধাংশু বুদ্ধোপাধ্যায় বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। তৃপ্তি মিত্রও মন্দ করেননি, যদিও তাঁর অভিনয়ে বাড়াবাড়ি আছে। সাধন সরকারের অভিনয় অসহ্য। অজিত চট্টোপাধ্যায়, নবদীপ প্রভৃতির অভিনয়ে মাস্কাতা আমলের ভাবভঙ্গীর পরিচয় পেরেছি। নার্সিকা চরিত্রে তপতী ঘোষ সাবলীল হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ দেখাননি। শব্দগ্রহণ ও অন্তান্ত কলাকৌশল নেহাতই অন্তর্লক্ষ্য। আরব্য উপন্যাসের ঢঙে একটি দৃশ্য সংযোজন করার অর্থও তেমন পরিহার নয়।

সবদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় কদর মনোভঙ্গীম্পন্ন ছবি-তোলার ব্যাপারে টাস প্রডাকসন্সও তার কর্তব্যাক্তিরা যথেষ্ট মূল্যমানার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বকার কুখ্যাত এটম বম, লেডিজ সীট, খণ্ডর বাড়ী, প্রভৃতি ছবিগুলিকেও লক্ষ্য দেয় এই ছবি।

অজয় রায় চৌধুরী



অঙ্গী

॥ অষ্টম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৬২ ॥

সমাপ্ত

সমীর মুখোপাধ্যায়

—কখনো ?

দরজাটা রীতিমত ধাক্কা দিয়ে হস্তদন্ত মেজাজে ঘরে ঢুকলো শ্রীপতি ।

দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে খাতা থেকে মুখ তুলল । খাটের মাঝখানে ধবধব কাগজের ওপর রাধা হারিকেনটা আড়মাতালের মত ছোট একটা টাল খেয়ে স্থির হল কোনরকমে বেসামাল হয়ে ততক্ষণে খাটের ওপর ধপাস করে বসে পড়েছে শ্রীপতি ।

সচরাচর তার চোখের মণি উত্তরে বাতাসের মত হিমশীতল থাকে । তাতে জীবনের স্পন্দন আত্মকাল বড় একটা থাকেনা । রাত আটটার সময়ও তাই ছিলো । এখন কিন্তু, এই রাত নটার সময়, হারিকেনের রক্তবর্ণ আলোয় দিব্যেন্দু শ্রীপতির চোখে রঙ দেখলো প্রাণের । শ্রীপতির চোখের মণি এই মুহূর্তে আর শীতল নয়, কঠিন নয়, তপ্ত এবং উজ্জ্বল ।

বিপুল উৎসাহে শ্রীপতি গলগল করে বলল—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে । ধম্মপথে থাকে যদি কেউ, সে যদি একসাও হয়, তবু তার মার নেই । তাকে সবাই দূর দূর করলেও তার একজন কেউ মাথার ওপর আছেন । তোরা—এ যুগের হতভাগারা তা মানিস আর না-মানিস আমার তাতে এই কল্যাণ ।

দিব্যেন্দুর নাকের ডগার শ্রীপতি তার নস্তি-টিপে-ধরা বুড়ো আঙুল ছুঁতে নাচালো ।

মাথার প্রায় সব চুল পাকা বাপের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের কোন সদর্থ ভখনকার মত নিরেট মস্তিকে ঢুকলোনা । ও শুধু তাকিয়েই রইলো । আর মনে মনে নির্ঘাৎ ভাবলো, ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন নাকি !

—এক ঘণ্টা আগেও জানতাম না । তোরা আমার কাছে গিয়ে জানলাম ।

পর পর কয়েকটি ঢৌক গিলে ফেলল শ্রীপতি ।

—জল খাবেন ? দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালো কলসী থেকে জল গড়িয়ে আনবে বলে ।

সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁচিয়ে উঠলো জীপতি—জল খাবেন ? জানে আমার দাঁতের গোড়ায় ব্যথা আর এই শীতকালের রাস্তির, জেনেকুনে—স্নাকা চৈতন, লটবর ।

দিব্যেন্দু ফের খাটে উঠে বসলো । বসলোনা শুধু, বসে রইলোনা এমনি এমনি, জ্বলের ছেলের হোমটাক্স মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলো ।

—হয়েছে হয়েছে । একটু কান দাও হে, তাতে জাতোপাত হবেনা । তুমি না হয় মাষ্টার, তা' ধরো গিয়ে তোমার বাপও তেমন মুখ্য নয় ।

তেমনি বিরস, বিকৃত মুখে জীপতি তাকালো দিব্যেন্দুর দিকে ।

—আপনি তো বলছেন না কিছু । দিব্যেন্দুর চোখে অসুযোগ, গলার স্বরে কিঞ্চিৎ ঝাঁজ ।

—কাকে বলবো ? কোন বেটাছেলেকে বলবো ?

দিব্যেন্দু চোপরা করলো না মুখের ওপর । এখনি খুনোখনি বেধে যাবে । সামান্য, অতি তুচ্ছ কারণে লংকাকাও বেধে যেতে পারে । সে বিশ্বাস তার এখনো অটুট ।

হঠাৎ জীপতি হাউ হাউ করে বলে চলল—মুক্তিপদ দস্তের সংগে তোমার মামার দেখা ব্যাঙেলের গাড়ীতে । তোমার মামা নাবলো গিয়ে হুগলীতে, আর মুক্তিপদ নাবলো মানকুতুতে ।

—কে মুক্তিপদ ?

—মুক্তিপদকে চিনিস না ? তা না চিনতে পারিস । কিন্তু তার ছোট ভাই—হরিদত্ত মানে কানাহরিদত্ত । তাকে চিনিস তো ? যার নামে ক্যালেন্ডার বার হয় ।

হরিদত্ত—কানাহরিদত্ত ? হ্যাঁ, চেনে বৈকি দিব্যেন্দু । ভ্রু কুঁচকে গেল—দুটোই ।

হ্যাঁ, শুনেছে তার নাম । ব্যবসা-লক্ষীর প্রসন্ন মুখ তিনি দেখেছেন । প্রথমে অবস্থা তিনি ব্যবসা ধরেননি । অতি সামান্য কিছু নিয়ে সুদী কারবার করতেন । শোনা যায় ময়রার একটি দোকানও ছিলো সে সময়, মানে আজ থেকে বিশ বছর আগে ।

তারপর 'সুদ মাংতা আসলি নেহি মাংতা'—এই সুবচন জপমালা করে সুদ এবং আসল, গাছের এবং তলার, দুই নিজের কোলের দিকে টানতে টানতে এক সময় কিছু পুঁজি পাটা হল । তখনো হরিদত্ত এমন কিছু কেঁটবিটু হয়ে ওঠেননি । ক-অঙ্কর গোমাংস ছিলো বিস্তে । বুড়ের মরশুমে ঐ ময়রার দোকানের সংগে একটা লোহা লকড়ের দোকান চালু করে ফেলেন তিনি । কাকে ক গ্যালন তেল দিতে হবে, কে সোনালি মদের পিপে, এ সবই ছিলো তাঁর নিখদর্পণে । সুতরাং নানা সুড়ঙ্গ পথে দু মের রাতরাতি উনি একেবারে সোনার খনির মালিক হয়ে বসলেন । ওঁর টাকা পয়সার খ্যাতি তখন থেকেই । মার্বেল পাথরের বিরাট বাড়ির সবচেয়ে উঁচুতলার ছাদে এখনো মাঝে মাঝে শুকোতে দেওয়া হয় রাশি রাশি পুরু নোটের তাড়া । আর তাই পাহারা দিয়ে ফেরে চকচকে চাপরাশ আঁটা কাঁধে-বন্দুক চাপরাশীরা । তলাকার অঙ্ককার কুঠরীতে বাকমবন্দী থেকে থেকে নোটগুলো

একটু নরম হয়ে যায়। যাতে সবার চোখের সামনে ধরধর শব্দে বাজানো যায় তাই বোদে একটু সেকে নেওয়া, এই আর কী।

হরিদন্ত কিন্তু আসলে কানা নয়, মন্দলোকে ঐ কানা কথাটি নামের আগে যোগ করে দিয়েছে।

এক চোখেই দেখেন হরিদন্ত, একদিক থেকেই। যা করলে কিছু পাওয়া যায়, যা বাঁটলে কিছু মেলে, শুধু নজর তাঁর সেই দিকে। সেই নজর অতি তীক্ষ্ণ। শকুনির নজর যেমন মরার দিকে।

ব্যবসায়ী মহলে এই নামেই তিনি খ্যাতির পান। কবে কোন ব্যক্তি গায়ের জালার হরিদন্তের নামের আগে কানা কথাটি যোগ করে দিয়েছে তা জানবার আজ আর উপায় নেই। কিন্তু চল হয়ে আসছে ঐ নামটি এই সাতচল্লিশ সাল থেকে। বোধ হয় ও নামে হরিদন্ত স্বয়ং চটেন না, মনে মনে হাসেন, দুর্বল অথচ ঈর্ষাপরাধ মামুষের এই গায়ের জালার।

শ্রীপতিও বোধ হয় ঐ কথাই ভাবছিলো। জানলার পরপারে কিসের একটা করকর শব্দ হল। আশ্চর্য ভাবটা তার কেটে গেল ঐ করকর শব্দে।

কের ওর মুখ খুলে গেল, ও গড়গড় করে বলে চলল—তো হল কি জানিস, মুক্তিপদ আর তোর মামা তো চলেছে। পাশাপাশি বসা ছুজেন। ভিড় ট্রেনটার পাতলা হয়ে আসছে। এতোক্ষণ কথা নেই। শ্রীরামপুর ছাড়াতে তোর মামা পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বার করলো। তারপর আতিপাঁতি খুঁজলো, ঐ যা—নেই, দেশলাই পকেটে নেই। তখন পাশে-বসা মুক্তিপদকেই বলতে হল, আছে নাকি? মুক্তিপদ দেশলাই বার করে দিলো। বাসু আলাপ শুরু হয়ে গেল।

মুক্তিপদই প্রথমে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় থাকেন? তো তোর মামা বললে, কেন, চেনেন নাকি জায়গাটা? না। মুক্তিপদ বেশ একটু চুপ করে থেকে বলল, হয়েছে। ওখানের শ্রীপতি ঘোষকে চেনেন? অবশ্য কতো শ্রীপতি ঘোষ আছে, চেনা শক্ত। তবু বর্ণনা দিচ্ছি। দেখুন, পেলেও পেতে পারেন। কোলকাতার পিসীর বাড়ি থাকতো। আমার সংগে স্থলে কলেজে পড়েছে। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। বিয়ের বোধ হয় ছ'বছর পর বলা নেই কওয়া নেই কোলকাতা থেকে বেমানুম তারপর উঠাও। বন্ধুরাও জানতোনা। অনেক পরে কার মুখে যেন শুনেছিলাম ও হুগলীতে আছে। ছোকরা ইংরেজী বেশ ভালো জানতো। তোর মামা তখনো ধরতে পারেনি, ও বলল, তারপর। মুক্তিপদ বলল, ই্যা, তার একটা অসুখও ছিলো সে সময়। হার্ট ডিজিজ। বেরাড়া রোগ। কোথাও নিয়ে যাওয়া যেত না, কোনরকমে নিয়ে গেলেও ফিরিয়ে আনা ভয়ানক শক্ত ছিলো। বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই মরে যাবো, এই বাই। মোটরে চড়তেও ভয় খেতো। এতোক্ষণে তোর মামার মুখে হাসি ফুটলো। কি হাসছেন যে? মুক্তিপদ জিজ্ঞেস করলো। তোর মামা বলল পেয়েছি। যে শ্রীপতি ঘোষের কথা আপনি বলছেন তিনি আমার ভগ্নীপোত। মুক্তিপদ তো হাতে চাঁদ পেলো, বলল, বলেন কী! তোর মামা বলল, ঠিকই বলছি।

আশ্চর্য, মুক্তিপদ শেষে, একথা সে-কথার পর, তোর কথাও জিগ্যেস করলো।

—আমার কথা? দিব্যেন্দু অবাক।

—তবে আর বলছি কি। একেই বলে বন্ধুত্ব। আমি কবে ভুলে মেয়ে দিয়েছি ওকে। ও কিন্তু আমাকে মনে রেখেছে। শুধু আমাকে নয়, তোকেও। অথচ তোকে মনে রাখবার কথা নয় ওর। ও যখন তোকে শেষ দেখেছিলো তখন তোর বয়স জোর দু' কি তিন বছর। তাতেই তোর সম্বন্ধে কতো কথা জানতে চাইলো। তোর কতো বয়স এখন? বি, এ, পাশ করেছিস কিনা। বি, এ, পাশ করেছিস শুনে বলল, হবেই তো। লাইক ফাদার লাইক সন। কি এখন করছিস জিগ্যেস করলো। মাষ্টারী করছিস শুনে বলল, তাই বা মন্দ কী। যা দিনকাল, তাই বা কে পায়। এরপর গোটাকতক প্রাইভেট টিউশনী করলে সবদিক বেশ ম্যানেজ হয়ে যাবে। আর কি জিগ্যেস করলো জানিস?

—আপনি না বললে কি করে জানবো।

—বলল, বিয়ে করেছিস কিনা। না শুনে হা হা করে হাসতে লাগলো, বলল, হবেই তো। এতো তাড়াতাড়ি আফকালকার ছেলেরা বিয়ে করেন। সে কতো কথা।

তারপর ঝপ করে আমার ঠিকানাটা টুকে নিলো ডায়েরীতে। অবশেষে হুম্ব করে বলে বসলো, দেখা করবো আসছে সোমবারে, সকালে।

—তারপর? দিব্যেন্দু জিগ্যেস করলো। জিগ্যেস করতেই হবে। সে যে সমস্ত কথাই ত্রীপতির বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এটা প্রমাণ করা চাই। সেইজন্মে আরো তারপর বলার জন্মে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

—হ্যাঁ, তোর মামা ভদ্রতা করে জিগ্যেস করলো, আপনার নাম? নিবাস?

নিজের নাম বলল, তাহলে তো কানাহরিদত্তকে আপনি চেনেন? ওনার ছো দেশ হরিপুরায়। মুক্তিপদ বোধ হয় হেসেই বলল, চিনি বিলক্ষণ। সে আমার ছোট ভাই, মাস্তের পেটের। আর পায় কে। ইনসিওরেন্সের লোক। একেবারে চেপে ধরলো। কটা ইনসিওরেন্স করেছেন কানাহরিদত্ত? ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্ন। আমি ওসব জানিনা বলে মুক্তিপদ যেন বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়েই এককথায় তোর মামাকে ধামিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেল মানকুণ্ডে। ও নেবে গেল। নেবে যাবার সময় বলে গেল, নিশ্চয় বলবেন ত্রীপতিকে, আসছে সোমবার সকাল বেলায় আমি ওখানে যাচ্ছি।

—তারপর?

—তারপর আর কী।

একটু ধেম্বে ত্রীপতি আকসোস করে বলে—আর তখন কি ছাই জান যে কানাহরিদত্তের বড় ভাই আমাদের মুক্তিপদ। অবশ্য জানলেই বা তখন কি হত। কেই বা তখন চিনতো কানাহরিদত্তকে সে সময়। বড়ই হেলা ফেলা করেছি মুক্তিপদকে একসময়। তবু ভালো যে তোর মামার সংগে শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ে গেল।

বুক খালি করে ত্রীপতির একটি দীর্ঘশ্বাস সঙ্করণ ভাবে বাইরে আছাড় খেয়ে পড়লো।

—কি হবে এতে ? কিছুই হবেনা শেষ পর্যন্ত দেখবেন । কিছুই না, কিছুই না ।

ছেলেদের খাতায় মন দেবার উদ্যোগ করে দিব্যন্দু ।

—এই তো, নিরাশ করো এক কথায় । কিছু হবেনা কিছু হবেনা করলে শেষ পর্যন্ত সত্যি কিছু হয়না । যা হোক একটা আশা জেগেছে, দেখাই থাক না ।

আর এখানে বসে দিব্যন্দুর পাকা পাকা কথা শুনতে সাধ হলনা শ্রীপতির । খাট ছেড়ে ও উঠলো । ভাঁড়ার ঘর পার হল অন্ধকারে । শোবার ঘরে যেখানে একটি তালি-মারা ময়লা মশারীর নিচে গুটিগুটি হয়ে প্রীতিলতা ঘুমোচ্ছে সেইখানে গেল । একটু তাড়াতাড়ি শোয়া চাই প্রীতিলতার । না হলে চলেনা । সমস্ত সংসারটার ঘনি একরকম তাকেই টানতে হয় যে । যি চাকরের বালাই নেই । সব ভাল তার ঝড়ে । সারাদিন একনাগাড়ে খেটে রাত্রে দিকটা ও আলা হয়ে পড়ে । তাই একটু তাড়াতাড়ি শয়ন ।

প্রীতিলতার একটি আদরের নাম আছে । বুড়ী । স্বামীর দেওয়া নান । মাঝে মাঝে ওই নামটি শ্রীপতির মুখে এসে যায় মন যখন খুশি থাকে । বাগের ঝাঁজে ঐ বুড়ী হয়ে যায় মাগী । মাগীর তেজ দেখছো, মাগী যেন জাত গোখরো ! আর মোহাগের সময়, ভালো কথা শোনা বা বলার সময় ঐ ‘বুড়ু’ ডাকটি । ফুলশয্যার রাত্রে দেওয়া নাম । আজো তা স্নান হলনা ।

—বুড়ু ঘুমোলে ?

—ঘুমোবো না তো কি ধেই ধেই করে নাচবো ?

—তাই কি আমি বলেছি বুড়ু ?

—আর বুড়ু বুড়ু করতে হবেনা । কি বলতে চাও বল চটপট ।

—শোন বলছি । মুক্তিপদ দস্তকে মনে পড়ে ? অবশ্য তাকে তুমি মোটে বার পাঁচ ছয় দেখেছো । তাও আবার বিশ বছর আগে ।

—না । তোমার কোথাকার কোন গের্জেল, মাতাল ইয়ার বকসীদের নামও আমাকে মনে রাখতে হবে ? আর সেই কথা জানাবার জন্তে এই এতো রাস্তিরে, না, মাইরী এবার যাচ্ছেতাই করবো বলে দিচ্ছি, সাবধান ।

—তুমি চটে যাচ্ছে কেন ? শোনাই না শেষ পর্যন্ত । মুক্তিপদ হচ্ছে কানাহরিদন্তের বড় ভাই । এবার বোধ হয় মুক্তিপদকে চিনবে ।

—কানাহরিদন্ত ?

—হ্যাঁ । খবরে কাগজে প্রায়ই নাম টায় ওঠে, স্বনামধন্য ব্যক্তি ।

কানাহরিদন্ত কথাটা কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো প্রীতিলতা । এ এক আশ্চর্য নাম । স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পর আর এক বড় বাঙালী ঘরের । লক্ষ্মীর বরপুত্র । অতি পরমন্ত লোক । ঐ নাম শুনলেই মহালক্ষ্মী ধ্যানের মন্ত্র আপনিই মনে পড়ে, মুখস্থ না থাকলেও ।

—কি হয়েছে ? কানাহরিদন্ত কি করেছেন ?

—তিনি কিছু করেন নি। তাঁর বড় ভাই আমার বাল্যবন্ধু মুক্তিপদর কথা বলছি। মুক্তিপদর সংগে তোমার দাদার আলাপ হল টেনে। আজ বিশ্ববহুর ছাড়াছাড়ি। আমি কবে ভুলে মেরে দিয়েছি। ও কিন্তু আমাকে ভোলেনি। এমনকি দেবুকে পর্যন্ত ওর মনে আছে। অথচ বছর দু'য়েকের ছেলে তখন দেবু। ওই মুক্তিপদ নিজে উপযাচক হয়ে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে আমার ঠিকানাটা টুকে নিয়েছে ডায়েরীতে। ওঃ, একেই বলে বন্ধু !

অথচ বুঝলে বুড়ু, এক কাপ চাও তাকে কখনো খাইয়েছি বলে মনে পড়েনা।

অতীত দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। বিশ্ববহুর ব্যবধান। ঠিক ঠিক সব মনে নেই। মুক্তিপদ বন্ধু ছিলো বটে তবে এমন কিছু বিশিষ্টজন ছিলোনা। শ্রীপতি ছাত্র হিসাবে বরাবরই ভালো। মুক্তিপদ মাঝারির চেয়েও খারাপ ছিলো। তাছাড়া, এ-কথা একশোবার, ইথরজীটা শ্রীপতি ভালোই জানতো।

আবেশে দু'চোখ বুজে শ্রীপতি বলল—বুঝলে বুড়ু, একদিন ঐ মুক্তিপদ আমার পায়ের ধুলো নিয়েছিলো। এখনকার নাট্যাচার্য তখন আমাদের কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ডিবেটিংএ সেবার আমার বক্তৃতাই সবচেয়ে চৌকশ হয়েছিলো। সভার শেষে সভাপতি হিসেবে সেই কথাই নাট্যাচার্য বললেন, সে কথা আমার এখনো কানে বাজছে, বললেন, এ পর্যন্ত কোন ছাত্রের মুখে এমন অপূর্ব বক্তৃতা কখনো শুনিনি। যেই না একথা বলা, সবার সামনে পায়ের ধুলো দাও দাদা বলে মাথা হেঁট করে মুক্তিপদ খামচি মেরে পা থেকে ছটাক আন্দাজ ধুলো টেনে বার করে মুখে মাথায় ঠেকিয়েছিলো।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। মনে পড়েছে প্রীতিলতা, মনে পড়েছে, কে জানে কি কথা।

একটু ভেবে নিয়ে প্রীতিলতা বলল—আচ্ছা কিরকম দেখতে ছিলেন বলত' তোমার বন্ধু ? খুব কালো, মাথার চুল খুব কৌকড়ানো—না ?

—হ্যাঁ। মোষের মতো কালো, ভুঁড়িহার, বিরাট পুরুষ। পাস্তুরার মত কোলা গাল। ঠিক বলেছো তুমি।

—তোমার বোধ হয় মনে আছে, একবার এই সাজবেলায়, তখন হেমন্তকালই হবে আজকের মত, তোমরা দুটিতে বসে ছিলে তোমার পিসীর কোলকাতার বাড়ি সেই তলাকার আধো অন্ধকার ঘরটার। আমি কি একটা কাজে ওখানে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসছিলাম। তোমাদের মুক্তিপদ বললেন, আমি চলে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, আচ্ছা ইয়ে, তোমার স্ত্রীর পায়ে কি খেত হয়েছে ? আমি চমকে উঠেছিলাম কথাটা কানে যেতে। আচ্ছা লোক ত, শুধু মন্দ কথাটাই মুখে আসে ? যা হোক, তুমি হেসে বললে, না হে মুক্তিপদ, ওর পা ভয়ংকর ফর্সা বরাবরই। খেত কেত কিছু না। তোমার বন্ধু হাঁ হয়ে বললেন, বলো কি, এতো ফর্সা।

একটু থেমে তন্ময় হয়ে প্রীতিলতা বলল—সে কথা এখনো মনে পড়ে।

—সম্ভব বটে। অন্ধকারে শ্রীপতির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কিনা কে জানে।

প্রীতিলতা হঠাৎ রেগে গেল, বলল—খুব হয়েছে। যাও এখন। দয়া করে ভুলে দাও।

—ঐ তো শুধু শুধু চটে উঠলে।

—ওই রকম শুধু শুধুই আমি চটি। বেশি বাড়াবাড়ি কোরোনা। সরে পড়।

নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং একটু ভয় পেয়েই ত্রীপতি সরে এলো পাশের ঘরে। দিব্যেন্দুর কাছ থেকে হারিকেনটা নিয়ে তার আলোর ক্যালেণ্ডারের তলার দাগ দিয়ে রাখলো কালির। ঐ তারিখে এখানে মুক্তিপদ আসবে।

আচমকা দিব্যেন্দু হেসে উঠলো। হাসির তোড় এসেছিলো প্রচণ্ড। মুখে হাত চাপা দিয়েও রোধ করা গেল না। ভারী বিত্রী আর বেয়াদপ শোনালো নিজের কানেই।

ঘাড় ফেরালো ত্রীপতি। হাতের কাছে কিছু ছিলোনা তাই রক্ষে। বাকলে হাতের কাছে ষটি বাটি, তাই দিয়ে দিতো লক্ষ্মীছাড়ার মাথা কাটিয়ে। নিতান্তই হাতে রয়েছে জলন্ত একটা হারিকেন। না, এটা ছুঁড়ে অস্ত্রত মাঝে যায়না। নিফল রাগে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে টকটকে লাল চোখে ত্রীপতি তাকালো দিব্যেন্দুর দিকে। আর দিব্যেন্দু, তুমি শ্রামাশ্রমাদ হাই স্কুলের শিক্ষক হয়েও, হাসির অপরাধে অনেক ছাত্রের কানমূলে দিয়েও, স্বয়ং আরো বেয়াদপ আরো বিত্রী ভাবে হেসে উঠলে সেই অপরাধ দৃষ্টির সামনে!

না। ত্রীপতির অতো যত্ন করে ক্যালেণ্ডারে দাগ দেওয়া বুঝা যায়নি। একই তারিখে, একই দিনে, একটি রিক্সা দ্বি. টি. রোড ধরে খানিকটা টানা এসে, নানা গলিতে পাক খেয়ে অবশেষে থামলো এমন এক জায়গায় যার অল্প কয়েক হাত দূরেই ত্রীপতি আর ত্রীভিলতা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

রিক্সা থেকে একটি কালো, লোমশ, বিরাট বপুর আবির্ভাব ঘটলো। সংগে নামলো আর একজন, বোধ হয় ওরই কন্ঠা।

নেমেই মুক্তিপদর হো হো হাসি। অবিকল আগের দিনের মতই।

—আরে, তুমি যে বুড়ো হয়ে গেছ হে। তোমার চেয়ে বয়েসে বড় আমি। তবু বলুন তো বৌদি, কাকে বেশি ইয়ং দেখাচ্ছে, ত্রীপতিকে না আমাকে?

—হু জনেই ইয়ং। একজনের মাথা ছোড়া টাক, আর একজনের শন ছুড়ী।

ত্রীভিলতা হাসলো।

কথাটা শুনে আবার এক চোট হাসি মুক্তিপদর। আর ভেমনি হা হা করে। নাকের দু-পাশে ঝুলে-থাকা মাংস নড়ে নড়ে উঠলো ঐ হাসির দমকেই।

—এই যজু, কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছিস যে? নে, প্রণাম কর কাকাবাবু কাকীমাকে। ভেমনি হাসতে হাসতেই মুক্তিপদ আদরের ধমক দিলো যজুকে।

—থাক থাক। হয়েছে।

স্রীতিমত শংকিত হয়ে উঠলো কাকাবাবু আর কাকীমা। যজুকে মাঝ পথে ধাক্কা দিয়েও। ত্রীপতি মনের একটু স্বৈর্য্য ফিরে পেয়ে বলল—চল ভাই চল। ভেতরে চল। এসো মা। যা আমার লক্ষ্মী।

—দ্বিবি বাড়ি। চারিদিকে তাকাতে লাগলো মুক্তিপদ বেশ একটু মুগ্ধভাবেই।
 ত্রীপতি আর ত্রীতিসতা ভাবে আরো বেশি গদগদ হয়ে উঠলো। মাত্র কালকে ঘরের
 কলি ফেরানো হয়েছে। তবু সন্দেহ হয় তাদের। এই প্রশংসা বাক্য সত্যিই কি
 আস্তবিক না নিছক ভক্ততা? কানাহরিবস্ত্রের বড় ভাই একথা বলছে? কিন্তু মানুষটা
 সরল বাপু। দেখনা, অতো বড় লোক হয়েও কেমন সাধা-সিধে সাজ পোশাক। আর
 মেয়েটি? একটি বাড়তি গয়না নেই গায়ে। তাহবে, মুক্তিপদ খোলামনে বলছে
 হয়তো।

ক্যাচ কোঁচ শব্দ করে উঠলো কোচ। বিরাট-বপু মুক্তিপদ আর ঘাড়হেঁটকরা
 মঞ্জু বসলো।

—বাঃ বাঃ। এ যে এলাহী ব্যাপার। অনেকদিন কোচে টোচে বসিনি।

তেমনি মুগ্ধ ভাব চোখে মুখে মুক্তিপদের।

ঠাট্টা করছে নাকি ও! ত্রীপতি আর ত্রীতিসতা কেমন ঘাবড়ে গেল। কিন্তু
 মানুষ কি এতো স্বাভাবিক, এতো সরল ভাবে ঠাট্টা করতে পারে? আরো একবার
 আপন মনেই বাঃ বাঃ করে উঠলো মুক্তিপদ।

দিব্যেন্দু এসে ঘরে ঢুকলো। গিয়েছিলো চুঁচড়ায় দই আনতে। দই ভাঁড়ার
 ঘরে রেখে যে ঘরে সবাই বসে আছে সেখানে এসে দুটি হাত কপালে ঠেকালো ও।
 ত্রীপতি আর ত্রীতিসতা সংগে সংগে কটমট করে তাকালো ওর দিকে। হাত তুলে
 নমস্কার করা কী? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কি মহাতারত অশুভ হয়?

—বেশ বাবা বেশ। মংগল হোক তোমার।

মুক্তিপদ দিব্যেন্দুকে জিজ্ঞেস করলো—মাষ্টারী করা হয়?

—আজ্ঞে। তবে তাকে কিছু করা বলে না।

—তা মন্দ কী বাবা। এই তো বেশ। কেন, মাষ্টারী কি খারাপ? কতো বড়ো
 আদর্শ, তবে ই্যা, মাইনে কম। তা হোক তবু সংকর্ম।

কথা বলতে বলতে কেমন অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে মুক্তিপদ। তারপর আচ্ছন্ন ভাবটা
 কাটিয়ে স্থিত মুখে দিব্যেন্দু আর মঞ্জুর দিকে চেয়ে বলল—তোমাদের দুজনের মধ্যে আলাপ
 করিয়ে দি। আচ্ছা, এই মঞ্জু, মঞ্জুরানী, আমার মেয়ে। আর ঐ ত্রীমান হচ্ছে দিব্যেন্দু,
 তোমার কাকবাবুর ছেলে। হল তো!

মঞ্জুর দিকে তাকালো দিব্যেন্দু। নমস্কার করলো। মঞ্জুও তাকালো ওর দিকে।
 নমস্কার করলো। বাস ঐ পর্যন্তই। দিব্যেন্দু একটু অবাক হল। কথা না বলার জন্তে নয়,
 ঐ প্রাণহীন ভংগীতে নমস্কার ফিরিয়ে দেবার উদাসীনতায়। আশ্চর্য শান্ত, ধীর মেয়েটি।
 উচ্চ বাক্য নেই। বংটা কালো। সেই কালো বং প্রথর হয়ে উঠেছে গিরিমাটি রঙের
 শাড়ীতে। কেন ঐ রকম রঙের শাড়ীতে অতো চুপ চাপ মেয়েটি?

দিব্যেন্দুর আশ্চর্য লাগলো।

আবার কথা বলতে শুরু করলো মুক্তিপদ। শুরু করবার আগে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সুতরাং কি এক আশ্চর্য যোগাযোগে শ্রীপতি আর প্রীতিসতার মুখেও ফুটে উঠলো মুক্তিপদের হাসি।

মুক্তিপদ বলল হেসে—আর বলো কেন শ্রীপতি। বায়না ধরলো মেয়ে। বাবা নিয়ে চল। তুমি তোমার বিশ বছরের না-দেখা বন্ধুর সংগে দেখা করতে যাচ্ছে, এমন সুন্দর দিনে আমাকে নিয়ে যাবে না? তারপর চোখ ছলছল করে ফেলল। ব্যাস, না সংগে এনে আর উপায় আছে! এমন দিনে ওর মা বেঁচে থাকলে—

চোখের কোণ দুটো ভিজে গেল মুক্তিপদের।

—আহা!

প্রীতিসতা আহা বলে তাকালো শ্রীপতির দিকে। ভাবটা এই, কিছু বল। কিন্তু শ্রীপতি কিছু বলতে পারলো না। সুতরাং প্রীতিসতার চোখ জলে উঠলো। একটা আহাও বলতে পারলে না। কি আড়বুঝো, জবুপবু মানুষ। খেঁটা মারো। প্রীতিসতার দিকে চোখ পড়ে যেতেই শ্রীপতি মুখটা অন্ধ দিকে ঘোরালো। আর এই সব দেখে একটু হাসি দিব্যেন্দুর ঠোঁটে চিড় ধরিয়ে দিলো। শ্রীপতি মুখ নিচু করতে গিয়ে দিব্যেন্দুর হাসি দেখলো। রাগে তাই গড়গড় করে মাথা ঝাঁকি দিলো ছ'বার। মঞ্জুরী কিছু বুঝতে না পেরে বাপের মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু মুক্তিপদের চোখ জানলার পরপারে হেমন্তকালের আকাশের রক্তহীন, ফ্যাকাশে মেঘের পাঁজরে বিধে গেছে তখন।

প্রীতিসতা বলল—দাঁড়ান আসছি।

সংগে ইশারা করে ডেকে নিয়ে এলো দিব্যেন্দুকে ভাঁড়ার বরে। তারপর বাস থেকে টাকা বার করে দিয়ে বলল—এই। মিস্তিতে হবেনা, আরো কিছু নিয়ে এসো। বড় তুচ্ছতামিলা দেখাচ্ছেন ওঁরা।

—কই তা' তো মনে হয়না। বেশ সরল বলেই তো—

—যা বলছি তাই শোন, আর না শোন ত' বাড়ি থেকে বার হয়ে যাও।

—বল, কি আনতে হবে।

দিব্যেন্দু হেসে ফেল প্রীতিসতার সংকান্ত ডোমেশানো বাক্যবিজ্ঞাসে।

—তোমার মনে আছে শ্রীপতি, সেদিন খুব জলের দিন, এই যখন আমরা খুব নিচু ক্লাসে পড়ি, আমরা ছ'জন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাগবাড়ার পার্কে চলে যাই বল খেলবো বলে, ছোলা ভাজা খাবো বলে?

—কই মনে পড়ে না তো। শ্রীপতি মাথা চুলকোতে লাগলো।

সেই কথা কানে যেতে রান্নাবরে এটাওটা নাড়াচাড়া করতে করতে প্রীতিসতা আপন মনে গজগজ করে উঠলো—মরণ!

মনে পড়েনা কি হে। তুমি বললে পার্কে নয়, সেখানে তোমার জানা লোক থাকতে

পারে। তার চেয়ে চলো যাই দূরের ওই মাঠে। গেলাম আমরা। এই ঘণ্টাখানেক খেলেছি কি খেলিনি অমনি মুখল ধারে বিষ্টি। সে বিষ্টি মনে আছে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার হাতে একটা ছাতা ছিলো নতুন কেনা ?

—হ্যাঁ।

তবু ভালো—রাগাধর থেকে রসান দিলো প্রীতিলতা ফের।

—তারপরের কথাও আমার মনে আছে। খুব জল হচ্ছে দেখে একটা ঝাঁকড়া-চুল বটগাছের তলায় চটা-ওঠা সাঁকোর ওপর আমরা দুই বন্ধু ছাতা মাথায় বসলাম। সাঁকোটা বেশি উঁচু নয়। পা রুলিয়ে বসলে জল ছোঁয়া যায়। তুমি জুতো শুদ্ধু পায়ে লাগি মারছিলে গোঁ গোঁ করে বয়ে যাওয়া স্রোতে। ভেসে গেল তোমার চটি। ভেসে গেলেও তোমার হুঃখ হলনা। তুমি খিলখিল করে হাসলে। আমি খিলখিল করে হাসলাম। শেষ কালে, ইচ্ছে করে, তুমি আর এক পাটিও ঐ জলে ছেড়ে দিলে। বললে, সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, বললে, যা বেটা ভাগ। সংগে সংগে ধলধলে গলাটা কবলের মত কাঁপিয়ে রীতিমত শব্দ করে হেসে কুটিপাটি হল মুক্তিপদ।—ঠিক বলছো ভাই, ঠিক বলছো।

শ্রীপতি এইবার খানিকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে।

সোন্দা কথা নয়, মুক্তিপদ হচ্ছে কানাহরিদত্তের বড় ভাই। নিতান্ত আমড়া কাঠের ঢেঁকিটি নয়। আর তাছাড়া বিশ বছরের ব্যবধানের পর আজ সর্বপ্রথম এই দেখা সাক্ষাৎ। তাই প্রথমটায় একটু কেমন সবই জড়িয়ে যাচ্ছিলো। যাক, জড়তাটা এখন একরকম কেটে গেছে।

কিন্তু মুক্তিপদ একটু অদ্ভুত আচরণ করছে নাকি। না হয় তার অবস্থা ধারাপ, তাই বলে এই রকম ভুলভালতা করতে হবে ?

যা দেখছে তাই বলছে ভালো। বাড়ি দেখে বললে, চমৎকার। কোচে বসে বললে, এলাহী ব্যাপার। দিবেন্দু মাষ্টারী করছে শুনে বললে, মন্দ কী। এর নাম সরলতা, এর নাম খোলা-মন ? কিন্তু সবাইকে টেকা দিয়েছে মঞ্জুরী। বড় চুপচাপ। এসে থেকে ছ' চারটি ছ আর হাঁ বলেছে কি বলেনি।

একি লজ্জা না আর কিছু ? দেমাক ? হ্যাঁ,—দেমাকই তো। কানাহরিদত্তের ভাইঝি, হবে নাই বা কেন !

শ্রীপতি বাপ আর মেয়েকে বসিয়ে রেখে একটু ভিতরে গেল। জলখাবার এখনো দিচ্ছে না কেন ?

—যাই একবার ভেতরে।

—আচ্ছা।

শ্রীপতি চলে যেতেই রাগাধরে খাবার নামিয়ে দিবেন্দু বড়ধরে চুকলো। সংগে সংগে একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। না, তাকে কেউ দেখেনি তখনো। সে দেখেছে শুধু।

সদাহাস্তময় যুক্তিপদর চোখে আগুন। আর আগুন যেন কবাতের মত চিরে ফেলতে চাইছে মঞ্জুরীকে। আর মঞ্জুরী সেই কুটিল, কর্কশ চোখের তীব্র ছটা যেন নিতান্ত অবহেলা করে অবাধ্য ষাড় তুলে বইলো ওই দিকে। চকিতেই ব্যাপারটি ঘটলো। সংগে সংগে সরে এলো দিব্যন্দু। কারুণ্যে কিছু বলল না। ভয়ানক রকম অবাক হয়ে রান্নাঘরে ফিরে এলো। তারপর দু'হাতে দুটো খাবার প্লেট নিয়ে দিব্যন্দু, দুগ্ধাস কর্পূর-মেশানো জল নিয়ে শ্রীপতি, দুটি রঙীন পাখা নিয়ে ঐতিহ্যতা বড়ঘরে ফের এলো। যুক্তিপদ রীতিমত অবাক হয়ে বলল—একি করছেন বৌদি। একটু পরেই তো ভাত খাবো। আপনারা এসব কি আরম্ভ করলেন?

—কিছু না। এ অতি সামান্য।

বলেই শ্রীপতি ঐতিহ্যতার দিকে তাকালো। অর্থাৎ দেখো, কেমন বললাম কথাটি। হঠাৎ মঞ্জুরী কি মনে করে উঠে দাঁড়ালো। লজ্জা পেয়ে গেল যেন। এতোকণ পারিনি। এইবার পেলো। শ্রীপতির হাতের গ্লাস, দিব্যন্দুর হাতের খাবারের প্লেট, ঐতিহ্যতার হাতের পাখা আর সব মিলিয়ে একটা শব্দব্যস্ত ভাব ওকে কেমন লজ্জা পাইয়ে দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রথম মঞ্জুরী কথা বলল, দিন দিন। আমাকে দিন। আমি পরিবেশন করছি। বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি ঐতিহ্যতা বলল—তুমি কোন ছুঁখে পরিবেশন করবে মা? কতো বড়োঘরের মেয়ে তুমি। আমরা বুড়ো মাগী থাকতে—

বুড়ো মাগী কথাটা বলেই চমকে উঠলো ঐতিহ্যতা। চকিতে একবার সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ও। না, কেউ খেয়াল করেনি কথাটার। নিতান্ত আটপোরে, সাদা—চলতি কথায় বিশেষ কেউ মনোযোগ দেননি। তবু উচিত হয়নি এমন কথা মুখ দিয়ে বার করা। বলে বলে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে। ছি-ছি। এরকম মুখ-আলগা হওয়া কি উচিত? কিন্তু অবাক করলো মঞ্জুরী। কথা বলল যে বড়! কানাহরিদন্তের না হয় ভাইঝি, তাই বলে দেমাকে গরগর করতে হবে? ধরাকে সরা জ্ঞান? টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে ঐতিহ্যতা বুঝলো অবাক হয়েছে সবাই। দিব্যন্দু তাকালো যুক্তিপদর চোখে। যুক্তিপদর যে চোখে একটু আগে আগুন দেখেছিলো ও সেই চোখেই এখন দেখলো বিশ্বয়, তাতে মেশানো চকিত আনন্দ।

—টেবিলের ব্যবস্থা কেন করেছে হে? এরকম করে তাই খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। বলতে বলতে একটা লেডিকেনি চোখের নিমেষে চালান করে দিলো যুক্তিপদ গৌরব করে। কথাটা কানে গেছে ঐতিহ্যতা আর শ্রীপতির। ওরা তাকালো দুজন দুজনের দিকে। না হয় টেবিলটা ততো দামী নয়, না হয় টেবিলরূপের দু'চার আয়গায় একটু চটা চটা, তাই বলে এই গা-জালানো অপমানের ছুঁচোবাকী ছেড়ে দিতে হবে? কানা হরিদন্তের বড় ভাই যখন, তখন হয়তো কেন নিশ্চয় এর চেয়ে দামী টেবিল রূপে, কলনার চেয়েও মনোরম অনেক অনেক লেডিকেনি খায় যুক্তিপদ, কিন্তু তাই বলে এরকম করে জুতো মারা উচিত নয়।

মঞ্জুরীর সেই অতি-চুপচাপ ভাবটা এখন আর নেই। এতোক্ষণ কোথায় যেন বাধা ছিলো। এখন নাই। তাই ও খেতে খেতে একটু সহজ ভাবে বলল—কাকীমা, আমি কিন্তু এসব খেতে ভালোবাসিনা। আমার পাপর ভাজা, তেল-মাখা মুড়ি আর যদি পেরোজ কুচি ভাজা হয়, তাহলে—

—তাইকিটি আমার পাগলী!

শ্রীপতি হাসলো। পাগলামী শুনে নয়, অল্প কারণে! পাপর ভাজা, পেরোজ কুচি উনি খান! খান না কচু। তা খাবেন না কেন? সখ করে খান। তবে তাকে ধাওয়া বলে না। বলে, শৌকা। তাই বলো না বাবু, শুঁকি, খাইনা। ভীমনাগের সন্দেশ আর কে, সি, দাসের রসগোল্লা না হয় দিতেই পারিনি, তাই বলে—ওঃ—

শ্রীতিলতা এই প্রথম সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো স্বামীর দিকে। না, একটু বুদ্ধিগুহ্মি হয়েছে। বেশ কায়দা করে কথাটি বলেছে, তাইকিটি আমার পাগলী। বেশ বলেছে। তা' বুদ্ধি হবে নাই বা কেন? আমার কাছে ধমক খেয়ে খেয়ে এটুকু আক্কেল আর হবে না?

চুকলো জলখাবার পর্ব। দিব্যেন্দুকে নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলো মুক্তিপদ কস্তাসমেত। তাই বলল শ্রীতিলতাকে—বৌদি, আপনি তো উল্লু ছাড়বেন না। আর আমরা এসে পড়ায় তা আরো অসম্ভব। আর শ্রীপতি, তুমি নড়বে না কারণ নড়তে পারো না তুমি। ঘর থেকে ছ'পা বার হলে তুমি নির্ধাৎ মারা যাবে। অগত্যা দেবুকে নিয়ে আমি আর মঞ্জুরী—

কেউ কিছু বলবার আগে আস্তে অথচ দৃঢ়ভাবে মঞ্জুরী বলল—আমি যাবো না।

কাকীমা একা রান্নাঘরে পেরে উঠবেন না। আমি থাকবো ওঁর কাছে।

শ্রীতিলতা হাউমাউ করে উঠলো—তুমি উল্লুর ধারে কি যা? যাও, বোরয়ে এসো বাবার সংগে।

মুক্তিপদ কি মনে করে বলল—থাক আপনার কাছে। যখন বলছে। এসো দেবু।

দেবু বলল—চলুন।

খানিকটা দূর্বোধ্য থাকলেও ইতিমধ্যে খানিকটা পরিচিত হয়ে উঠেছে মঞ্জুরী শ্রীতিলতা আর শ্রীপতির কাছে। না, দেমাক এতোটুকু নেই যেন্নের। তবে যে দেমাক বলে মনে হয়েছিল?

হ্যাঁ—তা হয়েছিলো ঠিক। হবার কারণ, বড় বেশি চুপচাপ ছিলো। কেন চুপচাপ ছিলো বাড়াবাড়ি রকমের? তা বাপু বলা যায় না। আর ঐখানেই খানিকটা কুয়াশা রয়ে গেছে। কিছু রহস্য। না, উল্লুর ধারে বসবো বল্লই কানাহরিদত্তের তাইকিকে উল্লুর ধারে আনা যায় না। অথচ একেবারে কোন কাজ না দেওয়া ঠিক নয়। সে যাই হোক, বড় শাস্ত মেয়ে বাপু। বাচাল, বেহেড নয়। বেশি কথা বলে না। সজ্জা-শরম আছে। এইরকমই ভালো।

খানিকপর মুক্তিপদ ফিরে এলো টই টই করে ঘুরে ।

—কই বৌদি, তেল দিন । চান করবো । বাবা, ঘুরে ঘুরে আলা হয়ে গেছি ।

ঐতিমতা তাড়াতাড়ি একটি সত্ত কাচানো পাট-না-ভাড়া কাপড় আর দু'একদিন আগের কিনে রাখা গামছা তার হাতে তুলে দিলো । তেলের বাটি নিয়ে এলো দিব্যেন্দু ।

মুক্তিপদ একটু ধতমত খেয়ে বলল—এই কাপড় পরে চান করতে হবে নাকি ? মরেছে । আর কিছু নেই ?

ঐতিমতা মনে মনে বেজায় রেগে উঠলো । এর চেয়েও ভালো, এর চেয়েও পরিষ্কার, আর এর চেয়েও যত্ন করে পাট করা কাপড় না-হলে চান হয়না ? তবে কি পরে চান করে কানাহরিদন্তের হাড়হাভাতে বড় ভাই ?

ঐতিমতা মুখভার করে বলল—না, এছাড়া তো—

—অগত্যা ।

বলে আচ্ছা করে গায়ে তেল মাখতে বসলো মুক্তিপদ ।

ঐপতি দোকান থেকে সত্ত আনানো গন্ধ তেল ওর হাতে আগিয়ে দিলো—মাথায় মাকো হে, ভারী খোসবাই ।

—ওসব মাখি না ।

ভাচ্ছিলোয় সংগে বললে মুক্তিপদ ।

দিব্যেন্দু বলল—আমায় দিন । আমি মাখি ।

—এই নাও ।

বলে হড়াৎ করে অনেকটা তেল ইচ্ছে করে ওর মাথায় ফেলে দিলো ঐপতি ।

আর বিজ্রীরকমের এবং বিরাট আয়তনের একটি প্রবল হাসি অতিকষ্টে দমন করে করেও আর চেপে রাখতে পারলো না দিব্যেন্দু । ছিপি খোলা সোড়ার মত হেসে উঠলো ।

বেলা হল । ছুটো বাজলো । সবাই খেতে বসলো । মঞ্জুরা শুধু নয় । ও বলল—না, এখন খাবো না ।

না—ঐ একটি কথাই যথেষ্ট । কথাটা উচ্চারণ করলো আশ্চর্য করেই । কিন্তু তাতে জোর ছিলো ।

তাই ঐতিমতা কিছু বলতে পারলো না । ঐপতিও না ।

মঞ্জুরী কারুর সম্মতির তোয়াক্কা না রেখে পরিবেশন করতে শুরু করে দিলো ।

ঐপতি ফের কি আশ্চর্য করে বলতে গেল ।

মঞ্জুরী বলল তেমনি শাস্ত ভাবে, বড় বড় চোখে—আপনি ব্যস্ত হবেন না কাকাবাবু । আপনি খান ।

দেখা গেল যা ভেবেছিলো ঐতিমতারা, তা ভুল । পরিবেশন বড় লোকের আহুয়ে ভাইঝিটি সত্যিই করতে জানে । আর তা ঐতিমতার চেয়ে কোন অংশে কম নয় ।

যতো সহজ, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করুক মঞ্জুরী, দিব্যেন্দুর সে খটকা আর যাবার নয়।
ওর চকিতে দেখা অসাধ্য ঘাড়ের অপরাধ ভংগীটি ভোলার নয়।

খেতে খেতে নানা কথা হচ্ছিলো। তুমি কেন শ্রীপতি এখানে চলে এলে? আর
চলে এলে যদি কাউকে না জানিয়ে একেবারে বিশ বছরের দায়ে নিশ্চিন্দ করে যেতে হয়?
কি বললে? হঠাৎ তোমার মায়ের কলেরা হওয়ার খবর পাও?—ও—হরি তাই বলে ইত্যাদি
ইত্যাদি নানাকথা।

কিন্তু এসব কথার আড়ালে আর একটি কথাও শ্রীতিলতা আশা করছিলো। মুক্তি-
পদ কেন যে বলল না? বললেই হত। কথাটা তো আর মিথ্যে নয়। সবাই বলে। আর
ভক্ততার খাতিরেও—

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে শ্রীতিলতার আফসোস মেটালো—চমৎকার রেঁধেছেন
কাকীমা। ভারী সুন্দর।

অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। ওর কানে অমৃতবর্ষণ করলো কেউ। শ্রীতিলতা ভক্ততা
করে বলল—আমার আবার রান্না। তোমাদের বাড়ির তুলনায়—

মঞ্জুরী তবু বলল—হ্যাঁচড়াটা রেঁধেছেন চমৎকার।

ইতিমধ্যে বেলা আরো বেশি চড়ে গেছে। এক খিলি পান মুখে দিয়ে, কি খেয়াল হল
মুক্তিপদর, ও বলল—শ্রীপতি, তোমার গান শুনবো ভাই, কতোদিন শুনিনি।

—আমার আবার গান। শ্রীপতি উদাসভাবে হাসলো।

—ও-কথা বোলোনা। আমাদের কারকরুমা লেনের সে সময়কার সেরা গাইয়ে ছিলে
তুমি। তোমার সেই গানটা, আহা, মনেও পড়েনা ছাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী...এখনো কানে লেগে আছে। ঐ যে ঐ তো হারমোনিয়ম।

আঙুল দিয়ে হারমোনিয়মটা মুক্তিপদ দেখিয়ে দিলো শ্রীপতিকে। অগত্যা শ্রীপতিকে
চেনে নামাতে হল ঝুল আর ধুলো মাখা, বেলা প্রায় ফেসে যাওয়া পুরোনো দিনের মনোরম
সংগীটিকে। এটির আর স্বপ্ন করার সময় হয়নি। কে ভেবেছিলো মুক্তিপদর খেয়াল হবে
গান শোনার? ছি-ছি। ওটা দেখলেই সংগীত শাস্ত্রের ওপরে ঘেন্না ধরে যার। আশ্চর্য,
ওটা যে ওখানে ছিলো এটা মনে হয়নি এতোদিন। যাই হোক একটু ধুলো-টুলো ঝেড়ে
ওটার গায়ে হাত বুলিয়ে নিলো শ্রীপতি। তারপর পুরোনো ঢঙে পুরোনো হারমোনিয়ম
পুরোনো দিনের গান জুড়ে দিলো শ্রীপতি। মুক্তিপদ পকেট থেকে দেশলাইএর
কাঠি বার করে ঝোলের উপর টোকা দিতে লাগলো বৃহুবৃহ। আর শ্রীতিলতারও
অনেক অনেকদিন পর আশ আবার নতুন করে মনে হল, অস্ততঃ সা-রে-গা-মাটা তার
স্বামী জানে।

কিন্তু আবার সেই দ্রুত শয়তানি জুড়ে দিলো দিব্যেন্দুর সংগে। ওর ভয়ানক হাসি
পেল কুড়ি বছর অভ্যাস না থাকা ভারী, খনখনে গলার আওয়াজে।

ও মুখে হাত চাপা দিয়ে ঘরের বার হয়ে এলো। ঘরের বার হলেও ঐ হাসির হাত

থেকে নিস্তার নেই। তখনো পর্যন্ত উদ্দাম ভাবে গেয়ে চলেছে শ্রীপতি। গান ধামানো যায়না। মুক্তিপদ যখন বলেছে। কানাহরিদন্তের বড় ভাই যখন বলেছে।

গান ধামানো এক সময়। কথা চলল আরো ধানিক। ইতিমধ্যে চা এসে গেল। চা খাওয়া হয়ে গেল। আবার দু'একটি কথা। ছাড়া ছাড়া, অস্পষ্ট। আবার চূপচাপ।

জমছেননা আর। ছপুর চলে গিয়ে বিকেল এখন। সেই দিকে চেয়ে হাই তুলল মুক্তিপদ, তারপর বলল—এবার ওঠা যাক ভাই। কাল আপিস।

—তোমার আপিসটা যেন কোথায়?

—রাইটাস্ বিল্ডিংস্।

—ও। চূপ করে গেল শ্রীপতি। ও চূপ করলেও কানে গেল কথাটা ঐতিহ্যতার।

ভাঁড়ার ঘর থেকে ঈশারা করে ডাক দিলো ঐতিহ্যতা শ্রীপতিকে। দেখেছো মানুষটা কিরকম 'বেভু'ল।' আসল ব্যাপারটাই ভুলে মেয়ে দিয়েছে। রাইটাস্ বিল্ডিংস্ গুনে ডুড়ি বাড়িয়ে বলল 'ও।' বাস্। দায়িত্ব শেষ। তার ছেসে আর কতো ভাসো হবে।

—এসেছো? গলা নামিয়ে কিন্তু চাপা রাগে পুড়তে পুড়তে ঐতিহ্যতা বলল—বাঞ্ছা কথার মন্ত হয়ে আছো, ধন্য পুরুষ। কি হল আসল ব্যাপারের? কিছু বলবে না।

—ও আমি পারবো না। তুমি বলো।

—সবেতেই আমি? তুমি কি করতে রয়েছো?

—আমি নেই মনে করো।

—যতো খিদে আমার? তোমার খিদে তেঁটা নেই তো? বেশ, আমিই কথা পাড়ছি।

অল্প কয়েক মিনিট পর ঐতিহ্যতা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বড় ঘরে গেল। তারপর মুক্তিপদ আর মঞ্জুরীর্দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে হেসে বলল—কতো কষ্ট হল আপনাদের, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট!

—কি বলছেন? এরকম অমৃত বহুদিন জোটেনি।

মুক্তিপদ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলল।

—তা বলতে পারেন।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে হেসে ঐতিহ্যতা আরো বলল—একটা কথা বলছিলুম। দেবু তো মাষ্টারী করছে।

মুক্তিপদ বালিসে ঠেসান দিয়ে কাত হয়ে শুয়েছিলো। দেবুর কথা শুনে উঠে বসলো।

—ওর কি হবে তাই ভাবি। অতো অল্প মাইনেতে—। তাই আমি বলছিলাম, আপনি যদি রাইটাস্ বিল্ডিংস্—আর ওতো বি. এ. পাশ, তাই বলছিলাম—

শ্রীপতি বলল—তুমি বললেই হয়ে যাবে।

এক মিনিট, প্রায় এক মিনিট চূপ করে রইলো মুক্তিপদ। তারপর বলল—রাইটাস্ বিল্ডিংস্ ওর কাজ যদি জুটিয়ে দিতে পারতাম তাহলে আমার লাভ নেহাৎ কম হোত না। কিন্তু—

শ্রীপতি বলল—‘কিন্তু’ টা কোথায় ?

—আমি তো সামান্য আড়াইশো টাকা পাই।

রীতিমত অবিবাহিত ভংগীতে হেসে শ্রীতিলতা বলল—আপনি না হয় তাই করেন ধরা গেল। কিন্তু আপনার ভাই সেই লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ ধুলো মুঠি যিনি সোনা করে ছাড়েন, তাঁর তো অনেক জানাশোনা, তাঁকে বলে—

মুক্তিপদ হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বলল—তাকে বলার উপায় সে রাখেনি। আমাদের হাঁড়ি আলাদা।

—কেন ?

—কারণ ? হাসলো মুক্তিপদ, বলল—কারণ তিনি স্তর হরিদত্ত দ্বিতীয় বাজেন-মুখুন্ডে আর আমি—আমি সামান্য কেরানী, তাই।

সমস্ত সুরাই কেটে গেলে এই কথা। আর সংগে সংগে সব কিছুই ভারী নিরর্থক মনে হল। চায়ের কাপ দুটি নিঃশেষ হয়ে গেছে। সিগারেটের ছাই জমেছে প্লেটে। ওদিকে বেলাও হল কিছু। ঘরে আর তেমন আলো নেই। জানালার পরপারে হেমন্তের আকাশ দেখা যায়। লালের ছোপ নেই সেখানে। রুগীর বিছানার ময়লা চাদরের মত ক্যাকাশে মেঘ। আকাশও তেমন নীল নয়। বাসি। বমি আসার মত। পড়ন্ত রোদ্দুর গাছের আগায়। একটি চিল উড়ছে শূন্য আকাশে। আর এই ঘর। সবই কেমন নির্বাক জবুথবু। একটি টিকটিকি স্নান আলোয় চলেছে দেওয়াল বেয়ে আর একটি টিকটিকির সন্ধানে। মাছি উড়ছে ভনভন—একাকী। বাইরের দম্কা বাতাস মড় মড় করে কতোগুলো পাতা খসিয়ে দিলো।

আন্তে আন্তে মুখ খুলল মুক্তিপদ, এই প্রথম আশ্রয় আশ্রয় করে বলল—আমিও বলবোনা ভেবেছিলাম এতো তাড়াতাড়ি। কিন্তু না বলে থাকতে পারছি কই? চুপ করলো একটু ও।

কেউ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ। হুমড়ি খেয়ে পড়লোনা কেউ উত্তর দিতে।

কের মুক্তিপদ বলল তেমনি স্নান গলায়, তেমনি সুর-ছেঁড়া ভংগীতে—আমার অনেক-গুলো মেয়ে মঞ্জুরীই বড়ো। আমি ভেবেছিলাম পান্টি ঘর, তাছাড়া শ্রীপতি তুমি আমার কতোদিনের বন্ধু, তাই আমি ভেবেছিলাম—কিন্তু—

আবার একটু ধামলো ও।

তারপর আবার ঐ একই ভাঙা ভাঙা গলার ঐ একই ভংগীতে টেনে টেনে ক্লান্ত স্বরে বলল—কিন্তু তাত এখন আর সম্ভব নয়, কি বল ?

শ্রীপতি আর শ্রীতিলতা অবাক চোখে তাকালো মুক্তিপদের চোখে। তারপর চোখ নিচু করলো। কথা বলল না কেউ। কিন্তু সেই মুহূর্তে, সেই স্নান আলোয় চকিতে দিব্যেন্দু একবার তাকালো মঞ্জুরীর দিকে। মঞ্জুরীও তাকালো ওর দিকে। ওরা কেউ কোন কথা আগে বলেনি। তবু এখন, এই মুহূর্তে কোন কথা না বলেই কথা হল। ঠিক সুরটি বাজলো। দিব্যেন্দুর মনে হল তারা একই জমির ওপর দাঁড়িয়ে।

আর কোন কুশাশা নেই, রহস্য নেই।

অশ্রুমতী

ভূর্গেবিভ

অনুবাদ : শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাট্টা

ভালবাসার ফুলে কাঁটার যন্ত্রণা।

ষতদিন মিচেলের কাছে গিয়ে বসেছি দিনরাত পাহারায় পাহারায়। কাঁটা হয়ে থাকতাম। কিন্তু তার পরও আমাদের গতিবিধির উপর নজর ছিল ছোটকর্তার। প্রকেশরের বিষাক্ত দৃষ্টি অনেকবার দেখেছি আমি। শুনেছি তার চাপা হাসির আওয়াজ। কিন্তু সে সব তখন আমার মনের সীমানায় কোন অশান্তির ঝড় তুলতে পারত না। তখনকার দিন-রাত্রি আমার ভালবাসার অকুস যাত্রা।

আমাদের মধ্যে গোপনে ঠিক হয়েছিল, যেদিন মিচেল শহরে ফিরে যাবে, ও অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এসে আমায় তুলে নিয়ে যাবে সঙ্গে। তার ফলে কোন লোক জানাজানি হবার ভয় থাকবে না। সেই সব ব্যবস্থা পাকা করবার ইচ্ছেতেই যাবার আগের দিন বিলিয়ার্ড ঘরে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা জানিয়েছিল মিচেল। তারই এক বিশ্বস্ত চাকরের হাতে সেই মর্মে একখানা চিঠি পেলাম। ঠিক সাড়ে পাঁচটার আমি যেন যাই সেই ঘরে কেন না আমার সঙ্গে শেষবারের সব কথাবার্তা না করে সে আয়োজন পাকা করতে পাচ্ছে না।

এর আগেও দুবার আমি তার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছি। ঘরের বাইরের দিকের একটা চাবি ছিল আমার কাছে। সাড়ে নটার দিকে ঘড়ির কাঁটা ঝুলতেই আমি গায়ে একখানা গরম চাদর জড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পারের নিচে হালকা বরফের টুকরোর মুচ মুচ করে আওয়াজ হচ্ছে। আমি দ্রুত পায়ে অভিসারে যাচ্ছি।

মুখ তুলতেই চোখে পড়ল ছাতের আলসের ঠিক ওপরেই নীলাভ জ্যোতির মণ্ডল রচনা করে সভা জাঁকিয়ে বসেছেন চন্দ্রমা। দেওয়ালের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শব্দ দিয়ে ফিরছে হিমালী বায়ু। সারা শরীর দিয়ে একটা অশ্রুভূতি দ্রুত ওঠা নামা করছে।

সতর্ক হাতে দরজার চাবী লাগিয়ে নিঃশব্দে অন্ধকার ঘরের ভিতর গিয়ে পড়লাম। পিছনে দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে তাকাতাই চোখে পড়লো দেওয়ালের ধারে একটি ছায়ামূর্তি।

সেই মূর্তি আমার দিকে হু পা এগিয়ে আসতেই আবেগে আমার গলা জড়িয়ে এস। কাঁপা গলায় ডাকলাম।

‘মিচেল।’

‘মিচেল থুই বরে আটক আছে আমার হুকুমে। কার সঙ্গে কথা কইছ বুঝতে পেরেছ।’

সেই কণ্ঠস্বরে যেন আমার বুকখানা চিরে গেল ফালা ফালা হয়ে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আমি ছুটে পালাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ছোটকর্তা আমাকে সবল হাতে ধরে ফেললেন।

‘যাচ্ছ কোথায়, ছিনাল মেয়েমানুষটি? গোপনে গোপনে অভিসার করতে শিখেছ। কাঁচা বয়সের ছোকরাদের ভুলিয়ে মজা লুটছ, সেই মজা আমি তোমাকেও শেখাব।’

আতঙ্কে শরীর আমার থরথর করে কাঁপছিল। তবু তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা আমি করলাম। কিন্তু তার বজ্রমুষ্টি আমি বিন্দুমাত্র শিথিল করতে পারলাম না।

ছোট কর্তা আমাকে কঠিন করে ধরে রইলেন।

‘আমাকে ছেড়ে দিন। যেতে দিন আমার’ মিনতি করে বললাম আমি।

‘এক পা নড়বে না, আমি বলে দিচ্ছি।’

হাত ধরে আমার জোর করে বসালেন ছোট কর্তা। সেই অনুসারে তার মুখখান আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তার মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলাম আমি। কিন্তু সেই অন্ধকারে তার ভারী নিঃশ্বাসের আওয়াজ আমার কানে যাচ্ছিল। আর গুনতে পাচ্ছিলাম তার দাঁতে দাঁত পেষার শব্দ।

তখন আমার ভয় কেটে গেছে। ধরা পড়ার নিরাশ ভাবটাও কেটে গেছে মন থেকে। শুধু একটা নিথর বিমূঢ়তা আমার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রইল। বাজপাখীর নথরাবাতে অবসন্ন অসহায় ছোট পাখীর মত বিবশ দেহে আমি বসে রইলাম। তার সেই হিংস্র আক্রোশের চাপে শরীর আমার কঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।

‘এতদূর অবধি গড়িয়েছে দেখছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।’

তার বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু ছোট কর্তা আমাকে এমন জোরে নাড়া দিয়ে দিলেন যে সর্বদা আমার ব্যথায় থরথরিয়ে উঠল। তার মুখের অপমানকর ভাষায় অতিষ্ঠ হয়ে টেচিয়ে বললাম—

‘মিচেল, তুমি আমার রক্ষা কর। এ অপমান আমার সহ্য হয় না।’

রাগে সব শক্তি দিয়ে ছোট কর্তা আমার এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে যন্ত্রণায় আমি টেচিয়ে কেঁদে উঠলাম।

আমার কান্না তার কানে যেতেই ছোট কর্তা আমার ছেড়ে দিলেন। অন্ধকারে বিরাট ছায়াবৃত্তির মত দরজা আড়াল করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ সময় কাটল। নিথর নিস্পন্দ হয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছোট-কর্তা দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

‘বোসো চুপ করে।’ শেষ অবধি বললেন তিনি—‘চুপটি করে বসে আমার কথার জবাব দাও। আমি দেখতে চাই তুমি একেবারে উচ্ছিন্নে গেছ, না এখনও বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে

লোপ পায়নি। ভুল ভ্রান্তি আমি মাপ করবো, কিন্তু মতি যদি দেখি যে গোল্লার পথে পা বাড়িয়েছ—আমার ছেলে মিচেল তোমায় বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে? জবাব দাও—কথা দিয়েছে তোমায়?’

সে কথার কোন জবাব দিলাম না আমি!

আমার শাড়া না পেয়ে রাগে হুকার দিয়ে উঠলেন তিনি।

‘চুপ করে আছ। তার মানে তোমার কিছু বলবার নেই, এই ত? তুমি হবে আমার পুত্রবধূ। তোমার মত মেয়ে—ফন্দীটা মন্দ করোনি দেখছি। তবে একটা বড়ো ভুল করেছ তুমি। ঐ সব ছোকরারা কাজ গোছাবার ক্ষেত্রে অনেক অনেক রকম মন ভোলবার কথা কয়। বলে রানী করব, সোহাগী হবে। কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিয়ে সে সব কথা তারা রাখে না, সে বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। তুমি ত আর চার বছরের কচি শুকীটি নও। তুমি কি ভাব আমার মত ভদ্রলোক তোমার মত একটা মেয়েকে ঘরে স্থান দেবো। ভাবছিলে গোপনে পালিয়ে যাবে, তারপর বিয়ে করে ফিরে আসবে এই ঘরে। বড়োটার পারে পড়ে ছ ফোঁটা চোখের জল ফেলে আমার মন ভোলাবে। তখন আর আমার উপায় থাকবে না কিছু? নোংরা মেয়েমানুষ, এই ত চেয়েছিলে তুমি? এই ফন্দীই ত এঁটেছিলে মনে মনে!’

কথা বলানোর ক্ষেত্রে লোকটা হয়ত আমার খুন করতেও নারাজ ছিলেন না। কিন্তু আমার মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারেন নি তিনি।

ক’বার এদিক ওদিক করে নড়ে বেড়ালেন ছোটকর্তা। তারপর অনেকখানি সামলে বললেন—

‘বুঝতে পারছি যে তুমি ভয় পেয়েছ? ভয় পাওয়ার কথাই। ভাবছ বোধ হয় যে একটা দৈত্য দানবের কবলে পড়ে গেছ। কিন্তু ভয় নেই। আমি ঠিক দৈত্য দানব নই। তোমার মত ছদ্ম বল একটা পদার্থ আমার শরীরেও আছে। তুমি একবার ভেবে দেখো। নিজেকে আমার অবস্থায় ফেলে একবার ভেবে দেখো দিকিনি। তোমার ওপর মিথ্যে রাগ করে আমার লাভ কি? রাগ আমি কোনদিন করেছি তোমার ওপরে? যখন প্রথম এসেছিলাম এখানে, তোমায় কি দয়া মায়ী মমতা দেখাইনি? মিচেল যখন অসুখে পড়ল তোমাকেই ত ডেকে পাঠলাম তাকে দেখা শুনো করতে। গল্প করে তার মন ভালো রাখতে। তার কি এই প্রতিদান তুমি আমায় দিলে? আমি তোমার মঙ্গল চাইছিলাম, আর তুমি গোপনে গোপনে আমারই সর্বনাশের পথে পা বাড়ালে। এই কি কৃতজ্ঞতা তোমার? অন্তত এর চেয়ে আর একটু ভালোই তোমাকে ভেবেছিলাম আমি।’

কাছে এসে ছোটকর্তা আমার বাহমূলে আদর করলেন। তার সবল হাতের চাপে এখনি সেখানটা আমার বস্ত্রণায় অশাড় হয়ে গিয়েছিল, সেইখানে কত আদরে তিনি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

‘দোষ দিই না অবশ্য তোমায়। মাথা গরম আমাদের সকলেরই। তোমারই বা একা

দেবো দেবো কেন ? কি যে আমাদের ভাল, কি যে আর সকলের ভাল, এসব কথা আমরা ভাল করে বিবেচনা করতেই চাই না। নিজেরটা নিয়েই মেতে ওঠা আমাদের স্বভাব। কিন্তু তবু তোমার জিজ্ঞেসা করি, কি লাভের লোভে তুমি এই পথে যাচ্ছ ? সত্য সত্য হয়ত কিছু লাভ হত তোমার, কিন্তু সে ক'দিনের ? আমি তার বাবা, এ বাড়ির সর্বময় কর্তা আমিই। মিচেল নয়। আমি সংসারী মানুষ। আমার কাছে তোমাদের এই সব ছেলে-মানুষীর কোন দাম নেই। দাম থাকতেও পারে না। যে আশা তোমার জীবনে সার্থক হতে পারে না, সে আশা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। মিথ্যে নিজের মনকে ঠকাচ্ছ কেন ?

একটুখানি দম নিয়ে ছোটকর্তা আবার বললেন—

‘অবশ্য যে পথে তোমরা যাচ্ছিলে সে বড়ো নোংরা পথ। সে পথে গেলে শেষ অবধি তোমার ভাগ্যে কি হত সে বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। কিন্তু সে পথে যেতে তোমায় আমি দেবো না। তোমার মঙ্গল অমঙ্গলের তার যখন আমার হাতে এসে পড়েছে, আমি তার যথাযথ ব্যবস্থা করব। যাতে তুমি সুস্থ সুন্দর জীবন চালাতে পার, তার একটা পাকা বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি। তোমার যে বকম বুদ্ধি-শক্তি, তোমার যত গুণ, সে সব আমার মত আর কেউ জানে না। ও সব জিনিস আমি নষ্ট হয়ে যেতে দেব না। কিন্তু তার চেয়েও যা বড়ো, সে হল তোমার রূপ। আমি বড়ো হয়ে যাচ্ছি, তবু তোমার ঐ চোখের দিকে তাকালে আমারই শরীর কেমন হয়ে যায়। তোমার ঐ রূপ আমি যেখানে সেখানে নষ্ট হতে দিতে পারিনা।

কথাগুলো শুনে শরীরের ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা সাপ যেন হিলহিল করে বেড়াতে লাগল। তার কথা যেন আমার বিশ্বাস হতে চাইল না। প্রথমে ভাবলাম যে হয়ত মিচেলকে ছেড়ে দেবার ঘূষ হিসাবে ছোটকর্তা আমার অন্য ব্যবস্থা করে দিতে চাইছেন। কিন্তু সেই অন্ত্যাস হয়ে যাওয়া অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভুল ভাঙল। দেখলাম মুহূর্তে হাসছেন তিনি।

আমার দিকে আঙুল মেড়ে বললেন—‘কি গো। মনে ধরল আমার কথা ? রাজী ত ?’

‘রাজী !’ অন্য মনস্তাবেই যেন কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটকর্তার পাতলা হাসি আমার চোখে পড়ল। কানে বাজতেই সমস্ত শরীর আমার ঝি ঝি করে উঠল।

‘তোমরা সব এক জাতের। দেখে আসছি কিনা চিরকাল। কাঁচা বয়সের মেয়েরা ছোকরা না পেলে বাঁচে না। খাদ্য পানীয় সব তোমাদের ঐ এক। কিন্তু ভালবাসা বুঝি ছোকরাদের একচেটে। বয়স হয়েছে যাদের তারা বুঝি ভালবাসতে ভুলে যায়। তারা বুঝি ভালবাসতে পারে না ? আমার মত পুরুষেরা খুব ভালবাসতে পারে গো। আমাদের ভালবাসা হল পাহাড়ের মতো। একবার মন বসল ত আর টলবার পাত্র নয়। ঐ সব ছোকরাদের হল সন্ধ্যাবেলার মূল। এই আছে ও এই নেই। খুব হৈ চৈ করে আরম্ভ করে

কিন্তু থাকে কতক্ষণ। বিশ্বাস করতে পারছ না বুঝি। এই এসোনা কাছে। দেখো না নিজেই পরখ করে ভালবাসতে পারি কিনা—’

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আমি সর্বশক্তি দিয়ে সেই বুড়োটার বুকে ঘুষি মারলাম। হঠাৎ এই থাকা খেয়ে লোকটা যেন টলে পড়ে যাবার মত হল। আমার শরীরে তখন তৈরবী ভর করেছে। ঐ ঘৃণ্য মানুষটাকে শিক্কা দেবার জন্যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। ভয় তখন শরীর থেকে কোথায় চলে গেছে।

‘লজ্জা করে না আপনার ঐ সব কথা বলতে? জানেন, আপনার দাদা আমার বাবা—’

‘কি বলছ? আচ্ছা—আচ্ছা, তাই বুঝি?’ রাগে থরথর করতে করতে ছোটকর্তা টেচিয়ে ডাকলেন—‘আইভান, এদিকে এসো।’

মুহূর্ত মধ্যে ঘরের আর একটি দরজা খুলে যে বেড়িয়ে এসে সে প্রফেসর। হাতে তার বাতি। তারই আভায় মুখখানি তার দেখতে পেলাম আমি। প্রতিহিংসার পুলকে একটা অশুভ জ্যোতি জ্বলছে সেই মুখে। চোখে তার আক্রোশের তৃপ্তি। সেই চোখ দুটি দেখলে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

‘এই মেয়েটাকে এখুনি নিয়ে যাও—’ ছোটকর্তা হুকুম দিলেন তাকে। কম্পিত হাতে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন। ‘এটাকে বাড়িতে নিয়ে যাও। ঘরে তালি বন্ধ করে রাখবে। ওর ঘরে যেন কাকপক্ষী ঢুকতে না পারে। যদি এর কোনরকম ব্যতিক্রম হয়, তোমার সর্বনাশ করে দেবো জানবে।’

প্রফেসর টেবিলের উপর বাতিদানটি রেখে ছোটকর্তাকে তখুনি সেলাম দিলে। তারপর বিষাক্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কলে পড়া ইউনিভার্সিটিতে যেমন করে মানুষ এগায়, প্রফেসরের তদ্বিধে আমার সেই কথাই মনে হল। লজ্জার যুগায় অপমানে শরীর আমার অবশ হয়ে গেল। ঐ মানুষটা সব করতে পারে। সেই ভয়ে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

‘এসো সুলক্ষ্মী। আমার সঙ্গে এসো।’

আমার হাত ধরে প্রফেসর নিয়ে চলল। আমি যে পালাবার চেষ্টা করব না, সে কথা বুঝতে তার দেবী হয়নি। ছোটকর্তার অশুচি সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই তখন আমি বাঁচি।

প্রফেসরের সঙ্গে একরকম ছুটেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে এলাম।

সারা পথটা নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরিয়ে রাখলে প্রফেসর। তার সেই চাপা হাসির শব্দ যেন আমার প্রাণের ভিতর মাদলের মত বাজতে লাগল।

বাড়িতে পৌঁছে জানলা দরজা বন্ধ একখানা ঘরে সে আমার বন্দিনী করে রাখলে। যাবার সময় আমার একটা সেলাম দিয়ে গেল যেমন দিয়েছিল ছোটকর্তাকে।

‘বান্ধাকে বিদায় দিন রাজকুমারী’ বললে প্রফেসর—‘পাখী তোমার পালান। তাকে

খাঁচায় বাঁধতে পারলে না সুন্দরী। তবে জাল বিছিয়েছিলে ভাল। টেনে তুলতে পারলে না তাই—’ বলে হো হো করে হাসলে প্রফেসর।

শেষবারের মত দরজাটা বন্ধ করবার সময় একবার মাথা গলিয়ে বলে গেল—‘অপমানের প্রতিশোধ কেমন নিলাম, দেখলে ত। সাপের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলে—’

ঘরের চাবিটা ঘুরে যাবার পর আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভয় ছিল প্রফেসর হয়ত আমার হাত দুখানা বেঁধে দিয়ে যাবে। কিন্তু হাত দুখানা আমার নিজেরই রইল। সেইটুকুই আমার স্বস্তি রইল।

জামার সিকের কিতেটা ছিঁড়ে ফেললাম আমি। সেই কিতে পাকিয়ে একটা কাঁস করে গলায় জড়িয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু কি মনে করে গলায় দিলাম না।

অপরিসীম বিদ্রোহে চেষ্টা করে বললাম—‘কিসের জন্তে মরব আমি? মরলে ত তোমাদের দ্বিত। কিন্তু দ্বিততে তোমাদের আমি দেবো না। এ জীবন আমার মিচেলের হাতে আমি সঁপে দিয়েছি। সে আমার বাঁচাবে। তোমাদের এই নরক থেকে সে আমার উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।’

আমার মিচেলও যে শত্রু পুরীতে বন্দী। ভাবতেই চোখের কোল ফেটে আমার জল এল। বিছানায় পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলাম আমি। পাছে প্রফেসর দরজার আড়ালে কান পেতে আমার কান্না শুনে হাসে সেই ভয়ে মুখ চাপা দিয়ে আমি কান্না গিলতে লাগলাম।

শরীর আমার ভেঙে পড়েছে। সকাল থেকে লিখতে বসেছি। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এই লেখা থেকে উঠে পড়লে আর আমি লিখতে পারব না। হয়ত আমার শেষ কথা না লেখাই থেকে যাবে চিরদিন। যত কষ্টই হোক, সে বেদনার কাহিনী আমি শেষ করবই। তা না হলে মরেও আমি শাস্তি পাব না।

চব্বিশ ঘণ্টা পরে একখানা ঢাকা গাড়ী এল আমার নিরে যেতে। সেই গাড়ীতে করে তারা আমার চাবীদের পাড়ায় একখানা কাঁকা কুঁড়েতে নিয়ে এল। ছ সপ্তাহ সেই ঘরে নজর-বন্দী অবস্থায় কাটল আমার। সেই সময় একটি যুহুর্ভও আমার স্বস্তিতে কাটেনি।

পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যেদিন থেকে মিচেল এ বাড়িতে এসেছিল, সেইদিন থেকেই প্রফেসর আমাদের সতর্ক পাহারায় রেখেছিল। যে চাকর আমার চিঠিখানা পৌঁছে দিয়েছিল, তাকে টাকা ঘুষ দিয়ে চিঠিখানা পড়ে নিয়েছিল প্রফেসর।

যেদিন রাত্রে আমার সঙ্গে ঐ ব্যাপার ঘটে তার পরের দিন সকালে বাপ-ছেলেতে এক বিব্রী মনান্তর হয়। ছেলে বাপ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বলে গেছে যে এ বাড়িতে আর কোনদিন সে ফিরবে না। কিন্তু প্রফেসরের তাতে কিছু ভাল হয়নি। যে তীর সে আমার দিকে ছুঁড়েছিল সেই তীরে নিজেকেই সে আহত হয়েছে।

ছেলে ঐ-ভাবে চলে যাবার পর ছোটকর্তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল প্রফেসরের ওপর। তাকে জমিদারী থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। অবশ্য মোটা টাকা দিয়েই তাকে বিদায় করলেন।

প্রফেসর যাবার আগে আমার আর একবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। অবশ্য কড়া পাহারা মোতাবেক রইল আমার ওপর। এরই ক'দিন পরে আমরা চলে এলাম।

কিন্তু অমন ভাল চাকরীটা চলে যাওয়ার জন্যে প্রফেসর আমাকেই দায়ী করলে। আর সেই থেকে দেখছি আমার ওপর তার আক্রোশের অবধি নেই।

‘অত চটে যাবার তোমার কি দরকার ছিল শুনি? বুড়োটা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি করেছিল, কিন্তু তাতে তোমার কি, হুঁ হাঁ করে দুটো দিন কাটিয়ে দিলেই বুড়োটা গিতিয়ে যেত। তখন তোমারও একটা হিল্লো হয়ে যেত, আমারও আখের এমন করে মাটি হোত না। কথায় বলে না মেয়েদের বারো হাত কাপড়েও—তা লাভ হোল কি? তুমি এলে আমার পাল্লায়—আর সে ছোকরারও ছটকটানি ঘুচল না।’

এ সব অপমান নীরবে হৃদয় করতাম আমি। ছোটকর্তাকে আর কখনো দেখিনি আমি। ছেলের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার পর মানুষটি যেন ভেঙে পড়লেন। জানিনা শেষ অবধি তার অনুতাপ হয়েছিল কিনা। তবে আমার সঙ্গে তাদের বাড়ির সম্পর্কটা তিনি ইচ্ছেমত উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তাই আমার নামে কিছু মাসোহারা ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। যতদিন না আমার বিয়ে হচ্ছে ততদিন অবধি প্রফেসরের হাতে আমার মাসোহারার টাকা আসবে। যে টাকা আমার তার হাত থেকে নিতে হবে। সেই আমার লজ্জার টাকা।

মক্কোতে এসে প্রফেসর বাসা বাঁধলেন। তার কাছে, তার বাসায় একটা দিন আমি থাকতে চাইনি। যে দিকে দু চোখ যায় আমি চলে যেতাম। পুলিশে খবর দিতাম আমি। কিংবা হয়ত বাঁচবার রাস্তা খুঁজতে আরো বড়ো কারুর কাছে আশ্রি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। তারপর কি হত, তা আর আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু কিছুই আমার করা হয়ে ওঠেনি।

দেশ থেকে চলে আসবার দিন, আমাদের বড় বাড়ির একজন বি আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়েছিল। সে আমার মিচেলের লেখা চিঠি। সে ত চিঠি নয়, সে আমার মৃতদেহে প্রাণশিখা। সেই চিঠিতে কতবার ঠোঁট ছুঁয়েছি তা বলতে পারি না। কত কান্নায় ভিজে গেছে তার লেখা।

সেই চিঠিতে মিচেল আমায় অনন্ত ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বলেছিল যন ধারাপ না করতে। সে চিরকালের জন্যে আমারই থাকবে। আমিই তার বিয়ে করা বোঁ। আমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে জীবনে আর সে গ্রহণ করতে পারবে না। এই চিঠি পেয়ে অভাগিনী যেন বেঁচে উঠেছিল। মিচেল জানিয়েছিল যেন আমি ধৈর্য না হারাই। অপেক্ষা করি তার ফিরে আসার।

মিচেলের কথা আমি ফেলতে পারিনি। অসীম ধৈর্য নিয়ে আমি অপেক্ষা করে বসে আছি। তার সেই চিঠিখানি আমার বুকের খুব কাছে লুকিয়ে রেখেছি। যখনই প্রফেসর আমায় অপমান করে আমি আলতো হাতে আমার বুকের মধ্যস্থানটিতে হাত দি। যুহু যুহু হাসি। তখন আর আমার অপমানের ভয় থাকে না। নৈরাশ্রজয়ী সে আমার মহান সংগীত। আমার দিশেহারা জীবনের প্রিয়তম ধ্রুবতারা।

তারপর আরো একখানি চিঠি পেয়েছিলাম মিচেলের কাছ থেকে। তার মধ্যেও সেই একই আশার সুর। অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো। এ বিচ্ছেদ-রাত্রির অবাসন হবে।

অত বড়ো দুঃখ অপমানের পরেও কি করে আমি অমন শান্ত মনে দিন কাটাচ্ছি, এ এক মহা রহস্য হয়ে উঠেছিল প্রফেসরের। সে বোধ করি ভাবত যে, দুঃখে আমার মাথা ধারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশা আমার কুসুম হয়নি। মুকুলেই সে ঝরে গেছে।

সেদিনের সকালটি মনে পড়ছে। প্রফেসর আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। মুখে তার বিশ্ববিজয়ী হাসি। চোখে বিষ মাখানো চাউনি। এসেই আমার কোলের ওপর ফেলে দিলেন একখানি খবরের কাগজ। তাতে মিচেলের মৃত্যুসংবাদ।

তারপর আর আমার কিছু করবার রইল না। নিবিরোধী ভালমানুষের মত প্রফেসরের ঘরে আমি রয়ে গেলাম। নিজের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা আর আমার মনে রইল না। দিনরাত্র আচ্ছন্ন করে রইল মিচেলের স্মৃতি। আমার নাম মুখে করে কবরে গিয়ে ঘুমিয়েছে মিচেল। সে খবর তার এক চাকর আমার এসে বলে গেছে। সে কথা কি আমি ভুলতে পারব কোনদিন। মিচেলকে কি ভুলতে পারব।

সেই বছরই প্রফেসর বিয়ে করলেন। খবর এল যে দেশের বাড়িতে ছোটকর্তা মারা গেছেন। উইলে আমার মাসোহারার টাকা বিহীন বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। আমার বিয়ে হওয়া অবধি সে টাকা পাব আমি। আমার অবর্তমানে সে টাকা পাবে প্রফেসর।

এমনি করে বছরের পর বছর গেছে। সাত বছর পার হয়ে গেল। জীবন যেন এগিয়ে চলেছে ভাঁটার টানে। আমি যেন পারঘাটের যাত্রী : নিজের জীবনের ভাঁটি স্রোত দেখছি পারে বসে। সেই স্রোতে আমার জীবনের সব কিছু ভেসে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। এমন অসহায় আমি।

এমনি করেই বোধ হয় আমার দীপশিখা নিভে যেত একদিন। কিন্তু নিয়তি কেন জানি না আমার জীবনে আবার নতুন আশাবরী বাজালে। নতুন দীপ জ্বলল আমার মনে।

এই অবধি লেখা সেই পাণ্ডুলিপিতে। এর পরের ক'খানি পাতা কিভাবে ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে। শেষের কটি লাইনেও এমন কাটাকুটি যে তা থেকে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হল আমার।

[ক্রমশ]

অবেশণ

সুবোধমোহন ঘোষ

সেই ঘটনার পর থেকে আর আমল দিইনি নিশীথকে ।

হুজনে হুজনকে এড়িয়ে চলি । অথচ প্রতিদিন আমাদের দেখা হবেই । ও মুখ নিচু করবে, আমি মুখ ফিরিয়ে নেবে । বিজাতীয় যুগা : একটা অপদার্থ, কাপুরুষ, ভণ্ড, স্বার্থপর । নিজেকে লুকিয়ে রাখবার অদ্ভুত কৌশল ও জানে । কিন্তু এ গুণটুকু কমবেশি কার না চরিত্রে আছে । ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে ।

তবু নিশীথকে আমি ক্ষমা করতে পারি না । না ।

পাশাপাশি বাড়ি । আমার প্রতিটি দিন যন্ত্রণা-কাতর, কীটহুট, আমার শুভ্রশুচি মেঝাড়ে হল ফুটবেই । এত জ্বালা, এত জ্বালা তার । মুন্সিগ এই, বাইরে বাজারে রাস্তায়, ট্রামে বাসে হঠাৎ যুধোয়ুধি হয়ে যাওয়া । এখানে মলজ্ব হেসে ও মুখ তুলতে চেষ্টা করত, আমার সারা মুখের কাঠিন্তে এক নিমেষে মিলিয়ে যেত সে হাসি ।

আর কোথায় না তাকে দেখতে পাওয়া যায় । মার্কামারা বাউণ্ডুলে, বজ্জাত হতভাগা ।

মনে মনে যতই ওকে ঘৃণা করতে থাকি, ততই ও নিকটে সরে আসে । শত্রুকে ঘৃণা করলে নাকি শত্রুতার জ্বালা মেটে । নিশীথ আমার শত্রু নয় । আর কারো কাছে হয়ত সে ক্ষমার যোগ্য, আমি যে কেন সে উদারতা দেখাতে পারছি না—

এই অবস্থা চলছে ক'মাস । আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে আমার ক্রান্তি । এখন মনে হচ্ছে সবটুকু ওর দেখা হয়নি, ফাঁক রয়ে গেছে কোথাও । কোথাও নিজেকে ফাঁকি দিয়েছি । আর একবার পরীক্ষা করলে কেমন হয় ?

পরীক্ষা নিরীক্ষা কী এতই সোজা কথা ! তার বেদনা, গ্লানি, ক্রান্তি, হতাশা বইবার সাহস আমার আছে তো ? এ যে আগুন নিয়ে খেলা । পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও নেশার ঘোর কাটে না । ভাবি, দিন যায়, ক্রান্তি মাপি, জ্বালা বাড়ে ।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ এল । মন স্থির করে ফেললাম, এ সুযোগকে আমি কাজে লাগাব । গরল ওঠে উঠুক, অমৃত উঠলে তো কথাই নেই । আমার সমস্ত সত্য সত্য উল্লাসের নাচন দেখব ।

সুতরাং বিধাকড়তা সাফ মুছে ফেললাম । দেখা যাক । অভিজ্ঞতার আর এক স্তরে পৌঁছবার ঐশী নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম ।

হঠাৎ সরমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। আমার ছোট বোন সরমা। বছরের পর বছর চেষ্টা করে করে ব্যর্থ আক্রোশে যখন ফুসছিলাম, হঠাৎ তার এমনি সমাধান—

ভয়ে ভয়ে বলি এই কি অদৃষ্ট! আমার বুদ্ধি বিচারবোধ বোলা হয়ে গেছিল। ভাবছিলাম আকস্মিকতাই জীবন। যাক সে কথা।

সময় অল্প। কত কাজ, কাজের পাহাড়। এত হাঁটাইটি, কেনাকাটা, দর কষাকষি। সকাল থেকে সেই যে শুরু হবে—। ছোটদের জুজুর ভয়ের মতন এই ভয় থেকে শত হস্তে দূরে থাকতে আমি ভালোবাসি। আমার নিয়মে-বাধা জীবনে এত বড় অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। ডান হাত থাকতেও ডান হাত খুঁজে মরি। আর মার সহিষ্ণুতার বাধ ভাঙল বলে—

তখন মনে হল এ ভার নিশীথের ঘাড়ে চাপালে কেমন হয়? এককথায় রাজী হয়ে যাবে সে। হাতে স্বর্গ পাবে। কিছু বেশি হবে খরচ। তা হোক। নিজের স্ত্রী শ্রমটুকু আর একজনের ঘাড়ে চাপাতে গেলে এ ক্ষতিটুকু স্বীকার করতেই হবে।

ক্ষতি স্বীকারের কোন ক্ষোভ নেই আমার। বরং বড় স্বস্তিবোধ করলাম, বড় হাফা লাগল নিজেকে।

তবে, নিশীথকে পেতে গেলে আগে রান্নুর দাদার মতামত নেওয়া দরকার। না নিলে ক্ষুণ্ণ হবেন তিনি, আর দেখায়ও খুব খারাপ।

প্রস্তাব শুনে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, বলো কী? তোমার কি মাথা খারাপ হল? জানো ও চোর, ডাকাত—এই সেদিনের কথা ভুলে গেলে?

বললাম, কি করা যাবে, সামলে নেব।

আমার শরীর ভালো নয় জানোই তো। নইলে—

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, না, না দাদা। আপনাকে কষ্ট দেবনা। তবে কর্তর্দগ্ধলো আপনার সাহায্য ছাড়া—

সেটুকু পারব—তা নাও নিশীথকে। পাই পয়সাটির হিসেব নেবে ওর কাছ থেকে, আমি কিছুই মনে করব না তাতে।

আছে ও?

আছে। আজকাল ঘরে বসেই বিড়ি বাঁধে। রান্নাকেও এই বিস্তার পারদর্শিনী করে তুলছে। আর বলো না ভাই, আর কারো কাছে বলবার নয় এসব কথা। ছি ছি! হতভাগা আরো কত নিচে নাববে কে জানে।—তার লম্বা নাক থেকে অনেকখানি হাওয়া বেরিয়ে এল। চুপসে গেলেন।

তবু একটা কাজ নিরে আছে।—তাকে একটু চাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলাম।

কাজ, তুমি একে কাজ বল! বামুনের ছেলে বিড়ি বাঁধবে?

হেসে বললাম, দেখুন, এ খেলা কতদিন থাকে।

হ্যাঁ, ওইটুকুই আমার সাক্ষ্য। তবে ভাবগতিক ভাল নয়। রান্নুও বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে।

এবার চুপ করলাম। একেবারে ওদের ঘরোয়া কথায় এসে গেছি। আর না।

সুতরাং কাজের কথাই পাড়ি, একবার ওকে পাঠিয়ে দি।

উনি হাঁক পাড়লেন। গলার জোর আছে বটে। সংযমী গন্তীর নিনাদ।

ভূত দেখার মত আমাকে সামনে দেখে নিশীথ ধ্বমত খেয়ে গেল। ভয় পেয়েছে।
অনাবশ্যক দাড়ি চুলকতে লাগল।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন উনি, রীতিমত সতর্ক করে দিলেন, ধবরদার...হঁ...বুঝলে...

ও সমজ্জ হাসল। এবার কানের পাশ চুলকতে লাগল। কত বকমের মূজাম্বা
স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে মানুষ। দুটো পা দুটো হাত, আর গোটা একখানা মুখ—কত
তার লীলা! কত কদর্ষ আর কত মধুর।

বললাম তোমার অমত নেই তো?

একাজ আমি পারব। কিন্তু কেমন ভয় করছে।

কেন?

ও চুপ করে রইল। এবার দুটো আঙুল মটকে নিল। অস্থির, অস্থির ছোকরা।

সাহস দিলাম, ভয় নেই, তোমাকে অপরাধী করব না।

রাহুর দাদা বললেন, এ ভিন্ন উপায় নেই নিশীথ। আমার মুখ রেখো।—অনুরোধ
আর শাসনে স্নেহের আভাস ফুটল তাঁর গলার কারুকাজে।

এরপর নিশীথকে বাড়ি নিয়ে এলাম। ঠিক সাদর সন্তাষণ সে গেল না যার কাছে।
ক্ষুণ্ণ হলাম।

হুদিন কার্টল।

কাজে যেতে গেছে নিশীথ। যার বেজার মুখে হাসি ফুটল। গাধার মত খাটছে যে
লোকটা তার খাওয়া-দাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখতে যা ভুললেন না। যার মন জয় করেছে
নিশীথ। নিশীথ এখন এ-বাড়ির ছেলে, আপনজন।

আর হিসেব নেবার দায় থেকে আমাকে মুক্তি দিলেন রাহুর দাদা নিজেই। আপিস
থেকে ফিরে সন্ধ্যা আহ্নিক সেবে তিনি চলে আসেন আমাদের বাড়ি। কুগী, মানুষ, চায়ের
বদলে বেলের সরবৎ আর কিছু মিষ্টি নিয়ে আসেন মা। ষড় করে খাওয়ান। জলযোগ সেবে
তিনি হিসেবে বসেন। রাত হয়। দরজার পাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিশীথ। যেন
এমনি এক পরীক্ষার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে সে যেখানে ফেল হওয়া না-হওয়ার মধ্যে তার
ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি নির্ভর করছে।

রাহুর দাদার মুখে হাসি ফোটে। পাই পরসাটি নড়চড় হয়নি। আগামী দিনের
কাজকর্মের আলোচনা ও যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তিনি যখন ওঠেন, তখন বেশ রাত। পাড়া
ঘুমিয়ে পড়েছে।

উনি চলে গেলে মা নিশীথকে খেতে-ডাকেন। তখনও সে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট।

দেখি আমার চেয়ে রাহুর দাদার উৎসাহ হাজারগুণ বেশি। যেন নিজের বোনের

বিয়ে। অবিষ্টি বিয়েটা পাকাপোক্ত হবার সমস্ত ষাপগুলোই তাঁর বিষয়বুদ্ধি নিয়ে পেরিয়েছি। তাই ঠকিনি, পাত্রপক্ষের মার-প্যাঁচের সঙ্গে সমানভাবে তাল ঠুকেছি। হ্যাঁ ; আমার ঘুঙুরের বোলে মা পর্যন্ত চমকে গেছিলেন।

একদিন উনি ছঃখু করে বললেন, নিজের বোনকে তো ভালোভাবে পাত্রস্থ করতে পারিনি, সরমার বিয়েতে সে সাধ মিটিয়ে নেব।

মা বললেন, ছঃখু কি বাবা, সরমা তোমারও বোন।

উনি হাসলেন।

আর একদিন হাসতে হাসতে বললেন, ছোকরা এতটুকু ডান-হাত বাঁ-হাত করবে না এ আমি ভাবতেই পারছি না অসীম। মশলার দোকানে গেছলাম—

বললাম, থাক গে দাদা। শুনলে ও কষ্ট পাবে। ও যে এত খাটতে পারে—

আমিও কম অবাক হচ্ছি নাকি। কুঁড়ের বাদশা যে—

মা হাসতে লাগলেন, ওকে তোমরা কোথাও অবিচার করছ, দেখেওনে আমারও যেমন ধারণা হয়ে গেছিল—যাই বল, নিশীথ বড় ভালো ছেলে।

আমরা খুব হাসতে লাগলাম।

আমাদের স্বীকার করতে হল, বাজারহাট ব্যাপারে নিশীথ গুলীলোক। শেরালদার মাছ কিনতে গেলেও দ্বিতে এসে সে। রাত তিনটে থেকে শেরালদার মাছের বাজার এক আশ্চর্য বাজার। দালাল, কয়েল, গদির মালিকদের কানামাছি-ভেঁা খেলায় পাকা খেলোয়াড়ও বুড়বাক বনে যায়, গলায় আটকে যায় আসটে মাছি।

আমি বোকা বনে গেলাম নিশীথের প্রস্তাব শুনে, রান্না আমিই করব, জোগাড়দার হিসেবে একটা লোক চাই শুধু, এমন পাকা মাছ আর কারোকে বাঁধতে দ্বিতে মন সরছে না। কহলগাঁও বা চিলকার মাছ নয়, কলকাতার কাছাকাছি ভেড়ীর মাছ শ্রাওলা খেয়ে খেয়ে চেহারাখানা কেমন বাগিয়েছে দেখেছেন—’

মাছ সব্বন্ধে ওর ধারণায় অবাক হই, তবু দ্বিধাভরে বললাম, সে কি, এত পরিশ্রম, তুমি স্বয়ং দেখিয়ে শুনিয়ে দিও।

মামার হোটেল চালিয়ে এলাম এতদিন।...কি হে, মাছ কুটতে জান না, ওইভাবে মাছের আঁশ ছাড়ায়—একেবারে ধোঁতলে দিলে যে মাছটা...সব, সব—

রান্নার দাদা পুরোহিতের সঙ্গে এক চুল-চেঁরা তর্কে মেতেছিলেন, গলায় আঁওরাজ পেয়ে উঠে এলেন, পারবে অসীম, ওর হাতে ছেড়ে দাও।

অতিথি অভ্যাগতদের ভারও উনি ঝেঁছায় নিলেন। শুধু নতুন কুটুমদের সঙ্গে মজলিসি আলাপ-জমানো ছাড়া-আমার আর কোন কাজ নেই।

তাও শেষ হল এক সময়। শুভলগ্নে বিবাহ হয়ে গেল।

বান্নার চাপা সংশরও আমার ঘুচল। বান্নার প্রশংসা বুধে বুধে। উৎসাহী ক’জন বায়ুনঠাকুরের ঠিকানা চেয়ে বসল।

কর্মবাড়ির হৈ চৈ জলন্ত ভুবড়ীর মত নিবে আসছে। বাইরে একটা চেয়ারে আমি পিপাসার্ত। এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে গেলেন মা।

বললাম, আর রাত করে লাভ কী, নিশীথ, বাহুর দাদা ওদের—বাহু এসেছিল ?

না। সত্যি নিশীথ যদি না থাকত। কী চমৎকার রাগা রে, সুখ্যাতি শুনে শুনে—আমার কি মনে হয় জানিস খোকা, নিশীথের ওপর খুব অবিচার করছে ওরা—

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে মা-চলে গেলেন।

বললাম, আর একটু নাও।

আর কত খাব দাদা। প্রবল বেগে ও মাথা ঝাঁকানি দিল।

তোমাকে খাইয়ে সুখ নেই, খাইয়ে তুমি নও। ও হাসতে লাগল। ফুলো চোখে হাসিটা বীভৎস, খুতনিতে রক্তের দাগ।

আর একটু নাও, গা-গতরের ব্যথা মরবে। আর একটু সোডাওয়াটার চলে দিলাম ওর গ্লাসে, আর একটু কারণ।

আমি বলে উঠে দাঁড়াতে পেরেছি। রাগলে দাদার জ্ঞান থাকেনা।

মারলে কেন ?

ধরচের ঢাকা চেয়েছিলাম তাই। গ্লাসে আঙুল চুমুক দিল ও।

ব্যাপারটা আমার কাছে বড় হৈয়ালি লাগছে। আচ্ছা, তোমার বউ তোমাকে ভালোবাসে ?

খুব। এত ভালো মেয়ে।

হাসি আমারও পেল। গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিলাম। এক টুকরো মাংস গালে কেলে ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা। অনেক দিনের কৌতুহল আমার। এই মেয়েটিকে ও বিয়ে করল কেন। কেমন করে পছন্দ হল। চোখের কোণ থেকে ছোটো গাল সাঁদা, কপালের মাঝখানটা, কনুই থেকে ছোটো হাত, পায়ের গোছ, বুক-পিঠ-পেটে ঢাকা ঢাকা দাগ। ঝল ঝল রোগ নাকি।

বহুর দশ আগে। আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়া এল। দিনের বেলা ঘুলঘুলি-অন্ধকার বাড়িটার আনাচে-কানাচে। চট করে কারো পছন্দ হবার কথা নয়। কলকাতার লোক আলো-বাতাসের কাঁড়াল, পরসাদ দিয়ে কিনতে হয় আলোবাতাসকে। চড়া দামে। বারোমাস তিরিশদিন বিনিপরসাদ আলোবাতাস ছ'হাতে উড়িয়ে, আলোবাতাসের আলাদা দামের কথা ভাববে, কি ভেবেও হিসেবের বাড়তি ল্যাঙ্গটুকু কেটে বাদ দেবে—এক গৈয়ো লোকের গৈয়োমির কথা ভেবে বড় আশঙ্কা বোধ করেছিলাম।

মানুষের গলার আওয়াজে এত বাছ। বাছমনে মৃতদেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হল।

মা বললেন, বাঁচলাম, সন্ধ্যার পর ওদিকে তাকালে গা ছমছম করত।

ঠিক গা ছমছম নয়, রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবলাম, পোড়ো বাড়িটার ঘুলঘুলি-অন্ধকার এই সুপুরুষটির ছোঁয়াতে আলো হয়ে ফুটেছে। মুগ্ধ হয়েছিলাম রান্নুর দাদাকে দেখে।

আলাপ কমে উঠল। রেখে-ঢেকে কথা বলতে জানে না ওরা। সহজ কথাটা বলতে পারার আশ্চর্য প্রসাদগুণ রান্নুর দাদার। মিশে গেলাম।

তখন রান্নুর বয়স দশ-বার বছর। সুন্দর মুখশ্রী। গভীর চোখের চাউনি। কেমন যেন মনে হত বয়সকালে পুরুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা পাবে ও। কিন্তু আমার চিন্তা বেশি দূর এগুত না। ডান হাতে টীকার জায়গায় দুটো চাকা চাকা দাগ দেখেছিলাম। মাঝে মাঝে ট্রপিক্যালের নিয়ে যেতে দেখেছি ওর দাদাকে। রান্নুর মা বলতেন, বসন্তের টীকা দিয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার। তারপর থেকেই ওইরকম দেখা দিয়েছে। দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের বংশে কারো নেই ও রোগ।

বছর দুই বাদে ওরা উঠে গেলেন অন্য পাড়ায়। খুব দূর না হলেও আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। একরকম ভুলেই গেলাম ওদের।

একদিন পথে দেখা রান্নুর দাদার সঙ্গে, বললেন, মা দুঃখ করছিলেন, তুমি আর যাও না, এই তো একটুখানি পথ।

কথা দিয়েছিলাম, যাব। গেলামও একদিন। বেশ বড় হয়েছে রান্নু। সেই সঙ্গে সমান ভাবে বড় বড় হয়েছে টীকার চাকা চাকা দাগ। ঠোটে, ক্রর কোলে, কপালের কিছু কিছু অংশ ছিট ছিট সাদা হতে শুরু হয়েছে। আমাকে দেখে পালাল। অনেক ডাকাডাকি করলেন ওর মা, কিছুতেই সামনে এল না।

দরজার দিকে চেয়ে বললাম, এত লজ্জা তোর কবে থেকে হল রে রান্নু, আর, এদিকে আর—

স্কন্ধ হয়ে ওর মা বললেন, আজকাল ও কারো সামনে বেরোয় না। এগুলো বেড়েই চলেছে, কে কি ভাববে তাই। বড় অভিমানিনী।

বললাম, ট্রপিক্যালের দেখাচ্ছিলেন, কি হল ?

ছাই হ'ল। ওর মা হাত নেড়ে বললেন, বড় বড় ডাক্তাররা শুধু পাশই করেছে। এমন কোন ওষুধ দিতে পারল না যাতে দাগগুলো মিলিয়ে যায়। ওর জীবনটা নষ্ট। বিয়ে-খা কেমন করে দেব। এমনিতেই মেয়েদের বিয়ে হয় না—

একটা দীর্ঘ শ্বাস চেপে সেদিন চলে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল এসব কথা রান্নুও আজকাল ভাবতে শিখেছে। মেয়েটি বড় ঠাণ্ডা ; লাজুক। ওর মা বলছিলেন, মুখ বুজে সংসারের সব কাজ করে যায়। এতটুকু ব্যাজার নেই।

বলেছিলাম, ভালো করে লেখাপড়া শেখান, কিংবা কোন হাতের কাজ—নিজের পারে যাতে দাঁড়াতে পারে।

খুব হেসেছিলেন ওর মা, এত অসহায় হাঙ্গামা আমি দেখিনি, ওকে বুঝিয়ে যাও তো বাবা। নিজের স্বার্থ যদি এতটুকু বুঝতে শিখত। মরেও সুখ পাব না বাবা।

অনেক ডাকাডাকি করেছিলাম। বর থেকে কিছুতেই বেরোয়নি রান্নু।

তারপর মাঝে মাঝে গেছি ওদের বাড়িতে। কিন্তু রান্নু যে কোথায় লুকিয়ে থাকত খুঁজে পাওয়া দায়। যদি বা ওর মা কখনও জোর করতেন কান্নাকাটি করত। শেষে ওকে আর কেউ বিরক্ত করত না। বাড়িতে থেকেও যেন বাড়িতে নেই।

কয়েক বছর আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। শুনেছিলাম যুদ্ধের হিড়িকে কলকাতার বাসা ছেড়ে দিয়ে ওরা দেশে চলে গেছে।

যুদ্ধ মিটল। আবার রং ফিরতে শুরু হয়েছে মানুষের জীবনে। আমিও লেখা, ক্লাব, বন্ধ বান্ধব নিয়ে মশগুল হয়ে রইলাম। ভুলে গেলাম আশে পাশে তাকাতে।

হঠাৎ দেখা। ট্রামের দল্ল অপেক্ষা করছিলেন রান্নুর দাদা। চিনতে পারিনি, বাজপড়া-তালগাছ যেন। মারি আর যুদ্ধের আগুনে বলসে যাওয়া একটি ছবি যেন।

অসীম না ?

বিমূঢ় হয়ে গেছিলাম। স্বপ্নের সঙ্গে বাড়ির বোঁজ খরর নিলেন। কুশল প্রশ্নের আদান প্রদান শেষ হল। বললাম, রান্নুর সেই দাগগুলো মিলিয়ে গেছে ?

জানো রান্নুর বিয়ে হয়ে গেছে ?

স্বাসক্রম হয়ে বললাম, কেমন করে জানব। নিয়ন্ত্রণ তো করলেন না। কোথায় হল, পাত্র করে কী ?

আইবুড়ো নামটা ষোচালুম আর কি—বুঝতেই পারছি।

রান্নু রাজী হয়েছিল বিয়েতে ?

আমার কৌতূহল দেখে উনি হাসলেন, বিয়ের দল্ল কান্নাকাটি করত হামেসাই। মাও ইদানীং রোজ মড়া-কান্না শুরু করত : ওর—একটা ব্যবস্থা করে দে, থাকতে থাকতে দেখে যাই।

ভাবলাম, পুরুষের আসল লিপ্সা থেকে মুক্ত হবার শিক্সা রান্নু কোথায় পাবে, কি জানি মেয়েদের মন—। তবু সংশয় রইল। রান্নুর মার দল্ল সত্যি বেদনা বোধ করলাম।

সেগুলো তেমনি আছে, না—

উনি উত্তেজিত হলেন, যা হয়েছে, অন্ধকারে দেখলে তুমি রীতিমত-আংকে উঠবে। ছেলেপুলের ঘর, কি-যে ভয়ে ভয়ে আছি।

ছেলেটিরও আছে নাকি ওই রোগ ?

না, না। তবে একটু আফিং-এর নেশা আছে। আমার হোটেল দেখাওনা করে।

খুব অবাক হলাম। আরো উদগ্র হল কৌতূহল।

একটা বাড়ি দেখে দাও অসীম। দেশে বড় অশ্রুবিধে হচ্ছে। যুদ্ধের সময় দেশে কী যে বোকামি করেছি, মনে হয়েছিল শহর ছাড়তে পারলে ভালোভাবে বাঁচব—

উৎসাহিত হয়ে বললাম, আমাদের পাশের বাড়িটা খালি আছে।

তাই নাকি ? বেশ তো । আবার পাশাপাশি থাকা যাবে । আনন্দে উনি আমার পিঠ চাপড়ালেন ।

ট্রাম এসে গেছে । উনি উঠে পড়লেন । গলা বাড়িয়ে ঠিকানা দিলেন ।

ওরা এলেন আমাদের পাশের বাড়িতে । দেশের বিনিপন্নসার আলোবাতাসের চেয়ে ভালো ঘুমঘুলি-অন্ধকার—বৈচে থাকার রসদ এখানেই আছে । যেন ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, কলকাতায় ঠাই পেয়ে আশ্রয়হারা হলেন রাসুর দাদা । আমাদের কাছ থেকে ছোটখাটো সুবিধা, সহযোগিতা পেয়ে বর্তে গেলেন । অনেক বদলে গেছেন ।

দেখসাম জামাইকে । এই নিশীথ । চেহারা ভালোই । না, কোথাও কোন বিকৃতির চিহ্ন নেই চেহারায় । এখানেই থাকে । এমন বৌকে ঘরে তুলতে ওর কাকা রাজী হয়নি । স্বস্তর বাড়ি ছাড়া নিশীথের আপনজন বলতে কেউ নেই ।

প্রায় ঝগড়া হয় ওদের বাড়িতে নিশীথকে নিয়ে । মা জামাইয়ের পক্ষ সমর্থন করেন অন্ধর মতন । রাসুর সাড়াশব্দ পেতাম না । রাসুর দাদা চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করেন : নিশীথ বসে বসে থাকে কেন ? কাজকর্ম করুক । কাজকর্ম উনি করেকবার জুটিয়েও দিলেন । বেশিদিন কোন কাজে টিকে থাকতে পারে না নিশীথ । রাতদিন খিটিখিটি ।

এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওদের বাড়িতে । সময় সময় বড় ঝামেলা মনে হয় । ঝগড়া চরমে উঠলে কেঁদেকেটে রাসুর মা আমাদের বাড়িতে এসে বসে থাকেন । এখন ভাবি, বাড়ির খোঁজটা না দিলেই বুঝি ভালো করতাম ।

সেদিন ঝগড়া তুমুল আকার ধারণ করল । কয়েকটা টাকা ছিল রাসুর দাদার পকেটে । সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না । মাসের শেষ সপ্তাহ । রাসুর দাদা ধৈর্য হারালেন । রাগের সঙ্গে কান্নার আমেজ গলার স্বরে ।

চুলের মুঠি চেপে ধরলেন রাসুর অসহ্য ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে, আঁকারা দিয়ে দিয়ে তুই ওর মাথাটা চিবুচ্ছিস—

রাগের আর এক কারণ পরন্তু এক সাহেব বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে নিশীথ । কাল হাতে-পায়ে ধরারও বেশি অশ্রুনয় বিনয় করেছিলেন নিশীথকে । নিশীথ কাঠ-গোয়ারের মত-মুখ বেঁকিয়ে ছিল । তারপর এই চুরি । মাসের শেষ ।

বা কতক চড় চাপড় পড়ল রাসুর পিঠে । রাসু চুপ ।

সোমখ মেয়েকে মারতে দেখে হাউমাউ করে আমাদের বাড়িতে ছুটে আসতেই রাসুর-মা চৌকাঠের ওপর কিট ।

নিশীথ বলল, মারতে হয় আমাকে মারুন, ওর কোন দোষ নেই ।

কী নির্লিপ্ত কণ্ঠ রে বাবা ! হকচকিয়ে গেছলাম ।

দাদা অগ্নিব্রুতি হয়ে বললেন, বেরোও বাড়ি থেকে, চোরকে কিছুতেই বাড়িতে স্থান দেব না ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল নিশীথ ।

দিনকতক বাদে রাস্তা থেকে আবার ঘরে নিয়ে এসেন দাদা।

আজকের ঝগড়া চরমে উঠেছিল। বেদম মার খেয়েছে ও দাদার কাছে। ডিসপেন-
সিয়া কুগীর রাগও বিষম। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আজকের ঝগড়ায় নিশীথও
সমানভাবে গলাবাজি করেছে। ওদের ঝগড়ার বিষয় বড় দুর্বোধ্য, হেয়ালিপূর্ণ, কান খাড়া
করে শুনেছি, বিশেষ কিছু বোধগম্য হয়নি।

মাকে মাঝে হাত পাতত আমার কাছে নিশীথ। দিতাম কিছু কিছু। একদিন
বীকারও করল একটুআধটু মৌতাতী নেশা আছে ওর। বড় কষ্ট পাচ্ছে। নেশার খোরাক
ছুটেছে না।

ওকে প্রশ্ন দিয়েছি। শুধু একটি কৌতূহল চরিতার্থ করব এই আশায়। মানব
মনের এক গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন করব। মনে হল আজ সেই সুযোগ এসেছে।

প্রায় আধমরা হয়ে নিশীথ শুয়ে পড়েছিল আমাদের রকে। কোনদিন ওদের ঝগড়ায়
কোন পক্ষের সমর্থনে আমরা দাঁড়াইনি। আজও না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রোগা
মানুষটার সমস্ত মার ও আত্মসাৎ করেছে। এক ইঞ্চি নড়েনি। রান্নুর মা হাউ হাউ করে
কঁদতে কঁদতে ছাড়াতে এসে অর্ধউল্লসিত হয়ে ঘরে ছুটে পালিয়েছেন। রান্নু ঘর থেকে
বেরোয়নি।

সন্ধ্যার পরই মিলল সুযোগটা। কাণ্টা ঘটেছিল বিকেলের দিকে।

কানে কানে বললাম, কি হে চলবে ?

দাদা, আপনার ঋণ কখনও ভুলব না।

একটা রিক্সা ডেকে এক পঁয়াল্লীস হোটেলে চলে এসেছি আমরা। টিপ টিপ বৃষ্টি
পড়ছে। মেজাজ খারাপ করা বাদলা আবহাওয়া। কারণ সেবনের আমেজী দিন। ঢালা
অর্ডার দিলাম। এক নম্বর, তাও বড় বোতল।

আন্তে আন্তে মাসে চুমুক দিচ্ছিল ও। পঁয়াল্লীস কুচি দিয়ে এক ডিস শালাড্ তৃপ্তির
সঙ্গে মুখে পুরছিলাম। অল্প সময় হল এই কাঁচা পঁয়াল্লীস খাওয়া—রামঃ।

তুমি যে সববৎ খাচ্ছ হে ? আর কি নেবে ?

মাংস একটু—

শুধু মাংস না নিয়ে তড়কা নাও। পালক শাকের সঙ্গে-মাংসের ব্যাট, আর সঙ্গে
খিরের ফোড়ন। মুখে তার আসবে।

ও বাড় নাড়ল।

বয়—

অর্ডার দিয়ে লম্বা এক চুমুকে গলাটা ভিজিয়ে নিলাম। অল্প সময় হল শুধু সোডা-
ওয়াটার কতটুকু খাব ? চারটে বোতল পার করে দিলাম হুজনে। পেট না জালা।

তোমাকে ওরা কেমন করে খুঁজে বের করল ?

রান্নুর মাসীর বাড়ি আমার মামার হোটেলের পাশেই।

মেয়েটাকে তুমি দেখলে কেমন করে ? ও তো কারো সামনে বেরোয় না ?
হঠাৎ দেখেছিলাম।

পছন্দ হল ?

ওর চোখ দুটো দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল পুরুষ মানুষের চোখের
দিকে এই প্রথম ও তাকাল। নিশীথ মুচকি হাসতে লাগল। মাঝে মাঝে মুচকিহাসি উপচে
পড়ছে। নেশাটা জমতে শুরু হয়েছে।

তোমার সাহস আছে। রোগটা জেনেও—

একটু ভাবল ও, বলল, আমিও ভেবে দেখেছি। রোগটা আমাকে ধরতে আর কারু
করতে করতে বুড়ো হয়ে যাব। তখন কি এসে যায়। তাছাড়া রোগটা শুধু চেহারা
খারাপ করে, জালা যন্ত্রণা নেই।

সত্যি উদার। আর একটু নাও। জোর করে চেলে দিলাম ওর ঘাসে বেশ খানিকটা।

বয়স তড়কা দিয়ে গেল। ভূমির সঙ্গে খাচ্ছে ও।

ছেলেপুলের কথা ভাবনি ?

ও মুখ তুলল, ছেলেপুলের নাও হতে পারে। দেখেছি আমাদের পাড়ায়। স্বামীর
ধবল আছে, স্ত্রীর নেই। ছেলেপিলে দিব্যি সুস্থ। আর ধবল বছরকমের।

মাথাটা টলছে ওর। জমে গেছে নেশা। চোখে মুখে নেশায় তার মুচকি হাসিটা
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। হৃৎকেন্দ্রই। ভেতর থেকে ঠেলে আসছে উদাস হাসি। বোধ
করতে পারছি না।

আজকে এত মারল কেন ? তোমারও মুখে মুখে জবাব কাটা ভালো হয়নি।
হৃৎকেন্দ্র, তোমাকে সত্যি উনি ভালবাসেন।

হঁ।

রাগ করলে ?

একটা শব্দ ছিল ব্রিয়ের।

কি রকম ? সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

বেকার হলে হাত ধরচের টাকা দিতে হবে। নেশাখোর মানুষ, কত খাটব ?

হাসিতে চৌচির হল ও। পর্দার আড়ালে হৃৎকেন্দ্র বয়স মুখ বাড়িয়ে মুখ টিপে হেসে গেল।

এ-রকম রোজ দেখে তবু বোধ হয় নেশা কাটেনা ওদের।

আর আমার নেশা বুঝি ছুটে যায়। বলে উঠলাম : একটা অপদার্থ, কাপুরুষ, ভণ্ড,
স্বার্থপর...

কোথায় গুনব একটা অনবদ্য প্রেমের কাহিনী, না—

খোকা কি ঘুমিয়ে পড়লি ? খাবি আর। ওরা সব বসে আছে তোমার জন্যে—

আধতন্দ্রার মত এসেছিল, ধরকড়িয়ে উঠে বসলাম, রাহু এসেছিল ?

না।

অত করে বলে এলাম। খাবার পাঠিয়ে দিও।

তুই আমাকে শেখাবি! বড় একগুঁয়ে মেয়ে বাপু—কি বলিস? আর আর—

উঠে এলাম। আহা, রাগ করতে পারলাম না রাহুর উপর। ঘরে-বাইরে সে বিপর্যস্ত। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোর কবে যে দায়িত্ববোধ আসবে। অন্তরের স্তম্ভবোধ কবে দৃঢ় সঙ্গমে আবদ্ধ হবে সমাজবোধের সঙ্গে, কর্তব্য আর দায়িত্ব কবে ফুল হয়ে ফুটবে।

শেষ ব্যাচে একান্ত পরিচিত আমরা কজন বসেছি। মহা উৎসাহে পরিবেশন করছে নিশীথ। এতটুকু ক্লান্তি নেই। মা কত অনুরোধ করলেন, তুমিও বসে যাও, ক'জনমাত্র, দেওয়া ধোওয়া করছি আমি।

আমার কণ্ঠে ভাববেন না। গন্ধে গন্ধে খাওয়া আমার হয়ে গেছে। বসতে হয় নতুন জামাইয়ের সঙ্গে এক সঙ্গেই বসব।

ওমা, তার তো কখন খাওয়া হয়ে গেছে।

তার পেটের ধবর আমি জানি। চারদিক থেকে হেঁকে ধরলে বেচারী খায় কেমন করে।

বায়ুন ঠাকুরের পৈতে কোথায়?

পোলোয়ার সঙ্গে ঘেঁটে দিয়েছি।

তাই বুঝি পোলোয়া এমন সুস্বাদু—

মেয়েদের মধ্যে কলরব উঠল। খুশির আমেজে চুড়ির ঝিনঝিনি।

এতক্ষণ চোখ বুজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম নিশীথকে। এবার খোলা চোখে দেখতে থাকি। চেনা মানুষটাকে আজ বড় অচেনা লাগছে।

দাদা কিছু খাচ্ছেন না, আর একটু দই নিন, আর কিছু ভাগো না। লাগে দই খান, শরীর ঠিক থাকবে।

রাহু এল না কেন?

কি জানি।

বেশ খানিকক্ষণ দই দিয়ে পাশ কাটাল নিশীথ। পেছন থেকে দেখলাম ওকে। লম্বা ভোয়ালে দিয়ে কাপড়টাকে ঢেকেছে, তার ওপর আঁট করে বাঁধা একটা নতুন গামছা। এককালে স্বাস্থ্য শ্রী বেশ ছিল। জ্বরশই বড়ে যাচ্ছে। কেন? কোথায় ওর বেদনা? শুধু বেকারত্ব এর কারণ, না আর কিছু? কাজ জুটিয়ে দিতে রাহুর দাদা সিদ্ধহস্ত, সেই কাজ হেলার ছেড়ে দিতে নিশীথেরও জুড়ি মেলা ভার।

যে গল্প লাঙলে জুতবেনা, তাকে চাবকালেও শোধরাবে না। প্রথম প্রথম আকসোস গোঁজে উঠত রাহুর দাদার, ধবল রোগের মতন এখন অসাড় হয়ে গেছে সব।

ভাবলাম রাহুকে ডেকে আনব কিনা। নিশীথকে জানতে হলে রাহুর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করা দরকার। বেজার নিজের দাদার সামনেও সে বেরোয় না। একটি পুরুষের

কাছে নিজেকে উন্মোচিত করেছে সে। স্বর্ষের কাছে। কৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধিকার আত্মসমর্পনের মত। শুনেছি বি, এ, অবধি পড়েছে নিশীথ। বাড়িতে পড়াশুনা করে রান্না। এ বিষয়ে জীকে সাহায্য করতে অক্লান্ত কর্মী। এই একটি গুণ গুণ, রান্নার দাদাও স্বীকার করেছে।

কিন্তু উপায় করতে হবে তো? জীর আঁচল ধরে বসে থাকলে চলবে—বেগাড়া বজাত। প্রশংসায় রান্নার দাদার বাঁ চোখ নাচে, গালিগালাজে ডান চোখটা মশাল হয়ে জলে।

লক্ষ কথার বিয়ে। লক্ষ কথা যেখানে, সেখানে কোন কথাই মনে থাকে না। লক্ষ কথাই গোজামিলের চিকচিকে বালি। সেই বালি যখন ক্ষুর হয়ে কাটতে বসে তখনই বিপদ। বিয়ের শর্তের কথা ভুলে গিয়ে, কি বিয়ের শর্তের কথাই মনে করে বার বার নিশীথের কাছ জুটিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন রান্নার দাদা। স্মৃতরাং গালাগাল এবং প্রহারে তার অধিকার আছে।

রান্নার চুপচাপ থাকা থেকে মনে হয় এ-অধিকার মেনে নিতে সে রাজী নয়। কেন রাজা নয় সেটা জানতে হবে। সেটুকু জানতে পারলে নিশীথকে জানতে পারব।

নিশীথের এই কাজের পুরস্কার দেওয়া উচিত। এত বড় কাজের বড় ছই বলিষ্ঠ বাহুতে ক্লান্ত তো। রান্নার সঙ্গে আলাপ না হলে কেমন করে এগুবে এ কাজে। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠি। অদম্য উল্লাসের উপর হঠাৎ একটি পোকা বসল। তার ছোট পাখনার ভেঁ। ভেঁ। অসহ। কাজটা এখনি মিটিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি। ঋণের শেষ রাখতে নেই।

শুধু তাই নয়, মানবমনের এক গূঢ় বহুস্তরের উদ্ঘাটনে আমি সফলকাম হতে চাই। আমি মনস্তাত্ত্বিক নই, শুকনো বিচার বিশ্লেষণে তত্ত্বোদ্ঘাটনে ক্রটি নেই। আমি লেখক, রসের পথেই সত্যকে দেখতে চাই।

বিয়ের হাদ্যমা মিটল। তাক মত রান্নার সঙ্গে আলাপ করা আর হল না। অস্থির হয়ে উঠি।

সরমা স্বপ্নের বাড়ি। পারের শেকল কেটেছে। এবার বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করব। আর ভয় কী, আইবুড়ো ভারী বয়সী মেয়েকে নিয়ে ট্যাঙ্কস ট্যাঙ্কস করে ঘুরে বেড়াতে হবে না আর। শুয়ে বসে বেড়িয়ে ছদও বাঁচব। তের বছর বয়সে সংসারে ঘানিটানা শুরু করেছি, এবার মুক্তি দে : মা না-ছোড় : দেখ, হঠাৎ যদি ক্ষুর যাই, তোমার আকসোসের সীমা থাকবে না। পূর্ণ হতে পারব না এ জীবনে, পূর্ণের পথে পা বাড়াতে দে।

কোন গুণের আপত্তি টিকল না। চলে এলাম কাশী।

কাশীর কানাপলি আর ভগবতী গঙ্গা, বেগুপাটি, আর বাবা বিশ্বনাথ, হাটবাজারের কিচিরমিচির আর সাধুসন্ন্যাসীদের গুঁকারনাদ। অপক্লান্ত অস্থির।

তিনটে মাস দম দেওয়া লাটুর মত কেটে গেল। ফেরবার দু'দিন আগে রান্নার চিঠি : জ্যেষ্ঠিমা, বড় বিপদ আমার। গুঁর বাড়াবাড়ি অনুরূপ। কিছু সাহায্য যদি করেন, যেন দাদা

জানতে না পারেন। বড় গোড়া তিনি। এককালে ভিক্ষায়ে ব্রাহ্মণের দিন কাটত। কিন্তু ভিক্ষার পাত্র বাড়তে দাদা নারাজ, বিপদেও তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ।...

অবাক চিঠি। গোটা গোটা অক্ষরগুলো হিমালয়ের ধবল রেখার মত স্ফটিকিত কারুকাজ।

মা বললেন, তোকে লিখতে পারত, আমাকে—

মনে মনে বললাম, আমাকে লিখবে কেন। তার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ নেই, দ্বিতীয় পুরুষের কাছে প্রার্থী হয়ে দাড়াবে এমন মেয়ে নয়। এখানে তার দাদার জীবননিষ্ঠা নিষ্ঠাই নয়।

তবু মনটা প্রকুল হয়ে উঠল। সেই পরমাশ্রুতিকে এবার দেখব।

কিবে এসে মা ডেকে নিরে এসেন। কিছুতেই আসবে না আমার কাছে।

মা বললেন, মেয়ের আমার চোখ ছলছল করছে।

প্রশান্ত হেসে বললাম, দাদার কাছে বোনের লজ্জা করতে নেই।

কথাটা নিজের কানেই কেমন বিজী লাগল। সারা মন আমার ময়ূরের পেখমের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সেই রাহু! আঃ! হে ঈশ্বর!!

আমি বাই দাদা।—গানের মত কণ্ঠ।

টাকাটা দিলাম হাতে মুছ হেসে।

চমকে ও চোখ তুলল, এত টাকা লাগবে না।

রাখো। চিকিৎসার পরে পথি আছে।

কিন্তু এত টাকা কেমন করে শোধ করব।

আগে ও সেরে উঠুক, তারপর শুনব তোমার কথা—স্নেহের সঙ্গে শাসনের স্বর মিলিয়ে দিই।

রাহু হাসল, একটু খেয়েবলল, এখন থেকেই বলছে, বেঁচে উঠলে আবার কাজের চেষ্টা করতে হবে তো।

আচ্ছা, কাজকে এত ভয় করে কেন নিশীথ?

অনেকশয় চুপ করে রইল রাহু। বেদনার ভারী চোখের পাতা। স্বাধীনতা শুনে হবে আশা করেনি।

বাইরে থেকে তাই মনে হয় দাদা। কী কাজ না উনি করেছেন: কেরানীগিরি, হকারী, দালালী, মোটর মিস্ত্রী, রিক্সাটানা, শেষে এই বিড়ি বাধা—কিছুই বাদ যায়নি।

বড় অস্থিরচিত্ত।—আমার স্নেহের চোখে সহানুভূতির পোকা উড়ে এল।

মা—রাহুর চোখ করকরে।

গলার আঙুরাও চমকে ওঠার মতন। ধতমত খেয়ে গেলাম। হঠাৎ কথা জোপাল মা মুখে।

মামার হোটেল দেখাশুনা করত শুনেছি—

হ্যাঁ। ভাগ্যের ওপর সুবিচার করেনি মামা। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্তি বারটা পর্যন্ত অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেও মন পায়নি। ছুটে বেরিয়ে গেছে অল্প কাজে, থাকে খেয়ে আবার ফিরে এসে লাগি কাঁটা খেয়েছে। এমনি বারবার ঘটেছে।

হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলাম, ও তো নেশাও করে।

করে।—রাস্তার অবিচলিত কণ্ঠ,—একটা কাজ ধরে যখন হতাশার ভেঙ্গে পড়ে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারে না। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না তখন। ওর লাল টকটকে চোখ দেখেই বুঝতে পারি—

সেই অধৈর্য আর অস্থিরতা এর মূল কারণ।

না। ও চায় এমন কাজ—কি করে বোঝাব আপনাকে—কোনো কাজে নেমে দিম কয়েক যেতেই ওর মনে হয় কে যেন ওর টুঁটি চেপে ধরে আছে, কিছুতেই মুক্তি নেই, তখন আর এক কাজ। ও কাজ চায়, কাজের আনন্দ, মুক্তি, নিটোল শান্তি। ও বলে, আমার জীবনের পূর্ণ কী ওরই বাহ্যিক কাজ করি।

বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রাস্তা। তার মুঠির মধ্যে মোটগুলো ভিজেভিজে।

একটু চুপচাপ।

বাই দাদা। উনি একা।

উত্তরের অপেক্ষা না করে রাস্তা চলে গেল।

নিরৈক পীড়াদায়ক এক শুকতা। বাইরে কাঁকা রোদ।

খোলা জানলা দিয়ে একটা মোমো ছুঁকল ধরে। ভেঁ ভেঁ ভেঁ। কি খেয়াল হল বন্ধ করে দিলাম জানলা। ঘর অন্ধকার আর গাঝে ঘরে এক যন্ত্রণাকাতর আর্দ্রনাদ : এখানে মধু নেই, নেই ফুল, নেই মুক্তি।

খুলে দিলাম জানলা। দেয়ালে মাথা কুঁটে কুঁটে বেরিয়ে গেল মোমোছটা।

আবার শুকতা।

জানি না মনের মতন কাজ নিশীথ পাবে কিনা, কে জানে কবে শেষ হবে : তার এই অবেশণ। এ যেন পরশ পাখির খুঁজে বেড়ানো। হঠাৎ দপ করে উঠল মনের মধ্যে : বিয়ের একটা শর্ত আছে। হাত ধরচের টাকা দিতে হবে বেকার হলে।

জীবন থেকে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টার ভয়াবহ হতাশাও তাকে আশ্রয় করে বেড়াতে হবে। হায়রে মুক্তি।

মনটা বিষম বেদনাক্রুর হয়ে গইল।

আজ রাতে শিশিরকুমার দাশ

আজ শুধু ক্ষমা করো, আজ তুমি নির্বাসন দাও ।
 আজ শুধু অন্ধকারে বন্ধ হয়ে থাক ! ব্যর্থ আমি,
 ক্লান্ত আমি, জীবনের সবযুদ্ধে পরাজিত আজ ।
 বিজ্ঞপের রুঢ় হস্ত ; বক্ষময় নির্মম চাবুক—
 আজ শুধু ক্ষমা করো ; মিথ্যা অভিনয়ে আজ আমি
 প্রবঞ্চিত করিনা নিজেকে । আজ রাতে কৃষ্ণপক্ষে
 মৃত্যুর শ্মশানে এসে যুদ্ধ হবে—আজ রাতে
 বাহু শুধু পেষণে পেষণে হত্যা দেবে, চক্ষু শুধু
 দৃশ্য দেবে, পদযুগ্ম দলে যাবে শত্রু সেনানীকে—
 বাহু আজ আলিঙ্গনে দেবেনা নিভৃত স্পর্শ, চক্ষু
 আজ ছড়াবেনা নীলিম অঙ্গন, ক্ষমা করো আজ
 আজ রাতে প্রেম নয় ; আজ তুমি নির্বাসন দাও ।

আজ নয়, আজ নয় ; তোমার প্রতীক্ষা হবে কাল ।
 আজ শুধু কাল শুনি বিকৃত শিশুর ; মাঠে মাঠে
 কাল তারা হাসির পাখিকে ছেড়ে দেবে ; আজ শুধু
 রুদ্ধ মাঠ-কুমারীর অসহ যন্ত্রণা ; কাল ভোরে
 অজস্র শব্দের গর্বে নত স্তন হবে ; আজ শুধু
 বিকারের গলিত প্রলাপ ; প্রেমহীন অভিনয়,
 আজ শুধু জ্যোতিহীন ধূমাক্ত কালি ; কালরাতে
 এ আকাশে বাণীময় গান আর বেহুলার প্রেম
 অদ্বিতীয় দীপ্ত পুত্রে আকীর্ণআকাশভরা প্রাণ ।

আজ রাতে তুমি শুধু শরীরিণী, শুধু দেহী আজ
 আমি শুধু ধরিত্রীর জীবমাত্র ; আজ ক্ষমা করো
 আজ শুধু নির্বাসন দাও ; তোমার প্রতীক্ষা কাল ;
 কাল রাতে তুমি উমা, তুমি রাধা, বিদেহী গাঙ্গারী
 আশীর্বাদপূত আমি কাল রাতে অমৃত সন্তান—
 আজ শুধু ক্ষমা করো ; আজ তুমি নির্বাসন দাও
 আজ রাতে প্রেম নয় ; আজ আমি প্রেমের সৈনিক ॥

ফকু

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার বাইরে এক শিশুর জগৎ
বিশ্বয়-বিভ্রমে যার দিন মন্দ নয়,
কলেজের করিডর আছে চিত্রবৎ
ছায়া ফেলে মনে মনে সময় সময়;

কল্পের মতন তার অন্তর্ঘর্ষী প্রবাহের জলে
তোমার উতল ভাষা করেছে নোঙর—
শান্তিসহচর তীরে হাওয়া বয়, যুহুতে প্রবলে
বিমিশ্র সূর্যের রশ্মি জালে বিপ্রহর !

এখানে বসতি বাড়ি শাদা শাদা ঘর,
নগরের ক্ল্যাট হল ক্ষুদ্র হাসপাতাল—
হাজার বছরে যেন রুগ্ন, তীক্ষ্ণ সব কণ্ঠস্বর
হলুদ নোনার দাগে পরিহৃত আশ্চর্য আকাল ;
এরই মধ্যে তুমি আছে তাই আছে আমি
অলৌকিক স্বপ্নের বন্ধে হইনি বেনামী ।

[হান বংশের রাজত্বের শেষে এবং টাং বংশের রাজ্যগঠনের অন্তর্বর্তী সময়ে অর্থাৎ ২২০—৬১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে জনগণের দুঃখের শেষ ছিলনা। তখন উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হত। এবং সাধারণ মানুষ গার্হস্থ্য-জীবন ত্যাগ করে' সৈনিক হয়ে যুদ্ধের খোরাক যোগাত। অথচ সাধারণ মানুষ শান্তির জন্য কী ব্যাকুলই না ছিল। দেড় হাজার বছর আগে লেখা এ-কবিতাটিতে যুদ্ধের পটভূমিকায় এক চীনা-দম্পতীর গভীর দুঃখ ভাষা পেয়েছে। অনুবাদক।]

দক্ষিণ-যাত্রা

চাই কুও (২২০—৬১৭ খৃঃ)

দক্ষিণগামী নিঃসঙ্গ এক উড়ন্ত বিহংগের দিকে চেয়ে চেয়ে
স্বামীকে স্মরণ করে' কেঁদে ফেলল স্ত্রী।
বুনো রাজহংসীর শেষ-দক্ষিণী আবাসভূমি থেকে
আরো দক্ষিণে স্বামী গেছেন উধাও হয়ে।
ওদিকে দক্ষিণ দেশের সেই তিস্ত পথে
হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণায় যন্ত্রণায়
স্বামীও স্মরণ করছে স্ত্রীকে একুনি।

ভুষারঙ্গ কনকনে বাতাসে
নিজের একমাত্র হালুকা পোশাকের কথা ভুলে গিয়ে
বধু রইল দাঁড়িয়ে আনমনা হয়ে।
আর মেঘের এক ফাঁকে চাঁদ পড়ল ঠিকরে
সমস্ত আলো নিয়ে বধুর উপর।
আহা, রাতের পর রাত সে খুঁজছে স্বামীকে
এবং বছরের পর বছর
মিলনের সে-বাসনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

“আমি বাক্সের ভেতর রাখব একটি আয়না,”
সে বললে, “পাঠিয়ে দেব সেটিকে তাঁর কাছে ;
তাঁর নিজের পাকা চুল দেখে’ বুঝবেন তখন
আমার কাছে ফিরে আসার লগ্ন কবে কেটে গেছে।”

ওদিকে বর তখন ঘরে ফেরার বাসনায়
রাতের পর রাত, দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে
যন্ত্রণায় পা চালাবেন। তখন অশ্রুতে নামবে ঢল
যখনই মনে পড়বে দূর চাং-আনের স্মৃতি।

অনুবাদক—রামেন্দ্র দেশমুখ্য

ভাষা-বিচার

অনাদি মণ্ডল

“এক্ষণে বাংলাভাষার সমালোচকরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁচী সংস্কৃতবাদী। যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের ব্যবহার হয়, তাহা তাহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, যে ভাষা বাংলাসমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাংলার নিত্য কার্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাকালীতে বুঝে তাহাই বাংলাভাষা—তাহাই গ্রন্থাদিতে ব্যবহারের যোগ্য।”

কিঞ্চিদূর একশত বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ভাবগতি পর্যবেক্ষণ করে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সে দিনগুলো বাংলাসাহিত্যের প্রসূর যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে। কিন্তু কিম্বাচর্যমতঃপরম্! সে যুগের কথাগুলো আজকে একেবারে আধুনিক আধুনিক ঠেকেছে। সমান হৃদয় ও সংশয়ে বাংলাসাহিত্যের প্রখ্যাতনামা সমালোচকগণ বিধাবিভক্ত। ‘ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে’—প্রবাদটি দেখছি নেহাৎ বাজে নয়।

বাংলার জটনৈক নামজাদা সমালোচক দেহাতীভাষা, বস্তির ভাষা, এবং রকের ভাষা—যারা এতাবৎকাল সাহিত্যে শূদ্রের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছিল, তাদের গলায় পৈতে পরিয়ে ব্রাহ্মণ করে নেওয়ার জন্যে সম্প্রতি খুব জোর এক শওয়াল করেছেন। অপরপক্ষও কম যান না। তাঁরা ছেড়েছেন নিম্নলিখিত দুই তীক্ষ্ণ যুক্তিশর :

(১) রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পূর্বসূরীদের চেষ্ঠায় ও কৃপায় বাংলাভাষা মার্জিত, সংস্কৃত ও কমনীয় হয়েছে ; এইটাই কাম্য ও সত্যতার অগ্রগতির স্মারক বিশেষ। বর্তমানে উন্টোপথে যাওয়ার অর্থ বাড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়া।

(২) লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার পার্থক্য ছিল, থাকবেও। মানুষের মুখের কথাকে কলমের মুখে ছবছ রূপ দিতে গেলে সাহিত্যে নৈরাজ্য অবশ্যস্তাবী।

কথাগুলো তলিয়ে ভাবা দরকার। বাদীপক্ষের যুক্তি থেকেই শুরু করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনায় বাংলাভাষা এক প্রশংসনীয় আভিজাত্য অর্জন করেছে, একথা সত্য। কিন্তু ভাষার ঐ বিশেষ শালীনতা যে অশুভন ও আগামী বহুবিপুল কালের জন্যে চরম এবং পরম কথা—তা জোর করে কি বলা যায়? সাহিত্য জীবনের চিত্রায়ণ নয়, কিন্তু শিল্পায়ণ তো অবশ্যই। আর সেই বৈচিত্র্যমণ্ডিত জীবনকে অবলম্বন করে গল্প-উপন্যাস রচনা করতে গেলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কথ্যভাষা ছায়াপাত করবে—যে কথ্যভাষা যেমন মার্জিত তেমনি অমার্জিতও। চরিত্র ও পরিবেশ স্রুটনের জন্যে এই

বিপরীতধর্মী উভয়প্রকার ভাষার সহায়তা লেখকরা নেবেন, শিল্পসৃষ্টির পবিত্র কারণে। বস্তুর চরিত্র বা জীবনকে নিয়ে সেখা গল্প বা উপন্যাসে যদি দেখা যায় নায়ক-নায়িকারা অবলীলাক্রমে মার্জিতভাষায় কথোপকথন করছে, প্রেম নিবেদন করছে উচ্চ মধ্যবিত্তিক রুচিসহকারে—তাহলে যা সর্বাধিক ফোর্টে ও প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে, লেখকের শিল্পচেতনার আত্যস্তিক দৈন্ত। (বাংলার তথাকথিত বস্তুবাদী সাহিত্যে এবংবিধ ছুঃস্থতা প্রকট।) সাহিত্যের একজন পাঠক হিসেবে এখানে আমাকে এও স্বীকার করতে হবে যে বাংলা ভাষায় এই ‘সর্বব্যাপী মার্জিতরুচির’ সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন ভাষা, এমন কোন সাহিত্য নেই। কুপরিন বারবনিতাসুলভ অমার্জিত কথাবার্তা, অগ্নীল রসালোপ যথাযথ পরিবেশন করেছেন ‘ইয়ামা দি পিট’-এ। ‘হাঙ্গার,’ ‘এণ্ড কোয়ার্টেট ফ্লোজ দি ডন’ ইত্যাদিতেও দেখি সমান রুচ বাস্তব—ভাবে ও ভাষায়। রক্ষণশীল মম সাহেবও খিস্তি করেছেন ‘মুন এণ্ড সিক্স পেনস’-এ, ফরাসী ভাষার ঘোমটা টেনে দিয়ে। এই উপন্যাসগুলির সব কয়টিই বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসন দখল করে আছে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে একনম্বর উচ্ছৃঙ্খল খাতালও সংঘত কাব্যিকানার কথা নয়! প্রসঙ্গটা স্নীল-অস্নীল সমস্তার কানঘেঁষে যাচ্ছে বলে বলছি—যা অস্বাভাবিক, তাই অস্নীল। (কথাটা আমার নয়—ডি. এচ. লরেন্সের।) যা অস্বাভাবিক তা অনুন্দর—তাই অস্নীল। কোন রসিকজন উল্লস শিশু মূর্তিকে অস্নীল বলবেন না।

মার্জিতরুচির সাথে সাথে কমনীয়তার কথা উঠেছে; রবীন্দ্র-বঙ্কিম-শরৎ ভাষায় কমনীয়তা এনেছেন। কিন্তু প্রশ্ন না করে পারি না, এদের সাহিত্যের কমনীয়তা কি শুধু ভাষায়, না বিষয়বস্তুতে—অথবা উভয়তই? আমার মনে হয় ভাষারূপ বাহিরবরণকে কমনীয়তার নিরিখ করলে স্যুটপরা মানুষকে ইউরোপীয়ান মনে করার মত লাভি করা হয়। আসল মানদণ্ড হোল বিষয়বস্তু, বস্তুব্যবিসয় এবং সেই তত্ত্ব যা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-এর ভাষা ও ভাষা রসস্বিচ্ছ মননশীলতা এবং জীবনদর্শনের সুপল প্রয়োগে ‘সাবলিমিটির’ উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেছে। কিন্তু সাহিত্যের এই দিকপালগণ ছিন্নভিন্ন বস্তিজীবন বা ভবঘুরেদের অবলম্বন করে সার্বক উপন্যাস লিখলে (বলা বাহুল্য, একটাও লেখেননি এবং কারণটা বোধকরি তৎকালীন অপেক্ষাকৃত সুস্থসংঘত সমাজজীবনের মধ্যে খুঁজতে হবে) বাচনে ও বাগভঞ্জিতে অমার্জিত ভাষার ব্যবহার একান্ত এড়াতে পারতেন না, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। যে সমাজ বা যে গোষ্ঠীর আলেখ্য তাঁরা উদঘাটন করেছেন তাতে কমনীয় ভাষাকে মাধ্যম করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অপরপক্ষে ইদানীংকালের পল্লীজীবন ধ্বংসে যাচ্ছে; যন্ত্রদানবের সর্বাঙ্গক দাপটে সৃষ্টি হচ্ছে নবতম বর্ণাশ্রম; হুয়াশা, ক্লেশ ও হতাশার পাশাপাশি নৃত্য মহাজীবনের উচ্ছল স্বপ্ন দেখছে মানুষ। তাই সংগত কারণে লেখকরা পাপ দেখে পাপীকে ঘৃণা করেন না; সমস্ত পাপীকেও পাংক্তের করেন সাহিত্যবাসরে। ফলে ‘পাপী’জনের গহিত আচরণ, অকমনীয় ভাষাও সাহিত্যে এসে পড়ে। এই বিরোধটি অস্ত্র দৃষ্টিকোণ

থেকেও বিচার করলে কমনীয়ভাষার আন্দোলনকারীদের ফাঁকিটি ধরা পড়ে। এঁরা কমনীয় ভাষার মসলিন-পর্যায় অসুস্থ চিত্তবিকৃতি, অলস তারপ্যাকেও—যার ভূরি ভূরি উদাহরণ মিলবে মিষ্টি লেখকদের লেখায়—আপত্তি করেন না, কিন্তু যোল আনা রাগ বস্তি-র ক্রন্দ ও রুচ্যভাষণের উপর, যদি তা সত্য ও স্বতোৎসারিত হয় তবুও। সাহিত্যের এ রসবিচার মেনে নিতে বাধে।

শেষনাদ-বধের কবি মধুসূদন সেই বিপতযুগে নিতান্ত প্রয়োজনে ভাষায় এমন এক কুলিশকঠিন রূপ দেন যা দেখে বিশ্বমহল বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছুরুহ ছুপ্রাপ্য ও অপ্রচলিত সংস্কৃত পদের সঙ্গে সুচারুরূপে সংবদ্ধ করলেন ‘ঘটঘটি’ ‘মড়মড়ি’ জাতীয় কথোপকথনের ভাষা—যা সাহিত্যের আসরে একান্তভাবে অচুৎ। ইতিহাস বলে, সেদিনের সমালোচক দলও কিরিন্দীকবির হুঃসাহসে অস্বস্তি-বোধ করেছিলেন মাত্র কিন্তু কাব্যগুণকে অস্বীকার করার মত অমার্জনীয় স্পর্ধা করতে পারেননি।

কথ্যভাষা, রকের ভাষা, বস্তি-র ভাষা কি সর্বাংশে অস্বীল? আমার মনে হয় সকলেই উত্তরে নতুর্ধক শব্দটি উচ্চারণ করবেন; সর্বাংশে অস্বীল নয়। তা যদি হয়, আপত্তি কেন সে ভাষায়? উদাহরণ স্বরূপ ‘চারশো বিশ’ অথবা কোর টোয়েন্টি’ কথাটি আদি ও অকৃত্রিম রকের ভাষা। আজকাল তো দিকি সে সাহিত্যে মৌরসী পাট্টা করে নিয়েছে। তাছাড়া রক ও বস্তিতে চলিত এমন অনেক আটপৌরে কথাবার্তা ও কথামাত্রা আছে যারা ব্যঞ্জন ও রসগুণে পোশাকী ভাষাকেও হার মানায়। (পরশুরাম, শিবরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মুক্তবা আলির কিছু কিছু উচ্চারণ প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয়) সে সব রসসমৃদ্ধ উক্তি ‘রক-জ’ বলেই অচুৎ করা আর নীচবংশোদ্ভূত মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার না করা একই কথা।

তাছাড়া ভাষা ব্যবহারের কৃতিত্বের উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। কিছুদিন পূর্বে ত্রিযুক্ত প্রভাত দেব সরকার ‘দেশ’ এ প্রকাশিত এক গল্পে ‘ও খেতে পারিস না’ পদটি ব্যবহার করেছেন। (অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্রও একটি নাটিকায় এবংবিধ পদ ব্যবহার করেছেন বলে মনে পড়ছে) কথাটি আপাতচক্ষে শ্রীলতা বিরোধী হলেও ব্যবহারের গুণে লেখকের শিল্পীমানার কৃতিত্ব প্রমাণ করে। আমার মনে হয়েছিল ঠিক ঐ জায়গায় ‘ও খেতে পারিস না’ বাক্যংশটি ব্যবহার না করাই হোত সাহিত্যিক অস্বীলতা।

লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষার সত্যিই কী কোন ‘বর্ডার লাইন’ আছে? আমার মনে হয় নেই। আরও দেখি, সর্বযুগের সর্বকালের শিল্পীসাহিত্যিকরা সে লাইন, সে গভী দরকার মত ডিঙ্গিয়ে পার হয়েছেন—প্রহরী সমালোচকদের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে। তাই পরম বক্ষণশীল বক্ষিমচন্দ্রও বলেন :

“বলিবার কথাগুলি পরিশ্রুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জ্ব ইংরাজী, কাসি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বস্ত যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অস্বীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।”

ভাষা-বিচারের ব্যাপারে এর থেকে উত্তম কোন পরামর্শ আছে বলে আমার জানা নেই।

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

নীল-ভূ-ইয়া—অমিয়ভূষণ মজুমদার। প্রকাশক—নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩। দাম—৫/-

সাহিত্যের ইতিহাস বয়সের তোয়াক্কা রাখে না। নবীন লেখকের সাফল্যকে যেমন সে পূর্যম উৎসাহে স্বীকার করে নেয়, প্রবীণ লেখকের ব্যর্থতাকেও তেমনি কালের প্রলেপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অমিয়ভূষণ মজুমদার নবীন লেখক এবং নীল-ভূ-ইয়া তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। উপরোক্ত কথাটি এ-লেখক এবং এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি-না তা, আশা করছি, বাঙলাদেশের বিদগ্ধ পাঠকসাধারণ ইতিমধ্যেই অশুধাবন করতে শুরু করেছেন।

যে-কটি বিশেষ কারণে 'নীল ভূ-ইয়া' উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী। সময়ের দিক থেকে লেখক তাঁর পটভূমিকে যদিও শ'ছয়েক বৎসর পিছিয়ে নিয়েছেন তবুও পাঠকের একথা মনে করে আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, যেহেতু ঘটনাকালের অদূরতবিস্ময় লেখকের নথ্যদর্পণে, সেহেতু ঘটনাক্রমকে যদৃচ্ছ ব্যবহার করেছেন তিনি। বরং পাঠক আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করবেন, সে-সুযোগ পুরোমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও তিনি সচেতনভাবেই তাকে এড়িয়ে গেছেন। পরিশ্রেক্ষিতে বিগত অতীত আত্মগোপন করে থাকলেও, সে-অতীতের চারিত্র্যনির্দেশ করতে লেখক ইতিহাসের পাতা সাজিয়ে রাখেননি। সে-অতীত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে হরদয়ালের তৎকালীন সমাজচেতনায়, রানীমার ঐতিহ্য-পরায়ণতায়, পিয়েত্রোর অস্তোমুখ তেজস্বিতায়। আধুনিকতার প্রলেপ সমস্ত গ্রন্থটিকে স্তম্ভ করে রাখলেও, বিচক্ষণ সমালোচকের চোখ এড়াবে না যে, ইতিহাসচেতনা প্রাঞ্জল না হলে কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয় বিগত অতীতের বিভিন্ন চরিত্রকে এমন স্পষ্ট করে তুলে ধরা। বলা বাহুল্য, লেখকের আন্তরিক সংস্কৃতিগত ইতিহাস-পার্টই তাঁকে সাহায্য করেছে এ-ক্ষেত্রে, কিন্তু তাঁর বাহাহুরী এইখানে যে সে-ইতিহাস পাঠককে বিভ্রত করে তোলে না।

এ-সঙ্গে অমিয়ভূষণের মননধর্মটিও প্রাধান্যযোগ্য। নিতাস্তই কয়েকটি ইঙ্গিতের সাহায্যে এমন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা যে সম্ভব এ-কথা আমরা, প্রচলিত ধারার অভ্যস্ত পাঠকরা, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হরদয়াল আধুনিকতার ধারাবাহী, কিন্তু তাঁর এ-পরিচয় পূর্ণতা পেলে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতায়, পিয়েত্রোর সহজ সরল জীবনযাত্রার অন্তরালে যে-বহি প্রোক্ষল মাত্র কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত কাহিনীতে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও

তাই হাতে তৈরী বুজরুক আলী তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। বানীমা প্রায় অল্পবয়স্ক থেকেও সর্বদাই প্রকাশমান। বাগচীমাষ্টার আর কেট চরিত্রের স্পষ্টতা নিয়েও ইতিহাসের প্রতীক। কেবলমাত্র রাজচন্দ্রকেই যেন আমরা চিনি—প্রচলিত বাংলা উপন্যাসের নায়ক সে।

কিন্তু এ-সমস্ত মেনে নিলেও নয়নতারা আমাদের চোখে একটি আশ্চর্য চমক। যারা একদিন শব্দচক্রের কমলকেও ঢোক গিলে সহ করে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ-কেউ হয়তো নয়নতারাকে স্বীকার করতে রাজী হবেন না। তবু বলবো, নয়নতারা অবাস্তব নয়। বরং ভাবতে ভালো লাগছে যে, অমিয়ভূষণ ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যকে রূপায়িত করতে সকল হয়েছেন নয়নতারার মধ্যে। এ-মেরেটি কোনো বিদেশী পাঠকের কাছে বাঁধা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত নাটক পাঠে আবহমানকালের অভ্যস্ত আমরা, আমাদের কাছে তো তার পরিচয়ে ভুল হওয়ার কারণ নেই। সাহিত্যবিচারের রীতি মেনে বলতে বাধা কি যে, নয়নতারাই আদর্শ নায়িকা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যবিচারের যে-রীতি মৃত আত্ম তাকে নতুন করে উদ্ধার করার প্রয়োজন কি, আর তা-ই যদি কেউ করে তা হলে ছকে-কাটা সে-নায়িকা অবশ্যই ব্যর্থ-চরিত্র। কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তরে সমালোচককে মনে রাখতে বলবো ঘটনার কালানুযায়ী পরিপ্রেক্ষিত এবং নয়নতারা চরিত্রকাঠামো তৈরীর পটভূমিকে। সে শুধুই যে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ভগ্নী তাই নয়, উপরন্তু সে নিজেও সে-সাহিত্যের সত্যিকারের রসগ্রাহী। অধিকন্তু এমন একটা কালে তার বাস যে-কাল প্রথম বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমার আঘাতে শতচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নয়, এমন কি সিপাহীবিদ্রোহের স্বপ্নও যখন কারো চোখে জালা ধরিয়ে দেয়নি। সামাজিক যে-বিবর্তন তখন সূচিত হচ্ছে দিকে দিকে তা প্রধানত শহরকেন্দ্রিক, আর বাও-বা গ্রামে গিয়ে পৌঁচেছে সে ঢেউ, তা এতই অপ্রত্যাশ্য যে, তাকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা সাধারণ প্রজার পক্ষে প্রায়, অসম্ভব। এ অবস্থায় নয়নতারা নারীমাত্র। নিরুত্তেজ জীবনে তার সম্বল শুধু সংস্কৃত সাহিত্যপাঠে আন্তরিক আগ্রহ। এ-আবেগ যদি সত্যি হয়, তবে এমনটা মেনে নেওয়া কি অস্বাভাবিক যে, সে-সাহিত্য তার অবচেতন মনে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে তার চরিত্রকেই তৈরী করে তুলেছে এই নায়িকারূপে? নয়নতারার চরিত্রবিশ্লেষণে এ-যুক্তিকে অগ্রাহ্য বলে মনে না করলে, তাকে বাস্তব বলতে বাধা থাকে না।

তবু পাঠকমনে কিছু আকসোস থেকেই যায়। পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে এ-উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁতভাবে গড়ে উঠলেও, সময়ের আবহাওয়ার লালিত গ্রামজীবনকে আমরা খুঁজে পাই না। প্রধান চরিত্রকটি তো গ্রামীণ এ্যারিস্টোক্র্যাট, এরা ছাড়া আর যারা আছে এখানে-সেখানে তাদেরও চলা-বলা প্রয়োজনের শেকলে বাঁধা। গোবর্ধন, চরণদাস কিম্বা সদর-নায়েব—এঁরা গ্রামের সাধারণজন নয়। সমস্ত গ্রামের চরিত্র এদের মাধ্যমে ফুটে ওঠার অবসর পায়নি, কারণ এরা সময় সম্বন্ধে সচেতন, সময়ের পরিবর্তনকে তারা লক্ষ্য করে চলে। গোবর্ধন তো উপসংহারে নায়কদের আংশিক দাবীদারই হয়ে ওঠে। বনজুর্গা যেন ওকেলিয়া-জাতীয় একটি করুণ মধুর ছবি। তাকে

অসুভব করা যায়, ধরে রাখা যায় না। এমন কি রূপচাঁদও এ-গ্রন্থে পুরোপুরিভাবে প্রয়োজনের অংশভাগ, জমিদার বাড়ির সঙ্গে তার পরিচিতি ওতপ্রোত, সে-জমিদার বাড়ি সমাজের কেন্দ্র হলেও সে নিজে একটি সমাজ নয়—গ্রামের প্রতিভূ তো নয়ই।

অথচ এ সামান্য ক্রটিকেও লেখক ছাপিয়ে গেছেন তাঁর চমৎকার সিনিকৌশলে। বস্তুত অমিয়ভূষণের কলাকৌশল এক অভিনব পন্থায় এগিয়ে গেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনতিদূর অতীতের পটভূমিকে আশ্রয় করে আরও কয়েকটি উপক্ৰাস রচিত হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে তাদের মধ্যে—উল্লেখযোগ্য বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোস্বামি’ আর প্রাণতোষ ঘটকের ‘আকাশ-পাতাল।’ কিন্তু অমিয়ভূষণের সঙ্গে এ-দৃজন লেখকের বিশেষ পার্থক্য এইখানে যে এঁরা দুজনই মুখ্যত কাহিনীকার আর অমিয়ভূষণ কাহিনীকার হলেও উপক্ৰাস-রচনায় মননশীলতার প্রয়োজনে বিশ্বাসী। তার মানে এই নয় যে, বিমল মিত্র কিংবা প্রাণতোষ ঘটকের আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই সাহিত্যের প্রতি, বরং বলা চলে, তার সঙ্গে সঙ্গে এ-দৃজন উপক্ৰাসকার পরম সহানুভূতির সঙ্গে বাংলাদেশের একেবারে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের প্রতিই দৃষ্টি রেখেছেন সতর্কভাবে। তাই তাঁদের উপক্ৰাস প্রচলিত প্রধায় ধারাবাহিক কাহিনী মাত্র হয়েছে—পটভূমি এবং চরিত্র উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এগিয়ে গেছে ইতিহাসকে স্বীকার করে। কিন্তু অমিয়ভূষণ কেবলই মাত্র কাহিনী বর্ণনা করেননি, তিনি আরও কিছু বস্তুতে চেয়েছেন যার ব্যঞ্জনা কাহিনীকে আশ্রয় করেও তাকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ তাঁর অব্যবহৃত নৈব্যক্তিকতা পাঠকের চেতনার বাইরেই থেকে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ কাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্বকীয় বক্তব্য আপনা থেকেই মিশে আছে, সহজভাবে। ফলে এ গ্রন্থ যেমন বিদগ্ধ পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে, তেমনি কাহিনীলুপ পাঠককুলকেও আনন্দ দিতে সক্ষম।

বস্তুত প্রচুর অবসরের মধ্যেই নীল ভূঁইয়া পড়তে হবে, কিন্তু অবসর বিনোদনের তরল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গেলে বোঝা যাবে সে-উদ্দেশ্যের পক্ষে এ-গ্রন্থ রীতিমত গুরুভার।

অনিল চক্রবর্তী

অদেশী বো : কলীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বিশ্ববাণী পাবলিশার্স, ৬, যুরলোধর সেন সেন, কলিকাতা-৭। দাম আড়াই টাকা।

বইখানিতে মোট যে বারোটি গল্প আছে, তাদের প্রত্যেকটি গল্পই পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না-করে উঠতে ইচ্ছা করেনা। বইখানির নামকরণ হয়েছে শেষ গল্পের নামে। এতে বোঝা যায়, গল্পের পুরো মিছিলটির পুরোভাগে একটি রাজনৈতিক গল্পকেই লেখক এগিয়ে দিয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে আমার ব্যক্তিগত বিচারে ‘মাসহারা’ গল্পটি মানসিক অধিকতর অগ্রগতির পরিচায়ক।

বাংলাদেশের মধ্যবিস্তৃত সমাজের সাধারণ হাসিকান্নার পলিমাটিতে গল্পগুলির জন্ম। গল্পগুলির আবেদন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় নয়, হৃদয়বেগের মধ্যে। লেখকের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, ভালো গল্প এবং মহৎ গল্পের মধ্যে তফাৎ আছে। ভালো গল্প মনোহরণ করে, কিন্তু

মহৎ গল্প মনোজ্ঞ করে। রস-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে নির্মল করতে পারলে, অর্থাৎ তাঁদের বিবেক-বুদ্ধিকে মানুষের মংগল সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে মহৎ শিল্পের সৃষ্টি হয়। জন্ম হয় বসিষ্ঠ শিল্পের।

গল্পের একটা গুণগত পরিবর্তন সম্পর্কে চীন এবং রাশিয়া নতুন করে' ভাবতে শুরু করেছে। সেই সংগে তাঁদের দেশের সমাজগঠনও নতুনভাবে পা ফেলেছে। রাশিয়ার নবনারীর সুখঃখ এখন অল্প পর্যায়ে চলে গেছে। উদাহরণ দিয়ে বোঝাই যে, খ্রীদাশ গুপ্তের 'একসূরে' গল্পটি ওদেশে অচল। বহু বছর ধরে যে-দেশে ক্ষয় রোগ কিংবা বক্তহীনতা প্রায় নেই, সিকিলিস কিংবা ভিটামিনহীনতা প্রায় নেই, সে-দেশে খ্রীদাশগুপ্তের 'একসূরে' গল্প জমবে না। তেমনি জমবে না 'সতী' গল্প, তেমনি জমবে না 'গোপাল উড়ের সেনের' গল্প। সম্ভবত সে-দেশে এগুলো আঘাতে-গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। যে-দেশে বৈশ্বাস্তি নেই, সে দেশে 'তাসের ঘর' গল্প কি জমতে পারে ?

কিন্তু তাহলে বাংলাদেশে যে এগুলো লেখা হবেনা, তা নয়। লেখা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু লিখতে হবে সচেতনভাবে। লেখক যদি নতুন সমাজ সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তবে পাঠক-পাঠিকার মনের মধ্যেও সে-স্বপ্ন ভরে' দিতে হবে। তাতেই রূপ পাবে মহৎ শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস। লেখকের দৃষ্টি অতীতের দিকে থাকলে তিনি ঐতিহাসিক, বর্তমানের দিকে থাকলে তিনি রিপোর্টার, এবং ভবিষ্যতের দিকে থাকলে তিনি সত্যিকারের রসবেত্তা।

আমার এই সমালোচনারও সমালোচনা চলতে পারে, কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি যে, লেখককে মানবদরদী হতেই হবে। রচনার কারিগরিতে দরদ অনেকটা সিমেন্ট ব্যবহারের মতই।

খ্রীদাশগুপ্তের লেখার ধরন বড়ই সুন্দর বলে এই বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করলাম। একটা অবাস্তব কথা বলি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অমানুষিক" গল্পের সংগে "অব্যাহতি" গল্পের বিষয়গত মিল আছে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

বিশ্বসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার : সুখান্ত সরকার ও রমাপ্রসাদ দাস। প্রকাশক : গ্রন্থলোক, ৬-বি, কালার্টা সাহা সেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৪। দাম : ১৫০ আনা।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাস বর্ণনা করে' গ্রন্থকারদ্বয় এই পুস্তক ছোট ছোট প্রবন্ধের মাধ্যমে বারোটি দেশের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক-লেখিকার জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন; আর প্রত্যেকটি আলোচনার শেষে আলোচ্য লেখক-লেখিকাদের প্রসিদ্ধ রচনাবলীরও একটি করে তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

বাঁদের জীবনকথা নিয়ে এই পুস্তকখানি প্রণীত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন : সুইডেনের সেলমা লেগারলফ, বেলজিয়ামের মরিস মেটারলিক, নরওয়ের হুট হ্যামসুন, ফ্রান্সের আনাতোল ফাঁস, আয়ারল্যান্ডের জর্জ বার্নার্ড শ', ইতালীর গ্রেসিয়া দেলেদা, জার্মানীর টমাস মান, ইংলণ্ডের জন গলসওয়ার্ডী, রাশিয়ার আইভান বুনিন, আমেরিকার পাল বাক,

পোলাণ্ডের হেনরিক সিনকেভিচ এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ । গ্রন্থকারদ্বয় এই সুবিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্ব স্ব ধ্যান ধারণার পরিচিতি প্রসঙ্গে তাঁদের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনা ও পরিপাশ্বিক সাহিত্যানুরাগী তরুণ পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন ; এবং সে-প্রয়াস লিপিকুশলতার গুণে প্রশংসনীয়ই হয়েছে বলা চলে । বিশ্বসাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য জিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীরা এবং অনুরাগীরা এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই ।

ছাপা বাগাই মোটামুটি ভালোই । প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও মনোজ্ঞ ।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

উলুখড়ের কবিতা—উলুখড় । প্রকাশক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ৩৭ রিপন ষ্ট্রিট, কলকাতা-১৬ । দাম : আট আনা ।

বারোটি কবিতার সংকলন । ছদ্মনামে সংকলন পুস্তিকাটি গ্রথিত হয়েছে বটে, কিন্তু জানিনে, ব্যাপারটা বেআইনী হবে কিনা যদি কঁাস ক'রে দিই যে, উলুখর আসলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সংকলনটা পেতে একেবারেই অসুবিধে হয়নি কেননা পুস্তিকাটির গুটি-দুই কবিতা তো এই অগ্রণীতেই বেরিয়েছিলো কবির স্বনামেই ।

স্বনামেই লিখুন আর বেনামেই লিখুন, মেজাজে কি কবি-ব্যক্তিত্বে এর স্বকীয়তা সহজেই স্বপ্রকাশ । আলোচ্য কবিতাগুলির মধ্যে কবির মনের যে-চেহারা ফুটে উঠেছে তা দেখে আরামে চোখ জুড়িয়ে যাবার কথা নয়, যে-ব্যক্তিত্ব সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে তার অনুভবে ধ্যানের তন্ময়তার কি ভাবের গভীরতার তলিয়ে যাবার কথা নয় । কেননা এখানে কবি জীবনের বহিরংগ-সমস্যায় কাতর, অস্থির, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, ঠাট্টা টিটকিরি দেবার অন্তে বদ্ধপরিকর । সংকলনটির প্রায় অর্ধেক কবিতাই কংগ্রেসী কুশাসন আর কংগ্রেসী নেতাদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে কবির দ্বিধার । এই দ্বিধার দিতে, বেশ লক্ষ্য করা যায়, কবিকে একবারো ঢোঁক গিলতে হয়নি, মিন্মিন্ করতে হয়নি এবং অপটু আক্ষিপনে আবোল-তাবোল বকতে হয়নি । অর্থাৎ কিনা, রাষ্ট্রকর্তা ও রাষ্ট্রনেতার ছদ্মবেশে যে-সব অসাধু ঠক ঝোঁচোর কালোবাজারী পকেটমারের পাল্লায় পড়ে আজ আমাদের জাতীয় জীবনে এত দুর্গতি এত হাহাকার, তাদের পিঠে কাব্যের লাঠি মারতে গিয়ে কবিকে তাঁর লাঠি এবং পকেট দুই-ই পকেটমারদের হাতে বেধে নাজেহাল হ'য়ে ফিরে আসতে হয়নি । যেটা হ'তে দেখা যায় অন্তান্ত অনেক ক্ষেত্রেই, অনেক প্রতিষ্ঠিত স্বনামখ্যাত কবির ক্ষেত্রেই—যার বিশদ উল্লেখ এখানে নিম্নরোজন । এ.থেকে মনে হয়, বক্তব্যের সংগে আলোচ্য কবির মেজাজের, সহজ রসবোধের এবং সাহিত্যিক কাণ্ডজ্ঞানের সমতা ঘটেছে । যার ফলে, কবি যা বলতে চান সেটা বলা হয়, বিষয়বস্তুর আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, রাজনীতির আসরে এসেও কবি আনাড়ীপনা ক'রে রাজনীতির যজ্ঞনাশ ক'রে বসেন না । এবং সাহিত্যেরও নাম হাসান না । কবির এই কৃতিত্বের দুটি-একটি নমুনা দেব কি ? উপায় নেই, কেননা তাহ'লে 'হাতি',

‘ঘুঘু-সংকীর্তন’, ‘রাইবেঁশে নৃত্যসংগীত’ এবং ‘Every Black-marketer will be hanged by the next lamp-post’ কবিতা-কটি এখানে আগাগোড়াই তুলে দিতে হয়। মোক্ষম-মোক্ষম দু-চারটি বচন এখানে উদ্ধৃত করার লোভ অতি-কষ্টেই সামলানুম।

সঙ্কলনটির অন্যান্য কবিতাগুলিতে অবিশ্রি কবি, এই ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, পুরোপুরি কবি-মেজাজেই ধরা দিয়েছেন। পুরোপুরি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই পাওয়া যায় তাঁর ‘বেকার জীবনের পাঁচালি,’ ‘শিশুর কান্না’ কি ‘মিছিলে’ নামক কবিতায়। লঘু মেজাজ কেটে গিয়ে এখানে তিনি গস্তীর, বিষন্ন, দুর্ভাগ্যপীড়িতদের অন্তে ব্যাকুল, অত্যাচার-অবিচারের শোচনীয় পরিণাম দেখে স্তম্ভিত। এখানে তিনি অনুভব করেন : ‘স্বাধীন ঋতুর প্রান্তরে একটি চারাগাছও আজ পল্লবিত নেই!’ হৃদয়ের রক্তক্ষরণে এখানে এমন কবিতার জন্মলাভ ঘটে, আমাদের মর্মে যার সানন্দ স্বীকৃতি চিরকালীন হ’য়ে থাকবে ব’লেই আমার বিশ্বাস, যেমন :

কিবা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষার কালো মেঘে
শরভের রোদ মুছে নিয়ে যায়-মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে
হেমন্তে যদি বাতাস ফোঁপায় কিংবা পদ্মপাল আসে
অসময়ে গাঁয়ে ধামারে গঞ্জে বস্তিতে বাঁকা শীত হাসে
তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, মিতে !
এসো তালি-দেওয়া জুতোজোড়ায় সমস্তে বাঁধি ফিতে ।

কল্যাণ কর

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

অগ্রণীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত রাজুলের জনপদের ছন্দ অগ্রণী বুক ক্লাব বই হিসাবে প্রকাশ করেছেন। অগ্রণীর গ্রাহকরা, ইচ্ছা করলে, বইটি বাড়িতে বসেই পেতে পারেন। তাঁদের পুস্তক মূল্যের শতকরা সাড়ে বার টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হবে। বইটির দাম ঠিক হয়েছে সাড়ে তিন টাকা।

॥ পত্র লিখলে বইটি বাড়িতে বসেই পাবেন ॥

সংগীতের আসর

বৈষ্ণবনাথ ঘোষ
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জগৎ যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ এ-কথা পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর-সমুদ্রে আত্মবিলুপ্তির চরম আনন্দ লাভ করতে হলে শ্রোতাদের চাই আগ্রহ, ধৈর্য ও একাগ্রতা এবং তার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মূল সূত্র সম্বন্ধে কিছু ধারণা। আগ্রহশীল শ্রোতাদের এ-সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ। যে কোন কলাবিদ্যার বা কলানুষ্ঠানের সমজ্ঞদার হতে গেলে খোলা মন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নেই; সকলে সবকিছু বোঝেন না, বোঝা সম্ভবও নয়। কোন বিষয়ে একজন মহাপণ্ডিত সংগীত বিষয়ে মহামূর্খ হতে পারেন। কিন্তু গত শতাব্দীতে দেখা গেছে ইঙ্গ-বঙ্গ সভ্যতার মাপকাটিতে বহু কৃতবিদ, বিদ্বান ব্যক্তিও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের মূল সূত্রটি বোঝার চেষ্টা না করেই এর সম্বন্ধে তাঁদের চরম রায় দিয়ে গেছেন; যার ফলে বহুদিন যাবৎ শিক্ষিতসমাজে এই সংগীতের প্রতি অবজ্ঞার ভাব শেকড় গেড়েছে। 'আমার মতে এর প্রতি যথেষ্ট অবিচার আমরা করেছি ইতঃপূর্বে, এবং সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার, অবিচার ক'রে আত্মতৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করেছি! গত শতাব্দীর মধ্যভাগে, বাংলার সংগীতজ্ঞ কলারসিক রাজা সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতের সংগীতক্ষেত্রে বাংলার মান রক্ষা ক'রে আমাদের অনেক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেছেন। যে-বাংলায় বহু শতাব্দী ধেকেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিকাশ, অনুশীলন ও প্রচার চলে এসেছে। যে-বাংলার আদিম অধিবাসীর আদিম সংগীত স্ব-সম্মানে স্থানলাভ করেছে ভারতীয় সংগীতে। বহু সংগীতবিদ বাঙালী পণ্ডিতের রচিত পুঁথি আজও ভারতীয় সংগীতের মাপকাটি সেই রাঢ়-বঙ্গে এ-সংগীত বিদেশী সংগীত হিসাবে গণ্য হবে? উচ্চাঙ্গ সংগীতও বাংলার নিজস্ব সংগীত তথা ভারতের নিজস্ব সংগীত, সর্বভারতীয় সংস্কৃত সমাজের সংগীত। এ কথা আজও বলতে হচ্ছে এই কারণে যে এখনও কেউ কেউ আছেন যারা এই সংগীতকে বিদেশী সংগীত হিসাবে অবজ্ঞা করেন এবং বাংলার নিজস্ব সংগীত খুঁজতে অসংস্কৃত সহজাত সংগীতের সমাজে হাতড়ে বেড়ান। বাংলার 'নরতন্ত্র', বাংলার কুষ্টি ও সভ্যতা, বিচিত্র, সংকর জনের সংকর সংস্কৃতি। সকল ধারার মিলনক্ষেত্রে বাঙালী সমাজ উচ্চাঙ্গ সংগীতে বহু অমূল্য রত্ন গোঁথেছে অতীতে; কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ঐদের রচিত গানের সুর, রাগরাগিনীর সন্ধান আজ না মিললেও একথা ঠিক যে এগুলি উচ্চাঙ্গ সংগীতেরই সম্পদ। অসংস্কৃত সমাজের সহজ ভাবাবেগই যে বাংলার একমাত্র নিজস্ব বস্তু

এ-কথা মানি না। উচ্চাঙ্গ সংগীত যে সবই শাস্ত্রীয় এবং আদি বৈদিক-জনের একটি বিশেষ শ্রেণী। নিজস্ব জিনিস এ-কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজও আমরা পাইনি। বরং “মার্গ সংগীত” ও “দেশী-সংগীত” এই দুটি কথার মধ্যেই খুঁজে পাই ভারতীয় জনগণের কুশল কণ্ঠ-স্বর। এ-ছাড়া একদল গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন যারা রোমান্টিক রসে মজে গিয়ে,—অপটু হাতের পটচিত্র দেখে গদগদ হয়ে পড়েন, অপটু কবির আদো আদো বুলি শুনে আবিষ্কার করেন নির্জলা কাব্য; অপটু গায়কের কল্পিত সুরে খুঁজে পান নিজস্ব সংগীত। এঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলে সুখী হতাম। এঁদের বুঝতে পারলে হয়তো ভুল সংশোধন ক’রে নিতাম, আপাতত এ ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ! কালিদাস, সেকসপিওর, টলষ্টয় মাইকেল এঞ্জেলো, র্যাক্সেস, ভারতের নাম না জানা দক্ষ-শিল্পী-সমাজ, তানসেন, বৈষ্ণু, আমার কাছে কলাবিচারের আদর্শ।

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতরসিকের অভাব ঐতিহাসিক যুগে ছিল না, অর্বাচীন যুগেও নেই। বহু জেলায় গ্রাম্য সমাজের মধ্যে এই সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ্যণীয়। তাল ময় মাত্রায় সুরের শুদ্ধতার প্রতি তাঁদের অবিচলিত নিষ্ঠা। আমি এমন গ্রামীন সমাজ দেখেছি যেখানে তথাকথিত বাংলা গান অপেক্ষা ক্রপদ ধামার বেশি প্রিয় ও পরিচিত। ভাষার কথা ভুলে সুর ও ছন্দের মধ্যে এঁরা আনন্দ পেয়ে থাকেন। কারণ অধিকাংশ উচ্চাঙ্গ সংগীতেরই গানের ভাষা প্রাচীন ভাষা : প্রাকৃত, মৈথিলি, ব্রজবুলি পঞ্জাবী, মারাঠী, বাঙ্গাল, সকল ভারতীয় ভাষার অপূর্ব সংমিশ্রণে উচ্চাঙ্গ-সংগীত-জগতের এক বিচিত্র ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এ সংগীতের ভাষা ধাঁরা বোঝেন তাঁরা দেখতে পাবেন কাব্যরসও তাতে কম নেই। তবে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন কলাবিদদের কণ্ঠে এ-ভাষার বিকৃতি ঘটিয়েছে, কখনও স্বচ্ছতার কখনও শিল্পীর আগোচরে। তাই এই ভাষা বুঝতে হলে কিছু পরিশ্রম করতে হয়, হয়তো কোথাও কোথাও ছর্বোধ্য হয়ে থাকে। শুধু এই অপরাধে এ সংগীত বাংলার অপাত্তের হতে পারে না। উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি অংশের শুধু এই সমস্যা; নৃত্য ও বাগ্ম সঞ্চকে এ-সমস্যার স্থান নেই এটা সুরের বিষয়। যদিও উচ্চাঙ্গ সংগীতের অপর নাম হিন্দুস্থানী সংগীত ও কর্ণাটিক সংগীত তবু এর রাগ রাগিনীর নাম বিচার ক’রলে দেখা যাবে এ-সংগীত সর্বভারতীয়; এতে অনেক আদি-মানব গোষ্ঠীর সুরও স্থান লাভ করেছে; কাজেই কোন একটি প্রদেশের বা কোন একটি মানবসমাজের দ্বারা এই সংগীত অন্তঃকলের ওপর চাপানো হয়েছে এ-বিশ্বাস করার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এই সংগীতের ব্যাকরণ ধাঁরা রচনা করেছেন তাঁরাও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতে এই রাগসংগীতের যে পরিবর্তন ঘটে গেছে সেটাও বিস্ময়কর। মুসলমান যুগে এই সংগীতের পরিবর্তন খুবই স্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে যার ফলে আজ হিন্দুস্থানী সংগীত ও দক্ষিণী সংগীত। হিন্দুস্থানী নৃত্য দক্ষিণী নৃত্য। এ সঞ্চকে সাধারণ শ্রোতাদের কিছু জানাবার জন্তে পরে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

উচ্চাঙ্গ সংগীত যখন থেকে রাজদরবারে বা জমিদারগৃহে সীমাবদ্ধ হলো তখন থেকেই

মনে হয় সাধারণ লোকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সম্পূর্ণ না হোক আংশিক ভাবে। অশুশীলনের দিক থেকে এতে লাভবান হয়েছে সংগীতসমাজ সম্বন্ধে নেই কিন্তু জন-প্রিয়তার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; বর্তমানযুগে সংগীতসমাজের আশ্রয়স্থল সর্বসাধারণ; তাই আজ কলাবিদদের নানা কথা চিন্তা করারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে গতযুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তনও অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। তা ব'লে একথা ভাবা ঠিক হবে না যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মান নিচু করে আত্মরক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। ভাবী সংগীতের মান আরো বাতে উজ্জ্বল হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই নূতন যাত্রা শুরু করার দরকার। সর্বসাধারণের মধ্যে সংগীত সম্বন্ধে আগ্রহশীল করার প্রধান উপায় সংগীতআসর। পূর্বে পূর্বে বৈঠকী গান প্রচলিত ছিল। তাতে যারা সমজদার লোক তাঁরাই থাকতেন। সেখানে কলাবিদদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা চলতো, বিচার চলতো, ভুল সংশোধন চলতো। বৈঠকে গান গাইবার বা বাজাবার অধিকার সকলের ছিল না, ঘরোয়ানা কলাবিদ, কিংবা গুরুর আদেশপ্রাপ্ত কলাবিদদেরই সেই সব আসরে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ ঘটতো; প্রতিযোগিতা, বিচার, ও সমজদার-দের তারিফ তখন বহুলাংশে সাহায্য করেছে সংগীতের অগ্রগতির। আধুনিক যুগে এ ধরনের প্রায় উঠে গেছে; প্রয়োজনের তাগিদে অর্ধনৈতিক চাপে বৈঠকখানা, ঠাকুর দালান রেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থের বিনিময়ে আশ্রয়স্থল হয়েছে বহু পরিবারের। বৈঠকী গান বৈঠকখানার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লোপ পেতে চলেছে। এই সঙ্গে হয়তো উচ্চাঙ্গ সংগীত ক'লকাতার ভূমি ছাড়তো যদি না কয়েকজন গুণী সংগীত বসিক এই বিপদের দিন আঁচ ক'রে অন্য পন্থা দেখিয়ে যেতেন। এ-ব্যাপারে সবার আগে মনে পড়ে কলারসিক শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের নাম। তাঁর ঋণ বাংলার সংগীত সমাজ কোন দিনও শোধ করতে পারবে না। তাঁর উৎসাহ না পেলে এ-যুগে বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত লোপ পেতো; সর্বসাধারণের সঙ্গে সংগীতসমাজের রাধিবন্ধন তিনিই করে গেছেন নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা চিন্তা না ক'রে। তিনি চিরস্মরণীয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকের ভুলনায় আধুনিক সময়ে সংগীতরসিকের সংখ্যা বেড়েছে, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। এর মূল আছে সাধারণ জলসা বা সংগীতসম্মেলন যা বর্তমান যুগে পাড়ায় পাড়ায় প্রায়ই হয়ে চলেছে এবং ঝাঁপেই সংগীত শোনার আগ্রহ থাকে, তিনি টিকিট কিনে সেখানে সভার আসন গ্রহণ করতে পারেন, প্রয়োজন হলে তাঁর মনের সন্তোষ বা অসন্তোষ দুই বিনা বাধায় প্রকাশ করতে পারেন। আগেকার দিনের বৈঠকী গানে সাধারণশ্রোতারা এতখানি স্বাধীনতা ভোগ করতেন না। সভার মধ্যে সংগীত ভাল না ধারাপ, বা কোনপ্রকার বিচারমূলক অভিমত প্রকাশ করতে হলে, হয় তাঁকে সংগীতজ্ঞ হতে হতো কিংবা নামকরা সমালোচক হতে হতো। এককথায় এ-সম্বন্ধে তাঁর অধিকার, প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। এখন শ্রোতারা সে-অনুপাতে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করেন। এ-স্বাধীনতা ভোগ করার কালে অনেক সময় এর অপব্যবহার হয়েছে দেখা গেছে; একজন প্রথমশ্রেণীর কলাবিদকে উপেক্ষা করে একজন তৃতীয়শ্রেণীর কলাবিদকে তারিফ করেছেন

এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই গত বিশ বছরের মধ্যে। তাই আজ উপযুক্ত শ্রোতা সৃষ্টির প্রয়োজন অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে সংগীতক্ষেত্রে যাতে এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হয়। আগেকার দিনে সংগীতের বৈঠক ধারা করতেন তাঁরা সম্ভদার, সংগীতের রসাস্বাদন ছাড়া অন্য কোন স্বার্থ প্রায়ই থাকতো না। শৃঙ্গার রসের আশেয়ে মাঝে মাঝে বাঁদীদেব প্রাধান্য দিতেন বটে কিন্তু বড় কোন ওস্তাদের আসরে বাঁদীদেবের গান নিষিদ্ধ ছিল। অনেক ওস্তাদ বাঁদীদেবের সঙ্গে গান গাওয়া অপমান সূচক মনে করতেন। বাঁদীরাও ধ্রুপদ খেয়ালের আসরে গান গাইতে নারাজ হতেন। আজকাল এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে; যে-কোন শিল্পীই আজ সমানারিকার ভোগ করে থাকেন, এটা এ-যুগের ধর্ম। এবং বাঁদীরাও খেয়াল ধ্রুপদের চর্চায় প্রথমশ্রেণীর গায়িকার আসন দাবী করার যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। কাজেই সংগীতসমাজ আজ বাঁদীদেবের দ্বারা সমৃদ্ধই হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দেখা দিয়েছে অন্যদিকে। কলারসিকদের মধ্যে রুচির বৈচিত্র্য এক জিনিস এবং সাধারণশ্রোতাদের মধ্যে রুচির বিকৃতি অন্যজিনিস। সচেতন শ্রোতারা এই বিকৃতির প্রকাশ দেখে অনেকক্ষেত্রে ব্যথিত হন। গত শতাব্দীর বিলাসী বাবুদের মধ্যে সংগীত শোনার যে আগ্রহ বিশেষ বিশেষ স্থানে দেখা যেতো সেই অতি স্থূল মানবিক বৃত্তির সত্য প্রকাশ যদি কোথাও দেখা যায় সেটা মোটেই সংগীতের মঙ্গল করবে না। অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর নারীকণ্ঠ অপটু স্বরবিন্যাস, যদি পটু সংগীতশিল্পীকে ছাপিয়ে তারিক পার সেখানে বুঝতে হবে কোথা যেন অমঙ্গল বাসা বেঁধেছে। এ-সম্বন্ধে সচেতন শ্রোতাদের চৈতন্য একমাত্র রক্ষা কবজ। ধারা এই সংগীত আসরের কর্মকর্তা তাঁদের বিচারবুদ্ধি অত্যাবশ্যক। তাঁরা সচেতন শ্রোতাদের সুখী করতে পারেন এবং অচেতন শ্রোতাদের সঠিক মার্গে পরিচালিত করতেও পারেন। আসরে সাধারণশ্রোতাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা দরকার। রাগ, তাল, সংগীতের কথা, কোন শ্রেণীর বা বিভাগভুক্ত গান বা বাজনা সে সম্বন্ধে যদি কিছু জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তাতে সাধারণ শ্রোতারাও ক্রমে পরিচিত হয়ে যেতে পারেন উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে। কোথাও কোথাও এ-ব্যবস্থা হয়েও থাকে; সর্বক্ষেত্রে সম্ভবও হয় না এও ঠিক, তবু আজকের দিনে রসিক সৃষ্টির সমস্তা দেখা দিয়েছে বলেই এ-সম্বন্ধে উৎসাহী কলা-রসিকরা পথের হৃদিশ্ দেবেন বিশ্বাস করি। পঞ্জাব সিদ্ধ গুজরাট মারাঠা দাবিড় উৎকলবঙ্গ এই সর্বভারতীয় সংগীতের ধারা বাংলার মাটিতে আরো পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক শ্রোতা ও কলাকারদের মিলিত চেষ্টায় সংগীতআসরের মাধ্যমে। বাংলার তথা কলকাতার সংগীত-সম্মেলন আজ সারা ভারতের কলাবিদদের আদর্শস্থল হয়ে উঠেছে, একথা স্বরণ করে, আদর্শ শ্রোতা সৃষ্টি হোক দলে দলে এটাই বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশ)

॥ চলচ্চিত্র ॥

উপহার : কাহিনী : শৈলজানন্দ ; সংলাপ : সুধীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায় ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তপন সিংহ ; ভূমিকায় : উত্তম, সাবিত্রী, মঞ্জু দে, নির্মল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অপর্ণা, ছবি বিশ্বাস, অমৃতা, মল্লিক দত্ত প্রভৃতি ।

অর্থলোলুপ কৃপণ বাড়িওয়ালার ভাড়াটে এল স্বামী-স্ত্রীর একটি ছোটো পরিবার। বাড়িওয়ালা নিজে এবং একমাত্র মা হারা মেয়ে থাকে নিচে এবং দোতলায় ভাড়াটে। ভাড়াটে দাদা-বৌদির উপর মেয়েটির বড় টান, তাঁদেরও মেয়েটির প্রতি। উপরন্তু মেয়েটির পাশের বাড়ির ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া (বাংলা ছবির নায়ক মাত্রই ফার্স্ট ক্লাস!) ছেলের সঙ্গে প্রেম। প্রেমে বাগড়া দেন কৃপণ বাপ এবং সাহায্য করেন উপরের দাদা-বৌদি। মূল গল্পাংশটুকু এই রকম। একে নানান অর্থহীন অস্বাভাবিকতায় ভেঙে-ছন্ড়ে ছবির উত্থান-পতন সৃষ্টি করা হয়েছে। ছবির অবিবাহিত প্রেমিক দু-জনার মিলনের বাধাও দুদিন দেখান হয়েছে। যে ভাবে তা হাস্যকর। যে মুহূর্তে নায়কের বাপ কন্টার পিতার কাছ থেকে অর্থের দাবী ছেলের সুখের ক্ষেত্রে কমাতে রাজী হলেন, এবং সেই কথা জানাবেন বলেন অন্তপক্ষকে, ঠিক তখনই যে কেন ধামোখা ছেলে বাপকে ছ'কথা শুনিতে নিজেই নিজের প্রেমের ব্যবস্থা করবে বলে বীরদর্পে বেরিয়ে গেল, গিয়ে গভীর রাতে প্রেমিকাকে নিয়ে যে দিকে ছ'চোখ যায় চলে যেতে চেষ্টা করল তা বোঝা মুশ্কিল। গল্পের এই অংশকে কেন্দ্র করে পরে যে সব প্যাচ তৈরী করা হয়েছে সেগুলি হাসির খোরাক জোগায়। কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি তৈরী করেছেন মনে হয় পৃথক পৃথকভাবে বসে, পরে একটি ঘোড়াতালি লাগান হয়েছে। তপন সিংহের পরিচালনা একঘেয়ে চিত্রাচারিত দুর্বলতা কণ্টকিত। বেকারযুবকের রাস্তা হাঁটা আর ব্যর্থ হওয়া, হার্টের দুর্বল রুগীর মৃত্যুর পূর্বে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হওয়া এবং পরে হঠাৎ টুপ করে মরে যাওয়া, ক্রাইসিস বা দুর্বিপাকে চরিত্রগুলির নিজের বা প্রিয়জনের কথা শুনতে পাওয়া (মল্লিকি?) প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের দিকে নির্বোধ, নিস্পন্দ তাকিয়ে থাকা, হাস্যরসের নামে আতিশয্য—এক কথায় ছবি হিট করাবার তথাকথিত সব মশলাই উপহার দেয়া হয়েছে।

ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ কোনোটিই চিত্রোপযোগী নয়, ফলে পাত্র-পাত্রীর অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করার সম্ভাবনাও বিরল। এরই মধ্যে সাবিত্রী তাঁর নিরলসমতার ছাপ স্পষ্ট করেছেন অনেক সময়। তাঁকে দেখলে কেবল এ কথাই মনে হয় যে উপযুক্ত চিত্রনাট্য ও পরিচালকের অভাবে কতটা শক্তি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। উত্তম মঞ্জুদের অভিনয় সংযত। কিন্তু নির্মলকুমার মোটেই সুবিধে করতে পারেননি। তাঁকে কেমন ব্যঞ্জনাহীন

কাঠ-কাঠ মনে হয়। কাশুবাবু ও জহর রায় আতিশয়া পীড়িত। কাশুবাবুর কাছ থেকে আরো ভালো অভিনয় প্রত্যাশিত।

আলোকচিত্র চলনসই। শিল্প নির্দেশনায় অজস্র সস্তা ও কঁাকির কাজ চোখে পড়ে।

চিত্রভাষী

॥ পথের পাঁচালী ॥

আমি সেদিন বাংলাদেশকে দেখে এলাম। আমার যে বাংলা পচা পানার কাঁথা মুড়ি দিয়ে একগলা জলে গা ডুবিয়ে ঘুমিয়ে থাকে, কেউ ঠেলা দিলে বুদ্ধদের বিজকিনি কেটে বিড়-বিড় করে আপন মনে। ছুঁয়ে এলাম বাংলাদেশের হাওয়া। যে হাওয়া বাঁশের বনে ভয় দেখায় 'কড় কড়' শব্দে। আবার কাঁশের বনে 'শন্ শন্' ডাক দিয়ে বেড়ায়। যেন বলে, 'শোন', 'শোন'। যে হাওয়া বৃষ্টির মেঘের তাড়া খেয়ে পল্লপাতার উঠোনে এসে মাথা কুটে কুটে কাঁচারায়। কালো কুঁচকানো চুলের মত পুকুরের পাতলা ঢেউ মানুষের ছবিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নাচে—সন্ধ্যার শাঁখ বাজলে গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকা কলাপাতার বন চোখে কালো। কাজলের টিপ পরে পুকুরের আয়নার মুখ দেখে থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আমার সেই বাংলাদেশ, যাকে এই কালের কোলকাতার কোলাহলে ভুলে গেছলাম, তাকে চিরস্মরণীয় করে দেখে এলাম। দেখে এলাম তিনমাস নয়, তিনদিন নয়, মাত্র তিন ঘণ্টারও কম একটা ছবিতে। ছবি 'পথের পাঁচালী'। তার পরিচালক নতুন। তার ক্যামেরাম্যান নতুন। সংগীত পরিচালক নতুন। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অধিকাংশ নতুন। তার সবখানেই নতুনের কেঁতন উড়ছে। সারা ছবিটাও তাই একাই একটা নতুন যুগ। নতুন যুগাস্তর।

ছবি দেখে ভাল লেগেছে অনেক, মুগ্ধ হয়েছি বহুবার, প্রশংসায় কেটেও পড়েছি কতদিন, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র মত আর কোনো ছবিকে কখনো এমন করে ভালবাসিনি। ভালবাসেনি কেউ। ছবির গায়ে ভাষাসার গন্ধ পেলাম এই প্রথম। যেন যৌবনের পরশমণি স্পর্শ করেছে তাকে। আজ তাই স্বর্গবেই একথা বলতে পারি যে "পথের পাঁচালী"র উদ্বোধনেই শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের যৌবনের জন্মদিন শুরু হল।

মানুষের সংগে প্রকৃতিকে জড়িয়ে, মানুষের বুকের ভালবাসার গন্ধকে প্রকৃতির ফুলে ফুটিয়ে, প্রকৃতির অন্তর্জালকে মানুষের কান্নায় ঝড়িয়ে, এক বর্ণগন্ধময়, দুঃখবন্দময় সবুজ সজীব বাংলাদেশের জয়গান 'পথের পাঁচালী' বইটি। এ বইয়ের স্বাদ বাংলাসাহিত্যে চির নতুন। তাই এই অভিনব অবদানের অষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে তাঁর চিরকালের ঠাইটি দখল করে নিয়েছেন।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে অননুয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কদম্ব যেমন, দুঃখতম্ব যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।' কিন্তু 'পথের পাঁচালী' উপাখ্যানে প্রকৃতি একজন

বিশেষ পাত্র নয়, প্রকৃতিই এখানে শ্রেষ্ঠ চরিত্র। নেপথ্যচারী নাটক। আর সেই নায়ককে কেন্দ্র করেই দুটি সুকোমল স্বপ্নাতুর জীবন। অপু আর দুর্গা। অপু আর দুর্গার এই শৈশব-কাহিনীকে ছায়াছবিতে রূপান্তর ঘটানো কখনো সার্থকভাবে সম্ভব হতে পারে, তাবিনি আমরা। আর আজ অপু আর দুর্গার সেই শৈশব-কাহিনীকে ছায়া-ছবিতে রূপান্তরিত হতে দেখে কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে সার্থকতাও এতখানি সার্থক হতে পারে।

কবিতা আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার 'দুর্গা-সহজ' এই কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। শিল্পী-পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' ছবিতে অপু ও দুর্গার মনের গহনের গভীর আলোড়নকে সেই 'দুর্গা-সহজ' মনের ছোয়ার জীবন্ত করে তুলেছেন। দুর্গার সোনারকাঠি আঙুলের ছোয়ার এই যে অপু প্রথম চোখ মেলে তাকাল—গভীর অর্থবহ এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর মধ্যেই পরিচালকের মস্ত বড়ো একটা হৃদয়ের এবং চিন্তার আলো ঝলসে উঠেছে। এইই হল 'দুর্গা-সহজ'।

পিসীমা মরে বাঁশ বনের হাওয়ায় ছলছে। দুর্গার ঝাঁকুনি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দেহটা। একটা কাঁপা জীবনের পতন হোল—চপ। তারপর সেই নিদারুণ মৃত্যুর সুখো-মুখি দাঁড়িয়ে একটিও কথা নেই কারুর মুখে। যেন সমস্ত পৃথিবীই বোবা হয়ে গেছে। শুধু বাঁশবনের কড়কড়ানির মধ্যে মৃত্যুর পায়ের সাড়া। অপু দুর্গা বাড়ি ফিরতে পা বাড়িয়েছে। পিসীমার ঘটনানা তাদের পায়ের ধাক্কায় বাঁশবনে ঠোঁকর খেয়ে আর্দ্রনাদ করে গড়িয়ে পড়ল জলে। বিরাট নিস্তর পটভূমির মাঝখানে ঐ ঘটির ডুকরে ওঠার ধ্বনিতেই আমরা অপু দুর্গার হৃদয়ের সমস্ত কান্নাকে স্পর্শ করলাম।

হরিহরের শেষ চিঠিখানায় কুশল সংবাদ পাওয়ার পর সর্বজন্মের বৃকে উৎসলে ওঠা খুশির নাচুনি বোঝাতে গিয়ে ঝিকঝিক পুকুরের চেউ আর জল-পোকায় নাচ আর কলমী ডাঁটার কড়িং-এর চঞ্চলতার দৃশ্য কটি যেন কোনো শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতার মত প্রাণে এসে বেজেছে।

দুর্গার মৃত্যুর রাতে প্রদীপের শিখা সারা রাত ছটকট করলো যন্ত্রণায়। কিন্তু বাংলা ছবির চিরকালে প্রথামুখ্য নিন্দন্য শেষ পর্যন্ত। গণেশঠাকুরের বেদী বিছাতের ধান্ধড়ে টলমল করে উঠলো। কিন্তু গড়িয়ে পড়লোনা, ভাঙলোনা টুকরো টুকরো হয়ে। ছর্ষোগের রাতের শেষে দুর্গার কি হল কোথাও তার প্রকাশ নেই। অপূর ডাকে জ্যোঠাইমা যখন তাদের বাড়িতে আসছে তখন দেখা গেল বিধ্বস্ত বাড়িটার একখানে কাদাজলের ওপর চিং হয়ে পড়ে আছে একটা মরা ব্যাঙ। দুর্গা যে নেই একথা তার মাকে হাহাকার করে বলতে হোলনা। দুর্গা মরে যাওয়ার পর অপু বোধ হয় একটিও কথা বলেনি। নির্বাক অস্তিনয়ে ফুটিয়েছে তার নিঃসঙ্গ জীবনের আঁতি। সেই অপু একদিন সকালে বাজার করতে যাচ্ছে বোধ হয়। উঠানে নেমে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর আবার ঘরে ঢুকে ছাতাটা নিল বগলদা বা করে। অপূর ঐ আকাশের দিকে তাকানোর ঘটনাটা হয়তো শুধুমাত্রই আকাশকে দেখার জন্যে। কিন্তু বারবার আমার মনে হয়েছে যেন আকাশে তাকাতে দুর্গা

তাকে ডেকে বললে ‘অপু, ছাতাটা নিয়ে যা।’ কানীতে চলে যাবার কদিন আগে জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে আচারের মালায় অপু খুঁজে পেল দিদির চুরি করা পুতির হারটা। সবায়ের অগোচরে সেটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল পচা পানা-পুকুরে। পানাগুলো সরে গিয়ে সেটাকে যেন জলের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে আবার খুঁজে যেতে চাইল। কিন্তু সবটা কঁাক ভরলোনা। অপু সেটা তাকিয়ে দেখলো। আমরা বুঝেছি অপূর জীবনেও ঐ কঁাকটুকু রয়ে গেল। রয়ে গেল দিদির জীবনের কলঙ্কিত একটি দিনের ব্যথিত স্মৃতি।

এ ছবির আরও যেটি মহৎ গুণ, যার ছোঁয়ায় এ ছবিকে ছায়াচিত্র মনে না হয়ে মনে হয় দর্শকের নিজের চোখের দেখা জগৎ—সেটি হল মমতাময় অথচ নিষ্ঠুর বাস্তবতা। তাই পিসীমার কাঁথা ঝাড়তে গিয়ে যে ধুলো উড়েছে, সে ধুলোর ঝাপটায় দর্শককেও নাক চাপতে হয়েছে। সেজ খুড়ী বাড়ির ছাদে কাপড় মেলতে মেলতে যখন কথা কইছে—তখন বাড়ির নিচের তলা থেকে একটা শিশুর কান্নার শব্দ যেন একটা গোটা গ্রামের বুকের ধ্বনি হয়ে ফুটে উঠেছে। মড়ার গায়ে মাছি বসানো, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া, রাজহাঁসের ডাক, হরিহরকে দিয়ে ভাত খাওয়ানো, টাকের উপরে এক কোঁটা বৃষ্টি ফেলা, ছোটদুর্গার ঘরে ঢোকার সময় উঠোনের কোণে ধুখু ছিটানো, বড় দুর্গাকে মেঝে ঘরের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার পর ভার্য্য অপূর এঁটো মুখ ধুয়ে ফেলা এবং নব ধারাপাত নিয়ে পড়তে বসা, সন্ধ্যার দৃশ্যে চাল থেকে পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া দেখানো, মেঠো পথে পিসীমার শব্দেই নিয়ে যাওয়া, বৃষ্টির আগে কোলে ছেলে নিয়ে পথচারীদের ত্রস্ত ছুটে পালানো, ঝড়ের পরের দিনের দৃশ্যে ভিজে উঠানে কয়েকটা ইঁট পেতে দেওয়া, দুর্গার মৃত্যুর পর থেকে দাওয়ার কোণে মরা পাখীর ঝাচাটাকে উপড় করে রাখা—এই সমস্ত ছোটখাট ঘটনার মধ্যে ফুটে উঠেছে ক্লাসিক ঔপন্যাসিকদের গভীর আর নিপুণ বাস্তবতাবোধ। ক্যামেরার ভোলা এই ছবিকে কখনো তাই মনে হয়েছে যেন কুঁদে কুঁদে তৈরী করা ভাস্কর্যের কাজ। ভাস্কর্য কি সত্যিই নেই? পিসীমা যেখানে ছুঁতে শ্রুতো পরাচ্ছে একতাল অঙ্ককারের মাঝখানে একটুখানি মিটমিটে প্রদীপের আলোর, সেই পরিমিত আলোছায়ায় পিসীমার যে মূর্তিকে পাই—তাকে দেখে কি মনে হয়? আবার কখনো মনে হয়েছে পড়ছি কবিতা। যেন পড়ছি ‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে, হৃদয় নাচেরে’—যখন আকাশ জুড়ে মেঘ ডেকে উঠল বৃষ্টির ঘোষণায়। প্রথমে পল্লপাতার বন উল্টিয়ে হাওয়া উঠল। এক কোঁটা ছুঁ কোঁটা করে বৃষ্টির জল পুকুরের জলে ঝাপড়া ঘুরিয়ে নাচতে বইল। তারপর এলো ঝমঝমানো বৃষ্টি। বাংলা ছবিতে এর আগে বৃষ্টি দেখিনি কোনোদিন। তাই সমস্ত বৃষ্টিটাই ঝরেছে আমাদের মনের মাটিতে। দেখেছি কি কখনো ঐ গা-চমকানো ঝড়-বাদলের রাত? ছিনিয়ে নেবার, তাসিয়ে দেবার রাত? গোঁয়ার আকাশের গোঁ গোঁ করা আক্রোশ শুনেছি কখনো?

আর কখনো কি শুনেছি এমন আবহ-সংগীত? যে আবহ-সংগীত নিজে বুক-কাটিয়ে কেঁদে সর্বজন্যকে কাদতে দেয়নি। দুর্গার পিঠে প্রহারের যন্ত্রণায় যে নিজের পিঠে ঢাকের

কাঠি পিটে আর্তনাদ করে উঠেছে। মেঘের এমন মৃদঙ্গধ্বনি, কবিতার পাতায় নয়, কান পেতে কি শুনেছি কখনো? টেলিগ্রাফের থামের বুকে কত যে ব্যথার স্বর তাও কি শুনেছিলাম? একটা ছবির সার্থকতার পিছনে আবহ-সংগীতের যে কতখানি মূল্য থাকতে পারে—রবিশঙ্করের প্রতিভা সেই দৃষ্টান্তই প্রতিভাত করেছেন এই ছবিতে মস্ত বড়ো করে। ছোট খঞ্জনী, পিসীমার যাওয়া আসার পথে গরুর গলার ঘণ্টাকেও তিনি তাঁর আবহ-সংগীতের আসরে বসতে ঠাই দিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা যেমন এ ছবির প্রাণ তেমনি সূত্রত মিত্রের ক্যামেরা এ ছবির হৃৎপিণ্ড। যখন কেউ কথা বলেনি, এমনকি আবহ-সংগীতও শুরু—তখন তাঁর ক্যামেরা কথায় মুখর। লং-শটের এমন উজ্জ্বল কৃতিত্ব দেখিনি। মইয়ের বিয়ের দিনে দুর্গার ব্যথিত মুখ, পিসীমার ছুঁচে স্ততো পরানোর দৃশ্য, অপূর প্রথম চোখ মেলে চাওয়া, নেচে নেচে ছোট দুর্গার ঘরে ফেরা, সব কিছু ছিনিয়ে নেবার ঝড়, পুকুরের জলে পোকান নাচ, কলমী লতার ললিত ভঙ্গিটি, পানাপুকুরের ফাঁক হয়ে গিয়ে আবার বুঁজে আসা, পাঠশালায় এক পরসার মুড়ি কিনতে আসা মেয়েটির পণ্ডিতের মার দেখে দূরের পুকুরের ধার দিয়ে ছুটে পালানো, সন্ধ্যার ছোয়ায় পুকুরের জলে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা কলাবন, রোদের ছায়া ফেলে ফেলে হেঁটে আসা— ক্যামেরা শুধু যে তাদের ছবিকেই ছুটিয়েছে তাই নয়, ছবিতে গন্ধ জুগিয়েছে, জাগিয়েছে স্পন্দন। তাকে অভিনন্দন জানাবার যোগ্য ভাষা আমার জানা নেই।

অভিনয় নিয়ে এ ছবিতে কিছু বলার নেই। কারণ কেউই অভিনয় করেনি। মুখের ভাষায় কথা বলেনি কেউ। সবাই কথা বলেছে চোখের ভাষায়। অপুকে অপু ছাড়া, দুর্গাকে দুর্গা ছাড়া, পিসীমাকে পিসীমা ছাড়া এই ছবিতে আর কিছু ভাবা যায়না। পিসীমার এই অভিনয়ের জন্তেই যেন চুনীবালা দেবী এত দিন মরেননি। আর পিসীমার এই অভিনয়ের জন্তেই তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক অভিনয় দেখেছি—‘দুর্গারে’ বলে তাঁর এই আর্তনাদ তাঁকে অভিনেতা হিসেবে মস্ত করল। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাচনভংগীতে প্রথমদিকে একটুখানি শহুরে টান ছিল। তাছাড়া সারা ছবিতে তিনি জীবন্ত। অপু আর দুর্গা তাদের ডাগর ডাগর চোখের তাকানোর, তাদের চলায়, তাদের হাসাহাসিতে যেন বইয়ের পাতা থেকে প্রাণ পেয়ে উঠে এসেছে বলে মনে হয়। মাহুঘের অভিনয়ের সংগে সংগে কুকুর, বেড়াল, পাখি, পোকা এমনকি মাছি পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছে এ-ছবিতে। যা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সংসারে ঘটে, যা কোনোদিনও বাংলাদেশের চিত্র-পরিচালকদের ঘটে তাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার মত ক্ষমতা ছিলনা ‘পথের পাঁচালী’ সেই তুচ্ছকেও সম্মান দিতে পেরেছে বলেই এত উচ্চ তার স্থান।

পরিচালক হিসেবে এই একটি ছবিতেই সত্যজিৎ রায় আজ তাঁর কীর্তির চেয়ে মহৎ হয়ে গেলেন। কিন্তু চিত্রনাট্যকার হিসেবেও তাঁর মৌলিকত্ব অবিস্মরণীয়। যখনই আমার দুর্গাকে মনে পড়ে—মনে পড়ে তার একটি মাত্র কথা—‘কেমন লাগছে রে?’—বন ভোজনের

সময় সে যা বলেছিল তার সইকে। অনাস্বাদিত যা কিছু—তার দিকে বাসনার চোখ তুলে চাওয়া এই হল দুর্গার চরিত্র। একটি ছোট্ট কথায় দুর্গার সেই চরিত্র যেন বাস্তব।

এ ছবি সম্পর্কে শেষ কথা বলার মত বুদ্ধি আমার নেই। সব কথা কেই বার বার বলতে ইচ্ছে করে। তবু একটা কথা না বলে পারছি না। ছায়াছবির সমালোচনার অবাস্তব হলেও বোলবো—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা দেশে কি গল্প, কি উপন্যাস, কি কবিতায় কি ছবিতে জীবন্ত দেশ আর দেশের মানুষকে তুলে ধরার যে ইচ্ছা এবং আন্দোলনের গুরু হয়েছিল এবং আজও চলেছে, এতদিন পরে পথের পাঁচালীতেই তা মূর্তি লাভ করল। পথের পাঁচালী ছবি সত্যজিৎবাবুর বাংলাদেশ আবিষ্কারের ছবি হিসেবেই ধরা হবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে হয়তো এই কথা বলেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

পূর্ণেন্দু গঙ্গী

॥ শারদীয় অগ্রণী ॥

পরবর্তী সংখ্যা অগ্রণী শারদীয় হিসাবে

মহালয়ার দিন আত্মপ্রকাশ করবে।

নবীন ও প্রবীণদের বাছাই করা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য-রচনা

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

॥ বিজ্ঞাপনদাতারা পত্রালাপ করুন ॥

॥ এজেন্টরা তৎপর হোন ॥

অগ্রণী কার্যালয়

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬



অঙ্গনা

অষ্টম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬২ ॥

যুক্তির প্রতিষ্ঠা বিষ্ণু দে

জীবনে আমরা চাই যুক্তির প্রতিষ্ঠা,
আনন্দিত স্বাধীন মনন,
তাই তো বিক্ষোভ, ক্রোধ, তাই ত্রাণনিষ্ঠা,
তাই চাই সকলের সম্পূর্ণ জীবন ।

যুক্তিনিষ্ঠ এ জীবনে একমাত্র প্রভু
প্রেম, শুধু প্রেম অধীশ্বর,
প্রেমেই জীবন হয় সুন্দর স্বপ্নসু,
নব জীবনে প্রেম আশার দীপ্তর ।

প্রেমেই তোমাকে তাই করেছি আপন,
মৃত্যু বটে দুঃখের মাঝে,
তবু তুমি শুকতারা ভোরের স্বপন,
সেই তুমি সন্ধ্যাতারা পরিণত মাঝে ।

তোমার প্রেমেই দেখি ইতিহাস সারা পৃথিবীর,
আমাদের প্রেম সর্বময়,
প্রেমের ওপাশে ঘৃণা, অসিধার শান্তির শিবির,
অসাম্যের প্রতিবাদ প্রেমেই দুর্জয় ॥



জন্মদিন

সত্যপ্রিয় ঘোষ

কাল ঋবনের জন্মদিন।

আজ সকালবেলা থেকেই তাই ভীষণভাবে পাঁচচারি শুরু করেছে সে বারান্দায়। উঃ, তাহলে আর একদিন বাকি? ভাবে সে অস্থির মনে। একদিনও না। আজ এই সকালটা, তারপরে দুপুর, সে তো ইস্কুলেই কেটে যাবে, তারপরে রাত্তির। ব্যস, ব্যস। রাত্তির ভোর হ'লো যেই অমনি তার জন্মদিন! রাত্তির ভোর হ'লো যেই, জন্মদিন এলো রে এলোই! বা, বা, ছাখো কবিতা বানিয়ে ফেললাম। সোনাটিটাকে একুনি গুনিয়ে দিই ডেকে? ওহো, সোনাটি তো ইস্কুলে চ'লে গেছে। আচ্ছা তাহ'লে চারতলার মিঁটাটাকে কলা দেখিয়ে আসি? বলেছিলো তোর জন্মদিন হবে না দেখিস। নিজের হয়নি তো তাই। হঁঃ, আমার জন্মদিন আবার হবে না! খেয়ে ফেলব না আমি তাহলে সবাইকে? এই তো একটু আগেও মা বললো বাবা বললো, ই্যা হবে হবে। মা তো আরো বললো, কী কী করা যায় ঋবনের জন্মদিনে? কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা যায়? আর যাকে করো করো, মিঁটাটাকে নেমন্তন্ন করা চাইই। স্বচক্ষে দেখুক ও, কত সাজে সে জন্মদিনে, কত কত জিনিস পায় সকলের কাছ থেকে, কেউ তাকে মারছে না, বকছে না, হাসিমুখে নতুন জামা নতুন প্যান্ট পরে, কপালে চন্দনের কঁোটা দিয়ে, গলায় একছড়া বেলফুলের মালা না ঝুলিয়ে—আঃ আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি ঘরের মধ্যে! কত খাওয়াদাওয়া হচ্ছে, কত আনন্দ হচ্ছে— কেন? ও মা, জানো না? আজ যে—জন্মদিন ঋবনের। ও মা, তাই নাকি? কই কই, ঋবন কই? আমি কিন্তু তাতে লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাচ্ছি না বারান্দায়। না, কিছুতেই না। কালকে আর লজ্জা কী, ভয় কী, হঁ কাল তো আমিই সব, আমাকেই সবাই দেখবে কেবল তাকিয়ে-তাকিয়ে। তা দেখুক। তোমাদেরও জন্মদিন হবে, ভয় নেই। শুধু মিঁটাটার হবে না। যেমন উল্লুক ও এক নম্বরের, তেমনি উপযুক্ত শাস্তি। কলা, কলা, এই কলা খাও। মা যদি বারণ না করতো তাহলে সে সত্যিসত্যিই এই বুড়ো আঙুলটা আচ্ছাসে নাচিয়ে আসতে পারত উল্লুকটার নাকের নিচে। কিন্তু মা-টা তো কিছু বুঝবে না। কেবল শিখেছে এটা করে না, ওটা বলে না। মিঁটাটার সংগে একদিন, একদিন কী, একঘণ্টা কি দুঘণ্টা, যদি খেলতে হ'তো তোমাকে কোনদিন—তো বুঝতে কী উল্লুক ওটা। তখন দেখতাম ওর সংগে তুমি ভাব রাখতে পারো কিনা। আসলে বুড়ো লোকেরা এমন বোকা। এমন কিছু না জেনে-শুনে এক-একটা কথা বলে। অবিশ্রি তাই ব'লে কাল জন্মদিনে সে কাকুরি ওপরে রাগ করবে না। মিঁটার ওপরও না। নইলে, কাল যে মিঁটা

তাকে কিল মারলো। টাটি মারলো, তারপরেও সে উল্টে উল্লুকটাকে ঘুষিয়ে দিলো না কেন, ওর মা বা দিদিদের কাছে নালিশ ক'রে দিলো না কেন। দিলে, যদি এমনি আড়ি হ'য়ে যেত যে কাল বাদে পরন্তু যে তার জন্মদিন সেই জন্মদিনেও আড়ি থেকে যেত তার একজনের সংগে। সোনাদি তো তাহলে কত কথা শোনাত তাকে, ঠোটমুখ উল্টে কেমন-ক'রে যে বলত সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে, ছাই! ছাই জন্মদিন তো! লোকের সংগে আড়ি দেয়া থাকে, তার আবার জন্মদিন না কচুদিন! উঃ, কী সময়মতোই মনে প'ড়ে গিয়েছিলো কথাটা, তাই তো ঘুষিটা তুলেও সে কষায়নি উল্লুকটার নাকটার ওপর। নাকটি ফাটিয়ে ছেড়ে দিভাম, জন্মদিন না থাকলে, হ্যা।

‘এই ঞ্জন! ঞ্জন! কী, ঘুরচিস কেন ওখানে? পড়াশুনো নেই, না?’

ডাকছে মা। আসচি, আসচি তো। এফুনি তো বসব পড়তে। ইচ্ছে হয় ঞ্জনের বগতে কথাটা চেষ্টিয়ে। কথার জবাব না দিলে আবার বড্ড চ'টে যায় মা-টা। কিন্তু, (পায়চারির বেগটা একটু কমেছিলো মায়ের গলা পেয়েই, কিন্তু কটি মুহূর্ত যেতে না যেতেই সেই বেগটা বাড়লো আবার) ভুলেই গেলো সে জবাবটা চেষ্টিয়ে দিতে। তবে মনে মনে সে সত্যিই ঠিক করে, এবারে সে পড়তে বসবে। ব'সে, কালকের পড়াটা সে ক'রে রাখবে। আজকেরটা যা হয়েছে হয়েছে, পড়া পারি ভালো নয়তো মারে কি দাঁড় করিয়ে রাখে তো রাখুক। কিন্তু তাই ব'লে কালকে তো আর মার খাওয়া চলে না। কাল যে জন্মদিন কিন্তু স্তরেরের কাছে তো আর বলা যাবে না সে কথা। স্তরেরাও তাই জানবে না। না জেনেও নেই, পড়া দিতে একটু ভুল হ'লেই হয়তো শাস্তি দিয়ে বসবে। সেইজন্তেই তো বলিয়েছিলো সে বাবার কাছে মাকে দিয়ে—কাল জন্মদিনের জন্তে ঞ্জন যে ইস্কুল যেতে চাচ্ছে না? কিন্তু বাবার সেই এক কথা, ইস্কুল কামাই ম'রে গেলেও চলবে না। বাবার কি কোনদিন জন্মদিন হয়নি?

‘কী হচ্ছে ঞ্জন, কানে কথা ঢুকচে না?’

দৌড়ে এসে এবার ঞ্জন বইপত্র বিছিয়ে বসে মেখেয়। আচ্ছা কালকের অঙ্কগুলো ক'বে রাখি রাখখাতায়? কী অঙ্ক দেবে সে তো জানাই। পরের দশটা ক'বে নিয়ে এসো, এই তো বলবে অঙ্কের স্তর। ওঃ হো, সে তো ভুলেই গিয়েছিলো কথাটা। যা বাব্বার মনে করিয়ে দেয়—না, না, দেন—তবু মনেই থাকে না কথাটা। গুরুজনদের কথা বলতে গেলে একটা দস্তান-ন দিতে হয়। বাবা বলছে না, বাবা বলছেন। কাকা এসেছে না, কাকা এসেছেন। হোঃ, সোনাদিটাও তাই কেবল বলবে, আমিও তো তোমার গুরুজন, আমি যদি ডাকি তো বলবি সোনাদি ডাকছেন। হ্যাঃ, তোকেও আবার! এখনো ব'লে ইস্কুলে যাস ফ্রক প'রে, তোকেও আবার দস্তান-ন দেবে কেউ! অবিশি কালকের কথা আলাদা। কাল জন্মদিন। মা বলেছেন জন্মদিনে কোন অস্তায় করতে নেই। ঝগড়া করতে নেই মারামারি করতে নেই। সকলে যাতে খুশি হয় তাই করতে হয় জন্মদিনে। তাই তুই যদি কালকে, জানি তো, প্রণাম একটা না নিয়ে ছাড়বি কি, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হাসিমুখ

ক'রেই দেব'ধন একটা প্রণাম ভোকে ঠুকে । আচ্ছা এটা তো রাখখাতা । এখানে একটু লিখলে হোষ কী । লিখি, একটু লিখি । রাখখাতার এককোণে লেখে ঋবন কুটিকুটি অক্ষরে : জন্মদিন । কাল আমার জন্মদিন । দশই শ্রাবণ আমার জন্মদিন । কাল আমি ন' বছর থেকে দশ বছরে পড়ব । তারপর ঋবন জন্মদিন শকটাই দাগা বুলিয়ে-বুলিয়ে মোটা ক'রে ভুলতে লাগলো ।

'কী, হচ্ছে কী তোর ব'সে-ব'সে ? শব্দ বেরুচ্ছে না একটু ?'

নাঃ, মা-টার আলায় কিছু যদি ঠিকমতো করা যাবে । সব মায়ের খুশিমতো করতে হবে । সব । মাঝে মাঝে এমন রাগ লাগে । কিন্তু মা-র শরীর ধারাপ । কাল মাথা ঘুরে প'ড়ে গিয়েছিলো । ডাক্তারবাবু বলেছে একদম শুরে থাকতে, কথাও না বলতে । কিন্তু তবু মা কাজ করছে রান্না করছে বাটনা বাটছে । আমি যদি কথা না শুনি তাহলে মা-র আরো রাগ হ'য়ে যাবে, তাহলে শরীর ধারাপ আরো বেশি হবে, বাবা বলেছে । কী করি, ইতিহাস আছে কাল, সেইটে মুখস্থ করি চেষ্টিয়ে-চেষ্টিয়ে ? ইতিহাস খুলে আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণ পড়তে শুরু করে সে চেষ্টিয়ে । কিন্তু মনের রাজ্যে তার আলেকজান্ডার তাঁর একটি পাও বাড়তে পারলেন না, সেখানে তখনো তার জন্মদিন জাল বুনতে লাগলো আপন মনে । জন্মদিনে কী নেবে তুমি ঋবন ? বাবা জিগ্যেস ক'রেছিলো । হ্যাঁ, করেছিলেন । সজ্জায় কিছু বলতে পারেনি সে । বাবা কতবার ক'রে জিগ্যেস করলেন । শেষে বাবা বললেন, আচ্ছা সেই ভালো, তুমি কিছু বোলো না, ছাখো কে কী দেয় । তুমি কিন্তু কিছু আশা করবে না, যে যা দেবে, হাসিমুখে তাই নেবে । নেব না কেন ? অবাক, ভাবে ঋবন । জন্মদিনে কেউ কিছু দিলে নেব না কেন ? মা অবিশ্রি বললেন একটা মজার কথা । বললেন ঋবন, জন্মদিনে সবাই তো কেবল পায়, তুমি সবাইকে দেবেও । কী দেবে কাকে ভেবে ছাখো । শুনে দাদা-দিদিরা তো কেমন মুচকে-মুচকে হাসতে লাগলো । আর সোনাদিটা তো হেঁড়ে গলায় চেষ্টিয়েই উঠলো, 'ওঃ, ও আবার কিছু দেবে কাউকে ? বন্ধ, এক নম্বরের বন্ধ ও ! ও যেদিন কাউকে কিছু দেবে সেদিন জলের ওপর দিয়ে যাহুধ হাঁটবে ।' কেন ? আমি কি কিছু দিইনে কাউকে কখনো ? দিইনে, দিইনে ? বন্ধ না, আমি বন্ধ না, আমি বন্ধ না—

'ও কী পড়ছিস তুই ঋবন ? অ্যা ? আন তো বইটা এদিকে, দেখি কোথায় আছে ওকথা'—মা বমকে উঠতেই চৈতন্য হয় ঋবনের যে সে একটু আগে চেষ্টিয়ে-চেষ্টিয়েই ব'লে ফেলেছে, 'বন্ধ না, আমি বন্ধ না, আমি বন্ধ না—'

ভয়ে-ভয়ে এবার ঋবন, আলেকজান্ডারের নাকটিকে মাত্র, ঢুকতে দিলে তার মনের মধ্যে । চেষ্টাতে লাগলো ইতিহাসের অক্ষরগুলো ঋবনের শিরা-কোলা গলা আর মুখ দিয়ে । আর জন্মদিন বলতে লাগলো মনে-মনে, বাবা যা বলেছেন তাই করতে হবে । কয়েকটা ছবি আঁকতে হবে আর কয়েকটা কবিতা লিখতে হবে । পাঁচতলার কুমাদি কী সুন্দর ছবি আঁকে । আমি যদি অমনি আঁকতে পারতাম । হঁস, তাহলে ঐকে-ঐকে যাকে-যাকে

দিতাম তারা যে কী খুশি হ'ত। আর মেজদার মতো যদি কবিতা লিখতে পারতাম।
আঃ, তাহলে কী মজাই হ'ত। কাউকে দিতাম ছবি, কাউকে কবিতা। সোনাদিটা
হাঁ-কয়ে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। যক্ষ বলা বেগিয়ে যেত। ওকে কিন্তু আমি ছবিও
দিতাম না কবিতাও দিতাম না। তবে দিতাম—যদি ও যুধ কাঁচুমাচু ক'রে বলত, কী সুন্দর
ছবি আঁকিস তুই ঞ্চবন, কী সুন্দর তুই কবিতা লিখিস, আমাকে দে না ভাই একটা, আমি
আমার ইস্কুলের বন্ধুদের দেখাব, দে না ভাই একটা, দে না। হ্যাঁ, তাহলে অবিশ্রি সে
সোনাদির দিকেও একটু যুধ ভুলে তাকানোর সময় পাবে।

‘এখন একটু অঙ্ক কষি মা?’—টেঁচিয়ে জিগ্যেস করে ঞ্চবন।

‘কষ’—বললেন মা।

অঙ্কের খাতা খুললো ঞ্চবন, কিন্তু কখন যে আবার রাফখাতা খুলে তার মধ্য থেকে
পাতা খসিয়ে সে তার মধ্যে একটার পর একটা ছবি আঁকতে লেগে গেছে, সে তার একদম
হাঁস ছিলো না।

হাঁস হয় যখন মা পাশে এসে, ব্যাপার দেখে, বলে ওঠেন, ‘এই তোমার অঙ্ক কষা
হচ্ছে?’

ভয়ে-ভয়ে হাসতে চেষ্টা করে ঞ্চবন।

মা সেই হাসি দেখলেন, ছবিগুলিও দেখলেন উল্টে পাল্টে, তারপর বললেন
রাগতভাবেই, ‘যাও, এবার নেয়ে এসো, খেয়েদেয়ে ইস্কুলে গিয়ে জগৎ উদ্ধার করো।’

তিড়িং-তিড়িং লাফাতে-লাফাতে ঞ্চবন সেবে ফেলে সব। ছবিগুলো বোধ হয় তার
ভালো হয়েছে খুব, তাই মা বকলেন না তাকে। রাগ-রাগ দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু ও-রাগ
ঞবন খুব বোঝে!

‘তোমার আজ হ'লো কী রে ঞ্চবন? ছাতে খেলতে না গিয়ে এখানে একা-একা কী
এত পায়চারি করছিস? কী এত ভাবনায় পড়লি রে, অ্যা!’

মা-র কথায় ঞ্চবন একটু লজ্জা পায়, পায়চারি বন্ধ ক'রে রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে অন্ত-
আকাশের বিচিত্র মেঘকলার আশ্চর্য রঙবদলের দিকে তাকিয়ে থাকে সে এবার একদৃষ্টে।

মা ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে, পালে হাত দিয়ে, চ'লে যান ঘরের ভেতর।

আর ছেলে তখন আপনমনে ঠোঁট নাড়ছে আর বলছে মনে মনে ঐ মেঘের দিকে
তাকিয়ে, জন্মদিন! জন্মদিন! মেঘগুলো যে হ'লো রঙীন! কবিতা? কবিতা বানিয়ে
ফেললাম নাকি? সকালবেলাও যেন কী একটা বানিয়েছিলাম? একটু ভালো লে।
নাঃ, সেটা আর মনে পড়বে না এখন। না পড়ুক। এই কবিতাটা আরো ভালো হয়েছে।
‘জন্মদিন, জন্মদিন! মেঘগুলো যে হ'লো রঙীন!’ আর একটু বাড়াতে পারিনে আমি?
মেজদা কী বড়ো-বড়ো কবিতা বানাতে পারে। ‘এখন বিষ্টি যদি খু-ব নামে, তবে ঠিনঠিনা-
ঠিন বাকবে ঠিন!’ এই তো, এই তো! আনন্দে, আবেগে, ছোট্ট বুকটা বুঝি তার কেটে

যাবে। ‘ওরে ব্যাঙ নাচে, ব্যাঙ নাচে, তাজিনাধিন ? ধিনাধিন ধিনাধিন, হে—ই, ধিনাধিন ! ওরে জন্মদিন ! জন্মদিন !’ ধেইধেই নাচতেই শুরু ক’রে দেয় সে। আঃ, এত বড়ো, এত বড়ো কবিতা বানিয়ে ফেললাম আমি ? দেখি তো, মনে আছে কিনা ? মনে-মনে আওড়ায় সে মেলানো কথাগুলো। একটুও আটকায় না কোথাও। আর তাইতে কী উল্লাসই তার জাগলো সমস্ত চৈতন্যে। আমার কবিতা—আমারই মনে আছে সবটা ! আচ্ছা, আর একবার মনে করি তো। আছে, আছে। ‘মা, ও মা !’—লাফ দিয়ে সে ঘরে ঢুকলো কবিতাটা শোনাতে মাকে। নাঃ, তার চাইতে আগে মিণ্টাটাকে গুলিয়ে আসি। কবিতা শোনাতে গেলে নিশ্চয় ঝগড়া হবে না তার কারো সংগে, তাই আড়িও হবে না, তাহলে আর ভয় কী। ‘আমি একটু ছাতে যাই মা’—ব’লে পাখীর মতো ডানা বিস্তার ক’রে লাফ দিয়ে সে ঘর থেকে বেরুতে যেতেই, পেছন থেকে সাপটে ধরলেন মা একটি ডানা। কোন কথা না শুনে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন তাকে পড়ার জায়গায়, বসিয়ে দিলেন পড়তে।

অভিমান, মনে-মনে কান্নায়, ভারী হ’য়ে আসে তার বুকটা। ছোট্ট ঐ বুকটির মধ্যে কেমন ক’রে যেন মস্ত এক সমুদ্রই পড়েছে ঢুকে। ঢুকে প’ড়েই তো আর থাকতে পারছে না সেখানে। ঠেলেঠেলে, ওর বুকটাকে দলাইমালাই পিষে ফেলে, ঝপাঝপা ক’রে আছড়ে প’ড়ে, প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মেঝে মেঝে যে বেরিয়ে আসতে চাইছে এখন। কী এখন করে সে। . জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে ভারী চোখে, রঙীন নানা রঙের মেঘগুলি সব গেলো কই ? নীল, সব নীল হ’য়ে গেছে এখন। ঐ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কী কান্না পায় তার। কিন্তু সোনাটিটা দেখছে তাকে। উঠে বাইরে চ’লে যাই ? বারান্দায় ? কী সুন্দর বাজনা বাজছে, কোথায় ? সোনাদিকে জিগ্যেস করব ? কী বাজনা রে ওটা সোনাদি ? বাঁশি না সানাই ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝলাম ওটা সানাই। ভাগ্যিস জিগ্যেস করিনি। বড়ো হ’য়ে আমি যদি অমনি সানাই বাজাতে শিখি ? কিন্তু বড়ো হ’লেই তো সানাই বাজানো যায় না ? কই, দাদারা তো বাজায় না। নীল আকাশ আরো ভালো। আরো ভালো। আরো সুন্দর। আমি নীল আকাশে চ’লে যাবো একদিন, দেখো। সেদিন আমাকে কিছু বলতে এসো ! দেখতেই পাবে না আমাকে। এই যে সোনাদিটা ব’সে ব’সে খোঁচাচ্ছে তাকে, বলছে যা-তা, সেদিন যদি ও কেঁদে-কেঁদে ম’রে যায় তাহ’লেও সে একটিও কথা বলবে না ওর সংগে।

মা এসে দাঁড়াতেই, বাধ্য হ’য়ে ঝবন শুরু করে চোঁচাতে। কালকে যে ইংরেজি কবিতাটা পড়া আছে সেইটিই মুখস্থ শুরু করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীত উচ্চ গলা তার ঝিমিয়ে আসে, খাদে নামতে নামতে পড়লো পিয়ে সেই অস্থির বিবশ সমুদ্রে আবার। চেঁউএর ঝাপ্টায় ঝাপ্টায় ছত্রাকার হ’য়ে ছড়িয়ে যায় তার সমস্ত চৈতন্য হাজারখানা হ’য়ে। ছলতে ছলতে, ভাসতে ভাসতে, ভাবে সে রাস্তিরটা কাটলেই তো তার জন্মদিন ! রাস্তিরের অন্ধকার যেই কেটে গেলো, সূর্য যেই উঠলো—কিন্তু মা যে বলেছে সূর্য ওঠার আগেই দিন শুরু হয়, তাহলে ? কী ক’রে বুঝবে সে তাহলে কখন থেকে শুরু হ’লো তার জন্মদিন ?

পাঁচটা, সবাই তো বলে পাঁচটার সময় উঠলে তবে গিয়ে শরীর ভালো থাকে, মোটা হয়। তাহ'লে পাঁচটা থেকেই বোধ হয় দিন শুরু? আমি তাহ'লে কাল পাঁচটারই উঠব। কী ক'রে? সুন্দরকাকু বলছে, রাত্রে শোবার আগে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে ছায়াকে বলতে হয় মনে-মনে তিনবার : ছায়া! ও ছায়া! আমাকে তুলে দিও তো অতটার সময়। বললে, ঠিক তুলে দেবে ছায়া ষটার বলবে তুমি, ঠিক ততটার সময়। এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হবে না। কী মজা, না? সেদিন সোনাদি বললো, হ্যাঁ! এটা ঠিক। ও ছায়াকে বলোছলো, আমাকে ঠিক ছ'টার সময় তুলে দিও তো ছায়া। সেদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলো, ঠিক ছ'টার ভেঙে গেছে তার ঘুম। বেশ বেশ। আজ আমি শোবার আগে বলব : ও ছায়া, কাল যে আমার জন্মদিন, কাল আমাকে ঠিক পাঁচটার তুলে দিও কিন্তু। তুললেই সর্বনাশ।

সোনাদি পাঁচটা নাশি করছে, 'ও মা, ফ্রবন ঘুমোচ্ছে কিন্তু না-খেয়েই।' না, আমি ঘুমোচ্ছি না। বিরক্তিতে, বিতৃষ্ণায়, কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে ফ্রবনের। কেন সকলে মিলে তাকে এত খোঁচাচ্ছে। কেন তাকে একটু চুপ ক'রে ভাবতে দেবে না কেউ। মা ধমকাচ্ছে। ধমকাক। এফুনি এসে হয়তো মারবে। মারুক। তবু আমি একটি কথাও বলব না। কাল জন্মদিন আনুক। তখন বুঝবে মজা। তখন তো আমার হাসিমুখ দেখবার জন্যে সবাই মিলে তাকিয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে। তখন আমি একটুও হাসব না। মুখ কালি ক'রে থাকব, হাঁড়িপানা ক'রে রাখব। বুঝবে তখন। ওকি, বিষ্টি নামলো নাকি? আঃ, চোখ খুলতে যে ইচ্ছে করছে না। হোক, বিষ্টি হোক। বিষ্টি খুব ভালো। খুব ভালো। জোরে নামলেও ভালো আস্তেও ভালো।

টুপ ক'রে ডুবে গেলো ফ্রবন ঘুমের অর্ধেক জলে।

তারপরে যে তাকে নিয়ে টানাটানি হ'লো তাকে খাওয়ানোর জন্যে, জোর ক'রে বসিয়ে কোনরকমে ছুটি খাইয়ে শুইয়ে দেয়া হ'লো তাকে তার বিছানায় সে আর কিছুই সে টের পেলেনা, বলতে গেল।

জন্মদিনের সীমাহারা মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে সে তখন সেই আচ্ছন্ন ঘুমের নৌকায়। নিজের ছায়াটি বুঝি তার হাল ধ'রে রইলো সেই নৌকোর, অতল্ল ভেগে রইলো সেই ছায়া, ঠিক পাঁচটার সময় যে তাকে পৌঁছে দিতে হবে ফ্রবনকে সেই সমুদ্রের ডাঙায়। সেখানে যে সব নতুন পাখী, নতুন সব রঙ আর নতুন একটা সূর্য অপেক্ষায় থাকবে ফ্রবনের ঘুম ভাঙার জন্যে।

গোধূলির রঙ

মিহির মুখোপাধ্যায়

দুপুরের স্বর্ষ আরো উত্তাপ ছড়ায়। সামনের লাল-সুড়কী-ঢাল। কাঁচা রাস্তাটার মানুষের আনাগোনা কমে আসে। পথের পাশে শিরীষের ছায়ায় বুড়ো ভিথিরিটা অনেকক্ষণ হ'ল ঘুমিয়ে রয়েছে। এপাশে ছোট্ট একতলা বাড়িটার বারান্দায় মায়ী দেবী দাঁড়িয়ে থাকেন, দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ-না দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামে, তারপর বিকেল ছেড়ে সন্ধ্যা। কখনো খোলা জানালার পাশে লোহার গরাদে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকেন। কখনো রোয়াকে কিংবা পথের উপর নেমে আসা সিঁড়ির ধাপে। গভীর কালো চোখে কেমন যেন অসুস্থ দৃষ্টি, ইন্দ্রনীল মণিছটো কেমন বিবর্ণ—ধোঁয়াটে। যৌবনের প্রাস্তসীমায় এসেও মায়ী দেবীর দেহমৌর্খবে শোভা, সজ্জম আর শুভ্রতার সমারোহ। লাল-পাড় শাড়ি, কপালে-সিঁথিতে সেই রঙ সিঁহুরের ছোঁয়া। গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, ডান হাতখানি ঝাঁচলের আড়ালে ঢাকা। অনেক দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হয়তো আচমকা ডাক দেন—“এই খোকা! এদিক এসোত বাছা!” রাস্তার ভবঘুরে ভিথিরী ছেলেটা ভীকু-পায়ে এগিয়ে আসে। বোদে-পোড়া চেহারা, ময়লা হাফপ্যান্ট, মাথায় ধুলোভর্তি একরাশ কটা চুল। সম্মুখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মায়ী দেবী মুখ ফিরিয়ে ডাক দেন—“লক্ষণ! দুধ নিয়ে আস।” পুরনো চাকর গ্রাম-ভর্তি দুধ আনে। মায়ী দেবী অমুনয়ের সুরে বলেন—“খাও বাবা! এই দুধটুকু খেয়ে ফেলো।”

ছেলেটির মুখ-চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, হাতের আঙ্গুলগুলো নাড়া-চাড়া করেন। নতুন ছেলেটি হয়তো অবাক হয়ে যায়। ভয়ভয় চোখে তাকায়—সংকোচে ঠোট কাঁপে, হাত কাঁপে। পুরনো পরিচিত ছেলেরা কিন্তু তেমন নয়। দুধ খাওয়ার পরেও পরসী চায়, জামা-কাপড়ের ভুলে আকার ধরে। হাসিমুখে দেন তিনি পরসী, কাপড়, জামা, মুঠো মুঠো চাল। কিন্তু কখনো হঠাৎ রেগে যান, হঠাৎ চোঁচিয়ে ওঠেন—“পালা, পালা সব এখান থেকে, যত সব চোর, মিথ্যাবাদীর দল!”—হাঁফাতে থাকেন মায়ী দেবী, ঘামে-ভেজা ফর্সা মুখে সিঁহুর ছড়িয়ে যায়। জোরে জোরে শ্বাস টানেন। কেমন অস্থির অস্থির মনে হয়।

তারপর বিকেলের ছায়া নামে। অধ্যাপক স্বামী বাড়ি ফেরেন।

কলেজ ছুটির পরে আর একমুহূর্ত দেবী করেন না সুদেববাবু। কোন ক্লাব বা আড্ডার আকর্ষণ তার নেই। সিঁড়ির মুখেই মায়ী দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

—“এখনো দাঁড়িয়ে আছ!”—সুদেববাবু স্নান-ঠোটে হাসেন—“সারা দুপুর বুঝি এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলে? চলো এখন ভেতরে চলো।”

কোন উত্তর নেই। স্বামীর পেছনে পেছনে নিঃশব্দে ঘরে আসেন। জামা-কাপড় বদলে ইজি-চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসেন সুদেববাবু। মুখোমুখি চেয়ারে মায়া দেবী। পশমের গুটি কোলে নিয়ে বসেন। কখনো উল বোনেন। কখনো ফাঁকা দৃষ্টি ভুলে ধরেন। খোলা জানালায় ফিকে নীল পর্দাটার পাশ দিয়ে দেখা যায় আরো দূরের আরো গভীর নীল অপরাহ্নের আকাশ। লক্ষণ একসময় চা-জলখাবার দিয়ে যায়।

এক কোণে ভে-পায়াল টেবিলের ওপর কুসদানীটায় গতদিনের বাসি রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ওখারে সেকুকের ওপর পাথরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিটার পাশে ছোটো ধূপকাঠি জ্বল। ঠিক উপরেই দেয়ালের গায়ে বিলিতি ক্যালেন্ডারের ছবি।

সুদেববাবু ডাকেন—“মায়া! একটা গান গাও না, তোমার সেই প্রিয় গানটি গাও—
“ঐ আলোক মাতাল স্বর্গ-মন্ডার মহাঙ্গন।”

—“ভুলে গেছি।”—নরম নিরুত্তাপ জবাব।

মায়া দেবী ভুলে গেছেন। এককালের স্মৃতি গায়িকা মায়া দেবী আজ গানের অগৎ থেকে নির্বাসিতা। আশ্চর্য।

সুদেববাবু একটু হাসলেন—অত্যন্ত করুণ হাসি, সিগারেট ধরালেন—হাকা ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে বাতাসে মিশে যায়। সেরিকে চোখ রেখে আবার ধীরে ধীরে বল্লেন—“মায়া! তুমি কি এমনভাবেই চুপ করে বসে থাকবে?”

আর কোনো জবাব নেই। হয়তো এমনভাবেই চুপ করে বসে থাকবেন মায়া দেবী। প্রতিটি হৃদয়-বিকেল সন্ধ্যার অন্তহীন অপেক্ষার দিনগুলি গড়িয়ে যাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও কথা বলবেন না। প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। স্বামী-সংসার পরিচিত পরিবেশ কেমন মিথ্যে আর ফাঁকি মনে হয়। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালায় পর্দাটা লুটোপুটি খায়। সিগারেটের ধোঁয়া এলোমেলো হয়ে যায়—বিলিতি ক্যালেন্ডারের পাতাগুলি ফরফর করে উড়তে থাকে। দিন-মাস-বছরের পাতাগুলিও এমনি উড়ে যায়। সুদেববাবুর চোখের সামনে সেই পুরনোপাতাগুলি যেন অস্পষ্ট রঙের আভাসে ভেসে ওঠে।

আঠারো বছর আগের কথা। ছোট্ট মফস্বল শহরের কলেজ। পুরনো কলেজ। নাম-ডাক আছে। শহরের সীমানা ছেড়ে কিছুটা বাইরের দিকে—বেশ নির্জন পরিবেশ।

ঘন দেবদারু পাতার ফাঁকে ইট-লাল রঙের বাড়ি। মেয়েদের কমন-রুম পশ্চিমে। ছোট পুকুরের পাড় ঘেষে লাল টালীছাওয়া বাংলা প্যাটার্নের ঘর। পেছনের কাঠের বারান্দাটা ঠিক জলের ওপর। কাঠের রেলিং ঘেষে বেতের চেয়ারে বসে থাকে মায়া। বসে বসে বই পড়ে। কানের বুকে গালের ওপর গড়িয়ে নামে, গলায় সরু হার চিক্‌চিক্‌ করে। সন্ডনে-সবুজ শাড়ীর আঁচলটা ডান হাতখানি সযত্নে সতর্কে ঢেকে রাখে।

বি-এ ক্লাসের ছাত্রী মায়া। আঠারোর ঘর ছেড়ে সবে উনিশের চৌকাঠে পা দিয়েছে। নিটোল স্বাস্থ্য, ফর্সা তলতলে মুখশ্রী। ছোট্ট কপালের আশে-পাশে কয়েক

গোছা আলগাচুল। পানকোড়ি-পাখার মত কালো লম্বাবেনীটা চলার ছন্দে পিঠের ওপর দোলে।

পুকুরের একপাশে গাঢ় নীল বংএর পর্দা-ঘেরা মেয়েদের ব্যাড্‌মিন্টন খেলার জায়গা। যেখানে কলকল কথা আর অকারণ হাসির ঢেউ উপচে ওঠে। একহাত খেলার পর সোজা কমন-ক্রমে চলে আসে শিপ্রা। মাথাকে কোথায় পাওয়া যাবে ঠিক জানা আছে তার। কাছাকাছি এসে বলে—“আচ্ছা মায়া! তুই এরকম একা একা বসে থাকিস কেন? চল একটু ঘুরে আসি আর না হয় আমাদের খেলা দেখবি চল—ওঠ ওঠ।”

মায়া চোখ তোলে। পাতার ফাঁকে আঙুল ডুবিয়ে বইটা বন্ধ করে, তারপর শিপ্রার বাম-পিছল মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—“তুই যে ঘেমে নেয়ে উঠেছিস—মুখটা মুছে ফ্যান।”

—“আচ্ছা সে না হয় হ’ল”—শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে শিপ্রা বলে—“কিন্তু তুই এরকম হয়েছিস কেন? কারো সঙ্গে মিশিস না, কথা বলিস না।”

—“সব জেনে শুনে একথা বলিস কি করে।”—একটু ধেমে ধেমে জবাব দেয় মায়া।

—“আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। তোর মত ওরকম কত লোকের হয়। ওই নিয়েই তো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কাজকর্ম করে—অসুখ-বিসুখ তো সবমাসুখেরই আছে—কিন্তু তাই বলে তোর মত কেউ মনমরা হয়ে বসে থাকে না।”—শিপ্রার কথায় ঝাঁজ আছে, বিরক্তি আর ক্রোধ। কিছু সময় আনমনে বইয়ের পাতা ওল্টায়। তারপর দূরে কলেজ-গেটের কাছে দেবদারু গাছটার গায়ে অলস দৃষ্টি এলিয়ে দেয় মায়া, যেখানে ঘনসবুজের ওপর পড়ন্ত বেলার রোদ আশ্চর্য সুন্দর আর স্নিগ্ধ হয়েছিল। শেষে ধীরে ধীরে বলে—“কেউ আমাকে দেখে মনে মনে বেয়া পাবে কিংবা ছোয়া বাঁচিয়ে দূরে সরে যাবে, এটা আমার কাছে অসহ্য লাগে। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করি। আগেও তোকে বলেছি আজো বলছি আমাকে আর এরকম অসুযোগ করিস না শিপ্রা।” আর অসুযোগ করেনি শিপ্রা। নিজে এসে গল্প করেছে, হাসি ঠাট্টার ছতোয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু অল্প মেয়েদের ভিড়ে আনন্দআবেষ্টনীর মধ্যে তাকে আর নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু নিজেকে আলাদা করে রাখা, লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেও সবসময় বুঝি সকল হওয়া যায় না। কাছাকাছি মানুষের কোঁতুহল তার আলাদা হয়ে থাকার বিশিষ্টতাকে বাঁকা চাউনি আর বিজ্রপের হাসি দিয়ে বারবার আঘাত করে। সোজাসুজি অপমানিত না হলেও লজ্জা আর সংকোচের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

সেদিন ইতিহাসের ক্লাস। অধ্যাপক সুদেব সান্যাল এ-কলেজে নতুন মানুষ। সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমশ্রেণীর ছাপ নিয়ে এখানে এই শহরে এসেছেন অল্পদিন। কিন্তু এই অল্পদিনেই সুনাম কিনেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। চমৎকার পড়ান তিনি। সহজ কথায় বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিটি আরো চমৎকার।

সেদিন ক্লাসে নোট দিচ্ছিলেন। গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ। ছেলেমেয়েরা নোট লিখে নিচ্ছে। সমস্ত ক্লাস যেন ধমকে ধেমে বোবা হয়ে আছে—শুধু মাথার ওপরে

ইলেকট্রিক পাখার শব্দ শব্দ । হঠাৎ সুদেববাবুর নজরে এল, একটি মেয়ে কিছুই লিখছে না, আঁচলে হাত ঢেকে চুপ করে বসে আছে । মাঝে মাঝে পাশের মেয়েটির খাতা দেখছে ।

—“ওকি ! তুমি কিছু লিখছ না কেন ?”—সুদেববাবু প্রশ্ন করলেন । নোট লেখা বন্ধ হল । এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ে যাবার মত সমস্ত ক্লাশটা গুনগুনিরে উঠল । ছেলে মেয়েদের চাপা কিসুফিসানি, সকলেই চোখ কেরালো সুদেববাবুর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মায়া । মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল । শুধু মেয়েদের ক্লাশ হলে হয়তো এতটা লজ্জার কথা কিছু ছিল না । কিন্তু কো-এডুকেশন কলেজ । ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে ক্লাশ । ওধারের বেকিগুলোয় ধুতি-পাঞ্জাবী সার্ট-পায়জামার দল ।

চাপা কথা আর চোরা চাউনীর ভিড় । এখানে আশে-পাশে নানা রঙের শাড়ি-ব্লাউজ —হয়তো তাদেরও ঠোঁটে ঠোঁটে বিজ্রপের ঝাঁক হাসি । একটি কথাও বলতে পারল না । সে চোখ তুলে তাকাতেও পারল না । কপালে কঁোটা কঁোটা ঘাম ।

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । ক্রমাল দিয়ে চশমার কাচ ঘষতে ঘষতে সুদেববাবু বললেন —“যদি কোনো জায়গা বুঝতে না পার সোজাসুজি আমাকে বলবে—বারবার বুঝিয়ে দেব, একথা আমি তো আগেও তোমাদের বলেছি । সে থাক এখন মাঝখান থেকে লিখে নিতে তোমার অনুবিধা হবে নিশ্চয় । তুমি ক্লাশ ছুটির পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো ।”

ক্লাশ ছুটির পরে অধ্যাপকদের বিশ্রাম-ঘরের সামনে আবার দেখা হ’ল । —“এই যে তুমি এসেছ ।”—সুদেববাবু পকেট হাতড়ে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বার করে বললেন—“আজ ক্লাশে যা লিখিয়ে দিলাম সবটাই আছে এর মধ্যে, এটা বাড়ি নিয়ে যাও, টুকে রেখে কাল আমাকে ফেরৎ দিও ।”

তার মুখের দিকে তাকাল মায়া, তারপর মাটিতে চোখ নামাল, শেষে আবার মুখোমুখি । কি যেন ভাবল সে । কিছু সংকোচ আর লজ্জা । একটু অবাক হলেন সুদেববাবু—“কই নাও ।”

সমস্ত কুঠা ছেড়ে আঁচলের আড়াল থেকে ডানহাতখানি ধীরে ধীরে এগিয়ে দিল মায়া ।

সুদেববাবু দেখলেন, স্পষ্টই দেখতে পেলেন । হাতের আঙুলে, উল্টোপিঠে কজির কাছে শাদাশাদা দাগ । ফুল-হাতা ব্লাউজে ঢাকা পড়েছে বাকীটুকু । চিন্তে ভুল হলনা তাঁর—শাদাশাদা খেতী-চিহ্ন । এতক্ষণে মেয়েটির সংকোচ আর লজ্জার কারণ বোঝা গেল ।

কেমন যেম বেদনাবোধ করলেন তিনি । একটু বিবর্ণ হল বুকি তার মুখের চেহারা । এমন স্ত্রী মেয়েটি, পান-পাতার মত মুখের ডোল, কেমন টানা টানা চোখ আর যেন তুলি ঝাঁক ভুরু ।

চলে যাবার মুখে আবার বললেন—“কাল বিকেলে তুমি আমার বাড়ি এসো, আমার বাড়ি তো এই কলেজের কাছেই, ওধারের রাস্তায় চেনো বোধ হয় ।” মায়া বাড়ি হেলাল ।

তারপর সুদেববাবুর বাসায় । কলেজের কাছেই ওধারের রাস্তায় সেই ছোট্ট একতলা বাড়িটা । অনেকদিন এখানে এসেছে মায়া ।

অনেক সোনালীসজ্জা আর ধূসরগোধূলির মুহূর্ত কেটেছে এ-বাড়ির বারান্দায়, সুদেববাবুর ঘরে কিংবা তার ছোট বোন সুচিত্রার সঙ্গে ছাদের আলশের হেলান দিয়ে গল্প কাটানো সময়।

শিপ্রাও এসেছে মাঝে মাঝে। সংসারে শুধু সুদেববাবুর বিধবা মা আর ছোট বোন। আশ্চর্য মানুষ তারা। মায়াকে দেখে ঘেঁরা পায়নি, ছোঁরা বাঁচিয়ে দূরে সরে যাননি। তাঁদের মুখে ঝাঁক কথো শোনেনি কোনোদিন, বিজ্ঞপের হাসিও দেখেনি কেউ। ভারী অগোছাল মানুষ সুদেববাবু। সমস্ত ঘর জুড়ে নানাধরনের বই-খাতা পুরনো পত্র-পত্রিকার ভিড়।

সুচিত্রা হেসে হেসে বলতো—“দাদার বই পড়ার সখ আছে ঘোল আনা কিন্তু গুছিয়ে রাখতে জানে না—এমন নোংরা করে রাখে।”

—“বই পড়ার কাজ হল আমার আর গুছিয়ে রাখার কাজ হল তোর—সুদেববাবুর জবাব শুনে ঠোট উন্টে সুচিত্রা বলতো—“বয়ে গেছে, ওই নোংরা আমি ষাটতে পারবো না।”

ভাই-বোনের ঝগড়া শুনে হেসেছে মায়। কখনো একা-একা অগোছাল ঘরটাতে ঢুকে বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু সান্নিধ্যে গুছিয়ে বেখে যাবার ইচ্ছে হলেও নিজেকে সামলে নিয়েছে। প্রথমআলাপের লজ্জা কেটে গেছে যদিও, কিন্তু ছোঁয়াছুয়ির সংকোচ যাননি। কেউ যদি কিছু ভাবে। তার হাতে, হাতের আঙুলে যে কুৎসিৎ শাদা শাদা দাগ। বীভৎস ব্যাধি।

সুদেববাবু পড়াতেন। মাঝে মাঝে নোট লিখিয়ে দিতেন। মেজের ওপর মাহুর বিছিয়ে বসতে হত। কারণ একটি মাত্র টেবিলে হাত রাখারো জায়গা নেই। খাটের ওপর বিছানার পাশেও গাদা গাদা বই। সরল সোজা তিলেঢালা স্বভাবের মানুষ সুদেববাবু। এলোমেলো কোঁকড়া চুল, জামাকাপড়েও বিশেষ যত্ন নেই। কথা-বার্তার ধরনও অদ্ভুত। পড়াচ্ছেন তো পড়িয়েই যাচ্ছেন, চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সেদিকে হাঁস নেই।

—“ওকি আপনার চা যে জল হয়ে গেল, খেয়ে নিন্।”—মায়ার কথার চমক ভাঙে।

—“ও, ই্যা ই্যা, এই যে খাচ্ছি।”—কাপটা ভুলে নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করেন—“আচ্ছা আমাকে তোমার কেমন লাগে?”

মায়ার কানদুটো গরম হয়ে ওঠে—নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। একচুমুকে কাপটা শেষ করে নাশিরে রাখতে রাখতে আবার বলেন—“মানে আমার পড়ানোটা কেমন মনে হয়।”

যাক বাঁচা গেল। ধীরে ধীরে দম ফেলে মায়, একটু হেসে জবাব দেয়—“কেন আপনি তো ভালই পড়ান, কলেজে তো খুব সুখ্যাতি করে সবাই।”

—“ভাই নাকি।”—একটু হাসেন সুদেববাবু, তারপর আবার ইতিহাসের পাতার পাতার হারিয়ে যান—বাইরের সমাজ সংসার সম্বন্ধে আর খেয়াল থাকে না।

প্রায় একবছর ঘুরে এল। মায়ার কোর্স ইয়ার শুরু হয়েছে। আলাপ-আলোচনা আর আসা-যাওয়ার ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়েছে। বাপ-মা, ভাই-বোন নিজের সংসার সীমার বাইরে আর কারো সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে নেশেনি মায়—সুদেববাবুর মা আর বোন তাকে আপন করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সুচিত্রার বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী উকিল। আর এক

পাড়ায় স্বপ্ন-বাড়ি। মাঝে মাঝে সুযোগসুবিধে মত মায়ের কাছে আসে। দাদাকে বিয়ে দেবার জন্যে খোঁচাখুঁচি করে। মায়েরও আগ্রহ খুব। কিন্তু ছেলের তেমন উৎসাহ ছিল না। তারপর এক সময় প্রায় চট করে বিয়ের দিকে মন গেল সুদেববাবুর।

ভেবে দেখলেন, এ-সংসারে এখন মা বড় একলাটি হয়ে গেছেন। তিনি যখন কসেজে চলে যান, একা-একা এই বাড়িতে থাকতে হয় তাঁর। সংসারের সমস্ত কাজ একাই করেন। তাছাড়া আর একটা ভাবনাও কিছুদিন ধরে ভাবিয়ে তুলেছিল সুদেববাবুকে। আত্মভোলা ইতিহাস-রাজ্যের মানুষ কি করে যে মন-দেয়া-নেয়ার অপরিচিত জগতে এসে পড়েছিলেন—নিজেও ঠিক খেয়াল করতে পারেননি। খোলাখুলিভাবেই মায়ের কাছে, বোনের কাছে বললেন সব কথা, পরামর্শ করলেন তাঁদের সঙ্গে। তারপর একদিন, সেদিনের তারিখটা ভুলে গেছেন সুদেববাবু, মনে আছে সময়টা শ্রাবণ-শেষ। বোধ হয় শনিবার।

বিকেসের দিকে গেলেন হরিপদবাবুর বাসায়। মায়ার বাবা স্থল-মাষ্টার হরিপদ নিয়োগী নিরীহ মানুষ। রুগা স্ত্রী আর পাঁচ-ছটি সন্তানের সংসারভারে কিছুটা বিব্রত। সুদেববাবুর পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। মায়ার মুখে অনেক আগেই তাঁর প্রশংসা শুনেছেন। একথা-সেকথার পর একটু কুণ্ঠাসঙ্গেই মায়ের জবানিতে বিয়ের প্রস্তাব করলেন সুদেববাবু। বাড়িতে অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই বলেই তার নিজের আসতে হ'ল—একথাও বলেছিলেন। অবাক-আনন্দে হরিপদবাবু প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলেন। সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও যে-মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এসে এসে ফিরে যায়—ডানহাতে ওই খেতী-চিহ্ন—শাদা শাদা দাগের জন্যে। তার এমন অস্বাভাবিক সৌভাগ্য-সংবাদে একজন সাধারণ স্থল মাষ্টারের পক্ষে বিমূঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। আন্তরিক আশীর্বাদ জানালেন তিনি। দু'একদিনের মধ্যেই সুদেববাবুর মায়ের কাছে গিয়ে পাকা কথা দিয়ে আসবেন—এমন আশ্বাসও দিলেন। সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে সারি সারি ঝাউগাছের তলা দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সুদেববাবু। ঝাউ-এর পাতায় বাতাসের শব্দ শব্দ, ঘরমুখো পাখীদের ডাকাডাকি, বকের শ্রেণীর শাদা ডানা মেলে নদীর ওপারের অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া আর অপক্লপ অপরাহ্নের নদীতে দূরগামী ষীমারের ভেঁা আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়েছিল।

কয়েকটা দিন পরে। ছপুর বেলা নিজের ঘরে বসে সুদেববাবু একটা প্রবন্ধের প্রথমদিকটা সবে শুরু করেছেন। এমনসময় দরজার বাইরে স্তাণ্ডেল বসা শব্দ শোনা গেল।

—“ভেতরে আসতে পারি?”—পর্দাটা নড়ে উঠল।

—“কে মায়া নাকি—এসো এসো”—সুদেববাবুর ডাকে ভেতরে এল মায়া। সামনে বসল। তারপর চোখ নিচু রেখে একটু ইতস্তত করে বলল—“আপনি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, শুনলাম।”

—“হ্যাঁ, কেন বলতো?”—কলমটা একপাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি।

—“কি কথা বললেন তার কাছে।”

—“আমাদের বিয়ের কথা বলেছি—কেন ভোমার আপত্তি আছে নাকি?”

—একটু ঘেন বিষয়ের সুর ।

জলজমেআসা টল্টলে চোখহুটি তুললো মায়া, তারপর ক্রান্ত-কোমল গলায় ধেমে ধেমে বলল “আপনিতো জানেন ভীষণ রোগ আমার, খুব খারাপ অসুখ—মায়েরও এ-রকম আছে ।”

—যুখ নিচু করে ধেমে গেল সে ।

—“ও এই কথা ।”—সুদেববাবু ঘেন জোর করেই জোর গলায় হেসে উঠলেন সমস্ত ভয়-ভাবনা উড়িয়ে দেবার মত হাসি ।

তারপর কসু করে মায়ার ডানহাতখানি টেনে নিয়ে বললেন—“কই দেখি তোমার কিরকম অসুখ ।”

হু’হাতের মধ্যে নিয়ে বেশ ভালকরে দেখলেন । হাতের উন্টোপিঠে, তারপর মণি-বন্ধ থেকে কনুই অবধি কয়েকটা শাদাশাদা দাগ—আর কোথাও নেই, শুধু এই ডান হাতে ।

সেইজন্মেই বুঝি সবসময় হুল-হাতার ব্লাউজ পরে মায়া । হাতখানিও যতটা সম্ভব আঁচলের আড়ালে রাখে ।

ততক্ষণে তার হুচোখের পাতা উপচে শিশির-কোঁটার মত জল নেমেছে । ফুলে ফুলে কাঁদছে সে । অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল । একটি কথাও বলতে পারলেন না সুবক্তা সুদেববাবু । শাস্ত্রনার কোনো ভাষাই খুঁজে পেলেন না তিনি । শুধু বিব্রতচোখে তাকিয়ে রইলেন সেই মেয়েটির দিকে যার বিষের সম্বন্ধ এসে এসে ফিরে যায় । সমবয়সী বন্ধুরা যার ছোয়া বাঁচিয়ে চলে । যার বাপ-মা তাকে মনে করে নিদারুণ গলগ্রহ । জীবনের সমস্ত উৎসব আনন্দ থেকে যে নিজেকে নিঃশব্দে লুকিয়ে রাখে ।

সেদিনের সেই নির্জন ছপুরের কথা, সুদেববাবু ভুলতে পারবেন না কোনোদিন । বিষের পরেও বিশেষ পরিবর্তন হল না তার ।

বাইরের মেলামেশা আরো কমিয়ে দিলে । এমন-কি কলেজের পড়াও ছেড়ে দিলে । সুদেববাবু একটু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু জবাব দিয়েছিল—“নানা সে হয়না, একমাথা সিঁচুর নিয়ে কলেজে যাব—সেই ক্রাশে তুমি আবার গড়াতে আসবে—তারী লজ্জা করবে আমার ।”

সুতরাং সবসময় শাওড়ীর কাছাকাছিই রয়ে গেল সে । বাইরের পরিবেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলে নতুন সংসারের মধ্যে ।

মাঝে মাঝে নন্দ আসে । হৈচৈ করে একঝলক উদ্যম হাওয়ার মত গান আর গল্পের গোলমালে খানিকটা সময় ভাসিয়ে দিয়ে যায় । শুধু এইটুকুই ব্যতিক্রম । না হলে এক ঘোরে দিনগুলি একই ছন্দে কেটে যায় । প্রতিদিনের পুরনো সূর্য ওঠে একই বস্ত্র নিয়ে । শুকুদপুর আর শান্ত বিকেলের একই ছবি ।

আরো একটা বছর কেটে গেল । সেদিন কলেজে বেরোবার যুখে মা এসে বলেন—“হু’টো টাকা বেখে যাস, পাষণময়ী কালী-বাড়ি পূজো পাঠাব ।”

“কেন মানস্ত-টানস্ত আছে নাকি ?”—সুদেববাবুর প্রশ্ন শুনে মা হেসে জবাব দিলেন

“তোমার তো কিছু খেয়াল হয় না, সংসারে কারো খোঁজও নিস না, বইপত্র নিয়েই তো আছি। সারাদিন—এদিকে বোমার শরীর খারাপ—বোধহয় ছেলেপুলে হবে।”

বিশ্ব-বিমুঢ় চোখে সুদেববাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। মা চলে যেতেই একমুখ লজ্জার হাসি নিয়ে মায়া এল।

—“এক কাণ্ড বাধিয়েছো দেখছি”—সুদেববাবু হেসে বললেন।

—“যাও।”—মায়াও হাসল, একটু ধেমেরে কিছুটা গন্তীর হয়ে আবার বললো—“কি যে হবে, আমার এই খারাপ রোগ যদি বাচ্য হয়, সারা মুখে গায়ে এরকম দাগ হয়ে থাকবে।”

—“ওসব বাজে চিন্তা ক’রো না, এরকম কখনো হয় নাকি।”—সুদেববাবু জবাব দিলেন, তারপর নরম সুরে বললেন—“কেন ওসব ভেবে মন খারাপ করছ। তোমার অসুখ তো অনেকটা সেরে গেছে মায়া।”

এটা সুদেববাবুর সাস্থ্যনার কথা। অসুখ একটুও কমেনি। বিল্ট্রী দাগগুলো আগের মতই আছে। অনেক ওষুধ আর ইনজেকশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। সুদেববাবু কলেজে গেলেন, মায়ার মনের ভাবনা গেল না। যে-শিশু আসছে সে যদি তার মায়ের এই ব্যাধি নিয়ে জন্মায় কিংবা জন্মের কিছুদিন পরেই যদি তার দেহে মুখে এই বিল্ট্রী দাগগুলো ফুটে ওঠে। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন কেউ তার ছেলেকে কোলে নেবে না। ছোয়া বাঁচিয়ে দূরে সরে যাবে। এর চেয়ে যদি মরেও যায় সেও ভাল। অশুভচিন্তা মায়ার মনে ভারী পাথরের মত চেপে থাকে। একটা অস্থির ভাব তাকে অস্থির করে তোলে। তারপর একদিন সময়মতই পেডী-ডাক্তার এল, দাঁই এল। দুপুররাত থেকেই ব্যথায় ছটফট করেছে মায়া। সুদেববাবু প্রথমটা ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করলেন। খবর দিলেন খণ্ডর-বাড়ি, বোনের বাড়ি। একজন নাসও নিয়ে এলেন। তারপর যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নিজের ঘরে এসে বসে রইলেন। কিন্তু বসে থাকারও যায় না। বড় অস্থির, বড় বিল্ট্রী লাগে এই উদ্বেগের পাথর-চাপা মুহূর্ত-গুলি। বাড়িটা অবিশ্রাম টিক্ টিক্ করে। ঘণ্টার কাঁটা তিনটের ঘরে পৌঁছল। বাইরের কালো রাত আরো নির্জন আরো অন্ধকার মনে হয়। আচমকা কোথায় যেন একপাল শেয়াল ডেকে শেষপ্রহর জানিয়ে দিল। সুদেববাবু একবার বাইরে উঁকি দিলেন। অন্ধকার বারান্দাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওদিকে একটেরে আলাদা আতুর-ঘরের সামনে সূচিক্রা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরজার কাঁক দিয়ে আলো আসছে—একটা চাপা গোষ্ঠানি আর ফিস্‌ফিস্‌ কথা। কি করছে ওরা এতক্ষণ। মায়া কি মরে গেল। ঠিক এই সময় খুব খারাপ লাগে ওদের চাল-চলন আর ফিস্‌ফিস্‌ কথা। ফিরে এসে খাটের ওপর বসলেন—একটা সিগারেট ধরালেন। ওধারের আলনায় মায়ার শাড়ী-সাদা-ব্লাউজ; ড্রেসিং টেবিলে পাউডারকেস, চিক্রনী, সিঁদুরকোঁটো, চুলের ফিতে, রূপোর কাঁটা।

ঘনঘন ধোয়া ছাড়েন সুদেববাবু। চেনা জিনিসগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। হাত নেড়ে ধোয়া সরিয়ে আবার ভাল করে দেখেন—চিক্রনী, সিঁদুরকোঁটো, চুলের ফিতে, আলনায় শাড়ী-সাদা ব্লাউজ। বাড়িটার একঘেয়ে টিক্‌টিক শব্দটা খুব খারাপ শোনায়।

ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটা ছুটো যেন কালো কালো মাকড়সার পা। সময়ের জাল বুনে চলেছে। সুদেববাবু যেন ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছেন সেই জালে। ছাড়া পাবার উপায় নেই। প্রতিটি দমবন্ধ মুহূর্ত যেন এক ভয়ংকর সম্ভাবনাকে ক্রমশই কাছে টেনে আনছে।

আর কিছু সময় পরেই হয়তো এমন কিছু ঘটে যাবে যা সুদেববাবুর সমস্ত ভাবনা-চিন্তার বাইরে। ভাবতেও হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। হঠাৎ চমকে উঠলেন। পর্দা ঠেলে লেডী-ডাক্তার ঘরে এল।

—“ছেলে হয়েছিল—কিন্তু ভেরী স্ট্রাড, বাঁচাতে পারলাম না।”

—“অ্যা!—প্রথমটা যেন কিছুই বুঝতে পারেননি সুদেববাবু, আঙুলের কঁক গলিয়ে সিগারেটটা মাটিতে পড়ে গেল। তারপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—“আর মায়া; সে কেমন আছে?”

—“এখনো জ্ঞান ফেরেনি বটে। তবে আর ভয় নেই, কাঁড়া কেটে গেছে। বড় হুঃখিত ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলাম না।”

সুদেববাবু বাইরে এলেন। ওদিকের একটা অন্ধকার কোণ থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে বলা মায়ের কথা শোনা গেল—“ওকি আর বাঁচবে বলে এসেছিল, পোড়া কপাল আমার; মাকে কষ্ট দিতেই জন্মেছিল। সবিয়ে নিরে যাও বাছা আমি আর দেখতে চাই না। আঁতুর ঘরে মায়ের কাছে আর ওকে রেখো না।”

দাই-এর কোলে মরা ছেলে। একমুঠো ঘুঁইফুলের মত নরম তুলতুলে। একটু লালচে রঙ। নীরোগ, নিটোল দেহ। সেই শেষরাতেও তরল অন্ধকারে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোর সুদেববাবু দেখলেন, ভালভাবেই দেখে নিলেন—কোন ব্যাধি নেই, কোন বিকৃতি নেই। লেডীডাক্তার, দাই বিদায় নিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার মুছে এল। পূব-আকাশে পায়রা পা-এর মত পাখুর লাল রঙ। মায়া তখনো ঝিমিয়ে ছিল। জ্ঞান কিরেছে, কিন্তু হুঃখান্তি কাটেনি—কেমন বিষম অবসাদ। সূর্য উঠতেই ভাল করে চোখ মেুল সে। শ্রান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল—“কি হল ঠাকুরকি!”

সুচিত্রা জবাব দিল—“ছেলে।”

একটু পাশ ফিরে কোলের কাছটা দেখতে গিয়ে বললো—“টেক! কোথায়?”

—“হুঃখ করোনা বৌদি—হয়েছিল, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই মারা গেল।”

কোথায় বুঝি একটা কাক ডেকে উঠল—ভোরের কাক, কিন্তু এত ককশ শোনার কেন? সুচিত্রার সুন্দর মুখ খুব কুৎসিৎ দেখায়, তার কথাগুলি ভারী বিত্রী আর হর্বোধ্য মনে হয়।

—“কি বললে! মরে গেছে!”—মায়া কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসতে গেল—“টেক! আমার এনে দেখাও তো, একুনি দেখাও, একুনি দেখব আমি।”

—“ওকি, ওকি তুনি উঠোনা, উঠোনা বৌদি।”—চীৎকার শুনে সুদেববাবু ছুটে এলেন, মা এলেন, নাস এল।

নরম গলায় বললেন সুদেববাবু—“সে তো মরে গেছে মায়া—তুমি অস্থির হয়ে না।”

কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। স্বামী, শাওড়ী, ননদ কেমন যেন অচেনা আর দূরের মনে হয়। অথচ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন সবাই।

মায়া তাকালো তার হাতের দিকে। হাতের আঙুলে, মণিবন্ধে, কনুইএর কাছে খেতী-চিহ্ন—শাদা শাদা দাগ। চোখ তুলে আবার তাকাল সুদেববাবুর দিকে। কি আশ্চর্য তার মুখেও যেন ওইরকম দাগ।

শাওড়ী, ননদ—এ সংসারের সবার সর্বদেই যেন জড়িয়ে গেছে তার অস্থখ, তার রক্তের ব্যাধি—কি সর্বনাশ।

একঝটকায় সুদেববাবুর হাতখানা সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—“না না মরেনি সে, তোমরা সরিয়ে ফেলেছ, ডাক্তার বুঝি বলেছে আমার মত রোগ হবে, তাই লুকিয়ে রেখেছ। এনে দাও, এক্ষুনি এনে দাও আমার ছেলে।”

অস্বাভাবিক জোরে চীৎকার করে সে। চোখে-মুখে যেন রক্তের জোয়ার নামে। জোরে জোরে খাপ টানে। ভোরের আকাশ কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। কোথায় বুঝি একটা বীভৎস শব্দ তার অন্ধকার ডানা মেলে সমস্ত আলো মুছে নিল।

বাতাসে বিস্মাক্ত ঝড়—ওমূধের অস্থস্থ গন্ধ।

সেই থেকে কেমন যেন হয়ে গেল মায়া। আজকের প্রোটা মায়া দেবী। দীর্ঘদিন কেটে গেছে। শাওড়ী মায়া গেছেন। সূচিক্রা এখন নিজের সংসারে ব্যস্ত। কিন্তু মায়া দেবীর আর বদল হল না। নানারকম মানসিক চিকিৎসা আর অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারের আনাগোনা ব্যর্থ হল। প্রতিদিন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন—অস্থস্থ কাঁকা দৃষ্টি মেলে। ছোট ছোট ছেলেদের ডাকেন, হাত-পা মুখ চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। প্রাস্ততি হুধ খেতে দেন। ভিখিরী ময়লা ছেলেগুলি হুধ খায় আর মায়া দেবী তাকিয়ে থাকেন—অস্থস্থ চোখেও কেমন যেন স্নেহের দৃষ্টি।

আজকের প্রোটা অধ্যাপক সুদেব সার্যাল ইঞ্জিচেয়ারে শুয়ে সিগারেট টানেন।

মায়া দেবী উল বোনেন। ছোট ছেলেদের মাপে মোজা, জামা, টুপী তৈরী করেন।

সুদেববাবু ডাকেন—“মায়া কিছু কথা বলো।”

—“কি বলব, কি কথা বলব তোমাদের সঙ্গে, তোমরা সব চোর, মিথ্যাবাদীর দল, ভিখিরী করে দিয়েছ আমার ছেলেটাকে, রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছ।”—হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন মায়াদেবী। নিরুপায় সুদেববাবু তাকিয়ে থাকেন। ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিটার পাশে ধূপ-কাঠি ছুটো জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়। একটা ধূসর দীর্ঘশিখা কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিশে যায়। আকাশের দীর্ঘনীল পটে গোধূলির বিবর্ণ রঙ বদলে যায়, রাত্রির কালো ছায়া ধীরে ধীরে পাখা মেলে।

সোভিয়েট রাশিয়ার চাষ-জীবন

নবোদয় দেব

আমাদের দেশের মতো রাশিয়াও ছিল একদিন কৃষি-প্রধান দেশ। বড়বড় কলকারখানা ও শিল্প-সংস্থা তখনও গড়ে ওঠেনি। দেশের অধিবাসিরা অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত ও দরিদ্র। জমিজমা বেশির ভাগই ছিল জমিদার আর জেতদার বা ধনী কৃষি ব্যবসায়ীদের হাতে। সাধারণ চাষীদের হাতে সামান্যই জমি ছিল। চাষীসমাজের এক তৃতীয়াংশ লোকের নিজের জমি বলতে কিছুই ছিলনা। অপরের ক্ষেতে মজুরি করে তাদের দিন চলতো।

ইং ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সেখানে যে নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁরা প্রথমেই আইন করে জমিদারী ও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেন। দেশের সমস্ত জমির স্বত্ত্ব তাঁরা জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। যারা নিজেরা খেটে মেহনৎ করে চাষ করবে তাদেরই কেবল প্রয়োজনীয় জমি ব্যবহার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। মহাজনদের কাছে চাষীদের যে টাকা ঋণ নেওয়া ছিল আর জমিদারদের কাছে তাদের যা ঋণনা বাকি ছিল সে সব দেনার দায় থেকে চাষীদের বেহাই দেওয়া হয়েছিল। ভাগচাষীদের যে সব ফসল জমির মালিকদের দিতে হ'ত তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আগে চাষীদের জমি কিনে বা ইজারা নিয়ে সংগ্রহ করতে হত। এর জন্য অনেক টাকা দাম এবং সেলামীও দিতে হ'ত। সেই টাকা সংগ্রহ করতে তাদের মহাজনের কাছে ধার করা ছাড়া উপায় ছিলনা। সেই ধার শোধ করতে আবার জমি বাঁধা দিতে হত। ফলে, তারা ক্রমেই ঋণজালে জড়িয়ে পড়তো। দেনার দ্বারা তাদের জমি নিলেমে বিকিয়ে যেত। হাল গরু বেচে শেষ পর্যন্ত পরের ক্ষেতে দিনমজুরী করে তাদের অতি কষ্টে দিন চলতো। এখন তারা যেন হাঁক ছেড়ে বেঁচেছে। জমি সংগ্রহের জন্য আর তাদের কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হয়না। সব জমিই যে এখন তাদেরই সম্পত্তি।

১৯২২ সালে সোভিয়েট সরকার আইন করলেন যে চাষীরা কৃষিকাজের জন্য জমিতে পাবেই, এমন কি সে জমিতে ইচ্ছে মতো চাষীরা ঘর বাড়ি তৈরি করে নিয়ে বসবাসও করতে পারবে। জমিতে সরকারের অধিকার থাকলেও চাষীর তৈরি ঘরবাড়ি কৃষকের নিজস্ব সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, আর জমির ফসলের উপরও চাষীরই একমাত্র অধিকার থাকবে। এই ব্যবস্থার ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল। দুঃস্থ চাষীর সংখ্যা ক্রমশই সে-দেশে কমে আসতে লাগলো।

১৯২৮ সালের পর দেখা গেল যে ছোটছোট জমি নিয়ে চাষীরা পৃথকভাবে চাষ করতে গিয়ে ভেয়ান লাভবান হতে পারছে না। কারণ, হাল গরু, চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ শস্ত ও

সার সংগ্রহ করতে তাদের প্রত্যেকের মাথা পিছু যে টাকা খরচ হয় সেটা বহন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। কাজেই উৎপাদনের দিক দিয়ে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তাবা পুরোপুরি সরবরাহ করে উঠতে পারছিল না। সুতরাং সোভিয়েট সরকার চাষবাসের জন্য নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন।

এর ফলে শুরু হলো সেখানে ঘোঁষ ক্ষেতখামার। অনেকগুলি চাষী তাদের নিজ নিজ ক্ষেতের জমি একত্রে মিলিয়ে সমবেতভাবে চাষের কাজ শুরু করলে। এবার দেখা গেল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, উৎকৃষ্ট বীজশস্য, শক্তিশালী রাসায়নিক সার ও উন্নত সেচব্যবস্থার শুণে বিশাল বিশাল শস্যক্ষেত্রে দ্বিগুণ ফসল ফলতে শুরু হল। দেশের খাদ্যতাব ঘুচলো, চাষীদেরও অবস্থা উন্নত হল।

সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন চাষীদের সমবায় প্রচেষ্টায় পরিচালিত চুরানসই হাজার ঘোঁষ ক্ষেতখামার স্থাপিত হয়েছে। সরকারের খাস অধীনে পরিচালিত খামারের সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের উপর। এইসব ঘোঁষ ক্ষেতখামারকে ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং বীজ সার ইত্যাদি যোগাবার জন্য সারা সোভিয়েটদেশে প্রায় দশ হাজার মেশিন ট্রাক্টর স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। যেসব শস্যক্ষেত্র এর যে কোনও একটি স্টেশনের কাছাকাছি, চাষীরা সেই স্টেশন থেকে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য পায়। এই ব্যবস্থায় সে-দেশে চাষআবাদের অসাধারণ উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

কাজেই, এখন আর ছোটছোট চাষীদের টুকরোটুকরো জমি নিয়ে সেখানে চাষ করা সম্ভব নয়, এবং লাভজনকও নয়। সমস্ত জমিই প্রায় নতুন প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে একসঙ্গে এক একটি ঘোঁষ ক্ষেতখামারে পরিণত হয়েছে। অবশ্য, সর্ববৃহৎ কৃষিক্ষেত্র হল সরকারের খাসে যেটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জাতীয় কৃষি-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হয়। সরকারের খাসে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষেতখামারও আছে। মেশিনট্রাক্টর স্টেশনগুলি যন্ত্রপাতি বসিয়ে রেখে মরচে ধরান না। বিভিন্ন ঘোঁষ ক্ষেতখামারকে সাহায্য করেও অবশিষ্ট ট্রাক্টরগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য তাঁরা নিজেরাও চাষের কাজে নেমেছেন। আরও অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনমূলক বিভাগ থেকেও জমি চেয়ে নিয়ে চাষ আবাদ করা হয়। তাতে যে আয় হয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির খরচ চলে যায় সে-টাকায়। এঁরা শুদাম ও সরকারী কর্মচারীদের বসবাসোপযোগী গৃহ তৈরির জন্যও জমি ব্যবহার করতে পারেন। এ অধিকার চাষীদেরও আছে।

ঘোঁষ ক্ষেত খামারের প্রত্যেকটি চাষী পরিবার তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খানিকটা জমি রাখতে পারেন। সে জমিতে তাঁরা ইচ্ছা করলে বসতবাড়ি তৈরি করতে পারেন, ফলমূল তরিতরকারী বা ফুলের বাগান করতে পারেন। গৃহপালিত পশুপক্ষীর জন্য খোঁয়াড় করতে পারেন। এ ছাড়া, যেসব মজুর বা শ্রমিক এবং বেতনভোগী কর্মীরা তাদের অবসর সময়ে বাড়তি কিছু রোজগারের আশায় চাষ আবাদের কাজে নামতে চায় তাদেরও জমি দেবার ব্যবস্থা আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত জমির শতকরা তিন ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ জমি চাষের কাজে লাগানো হয়েছে। এক তৃতীয়াংশ রাখা হয়েছে দেশের অরণ্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য। এ ছাড়া সরকারের হাতে মজুদ জমি রিজার্ভ রাখা হয়েছে এক তৃতীয়াংশ। বাকি জমি শহর তৈরি, লোকের বসতি, কলকারখানা, শ্রমশিল্প, রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য ব্যবহার হয়।

যৌথ ক্ষেতখামার যে জমি পায় তার দুটি পৃথক শ্রেণীবিভাগ আছে। একটি হল সমবায়পদ্ধতিতে চাষের জন্য। এরা কৃষি ক্ষেত্রে ছাড়া, গোচারণভূমি, ঝাড়াই বাছাই মাড়াই করা ; খড় বিচালি ঘাস রাখা, খানের গোলা করা ইত্যাদির জন্য প্রশস্ত মাঠও রাখতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী হল যৌথ ক্ষেতখামারে যোগ দিয়েছেন যে-সব চাষীপরিবার তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য যে জমি খয়রতি দেওয়া হয়। অবশ্য এর আয়তন খুব বেশি নয়। অবস্থা বিবেচনা করে পরিবার পিছু এক থেকে দু' বিঘে পর্যন্ত দান করা হয়।

যৌথ ক্ষেতখামারকে সোভিয়েট সরকার যখন ভূমি বিলি করেন, তখন তাদের একটি দানপত্র লিখে দেওয়া হয়। তাতে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা আছে যে এই জমি ঐ প্রতিষ্ঠানকে চিরকালের মত চাষের কাজে ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে দান করা হল।

এই জমির জন্য কৃষকদের মূল্য তো দিতেই হয়না। এমনকি খাজনাও দিতে হয়না। লাইসেন্স ফী, রোড সেস, ওয়াটার সেস প্রভৃতি কোনও কিছুই তাদের কাছে আদায় করা হয়না। কেবল মেশিনট্রাক্টরের ভাড়া ও সার প্রভৃতির মূল্য দিতে হয়। তাও নগদ না দিলেও চলে। শস্যের বিনিময়ে ঋণ শোধের সুযোগ দেওয়া হয়।

কলে সোভিয়েট রাশিয়ার চাষআবাদ দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে। প্রতিবৎসরের উৎপাদন তার পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং কৃষকরা বেশ স্বচ্ছন্দ আরাম ও আনন্দে কাজ করছে।

শ্রাবণসন্ধ্যা

আশীষ বর্মণ

কালই পরীক্ষা শুরু, অথচ সারাদিন মেয়েগুলো পড়তে দিল না। কোথা থেকে নিয়তি এক ক্যামেরা এনেছে আর আনা অবধি হটোপাটিতে মেতেছে সবাই। কেউ ছবি তোলাচ্ছে কেউ শিখছে তুলতে ; হাসি এবং কথার তোড়ের কামাই নেই। প্রভাতী তবু বই নিয়ে মাথা গুঁজে বসেছিল, ঘরের দরজা দিয়েছিল বন্ধ করে। মন যে ঠিক নিবদ্ধ হচ্ছিল তা নয়, টুকুরো টুকুরো কথা আর অনাবিল হাসি থেকে থেকে চিন্তা তার অগোছাল করে দিচ্ছিল। অন্তমনা চোখ তুলে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকছিল সে মাঝে মাঝে, আর চৈতন্য নিরাস্রব, শূন্য হয়ে পড়ছিল। কখনো বা ভীষণ তিক্ত হয়ে ওঠে মেজাজ, ভেসে আসা কাকলি আর হাসির গমক মনে হয় বাড়াবাড়ি। এত উচ্ছ্বাসের কি আছে? কথা বললেই কি চিন্তার করতে হয়? বিরক্তিতে সত্তা তার কর্কশ হয়ে ওঠে—তখন, হাসির আলোড়ন কানে এলো শোনার জ্বালা মেয়ের আকারী সুরের মত। বিল্ডি ও অসহিষ্ণু লাগে, হাতের মোটা বইটার পেঙ্গিলের ঢোকা দেয় সে দ্রুত, ভুরু কঁচকে।

এরি মধ্যে যেটুকু পড়া হচ্ছিল তাও গেল হঠাৎ। দরজার হুম-হুমাহুম আওয়াজ আর বহুজনের মিলিতকণ্ঠে ডাক এল।

নিয়তি বলে—দরজা খোল প্রভা।

—না খুলে ভেঙে ঢুকবো কিন্তু

—মেয়ে একেবারে পড়ায় ডুবে গেলেন!

—পড়া না হাতী...গুয়ে গুয়ে ঘুমুচ্ছে।

—প্রভা...এ্যা ই প্রভা...ওগো ভালো মেয়ে!

—সবসব তোরা সব...দেখি কেমন দরজা না খোলে।

নিমেষের মধ্যে বিপুলশব্দে দরজার কিল চড় ঘুঘি পড়তে থাকল অজস্র। সঙ্গে লেগে রইল নানান রকম সন্ধান ও শাসানি। অগত্যা দরজা খুলে দিল প্রভাতী। প্রথমটা রাগও দেখাতে চেষ্টা করল। ওরা কিছুই শুনল না; হঠাৎ, জোরজবরদস্তিতে, প্রাণোচ্ছ্বাসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বাগানে, দোতলায়, বাবেয়ার ঘরে। নিজের ঘরেও তুলে ছবি। বিকেল হয়ে এল যখন হৈ ছল্লোড়ে তখন শ্রান্ত বোধ করল ও, কিন্তু তেমন আর তিক্ত, বিল্ডি সাগল না। নিজের হাসল কথা বলল ঠিক ওদেরই মত। ক্যামেরার কিন্ন যখন ফুরালো তখন মনও অনেকটা হালকা ও ক্লান্ত হয়েছে। আন্তে আন্তে ও ফিরল ঘরে। পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকে দেখল সব প্রচ্ছন্ন ও নব্ব। সোজা গিয়ে বিছানার গড়িরে পড়ল। চোখ দুটি

বুকে বইল কিছুক্ষণ। শরীর অবসাদে যেন মিলিয়ে থাকল খাটে। কতক্ষণ কাটে একই ভাবে খেয়াল নেই, যখন চোখ চাইল তখন সন্ধ্যা ছেয়ে এসেছে ঝাপসা আলোয়। কোণের টেবিলটা দেখায় অস্পষ্ট, উপরে রাখা অবিস্তৃত বইগুলি ঝটপাকানো আঁধারের মত। দেয়ালের লম্বা টানা চিড় চোখেই পড়ে না, পাশের কিছুটা দেয়াল শুধু চারিদিকের কালোর মধ্যে থানের মত শাদা লাগে।

বাকল কটা? সত্যিই কি সন্ধ্যা হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি?

বিছানায় উঠে প্রভাতী বুকে টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে হাত বাড়াল। অনেকটা বুকেও যখন হাত পেল না তখন উঠে গিয়ে দেখল। সাড়ে চারটে মাত্র! ঘড়ি রেখে সে এগিয়ে এল জানুলায়। বাইরেটাও ঝাপসা কাচের মত লাগে। আকাশে দেখল পুঞ্জপুঞ্জ কালো মেঘ, ছুছ করে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। নিচে পৃথিবীর আলো যেন তরতর করে যুচ্ছে যাচ্ছে হাওয়ার টানে। ঘরের দিকে সে ফেরে আবার; মেঝের পানে তাকিয়ে প্রথমটা কিছু চোখেই পড়ে না, একটু চেয়ে থাকার পর দেখতে পায় নিঃসঙ্গ আবছায়ায় ঘর ভরে রয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসে প্রভাতী। ভাবে অচলার কাছে বসবে গিয়ে। বারান্দা দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে যায়। যেতে যেতে কানে আসে ওপাশের একটা ঘর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি মেয়ের কথা কওয়ার টেচামেচি। শুনে ও দাঁড়ায় একটু চুপ করে। শোনে। মন হঠাৎ কেমন বেকে যায়; ধীরে ধীরে ফিরে আসে নিজেরই ঘরের সামনে। দরজার ঝোলানো পর্দাটা উপরে তুলে দেয়। তারপর সোজা জানুলায় এসে দাঁড়ায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়, কেউ কি আসবে আজ?

—প্রভাদিদি...

ডাকে ও চমকে ওঠে। ফিরে দেখতে পায় দরজার ফ্রেমে, আবছা আকাশের পটে, ছায়ামূর্তি এক। এক নিমেষ হতবাক থাকে ও, তারপর সামলে নিয়ে ডাকে....কে?

—আমি...নন্দ।

—ওঃ, নন্দ! প্রভাতী হাসে একটু, তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। নন্দ হস্টেলের ভিজিটাস বুকটা বাড়িয়ে ধরে, বলে—আপনার কাছে এসেছেন...

—আচ্ছা—প্রভাতী আগন্তকের নামটা দেখে নেয়, বলে—বল্গে আসছি...এখুনি।

নন্দ খাতা নিয়ে চলে গেলে ও ঘরের আলো জ্বলে। টেবিলটার সামনে এসে অকৃতমনস্কভাবে ছ'একটা বই গুলিয়ে রাখে, কয়েকটা যেমন ছিল তেমনিই থাকে; তারপর দোয়াত তুলে হাওয়ার ওড়া খাতা চাপা দেয়। আচ্ছা হাত টেবিলের ওপর রেখে বাইরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। শেষে, ছোট্টো আয়নার নিজেকে একটু দেখে নিয়ে আলো নিভিয়ে বেরিয়ে আসে।

নিচের বারান্দার বেঞ্চে কেউ নেই। বাইরের দিকে বেরিয়ে এসে সামনের মাঠে দেখতে পেল অপূর্বকে; সিগারেট খাচ্ছে আর পায়চারি করছে।

—এ্যাই...এ্যাই—ও ডাকল, অপূর্ব একটু এগিয়ে এলে বলল—

—ওখানে ঘুরচ যে ?

—বারন্দায় ভীষণ গরম।

—কিছু গরম নয়...বসো।

অপূর্ব এলো এগিয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে মাথা বাড়িয়ে বারন্দার নেকটা দেখাল। হেসে বলল ছুজনেই।

—এখানেই বসিয়ে রাখবে নাকি ? ও বলে বসে।

—ভিজিটান' রুমে লোক আছে।

—অন্ত আর জায়গা নেই ছুনিয়ায় ?

—আছে নিশ্চয়ই, আমি এখন বেরুবো না।

—কি ব্যাপার ?

—ক্রান্ত...সারা ছপুর যা গেল...গা ধোয়াও হয়নি।

—এখন গা ধুতে যাবে নাকি ?

—যদি যাই-ই...অমনভাবে তাকাচ্ছ কেন ?

—গেলে কি করব ভাবচি।

—বসবে।

—আর পেটটি...পেটটি চুপ করে থাকবে ?

—কেন, খাওনি...চা ?

—না—অপূর্ব হঠাৎ উঠে পড়ে, দাঁড়িয়ে থেকে বলে—

—অফিস থেকে সোজা আসছি...যাবে ?

দাঁড়ানো অপূর্ব নিচের দিকে আর বসে থাকা ও উপর দিকে তাকায়, ছুজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে এক মুহূর্ত, অচঞ্চল ; তারপর হাসি আসে তবে। অপূর্ব দেখে ওর খোলা চুল ছড়িয়ে এসেছে ছ'বাহুর ওপর, মুখটিকে বিরেছে চুলের আচ্ছাদিত বিস্তার। চোখ দুটি ঈষৎ ভারী।

—খুব ঘুমিয়েচ বুকি ? অপূর্ব বলে।

—কোথায় ! সারা ছপুর গ্যালো হৈ-হৈ-এ ; পড়তে পৰ্বন্ত পারিনি।

—পড়তে আর কবে পার।

—না পারি না !

—আচ্ছা পার—অপূর্ব হাসে, বলে—কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

—থেকো না...যাচ্ছিলে তো একা, যাও।

অপূর্ব অন্য দিকে ফিরে হাসে, হস্টেলের দেয়ালে তোলা লতাগাছ থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাতের তালুর ওপর রেখে এগিয়ে আসে, প্রভাতীর সামনে তুলে ধরে বলে—
—নেবে ?

প্রভাতী হাতের দিকে তাকায়ই না, বাইরে থেকে কুম্বেটকে কিয়তে দেখে হাসে, মেয়েটি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে—হল ?

মেয়েটি বাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায়, তারপর যেতে যেতেই বলে—ঠিকই বলেছিলি তুই।

ওরা পরস্পর আবার অল্প হাসে।

অপূর্ব বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করে ; মেয়েটি চলে গেলে এক পলক দেখে প্রভাতীকে। ও নিজের ব্লাউসের হাতার একটা আঁরা সূতো নিয়ে খুব ব্যস্ত। কোনোই কথা হয় না কণকাল। হঠাৎ যেন কিছুই মুখে আসে না। বাইরে চেয়ে থেকে নীরবে সিগারেট টানে অপূর্ব। আর হাতের মুঠোর পাতাগুলো অকৃত্রিম দলাপাকিয়ে পাকিয়ে আঙুল দিয়ে ঠোকর দিয়ে মাঠে ফেলে। মনে মনে যতবার সে নিজেকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে ততোবারই কেমন অসহায় বোধ করে। শেষে ফিরে প্রভাতীর সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে—চটলে ?

প্রভাতী ওর মুখে দিকে চেয়ে রইল সোজা ছ'এক নিমেষ, তারপর বলল, আন্তে আন্তে—কিধে বুঝি মিটে গেল ?

—কৈ আর...

—তবে ?

—তবে আবার কি, তুমি যাযে না ?

—না।

অপূর্ব তখনি কিছু বলে না, ছ'এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে ওর পানে, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, লতার দিকে তাকিয়ে থেকে মুহূর্তে বলে—বেশ !

দেয়ালে ভোলা লতাটার দিকে ও আবার এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। পাছটার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে। সিগারেট আন্তে আন্তে কয়েকবার টুকটুকায় টেশলাইয়ের বাক্সে, অবশেষে ধরিয়ে নীরবে বাইরের দিকে তাকিয়ে টানে। প্রভাতী বসে বসে লক্ষ্য করে সমস্তটা। পাশ থেকে দেখতে পায় ওর সংবেদ্য মুখের একাংশ, ঘাড়ের ঈষৎ বেড়ে ওঠা চুল, বা পাশে মাথাটির অল্প কাঁচ হয়ে থাকা।

হঠাৎ সে উঠে পড়ে বেঞ্চ থেকে, হস্টেলের দিকে এগোয়। অপূর্ব ফিরে দাঁড়ায় চট করে, এক নিমেষ দেখে, তারপর চাপা উষ্মে জিজ্ঞাসা করে—যাচ্ছ ?

—আসুচি—না থেমে, একটু মন্থর হয়ে, যেতে যেতেই বলে প্রভাতী—কাপড়টা বদলে আসি।

সিঁড়ী উঠতে উঠতে ও হাসে। ঘরে ঢুকে আগনার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ায় তখনো হাসির আভাস লেগে থাকে। আশিতে নিজের খুশি খুশি চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ও ভুরুটা তুলে বলে—কী ? আর সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখে ছড়িয়ে যায় আলো।

কিভেহীন একটা বেনী বেঁধে নেয় ও তাড়াতাড়ি, পরে শাড়িটা পাল্টায়। তাবে না কিছুই ঠিক, অথচ অজস্র জিনিস মনের মধ্যে ভ্রত বয়ে যায়। ছোটো ছোটো অকুরত

চেউগুলি স্বতন্ত্র, কিন্তু হারায় দেখার আগেই ; ওনে নেবে কোনটা কি তা আর হয় না। কেমন যেন সব অবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে তাড়ায় ; কি একটা সঙ্গে নেবে ভেবেছিল কিন্তু আচমকা সেটা আর মনে থাকে না। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে ও খাটের দিকে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করে জিনিসটা। টেবিলের সামনে আসে দ্রুত, দাঁড়ায় নিখর, দেখে সমস্তটা। বই, খাতা, পেন দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয়, কি খুঁজছি কি ? কি চাই ? মাথা ফাঁকা হয়ে থাকে, কোনো জবাবই মেলে না। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিহীন চোখে টেবিলের উপরটার সোজা চেয়ে থেকে হঠাৎ সে ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। প্রায় দরজার মুখোমুখী গিয়ে অকস্মাৎ মনে পড়ে এতক্ষণ কি খুঁজছিল। ক্রমাল। ক্রমালটা কৈ ? ফিরে এসে আলুনা থেকে ক্রমাল নিয়ে প্রায় দৌড়ে সে বেরিয়ে গেল।

—কোথায় ছুট্টিস্ ? পথে অলকা ডাকে।

—এই-ই... ও কথা শেষ করে না।

—এই মানে ? শোন শোন...

—আসছি ছ'মিনিট। ও পিছন পানে হাত নেড়ে বলে, ধামে না।

নিচে এসে দেখল অপূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে কাছে এলে ও বলে—
দেখো ?

মুখ ভুলে দেখল প্রভাতী। ঘনঘোর মেঘ ঝোড়ো সমুদ্রের উত্তরোল চেউয়ের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে আসছে। ছাইরঙের মস্ত মস্ত পাহাড় মনেহয় ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে সারা আকাশে।

—বেরোও তো তাড়াতাড়ি—প্রভাতী হঠাৎ ওর হাতে টান দিয়ে বলে—বৃষ্টি এলে আর ক্যান্টিনে পৌঁছেচ !

ক্যান্টিনের প্রায় মুখটার যখন ওরা তখন বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি নামে। বাকী অল্প পথটুকু ছুজনেই দৌড়ে পেরিয়ে যায়। কয়েক বিন্দু জল প্রভাতীর নাকে-চোখে কপালে ছড়িয়ে থাকে। আর হঠাৎ ওর সহাস উৎফুল্ল মুখখানি পালকের মত দেখায়।

—কি ধাবে ? মুখোমুখী বসে ও জিজ্ঞেস করে।

—ভুমিই বলো।

—আমি ধাব না... খেয়ে এসেচি...বলো ?

—আবার নয় খেলে।

—না।

—খেলে ভালো লাগত আমার। ওর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে, নূনের পাজটা কাছে টেনে, আঙুল বলল অপূর্ব। বলে তাকাল না ওর দিকে, নূনের চামচটা দিয়ে বোঁচাতে থাকল সাদা ডাঁড়োটুকু। প্রভাতী চেয়ে রইল এক মুহূর্ত, দেখল ওর খেলা, তারপর মুখ ভুলে পাশে দাঁড়ানো বাচ্চা বয়সকে বলল—আমার জন্তে চপ একটা আর ওখানে অমলেট আর ফিশ ড্রাই...যা।

বাচ্চাটা কিছুটা এগিয়ে গেলে আবার ডাকল—আবে শোন শোন, সঙ্গে একটা টোস্ট দিস্ ।

তারপর অপূর্বর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—ভুমিতো আবার শুধু ডিম খেতে পারনা ।

অপূর্ব কথা বলেনি কোনো । প্রভাতীর মাথার ওপরের বাতিটা জ্বালা, আর ক্রক চুলে ইতস্তত জলকণার চূর্ণ হীরা ; সেই আলো আর হীরার মণি মাথায় চিক্চিক করে, চোখ ফেরে না অপূর্বর ।

—কি দেখচো কি ? প্রভাতী ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে নিজের মাথায় হাত বোলায় ।

ও হাঁ-হাঁ করে ওঠে, বলে—গ্যালো গ্যালো... এ্যাই !

—বাঃ !

—দিলে সব ডুবিয়ে ।

—কি যে বলো—প্রভাতী নিজের হাতটা চোখের সামনে নামিয়ে এনে দেখে, বলে—

জল ?

ও ঘাড় নাড়ে, চেয়ারটায় সম্পূর্ণ এলিয়ে বসে, বলে—

—কিছু নেই আর...মিশে গেছে সব চুলে...

—বাক্ ।

—এতক্ষণ ছিল আলাদা আলাদা, মনির মত, ফোঁটা ফোঁটা...আশ্চর্য দেখাচ্ছিল ।

—কার মাথা দেখতে হবে তো ।

—সত্যি !

ছেলেটা এলো ফিরে ওদের কথার মধ্যে খাবার নিয়ে । টেবিলে রাখল যখন প্লেটগুলো খটাখটু আওয়াজ হল ।

—অমলেটটা কৈ রে ? প্রভাতী জিজ্ঞাসা করে ।

—ভাচ্চে...খান্ না ।

প্রভাতী কিন্ ফ্রাইটা দিল ওকে আন্তে আন্তে এগিয়ে, নিজে নিল চপটা, তারপর বলল—ওটা দিয়েই শুরু কর ।

নীলবে ওরা খেতে থাকল কয়েক নিমেষ । বয়টা আবার এসে অমলেট টোস্ট দিয়ে গেল । গোলমরিচের শিলাটা এনে দিল অল্প টেবিল থেকে । শেষে একটু আড় বেকে বলল—চা ?

অপূর্ব এক সেকেন্ড ওর জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গি দেখল তাকিয়ে, তারপর হেসে ফেলল, বলল—হু'কাপ...পরে ।

প্রভাতী লক্ষ্য করেনি কিছুই, অন্তমনস্কভাবে বললো—জানো...অপূর্ব মুখ তুলে চেয়ে রইল, ও কথা শেষ করে না ; মুখ নিচু করে একটু চপ মুখে দেয় ।

—কি বলছিলে ?

—না কিছু না ।

অপূর্বর মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। কিছু সে বলল না, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। প্রভাতীও খেতে থাকে, দুটিটা কেবল তার ঘুরে যায় ওর মুখের ওপর দিয়ে।

—কী...বাগ ? হঠাৎ ও অপূর্বর টেবিলে রাখা হাতে ঠেলা দিয়ে বলে।

—বাগ আবার কি...তোমার এই অর্ধেকটা কথা বলার মানে বুঝিনে।

—নিজে যখন বলো ?

—তখন নিজে খুব চটো।

হু'জনেই ওরা হেসে ফেলে। প্রভাতী আবার চামচে চপ ভাঙতে ভাঙতে বলে—
কিছুই এমন নয়...হুপরে এস্তার ছবি তুলুম।

—কোথায় ?

—হস্টেলে...নিজেরাই...হু-হু !

—ছবি উঠলে হয়।

—না উঠবে কিসে...তখন এসো চাইতে...দেখাবো !

—উঠলে নিজেই আসবে।

—ইসু !

—নয় ? আমি না দেখলে নিজের ছবি নিজেরই ভলিও লাগবে না।

—খুব লাগবে, আহা...কী কথাই বলেন !

অপূর্ব হু হু হাসে, হাসতে হাসতে ধার, কিছু বলে না। বাচ্চা হু' পেয়াদা চা এনে রাখে টেবিলে।

—ধ্যাক্স ! অপূর্ব ওর পানে তাকিয়ে থেকে বলে। বাচ্চাটা এক মুহূর্ত হতবাক চেয়ে থাকে অপূর্বর মুখের পানে, তারপর সলজ্জ হেসে দৌড় দিয়ে চলে যেতে যেতে বলে—ধেং !

ওরাও হাসে। শেষে বাইরের ধরে আসা হুটির দিকে চেয়ে থেকে প্রভাতী বলে—
আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—হোলেই হল।

—বাবু, কাল থেকে আমার বিওরেটিক্যাল পরীক্ষা...

—তোমার তো বিওরেটিক্যাল...প্রাকটিক্যাল...সার্জিক্যাল লেগেই আছে।

—আছেই তো...ডাক্তারী কি অমনি অমনি...

—ছেড়ে দাও ডাক্তারী পড়া।

—ই্যা, সেই ভালো...রাস্তায় ক্যা-ক্যা করিয়ে।

অপূর্ব তখনি কোনো জবাব দেয় না, চারের পেয়াদা তুলে একটু ধার। তারপর পেয়াদাটা আবার টেবিলে রেখে বলে—

—হুপরে পড়লে না কেন ?

—বসেছিলুম তো, যেয়েগুলো দিলে পড়তে...সত্যি ! আমার মোটেই ভালো লাগছিল না হেঁটে।

—বেশ, তখন ওরা দেয়নি এখন নয় আমি দেবো না পড়তে । প্রভাতী চপের খালি প্লেটটা সরিয়ে রাখল নীরবে, জবাব দিল না তখুনি । চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দিল দু'তিনবার । তারপর চামচ দিয়ে অন্তমনে নাড়তে থাকল চা ; নাড়তে নাড়তেই বলল, ধীরে—তাতে সাত...পরীক্ষা খারাপ হলে তোমারও ক্ষতি ।

ওর কণ্ঠস্বর, নতদৃষ্টি, ফর্সা মসৃণ কপাল আর মাথার মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া সিঁদুরি সোজা রেখাটি হঠাৎ অপূর্বকে তাকাত করে দেয় । সম্ভার গভীরে স্থপ্ত এক ছবির যুগ্মযুগ্মী যেন ও চমকে দাঁড়ায় । মুখে কথা যোগায় না, শুধু কানে আসে কমে যাওয়া বৃষ্টির পিটপ্যাট মধুর শব্দ । বিছাৎ ঝিকার থেকে থেকে আকাশ জালিয়ে দিয়ে । মনে হয় আবার আসবে জল জিরিয়ে, আয়োজন সেরে । এবার বুঝি দু'কুসই ভাসাবে ।

—চলো, উঠবে ? হৃদস্বরে, আনুতোভাবে জিজ্ঞাসা করে অপূর্ব । প্রভাতী ওর পানে একবার তাকায়, তারপর আনুলা দিয়ে বাইরেটা দেখে । কিছুই চোখে পড়ে না, শুধু বৃষ্টি যায় ফিকে কালোর বুকে দাঁড়ানো জমা-অন্ধকার বড় গাছটার । কানে আসে অলস জল ঝরার তালহীন আওয়াজ ।

—বৃষ্টি পড়চে বোধ হয়... । বাইরের দিকে চেয়ে থেকেই আস্তে, প্রায় স্বগত উচ্চারণের মত বলে প্রভাতী ।

—কম...এখুনি হয় তো তোরে আসবে...এই বেলা বওনা দিই ।

—চলো । উঠে দাঁড়ায় প্রভাতী, তারপর বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলে—সকালে পরসী দিয়ে যাব...বুঝলি ?

—কেন আমি দিয়ে দিচ্ছি ।

—না । প্রভাতী বাইরের দিকে পা চালিয়ে বলল—এসো । বের করা পার্শটা গকেটে পুরে পিছিয়ে থাক । অপূর্ব ওকে অনুসরণ করে । বৃষ্টি থেমে গেছে ; ভিজ, সজল গাছ থেকে শুধু পিট-প্যাট ছোটো-বড় দানা-দানা জল পড়ে । নিচে'পিচের পথের যে জায়গাগুলো একটু অসমতল, সামান্য জল-জল, সেখানে কোনো কোঁটা ঝরলে সরব প্যাট একটা আওয়াজ হয়, খানিক জল ছিটিয়ে যায় চার পাশে । সমতল জায়গাগুলোর শব্দ কম, চাপা ; ঝরে আসা বিন্দুগুলোও কনিকেই মেলায় । মাঝে মাঝে কেবল হাওয়া দিলে, গাছগুলো ছলে বেজে উঠলে, ঝরঝর অথোরে একরাশ জলকণা ঝরে যায় । হঠাৎ মনে হয় বৃষ্টি এল ।

হস্টেলের বারান্দার ঠিক মুখে এসে গাড়িবান্দার তলার, ওরা দুজনেই মন্থর হল । কি যেন বলার এলো মনের কিনারে, প্রায় বাক্য হল ভাবার, কিন্তু তবু ঠিক ধরা গেল না । হাবিয়ে গেল যুহুর্ভটি হঠাৎ, শুধু প্রভাতীর মনটা গোলমেলে হয়ে রইল । বারান্দার ওঠার সিঁড়ীর প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে অপূর্ব বলল—আচ্ছা...প্রভাতী ঈষৎ হাসল, ম্লান । কিছুই বলতে পারল না । চলেও গেল না ভিতরে । স্থির হয়ে রইল একটু নিমেষ কর । তারপর একটু এগিয়ে এসে, হাতটা বাইরে বের করে দেখল জল আবার পড়ছে কি না ।

—আসেনি এখনো...বুড়ি। অপূর্ব বলে, হাসে অল্প। প্রভাতী ফিরে বারন্দার উঠে যায় ফের। অপূর্বর পানে তাকিয়ে থেকে বলে—কবে আসচ আবার ?

—দেখি।

—তার মানে ?

অপূর্ব হেসে ফেলে, বলে—আসব শিগ্গিরই।

তারপর সব কথা শেষ হয়ে যায় যেন। দু'জনেই চুপ করে বইল যুহুর্ভকর। মনে হয় অনেক কিছুই বলার ছিল এই যুহুর্ভে, অথচ কিছু খেয়াল হয় না। সব যেন কেমন পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যায়, অথচ অস্তিত্বের গভীরে, বোধের আবছা অন্ধকারে ঠিক নাড়া দেয় অব্যক্ত আকৃতি।

—চলি...। সিঁড়ীটা নেমে দাঁড়িয়ে বলে অপূর্ব, তাকিয়ে থাকে এক পলক ওর দিকে। প্রভাতীর বাড়ি আপনা থেকেই হেলে যায়। হাসি আসে না মুখে।

অপূর্ব বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করে। যুহুর্ভের জন্তে মনে হয় প্রভাতীর ডাকে ওকে। ডাকা কিন্তু হয় না। আরো এগিয়ে গেলে প্রভাতী ছ' সিঁড়ী নেমেই আসে, প্রায় যেন সাড়া দিয়ে উঠবে এবার। ওদিকে উপরের সিঁড়ী থেকে লোকের আওয়াজ আসে। প্রভাতী ফেরে, বারন্দার সিঁড়ীগুলি ওঠে ; ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ভিতর দিকে। শূন্য, রিক্ত বিষাদে ঘরে ঢুকেই হঠাৎ ওর মনে হয়, কেন ডাকলুম না ওকে ?

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অবসাদ আসে ওর সারা শরীর ঘিরে। কিছু আর ভালো লাগে না ; হাত পায়ে বিন্দুমাত্র জোর নেই। আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় এসে ও শুয়ে পড়ে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস কোন অতল থেকে উঠে আসে সারা দেহ কাঁপিয়ে। আর বাইরে, গাছের পাতায়, আবার সাড়া দিয়ে নামে ঝরঝরো অঝোর বৃষ্টি।

রবীন্দ্র-নাট্যের বৈশিষ্ট্য

দিগিজিটাল বক্ষ্যাপাধ্যায়

কিছুদিন আগে পর্যন্তও অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, ‘বিসর্জন’, ‘শেষ রক্ষা’, ‘চিরকুমার সত্তা’ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক অভিনয় কিনা? কিন্তু সম্প্রতি ‘রক্তকরবী’, ‘অচলায়তন’ ও ‘কালের যাত্রা’ নতুন প্রযোজনাপদ্ধতি ও অভিনয়আঙ্গিকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করে যে সাড়া পাওয়া গেছে তাতে একথা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত রূপক নাটকগুলিও কেবল বোধগম্যই নয়; সেগুলিকে সর্বসাধারণের রসাস্বাদনযোগ্য করেও পরিবেশন করা সম্ভব। খালি রূপসজ্জার পরিবর্তন এনেই নয়, বাচনভঙ্গিতেও আবৃত্তির সুর ত্যাগ করে যদি সক্রিয় আবেগ সঞ্চার করা যায় তবেই রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের প্রতীকধর্মী চরিত্রগুলির কথোপকথন নিছক তাত্ত্বিক বা কাব্যিক আলাপআলোচনা না হয়ে নাটকীয় সংলাপে পরিণত হতে পারে। চরিত্রের ‘মুড’ বুঝে সংলাপে ক্রোধ, ভীতি, উদ্বেজনা, দীর্ঘা, ঘৃণা প্রভৃতি ভাবগুলিকে বাস্তবায়ন করে প্রকাশ করতে পারলেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাষার আন্তর্য ভেদ করে নাটকীয় আবেদনটি বেরিয়ে আসে; নীরস তত্ত্ব তখন সহজ জীবনদর্শনে পরিণত হয়; নাটকের ভাষা কথোপকথনের (conversation) পর্যায়ে না থেকে সংলাপের (dialogue) রূপ পরিগ্রহ করে। গোটা নাটকই তখন গতিসম্পন্ন হয়, চরিত্রগুলি কেবল ভাবের প্রতীক না হয়ে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যারা সাহিত্যের গোড়ামি করে থাকেন তাঁরা এটাকে বলেন বিচ্যুতি। তাঁদের ধারণা কল্পিতকর্তে নিম্প্রাণ আবৃত্তির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের বর্ধা মর্দা দক্ষা করে থাকেন তাঁরা। দর্শকরা যে তাতে হাঁপিয়ে ওঠেন, হাই তোলেন, সেদিকে ভ্রক্ষেপও নেই তাঁদের। এই ধরনের রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে লোকের মনে এতদিন একটা ধারণা বহুশুল হয়ে গিয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি শুধু পঠিতব্য সাহিত্য, নাটকীয় উপাদানের বড়ই অভাব সেগুলিতে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে সাধারণ প্লে-র পর্যায়ে ফেললে আঙ্গিক বিচারে ক্রটিপূর্ণ বলেই মনে হবে। সাধারণ লোক যে ভাষায় সচরাচর কথা বলে থাকে, রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের পাত্রপাত্রিগণ সে-ভাষায় কথা বলে না। সাধারণ নাট্যশালার সঙ্গে বনিষ্ঠভাবে যুক্ত না থাকার ফলেই বোধ হয় এমনটি হয়েছিল। তাছাড়া আরো একটা দিক ভাববার আছে। কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত দার্শনিক সত্তাটিই বোধহয় শব্দ নির্বাচনে তাঁকে স্তব্ধ ও ভিন্নপথে প্রধাবিত করেছে। তাঁর নাটকের বাক্য রচনার রয়েছে কাব্যিক ভঙ্গি আর শব্দযোজনার রয়েছে বিরাট-বিশাল-মহানকে ধরবার চূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। তাঁর দার্শনিক মন

যখনই নাটকে কোন একটি তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছে, চিন্তাজগতের কোন বৈপ্লবিক সংঘাতকে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছে, তখনই তিনি তদুপযুক্ত প্রতীক শব্দ খুঁজেছেন এবং তারই ফলে স্থানে স্থানে তাঁর নাটকের সংলাপ হয়ে পড়েছে আলংকারিক। নাট্যকার সেক্সপিয়রেরও এই দার্শনিক মানস ছিল; কিন্তু সাধারণ নাট্যশালার সর্বসাধারণের সমক্ষে অভিনয় করতে হতো বলেই বোধহয় প্রধানত সাধারণের সহজবোধগম্য ভাষায়ই তিনি সংলাপ রচনা করেছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষার তাঁকেও বহু নতুন শব্দ আমদানী করতে হয়েছে এবং ভাবপ্রকাশে সুবিধের জন্য অসংখ্য ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি নাটকে সংস্কৃতভাষা বহু অপ্রচলিত সাধু বাংলা-শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। যে-ভাবকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই শব্দসম্ভার ব্যতীত তা প্রকাশ করা সম্ভব হতো কিনা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

এ হলো রবীন্দ্রনাট্যের রূপরীতি ও রচনানৈশলী সম্পর্কে সাধারণ করেকটি কথা। এবার তাঁর নাটকের ভাবসম্পদ সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা যাক। দু'টি চিন্তাধারা, দু'টি জীবনদর্শন, দু'টি উপলক্ষের যেমন তীব্র সংঘাত আমরা রবীন্দ্রনাট্যে প্রকট দেখতে পাই, সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে তা বিরল। রবীন্দ্রনাট্যে এমন ভাবসংঘাত আছে যা কেবল জাতীয় জীবনের ওপরই আলোকপাত করে না, আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও মনকে ভাবিয়ে তোলে, সচেতন করে। রবীন্দ্রমানসের অসীম বিস্তৃতি ছিল বলেই জাগতিক চিন্তাধারার একটা অখণ্ড রূপ তাঁর নাট্যসাহিত্যে ধরা দিয়েছে এবং একারণেই রবীন্দ্রনাট্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্যের সমপর্যায়ভূক্ত।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাব-সংঘাতের মধ্যে যে মানবিক আবেদন রয়েছে এখন সংক্ষেপে তার করেকটি উদারণ দেবার চেষ্টা করবো। প্রথমে তাঁর বিসর্জন নাটকের কথাই ধরা যাক। নিঃসন্তান রানী গুণবতী ছাগশোণিতে দেবীর তৃপ্তি সাধন করে পুত্র পেতে চান। প্রবোচনা দেন পুরোহিত রঘুপতি। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও নিম্প্রাণ ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা পুরোহিতত্বকে টিকিয়ে রাখতে চান তিনি এই অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাবাত ক'রে মানবতাকে উর্ধ্বতুলে ধরাই বিসর্জন নাটকের মূল লক্ষ্য। রঘুপতির মোহমুক্তির জন্য প্রয়োজন হলো এক প্রচণ্ড আঘাতের। প্রাণপ্রতিম জয়সিংহ আত্মবিসর্জন করে রঘুপতিকে দিয়ে গেল সেই আঘাত এবং সেই আঘাতেই প্রাণহীন ধর্মাচরণের অসাড়তা তিনি উপলব্ধি করলেন। তাই জয়সিংহের আত্মবলিদানের পর রঘুপতিকে দেবীর সামনে বিলাপ করতে দেখা যায় :

“দেখো দেখো, কী করে দাঁড়িয়ে আছে
জড় পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মুক, পশু, অন্ধ ও বধির। তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে।
পাষণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারা ভাঙিছে আছাড়ি। হা-হা-হা-হা !

কোন্ দানবের এই জুর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া ।
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অটহাস্তে নির্দয় বিজ্ঞপ ।
দে কিরায়ে জয়সিংহে মোর দে কিরায়ে ।
দে কিরায়ে বান্ধনী পিলাচী

(নাড়া দিয়া) শুনিতে কি
পাস ? আছে কর্ণ ? জানিস কি করেছিস ?
কার রক্ত করেছিস পান ? কোন্ পুণ্য
জীবনের ? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতিভরা
মহা হৃদয়ের ?

থাক তুই চিরকাল
এই মতো—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস ।
দিব তোর পূজা প্রতিদিন পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে । তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু কিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে । কার কাছে কাঁদিতেছি ।
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীবে । লঘু হ'ক
জগতের বন্ধ ।”

এই আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশে, যেখানে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস অক্টোপাশের মতো লোকের
মনকে জড়িয়ে আছে সেখানে রঘুপতিকে দিয়ে গোমতীর জলে প্রতিমা নিক্ষেপ করিয়ে
রুবীন্দ্রনাথ অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন । বিসর্জন নাটকেই তাঁর অকুতোভয় ও
গতিশীল মনের যথেষ্ট পরিচয় পাই আমরা ।

তারপর আসা বাক তাঁর মুক্তধারা নাটকে । মনের উদারতাও প্রসারতাকে সংকুচিত
করে মানুষ যখন নিজশক্তির গর্বে ক্ষীণ হয়ে ওঠে তখন সে ভেঙ্গে পড়ে তার নিজেরই
অন্তর্নিহিত আঘাতে—এই হলো মুক্তধারার তান্ত্রিক বাণী । এই মূল সত্যটিকে প্রকাশের
জন্তেই তিনি মুক্তধারার বাঁধাটিকে প্রতীক করে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সংঘাতের সাহায্যে
নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন । শক্তিকে কল্যাণে নিয়োজিত না করে রাজা যখন চাইলেন
তাকে পীড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে, তখন রাজারই অতিপ্রিয় পালিতপুত্র অতিথিৎ
নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে মুক্তধারার বাঁধ দিলেন ভেঙ্গে । জীবন দিয়ে জীবনের প্রবাহকে

দিলেন এগিয়ে। এই মুক্তধারায়ই ধনঞ্জয় বৈরাগী নির্ভীকতার এক মূর্ত প্রতীক। রাজা বগজিৎ যখন তাকে ভয় দেখাচ্ছেন : তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বই কি। নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমার কাজ।

রাজা। অমন পাগলামি করে আমাকে তোলাতে পারবেনা।....মাধবপুরের প্রায় দু'বছরের খাজনা বাকী—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ দেবো না।

রাজা। দেবে না এত বড় আশ্রয়।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারবো না।

রাজা। আমার নয়।

ধনঞ্জয়—যা আমাদের উদ্ধৃত্ত তাই তোমার পাওনা। আমাদের ক্ষুধার নয় তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ নয় যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী অনমনীয় বিদ্রোহী আত্মার প্রতীক চরিত্র। কাজেই সে অবধ্য, অহাঙ্গ, অজের। দুর্বলের ওপর সবল যখন অত্যাচার করে তখন দুর্বলের আত্মাই করে প্রথমে বিদ্রোহ। প্রতিরোধ জৈবধর্ম। তারই একটা ব্যাশনাল রূপ ধনঞ্জয় বৈরাগী।

রবীন্দ্রনাথের তপতী নাটকে আমরা কি দেখতে পাই? জালন্ধররাজ বিক্রম কাশ্মীর বিজয় করে কাশ্মীরকর্তা সুমিত্রাকে এনে পাটে বসান; রাজকর্তব্য ভুলে গিয়ে ছুট্টের দমন না করে প্রজাপীড়ক অত্যাচারী কাশ্মীরী অমাত্যদের শাস্তি না দিয়ে, রাজা চান সুমিত্রাকে খুশি করতে। সুমিত্রার তাতে তৃপ্তি নেই, আনন্দ নেই। তাই দ্রবতীর্থে মার্তণ্ডমন্দিরে সুমিত্রা যান শক্তির আরাধনা করতে। অগ্নিশয্যায় আত্মাহুতি দিয়ে তিনি রাজাকে করেন মোহমুক্ত। প্রজাপুঞ্জই রাজার প্রধান কর্তব্য। - সেই মহত্তর কর্তব্যক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি যখন আনন্দ পেতে চান, তৃপ্তি পেতে চান ক্ষুদ্রতার মধ্যে, সংকীর্ণতার মধ্যে তখনি তাঁর পদাঙ্কলন হয়। যে সুখের আশায়, ভোগের আশায় মানুষ নিজের কর্তব্যকে ভুলে যায় তার যে সেই সুখ সেই ভোগ লাভ হয়না, তপতী নাটকে রবীন্দ্রনাথ একথাটিই স্পষ্ট করে ভুলে ধরতে চেয়েছেন এবং সূচনাসংগীতেই নাটকের সেই মর্মবানী ব্যক্ত করেছেন :

সর্ব ধর্মতাবে দহে তবে ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।

দূর করো মহাক্রোধ
বাহা মুগ্ধ, বাহা ক্ষুদ্র,
মুড়্যবে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।

হৃৎখের মননবেগে উঠিবে অমৃত
শক্তি হতে বর্জ্য পাবে বাবা মৃত্যুভীত।

তব দীপ্ত রোদ্ভ ভেজে

নিখুঁত রিয়া গলিবে যে,

প্রস্তুত-শৃঙ্খলোদ্ভূত ত্যাগের প্রবাহ ।”

তারপর দেখুন ‘রক্তকরবী’ নাটকে কবি কি বলেছেন । শক্তি করায়ত্ত করে বণিকতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে যখন সাধারণ মানুষকে শোষণ করে তখন তথাকথিত ধর্মকেও তারা কিভাবে নিজেদের স্বার্থের অমুকুল কাজে লাগায় তারই নিখুঁত চিত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটকের একটি জায়গায় । বণিকনিয়োজিত ভণ্ড গৌসাইঠাকুরকে দেখে সর্দার বলেছে : এই-যে বলতে বলতেই উপস্থিত । প্রভু, প্রণাম । আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশাস্ত হয়ে ওঠে । এদের কানে একটু শাস্তিমন্ত্র দেবেন — ভারি দরকার ।

গৌসাই । এই এদের কথা বলছ ? আচ্ছা, এরা তো স্বয়ং কুর্ম-অবতার । বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকে আছে । ভাবলে শরীর পুলকিত হয় । বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা, শরীর পবিত্র হল যে-নামাবলিধানা পায় দিয়ে মাথার ঘাম পায় ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই । একি কম কথা । আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাকবে । বাবা, একবার কণ্ঠ ধুলে বলো ‘হরি হরি’ । তোমাদের সব বোঝা হাক হরে থাক । হরিনাম আদাবস্তে চ মধ্যে চ ।’

মজ্জুর ফাণ্ডলাল যখন গৌসাইর ভণ্ডামিতে চটে গিয়ে বলে : “এতক্ষণ অবিচলিত ছিলাম, কিন্তু আর তো পারিনি । সর্দার এত বড় অপব্যয় কিসের জন্তে । প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সহিব না ।”

গৌসাইর কণ্ঠে তখন ভণ্ডামির সুর কোমলতর হয়ে ওঠে : “বাই বলো সর্দার, কী সরলতা । পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে । বুকেছ ?....”

তারপর গৌসাইজীকে বলতে শোনা যায় : “বাবা, দস্তানপাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মুর্খতা-গরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজ্জেছে । মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল ব’লে । তবু আরো ক’টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো । কেননা, নাহং কারাং পরো রিপুঃ । ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পাল্লা ।....”

লেনিন বলেছিলেন : “Religion is the opium of the people,” অহিংসের মতো ধর্মের নেশায় লোককে ভুলিয়ে রাখা হয় । শোষিত, নিষাতিত, নিপীড়িত মানুষের চেতনাকে স্তিমিত করে রাখার জন্তে শোষকশ্রেণী কিভাবে ধর্মকেও অস্ত্রহিসেবে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথও তারই একটি জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন । লেনিনের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না ; কিন্তু মানবপ্রেমিক দুই মহাপুরুষের মধ্যে চিন্তার কি আশ্চর্যরকম মিল । এজন্তেই মহান কবিকে বলা হয় সত্যদ্রষ্টা-ঋষি ।

ত্রুটি মার্জ'নীয় অনাদি মণ্ডল

সহস্র অট্টালিকা-সমবিত্ত বাগিন নগরীর পূর্বপ্রান্তে বিজয়োদ্দীপ্ত সোবিয়ৎ-বাহিনীর দুর্মদ পদসংকার শোনা গেল।

এসেছে তুর্কী ইউক্রেনিয়ান দূরদূরান্তের হ্যামলেট থেকে, যারা হাজার হাজার সবুজ গমের মাঠ পেট্রোল আর গ্যাসোলিন দিয়ে পুড়িয়ে উন্নত জার্মান বাহিনীর অগ্রগমনকে করেছে মন্থর ; এসেছে স্ট্যালিনগ্রাদের সেই বজ্রকঠিন সেনারা, যারা অক্ষয় জীবনতুকে দেশকে করেছে লাজনামুক্ত ; এসেছে নবীন পাইওনিয়র দল, প্রাণবান বীর্যবস্তায় শত্রুকে সমূলে উৎপাটন করার জন্যে যারা কৃতপ্রতিজ্ঞ। তারা এসেছে, আসছে, দলে দলে, কাতারে—বাধভাঙ্গা বিপুল জসোস্রাসের মত ; শত শত মর্টার আর মেসিনগান তাদের প্রসন্নমুখ, আকাশে আকাশে তাদের রক্তপতাকার লেলিহান শিখা, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্জয় স্পৃহা !

যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ; উদ্বেগ বোমচারী বিমানের মুহূর্তে অগ্নুংগার আর নিয়ে শেল, মর্টার আর ক্র্যাকারের নিরবিচ্ছিন্ন বর্ষণের মধ্যে ধীর অধচ প্রতিজ্ঞা-তীক্ষ্ণ সৈনিকদের মার্চ ! আরও নিচে মাটি তপ্পর গুপ্ত মাইনের হুহুকার। সোবিয়ৎ-বাহিনী এগিয়ে চলেছে রাইখ চ্যান্সেলারীর পথ ধরে, যার গুহগহ্বরে লুকিয়ে রয়েছেন একদা-বলদর্পী ভয়কাতর হিটলার—যাঁর অত্যাচারে শ্মশান হয়েছে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ডের লক্ষ মাইল এলাকা, যাঁর বর্বর অট্টহাসি শত শত পিতৃহারা, মাতৃহারা, পতিহারা নরনারীশিশুর অবারণ ক্রন্দনে প্রতিধ্বনিত ! সৈনিকদের প্রতিজ্ঞা,—ঘৃণিত কুমিকীট হিটলারকে গর্ভ থেকে বার করে জবাব চাইবে এত কান্না, এত ক্ষুধা, এত হাহাকারের।

সেদিন ১৯৪৫-এর ৩০শে এপ্রিল। রাইখ চ্যান্সেলারীর গোপন কক্ষও এমন এক বীররসাত্মক নাট্যাংশ অভিনীত হচ্ছিল যা ওজোপুণে নিঃসন্দেহে বাইরের সমতুল। কট্রোল-রুমে বসে সেনাপত্য করছেন হিটলার ; শহর-রক্ষার শেষ চেষ্টায় ভরিত নির্দেশ দিকে দিকে পাঠাচ্ছেন বেতাবে কিন্তু প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধ করে ? বুঝলেন, যুদ্ধে জয় অসম্ভব ; ‘অসম্ভব’ কথাটা একবার অলক্ষে ছিটকেও গেল এই বর্ণলিপ্সু একনায়েকের মুখ থেকে ; নেপোলিয়নের মত তিনিও একবার, এই একবারই মাত্র, মূর্খদের অভিধানের মূলভাষ্য পদটি উচ্চারণ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ডাকলেন—ক্রুনি ?

পাশের দরজাটা উন্মুক্ত হোল নিমেষে। বেরিয়ে এলেন ইভা ব্রাউন—হিটলারের একান্ত সচিব, সখী ; ললিতকলায় পারঙ্গম যে ইভা।

চোখে চোখে রেখে বললেন হিটলার—সব ব্যর্থ হোল ক্রুনি ! জার্মান ভাষা মানবজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে আমার জীবনভোর সাধনা ব্যর্থ হোল ! কিন্তু আর দেবী নয়—

হিটলার গভীর প্রেমে সঙ্গিনীকে শেষবারের মত চুম্বন করলেন। তারপর পিস্তলের মুখ চাপলেন নিজের কপালে আর ইভা হাতে নিল বিষবটিকা।

হুনিয়ার মতামত যাই হোক, হিটলার কি নিজের কাজের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন কিঙ্কিন্দ্র ? তিনি কি কখনও কোন শাস্ত সমাহিত মুহূর্তে ভেবেছেন কত বড় অভিযাপ ডেকে আনছেন মানবজাতির মাথায়, আর এ অমার্জনীয় অপরাধ তাঁরই ?

দুটি প্রশ্নেরই উত্তর নড়াশক। উপরন্তু হিটলার সকল সময় ভেবেছেন, মানবজাতির যত্নকামীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ ; আর অত্যাচার ধ্বংস ‘একটু-আধটু’ যা হয়েছে তা তাঁর চেষ্টার পরিপূরকে—চিকিৎসক বিষ ফোড়ায় ছুঁচি চালান যেমন, রোগীকে নিরাময় করার কারণে।

হিটলারও কিশলয়ের মতো কচিশিশুদের ভালবাসতেন এবং শোষিত অবহেলিত আশ্রয়ডগ্‌স্‌দের জন্যে তাঁর প্রাণ কঁদত—অন্তত এই ধারণা নিজেকে বিশ্বাস করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। যদিও তাঁর ধারণা যে বেঙ্গলের মতো ভিতর-কাঁপা—চার্লি চ্যাপলিন গ্রেট ডিক্টেটর ছায়াছবিতে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তা উদ্ঘাটিত করেছেন।

সুতরাং দুঃখ যদি তাঁর আদৌ হয়, তা হয়েছিল দুটো কারণে (১) যুদ্ধে পরাজিত হলেন ; (২) নরমেঘ বজ্রটা মনের মত হতে হতেও হল না।

ঐ ঘটনার ঠিক ২৮ বছর আগে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রাপ্তির প্রায় একই দৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পার্থক্য শুধু এই, এটা আত্মহত্যা আর সেটা নিছক হত্যাই।

বিগত রাজনীতির অঙ্ককার তখনও ভাল করে কাটেনি ; কুয়াশাভরা সেই ভোরবেলার বিশজন ভীষণদর্শন গ্রহরী মার্গারেট জিলে’কে নিয়ে এল বধ্যভূমিতে। সর্বশেষ ক্যাসানের কান্চে সবুজ পোশাক তাঁর অঙ্গে, মাথায় হ্যাটটি নিখুঁত ভঙ্গিমায় পরা, সুদৃশ্য স্বর্ণজালিকা তাঁর মুখমণ্ডলে, হাতে গ্লাভ্‌স্‌....

বাইবেল হাতে নিয়ে পুরোহিত কন্পিভকণ্ঠে উচ্চারণ করছেন—করগিভ্‌মি মাই লর্ড....

মার্গারেট ঝিলুঝিলু করে হাসলেন—করগিভ্‌ !....হোয়াইট মনসেন্স ! কেন, আমি কি দোষ করেছি যে তুমি চাইব ভগবানের কাছে ?

পুরোহিতের পায়নে নাক থেকে ধসে পড়ল ; এমন অস্বাভাবিক-কথা বাহ্যিকের বসন্তে এই প্রথম তিনি শুনলেন।

এ হাসি ঠিক ভেমনি, যেমনটি শোনা যেত ছায়াছলোছলো ‘বুলেভার্ড’এ, যখন মার্গারেটের কানে কানে কথা কইতে গিয়ে উচিত কারণেই অকস্মাৎ নীরব হয়েছেন করাসী কোটিপতি। আলোকোজ্জ্বল অপেরা হাউসে বিলোল নৃত্যহিন্মলের মধ্যে সকল-গুপ্তবার্তা বিনিময়ের পর যে চটুল হাসি হাসতেন মার্গারেট—এ হাসি ঠিক সেই রকম, ভিন্নতা নেই এতটুকু !

মার্গারেট জিলে, জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের H-21, সাধারণ্যে মাতাহারি—গুপ্তচরবৃত্তির অবিখ্যাত ক্রিয়াকলাপের জন্যে মানুষের কাছে নৃতিমান প্রহেলিকা ; পীণপয়োধ্যরা, স্বর্গীয়

দেহস্বয়মায়ুক্তা মার্গারেট একই সঙ্গে ফ্রান্স ও জার্মানীর শত্রুতা করেছেন বিবদমান উভয় শিবিরে গুপ্ত খবর পাঠিয়ে। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থ ও দেহলালসা; দেহদানের ব্যাপারে বাদবিচার না মানাই ছিল তাঁর রুচি।

সেই মার্গারেট ওরফে মাতাহারি জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বলছেন—আমি কী দোষ করেছি যে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইব ?

ইতিহাস বলে, ব্যাটেভিয়ার পাঠরতা কস্তার ভবিষ্যৎ ভেবেই কিঞ্চিৎ চিন্তিতা হয়েছিলেন মাতাহারি—কলঙ্কময় জীবন বা ঘৃণ্য গুপ্তচরবৃত্তির অন্তে বেদনা বা অনুতাপের লেশমাত্রও ছিল না তাঁর মনে।

নিয়মিত পাপকর্মের দ্বারা বিবেকবুদ্ধির নিঃশেষ ঘটিয়েছিলেন হিটলার, মাতাহারি। এঁদের ক্রটি অস্বীকার করা যদি ব্যতিক্রম ঘটনা-বিশেষ বলে ভাবেন, তবে শুধু—

‘আমার জামার তলার রয়েছে ক্রান্ত অথচ করুণার্দ্ৰ হৃদয় বা মানুষের কতি করতে নারাজ।’

কথাগুলো ক্রাউলীর। ক্রাউলী, নিউইয়র্কের পয়লা নম্বর গুণ্ডাবদমায়েস—গত বিশদশক নিউইয়র্কবাসীদের ভীতসন্ত্রস্ত রেখেছিল যে প্রতিমিত ! এই ক্রাউলীর ধরা-পড়া এক চমকপ্রদ ঘটনা।

বিশ্বস্তমূত্রে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ওয়েস্ট এণ্ড এভিনিউ-র একটা বাড়ি ঘিরে ফেলল ১৯৩১ সালের ৭ই মে। বাড়িটা ক্রাউলীর নয়—তাঁর প্রণয়িনীর।

একশত পঞ্চাশজন পুলিশ এবং ডিটেক্টিভ বাড়িটার চারপাশ আর ছাদ ঘিরে রইল ক্রাউলীর পালাবার পথ রুদ্ধ করে। ওদিকে প্রকোষ্ঠের দ্বারদ্বার বন্ধ করে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলো ক্রাউলী। পুলিশ ছাদে গর্ত করে কাঁছনে গ্যাস ছাড়লো; কিন্তু বিশেষ কল না ধরায়, আশপাশের অট্টালিকার মেশিনগান বসাল আর এক ঘণ্টারও অধিককাল ধরে নিউইয়র্কের সর্বশ্রেষ্ঠ আবাসস্থল পিস্তল ও মেশিনগানের শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ক্রাউলীও চেয়ার আর টেবিলের ভূপের আড়াল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গুলী চালিয়ে চলছিলো পুলিশের প্রতি ! প্রায় ৫ হাজার উত্তেজিত জনতা সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল এই খণ্ডবুদ্ধি ; ঠিক এমন ঘটনা নিউইয়র্কে হ্রস্ব !

ক্রাউলী ধরা পড়লে পুলিশ কমিশনার মলকুনী ঘোষণা করলেন, নিউইয়র্কের যে সমস্ত ধুনীদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত সংঘর্ষ হয়েছে ক্রাউলী হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত। কমিশনার যশাই আরও জানালেন—হুহাতে পিস্তল চালিয়ে চোখের পলকে এ ধুন করতে পারে যে কাউকে !

কিন্তু ক্রাউলী, সব্যসাচী ক্রাউলী, নিজেকে কিরূপ ভাবতো ? আরবা জানি সে খবর। কারণ ঐ চাকল্যকর লড়াইএর মাঝেই সে একটুকরো কাগজে লিখেছিল কয়েকটা কথা বা জবাবদিহির মতো আজ শোনায়। সেই কথাকটি ৫ প্যারা আগেই লেখা আছে

—আমার জামার তলার আছে ক্লান্ত অথচ কল্পগাঢ় হৃদয় যা মানুষের কতি করতে নারাজ ।

এ ক্রাউলী সেই ব্যক্তি যে খানিক আগে লং আইল্যান্ডে খুনখারাবী করে বেড়াচ্ছিল আর এমন সময় বিনা যেষে বজ্রপাতের মতো আবির্ভূত হলো পেট্রলিং পুলিশ !

—আপনার লাইসেন্স দেখি, অত্যন্ত সোজানুজিভাবে দাবী করলেন আরক্ষিক ।

—দেখাচ্ছি । ক্রাউলীর হাত কিন্তু পকেটে না গিয়ে গেল বন্দুকের হাতলে আর শরতের একপসলার মতো এক ঝাঁক বুলেট ঝাঁজরা করে দিলো পুলিশম্যানের বক্ষদেশ । যুঁয়ুঁ পুলিশ মাটি নিলো আর ক্রাউলী গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে দীর্ঘায়িত শরীর থেকে ধুলে নিলো রিভলবারখানা । পবে মৃতকে লক্ষ্য করে গুলী করল আর একবার । কল্পগাঢ় হৃদয়ই বটে !

বিচারে ক্রাউলীর ইলেকট্রিক চেয়ার হোলো । ক্রাউলী কি তাতে বলেছিলো—এ আমার মানুষ মারার শাস্তি ? উহ, তা নয়, বলেছিলো—এ আমার নিজেকে রক্ষা করার অক্ষমতার মানুষ !

দম্ভদম সেট্রাল জেলের জটনক সুপারকে একবার জিগেস করেছিলাম—আপনারা তো জেলখানাকে মোরাল ডিসপেন্সারী বলে থাকেন ; কিন্তু ‘রোগীরা’ কি নিজেদের ‘রোগ’ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকে ?

বলতে ভুলে গেছি, এই প্রবীণ সুপার অত্যন্ত দিলুখোলা মানুষ । তিনি আমার প্রশ্ন শুনে পুরো ৬০ সেকেন্ড হেসে বললেন—রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ? না রোগ-না-থাকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ? তারা নিঃসন্দেহ থাকে বটে যে সবাই ধর্মরাজের সন্তান, বুদ্ধিষ্টির আপন ভাই !....

আমি চাপ দিলাম—আপনার মতটা একটু পরিষ্কার করে বলুন ।

বললেন—রাজবন্দী বাদ দিয়ে খুনী আসামী, গুণাবদম্যদের আমি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতাম । কারণ আমি মনস্তত্ত্বে এম, এ পাশ করেছিলাম এবং মনের অলিগলি খোঁজা আমার ‘হবি’ও বলতে পারেন । আমি দেখেছি খুনী বদম্যদের অতি নগণ্যসংখ্যা জেলখানার নিজেদের ধারণা ভাবে । তারা সন্মাই আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ—অস্ত্রত তাদের ধারণা ! এমন আসামীর সংস্পর্শে এসেছি যে নিজেকে বিখ্যাত লোকদের সমকক্ষ ভাবে—না, না, হাসবেন না, সত্যিসত্যিই সে এমনটি ভাবত । এরা মনের সঙ্গে ধারণাগুলো মানিয়ে নেয় আর লোককে বোঝায়ও তাই । তারা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে কেন খুন করেছে বা সিঁদ কেটেছে অথবা ধর্ষণ করেছে । আর তাদের ‘শুচিস্থিত’ অভিমত হলো—তারা খাঁটি, বিচারকদের বটে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি থাকলে কখনই তারা এদের জেলে পচতে পাঠাতেন না ।

এবার আপনাকে একটা সোজানুজি প্রশ্ন করব । যুদ্ধবাজ হিটলার, হুচরিত্রা

মাতাহারি, ওতা ক্রাউলী এবং অন্যান্য খুনী বদমায়েসরা যদি নিজের দোষ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও না দেখে তবে আমি আপনি—যারা অতীব ভক্ত, শাস্ত-নিষ্ঠ, যাদের প্রাণ পোষ-মানা—এমন আমরা যে দেখব না, সে কি বেশি কথা ?

নিদারুণ নিষ্ঠুর সত্য এই যে কোন মানুষই নিজের দোষ দেখতে পায় না, যেমন দেখতে পায় না নিজের পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠপ্রদর্শনও বড় লজ্জার—সমান লজ্জাকর অপরের মুখ থেকে নিজের কৃষ্টি শোনা । এটাই মানুষমাত্রের গোপন দুর্বলতা, একিলিসের পা । আমি আপনি এবং আর সবাই এই গুপ্তকৃত বহুদলে ঢেকে রাখতে চাই । এখানে হাতপড়া আর সাপের লেজে পা দেওয়া একই কথা ।

মানুষ ব্যক্তিগত গর্বের অভ্রংশিহ সৌধ গড়ে তোলে এই দুর্বলতার নরম মাটিতে । কেউ চায় না সমালোচনার গুরু আঘাতে সেই সৌধ নাড়া খায় ; নাড়া মানে যে ভেঙ্গে-পড়া ।

সুতরাং যখনই আপনি কোন মানুষের সংস্পর্শে আসছেন, সে আপনার মনিব হোক বা চাকর হোক, স্বামী হোক বা স্ত্রী হোক, পিতা হোক বা পুত্র হোক—দোষ দেখাতে গুরু করবেন না । সহানুভূতি দিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করুন । অপরকে স্বমতে আনবার এইটাই সর্বোত্তম অস্ত্র ।

ডাঃ জনসন্ বসন্তেন—‘মশাই, স্বয়ং ভগবানও মানুষের দিন না ঘুরানো পর্যন্ত তার বিচারে হাত দেন না ।’ আমি আপনি কেন দেব বলতে পারেন ।



শ্রীএস. এস. ভাসান প্রযোজিত ও পরিচালিত জেমিনীর বিরাট অবদান
ইনসানিয়াং চিত্রে দেবানন্দ ও বীণা রায়

মাইকেলের সমাধি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দাঁড়াও পথিকবর ! বিষণ্ণ বিকেল
 এখন আফিস ছুটি । হৃদয়ের গান
 তথাপি বিষণ্ণ ! তুমি ক্লান্ত হেঁটে এলে
 সারকুলার...পার্কটি...রাত্রির কামান
 কোথায় শিকার বোঁকে ! তাই কল্পমান
 অলিত চরণ, চলো, স্থির-মৃত্যু কেনে
 সামনে নিয়তি । কিন্তু মৃত্যুহীন প্রাণ
 তোমাকে ডাকছে, বুঝি, অন্ত-কোনোখানে
 অন্ত-এক চেতনায় ! কান পেতে শোনো
 সে-মহাসংগীত ! দেখ, পৌড়জন যাতে
 আনন্দে ক'র্বে পান, সে-সুখা এখনো
 তোমার সম্মুখে স্থির !...যন্ত্রণার রাতে,
 কথা রাখো, চেওনাকো দুঃখে ঘুমাতে—
 তারচেয়ে তাঁর সুখ দেখ, তাকে চেনো ॥

শান্তির জন্য রামেন্দ্র দেশমুখ্য :

গঙ্গার জেটিতে দাঁড়িয়ে একলা
মাথরাতে আকাশের দিকে মুখ করে'
আমি যেন সহসা দীর্ঘ হতে লাগলাম,
ক্রমে দীর্ঘতম হলাম চরাচরে
মেঘলা আকাশে হাত বেধে দাঁড়ালাম ।

যখন আশ্বিনের হাফা মেঘ স'রে গেল
তখন চোখে পড়ল মাইলের পর মাইল
দিগন্ত এখন জ্যোৎস্নায় ফুটফুটে ।
একদিকে দেখছি আফ্রিকার শাহারাকে ঘুরে
অন্যদিকে ইউক্রেনের শস্তের মাঠ ।
আহা পৃথিবী,
পৃথিবীর এমন বিসম্বদ রূপ ।

মুখ নিচু করে নিজেকে খুঁজতে লাগলাম,
এক অবাক দীর্ঘ দেহচূড়ার আমার চোখ দুটি
গভীর আবেশে বুজে গেল ।

আমি কবি ।
কতদিন অস্পষ্ট জলছবির মত পাহাড়ে পাহাড়ে
মারামুগের পেছনে পেছনে
আমার চেতনার ব্যর্থ শব্দ সন্ধান না করেছি ।
ফুলকে খুঁজেছি, মূলকে খুঁজিনি,
প্রকৃতির বেদনার বিহীন হয়ে
লোকালয়কে ছেড়ে অলৌকিককে খুঁজেছি ।

আমি

আমার চূড়ান্ত চিন্তার বেদনা মছন করে
প্রথমে পেলাম ছুটি চোখ ।

আমি বাদী

কান্নার জমাট রক্তে মরা হৃদয়ের মত
বাদীর ছুটি চোখ ।

ইতিহাসের বিস্মৃত গহ্বর থেকে
অন্ধকারে ককিয়ে উঠল আমার যৌবন,
অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলাম যুক্তিকে
কিন্তু অল্লাহ কণ্ঠ চেপে ধরল,
কেলে দিল আমার লাশকে টেনে
দিল্লীর কোন অন্ধকূপের অতলে ।

হেমন্তের কুয়াশায় ভেজা রাতের মাঠে
আমি চাষী ।

আমি নীল-বিজ্রোহের ফেরারী নায়ক
সহসা আমি পালাতে শুরু করলাম
যখন আতংকে শুরু গ্রামের পর গ্রাম,
গ্রামের যখন অদ্ভুত বয়সী
আমার ছুটি চোখে তখন স্থণা,
স্থণার মশাল ।

পেছনে ইংরাজের কুকুর তাড়া করছে
বাংলার নলবনে আমি লুকিয়ে গেলাম,
শতবর্ষ আমি লুকিয়ে কাটিয়েছি
আমি মরিনি ।

মহাবাষ্ট্রের পিতামহী

আমার আত্ম প্রার্থনা করেছিল জামু পেতে
তবু মায়ের বাহর ডালে ঝরে গেছি
আমি শিশু ।

মজুরের উঠানে আমি কুল ছিলাম,
কিংবা ছিলাম কুকলাসের মত,
কুলের মত ফুটে উঠতে পারিনি,
কোরকেই ধরে গেলাম ।

আমি ছাত্র ।

বসন্তের আকাশে কুসুমচূড়ার মত
কতবার রক্তে রং রেছি ।
আমাকে রেহা দেয়নি সরকার
গুলী করেছে আমার প্রাণ-পায়রাকে,
বস্ত্রান্ত করেছে বসন্তের মেঘকে ।
দেশের দুদিনে আমি যেহেতু
প্রতিবাদের পেখম ধরেছিলাম
পঞ্জাবে, মাদ্রাজে, পাটলিপুত্রের পথে পথে ।

অথচ,

সেই আমি মরনি
সেই আমি গংগার কূলে দাঁড়িয়ে
দেখছি ভলগাকে, দেখছি হোয়াংহোকে আজ ।
নিবিড় আবেশে শুনছি শান্তির কোরাস,
আমারই জীবনের জয়গান নতুন পৃথিবীতে
ক্রেমলিন থেকে পিকিঙের কণ্ঠে গান,
শত্রুতানকে শেষ করতে হবে ।

আমাদের এই রাতে

হাওয়ার পাল ভুলে' ভুলোর মত
জাহবীর জলথারার উপর দিয়ে
লোকে লোকে আমিও ছড়িয়ে গেলাম
শান্তির উত্তর-সাধক আমি ।

অবল্য আলোক সরকার

বিকেলবেলা ফিরে আসার পথে
হু-হাত ভ'রে এনেছিলুম সোনালী এক মুখ ।
অস্ত্র রঙ, অস্ত্র সুর তারা অনেক ভালো
আমি তাদের মেনেছি অপরূপ—
সবাই এক মিলিত শ্রোত অসীম শপথে ।

সন্ধ্যা হ'লে দ্বিধির শুভ্র নীরবতায়
আলোর নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে দেখি সোনালী মুখ ।
সোনালী মুখ—বিকেলবেলার পরিপূর্ণতার
সমন্বিত ধূপ ।
ফিরে যখন এলো, পেলেম দিগ বিজয়ী অনন্তাকে ।

সবার মধ্যে একটি আলো মৌল মহিমায়
আমি তাকে চিনতে পেরেছিলেম এই আনন্দ ।
অপর আত্মানের ভাষা—শ্রদ্ধা নিয়ে নিবিড় দূরে থাকি ।
সোনালী মুখ—স্থির বিশাল ছন্দ
অসম্ভব সরোবরে ভাসিয়ে দেবো ব'লে
তাকে নিয়ে যবে ফিরেছিলেম বিকেলবেলায় ।

অবশ্য সত্যব্রত ঘোষ

কোনদিন

অজ্ঞানে, পউষে, কিংবা মাঘের শেষের
উত্তরে হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়াবার
যে-স্পর্শ আয়ত্ত করেছিলুম,
ভেবেছিলুম, উত্তর পাহাড় চূড়ার মতো
অপক্লপ রূঢ় চেতনায় নিম্নেকে উদ্ধত করবো,
ভেবেছিলুম, আমার রক্ততাই আমার বর্ম হবে, আমাকে বাঁচাবে

যদিও বা

তারপর কেটে গেল কী করে জানি না,
হেমন্তে বসন্তে গ্রীষ্মে
মহন সহজ স্থগ্য মুহূর্তের ধারা,

যদিও বা

বিজিত সময়গুলো
আমার কেটেছে
শাসকের স্পর্শিত বাহর জবন্ত আলোকে,

আমি কেব

উত্তরে হাওয়ার মুখে
আখিনে, অজ্ঞানে,
উন্নত গভীর

এক মূল্যবান অধ্যায়ের প্রয়োজনে
সেই সাহসিকতার ব্যাকুল প্রত্যাশী,

আমি কেব সজ্জিত হবো ভালোবাসার শ্রামল ভূষণে
আকাশ সমুদ্র পৃথ্বীর অপরিমিত গভীর আবেগে,

কেননা, এখনো আমি বেঁচে,
আমাকে বাঁচতে হবে ॥

গোধূলি মানস রায়চৌধুরী

যদিও চাইনি, তবু কখন এসেছে। তুমি নেমে
হাওয়ার সৌরভ নিয়ে। বেলাশেষে আলোর মহিমা
ছুয়ে গেছে এ' চেতনা, হৃদয়ের পল্লবিত সীমা
বডিন সায়রাহ রঙে—উচ্ছ্বসিত অপূর্বের প্রেমে।

দিনান্তের স্তব্ধকণে স্নান আলো যখন হৃদয়ে
অল্পপম স্পর্শ রাখে, কিংবা দূরে বকুলের ডালে
উদাসী হেমন্ত-রোদ রঙের আশ্চর্য দিখা জালে—
তখন এসেছে তুমি প্রেমিকের আকুল প্রত্যয়ে।

এই যে ক্ষণিক আসা, মুহূর্তের দ্রুত পারাপার
উচ্ছ্বাসে ভরালো প্রাণ—দেখ তবু সেই চেতনার
গভীরে মলিন ছাপ কী করুণ। হিম যন্ত্রণায়
ধরধর প্রান্ততুমি। ব্যথামৌন কাটিকের রোদে
বরং উপেক্ষা ভালো। শীত পীত ঝাপসা কুয়াশায়
এই পথ ঢেকে থাক—থাকি মগ্ন নিরাসক্ত বোধে।

কখন সে চলে গেছে দীপংকর দাশগুপ্ত

কখন সে চ'লে গেছে । আলোনিরালোকে
তার মুখ রহস্যের আবরণে ঢাকা ।
সে যেন আমার নয়, আমি অন্তলোকে
নির্ধাসিত ।

নিষ্পলক চোখ মেলে যদি তাকে ভাবি,
চকিত আলোয়
যাকে উদ্ভাসিত দেখি, তার কাছে দাবি
কোনোদিন ছিলো না আমার ।

ভুলে যাবো এই ভেবে ভরে কেঁপে উঠি,
অথচ কখন গেছি ভুলে ।
যে ছিল প্রাণের সঙ্গে মিশে—
আমার হৃদয়ে
যে ছিলো সর্বস্ব জুড়ে সে বুঝিবা ভেসেছে অকূলে ॥

ছন্দনা

উৎপলকুমার বসু

আখ্যাসের ভালোবাসার মাটি ।

তুমি তাকে আহত করো, নিষ্পেষিত করো,
অশ্রুজলে ভেজাও—

সেই আহত নিষ্পেষিত মাটি কখনো মৃদু কণ্ঠে
কখনো আশ্চর্য শ্রুঙ্গ ধ্বনিতে গান গাইবে,
আখ্যাসের ভালোবাসার গান ।

সে মাটির বুকে যদি কোনোদিন সূর্যের তাপ না পৌঁছায় ;
স্বচ্ছ কাঁপনের পর্দায় চাঁদের আলো ম্লান হয়ে জলে
তোমার কারুণ্যে ;

তখনো অম্লচ্ছ গানের ঢেউএ তুমি ভাসবে—
যদি বিশ্বাস করো এই হাসুহুহানার সস্তারকে—
যদি বিশ্বাস করো, তার সৃষ্টিতে
আখ্যাসের ভালোবাসার মাটি ।

তার চেয়ে দূরে চলো—চলে যাওয়া সহজ স্বীকৃতি
মুঠো ধুলে...কাছের কপাট ধুলে....
ছন্নার পেরিয়ে....

অনিদ্রার তলে তলে
পৃথিবীর ক্লান্তি—অব্যবহারে ঘাস জাগানো খেয়াঘাটের মত
নিরানন্দ—বিমর্ষ দৃষ্টির কোলে, আরো আখ্যাস,
ভালোবাসায় সে প্রবাহিতা স্রোতকে চায়
বৈধে রাখতে—

ভাই শিকড়ে শিকড়ে প্রেমের শৃঙ্খল গড়ছে
শীর্ণ আড়ষ্ট আঙুলে চিরদিন
তোমার বৌবনদীপ্ত হাতখানি ধরে রাখবে বলে ।

শাকওয়ালী

সরলা বসু

রাতদিনের কি পটোল ছপুরের অবসরে গিয়েছিলো পাশের কলোনীতে দেশের লোকের সাথে দেখা করতে। সারাদিন কাজ, বাসনমাজা, জলতোলা, বাটনা-কুটনো, সাবান কাচা, গুল ঘুটে, এই নিয়েই দিন চলে। ছপুরের অবসর ঘণ্টাছই সময় তাও সেজোগিনীর ছোটো ছেলেটি রাখতে হয়, এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় ঘুরে। মাসি বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে যেতো সে কাঁকড়াগাছিতে, ছ'একদিন থাকতোও। আজ ছ'বছর হলো সে বালাইও নেই।

সারাদিন কাজ ; ছপুরবেলার অবসরটুকুতে মনটা যেন কেমন করে—কোথাও যাই যাই। বুকটার ভেতর ছাঁৎ ছাঁৎ করে। তাই গিয়েছিলো বিপিনের বোয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে শুনে এল বেশ ছ'চার কথা।

বিপিন নাপিত ওর গায়ের লোক। এ-বাড়ি ও-বাড়ি। পটোল যখন বিধবা হয়ে গাঁয়ে ফিরে এল তখন পটোলের বাপ পিরো কর্মকার বেঁচে।

এই বিপিন ছিল এককালে সুরে মিস্তিরের পাঠশালার ছাত্র। রামায়ণ মহাভারত মেঘনাদ-বধ পর্যন্ত পড়তে পারে।

পিরোনাথ বিপিনকে ডেকে বললো,—বাবা, ওকে তুই পড়া। আমি ওর আবার বিয়ে দেবো। বিদ্যাসাগর মশাই কতো বিধুপা বিয়ে দিয়েছিলেন তারপর ঐ স্বর্ণলতা রামমোহন রা'র মেয়ে কতো ছড়া বেঁধেছিল পৌষ-পার্বণের শুবরেয়। পিরোনাথ যেমন বলা আর যায় কোথা, সেখানে ছিলো ভুবন পিসি, সারা গ্রাম রটে গেল পত্র-পল্লবে, বিপিনের সঙ্গে পটোলের বিয়ে এই আখ্যান মাসেই।

পিরোনাথের মনিব বোস-বাবুদের কানে পৌঁছালো এ-কথা।

বোসদের ছোটবাবু ডেকে বললেন, পিরোনাথ, কি শুনছি? পিরোনাথ কাঁচু-মাচু হয়ে বলে, ওসব কিছু নয়, ছোটোবাবু। আমরা হলাম গরীব-গুরো মানুষ ; ঐসব কি আমাদের সঙ্গে তবে নেহাৎ মনের দুঃখে বলে ফেলে দিইলাম।

—আমিও তাই বলি, নাপিতের হাতে মেয়ে দিয়ে জাতকন্ম খোয়াবার মতো লোক নয়ই পিরোনাথ। তা, আমরা থাকতে তোমার মেয়ের কোন কষ্ট হবেনা।

হলোও তাই। বছরের মধ্যে পিরোনাথ সকল জালা জুড়িয়ে স্ত্রী-কন্যার কষ্ট দূর করে দিয়ে গেল। সেই থেকে পটোল মায়ের সাথে বোসবাবুদের ভাড়া-ভানে। মায়ে-বিয়ে ঢেঁকি টেনে গোক-টোক পুষে কোনো রকম ছোটো গালে মুখে দিত।

ধানচালের দাম গেল বেড়ে। সাড়ে তিনটাকা ধানের পালি। মানুষে খেতেই পায়না, তার ধান ভানাবে! বোসবাবুরা এখন আর ধান ভানালে চাল দেন না। দেন ছ' এক আনা পরমা। তাতে কি হবে?

দত্তদেব ঘোষালবাবুর মুখে ক'লকাতার কন্ট্রোলার সন্তা চালের কথা শুনে গোকুটা বেঁচে ছুটো খেয়ে বাঁচবার জন্য এসেছিলো মায়ের-ঝিয়ে ক'লকাতায়। তারপর তো পটোলের মা সন্তা-গণ্ডা খেয়ে-দেয়ে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাজলে সশরীরে স্বর্গলাভ করলো। সেই থেকে বোস-বাবুদের মেয়ে উমাদিহির বাড়ি পটোল কাজ করে। পেটে-ভাতে প্রায়। সামান্য কিছু মাইনে ধরা আছে মাত্র।

উমাদি বলেন, কাঁচা টাকা হাতে পেলে সোমন্ত মেয়ের বয়সে-পানা বাড়বে। ও আমাদের কাছেই পরিণামের জন্যে গচ্ছিত থাক, শেষকালে তিখি-খন্ডো করিস। মাঝে-মাঝে ছ' এক আনা পটোল এটা-সেটা করতে নেয়।

পাকিস্তান হওয়ার বিপিন এসে ঘর বেঁধেছে বাস্তহারী কলোনীতে। বিপিনের বিয়ে হয়েছে গ্রামের কালো নাপতের মেয়ে কিকুণীর সঙ্গে। ছেলেমেয়েও হয়েছে ছুটো। মাসি মরবার পর থেকে মনটা ধারাপ লাগলে মাঝে মাঝে যেতো বিপিনদের বাড়ি। বিপিন বাড়ি থাকলে ভালো মুখে ছ'একটা পান-দোস্তা দিতো। হিংসুটে কিকুণীটা ওকে ছুচোক্ষেরই দেখতে পারতো না। আজ বিপিনের অসাক্ষাতে বেশ ছ'চার-কথা শুনিয়ে দিয়েছে। তাই পটোল গজর-গজর করতে-করতে ফিরছিলো মহিষের খাটালের জলাটার পাশ দিয়ে।

গো-ভাগাড়টার পাশে আমতলার বসে শাকওয়ালী শূখী বুড়ি শাকের আঁটি বাঁধছিলো। সেখানে পটোল দাঁড়িয়ে গেল। রোদ্দুর পড়েছেও খুব! চৈত্রমাসেই যেন বৈশাখ বৈষ্ঠ্যর গরম।

পটোল বললো, শাকওয়ালী মাসি কিন্তু বেশ আছে, কোনো ঝই-ঝকার নেই; বেশ কিন্তু এই বিনামূল্যের ব্যবসা।

শূখী বুড়ি ভেঁলে-বেগুনে জলে ওঠে, বলে, সেই জালায় তো পুতো-শুগীদের বুকে আঙন জলে। করলিই তো পারো, এই বিনামূল্যের ব্যবসা।

সাবাদিন খুঁড়ে ছুটো কুশো বেল, বুনো কবমচা, ছুটো ডুমুর, তেলাকুচো পাতা, কচুর লতি, কচুশাক ভুলে এই পনের বছর আরামের ব্যবসা করছি। আগে তবু ছুডো শাক-পাতড়া মিলতো, পাকিস্তানী আঁটকুড়িদের জালায় মাঠে-ঘাটে একটা বিমে শাকও মেলেনা। কোনো পুকুরে এটা শালুক হিঁক দেখতে পাবা? সব শতক-খোয়ারীরা পুতোশুগীরা, ভালো মন্দটার চিন্তায় দেচ্ছে। এখন এই গো-ভাগাড়ের জলাটায় গোক-ঘোড়া মহিষ কুকুর পচা গছ। তাই আঁটকুড়ির কিরা আসেনা বলে ছুই একটা শুসুনি শাঁচি পাওয়া যায়। জল নেই, বর্ষা নেই, রোদ্দুর পুড়ে জোঁকে-পোকে কাটছে। হাত-পা হেঁজে পচে ধসে যাচ্ছে। কেমন আরামের ব্যবসা করতিছি, একবার করে ছাখোনা বাপু?

পটোল বলে,—রাগ করো কেন মাসি? রাগের কথা তো কিছু বলিনি।

আগ আবার কি ! সব মুখপুড়ীয়ে আমার এই ছুডো শাক-পাতার হিংসে করে । বুড়ি গজ গজ করতে থাকে । পটোল খানিক বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায় ।

বুড়ির গজর-গজর আরও বেড়ে চলে । ওসব আমি বুঝি, ওসব আমি বুঝি । পানদোস্তা খেয়ে কপালে টিপ পরে মরোদ ভুলানো নয় । এ সুখী বুড়ির চোখ । ছ'ডো শাক পাতা দেখে নোলা করছে ।

বুড়ি গজ গজ করতে করতে শাকের বুড়ি মাথায় নিয়ে লাঠিটা ভর দিতে-দিতে চলে যায় ।

পটোলের সারাদিনের ভূত-খাটুনির অবসরটুকু ঐ ছপুরবেলাটার ওর মাথায় ঝতো ভূত চাপে । মন কেবল যাই-যাই করে । আজও পারে-পায়ে চললো ঐ ভাগাড়টার দিকে ।

থু—থু কি বিত্ৰী গজ ! কে একটা মরাকুরুর কলে দিয়ে গেছে বটগাছটার ওখানে ।

একটু দূরে আমতলাটার সুখীবুড়ি আজও শাকের আঁটি বাঁধছে ; ও দাঁড়ালো সেখানে । সুখী দেখেও দেখলো না । সে আজ হিঞ্চে কলমী শুসুনি পেয়েছে প্রচুর ; শুছিয়ে আঁটি করতে অনেক দেয়ী হবে ।

পটোল বলে, মাসি ! আজ তো শাক পেয়েছো বেশ ।

বুড়ি গর্জে ওঠে—কেন তোদের বাবার তালুক থেকে খাই না পারি ? আমার ছ'টো শাক দেখলে এমন ছংরে মরো কেন ?

ছংরাতে যাবো কেন মাসি, মানুষের সুখ দেখলে খুশিই হই । দেখি তোমার শাক-গুলি আঁটি ক'রে দিই ।

পটোল ক্ষিপ্ত ও সূনিপুণভাবে আঁটিগুলি বেঁধে ডালায় সাজিয়ে দেয় । চারবটোর কাজ আধ বটোর করে ।

পটোল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, মাসির কেই বা আছে, দেশই বা কোথায় ?

সব খেয়ে বসে আছি, বাপু । বাড়িঘর কেউ থাকলে কি এই গো-ভাগাড় ছুঁড়ি ।

আমারও ভিনকুলে কেউ নেই মাসি । সবল গতোর । যাই বেলা গেছে ।

পটোলের যাওয়ার পথে চেয়ে বিজ্ঞের মতো মাথা হুলিয়ে বুড়ি বলে, তোমার এ হলদী বুঝতে বাকি আছে, ছুঁড়ি ? এখানে ফুট-কাটতে দিচ্ছিলে ।

তারপর দিনও পটোল এসে হাজির । কাপড় থেকে কতোগুলি ধানকুনি পাতা, বিরমি, পুসর্ণবা শাক চলে দিল, মাসি এই নাও । ওদের কতো বড়ো বাড়ি, যেখানে-সেখানে কতো শাক-পাতড়া হয়ে আছে, তাই তোমার জন্তে চাটি আনলাম । বুড়ির সঙ্গে শাকের আঁটি বাঁধতে লাগলো ।

—আচ্ছা মাসি, তুমি থাকো কোথায় ? রান্না-বার্না বা করো কখন ?

বুড়ি একটু নরম সুরে বলে, আমার আবার রান্না আর থাকে । থাকি ঐ বাজারের ফলের দোকানের পেছনের ছাঁচতলায় । শীত-জল কিছুই মানায় না । এই থাকি । আর

খাওয়া—ভোর থেকে এই নিয়ে বাজারে পড়ে থাকি। তারপর মাথায় জল দিয়ে ছোটো পান্ডা কড়ো-কড়ো মুখে দিয়ে এইখানে। সন্ধ্যাবেলা উঠুনে হাঁড়ি চড়াই। কোনোদিন চড়াইওনে। যমের দোরে কাঁটা দিয়ে বসে আছি, মা। বুড়ির চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

পটোল বলে, কাঁদিসুনি মাসি। চোখের জল যেন ফুরিয়ে গেছে। চোখে সাত-সুন্দুর উথলে পড়লেও ভগবান হুঃখীর হুঃখ দেখেন না।

এমনি ছপুয়ের অবসরে পটোল রোজই আসে। তার যাই যাই মনকে ধরে রাখতে পারে না, বেরিয়ে পড়ে।

কোনোদিন শাক, কোনোদিন বিমলির কাছ থেকে একটু ছাঁচা পান, কোনোদিন উমাদির কাছ থেকে পাওয়া একটু মোহন-ভোগ বুড়িকে খাওয়ায়। আর বলে, খাও মাসি, সুজিটুকু বেশ নরম, খাও, তোমার দাঁত নেই।

বুড়ির অবিশ্বাসী মন কিছুতে বাগ মানে না। মনে-মনে বলে, মার পোড়ে না পোড়ে মাসির,—তোমার এত দরদ কিসের?

বসন্ত আসে। দূরে শিমুল গাছটায় ফুল ফোটে। উদাসী শ্মশান-হাওয়া ভাগাড়-বাসিনী সুখীর পুরানো দিনের স্মৃতির বেশ নিয়ে আসে ভিমিত বোলাটে চোখে। পটোলের শেষ-বরণ খাঁপানো চুলে। হয়তো বুকে।

গ্রীষ্ম আসে। পচা ভাপসা গন্ধে মাছি ভিন্ ভিন্ করে।

বর্ষা আসে। চৈচোবাসে পূর্ণ হয় জলাটা। নীল শালুক ফোটে। কলমী, হিঞ্জে শুসুনি মতেজ নতুন সত্য ভরে যায়। বটগাছটার পাতাগুলো কিল্মিলু করে। আমের পল্লবে ঘন-সবুজের প্রলেপ লাগে।

পটোল যেন খুঁজে পেয়েছে খানিকটা স্বস্তি। ছপুয়ের অবসরে মাসির শাক গোছানো তার দৈনন্দিন কাজ। মাসি তাকে ভালো চোখে দেখে না, সে জানে। তবু তার যেন না-এসে চলে না।

আর সুখীর অবিশ্বাসী মন পটোলের নিঃস্বার্থতার এখনও সায় দেয় না। তবু পটোলের আসা যেন তার ভালো লাগে। ভাবে হয়তো মেয়েটা ভালো। বিনা কারণে কেউ তার সঙ্গে কথাটিও বলে না। অকারণে আসে শুধু ঐ মেয়েটা। প্রাণ ভরে মাসি বলে ডাকে। আসে আশুক, তবে একটি কলমীও নিতে দেবো না ভাঙাড় থেকে এও সত্যি।

পটোলের আসা-যাওয়া হলো এক বিপত্তি। উমাদির ছোটো মেয়ে কুণ্ডু অশুধে-অশুধে যিন-বিনে হয়ে গেছে। কোলে ছাড়া থাকে না। একদিন ছপুয়ে পটোলকে না পেয়ে যা তা বললেন। সোমন্ত মেয়ে যেখানে-সেখানে যাওয়া, এ কেমন! ভদ্রলোকের বাড়ি থাকতে হলে ভদ্র হয়ে থাকতে হয়। রাতদিনের কি যখন তখন যেখানে ইচ্ছা যাওয়া চলবে না।

পটোল আর কোথাও যায় না। সারাদিন ওই যিন-বিনে মেয়ে নিয়ে থাকতে হয়।

তিস্ত হয়ে ওঠে ওর মন। আগে উৎসাহে তাড়াতাড়ি সে কাজ করতো কখন মাসির ওখানে যাবে। আজকাল কাজ যেন হতেই চায় না।

সুখী শাকওয়ালীও পটোলের পথ চেয়ে থাকে। একদিন যায়, দু'দিন যায়, তবুও পটোলের খবর নেই। কি জানি মেয়েটার অসুখ করেনি তো? শাক যেন আর আগের মতো তুলতে পারে না সুখী। আর তোলে যদিও আঁটি গোছানো তেমন হয় না। কাঁপা হাতে শাক গোছায় আর পথ চায়।

উমাদি মেয়ে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবেন, পটোলকে সঙ্গে যেতে হবে। যাবার আগের দিন ছুটি নিয়ে ভাগাড়ে এসে দাঁড়ালো।

সকাল থেকে আজ দমকা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে। দূরে বুড়ি বড়ো এক বোঝা কচুশাক মাথায় করে লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটু-জল ভেঙ্গে আসছিলো। পটোলকে দেখে কেমন একটা মনের ব্যস্ততায় জলের মধ্যে বৃত্ত মহিষ-গোরু ফেলা এক ধণ্ড বাঁশে বেধে ছন্দুড়ি ধেয়ে পড়ে গেল। পটোল হা হা করে গিয়ে টেনে তুললো।

সারা গা বাঁশে ইটে ছড়ে গেছে। রক্ত পড়ছে খুব। বাম উরুতে বাঁশ বিঁধে বেশ চোট লেগেছে। বুড়িকে আমতলায় নিয়ে এলো। কাপড় জল-কাদায় একসা। পায়ে জোঁক ধরেছে ছাঁচারটে।

পটোল বুড়িকে মোছাতে মোছাতে বলে, কেন তুমি এমন বৃষ্টিতে শাক তুলতে এলে, মাসি? আহা-হা এমনি করে কোনদিন বেঘোরেই প্রাণটা যাবে। আহা-হা বড্ড লেগেছে।

সমবেদনায় গোপন অভিমানে বুড়ি ছুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, আর বলে,—প্রাণটা গেলে তো বাঁচতাম। তাহলে তো আরামের ব্যবসা করতি হতো না। এ কাহর প্রাণি যে বেরোবার নয়।

পটোলও অভিমানের সুরে বলে, সেই কথাই শুধু মনে করে রেখেছো। আমি বুঝিনি বলে বলেছিলাম। আমি চলে যাচ্ছি মাসি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

বুড়ি বোকার মতো জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পটোল বলে, ওরা হাওয়া বদলাতে যাবে তাই সঙ্গে যেতে হচ্ছে। ফিরতে বোধ হয় অনেক দেরী হবে।

বুড়িকে ধুইয়ে-মুছিয়ে জোঁকগুলো দোক্তার থুথু ফেলে মেরে দেয়, বলে চলো তোমাকে রেখে আসি।। আর এমনি ঝড় জলে এসো না মাসি।

সুখী উত্তর দেয়, না এলে চলবে কি করে? সব খেয়েছি তবুতো পেটের আগুন নেভেনি, মা।

বর্ষা গেল। শরৎ এলো। পল্লবাকীর্ণ হয়ে উঠলো বন-ভূমি। সোনালী বোজের ঝিলমিলানি নামে ভাগাড়ের কলমিলতা চেঁচো ঘাসের মাথায়। সুখী লাঠি ভর দিয়ে রোজই ভাগাড়ে আসে কিন্তু শাক তোলে না একটিও। আমতলাটার বসে বসে সারা

বেলাটা কাটায়। কি যেন ভাবে আর মাথা থেকে খুঁটে খুঁটে উঁকুন মারে। স্তিমিত চোখে চেয়ে থাকে সরু পথটির দিকে।

পুজো এলো। দূরে বাজনা শোনা গেল। দুই একজন লোকের যাতায়াত হলো সেই পথে। কানায়-কানায়ভরা জলার কালো জলে উজ্জ্বল টুপনি কৈ, শিঙি মাঙরের মেলা বসলো। কতো বাগদী মেয়ে ছাঁকা জালে ধরতে এলো মাছ। পিছনে তার ছাংটো কাদা মাথা ছেলের হাতে খালুই।

শরতের পর হেমন্ত এলো। টুপ টুপে শিশির ঝরলো বাবলা গাছটার মাথায়। বাবলা ফুল ঝরলো ছটো। সত্যরঞ্জন সুলটার পাশে শিউলিতলায় জমলো শিশুদের ভিড়। ঝরাশিউলির যুঁহু-গন্ধ মিলানো ভোরের বাতাস ছড়িয়ে দিলো ভাগাড়ের ঝিমোনো গাছের মাথায়।

এলো শীত। কনুকে হিমেল উত্তুরে বাতাস। শালুক হিঞ্জে, শুসুনি ভরা জলা শর শর করে কাঁপিয়ে কার আগমনী আনিয়ে গেল।

শীতের ছপূরের মিঠে রোদে আমতলায় বসে সুখী জ্বরের কাঁপুনী কাঁপে। শাক-খুঁটুনি মেয়েরা সবাই এগিয়ে বলে, মাসি, তোর ভাগাড়ে ছটো শাক খুঁটবো।

বুড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। আমের পাতা ঝরে পড়ে। বউলে ছেয়ে যায় গাছটা। শুকনো পাতায় মিষ্টি ভ্রাণ ওঠে। বউলের গন্ধে মৌমাছির গুন্ গুন্ করে। শীতের বুক চিরে শিশু বসন্তের আগমনীর বাঁশী বাজে।

বসন্ত আসে। পথের দেবদারু গাছে কচি পাতা গজায়। ভাগাড়ের পূবকোণের গাব গাছটায় লাল পল্লব খোকা খোকা ফুলের মতো দেখায়। কাণ্ডন প্রাতে বরা যুকুলের গন্ধে কুয়াশায় জলাভূমি হয়ে ওঠে চঞ্চল—যুধর। কচিশাক-শিশুরা চক-চকে রোদ্দে ঝিলঝিলিয়ে হাসে।

সবাই আছে, শুধু দেখা নেই সুখীর।

চৈত্র এলো। শন্ শনে মক্ক-হাওয়ার ঢেউ লাগলো ভাগাড়ে। ছপূরের অবসরে একদিন আবার পটোল এসে দাঁড়ালো আমতলায়।

ভাগাড়ে গরু ছাগল চরছে। খুঁটুনি মেয়েরা শাক জ্বলছে দূরে। পটোল এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ওগো খুঁটুনিরা, এখানে সুখী শাকওয়ালী আসে না?

খুঁটুনি মেয়েরা উত্তর দিলো, নাগো না, তার বড়ো ব্যামো হয়েছে; উঠতি-ইঁটতি পারেনা।

পটোলের মনটা যেন উলোট-পালোট করে উঠলো। চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দ, ভাগাড়ের শূন্যতা বুকটার ভিতর হা হা করতে লাগলো।

সে বাজারের দিকে ছুটলো। ফলের দোকানের আড়োটাড়াড় শূন্য—সুখী নেই। বুকের ভেতরটা ছাঁক করে উঠলো। দোকানী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো, সুখী শাক-ওয়ালী কোথায় গেল?

—ওই যে হোখা, ডাষ্টবিনটার পাশে বটতলায়।

পটোল ডাকলো, মাসি-মাসি, আমি এসেছি।

বটতলার একখানা চাটাইয়ের পরে একখানা ময়লা কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে সুখী। কতোগুলো ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের স্তুপ। ভাঙা কলাইকরা বাটিতে একটু বালি।

পটোল সুখীর মাথাটা কোলে তুলে মুখ নিচু করে ডাকলো, মাসি!

সুখীর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখখানি উজ্জল হয়ে উঠলো। বিহ্বলচোখে চেয়ে বললো,—কে, পটোল এলি মা?

পটোলের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে সুখীর চোখে মুখে।

সুখী শীর্ণ হাতখানি পটোলের গায়ে বুলিয়ে বললো, কাদিসনে মা। তোকে দেখবার সন্তি জীবনটা এখনও বেরোয়নি। আমার বারা ছিলো সব যে খেয়ে পেট ভরে বসে আছি মা।

সুখীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। পটোল নিম্নের আঁচলে মুছিয়ে দেয়।

সুখী মৃত্যু-শীতল ঠোঁটে হাসির আভাস এনে বলে, আমার মা নাম রেখেছিলো সুখী। সোয়ামী ছিলো মিস্ত্রী। হাওড়ার নতুন পুলটা হবার সময় পুল থেকে পড়ে পচে-গলে হাঁসপাতালে মারা গেল। ছেলে ছিলো খিদিরপুর ডকের কুলি। বৌ-নাতি সমেত মরলো বুমা পড়ে।...আর ছিলো আমার সোঁদামিনী...বুড়ির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। ভোর মতো দেখতে। এই বয়েস, রংটা শুধু কালো। মেয়ে জামাই মরলো আকালে, না খেয়ে।

বুড়ি হাতড়ে-হাতড়ে কাপড়ের মধ্য থেকে হুঃখের সঞ্চিত কয়েকটি টাকা পটোলের হাতে দেয়, বলে, তুই আমার দামিনীর মতো, এই দিয়ে ফলফুলুরির ব্যবসা করিস, মা! হাঁকিয়ে থুক থুক কাশতে কাশতে মাথা উঁচু করে দম্ব নিতে থাকে। আবার মাথাটি পটোলের কোলে ঢলে পড়ে, দম্ব আর করে না। পটোল হুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ডাষ্টবিনের পাশ দিয়ে ছুটে কুকুর জড়াঝড়ি করতে করতে ছুটে গেল। কুকুর-দৌড়ানো হাওয়া লেগে ডাষ্টবিনের জঞ্জালের, সুখীর ময়লা শাকড়ার, বালির বাটির মাছিগুলি ভন্ডনিয়ে উঠলো।

অশ্রুমতী

ভূর্গেবিভ

অনুবাদক—শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

॥ ১৮ ॥

এই নিদারুণ ঝড় তুফানের রাতে আমার ঘরে সুসানার হঠাৎ আবির্ভাবে যতখানি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি অভিভূত হলাম তার লেখা পাণ্ডুলিপি পড়ে। সারা রাত দু' চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। ভোর হতে না হতেই জরুরী চিঠি লিখে একজনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ফাস্তোভের কাছে। চিঠিতে জরুরী তাগিদ ছিল পত্রপাঠ মন্ডো চলে আসা চাই, নইলে তার অনুপস্থিতিতে যারাস্বক কিছু ঘটে যেতে পারে। সুসানার সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার লেখা পাণ্ডুলিপির কথাও উল্লেখ করতে পারলাম না। চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে সারা দিন আর বাড়ি থেকে বার হলাম না। সুসানাদের বাড়িতে এখন কি ঘটছে তাই নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগলাম বসে বসে। অথচ ওদের বাড়ি যাওয়া সম্বন্ধে মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। এদিকে মাসিমা যে আমার আচরণে বিরক্ত হয়েছেন তা তাঁর হাস্যচালে প্রকাশ হতে লাগল। একটি অপরিচিতা কুমারী মেয়ে রাতের অন্ধকারে একা আমার ঘরে এসেছিল, দুজনে আমরা অনেকক্ষণ নিরীবিলা কাটিয়েছি—আর যাবার সময় সে কঁদতে কঁদতে গেছে। সে সব খবর গোপন থাকেনি তাঁর কাছ থেকে।

মাসিমা ত কল্পনানেত্রে দেখতে লাগলেন তাঁর বোনপো অতলস্পর্শী বিরাট গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে আর তাঁর দীর্ঘশ্বাস, আর্ত কান্না আর বিলাপের বিরাম নেই। পরের দিনও উৎকণ্ঠিত আগ্রহ নিয়ে ফাস্তোভের পথ চেয়ে রইলাম। অন্তত একখানা চিঠিও আসবে। সুসানাদের বাড়ির কোন খবর নেই আর তারা আমাকেই বা খবর পাঠাতে যাবে কেন? জানে সুসানা হয়ত আমারই আসার পথ চেয়ে আছে। কিন্তু ফাস্তোভের সঙ্গে একবার দেখাশাক্ষাৎ না করে ওর সঙ্গে দেখা করার মত মনের জোর আমার ছিল না। তাকে যে চিঠি লিখেছি তার প্রতিটি অক্ষর আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, ভাবোন্মদনার চিঠির ভাষা হয়ত-বা একটু কৰ্কশ হয়ে থাকবে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে ফাস্তোভ এসে উপস্থিত হল।

॥ ১৯ ॥

ওর আসার ভঙ্গিটিতে কোন চঞ্চলতা দেখতে পেলাম না আমি।

ফাস্তোভ তার স্বভাবমূলত দ্রুত অথচ দৃঢ় পা ফেলে ঘরে ঢুকল। ওকে কেমন যেন

বিবর্ণ ক্যাকাশে দেখাচ্ছিল। অস্তুত আমার চোখে সেইরকমই লাগল। সূর্য দেহে ট্রেন ভ্রমণের শ্রান্তি জড়িয়ে। কিন্তু মুখে তার অদম্য বিশ্বাস, কোঁতুহল আর অধুনি। সেইটেই আমার কাছে নতুন বোধ হল। এ-রকম স্বক্সাবেগের অভিজ্ঞতা যে ওর খুবই কম তা বেশ বুঝতে পারলাম।

আমি ছুটে গিয়ে ওকে আলিঙ্গন করলাম। আমার চিঠি পেয়েই যে ও চলে এসেছে তার ক্ষমতাবাদ দিলাম বন্ধকে। তারপর সুসানার সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি ওর হাতে দিলাম। জানলার ধারে বেধানটার বসেছিল সুসানা, সেও সেইখানে গিয়ে বসে পাণ্ডুলিপিটি পড়তে আরম্ভ করে দিল। ঘরের আর এক ধারে একটি কোণ বেছে নিয়ে আমি একখানা বই খুলে বসলাম। কিন্তু পড়া আমার মোটেই এগোচ্ছিল না। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে বই পড়ার ছলে আমি আড়চোখে লক্ষ্য করছিলাম কাস্তোভকে।

পাণ্ডুলিপিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখেরও ভাবপরিবর্তন হতে লাগল। প্রথমে দেখলাম শান্ত নিরস্ত্রজিতভাবে পড়ে যাচ্ছে। তারপর পাতায় পাতায় তারও কোঁতুহল দ্রুতগতি হয়ে উঠল। দেখলাম তার চোখের তারা যেন লাইনগুলোর উপর দিয়ে নক্ষত্র বেগে ছুটে চলেছে। পাণ্ডুলিপিটি পড়া শেষ হলে ভাঁজ করে রাখলো কাস্তোভ। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবলে, তারপর আবার পোড়া থেকে শেষ পর্বস্ত পড়লো। পড়া শেষ করে পাণ্ডুলিপিটি পকেটে পুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তক্ষুনি কি ভেবে ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল।

—‘ওর প্রতি বড় অন্তর্য হয়ে গেছে’—গভীর আবেগের সঙ্গেই বললে কাস্তোভ—‘সত্যিই আমি অমার্জনীয় কাজ করেছি। অতি নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছি। ইচ্ছাকারিতার কাজ হয়েছে। ভিক্টোরের কথাই আমি বিশ্বাস করেছিলাম।’

—‘বল কি ? ওকে ত তুমি ঘৃণা করতে। কিন্তু কি বলেছে ও তোমায় ?’

কাস্তোভ হাত দুটি জড়ো করে একটু কাৎ হয়ে দাঁড়াল। ও যে দাক্ষণ লজ্জিত হয়েছে বুঝতে পারলাম আমি।

—‘মনে পড়ছে, ভিক্টোর কি একটা মাসোহারার কথা বলেছিল। ঐ কথাটাই কেন যেন আমার মনে বিঁধে গিয়েছিল। ঐ কথাটাই যত অনিষ্টের মূল। আমি অনেকবার ওকে প্রশ্ন করলাম। ও বললে—’

—‘কি বললে ?’

—‘ও বললে কে একজন—কি নামটা ? সেই সুসানার ক্ষেত্রে ঐ মাসোহারার ব্যবস্থা করে গেছে। মানে সুসানার সঙ্গে কি একটা অবৈধ—অর্থাৎ তারই ক্ষতিপূরণ হিসেবে।’

—‘তুমি বিশ্বাস করলে ওর কথা ?’

কাস্তোভ মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—‘তা বিশ্বাস করেছিলাম বই কি। ও আমায় বলেছিল—ঐ লোকটির ছেলের

সঙ্গেও নাকি সংসর্গ করেছিল সুসানা—। না ভাই, সত্যি বড়ো অন্তায় করেছে। আমার এ কাজের মার্জনা নেই—কোন যুক্তি কৈফিয়ৎ নেই।’

—‘ঐ কথা শুনেই তুমি সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে? আর কিছু ভাবলে না, জানলে না?’

—‘সে তুমি বুঝবে না বন্ধু। ঐরকম কথা কোন মেয়েমানুষের সম্বন্ধে শুনলে, এইটাই ত একমাত্র পথ। আমি অতি নিষ্ঠুরের মত কাজ করেছি। সত্যি যা-তা করে ফেলেছি।’

হৃৎনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কী যেন একটা গভীর লজ্জার কাজ করেছে আমরা—তাই আর মুখে কথা নেই। কিন্তু আমার ত আর সত্যি লজ্জিত হবার কিছু ছিল না।

॥ ২০ ॥

‘ঐ ভিক্টোরের মুখ আমি গুঁড়িয়ে দিতাম’—দাঁতে দাঁত চেপে নিষ্ঠুর আক্রোশে বললে ফাস্তোভ—‘ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতাম যদি না জানতাম যে আমার নিজেরই দোষ আছে। এখন বুঝতে পারছি সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কেন করেছে তাও বুঝতে পারছি। সুসানার বিয়ে হয়ে গেলে মাসোহারাটা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা। পাষাণ—পাষাণ ওরা।’

আমি ফাস্তোভের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিলাম। কোমলকণ্ঠে ভাবলাম—‘সে কথা যাক ভাই। তুমি সুসানার কাছে গিয়েছিলে?’

‘না। বাড়ি থেকেই ত সোজা এখানে চলে আসছি। কাল যাব। সব কিছুই আর এভাবে এড়িয়ে যেতে দেওয়া যেতে পারে না কোন মতেই।’

—‘কিন্তু সুসানাকে কি সত্যিই তুমি ভালবাস।’

আমার প্রশ্নে যেন বিরক্ত হল ফাস্তোভ।

‘নিশ্চয়ই ভালবাসি। ও আমার হৃদয়মণি?’

—‘সত্যি ভারী ভাল মেয়ে। এমন নরম কোমল।’

ফাস্তোভ অর্ধেকের সঙ্গে পা দিয়ে মাটি ঠুকতে লাগল। বললে—‘তুমি ওর সম্বন্ধে কি ভাব তা আমি জানি না জানতে চাইও না। আমি ওকে বিয়ে করবার জন্যে সব ঠিক করে ছিলাম। ও আমার বাগদত্তা। এখনও ওকে বিয়ে করতে আমি রাজী। বয়সে সুসানা আমার চেয়ে বড়ো। তা হোক তবু—’

ঠিক সেই মুহূর্তে কি জানি হঠাৎ আমার কেমন যেন হল। দেখলাম একটি বিবর্ণ মেয়ে হাতে মাথা রেখে জানালার ঠেসান দিয়ে বসে আছে।

মোমবাতির শিখা পুড়ে আলোর জ্বোর কমে আসছে। ঘরের ভিতর ঘনায়মান অন্ধকার। একটা আচমকা আতঙ্কে আমার বুকের ভেতর ছর ছর করে উঠল। সেই স্তিমিত প্রদীপে উত্তেজিত মনকে যথাসাধ্য প্রশমিত করে আর একবার চেয়ে দেখলাম আমি। এবার আর জানালার ধারে কাউকেই চোখে পড়ল না। কিন্তু কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি। ভয় বল, বেদনা বল, করুণা বল—কিংবা সব কিছু মিলিয়ে কি একটা অনাস্বাদিত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি।

আর সেই মুহূর্তে গভীর আবেগে আমি ফান্তোভকে মিনতি করলাম—‘ভাই এখুনি একবার সুসানার ওখানে যাও। কালকের জন্যে আর যাওয়া মূলত্ববী রেখ না। আমার মন বলছে আজই সুসানার সঙ্গে তোমার দেখা করা উচিত। কি জানি—’

কিন্তু ফান্তোভ সে আবেগে সাড়া দিলে না। শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে—‘কি যে বল এখন রাত এগারটা। ওরা সবাই এতক্ষণ ঘুমে পড়েছে।’

‘তা হোক গে। তবুও ভূমি যাও—আমি মিনতি করছি। আমার মনে একটা অল্প সংকেত পাচ্ছি। ভাই, যা বলছি একটবার শোন। একবার ঘুরে এস।’

কিন্তু ফান্তোভকে জাগাতে পারলাম না আমি। সে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বললে—‘পাগল হলে নাকি? এইভাবে অসম্ভব। কাল সকালে নিশ্চয় যাব। সব গোলমাল পরিকার করে দিয়ে আসব।’

—‘কিন্তু ফান্তোভ তুমি ভুলে যাচ্ছ সুসানা লিখেছে—ও মরতে বসেছে। ওকে আর জীবন্ত দেখতে পাবে না। যদি সেদিন ওর মুখ দেখতে পেতে একবার, ওর মত মেয়ে ছুটে এসেছিল আমার কাছে—তার জন্যে ওকে কত না ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।’

‘ওর মনের তার একটু উঁচু পর্দায় বাঁধা’—তেমনি শীতলকণ্ঠে বললে ফান্তোভ। আশ্চর্য-প্রত্যায় যেন কিরে পেয়েছে ও।’

‘প্রথম প্রথম সবমেয়েই ঐ রকম। আমি বলছি কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন চলি। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত—ঘুমে চোখ বুজে আসছি।’

টুপিটা হাতে নিয়ে ফান্তোভ ঘর থেকে চলে গেল।

কিন্তু কথা দাও কাল সকালে ওখান থেকে সোজা এখানে চলে আসবে। বলবে কি হোল?’

পাছে সারা রাত্রির বিশ্রামের পর কথাটা ভুলে যায় তাই শেষবারের মত ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম আমি।

‘ঠিক আছে’—যেতে যেতে বললে ফান্তোভ। কিরেও তাকালে না।

॥ ২১ ॥

কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখে বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল আমার। চোখ খুলে তাকলাম। ঘরে একটিমাত্র মোমবাতি জলছিল। তারই ক্ষীণ আলোর দেখলাম ফান্তোভ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। একি চেহারা হয়েছে ওর। ও যেন হাঁপাচ্ছে। হলদে বিবর্ণ ঠোঁট ছোটো ঝুলে পড়েছে—ওর লাল চোখে অর্ধহীন শূন্যগর্ভ দৃষ্টি। কোথায় গেল ওর সেই সদাহাস্তমধুর মূর্তি? পক্ষাঘাতে আমার এক আত্মীয় কেমন যেন জড়ভরত হতবুদ্ধি চেহারা হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন। সেই মুহূর্তে ফান্তোভকে দেখে তার কথাই আমার মনে পড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

—‘কি ব্যাপার ? হয়েছে কি ?’

কোন উত্তর দিল না কাস্তোভ ।

—‘বলো কি হয়েছে ? কথা বলো কাস্তোভ । সুসানা—সে কেমন আছে ?’

সুসানার কথা কানে যেতেই ও যেন চমকে উঠল ।

‘সুসানা’—ওর নাম উচ্চারণ করতেই গলার স্বর ধরে এসে কাস্তোভের ।

—‘সুসানা আর নেই ।’

—‘নেই, মানে ?’

—‘নেই । সুসানা মারা গেছে ।’

আমি বিছানা থেকে লাফ মেরে উঠে বসলাম ।

—‘মারা গেছে ? সুসানা মারা গেছে ?’

কাস্তোভ অকৃত্রিমকৈ মুখ ফিরিয়ে নিলে ।

—‘হ্যাঁ । সুসানা মারা গেছে । কাল মাঝরাতে ।’

—‘ও নিশ্চয় পাগলের প্রলাপ বকছে—’ মনে মনে ভাবলাম আমি ।

—‘মাঝ রাতে ? কটা তখন ?’

—‘যখন সকাল আটটা । ওরা লোক পাঠিয়েছিল আমাকে খবর দিতে । আগামী কাল ওকে গোর দেওয়া হবে ।’

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম ।

—‘কাস্তোভ তোমার কি মাথা ধারাপ হয়েছে । প্রলাপ বকছ না ত ?’

—‘মাথা আমার ঠিকই আছে । নিজের কানে শুনেছি । তারপর সোজা চলে এসেছি তোমাদের এখানে ।’

অপূর্বীয় ক্ষতির কথা শুনলে যেমন হয় তেমনি অসুস্থ নিকুপায় বোধ করতে লাগলাম আমি । হাত পা যেন ঠাণ্ডা আড়ষ্ট হয়ে এসে ।

—‘হার ভগবান ! মারা গেল ।’ বার বার আমি আবৃত্তি করতে লাগলাম নিজের মনে মনে ।

—‘কি করে মারা গেল । এত হঠাৎ কি হোল ? আত্মহত্যা করেনি ত অভিমানিনী ?’

—‘তা আমি জানি না । কিছুই জানি না । ওরা খবর দিয়েছে গেল কাল মাঝ রাতে সুসানা মারা গেছে । আসছে কাল ওকে কবর দেওয়া হবে ।’

—‘মাঝ রাতে ?’

তখন আমার মনে পড়ল । মাঝ রাতে ঠিক যখন আমি ওকে জানালার বসে থাকতে দেখেছিলাম । কত মিনতি করে বলেছিলাম কাস্তোভকে একবার ওর কাছে যেতে । তখনও বেঁচে ছিল সুসানা । তখনও বেঁচে ছিল । গেলে, শেষ দেখা হোল ।’

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন বলল কাস্তোভ ।

—‘কাল যখন তুমি আমাকে ওদের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলে তখনও বেঁচে ছিল সুমানা।’

কতটুকুই বা ও বুঝতে পেরেছে সুমানাকে ? আমরাই বা কতটুকু ওকে চিনতে পেরেছিলাম ?

আবার আমার ভাবনা উধাও পাখা মেলে দিল।

ওর মনের বীণার তার উঁচু সুরে বাঁধা। সব মেয়েই ঐ রকম। নিষ্ঠুর পুরুষ যখন খেলার খেলা খেলছিল হয়ত ঠিক সেই সময় সুমানা ঠোঁটের কাছে ভুলে ধরেছিল বিশ্বের পেরাঙ্গা। এত সাধের প্রাণ নিজের হাতে নষ্ট করে দিলে। কি জানি, ভালবেসে এমন মারাত্মক ভুল কি কেউ করে ? ভালবাসার ধনটিকে এমন অবহেলায় যেতে দেয় ?

আমার বিছানার পাশে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল ফান্তোভ। দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত।

। ২২ ।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম আমি। ফান্তোভকে বললাম—‘তাহলে এখন কি করতে চাও তুমি ?’

বন্ধু আমার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন আমি কি এক অসম্ভব প্রশ্ন করলাম তাকে, সে ভেবেই পেলো না। আর সত্যিই ত, কি করবারই বা ছিল আর।

তবু আমি বললাম—‘এখন তোমার উচিত ওদের বাড়ি গিয়ে মৃত্যুর কারণটা হদিস করা। কে জানে হয়ত কোন ক্ষয়্য অপরাধ আছে এর পিছনে। ঐ সব লোক যা তা করতে পারে। ওর পাণ্ডুলিপির সেই কারণটা মনে আছে। বিয়ে হলে ওর মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সুমানা মারা যায়, ওর মাসোহারার টাকাটা পাবে প্রফেসর। জিনিসটা তোমার খোঁজ নিতে হবে ভাই।’

ওর প্রতি শেষ কর্তব্যটুকুও ত করা উচিত আমাদের।

বড় ভাইয়ের মত আমি ফান্তোভকে উপদেশ দিলাম। অপার শোকের এই শোচনীয়-তার মধ্যে নিজেকে আমার ফান্তোভের চেয়ে অনেক বড়। মনে হতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, সে যে অন্তায় করেছে এই বোধে নিজেকে হয়ত অপরাধী ভাবছে ফান্তোভ। হয়ত বা আচম্বিতে এত বড়ো দুঃখ পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে সে। দেখেছি কিনা দুর্ভাগ্য মানুষকে ভারী অসহায় করে ফেলে। তাকে লোকচক্ষুতে নামিয়ে দেয়। ভগবান সাক্ষী সেই মুহূর্তে ফান্তোভকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে হতে লাগল আমার। ওর অন্তঃমন আমার করুণার আত্ম হয়ে উঠল। ভাবলাম ওকে যদি জাগাতে হয় কঠোর আমার হতেই হবে। এই বিপদের গহ্বর থেকে টেনে ওপরে তুলতে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। সংসারে মেয়েদের সমবেদনায় বোধ হয় কোমলতার লেশ থাকে না।

কিন্তু ফান্তোভ তেমনি উদ্ভ্রান্তের মত বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর বিমূঢ়তা কাটল না। আমার কোন কথাই যে তার মনে দাগ কাটতে পারেনি তা বুঝতে আমার দেবী হল না। তবু আবার যখন বললাম তাকে—‘তুমি যাচ্ছ ত সেখানে?’ সে শুধু ঘাড় নেড়ে বললে—‘না।’

—‘যাবে না মানে? কি তুমি ফাস্তোভ? কি হল তার? কেন এমন হঠাৎ সে চলে গেল—সে সব কিছুই তুমি জানতে চাও না? সুসানা হয়ত তোমার জন্তে কোন চিঠি বেখে যেতে পারে। হয়ত এমন কোন কিছু যা থেকে তার মৃত্যুর একটা সূত্রও মিলতে পারে।’

এ কথার জবাবে সে শুধু মাথা নাড়লে। তারপর জড়িত গলায় বললে—‘আমি যেতে পারব না। সেই কথাটাই তোমায় বলতে এসেছি আমি। তুমি একবার যাও ভাই। আমি যেতে পারব না সেখানে—আমি যেতে পারব না—আমি যেতে পারব না—’

টেবিলে বসে পড়ে ফাস্তোভ দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কঁদে কঁদে বলতে লাগল—‘তাকে যে আমি বড়ো ভালবাসতুম। বড়ো ভালবাসতুম তাকে।’

সেই মুহূর্তে একটা নতুন জিনিস অনুভব করলাম আমি। ফাস্তোভের পাশে দাঁড়িয়ে আজ আর সে-কথা স্বীকার করতে একটুও লজ্জা নেই আমার। বন্ধুর সেই আর্ত কান্না আমার মনে কণামাত্র অনুকম্পার উদ্বেক করতে পারেনি। শুধু অবাক হয়ে আমি ভেবেছিলাম যে ওর মত মানুষ কি করে এমন শিশুর মত কাঁদতে পারে? পারে অভিনয় করতে? ফাস্তোভকে সেদিন আমার বড়ো স্বার্থপর মনে হয়েছিল। বড়ো নীচ। অন্তত ঐ অবস্থায় পড়লে আমি তার মত কঁদে কর্তব্য পালন করতাম না।

সেদিন যা ব্যবহার করেছিল তাতে ঐ কথা ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারিনি আমি তার সম্বন্ধে। যদি দেখতাম যে অত বড়ো দুঃখের মধ্যেও সে বিচলিত হয়নি, হয়ত তাকে ঘৃণা করতাম আমি। কিন্তু নীচ ভাবতে পারতাম না। জানতাম যে মেয়ে মানুষের মন নিয়ে যারা খেলে বেড়ায়, সেও তাদের দলে। যত রাগই হোক অন্তত তাকে ভেঙে বলতে পারতাম না।

জীবনে অনেক কিছু দেখে তবে এই কথা বুঝেছি যে দুঃখের দিনে মানুষের চেহারাটার মধ্যেই তার চরিত্রের ছাপ ফুটে ওঠে। কেউ কেউ হয়ত সত্যিকার সমবেদনা পায়। কান্নার বা ভণ্ডামির কান্নার গোপন পাপ ঢাকা দেবার মিছে চেষ্টা কিছুতেই চাপা থাকে না।

২৩।

সুসানার বাড়িতে ফাস্তোভকে পাঠাবোই এমনি একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু শেষ অবধি আমার হার মানতেই হল। বাধ্য হয়ে বেলা বারোটা আনাজ আমি নিজেই তাদের বাড়ির দিকে যাবার জন্ত পা বাড়ালাম। রাস্তার মোড় কিরতেই ওদের বাড়িটা আমার চোখে পড়ল, জানলায় রাখা কটা মোমবাতি হলুদ শিখায় জ্বলছিল। দেখে কেমন একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কে আমার সারা শরীর ছমছম করতে

লাগল। একবার ভাবলাম কি হবে গিয়ে সেই মৃত্যুপুরীতে। তার চেয়ে বরং কিরেই যাই। কিন্তু কোনমতে সাহস জড়ো করে আমি চুকে পড়লাম ওদের বাড়িতে। বাড়ির বাতাস ধূপধূনো আর পোড়া মোমবাতির গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। এক দিকে দেয়াল হেলান দিয়ে রাখা সাদা জড়ি বসানো লাল রংয়ের কফিনের ঢাকনাটা রয়েছে। পাশের একটি ঘর থেকে মৌমাছির গুঞ্জনের মত পুরোহিতের মন্তোচ্চারণের ক্রান্ত সুর ভেসে আসছে। ডয়িং রুম থেকে কে ঘুম চোখে আমার ডাকলে। বললে—

—‘ভিতরে আসুন। দিদিমণিকে শেষ দেখা দেখে যান।’

খাবার ঘরের দরজাটা আমার দেখিয়ে দিল সে। ভিতরে চুকলাম। দরজার দিকে শিয়র করে পেতে রাখা হয়েছে কফিনটা। উঁচু করা বালিসের উপর ফুলের মালা দিয়ে ঘেরা সুশানার মাথার একরাশ কালো চুল সব প্রথম আমার চোখে পড়ল। এক পাশে সরে এসাম আমি।

তারপর ক্রম করে নতজানু হয়ে বসলাম মাটিতে। তাকিয়ে দেখলাম সেই শেষ ছবি-খানির দিকে। মুখের কোথাও এক তিল লাবণ্য নেই। জীবনে যে সুখ পায়নি, মৃত্যুর কোলেও কি তার শান্তি মেলেনি?

সদ্য মৃতের মুখে যে স্নিগ্ধ মহাশান্তির ছায়াটি পরিব্যাপ্ত থাকে, তাও যেন রূঢ় হাতে মুছে দিয়েছে নিষ্ঠুর শমন। সুশানার বাদামীরংয়ের ছোট্ট মুখখানির দিকে তাকিয়ে প্রথমেই আমার খুব পুরোনো ধর্মচিত্রের কথা মনে হল, দারুন হতাশায় ও আর্তনাদ করতে যাচ্ছিল— এমন সময় চিরদিনের মত রুদ্ধবাক হয়ে গেছে। উদ্গত আর্ত কান্না ধেমে গেছে মাঝপথে। এ-জীবনে আর সে কান্না শোনা গেল না। এমন কি চোখের কোণে সে ক্রক্টিটুকুও অক্ষুণ্ণ আছে। হাতের আঙ্গুলগুলো পিছনের দিকে বেকে রয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম এই ভয়াবহ মৃত্যু দৃশ্য থেকে। কিন্তু সেও মৃত্যুভের জগে। তখুনি আবার কোঁতুহল ভরে মৃত দেহের দিকে তাকলাম। কে যেন জোর করে আমার দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিয়ে দিলে। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলাম সুশানার মৃতদেহের কোথাও যদি কোন সন্দেহের সন্ধান পাই। দেখতে দেখতে মন আমার মমতায় ভরে গেল। দেখলাম মেয়েটির উপর কি অমানুষিক অত্যাচার করেছে এরা। কি কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছে তাকে। অথচ কি করে আমি তা প্রমাণ করব?

আরো অনেকণ বসে থেকে বিষম মনে ফিরে এসাম অন্ধকার গলিপথটার দিকে।

ডয়িংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসর বোধ করি আমারই অপেক্ষায়। গায়ে তার ধূসর রংয়ের একটা গাউন। আমাকে ইংগিত করলেন তার ঘরে যেতে। অন্ধকার ধমধমে ঘরটি তামাকের গন্ধে ভারী। সেই ঘরে পা দিতেই হটাৎ শেয়াল কি নেকড়ের গর্ভের কথাই আমার মনে হতে লাগল।

বিষ্ণু দেব শ্রেষ্ঠ কবিতা

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

আধুনিক বা জীবিত লেখকের কবিতায় পাঠক অম্লরস্ক হন নিজগুণেই। তবু পাঠকের উদারতার ভরসায় কোনো লেখকের পক্ষে নিজের লেখার সংকলনকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা সমীচীন কিনা সেটা ভাববার কথা।.....তা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ কবিতা কি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, বিশেষত নিজের লেখার ব্যাপারে—ভূমিকায় বলেছেন বিষ্ণু দে। শ্রেষ্ঠ কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের স্বপক্ষে যুক্তিতর্কসহ যুক্ত করার ভার যোগ্য পণ্ডিতের হাতে ছেড়ে দিলে, সোজাসুজি যা মনে আসে তা শুধু এই। চোরাবালি কাব্যগ্রন্থের কথা মনে এলেই আমার মনে পড়ে যাবে ওকেলিয়া ক্রেসিডা বা ঘোড় সওয়ার কবিতাগুলির কথা। বা পূর্বলেখের কথাপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মৃতিতে হানা দেবে পদধ্বনি, জন্মাষ্টমী বা সপ্তপদী। এর অর্থ কি? কেনই বা এমনটা হয়? ওই সমস্ত কবিতা পড়ার ফলেই হোক বা লোক মুখে-মুখে শুনেই হোক, এরা স্মৃতিতে একটা স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। এটাই কি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ? কে জানে। তবে তাদের একটা জাত ঠিক করে কেলা হয়েছে। তারা হারাবার নয়—এ-তকমা তাদের গারে আঁটা। কবে কেমন করে এ-কাজ সমাধা হলো তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামাবে না। নিজের প্রিয় লেখাগুলিকে একত্রে হাতের কাছে পেয়ে বুদ্ধিমান পাঠক যদি সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ আখ্যাই দেন তো তাঁর কুটির তারিক করাই চলে। আর তা ছাড়া, প্রসঙ্গ বধন বিষ্ণু দেব যতো মহৎ কবিকে নিয়ে।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে বৌবনের প্রথম শুরুতে কাব্যপাঠের যে একটা মেজাজ তৈরী হয়, প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই, সে মেজাজের বশে কোনো বিশিষ্ট কবির লেখা সম্পর্কে হুটাতক কথ্য ভাবে চিন্তে বলার মধ্যে কেমন যেন একটা বাহাহরীর ভাব ছিলো। আর প্রায় এ-কারণেই বিষ্ণু দেব কাব্যকে দুর্বোধ্য বা ভয়ঙ্কর আখ্যা দিয়ে হুঃসাহসী মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন কুতিষ ছিলো। আজ বেশ বুঝতে পারি সেদিন অনেককাল বিগত। তাঁর কবিতার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কথা, image বা বিশিষ্ট allusionই কি তাঁর কবিতার শেষ কথা? আলোচনা আর অভিযোগ এ-সব কিছুকেই কেন্দ্র করে চলতে থাকে। আপত্তিটা তো এখানেই। বিষ্ণু দেব কবিতার মূল কথা যদি আমার কাছে ধরা পড়ে তবে ছোটখাট অভিযোগগুলো তো অনায়াসেই কণস্থায়ী হয়ে উঠবে। 'ক্রতুকৃতম,' 'অলীকচক্রে চক্রমন,' 'অপাপবিন্দু মন্ডাবির' বা 'সুংকারে করি নরমাচার' যদি-বা আপত্তির নিগূঢ় কারণ হয়, মন ভারী করেই তোলে, তবু কি—

হৃদয় আমার খেয়ার বাতী বৈতরণীর পার
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেসার চোখ পুড়ে মরে দূরে
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার

বা

দিনগুলি তুমি ভুলে নিলে অঞ্চলে
বালুচরচারী দৃষ্টিতে করে সান্নিধ্যের ধারা
রাত্রিও চাও ? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম

বা

এই তবে ভোরবেলা
হে ভূমিশায়িনী শিউলি ! আর কি
কোনো সাস্বনা নেই ?
রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তরী কুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি ?

এমন সব অতিদুর্লভ কাব্যাংশের অনাবিল সংগীতে মনের ভার লঘু হয়ে আসেনা
কোনো-না-কোনো এক সময়ে ? বিদেশী নামের—স্থান বা ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের—
উল্লেখ যদিই বা থাকে তাঁর কবিতায়, শিকড় তো তার বাংলা দেশের মাটিতেই। বহু
দৃষ্টান্ত মিলবে বহু স্থানে। কই, বিলেতি বইতে তিনি তো নিজের দেশ খোঁজেননি। তবে ?
বাংলার মাটির, বাংলার জল ও আকাশেরই নিজস্ব তা। উর্বশী প্রসঙ্গে যদি আর্টেমিসের
কথা আসেই তো তাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কি আছে ? বাংলার আকাশ মাটির কথায় মুখর হয়ে,
শ্রাবণ-সাতরঙা আবেগে উচ্ছ্বস হয়ে, যদি পিকাসোর তুলির কথা স্মরণ করেন তবে কি তাঁর
কবিতার জাত যায় ? সর্বোপরি মনে রাখতে হবে কালের কথা। এটা তেরশো বাষট্টি।
রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক বাংলাকবিতার ইতিহাস নিতান্ত অপরিণত নয়। আরো,
পাঠকের চোখে খোলা রয়েছে বিষ্ণু দেব নিরলস কবিকীবনের বিশ বছরের কাহিনী।
সমস্তার সমাধান, তবু জানি, সহজে হওয়া অসম্ভব।

পাঠককে সহিষ্ণু হতে হবে। শ্রদ্ধা রাখতে হবে মনে বড় বা মহৎ কবির কাব্যপাঠের
মুহুর্তে। কবি তাঁর পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের পিপাসাকে যদি তীব্র তীব্রতর করে
ভুলতে চান তো তাঁর প্রচেষ্টাকে অভিযুক্ত করার জায়সঙ্গত কোনো কারণ দেখিনা।
বহুদিন আগে-পড়া কোনো সৎ মহৎ কবির লেখা কবিকে মুগ্ধ করেছে। মুগ্ধ কবি তারপর
তাকে হয়তো একদা ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর নিজেরই রচনায়। এও তো পরিশ্রম ও মনীষার
কাঙ্ক্ষা। আমার মনে হয় পাঠককে তাই কিছু ধৈর্যবান হতে হবে, কখনো বা সবিশেষ

পরিশ্রমী । বিষ্ণু দেব লেখার, আমার মনে হয়, syntax সম্পর্কে পাঠককে কিছু অভ্যস্ত হতে হবে সর্বাগ্রে, চৌধ আর কান আর কি সমান খোলা রাখতে হবে । বিশেষ সতর্ক হতে হবে ছন্দের দিকে কান রেখে । এতে যথেষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা । পাঠক অনেক সময় অসহিষ্ণু হয়ে বিচলিত বোধ করেন ও অবিচার করে বসেন শেষ পর্যন্ত ।

তা ছাড়া বিষ্ণু দেব রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস যারা অনুধাবন করবেন ও পরিশেষে উপলব্ধি করবেন এমনই মহৎ জীবনাদর্শ তাঁর, তখন মনে করবার কোনো হেতু থাকবে না পাঠককে বোকা বানাবার জন্যে কলম ধরেছেন তিনি । মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও কবিপ্রতিভায় নিতান্ত অসামান্যতা ছাড়া কোনার্কের এ অংশ রচনা করা অসম্ভব মনে করেছি আমি—

কত শিল্পী মজুরের মাঝি মালা কুলিদের কর্মিষ্ঠ গুপ্তন !
কত না দ্বাদশ শত কত শত সহস্রের বাটালি তুরপুনে
কত লক্ষ মানুষের জীবনের আনন্দের বিস্তৃত আকাশ
পৃথিবী পাথরে ধরে লক্ষ লক্ষ মূর্তি—ভঙ্গে, এককে মিথুনে,
ফুলে ও লতায় ফলে পল্লবিত গাছে শতজীব ! রূপাতাস
আশ্চর্য এ আমাদের দেশের মানুষ দিলে, সূর্যের সমান
প্রবল প্রেমের চোখে সর্বজয়ী জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগে ।
গ্রামে-গ্রামে শহরে বন্দরে যত বঞ্চিতের এবং বন্দীর
বিজয়ী জীবন, তাই শত সহস্রের হাতে রক্তস্রব লেগে
অমর ঐশ্বর্য়ে বাজে শিল্পীর তন্ময় ধ্যানে সৌন্দর্যে গস্তীর—
নির্মাণে চঞ্চল ভিড়ে জেগে ওঠে কোনার্কের মন্দির শ্মশান ।

॥ ২ ॥

বাংলা ভাষায় লেখা কবিতায় বাংলা দেশকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ অতি অবশ্য সীমাহীন আনন্দ । জীবনানন্দের কবিতায় পাই—চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে হেমন্ত আসিয়া গেছে । বিষ্ণু দেব কবিতায় পাই—

কোথায় যাবে তুমি ? যেখানে যাও সেই
একই মাটি জল একই নীলাকাশ—
জন্মভূমি যেন, দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, এই গ্রামের থেকে যেই
ও-গ্রামে যাও, তবু কোনোই ভুল নেই
বাতাস এক বয় একই নীলাকাশ ।

জীবনানন্দের কবিতায় বাংলাদেশের গাছপালা অবাধ প্রকৃতিকে ভালোবাসার আনন্দ যদি অসীম, তবে বিষ্ণু দেব কবিতায় বাংলার আকাশ মাটি জলবায়ু তথা অবহেলিত কতো

না ছেলেকে ভাসোবাসার অধিকতর আনন্দ অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের পর এমন নিরলস কঠিন সাধনা আর কোন কবি করেছেন। জীবনানন্দের অসাধারণ কাব্যদক্ষতা ও পরিশ্রম আধুনিক কবিদের কাছে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তবু রবীন্দ্রনাথ সেই যে বলেছিলেন না, তাঁর কবিতা 'গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'; জীবনানন্দের কবিতাও বোধ করি তাই বিচিত্র পথে ধাবিত, সর্বত্রগামী হওয়ার অথেষ্ট বৃষ্টি শুধু বিষ্ণু দেব কবিতায়। আর এ কারণেই বোধ করি তাঁর সাধনার পথ কিছু বন্ধুর, সেখানে এমন চড়াই-উৎরাই, আর সাধারণ পাঠকের কাছে তার বাহ্যিক রূপ এমন জটিল।

শ্রেষ্ঠ কবিতার মস্ত বড় সুবিধা এই যে, একটি মাত্র গ্রন্থের মাধ্যমে বিষ্ণু দেব কবিসত্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা চলবে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে ব্যঙ্গের শানিত অস্ত্র তাঁর হাত থেকে কবে কখন অসন্ধিতে খসে পড়লো, আর বেদনার অকৃত্রিম উপলক্ষিতে মন তাঁর ভাবাতুর। শুধু মাত্র এ-বিষয় নিয়ে আলোচনার বিস্তৃতির প্রয়োজন যথেষ্ট। স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার অবকাশ রয়েছে এরই বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজনে। আর এ-কথা আজ স্পষ্ট এই দৃষ্টি কোণ থেকে তাঁর কবিতার বিচার নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা সার্থক আলোচনার পথ বেঁধে দেবে। সময় সেনের মত বিরল প্রতিভা কি কারণে অন্তর্মিত আজ তাও অনুমের হবে এই আলোচনার ব্যাপকতায়। শ্রেষ্ঠ কবিতার ১৪৬ পৃষ্ঠায় আছে—

আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে উন্মুখ নির্ভায়

তোমাকেই চায় তাই যন্ত্রণার নব-প্রতিষ্ঠায়

যন্ত্রণার এই 'নব-প্রতিষ্ঠায়' তাঁর যা কাম্য তাই তো তাঁর বেদনাকে এমন জঙ্ঘম করেছে। আর তাঁর গতিশীলতার উৎস তো সেদিনই তিনি খুঁজেছেন যেদিন তাঁর কবি চেতনা প্রথম এই যন্ত্রণা ও বেদনার পিছু নিয়েছে।

আঙ্গিক ও হৃদয় নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিরকালই জটিল ও বিচিত্র। আর এ বিষয়েও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন যথেষ্ট এতোদিন নিশ্চয়। তাঁর ব্যাপক সাকল্যের তুলনায় তাঁর বস্তুসামান্য অকৃতকার্যতা এতোই অকিঞ্চিৎকর যে তা নিয়ে ঢাক পেটানো অমার্জনীয় দুর্বিনয়। তা ছাড়া হাজারো বক্তৃতার চেয়ে তিনি যে কিছু দৃষ্টান্ত পেলে খুশি হন, তার পরিচয় তো তিনি রেখেছেন তাঁর অবিচ্ছিন্ন কাব্যচর্চায় দুর্লভ হৃদয়পরীক্ষার ভার হাতে নিয়ে। এই কিছুকাল আগেই বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দের পাঁকের কথা উল্লেখ করেছেন।

এবারে যে কথাগুলো মনে আসে তা নিয়ে ভাঁক চলেনা, ক্ষুব্ধ হওয়া চলে। তাই তর্কের পথ না ধরে দুঃখ করেই বলি, বারোমাস্তার কিয়দংশ ও তিনটি কাল কোন্ সুবাদে শ্রেষ্ঠ কবিতার বাইরে পড়ে রইলো? বিশেষ করে বিষ্ণু দেব শেষ দিককার রচনাগুলির মধ্যে এ ছুটি তো বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। শাস্তির শরতে এসো যদি শ্রেষ্ঠ কবিতার নির্বাচনে স্থান পায়, আশ্বিন কবিতাটি যথার্থ মর্যাদা পেলোনা বলতে হবে। সামান্য তেরো লাইনের কবিতাটির বিশ্বকর আরম্ভ যে-কোনো ভাবুক পাঠককে প্রথম পাঠেই মুগ্ধ করবে। যদি সে আসে, তবে আসতে দাও তাকে।

নিচের এ-অংশগুলির খ্যাতি তো সকল তরুণের উদ্দেশ্য—

বা

পশ্চিমে ছাড়ে চিত্রকরেরা তুলি,
অশ্রুস্রব নাহেহাল রঙে রঙে,
প্রাণহস্তারা হার মানে এই জঙে।
আকাশ ছেয়েছে, হৃদয়ের সাত রঙে—
আকাশে তোমারই চম্পক অঙ্গুলি,
প্রত্যহ দিই তোমাকেই দিনগুলি
আশ্বিন আনে চোখের মুক্তি নীলে,
হৃদয় ছড়ায় ঢলের জলের মিলে,
পায়ের মুক্তি, মুক্তির নিশ্বাস
মাঠে-মাঠে মেলে, শরতের বাস, কাশ,
উদার পৃথিবী তারই মাঝে দিন্দার
ঘর বেঁধেছিল শিল্পী প্রেমের তার
আশ্বিনে বাঁধা ঘর।
এদিকে পাহাড় ওদিকে চূড়ার সার—
এই পার্বতী এই পরমেশ্বর।

আমি মনে করি শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ অংশটি অর্থাৎ ১৪৬ থেকে ১৬৬, এই পৃষ্ঠা কয়েকের মধ্যে কোমল গান্ধার থেকে আরো কিছু কবিতা বা কাব্যংশ বাছাই করে পরিবেশন করলে, পাঠক বোধ করি খুশি হতেন।

A penny for the old Guy-এর বাংলা যিনি লেখেন বুড়ো মোড়লকে কানা কড়ি, বা avoid speech-এর বাংলা করেছেন আলাপের মুখ চেপে ধরি, সর্বোপরি Gerontion-এর মতো কবিতাকেও বাংলা কবিতার মেজাজে আনতে পারেন যিনি, অনুবাদে তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি নিরে বিতর্ক যদি বা চলে সন্দেহ থাকতে পারে না। এলিয়টের কবিতা ও লরেন্সের কবিতার অনুবাদই কি তাঁর হাতে সবচেয়ে ভালো খোলে? ইয়েটসের বহুপঠিত প্রেমের কবিতার কোনো একটির অনুবাদ পেলেই খুশি হতুম। সেক্সপীয়রের সনেট ৫৫-র অনুবাদ খুবই ভালো। আমি অনুবাদ ও মূল রচনা পাশাপাশি রেখে পড়েছি। ফরাসী ও জার্মান কবিতার সম্পর্কে নীরব থাকতেই চাই। শুধু বলতে পারি, রিলকের কবিতা পড়তে ভালো লেগেছে। আর প্রবল আপত্তি উঠেছে আরাগঁর ওই কবিতাটি নির্বাচনে। শ্রেষ্ঠ কবিতার আরাগঁর স্বাধীন এলাকা কবিতাটির অনুপস্থিতি অনেক পাঠককেই হতাশ করবে। কেন, বিষ্ণু দে স্বয়ংই তো জানেন এ কথা, তিনি লিখেছেন— স্বাধীন এলাকাতে আছে সেই লাইনগুলি যা বহুলক্ষ মুখে হয়েছিল গুঞ্জিত এবং যা জিদকে গভীর নাড়া দিয়েছিলো :

প্রায়শী ছিলাম তোমার আলিঙ্গনে
বাইরে গাইলো অশ্রুট গুঞ্জে
কে এক পুরানো ফরাসী দেশের গান
যন্ত্রণা থেকে ধসল ছদ্মবেশ
নয় পদধ্বনির তড়িৎ রেশ
স্পন্দিত করে মৌন হরিতে প্রাণ।

প্রতিমা

মিহির আচার্য

প্রতিমাদিকে সেদিন দেখলাম শ্রামাচরণ দে ট্রিটের মোড়ে। হাওড়ার বাসের জন্তে দাঁড়িয়েছিলেন দিলখুসা কেবিনের সামনে। ওঁকে দেখে আমার কৈশোরের এক সজ্জা-ককরণ স্মৃতি ভেসে উঠল চোখের সামনে। কৈশোরের সেই অনভিজ্ঞ হৃদয়ের দাগ আজও হয়তো হারিয়ে যায়নি যৌবনের কর্কশতার তলায়। জিজ্ঞেস করব কী : সেই পুরানো দিনের সিদ্ধান্তে প্রতিমাদির মনে আজ কি কোনো ফাটলই ধরেনি !

সেদিনের কুড়িএকুশ বছরের সেকেন্ড ইয়ারে-পড়া বেণী-দোলানো প্রতিমা বিনী... লম্বা একহারা চেহারা, চওড়া চোয়ালের হাড় প্রত্যঙ্গদৃঢ়তা, ছোট ছোট গভীর চোখে বিকালের পাণ্ডুর মেঘের বৈরাগ্য। হাসলে হাঁহুর মতো সাজানো দাঁতগুলো ঝিলমিল করে উঠত, আর কী সুন্দর সেতারই না বাজাতে পারতেন তিনি ! আমাদের কিশোর মনের মানচিত্রে প্রতিমাদি ছিলেন প্রতিদিনে নূতন-করে-দেখা এক নূতন মহাদেশ। আমাদের মতো যুগ্ম কিশোরদের ভিড় ছিল ওঁদের বাড়িতে। ইস্কুলের ছুটি হলে নিজেদের বাসার কথা ভুলে গিয়ে কে আগে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা লাগত। ভাবখানা এই : যে আগে গিয়ে দেখবে প্রতিমাদিকে সে যেন তারই আবিষ্কার, তারই সার্বভৌম অধিকার। এক-একদিনে এক-একরকম ভাবে দেখতাম ওঁকে। কিংবা আজ মনে হয়, আমাদেরই মনের রঙে ওঁকে নিত্যনতুন রাঙিয়ে নিতাম। তবু যে-ভাবে প্রতিমাকে সাজিয়ে আনন্দ পায়। প্রতিমাদির প্রসাধনে চড়া সুর ছিল না, রঙিন শাড়ি কোনোদিন তার দেহলতাকে বেষ্টন করে উঠতে দেখিনি। শাদা তার পছন্দ মাকিক রঙ। আর শাদা পরিধেয়র মতোই ছিল ওঁর মনটা শুচিশুভ্র। প্রতিমাদি সুবাসিত পাউডার মোটেই স্পর্শ করতেন না, তাঁর বিলাস ছিল শংখচূর্ণে...স্নান করে শাঁখের গুঁড়োর শ্রামবর্ণ মুখখানা পাণ্ডুর করবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল ওঁর। আমরা যুগ্ম হয়ে থাকতাম চেয়ে চেয়ে আর মনে মনে বলতাম : আশ্চর্য ! আর একটা সখ ছিল প্রতিমাদির। সেটা ছিল খোঁপায় ফুল গোঁজা। আর এই ফুল জোগানোর দায় ছিল আমাদের মতো মালাকারদের। ফুল দিয়ে আর ফুল পরিয়েই আমরা খুশি। তারপর বিকালের সূর্যাস্তের সোনার প্রতিমাদির হাতের তারে যখন টুংটুং করে বেজে উঠত সেতারের আলাপ...তখন ওঁর দিকে চেয়ে-চেয়ে আমরা কি জানি কেন লোভার্ত হতাম। বাজাতে বাজাতে কখনো আমাদের দিকে চেয়ে হাসতেন প্রতিমাদি...সে-হাসির অর্থ সেদিন কেন, আজো বুঝিনি। সেটা হয়তো ছিল সংগীতেরই আবেগের প্রতিবিম্ব, আধা ঐন্দ্রজালিক, আধা নির্বোধ। বাজনা শেষ হলে অনেকক্ষণ চোখ বুজে মৌন হয়ে

থাকতেন তিনি। আর যেন ওই ধ্যানমগ্না মূর্তিটির পায়ে আমাদের আবেগে মাথা নত হয়ে আসত। কখন বাসায় ফিরে এসে পড়ার বই নিয়ে বসতাম মনে হতনা কিছু।

টিফিনের ঘন্টার আমরা প্রতিমাদির গল্প করতাম। আমাদের উদ্বেগ, আনন্দ সব মিশে জড়িয়ে গিয়েছিল প্রতিমাদির সঙ্গে। আমরা খেলতাম না, মারামারি করতাম না, ওই বয়েসেই আমরা যেন এক একজন রবিঠাকুর হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রতিমাদি কিন্তু আমাদের চার পাঁচজনের মধ্যে দুজনকেই বেশি ভালোবাসতেন। সুশীল আর আমি। সুশীলের বাবা শহরের সরকারী উকিল—ওদের পাখরের মেঝেতে নাকি মুখ দেখা যেত আর ওদের টাকার পাহাড়ের কাহিনী সুশীলই বলে-বলে আমাদের কাছে পুরানো করে দিয়েছিল। আমি প্রতাপে-প্রতিপত্তিতে চেহারায় স্বাস্থ্য ছিলাম সুশীলের বিপরীত। সুশীলের গায়ের রঙ ছিল কমলা-দুধে-ধোওয়া। আর আমি যেমনই ছিলাম কালো-কোলো তেমনি হ্যাংলা স্বাস্থ্য। আর আমার বাবা পদমর্যাদায় ছিলেন হাইস্কুলের সেক্রেটারি। তবু কি জানি কেন সুশীলের মতোই প্রতিমাদি আমাকেও অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কিংবা হয়তো সুশীল আর আমাকে তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তাঁর ছিল আমাকেও প্রয়োজন।

প্রতিমাদির মা ছিলেন না। বাবা ব্রিটার্ড মুন্সেফ। বার্ষিক্যে তিনি পেনশন দিয়েছিলেন শোবার ঘরে। বাইরের জল-হাওয়ায় তাঁর মন শরীর দুটোই কাহিল হয়। সংসারের ভার ছিল প্রোচা বিধবা পিসিমার হাতে।

হুগ্গার তিনদিন সন্ধ্যার প্রতিমাদির ইংরেজির মাস্টার আসতেন। কলেজের প্রফেসর রসময়বাবু। সেই তিনদিন আমাদের কাটত বন্দী বিহঙ্গের মতো। আমাদের বেলাশেষের বিকালটা সেদিন কালার প্রবালে রক্তিম হয়ে উঠত। আমরা মনে মনে অভিসম্পাত দিতাম রসময়বাবুকে। ঈশ্বরকে বলতাম : দাওনা ওকে একটা ছোটখাটো অসুখে পাইয়ে— থাকুন বিছানার পড়ে মাস দু-তিন।

সেবার পূজোর ছুটিতে প্রতিমাদি গেলেন পিসিমার খণ্ডর বাড়ির দেশ ঝাড়গ্রামে বেড়াতে। প্রায় একটি মাস আমাদের কার্টল মনমরা হয়ে। বিরহের মধ্যে দিয়ে সেবার বুকেতে পারলাম আমাদের কাঙাল হৃদয়ে প্রতিমাদি ছিলেন কতখানি তৃষ্ণার জল। আমরা পরস্পরে ঝগড়া করতাম। সুশীল আর আমাতে একদিন হাতাহাতিই হয়ে গেল প্রতিমাদিকে কেন্দ্র করে। সরাসরি কথাটা ভুল, আমার রোগা শরীরে পড়ে পড়ে মার খেললাম। তবু অশ্রুবিকৃত গলায় চিৎকার করে বলেছিলাম : ‘আজ প্রতিমাদি থাকলে এইভাবে মারতিনে।’ মার খেতে আমার দুঃখ ছিল না, দুঃখ এই যে, প্রতিমাদি এই সময়ে রইলেন না। প্রিয়জন কাছে না থাকলে অত্যাচার সত্ত্বেও তো সুখ নেই—সেকথা সেদিন ভীতভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

কথা ছিল গিয়েই প্রতিমাদি চিঠি দেবেন। এক মাসের মধ্যে চিঠি এলনা, এলেন শরীরে প্রতিমাদিই।

কী-রোগা হয়ে গেছেন এই কয়েকদিনের অবর্তমানে। আর কী-আশ্চর্য পরিবর্তন! আগের সেই তন্দ্রাতুর ভাবময়তা, সেই বিচিত্র জীবনৈষণা কোথায় গেল। হঠাৎ যেন গভীর আর গভীর হয়ে গেছেন তিনি! হাত বাড়িয়ে আমার ফুলস্তবকটি নিলেন, কিন্তু খোঁপায় গুঁজে নিলেন না। রেখে দিলেন টেবলের ওপর ফুলদানিতে। কোনো কথা নয়, হাসি নয়, গান নয়, স্পর্শ নয়, উত্তাপ নয়। এক মুহূর্তে আমার গন্ধস্পর্শময় জগৎটা যেন ফুলের মতোই শুকনো!, বিবর্ণ হয়ে গেল। ওতো শুধু ফুল নয়, আমার হৃদয়ডালা শ্রীতি...

আমি জড়ানো পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। প্রতিমাদি ডাকলেন, 'শোন সন্ত—'

হাতে যেন এক মুঠো সোনা পেয়েছি, একেবারে কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়ালাম।

প্রতিমাদি চিঠির কাগজ ছিঁড়ে খসখস করে কি লিখলেন। তারপর খামে জড়িয়ে ঠিকানা লিখে ডাকটিকিট এঁটে আমাকে আদেশ করলেন লেটারবক্সে কেসে দিতে।

নীল খামের চিঠির মধ্যে আজো যেন প্রতিমাদির বিষমক্রান্ত হৃদয়ের স্পর্শ পাচ্ছি। সেদিন কি জানতাম ওই চিঠির মধ্যেই ছিল আমাদের এক-এক জনের কঠিন মৃত্যুশেল। সেদিন কি জানতাম ওই একটুকরো নীল লিপিই আমাদের আর প্রতিমাদির মধ্যে এক হৃস্তর চৈনিক প্রাচীর ভুলে দাঁড়াবে। পরবর্তীকালে কবি-সাহিত্যিকদের মুখে শুনেছি এক-একটি মানুষ এক-একটি দ্বীপ, আর তার চার পাশে ঘিরে লবণাক্ত সমুদ্রের বিরহ-কল্লোল। এই সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে আর-একটি দ্বীপে পৌঁছনো মানুষের পক্ষে সাধনার ব্যাপার। জীবনব্যাপী এক লবণাক্ত সামুদ্রিক বিরহ-ব্যথা নিয়ে ব্যক্তিমানুষ নাকি প্রচণ্ড একক! আজকে বেশ বুঝতে পারি ওই নীলখামখানাই ছিল সেই লবণাক্ত সমুদ্রের উপমা। ওই নীলখামের মায়ায় দিনের পর দিন আমাদের নাগালের থেকে প্রতিমাদি ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলেন।

সেদিনের সেই নীলখামখানার কথা স্মৃশীলকে বসিনি। কি জানি কেন এই চিঠিটির খবর আমার মন ওকে কিছুতেই দিতে চায়নি। তবু চিঠি এল। আরো অনেক চিঠি। প্রতি হপ্তায় দুটো করে।

এই চিঠির প্রতিক্রিয়ায় কিংবা অন্য কোনো কারণে জানি না দেখতাম প্রতিমাদির নব নব পরিবর্তনের রূপ। প্রতিমাদির মনে রঙের পালিশ চড়ল, রঙের ঢেউ লাগল তার স্থির সংযত দেহতটে, সেই রঙের ছোপ ধরল তার পোশাক-আশাকেও। যে প্রতিমাদি একদা শাদা ছাড়া অন্য ভূষণ জানতেন না, তিনি এবার রঙের জৌলুষ দিলেন তাঁর গায়ের চামড়ায় তাঁর দেহাবরণে। কোনো শাড়ির রঙে আকাশের নীল জলের ইশারা, কোনো শাড়ির রঙে কচি কলাপাতার সবুজ উচ্ছ্বাসকেও হার-মানাপো, কোনো শাড়ির রঙে বসন্তের বাসন্তী লাভণ্য। প্রতিমাদির কানে প্রবাল, গলায়, মণিবন্ধে হাতঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে সোনার অহেতুক উচ্ছ্বাস দেখা দিল। ললাটে কুমকুমের টিপ, চোখে কাজলের গভীর রেখা, গালে আর ঠোঁটে কৃত্রিম রঙ চড়েছিল কিনা, আজ মনে নেই।

যত তাড়াতাড়ি গল্প বলে চলেছি, তত জলদে কিন্তু এ-পরিবর্তন ধরা দেয়নি।

প্রতিমাদির চরিত্রে ছিল সেই আশ্চর্য সহনশীলতা, আর অযুত ধৈর্যের মহিমা। ধীরে ধীরে যেমন মনের চেহারা বদলেছে, তেমনি ধীরে ধীরেই তাঁর মনের উপঢৌকনও নতুন নতুন রূপ নিয়েছে। কিংবা আজ হয়তো মনে হয়, এ-পরিবর্তনে হয়তো প্রতিমাদি স্বেচ্ছায় ধরা দেননি। এ যেন অনেকটা অবশ্যস্বাবী ছিল। যেন কোন এক যাদুস্পর্শে অন্ধের মতোই ছিল তাঁর এই অনুকরণ। যাদুঘরের মনে বন্দী অন্ধ প্রকৃতির মতোই।

সুশীল ছিল আমার থেকে এক-আধ বছরের বড়। কাছেই পৃথিবীতে আগে আসবার দাবিস্বরূপ সে আমার থেকে এক-আধ বছরের বাড়তি অভিজ্ঞতার অহংকার করত। তখন ওর সবে গৌফের রেখা উঁকি মারতে শুরু করেছে, ওর স্বাভাবিক চিকন নারীকণ্ঠের স্বরভঙ্গি প্রাক-যৌবনের সূচনার মোটা, ভারি, বেশুরো বলতে শুরু করেছে। সে আজকাল কথা বলত নাটুকেপনা করে, চোখ নাচাত, আর শিশুও দিত দোয়েলের অনুকরণ করে।

সুশীলের কুতূহল ছনিবার! সে হঠাৎ কয়েকটা কাজ করে বসল। ফলে ডাকঘোগের গোলযোগের দরুণ প্রতিমাদির কয়েকটি চিঠি খোয়া গেল। তখনো কি জানতাম ছাই, যে চিঠিগুলো সুশীলই লুকিয়েছে। জানতে পেরে সুশীলকে বকেছিলাম, শাসিয়েছিলাম। কিন্তু সুশীলের গায়ের জোরের ভয়েই কিংবা যে কোনো কারণের জন্মেই হোক—এ ঘটনা প্রতিমাদিকে জানাতে পারিনি। আজ ভাবতে পারি তার একটা অন্য হেতু ছিল। প্রতিমাদি ছিলেন আমাদের কিশোর-কল্পনায় এক পবিত্র ভাবমূর্তি—যাকে ছোয়া যায়না, যার চারিদিকে এক অপার্থিব জ্যোতির্মাল। এক বেষ্টনী তৈরী করে আলাদা করে রেখেছে। ততদিন ভাবতাম ওই স্বর্গীয় মন্দিরের দ্বারে আমরা কেবল প্রহরী মাত্র—ওই মন্দিরের ভেতরে আমরা হরিজন, অস্পৃশ। হঠাৎ দূরস্ত ঠেলায় সেই মন্দিরের আগল খুলে দিল সুশীল—আর যাগবজ্র ধুম আড়ম্বরের পুরু কুয়াশা গেল কেটে—বাইরের হঠাৎ জলো হাওয়ার মন্দিরের প্রতিমা গেল অনেকটা বিবর্ণ, পাণ্ডাশে হয়ে। সেই স্পষ্ট নির্ভীক বাতাবরণে প্রতিমাদিকে নতুন করে আবিষ্কার করবার মাদকতা আমাদের পেয়ে বসল।

চিকিন পিরিয়ডে সুশীল আমাকে টেনে নিয়ে গেল কাঁটালটাপা গাছটির নিচে। পকেট থেকে প্রতিমাদির চিঠি বের করে বললে, 'নে। পড়।' নিষিদ্ধ ভাবাবেগে তখন আমার আপাদমস্তক কাঁপছিল ঝাউ গাছের মতো। মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'না—'

সুশীল বললে, 'আচ্ছা—তাহলে শোন—'

সুশীল বিড়বিড় করে কী বলে গেল, সে ভাবা ও ভঙ্গি আজ আর মনে নেই। তবে সেদিনকার লজ্জা আর ভয়ে পীড়িত হয়ে ঝেঁটুকু অনুধাবন করা গিয়েছিল তাই ছিল আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সত্যি বলতে কী, সেই চিঠি শুধু সুশীলেরই নয়, আমারও যথেষ্ট ব্যয়স বাড়িয়ে দিল। আমি রাতারাতি অনেক প্রাচীন, অনেক বিজ্ঞ হয়ে পড়লাম।

আর এই বিজ্ঞতার সঙ্গে কেমন এক দুষ্টর লজ্জা আর অপরাধবোধ আমার উন্নত মাথাকে হুইয়ে দিল প্রতিমাদির সামনে। ওঁর দিকে চাইতে পারতাম না, কথা বলতাম নিচু করে, না-ডাকলে যেতাম না, গেলেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারতাম না। ওঁর উগ্র

অস্তিত্বের স্পষ্টালোকের সামনে। চোখ জ্বালা করত, মাথা দবদব করত, ঠোঁটের উপরে আর নাকের ডগায় ঘাম জমত। জানিনা প্রতিমাদি আমার এ-পরিবর্তন কোনোদিন লক্ষ্য করেছেন কিনা। হয়তো এতই আত্মসমাহিত ছিলেন তিনি, অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ পক্ষকাল ধরে প্রতিমাদির চিঠি আসত না। এবং আসত না কেন, সে কারণ তো আমি আর সুশীল জানি। সে দিনগুলিতে প্রতিমাদির কাছে ভিড়বার সাহস ছিল না আমার। ক্লান্ত বিশৃংখল চুলের রাশি পড়ে থাকত খোলা পিঠের ওপর। পোশাক-আশাকে রুচির দৈন্য পীড়িত করত আমার চক্ষুকে, না-জ্বিতেন চোখের কোণে ঘন কাজলের রেখা দীর্ঘ করে, না-আঁকতেন ললাটদেশে কুসুমের টিপ। সে দিনগুলিতে এক অদ্বুত জড়তা দেখতাম প্রতিমাদির দেহমানে। প্রায় সময় বিছানায় পড়ে কাটাতেন, কলেজ-বাওয়ার দিনগুলি থেকে না-বাওয়ার দিনগুলিই নিয়মিত হয়ে উঠত। অভিমানী সেতারে ধুলো জমত। তারপর হঠাৎ সুশীলের ঔদার্যের গুণে চিঠি আসত। জড়তা ধনিয়ে আবার প্রাণীন আবেগে সহজ-স্বাভাবিক হয়ে আসতেন প্রতিমাদি। প্রতিমাদির মনের চাবিটা হস্তগত করে' এক নতুন খেলায় জমে উঠেছিল সুশীল। ওটা ছিল তার এক নির্মম খেলা। কৈশোরের স্বার্থপরতার অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

সত্যি কথা বলতে কি, সুশীলের এই নির্মম খেলার আমিও জমে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। আমার ছিল গভীর অভিমান প্রতিমাদির বিরুদ্ধে। মনে মনে ওঁকে জব্দ করবার ইচ্ছা যে ছিল না, এমন নয়। আজ বুঝতে পারি সুশীলকে মনে মনে সমর্থন না-করে আমার উপায় ছিল না। আমার কিশোর মনের ভেতরে অশ্রুটে লুকিয়ে ছিল একটি নারী হৃদয়। যার শক্তি একমাত্র হৃদয় হৃদয়বৃত্তিতে, সুশীলের মতো আক্রমণশীল নয়, তাই নিজের আবেগে নিজের ইচ্ছার মধ্যেই ঘুরপাক খেতো রমণীহৃদয়ের সংকীর্ণ কামনাটুকু। প্রতিমাদির উপর অজ্ঞান্সে আমরা অধিকারের নিশানা জড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই অধিকার থেকে যে বস্ত্র হস্তীটি আমাদের হঠাৎ শুড় দিয়ে ঠেলে একেবারে অতল গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাকে আমরা কোনোদিন ক্ষমা করিনি। প্রতিমাদি ছিলেন আমাদের রাজ্যের মহিমাময়ী রাণী—আর আমরা ছিলাম তার নাইট—অন্ত রাজ্যের রাজপুত্র তাঁকে জবরদখল করবে, এটা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনি।

কিন্তু মিথ্যা আর পাপ কতদিন চাপা থাকে। একদিন ধরা পড়ে গেলাম প্রতিমাদির কাছে। শুধু ধরা-পড়াই নয়, আমরা স্বর্গচ্যুত হলাম। সে-কাহিনী বলি।

সেদিন ইন্ডুলে সন্ধ্যার দিকে কিসের এক উৎসব ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছিলাম। প্রতিমাদি ওঁদের বাড়ির সন্মুখে ছোট লনের ঘাসে পায়চারী করছিলেন। আমাকে দেখেই হঠাৎ জলে উঠল ওঁর চোখ। সেই প্রথম ওঁর চোখে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠতে দেখি। চোখাচোখি হতেই আমার অন্তরাত্মা যেন শুকিয়ে এক যুহুর্তে ছোটো হয়ে গেল। পাশ কাটিয়ে আসব ভাবছিলাম, প্রতিমাদি ভারি গলায় ডাক দিলেন : 'সন্ত—ওনে যাও—'

ইচ্ছে করছিল তখন ছুটে পালাই। কিন্তু প্রতিমাদির এমনই দ্বন্দ্ব আকর্ষণ ধমকে দাঁড়ালাম। তারপর যেমন করে মুক্ত আলোর পোকারা সান্ধ্য যুত্কার দিকে এগিয়ে যায়, আমিও তেমনি এগিয়ে গেলাম। প্রতিমাদি কোনো কথা বললেন না, ইশারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। সিঁড়ি বেয়ে ওর সঙ্গে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রতিমাদি যখন শক্ত হাতে দরজার আগল তুলে দিলেন, তখন ভয়ে লজ্জায় অনুশোচনায় না-জানি-কি কারণে দরদর করে বামছে সারা শরীর। প্রতিমাদি বললেন, ‘বোসো—’

অনেকক্ষণ মুখোমুখি আমরা স্থির হস্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। নিচের ঠোঁটটা অনেকক্ষণ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন প্রতিমাদি। যেন কিছু একটা যুত্কারও দেবার আগে জজসাহেব নিজেকে শক্ত করে নিচ্ছেন।

প্রতিমাদি অনেকক্ষণ পরে শুক গলায় বললেন, ‘সন্ত, তোকে আমি ভালো ছেলে বলেই জানতাম। তুই...!’

আর কিছু বলতে হল না প্রতিমাদিকে, হঠাৎ কিপ্রবেগে উঠে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ওঁকে জড়িয়ে ধরলাম। কান্নাগলানো গলায় কোনোরকমে বললাম ‘তুমি বিশ্বাস করো প্রতিমাদি। আমি—আমি কিছুই জানতাম না...সব সুশীল...’

প্রতিমাদি ধাক্কা দিয়ে আমাকে সারিয়ে দিলেন। ‘অন্ডায় করেছিস তবু লজ্জা নেই বজ্জাত ছেলে। আবার মিথ্যে কথা। ছি!’

ক্রত পায়ে গিয়ে সশব্দে দরজা খুলে দিলেন তিনি। তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আদেশের স্বরে বললেন : ‘বা বেরিয়ে যা—পাজি। আর কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আসবি না—’

হেঁটমুখে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিশোর বয়সের সেদিনকার সেই দুঃখ আর শূকবেদনার সাক্ষী কেউ ছিলনা। এরপর আর কোনোদিন প্রতিমাদির বাড়িতে যাইনি।

এর পরেও অনেকদিন ভেবেছিলাম যে-ঘটনায় আমার সক্রিয় হাত ছিল না, যার অন্তে মূল দায়ি আমি ছিলাম না, সেই আমার পরেই কেন সব দোষ চাপিয়েছিলেন প্রতিমাদি, একবারও বিচার করে দেখলেন না!

এ-বহুস্ত জানত কেবল সুশীল। শেষের দিকে এই ঘটনার অংকে সেইই নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রতিমাদির কাছে আমায় বদনামের ভাগী করেছিল।

আজকে প্রায় দশ-এগারো বছর পরে হঠাৎ আমার সামনে প্রতিমাদিকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুতূহল হল জিগ্যেস করি : আজকেও কি তিনি আমার উপর সেই একই ভুল ধারণা পোষণ করে রেখেছেন! সময়ের স্রোতে পরিবর্তনের ধারায় সেই দশ-এগারো বছর আগেকার পুরানো সিদ্ধান্তে কি কোনো ফাটল ধরেনি। এগোতে গিয়ে থেমে গেলাম—মাথার পাতলা চুলে সিঁহর রেখা, আর হাতের নোয়ার আদলে আজকের প্রতিমাদি হয়তো সেই একমুগআগেকার নবীনমোহনের রোমান্স শুনে উচ্ছস হাসিতে গড়িয়ে পড়বেন।

ধীর পায়ে কলেজ ট্রিট ধরে এগিয়ে গেলাম

ইন্দোচীনে আনামের রাষ্ট্রীয় প্রভাব

প্রভাত ভাদুড়ী

মানচিত্রে ইন্দোচীনের ভৌগোলিক অবস্থিতি ইংরেজী বড় অক্ষরের একটি এস্-এর মত দেখা যায়। ইন্দোচীনের বর্তমান সীমারেখা হচ্ছে ২,৮৫, ৭৯৪ বর্গমাইল আর তার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ২,৭৪,৬০,০০০। ফ্রান্সের সঙ্গে এক সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী ফরাসী ইন্দোচীনভুক্ত ভিয়েটনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়াকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ইন্দোচীন ফেডারেশনের উন্মেষ ঘটে। ইন্দোচীনে এই ফেডারেশনের উন্মেষ ইন্দোচীনরাষ্ট্রগুলির বলিষ্ঠ স্বাভাব্যবোধেরই অন্ততম অভিব্যক্তি।

কিন্তু ইন্দোচীনরাষ্ট্রগুলির এই স্বাভাব্যবোধের আরোহণ-অবরোহণমুখী গতিধারায় ফেডারেশনের লাওস, কাম্বোডিয়া অপেক্ষা যেমন ভিয়েটনামের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি উপেক্ষণীয় নয় ভিয়েটনামের অন্তর্গত টংকিং, কোচীনচীনের তুলনায় আনামেরও গুরুত্ব। এই কারণে বর্তমান ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় পরিবেশেও কূটনীতিক ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়েও একক আনাম সমগ্র ইন্দোচীনের প্রতিনিধি হিসেবে সংগ্রাম-আপোসের স্তর ও মূল্যমান নির্ণয় করে চলেছে। আর, অন্তর্দিকে, ঠিক একই কারণে, আনামের স্বাধীনতাস্বপ্নকে বিপন্ন বিপর্যস্ত করে ইন্দোচীনে শাস্তিসৌধ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ক্রমাগত ব্যর্থতায় বিড়খিত হচ্ছে। প্রাক-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের যুগেও, এই আনামের তীরভূমিতে দাঁড়িয়েই চৈনিক সাম্রাজ্য একদিন ইন্দোচীনের সামাজিক-রাষ্ট্রিক চিন্তাবৃত্তির ওপর তার সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রভাবজাল বিস্তার করেছিল। আর সেদিনেও এই আনাম, চরমতম স্বাভাব্যবোধ সত্ত্বেও, চীনসাম্রাজ্যের কবলে তার তীরভূমি সমর্পণ করেছিল শুধুমাত্র অগ্রসরতার অভাবের দরুনই।

আনামের আদি অধিবাসী ছিল থাই বংশোদ্ভূত এক জনসমষ্টি। এদের একাংশ মূল চৈনিক ভূখণ্ডেও প্রবেশলাভ করে। খৃষ্টপূর্ব ১০ম শতকের পূর্বে চাম্বাতির শাসনাধিকার ছিল এদের ওপর। এই চাম্বাশাসনের বিলোপ ঘটিয়েই আনামে চৈনিকশাসনধারার প্রথম প্রবর্তন করেন চিন্ শি ছ্যাং টি। চিন্ শি-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধসংগ্রাম গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত আনাম জাতিকে চিন্-শি-র হাতে পরাজয় বরণ করতে হয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের সমাপ্তিকালে চীনে চিন্-বংশের পতন ঘটায় আনাম তার রাষ্ট্রস্বাভাব্য ঘোষণা করে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের অবসান অবধি আনামের এই রাষ্ট্রস্বাভাব্য অক্ষুণ্ণ রয়ে যায়। কিন্তু চীনের হ্যান উ টি-র আক্রমণে আনাম আবার পর্যুদস্ত হয়। অতঃপর আনামশাসক ওয়াং ম্যাঙ-এর আমলে উ টি শাসক-বংশের উত্তরাধিকারীর কবল থেকে আনাম মুক্তি অর্জন করে।

এই সময় আনামবাসীরা চৈনিক ভাষা থেকে অভিনব ও সহজতর ভাষার আবিষ্কার ক'রে এক স্বতন্ত্র জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টি করে।

আনামের এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। পরাক্রান্ত চীনসম্রাটের হাতে আবার তাকে লাহিত হতে হয়। ২৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আনাম পরাধীন থাকে। কিন্তু আনামশাসক দিন্ বো ল্যান ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ২৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনসাম্রাজ্যের শাসন থেকে আনামের একটি ব্যাপক অংশকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হন। ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীনের শাসনক্ষমতার লিউ পরিবার অধিষ্ঠিত হলে আনামের রাষ্ট্রস্বাভাব্য দীর্ঘকালের জন্য অন্তর্মিত থাকে। অবশ্য চৈনিক শাসনক্ষমতার লিউ পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সুই-পরিবারেরও আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু চৈনিক পরিবারের পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বে আনামের স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সুবর্ণসুযোগের সূচনা করেছিল, এই সময় থেকে সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় অপসারিত হ'ল। চীনের পারিবারিক শাসনক্ষমতা পূর্বাশ্রয় অতিমাত্রায় শক্তিশালী আকারে দেখা দেয়। ফলে আনামের স্বাভাব্যলাভের পক্ষে এই সুরকে দুর্ভোগের যুগ ব'লে অভিহিত করা যায়। চীনে ট্যাং পরিবারের অভ্যুদয় ও পতন ঘটলে আনাম অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য আর একবার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পরিশেষে চিয়েন লুঙ্ পরিবারের হাতে ঐ স্বাধিকার বহুলাংশে কলুষিত হয়।

আনামের রাষ্ট্রস্বাভাব্য প্রতিষ্ঠার এমনিভাবে পর্যায়ের আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। আনাম তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ও আত্মরক্ষার অভিযানকে পূর্বাশ্রয় দ্বিমুখী ধারায় চালিত করেছে। একদিকে সে আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চৈনিকসাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়েছে, অপরদিকে, সে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তার রাষ্ট্রসীমান্ত-প্রসারের অভিযানেও উদ্যোগী হয়েছে। দক্ষিণপ্রান্তিক সামরিক ঘাট হিসেবে আনামের উত্তরপ্রান্ত চীন সাম্রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আনামও তার আত্মরক্ষার কেন্দ্রকে নিজস্ব দক্ষিণপ্রান্তের অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রসীমানার সম্প্রসারণ করবার প্রয়াস পায়।

হ্যান-বংশের শাসনকালে সমগ্র চীন পারিবারিক দ্বন্দ্ব বিস্তৃত হয়ে শাসনতান্ত্রিক ঐক্যমুদ্রে আবদ্ধ হলে আনামের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশই চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আনাম চীনের উপনিবেশিক রাজ্য হিসাবে আংশিক স্বায়ত্তশাসনেরও অধিকার পায়। এই পর্যায়ে ইন্দোচীনের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতেও চৈনিক প্রভাব বিস্তারের বিস্তৃত অভিযান চলে আনামকে আশ্রয়কেন্দ্র করে। দক্ষিণ আনামের সরাসরি প্রতিবেশী চম্পারাজ্য চৈনিক বশতাকে বরাবরই সাক্ষ্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছে। ঐ সময় কেন্দ্রীয় পর্বতমালায় পূর্বউপকূল অংশই ছিল আনামের দক্ষিণাংশ, আর এই অংশেই গড়ে উঠেছিল চামজাতির রাজ্যও চম্পা। চৈনিক শাসনক্ষমতার সাথে ক্ষণকালীন যুদ্ধবিরতির সুযোগেও উত্তর আনামের শাসকগোষ্ঠী দক্ষিণ আনাম ও তার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে যে রাষ্ট্র-সীমা প্রসারের অভিযান চালায় তাতে চম্পারাজ্যও শত্রুশক্তি হিসেবে গণ্য হয়। এই সূত্রে ধরে

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চম্পা কাছোডিয়া কর্তৃক অধিকৃত হলে আনাম কাছোডিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধোষণা করে এবং জয়লাভও করে। কোচীন-চীনও তখন কাছোডিয়ার অন্তর্গত। ফলে আনামের রাষ্ট্রসীমা কোচীন-চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু তৎকালীন চীনসম্রাটের হাতে আবার আনামের নিজস্ব স্বাধীনতাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

এইভাবে চৈনিক সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রভাব-অস্তরাল থেকেও আনাম তার রাষ্ট্র-স্বাভাব্য চেতনা-সাধনাকে অনির্বাক রেখেছে, শত্রুকে তার দুর্বলতম মুহূর্তে আঘাত হেনে স্তরে স্তরে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলেছে। এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকু জানা থাকলে ভিয়েটনামের সাম্প্রতিক রাষ্ট্র-নীতি ও কর্মধারাকে বখাষ অমুসরণ করা হয়ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার হবে না। আর অমুসরণ করা হয়ত অসম্ভব হবে না যে আনামের রাষ্ট্রচেতনা উগ্র হয়ে দেখা দিলেও চৈনিক সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সে কখনো তাকে স্বকীয় ধারায় রূপান্তরিত করতে পারেনি। তাই মূলত আনামের তীরভূমিতে দাঁড়িয়েই চৈনিক প্রভাব ইন্দোচীনের অস্ত্রাঙ্গ অংশেও নিষ্কিপ্ত হয়েছে।

উত্তরকালে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও চীন সাম্রাজ্যেরই কৌশল আশ্রয়ে আনামকেই কেন্দ্রবিন্দু ক'রে সমগ্র ইন্দোচীনের বুকে তার শোষণচক্র রচনা করে। বিগত সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে জর্জ কেম্পেইট ফ্রান্সে 'Society for Foreign Missions of Paris' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানেরই নির্দেশনামা বহন ক'রে ফরাসী বণিকগোষ্ঠী আনামের দক্ষিণ অংশ ও কোচীন-চীনে ফ্রান্সের 'sphere of influence' বা প্রভাব সীমানা বিস্তারের অভিপ্রায়ে প্রথম পদার্পণ করে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আনামের দক্ষিণাংশ ও কোচীন-চীনের ওপর উত্তর আনামের রাষ্ট্রিক অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জর্জ ফরাসী মিশনারী উত্তর আনামকে প্রত্যক্ষ সাহায্যদানে উত্তর আনামের জয়লাভ ঘটান। ফলে উত্তর আনামের ওপর ফরাসী প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভেতর আনামকে কেন্দ্র করে আনামকে অতিক্রম করে ইন্দোচীনের অস্ত্রাঙ্গ রাষ্ট্রাংশেও ফরাসী প্রভাব প্রকট দেখা দেয়।

কিন্তু, অতীতকালের সাথে সঙ্গতি রেখেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ফরাসী-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে ঐ আনামই। আনামেই গড়ে ওঠে প্রথম সংগ্রামী সংস্থা 'Society for the Modernisation of Annam.' যুদ্ধোত্তরকালেও বিপ্লবানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও রূপ নিয়ে 'Revolutionary Party of Young Annam' নামে ১৯২৫ সালে যে-প্রতিষ্ঠান দেখা দেয় তারও উৎস-কেন্দ্র ছিল আনাম। ১৯৩০ সালে দেশীয় সেনাবাহিনীতে প্রথম যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে তারও মূলে ছিল সেই আনাম-যুবকের নেতৃত্ব—যাঁর প্রকৃত নাম Nguyen Tat-Tham কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীখ্যাত হয়েছেন হো চি মিন নামে, যার ইংরেজী অর্থ হচ্ছে He Who Shines. ১৮৯৪ সালে আনামেরই এক নগণ্য গ্রামে এর জন্মলাভ ঘটে। ১৯৩০ সালে এঁরই চেষ্ঠায় ইন্দোচীনে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়। বিপ্লবীদলে ইনিই Nguyen—Ai-quoc নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৩৯ সালে বিপ্লবীদল মতভেদ দেখা দেওয়ায় 'Revolutionary Party of Young Annam' ভেঙ্গে আর একটি বিপ্লবীদল গঠিত হয় 'Viet-Nam-Doc-Lap-Dong-Minh Hoi' বা League of Vietnam Independence. ইন্দোচীনে এই দলটিই Viet Minh নামে সাধারণভাবে পরিচিত। এইসময় থেকেই আনাম ভিয়েটনাম নামে রূপান্তর পায়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মূল চৈনিক ভূখণ্ডেও শাসনকর্তৃক নিয়ে যেমন অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না, তেমনি অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্ত ছিল না আনাম প্রদেশেও। উত্তর আনামেরই শাসনাধিকারকে কেন্দ্র করে টংকিং-র ট্রিন বংশ ও আনামের নুগুয়েন-বংশের ভেতর যে বন্দসংঘাতের প্রতিযোগিতা চলছিল তাতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে নুগুয়েন বংশকে সাহায্য করে সমগ্র আনামে নুগুয়েন বংশের শাসন কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট বাওদাই এই নুগুয়েন বংশেরই বর্তমান উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্দোচীন জাপানের করায়ত্ত্ব হলে ফরাসীসাম্রাজ্যবাদের অনুগত রাষ্ট্রনায়ক বাওদাই ভিয়েটনামের পক্ষে জাপাবিরোধী সংগ্রাম চালনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফ্রান্স থেকে যথোপযুক্ত সাহায্যের অভাবে সম্রাট বাওদাই শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইন্দোচীন থেকে পলাতক হন। তথাপি ভিয়েটমিন দলটি গেরিলাযুদ্ধের আকারে জাপ-বিরোধী সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করে তুলেন। ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তির সক্রিয় সাহায্য পেয়ে হো চি মিনের ভিয়েটমিন দল ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে টংকিং প্রদেশে জাপসেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করেন। এই বৎসর আগস্ট মাসে জাপশক্তির আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই Peoples National Liberation Committee নামে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গড়ে তোলা হয়। অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে স্থায়ী জাতীয় সরকাররূপে রূপ দেওয়া হয় Democratic Republic of Vietnam নামে। রিপাব্লিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সেই আনামযুবক হো চি মিন। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপাবিরোধী আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে আন্দোলনের রূপ ও নীতি মৌলিকভাবে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলন জাতীয়তাবাদী রূপের ক্ষেত্র ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও শোষণবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সংগঠিত হয়ে ওঠে। সংগঠনের এই নীতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করে ফরাসী সরকারই নয়, বৃটেনের মত শোষণকারী সরকারও গভীরভাবে আশঙ্কিত হন। এই আশঙ্কার ফলেই ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৃটেনের বেতিনসাহেবের যে পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয় তারই পরিণতি স্বরূপ ১৯৪৫-এর অক্টোবরে পটসডাম চুক্তি অনুযায়ী ১৪ অক্টোবর উত্তরাংশ পর্যন্ত হো চি মিন সরকারকে শাসনপ্রাধিকার দিয়ে ভিয়েটনামের দক্ষিণাংশকে ফরাসী অধিকারে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়। দেশব্যাপী এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে হো চি মিন সরকার সমগ্র ইন্দোচীনের প্রতিনিধি স্বরূপ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললে ফরাসী সরকার ভিয়েটনাম সরকারের সাথে নতুন করে আপোস-আলোচনা করতে সম্মতি জানায়। ভিয়েটনাম সরকারকে 'free state with its own government,

parliament, army and finance' স্বীকৃতি দিয়ে হো চি মিনকে বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্যে প্যারিসে যাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যারিসে হো চি মিন যখন বিস্তৃত আলোচনায় ব্যস্ত ঠিক তখনই অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সাথে ইন্দোচীনস্থ ফরাসী হাইকমিশনার দেশভাগী ও দেশচ্যুত ভূতপূর্ব সম্রাট বাওদাইকে হংকং থেকে আহ্বান ক'রে ভিয়েটনামের 'স্বাধীন সম্রাট' ব'লে ঘোষণা করেন। তাই আজও ভিয়েটনামের রাজনৈতিক বঙ্গমঞ্চে স্বৈতশাসনতন্ত্রের অভিনয় চলিত হচ্ছে।

এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করবার বস্তু হচ্ছে এই যে বঙ্গমঞ্চের উভয় নায়কই হচ্ছেন আনামের অধিবাসী। আর সমগ্র ইন্দোচীনের রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় তার আত্মস্বাতন্ত্র্যের মেঘমুক্তি ও মেঘসঞ্চারের অমুঠানে ঘটিয়ে চলেছে সেই উচ্ছলগতি, স্বাভাববাদী আনাম, আজও।

ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম প্রতিভেদে
বীমা প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট কোং লিঃ

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১

প্রদত্ত দাবীর পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা

ডাক্তারী পরীক্ষা অথবা বিনা পরীক্ষাতে

১০০০/- টাকা পর্যন্ত জীবনবীমা হয়।

গত ভ্যালুয়েশনের ফল অতীব সন্তোষজনক

উত্তম শর্তে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক

এস, আর, সেন, বি, কম, এফ, আর, ইকন, এস (সগুন)

সেক্রেটারী

একফালি আকাশ

আবলু দাশগুপ্ত

কড়া নাড়তেই যা এসে দরজাটা খুললেন। বাইরের আলো থেকে ভিতরে এসে অন্ধকারে চিত্রার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেল। তবু অভ্যস্ত পা ফেলে অন্ধকারেই বাঁদিকে ঘরটার চুকে পড়ল সে। হাতের ব্যাগটা আন্দাজ করে কোণের ছোট টেবিলটার উপরে রেখে তাকের উপর থেকে হাতড়ে দিয়াশলাই নিয়ে হ্যারিকেনটা জ্বালল। তারপর দেয়ালের গায়ে টাঙানো দড়িটার উপর থেকে শাড়ী নিয়ে পরনের শাড়ীটা ছেড়ে ফেলে শুয়ে পড়ল চিত্রা। শুয়ে শুয়ে একটা পাখা নিয়ে নাড়তে লাগল।

এখন শান্তি, শুধু শান্তি। এর শুরু সেই হেয়ার স্ট্রীটের মোড়ে। সাত ঘণ্টা ঠায় বসে শুধু 'মাথার প্লীজ' বলা আর লাইন দেওয়া। এক মুহূর্ত অবসর থাকে না। যদি লাইন দিতে দেবী হয় একটু, অমনি গালাগাল। আর গালাগাল মানে এমন সব ভাষা, যা আর কোনোদিন শোনেইনি চিত্রা। মাঝে মাঝে ধমক দেয় সে, বলে, লজ্জা করেনা এমন ভাষায় কথা বলতে? নিত্য তিরিশদিন এই এক ইতিহাস। আর রোজ এমনি অবস্থায় সাত ঘণ্টা কাটিয়ে যখন ফেরে চিত্রা, তখন আর চেতনা বলে কিছু থাকে না। পরিশ্রান্তিতে দেহ তখন অবসন্ন, মানুষের নোংরামিতে মন বিভ্রাট। তবু সন্দের সহকর্মীদের সাথে ছুচারাটে কথা বলতে হয়, নিতান্ত অনিচ্ছায়। তারপর একে একে সবাই ট্রামে বাসে উঠে পড়ে। চিত্রাও।

ছুটা-নটার ভিউটি ছিল আচ্ছন্ন। এ-সময়ে ফেরারপথে ট্রাম কঁাকা থাকে। হেয়ার স্ট্রীটের মোড় থেকে ট্রামটা যখন বাক নেয়, তখন প্রায়ই আর কোনো যাত্রী থাকে না। মেয়েদের আসনে একটা পাশ ঘেঁষে মাথার খানিকটা তেরচাভাবে বাইরের দিকে এলিয়ে দেয় চিত্রা। বিপরীত দিক থেকে বাতাস এসে মুহূর্ত স্পর্শ লাগায় কপালে। একটা স্নিগ্ধতা নেমে আসতে থাকে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে।

আর তখন মনটা আন্তে আন্তে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এলে পরে আশ্চর্য শান্ত কোমল লয়ে একেকটা ভাবনা উঁকি দেয়। তারপর যেন নিঃশব্দে গুড়ি মেরে এগিয়ে চলে। অনেককে নিয়ে, অনেক কিছু নিয়ে ভাবনা। আর সেই ভাবনার তলায় তলায় মধু যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। মনে হয়, মিতুলকে নতুন জামার জল আজ বকুনি দেয়া উচিত হয়নি। অতটুকু মেয়ে, ওর একটা সুন্দর জামার সখ হতেই পারে। অথচ আশ্চর্য, এমন সহজকথাটা সেই সকালবেলায় চিত্রার মনে আসেনি কিছুতেই। এখন মনেহয়, হাতখরচের জন্মে মাকে

অন্তত গোটা পাঁচেক টাকা মাসে মাসে দেওয়া একান্ত উচিত। ধরের বড় মেয়ে সে, বড় ছেলের মত। টাকা কটা পেয়ে মায়ের মুখে যে হাসিটুকু ফুটবে তাই ভাবতেও ভাল লাগে।

আর সবকথা, সব ভাবনার তলায় আরেকটি সুর বয়ে চলতে থাকে একটা অন্তঃস্রোতের মত। একটু একটু করে সেই সুর মূর্তি নিয়ে ফুটে ওঠে নিমীলিত চোখের সামনে।

গত রবিবারে এসেছিল রমেন। চিত্রারও অফ্‌ডে সেদিন। রমেনকে দেখে বুকের খুশি মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল,—বোসো।

ধরে ঢুকে তক্তপোষে বসতে বসতে রমেন বলেছিল,—বসব না, চলো।

—কোথায়?

—কোথাও নয়, এমনি।

হাসিতে, খুশিতে, উদ্দীপনায় ঝলমল করছিল রমেন। মিতু এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। রমেন ডাকল,—মিতু শোনো।

কাছে আসতেই দু'পায়ের মাঝখানে ওকে দাঁড় করিয়ে ওর দুইগাল দুই হাতের চেটোয় চেপে রমেন বলল,—কি নেবে তুমি?

মিতু-খাড় নেড়ে বলল,—কিছু না।

—কিছু না নয়, অন্য কিছু।

মিতু হেসে ফেলল। বলল,—উঁহু।

একটা হাত ওর কাঁধে রেখে অন্যহাতে পকেট থেকে একটা মাউথঅর্গান বের করে ওর মুখের কাছে ধরল রমেন। চট করে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে মিতু সটকে বেরিয়ে গেল।

চিত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিতু বেরিয়ে গেলে বলল,—কী যে সব ছেলে-মানুষী করো তুমি!

—কেন?

—একটা মাউথঅর্গান কেনার কী হয়েছিল?

—উঁহু, আসল কথা তা নয়। ওটা তোমায় দেইনি বলেই—

—যাঃ, ফাঙ্কিল কোথাকার! কোণে স্মুটকেসটার উপরে পাট-করে-রাখা শাড়ী আর ব্লাউজ নিয়ে বেরিয়ে গেল চিত্রা। রমেন হোহো করে হেসে উঠল। বাইরের দরজার কাছ থেকে তখন মাউথঅর্গানের বিচিত্র সুর ভেসে আসছে।

আশ্চর্য! ঐ একটিমাত্র মানুষের উপস্থিতিতে গোটা বাড়িটার আকাশ কেমন বদলে যায়। একতলার অন্ধকার এই বরষাটিতে কেমন খুশির আলো ঝিলমিল করে ওঠে।

রমেনের কথা ভাবতেও কেমন আশ্চর্য ভাল লাগে। শরতের শিশিরের মত নিঃশব্দে নেমে আসে ভাল লাগার অনুভূতিটা। আর এখন এই গুয়ে গুয়ে চিত্রার স্বপ্নের মত মনে হয়, একটা মধুর মুছার আবেশ ঘন।

সেদিন রমেনের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রা। কলেজ স্ট্রীট থেকে ট্রাম ধরে সোজা

এস্প্রানেড। তারপর কার্জন পার্কের ভিতর দিয়ে এসে আরও খানিক দূর। পীচ ঢালা রাস্তার দুপাশে বেশ চওড়া সবুজ ঘাসের পাড়। তাই ধরে আরো কিছুটা হেঁটে এসে ছুটেন। আকাশ ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার দুপাশে আলোর সারি জ্বলছে। হঠাৎ মনে হয় যেন একটা আলোর রেখা চলে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত, অনেক দূর, চোখের দৃষ্টি পৌঁছায় না সেখানে।

ঘাসের উপরে বসল ছুটেন। পাশাপাশি। রাত্রির রেড রোড দিয়ে একেকটা গাড়ী তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে হুসু করে। তারপর আবার কিছুক্ষণ নীরব, নিঃশব্দ। শুধু দূর থেকে চৌরঙ্গীর কোলাহল ফিকে হয়ে ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। চিত্রা নির্বাক। এতক্ষণ আসতে আসতে ট্রামের ভিড়ে কত কথা বলেছে ছুটেন, কত কিছু নিয়ে কথা। কিন্তু এখানে, এই একা একা ছুটনের কারো মুখে কথা নেই আর।

শেষে একটা সিগারেট ধরালো রমেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—কই, কথা বলছ না যে ?

চিত্রা মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ তুলে বলল,—কী বলব ?

আবার নীরবতা। অস্বস্তিতে সমস্ত আকাশটা ভারী হয়ে উঠেছে। আর মনে মনে একটা চাপা গুমোটের ছটকটানি।

—আচ্ছা চিত্রা !

—বলো।

—এমন মুখ বুজে থাক কেন ?

একটু হাসতে চেষ্টা করল চিত্রা—থাকি বুদ্ধি ?

—থাক না ?

চিত্রা জবাব দিল না। একটা ঘাসের শীষ তুলে নিয়ে নখে কাটতে লাগল। নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল রমেন। আপনমনেই ধোঁয়ার রিঙ সৃষ্টি করল কয়েকটা। তারপর সিগারেটের শেষটুকু ধূবে ছুঁড়ে দিয়ে বলল,—এ আমার ভাল লাগে না।

—কী ?

—তোমার এমনি গুমু মেরে বসে থাক।

চিত্রা তবু নির্বাক। শব্দহীন মন্থরতার এগিয়ে চলেছে যুদ্ধের পর যুদ্ধ। আর অন্ধকার আকাশ যেন নেমে এসে চেপে বসছে ওদের ছুটনকে ঘিরে। শেষে খুব আশ্বে করে রমেন ডাকল,—চিত্রা !

—বলো।

—চার বছর তো কেটে গেল দেখতে দেখতে।

—হ্যাঁ। চিত্রার গলাটা কেঁপে গেল একটু। একটা গুমরানো ব্যথা হলে হলে উঠল তার বুকে। কেমন দুর্বল হয়ে উঠল দেহটা। নিজের অজান্তেই একমুঠি ঘাস ঝাঁকড়ে ধরল সে। আর রমেন মুখ ঘুরিয়ে চৌরঙ্গীর আলোকসজ্জা দেখতে লাগল একদৃষ্টে।

খানিক পরে চোখ ঘুরিয়ে সোজা সামনে দূরের দিকে দৃষ্টি ফেলল রমেন। বলল,—
শোনো চিত্রা।

—বলো।

—চার মাস মোটে বাকী বিশ্বর পরীক্ষার। তারপর তো আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

রমেনের প্রত্যেকটি কথা তরঙ্গ তুলছিল চিত্রার বুকে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। তারপর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তালতা। বাসের মুঠিটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরল চিত্রা। বাসগুলি উঠে এল। তখন রমেনের হাতখানাই চেপে ধরল সে।

রমেন বলল,—কী হল ?

চোখ বুজে ঠোট কামড়ে চিত্রা বলল,—কিছু না। বলার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নাড়ল অস্বাভাবিক জোরে।

সময় কাটছে ঘড়ির কাটার। যুহুর্তকেও যেন আবার ভাগ ভাগ করে পরিমাপ করা যায়। ছুজনেই নির্ধাক। শুধু রমেনের আঙুলগুলি নড়ে বেড়াচ্ছে চিত্রার আঙুলের মধ্যে।

—একটা কাজ করলে হয় না, চিত্রা ?

—কী ? অন্ধকারেও জ্বলে ওঠে চিত্রার চোখ।

একটু ইতস্তত করে রমেন। শেষে বলে,—না, থাকগে।

রমেনের মুখখানা একবার ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল চিত্রা। দেখতে পেল না। ওর মুখ অন্তরিক্কে ঘোরানো।

তারপর এক সময়ে চিত্রা নিজের হাত সরিয়ে নিল। বলল,—চলো, উঠি আজ।

—এখনি উঠবে ?

—হ্যাঁ। কাল নাইটডিউটি ছিল। ছপুবে ঘুম পোষায়নি।

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। রমেনও। মন্থরগতিতে হেঁটে চলল দুজনে। পায়ে পায়ে রেড রোড ধরে খানিক দূর এসে কোণাকুণি মাঠ পেরিয়ে মনুমেন্টের তলায়। তারপর সোজা ট্রাম টার্মিনাস্। নিঃশব্দে হেঁটে এসেছিল চিত্রা। হাঁটতে হাঁটতে নয়, ট্রামে বসে নয়, এমনকি কলেজ স্ট্রীটে নেমে আসার সময়ে পর্যন্ত রমেনকে একটি কথাও আর সে বলে আসতে পারেনি সেদিন।

আজ শুয়ে শুয়ে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে চিত্রার দেহের অবসাদ যেন আরো বেড়ে যাচ্ছিল। আরো অন্ধকার হয়ে আসছিল মনের আকাশ। আর তার সমস্ত দেহমন ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা গভীর কান্নার ঢেউ ঠেলে ঠেলে উঠছিল। চিত্রা জানে, বিশ্বর পরীক্ষাই শেষ সমস্যা নয়। পরীক্ষার পাস না-ও করতে পারে বিশ্ব। আর পাস করলেও কতদিনে চাকরি পাবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? আসলে সমস্যা তো আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বিশ্বর পরীক্ষার পরে। যদি চাকরি না পায় বিশ্ব ? এ-কথা কি বোঝে না রমেন ? নিবিড় সমবেদনার ঠোট দুটো আকৃষ্ট হয়ে বেকে উঠল চিত্রার।

—চিৎ !

মায়ের ডাকে উঠে বসল চিত্রা। বলল,—হ্যাঁ।

একটা শাড়ী, তোয়ালে আর হ্যারিকেনটা নিয়ে কলতলায় চলে এল চিত্রা। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে। বেরোতেই আবার মায়ের সঙ্গে দেখা।—বিশু ফেরেনি, মা ?

—এই কিরলো।

চিত্রা এ-ঘরে ঢুকল। আর বিশু ও-ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলায় চলে গেল। শুনশুনিয়ে একটা গানের কলি গাইছিল সে।

মা ভাত বেড়ে দিলেন। আসন পাতাই ছিল, ওলও এক গ্রাশ রয়েছে তার পাশে। চিত্রা এসে খেতে বসল। টেমিটা থেকে একরাশ ধোঁয়া উড়ছে। তার অনুচ্ছল আলোর রান্নাঘরটা খানিক স্পষ্ট, খানিক অস্পষ্ট। মায়ের মুখের একটা পাশে পড়েছে আলোটা। ঘামঘাম মুখখানা কেমন তেলতেলে দেখাচ্ছে।

বীকবে খেয়ে চলেছিল চিত্রা। মা ডাকলেন,—চিৎ !

চিত্রা মুখ তুলল।

—এই করে কি শরীর টিকবে ?

—কেন ?

—দেখছিস্ না নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে ?

—ও ! মনে মনে হাসল চিত্রা। শরীরের আর কী দোষ।

—একটু ছুখের ব্যবস্থা করি, কেমন ?

—কি করে চালাবে ?

—সে আমি চালিয়ে নেব।

মিতুর কথা ভাবল চিত্রা, মায়ের কথা আর বিশুর কথাও। বলল,—না, থাক।

—না কেন ? তোর শরীরটাতো টেকাতে হবে।

—এমনিই টিকবে।

একটু রাগই করলেন মা। বললেন,—কর তোদের যা খুশি।

বিশু এসে বসল একটা আসন টেনে নিয়ে। হাত বোড়িয়ে কুঁজো থেকে এক গ্রাশ জল গড়িয়ে নিল। মা ভাত দিলে এক গ্রাস মুখে দিয়ে বলল,—একটা খবর আছে, দিদি।

—কী খবর ?

—বল না তুই। টেমির আলোটা চলকে উঠছে বিশুর মুখে। একটু কৌতুকের হাসি চোখহুটিতে আর নাকের পাশের ছুটি ঝাঁজে।

ভাত থেকে হাত তুলে অবাক চোখে তাকালো চিত্রা। বলল,—কী খবর বল না।

—একটা চাকরি ঠিক করে কেললাম। বিশু বলল। আর বলেই আবার ভাতের দিকে মনোনিবেশ করল।

যেমন অবাক ছিল চিত্রা, কথাটা শুনেও তেমনি রইল। তেমনি একটু হা-করা মুখ,

তেমনি মাঝপথে শূণ্যে তুলে রাখা হাত। মায়েরও কোনো ভাবের পরিবর্তন নেই। সব নিশ্চল। শুধু বিত্ত খেয়ে চলেছে একমনে।

মুহূর্তকয়েক এমনি রইল। তার মধ্যে একটু একটু করে আশ্রয় হল চিত্রা। তখন রাগ হল তার। বলল,—কে তোকে চাকরি ঠিক করতে বলল ?

—কেউ নয়।

—তবে ?

—করলাম। দরকার তো !

চিত্রার রাগ আরো বেড়ে গেল। বলল,—দরকারের কথা কে তোকে ভাবতে বলেছে ? আসল কথা, পড়াশোনায় মন বসছে না। মাতব্বরী করার ইচ্ছে।

জেনেজেনেও মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল চিত্রা। বলে ফেলল রাগের মাথায়। পড়াশোনায় বিত্তর উৎসাহের অভাব হয়নি একটুও। বাবা মারা যাওয়ার পর এই চারবছর ট্রাইশন করে পড়া চালাচ্ছে সে।

বিত্ত আহত হল। কথাটা তার মর্মে গিয়ে বিঁধেছে। ভাত মুখে তুলতে গিয়ে থমকে গেল সে, ডাকল,—দিদি !

আর কথা যোগাল না চিত্রার মুখে। ভাতের শেষ গ্রাসটা মুখে পুরে দিয়ে সে উঠে গেল। মা একটি কথাও বললেন না। একটা বোবা বেদনায় তাকিয়ে রইলেন ক্যালক্যাল করে।

মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে এল চিত্রা। কোনো রকমে বিছানাটা টেনে ফেলে শুয়ে পড়ল। সমস্ত মনটা উথালপাথাল করছে। একটা চড়া পর্দায় বাঁধা হয়ে আছে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র। আর একটু টান পড়লেই যেন ছিঁড়ে যাবে সব পটপট করে। এই সময়টাতে কেন চাকরি নিতে গেল বিত্ত ? আর কটা মাস পরেই তো ওর বি, কম পরীক্ষা। পাস করার পরে তো চিত্রা নিজেই বলত তাকে। এই কদিন কি আর চিত্রা চালিয়ে নিতে পারত না ? রাগ হচ্ছে চিত্রার, আর অভিমানে কারা পাচ্ছে।

ঠিক এইসময়ে দরজার বাইরে বিত্ত ডাকল,—দিদি !

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল চিত্রা। বলল,—আয়।

তক্তপোষের উপরে চিত্রার কাছ বৈষে বসল বিত্ত। বলল,—রাগ করেছিস্ ?

চিত্রার মন আবার মুচড়ে উঠল। মুখটা দেয়ালের দিকে একটু ঘুরিয়ে নিল সে। একটু থেমে বিত্ত বলল,—আমি জানি, তুই রাগ করেছিস্।

আবার একটু হাসল বিত্ত। এর মধ্যে চিত্রা নিজেকে সামলে নিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে সে বলল,—এখন কেন চাকরি নিতে গেলি তুই ?

জবাব দিতে একটু দেরী করল বিত্ত। আর তারই ফাঁকে চিত্রা আবার প্রশ্ন করল,—তোর পড়া কী হবে ?

—চলবে তেমনি।

—পরীক্ষার ফল ?

—ভালই হবে ।

—চাকরি করে পারবি ভাল ফল করতে ?

—পারব । পরীক্ষার পড়া আমার হয়ে গেছে । এখন শুধু উন্টেপান্টে দেখা ।

—কিন্তু কেন ? কটা মাস কি আর চালিয়ে নিতে পারতাম না আমি ?

—পারতিস্ । তবু নিয়েছি । ভাল চাকরি চাইলেই পাওয়া যায় না । তা ছাড়া
অল্প কারণও আছে ।

—থাকগে অল্প কারণ । এর পরে তো আর পড়তে বলতাম না তোকে । শেষ
পরীক্ষার ফলটা ভাল হওয়া দরকার ।

এ-কথার জবাব থাকে না । বিত্ত চূপ করে রইল । দৃষ্টিটা সরিয়ে দিদির শিররের
জানালা দিয়ে বাইরে প্রসারিত করে দিল সে । দৃষ্টি গিয়ে আটকে রইল পাশের বাড়ির
দেয়ালে ।

—বিত্ত !

—কী ?

—হঠাৎ কী করে পেলি চাকরিটা ?

—হঠাৎ পাইনি । চেষ্টা করছিলাম অনেকদিন থেকে ।

—কই, আমার তো বলিসুনি কিছু ?

—বললে পরে তুই কি আমার চাকরি খুঁজতে দিতিস্ ?

হারিকেনের স্বল্পআলোয় ঘরের এ-পাশটা আলোকিত, ও-পাশটা প্রায় অন্ধকার ।
সেদিকে তাকিয়ে শেষে চোখ বুজল চিত্রা ।

—দিদি ! বিত্তর কণ্ঠে বনিষ্ঠ কোমলতা ।

—কী ? চিত্রা চোখ মেলল ।

—একটা কথা বলব ?

—বল ।

বলতে গিয়ে ধমকে রইল বিত্ত । শেষে বলল,—আমি এখন বড় হয়েছি ।

অবাক হল চিত্রা । বলল,—তা হয়েছিস্, কিন্তু কেন ?

আবার একটু উস্খুস্ করল বিত্ত ।

—বল না, কী কথা ?

—না, বলছিলাম কি, মানে, রমেনদার সঙ্গে এবারে মিটিয়ে ক্যাল ব্যাপারটা ।

—কী ব্যাপার মেটাযো ? বড় বড় চোখে তাকাল চিত্রা ।

—তোদের বিয়েটা । :

চোখ নামিয়ে নিল বিত্ত । চিত্রাও চোখ সরিয়ে আনল । ঘরের অন্ধকার কোণে
তাকাল আবার ।

—আমার তো চাকরি হল এবারে । এখন আমিই পারব ।

কথা বলল না চিত্রা । বিস্মৃত না । শুধু পা দিয়ে মেকের ঘষতে লাগল ।

গভীরতায় বন হয়ে উঠছে রাত্রি । নিরবির করে একটু ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকছে শিয়রের জানালাটা দিয়ে । হ্যারিকেনের আসোটা কাঁপছে একটু একটু ।

—অনেক রাত হল । আমি শুইগে যাই ।

বিস্মৃত চলে গেল । আর কথার পর কথা, ভাবনার পর ভাবনা হেঁটে বেড়াতে লাগল চিত্রার মাথার মধ্যে । শেষে একসময়ে কখন ঘুমিয়ে পড়ল সে ।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বেরোতেই বিস্মৃত সঙ্গে দেখা । ওর দিকে তাকাতে পারল না চিত্রা । একটা আশ্চর্য সংকেত এসে নামিয়ে রাখল ওর চোখ দুটি । মনে হল, বড়ই হয়েছে বিস্মৃত । অনেক বড় । শুধু বয়সে নয়, মনেও । আর চিত্রার নিজেকে মনে হতে লাগল অনেক ছোট, অনেক ছোট ছোটভাই বিস্মৃত কাছে ।

‘চা’-শিল্পে অগ্রণী

ফোন :—২২।২.৪২-৪৩ (অফিস)

আসিপুর ৪.৩৩ (ফ্যাক্টরী)

এরিয়ান প্র্যাণ্টাস এজেন্সী

(স্থাপিত ১৯২৫ সাল)

উঃ ভারতের বাছাই চায়ের রপ্তানিকারক •

ভারত ও পাকিস্তানে অবস্থিত কয়েকটি চা-বাগিচার পরিচালক •

চা উৎপাদক, নীলামে ক্রেতা-বিক্রেতা, আশ্বাদনকারী, মিশ্রণকারী,
এবং দেশবিদেশের ব্যাপারী

সভ্য : দি টি এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ; দি ক্যালকাটা টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন ;
ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন ; ইন্ডিয়ান টি প্র্যাণ্টাস এসোসিয়েশন ;
ত্রিপুরা টি এসোসিয়েশন ; পাকিস্তান টি এসোসিয়েশন ; প্রভৃতি

কলিকাতায় আমাদের আড়তে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ প্রকারের
চা মজুত থাকে (খুচরা চা বিক্রয় হয় না)

কোড :
একমি, বেন্টলি ও
প্রাইভেট

৯, এজরা ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১

কেবল :
‘এরিওপ্র্যাণ্টস্’

প্রাচীন বাংলা কাব্যের আংগিক

গুরুদাস ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের পথচলার শুরু চর্যাপদকে দিয়ে। কিন্তু তার সনেচীর গীতিময়তা পরবর্তীকালের কাব্যে আবছা হয়ে এসেছে; আখ্যায়িকার আকার-শাভের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। চর্যাপদ ছিল সর্বভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যকৃতির সংগে যুক্ত। কিন্তু মংগলকাব্যাদি বাংলার নিজস্ব সাহিত্য। তাই এর আংগিকও হল স্বতন্ত্র।

১৩শ-১৪শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত। ভারতে এর কাছাকাছি সময়ে। বাংলাদেশেও হুসেনশাহী আমলে। গুপ্ত যুগ থেকে আর্য-আর্যেতর সংস্কৃতির মধ্যে যে স্নায়ুবুদ্ধি চলে আসছিল বংগভূমির বুকে, সংঘাত-মাধ্যমে তা একটা নতুন রূপ নিল এই সময়েই। পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন ও কোমচেতনা পরম্পরের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করল, তার মিশ্রমিশ্রে দেখা দিল জীবনে ও মননে নতুন রূপ নবীন ভাবনা। উচ্চবিশ্ব ও লোকায়ত সংস্কৃতির দ্বন্দ্বজনিত নৈকট্য যে ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি করল, তাকে ধারণ করার ক্ষমতা চর্যাপদ-অনুসৃত আংগিকে আর চললো না। নতুন ধ্যানধারণাই সংগে ক'রে নিয়ে এসে নতুন প্রকাশভংগিকে। এবং সেই নব্য প্রকাশরীতিই নবজাগ্রত কবিমানস ও সাহিত্যকে নিয়ে চলল এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীতে। পূর্বগামী ধর্ম ধর্ম গীতিকবিতা সুসমঞ্জস আখ্যায়িকার রূপ নিল ১৪শ শতকের ত্রিভুজকীর্তনে। পূর্বরূপ নয়, পদক্ষেপ। সমকালীন লোক-গীতিগুলি এই প্রসংগে স্বরবীর। আদিম উপপুরাণ ও ত্রৈলোক্য কথ্য-অংশও তার অনুসংগী ও সহায়িকা।

অতঃপর বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই নতুন আংগিকটি বিবর্তিত হতে থাকল এবং পূর্বরূপ নিল ছয়টি অংগের সমাহারে। বন্দনা, দিগ্‌বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তি বা আত্মপরিচয়, সৃষ্টিপালা, পৌরাণিক ধর্ম, মানবধর্ম। বন্দনাংশে ইষ্ট এবং অন্ত্যস্ত জনপ্রিয় দেবদেবীর বন্দনা তথা রূপগুণের অনুধ্যান করা হত। দিগ্‌বন্দনার থাকত বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা ও উদ্দেশ্য প্রণাম। আত্মপরিচয় অংশে গ্রন্থরচনার কারণ ও সেইসূত্রে কবির আত্মপ্রকাশ বিবৃতি। সৃষ্টিপালার—আদিদেব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাণী থেকে দেবমণ্ডলী পৃথিবী জীব ও মানবসৃষ্টি। স্বর্গধণ্ডে স্বর্গে দেবদেবীর জন্ম, বিবাহ, লীলা প্রভৃতির দৈবকাহিনী। মানব বা মর্ত্যধণ্ডে—পৃথিবীতে ইষ্ট দেবদেবীর পূজাপ্রচার ও সেইসূত্রে মানবিক জীবনী ও চরিত্রের বস্ত-অনুগামী চিত্রপরিবেশ। এই ছয়টি অংগ মিলে বাংলা কাব্যের পূর্ণ আংগিক। বলা বাহুল্য, হঠাৎ অথবা কোনএকজনের চেষ্টাতেই এই আধার গড়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে বহুজনের চেষ্টাতেই তবে এর সম্পূর্ণতা সম্ভবপর হতে পেরেছে। সাহিত্যসৃষ্টির

ক্ষেত্রেও বিবর্তনবাদ প্রযোজ্য। সেইনিয়ম অনুযায়ী প্রথমদিকের রচনারীতি স্বভাবতই শিথিল বিক্ষিপ্ত ও রুক্ষ। কিন্তু যতোই অগ্রগতি, ততোই সুন্দরতা সৌম্য সংহতি; অবশেষে একটি সমঞ্জস্য পরিণতি। আর, একবার যখন সেইমাধার তথা আংগিক গড়ে উঠলো, তখন সেই পথই হলো রাজপথ। পরবর্তীকালের সাহিত্যরথ গড়িয়ে চলল সেই পথ ধরে বিনাধিঘায় বিনাপ্রশ্নে। ফলে, ভংগি ও রীতি আরো উন্নত ও সংযত হল, সাহিত্যও দৃঢ়তা পেল। আবার সেইসঙ্গেই বাঁধাপথ সাহিত্যের বিচরণভূমিকে ক্রমে ক্রমে সংকুচিতও করে আনল, যতক্ষণ না নতুন ভাব আবির্ভূত হলো নতুন আংগিককে সংগে নিয়ে।

মংগলকাব্যগুলির আংগিক এবং ভংগি-বিধ্বত কাহিনীগুলি অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। সে-আলোচনা করব না। কিন্তু সন্তোক্ত অংগগুলির প্রথম পর্যায়ের কিছু দৃষ্টান্ত দেবো, যেগুলি সন্ত আবির্ভাবের অপটুত্বের পরিচয় বহন করছে, যেগুলি এই পদ্ধতির পূর্বগা, যেগুলি ছড়িয়ে আছে শূন্যপুরাণের প্রাচীন অংশে, গাজনগন্তীরার গানে, ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোকগীতির মধ্যে।

প্রথমে বন্দনাংশ। শূন্যপুরাণের সূচনাতেই যে বন্দনা থাকার কথা, তা আছে পরে ‘স্থাপনডাকে’ ‘কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন।...ঋ’টি করি আইস ধর্ম দেবের দেবরাজ’। এর নমস্ক্রিয়াকেও বন্দনারূপে ধরা যায়—‘নকারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো বস্তা। নকারে নমো বিষ্ণু। অকারে নমো মহাদেব। সঅ নামে সিবসক্তি’। ধ্যান ও নিরঞ্জনষ্টকও এই জাতীয় রচনা। গন্তীরায় :

জল বন্দ স্থল বন্দ বুড়া শিবের গন্তীরা বন্দ।

আর বন্দ সরস্বতীর গান।

বান্ধুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।

আদিমদের উৎসবেও এভাবে আবাহন জানানো হয়েছে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে। ঔরাওরা নাচের সংগে সংগে গান ধরে—

মহাদেও বাবাসি আরোজি চেলা—

ধ্যানিম্ আজো চেলা, প্যানিম্ নামা।

হে ধরতি পিরথী বাবা হোয়

লামে লামে চিখন্ লগ্‌দম্ বাবা ওলবাণ লগ্‌দম্।

—মহাদেব বাবার চেলা আমরা। ধ্যানে আনো তাঁকে মননে আনো। হে ধরিত্রী পৃথিবী বাবা, আমরা বিলাপ ও ক্রন্দন করতে করতে তোমাকে নাম ধরে আবাহন করছি।

এই গানের মহাদেব ও ধর্মতত্ত্বটুকু অবশ্য আর্থগত, কিন্তু বন্দনার পদ্ধতিটি কোম মানসের নিজস্ব।

দিগ্‌বন্দনা। বাংলাকাব্যে প্রথম দিগ্‌বন্দনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। কৃষ্ণের হাত থেকে রেহাই পেতে রাধা বলে—‘কে না পূজিল বদ্রি বটেবরে’। ধর্মপূজাবিধানে

‘বারানসীপুর’কে স্মৃতি জানানো হয়েছে। মালদহের গন্তীরায় : দক্ষিণে জগন্নাথ, উত্তরে ভাগু, পূর্বে কামরূপ কামিখ্যা ইত্যাদির বন্দনা। আদিম কোমন্দের মধ্যে তীর্থস্থান ব’লে কিছু থাকেনা। দেব-দেবীর ‘ধ্যান’ থাকে মাত্র। কিন্তু তার কোন মাহাত্ম্যবিস্তৃতি সাধারণত চোখে পড়েনা। তবে বৌদ্ধ প্রভাবিত শূন্তপুরাণে ‘স্মারপালবন্দনা’ পাওয়া যায়; তীর্থবন্দনা তারই ক্রমপ্রসারিত রূপ। বরং, বলা যেতে পারে, এই দিগ্‌বন্দনা পুরাণ থেকে বাংলা সাহিত্যে গ্রহীত হয়েছে। তাই প্রথমদিকের রচনায় পৌরাণিক ও বহির্বাংলার তীর্থগুলির নামতালিকা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কৃতির স্পর্শে বাংলাতেও ‘তীর্থ’ গড়ে উঠতে থাকে। লৌকিক দেবদেবীরা ধারা নিজ নিজ ধানে পূজিত হতেন, তাঁরা ক্রমে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন, ‘ধান’ হলো তীর্থ। তারকেশ্বর-বৈষ্ণনাথ-চন্দ্রনাথ এই বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এঁদের প্রতিষ্ঠাকাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থ বিদ্যমান; তা থেকে এগুলির তীর্থে পরিণতির সুন্দর ইতিহাস মেলে। এবং বাংলাদেশে যখনই নিজস্ব তীর্থ গড়ে উঠতে লাগল, বাঙালী কবিরা তখনই বদরিনাথ-কাশীনাথকে ছেড়ে এঁদেরই বন্দনা করতে শুরু ক’রে দিলেন। বরিশালের গীতে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ক্ষীর নদীসাগরের বন্দনা; রাঢ়ের গন্তীরাগানে পুরাণকীতিত তীর্থগুলির সাথে আশ্রের তুলসী, আশ্রের বৈষ্ণনাথ প্রভৃতির বন্দনাও যুক্ত হতে লাগল। ক্রমে, পুরাণভাব গেলো সরে, বাংলার মন্দিরালাই হয়ে উঠলো একমাত্র বন্দনীয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবিকংকণ চণ্ডী এই বাঙালিরানার সুন্দরতম উদাহরণ।

সৃষ্টিপালা। প্রাচীন বাংলা কাব্যে এই একটিমাত্র অংগ, যা প্রথম থেকে পূর্ণরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিবর্তন যা হয়েছে, সে কেবল তত্ত্বের, মূল কাঠামো অর্থাৎ প্রকাশরীতিটি শুরুতেই সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। শূন্তপুরাণে ও বৌদ্ধ প্রভাবিত সাহিত্যে তাই সহস্র শিথিলতা সত্ত্বেও সৃষ্টিকাহিনীটি সামঞ্জস্যময়। আদিতে সবই ধুন্ধুকার ছিল। তারপর জাগলেন নিরঞ্জন; বাহন উলুকের সাহায্যে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী; হংসকূর্ম প্রভৃতিও সহায়তা করল। আদিদেবের থেকে আত্মশক্তি; এঁদের দুজন থেকে তিনদেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব; ক্রমে ক্রমে অত্যাশ্র জীব ও মানবগোষ্ঠী। মালদহের গন্তীরায় আদিম কোমন্দের প্রভাব বিস্তার করেছে—কাঁকড়ার আনীত মাটিতে বসুমতীর জন্ম ও কূর্মপৃষ্ঠে অথবা পদ্মের ওপরে স্থিতি। তারপর মাটি, জীব ইত্যাদির আবির্ভাব। পূর্ণায়ত মংগলকাব্যে পুরাণের আশ্রয়ে সৃষ্টিপালা বিবৃত। আদিদেব নিরঞ্জন ব্রহ্ম থেকে শক্তি, তা থেকে মহত্ত্ব অহংকারাদি, দেবতামণ্ডলী, সবশেষে মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব। তত্ত্বের প্রভাবে, আদিতে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি প্রকৃতি বা আত্মদেবী ব’লে কীতিতা হয়েছেন। কোন কোন কাব্যে আবার এইসব বিভিন্ন ধারণার সংমিশ্রণও ঘটেছে। এমনকি, পরবর্তী কালের ইসলামিক সৃষ্টিতত্ত্বও এর অংগীভূত হয়ে গেছে। আলাওলের পদ্মাবতী তার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

শত ব্যবধান সত্ত্বেও বিভিন্ন সৃষ্টিপালাগুলি প্রায় একই ধরনের। তবে, একদল মনে করে, মাটি (প্রভৃতি বস্তু) থেকে জীবের আবির্ভাব; আর একদল

ননে করে, এক দৈব সৃষ্টির স্রষ্টা। বিভিন্ন দেশের পুরাণ উপপুরাণ থেকে এ-ধরনের অজস্র কাহিনী উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এবং এগুলি প্রায় সমানধর্মী। তাই চড়কের মহাদেবকে ত্রীটিয় রীতিতে 'বাবা আদোম্' ব'লে সম্বোধন করতে গাজুনেসন্নাসীদের আদৌ বাধেনা। সব সৃষ্টিকথার আদিতেই নিশ্চিন্ন অন্ধকার, এক নিরঞ্জন আদিদেব সবারই স্রষ্টা। যারা মাটি থেকে সৃষ্টি চলে মনে করে, তাদের তত্ত্বকথার সংগে স্রষ্টা-বাদীদের সংযোগ হওয়াও তেমন কিছু অসম্ভব হয়নি। বাংলা কাব্যে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র মানিকদত্ত সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতির রচনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর ঠিক এইজন্যেই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে যখন অন্য কোন অংগের পুষ্টি হয়নি, তখনও সৃষ্টিপালাটিই ছিল ঐক্যসূত্রে বিধৃত সুসমঞ্জস ও সুশৃংখল। একদিকে আর্থ ভাবনাজগতের সৃষ্টিপালা কৌশিতকী ও শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু ক'রে প্রায় তাবৎ পুরাণে ছড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে কোম উপপুরাণের আদিতেই সৃষ্টিকাহিনী স্থান পেয়ে আসছিল; মধ্যে বৌদ্ধ-শাক্ত তন্ত্রের সৃষ্টিপন্থনকথা বাংলার মানস ও মননকে আলোড়িত করছিল। এসবেরই প্রভাব পড়েছিল সেদিনকার বাংলা কাব্যে। প্রথম দিকে কোম প্রভাব, মাঝে পুরাণ, শেষে তন্ত্রের প্রাধান্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্রতকথার সৃষ্টিপালার স্থান আদৌ নেই। যেটুকু আছে, তাও পরবর্তী কালের প্রভাব।

আত্মপরিচয় অংশটির ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা। বাংলা কাব্যের প্রথম স্তরে এই আংগিকটির আদৌ কোন প্রাধান্য ছিল না। যেমন পুরাণে নেই। গঙ্গীর গানেও নেই। নাম বা ভণিতা অবশ্য চর্যাপদের কাল থেকেই মেলে। কিন্তু শূন্যপরাণে এবং ধর্মমংগলে রামাই প্রভৃতি ধর্মপণ্ডিতের জীবনকথাই বোধহয় বাংলা কাব্যের প্রথম কবি-পরিচিতি বা 'গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ'। তারপর ক্রমে ক্রমে এই আংগিকটি পুষ্টতর হতে থাকে এবং মংগলকাব্যের একটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে ওঠে।

স্বর্গধনু বা পৌরাণিক ধর্মের ছবিও এই সমস্ত সাহিত্যে বিদ্যমান এবং মর্ত্যধর্মের চেয়ে তার প্রাধান্যই বেশি। শূন্যপুরাণে আদিদেব যোগসাধনায় রত হবার আগে গংগাকে 'নিরিসন্' (নিদর্শন) দিয়ে গেলেন পুত্র তিনজনকে দেবার জন্তে। ওদিক তিন দেবতা ধর্মের উপাসনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে পৃথিবী ও জীব সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হলেন। নাথসাহিত্যের প্রাচীন গাথাতে শিব জলটুংগীতে ব'লে পার্বতীকে বোগভঙ্গ ব্যাখ্যা করে শোনান; আদিসিদ্ধা চারজন মাছ হয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে তা শুনে নেয়। তাদের অলৌকিক সিদ্ধির পরীক্ষা নিতে পার্বতী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাত্র গোরক্ষনাথ ভিন্ন আর তিনজন সে-ছলনায় ধরা পড়ে ও নির্বাসিত হয়। এর পরও পার্বতী গোর্ষকে আবার পরীক্ষা করতে যান এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছে পরাজিত হন। এ-দুটি কাহিনীই সম্প্রদায় দুটির নিজ নিজ ধর্মতন্ত্রের আওতায় রচিত। এবং সে তত্ত্ব একদিকে যেমন বৌদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি কোম। ব্রতকথার স্বর্গের আভাস থাকলেও লীলা নেই। গাজনের গানেও নিজস্ব কোন দৈবকথা বিবৃত হয়নি। সমুদ্রমন্ডন, পারিজাত হরণ, বাণরাজ্যের কাহিনী প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যানিকাকে বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-ওখানে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র।

পরবর্তীকালের মংগলকাব্যের স্বর্গধণ্ড পুরাণ-প্রভাবিত, কোমল স্বর্গীয় কথা সেখানে সম্পূর্ণই অগ্রাহ হয়েছে। গম্ভীরগীতিতে তারই আভাস।

প্রাথমিক কাব্যপর্ষায়ে মানবধণ্ডের স্থান তেমন নেই; তবে যেটুকু আছে, তা বস্ত-অনুগামী। চড়কের গানে দেবতা মর্ত্যে নামেন, কপিল গাভীও। শূন্তপুরাণে শিব বম্বুকার ভীরে তপস্তা করেন, আর চাষ করেন ভীমের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। শিবের এই চাষ-পালা অংশটি একান্তভাবেই মর্ত্যকাহিনী এবং বাংলার হতদরিদ্র চাষীগৃহস্থের একটি সজীব ও সত্য চিত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পনেরো আনা অংশই তো মানবিক কাহিনী ও রসে ভরপুর। মংগলকাব্যগুলিতে চাষপালা পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে শিবদুর্গার গাইহালী ছবি দিয়ে। দরিদ্র ভিখারী শিবের তরুণী ভাষা ও বহুবচনাক্রিত পরিবারে নাজেহালের কাহিনী নতুন ক'রে বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখেনা।

এ ছাড়াও মংগলকাব্যে আছে চাঁদ সদাগর কালকেতু ধনপতি শ্রীমন্ত বিজ্ঞানন্দর লাউসেন প্রভৃতির কাহিনী—যারা মাটির মানুষ, স্বর্গীয় দেবতা নয়; যদিও দৈবশক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হতে হয়েছে তাদের। এ প্রাথমিক কাব্যসরগিতে এ-ধরনের কোনো কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলেনা; যেটুকু আছে তাও পুরাণ প্রভাবিত। অবশ্য সজোক্ত কাহিনীর মধ্যেও পুরাণ প্রভাব আছে, বংশ মনস্তরাদির বর্ণনা যার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। তবে, দেবীর পূজা প্রচারের ও মহিমা প্রসারের জন্তেও বহু কথার সৃষ্টি হয়েছে, বহু লৌকিককাহিনীকে গ্রহণ করতে হয়েছে। শেষত, দেশপ্রচলিত বহু রূপকথা উপকথার প্রভাবও এর পশ্চাতে বর্তমান। সাঁওতাল গুঁরাওদের উপপুরাণ, উত্তর ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন লৌকিক আখ্যায়িকাগুলিই শেষ দুইটি কারণের প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু অতোদূরে যাবার দরকার কি? আমাদের ঘরের মধ্যেই রয়েছে 'মেয়েদের ব্রতকথা' যার আদিমধ্যমন্ত মর্ত্যধণ্ডের কাহিনীতে মানবরসে পূর্ণপাত্র হয়ে টলটল করছে। আর এইসব ব্রতকথার ঝাঁপি থেকে গল্প সংগ্রহ করেই গড়ে যে উঠেছে মংগলকাব্যের কথাশরীর, রবীন্দ্রনাথের সত্যানুন্দর আলোচনার পর সে-তথ্য নতুন ক'রে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

এই হল প্রাচীন বাংলা কাব্যের আংগিকের ষড়ংগ। প্রাচীন বাংলা কাব্যের এই আংগিক সম্বন্ধে প্রচলিত মত, ওটি পুরাণ লক্ষণাক্রান্ত। সিদ্ধান্তটি আধাসত্য, সম্পূর্ণ নয়।

পুরাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনস্তরানি চ।

বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ (বরাহ, ২য় অঃ)

—সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মনস্তর ও চরিতাখ্যান, পুরাণের এই পঞ্চলক্ষণ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাংলা কাব্যের লক্ষণ ছয়টি। এবং আত্মপরিচয়কে বাদ দিলে বাকী পঞ্চাংগও পুরাণকে স্বাধাধ অনুসরণ করা হয়নি। বন্দনা—দিগ্‌বন্দনা—স্বর্গধণ্ড ও মানবধণ্ড পুরাণেও আছে। কিন্তু মংগলকাব্যে যেভাবে সেগুলিকে সাজানো হয়েছে, তা তার নিজস্ব। কোনটির পর কোনটি থাকবে এবং কি থাকবে এবং কিভাবে থাকবে—সে

পরিকল্পনা বাঙালী কবির স্ব-কৃত। পুরাণ তাকে পথ দেখিয়েছে, বাকীটুকু তার নিজেরই সৃষ্টি। তাছাড়া, পুরাণকথা নিজেই বিশৃংখলার পরিপূর্ণ, তার অংগ-সজ্জা বিপর্যস্ত, লক্ষণগুলি অবিকৃত। সে-হিসেবে বাংলা কাব্যের আংগিক নিখুঁত ও সুবিন্যস্ত। অপিচ, পুরাণে বংশ ও চরিতাখ্যান যেভাবে বিবৃত হয়েছে, মংগলকাব্যের মানবধর্মের অন্তর্গত কথাগুলি মোটেই তার সমগোত্রীয় নয়। একটি ইতিহাসমালা, অপরটি সাহিত্যপন্থ—যদিও সে রচনা দেব-দেবীর মহাস্বাক্ষরপথে পঞ্চমুখরিত। এদিক থেকে সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাবও কম কার্যকরী হয়নি। তার ওপর, বাংলা কাব্যের ষড়ংগ আংগিকের উপাদান ছিল তার ঘরের মধ্যেই। কোম উপপুরাণে-উক্ত লক্ষণগুলি অস্পষ্টভাবে হলেও অবশ্যই সুলভ।

আদিতে দেবতার রূপগুণ বর্ণনা ও আবাহন ক'রে কথারস্ত। কথার শুরুতে সৃষ্টিপত্তন। তারও পরে, বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে সংঘর্ষ ও একের পরাজয়ে অপরের বিজয়। লুশাই-কুকীদের মধ্যে স্বর্গ-নরকের একটি সুন্দর ছবিও দেওয়া আছে; পিয়াল, রাল, সেখানকার বৈতরণী নদী। মানবধর্মও কোম কথামালার বিদ্যমান। দেবতারা মর্ত্যে নামেন; লীলা করেন; ধাতাদি শস্ত্র ও মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টি করেন; আদি নরনারী ভাইবোন। এমনকি, ছুঁটের দমন শিষ্টের পালনের বাবস্থাও এসব কাহিনীতে বিদ্যমান। তারপর দিক্ বন্দনা ক'রে নৃত্যগীতারস্ত। গুঁরাও সাঁওতাল কোচ বোদো মুণ্ডা গোণ্ড এবং বাউড়ী বাগ্দী কেওট চামার প্রভৃতিদের মধ্যে এ-ধরনের কাব্যকথা কোন-না-কোন আকারে আজও বিদ্যমান।

সুতরাং, মংগলকাব্যের আংগিক রচনার বাঙালী কবিদের বাইরের শাস্ত্রের কাছে দেউলে হয়ে হাত পাততে হয়নি। তবে প্রভাব যে পড়েছে তা অনস্বীকার্য। একদিকে যেমন বৌদ্ধ সৃষ্টিভাবনা ও জৈন মূর্তিকল্পনা এবং এছাড়া ধর্মমতের দেবদেবীর স্বর্গমর্ত্যলীলার ছায়া পড়েছে বাংলা কাব্যে, তেমনি পঞ্চ লক্ষণাঙ্কিত পুরাণের স্পর্শও লাভ করেছে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ করেনি। তাকে নিজের মতো ক'রে নিল মংগলকবি। শুধু আংগিক নয়, প্রত্যেক বিভাগে কি কি বর্ণনীয় তারও হৃদিশ পেল পুরাণ থেকে। তার সংগে মিলিয়ে দিল দেশজ অংগসজ্জাকে। রূপ পেল বাংলার আত্মনেপদী প্রকাশরীতি। পুরাণ তত্ত্ব বৌদ্ধ জৈন আর লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে যে আংগিককে বাঙালী কবি গড়ে তুলল ঘরবাহিরের অপূর্ব মিশ্রণে, তা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব পদ্ধতি, নির্ভেজাল গোড়ী রীতি।

এর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, মংগলকাব্যের আংগিকের যেসব উৎসের কথা ওপরে বলা হল, তার কোথাও কবিপরিচিতির নামগন্ধ নেই। নাম বা ভণিতা আকারে যেটুকু পাওয়া গেছে, তা কবির আত্মপরিচয়ের দিগ্নির্দেশক নয়। ফলে, তাঁদের অনুসন্ধানে অন্তর্য যেতে হয়, অথবা 'চণ্ডীদাস সমস্তার' মতো জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে হয়। গ্রন্থোৎপত্তি বা কবির আত্মপরিচয়ের সূচনা ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর পূর্বকার নয়। কুস্তিবাগ মুকুন্দরাম থেকেই তার সাহিত্যিক রূপের প্রকাশ ও গতি; ভারতচন্দ্রে একটি সম-এ পরিণতি। এর কারণও আছে।

মধ্যযুগীয় সমাজবন্ধনে ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত থাকে। ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্তিচেতনা বন্ধকী থাকে। পারিপার্শ্বিকের কাছে প্রাণহীন আত্মসমর্পণই তখন একমাত্র সত্য; ব্যক্তিগত সংশয় চিন্তা যুক্তি বা কল্পনার ক্ষুধিত কোন অবকাশ থাকে না সে পরিবেশে। আর, ব্যক্তির জাগরণ ভিন্ন আত্মপরিচয়দানের আকাংখাও জাগতে পারে না। এর ফলে যে মুক্তি দরকার, ঘরে ও বাইরে, তার কোনো সুযোগই সেদিন ছিল না। কিন্তু যতোই দিন যেতে লাগল, সামন্ততান্ত্রিক শাসনশোষণ দূরতর হতে লাগল, নিপীড়িত ব্যক্তিসত্তা ততোই মুক্তির পথ খুঁজতে লাগল, অচলায়তনের পঞ্চকের মতো। একদিকে যেমন সংস্কৃতি সমন্বয়ে জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠল বাঙালীর, তেমনি কল্পনাচিন্তার প্রসারের ফলে ব্যক্তিচিন্তার উদ্বোধনও সম্ভব হয়ে উঠল। আর নির্বৃত্ত সমাজ-শরণ নয়, জীবনজিজ্ঞাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে লাগল কাব্যসাহিত্যের মুক্তিভবন। তাই, এই পর্যায়ের কাব্যধৃত আত্মপরিচিতির শুরু বাস্তব জীবনের দুঃখদৈন্যজর্জরিত পার্থিব ছবি দিয়েই; যেমন কবিকংকণে। অন্যান্য কবিদের মধ্যেও তখন সাড়া পড়ে গেল এবং এইপথ ধরেই প্রকাশ পেতে থাকল ‘গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ’। সংস্কৃত অনুগামী আত্মপরিচয়ও দুর্বল নয়, কিন্তু তা জনপ্রিয় হতে পারেনি বস্তুরহী ও কল্পনানির্ভর ব’লে। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত বস্তুভিত্তিক কবি-পরিচয়ও এক সময়ে ‘রীতি’ হয়ে দাঁড়াল। এবং প্রাণহীন হয়ে উঠল এ-রীতি। কিন্তু মূলত ও প্রথমত, এই নব্যরীতি, যা বাঙালী কবির নিজস্ব, যা একান্তভাবেই বাস্তব জগৎ থেকে আহৃত ও রূপান্তরিত, তা ছিল সত্য; যেমনি কাব্যে তেমনি জীবনেও। ধর্ম-সমাজ ইত্যাদির সর্বপ্রকার আনুগত্য থেকে মুক্তি না পেলে ব্যক্তির জাগরণ কোনোমতেই সম্ভব হয় না। এ সবদেশে সত্য। ব্রিটিশভারতের বাংলা দেশে তাঁরই প্রভাবে ও সমাজের বিবর্তনে তাইই সম্ভব হয়েছিল। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর রোমান্টিক গীতিময়তা, মংগলকাব্যের ক্রমশঃ বিস্তৃত মানবধর্ম (যা দেবকাহিনীকেও স্পর্শ করেছিল তাঁদের ঘরোয়া পরিবেশে সাক্ষিয়ে) এবং বৈষ্ণবী জীবনী ও লৌকিক কাব্যের আত্মপরিচয়। এগুলির উদ্ভব প্রায় একই সময়ে এবং একই কারণে। সনাতনী অচলায়তন থেকে মুক্তি এবং ব্যক্তিনির্ভর কল্পনাসমৃদ্ধির অবকাশ—যদিও ১৯শ-২০শ শতাব্দীর মতো অতো স্পষ্ট নয় অতো ব্যাপক নয়। আর এ-জাগরণ সম্ভব হয়েছিল মতুন সৃষ্ট আংগিকের সহায়তায়ই।

তাই এই আংগিক বাংলা সংস্কৃতিতত্ত্বের ষট্চক্র। সে-চক্র ভেদ না করলে, অর্থাৎ উক্ত রীতিটিকে ভুলভাবে না জানলে প্রাচীন বাংলা কাব্য, ধর্মচেতনা মন ও মানসকে সম্পূর্ণরূপে বোকাও যাবে না। বাস্তব ও কল্পনা, ঘর ও বাহিরের সমন্বয়ে তার যে মনোজগৎ গড়ে উঠেছে, তাকে ধারণ করে আছে এই ষট্চক্রঅংগ। আধারকে বাদ দিয়ে আশেয়ের ধ্যান পার্শ্বটিকে বাদ দিয়ে মহেশ্বরকে বোঝবার চেষ্টার মতো। এই আংগিকের রূপসজ্জার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঙালীর সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্ভব বিকাশ ও এককালীন পরিণতি।

বন্দনা অংশটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এতে দেবদেবীর যে রূপগুণের বর্ণনা আছে, তা আর্ষশাস্ত্রেরই অনুগত। বাংলার আগত আর্ষধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের সাক্ষ্য—তার

সমাজজীবের ওপরতলায় এবং কাব্যশরীরের নিরোদেশে স্বতঃই বিরাজমান। দিগ্‌বন্দনায় বাংলার সৌকসংস্কৃতিরই প্রাধান্য। স্বদেশে জনগণের মধ্যে যে নতুন চেতনা জাগছে, তারই আরক হয়ে গ'ড়ে উঠছে নতুন নতুন তীর্থ আকৃষ্ট জাজপুর ঝাড়গ্রাম বল্লুকা তারকেশ্বর বৈষ্ণনাথ চন্দ্রনাথ প্রভৃতি। কাব্যে তারই ইতিহাস। আর্থধর্মের সংগে সমানে পালা দিয়ে তারই আলো নিয়ে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি দানা বেঁধে উঠছে, সংঘাতে-সমরয়ে নতুনের ইসারা জাগছে, তারই স্বাক্ষর দিগ্‌বন্দনা; ঠিক বন্দনার পরেই আর্থ-অনার্থ ভাবনা, পরপর পাশাপাশি।

তারপরের পর্যায় আর্থ আর্থেতরে সমন্বয়। বাংলাদেশে স্বকীয় ও পরকীয় যতগুলি ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সকলের মিশ্রণের সুন্দর পরিচয় আছে সৃষ্টিপত্তনে। তাই এর স্থান তৃতীয় সিন্থেসিস বা সমন্বয়ের ছোতকরূপে। অল্প অংগগুলি বাংলাকাব্যের সব বিভাগে পাওয়া যায়না (যেমন বৈষ্ণবপদে স্বর্গ ও মর্ত্যধণ্ড অভিন্ন), কিন্তু সৃষ্টিপত্তন সর্বত্র বিদ্যমান। আত্মপরিচয় কথা সব কাব্যে দেখা যায়না, আগেই বলেছি। পরে যখন এসেছে, তখন তারই স্থান তৃতীয়। কেন, কবিমানসের সন্তোজ্ঞ আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট হবে। বাঙালীর আত্মচেতনা-উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সমন্বয় চেষ্টা জেগে উঠেছিল সচেতনভাবে। অবশ্য জনগণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সমাহার, তা অনেকটাই অজ্ঞাতসারে। তাই কথা-শরীরের সংগে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণের সম্পর্ক প্রায় শিথিল। আর এই নবজাগ্রত অনুভূতিটিকেও সেদিনের বাঙালী ভালভাবে ধরতে পারেনি বস্তুজাগতিক কারণেই। তাই কবিপরিচিতি আত্মজীবনী হওয়ার চেয়ে দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের দিকেই ঝোঁক দিয়েছিল বেশি। স্ব-আত্মাকে পরমাস্থার আশ্রয়ী করে তুলেছিল। শেষ দুই বিভাগে মানবিক রসের প্রাধান্য। কিন্তু সেখানেও আর্থ-অনার্থ ভাবনার দ্বৈতলীলা। স্বর্গধণ্ডে পুরাণকথার প্রাধান্য, মর্ত্যধণ্ডে, পৃথিবীকথার। যদিও মানবিকতা বোধের দিক থেকে স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যবধান তেমন আকাশপাতাল ছিলনা; যেমন, এক সূতোর বেশি পার্থক্য ছিলনা সেদিনকার বাংলার আর্থসংস্কৃতি ও লৌকিকসংস্কারের মধ্যে।

ব্যবধানকে স্বীকার করে নিয়েও সমূহিক মিলমিশের এই যে বোধনা প্রাচীন বাংলা কাব্যে রূপলাভ করেছিল, তারও মূলে তার আংগিক। মধ্য যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও কাব্য-গোষ্ঠীর মধ্যে যতোই সাম্প্রদায়িকতা থাকুক না কেন, দেবদেবীদের মধ্যে শক্তিলভের প্রতিযোগিতা যতোই প্রকট হোক না কেন—এই একটি মাত্র আংগিকই ছিল সব কাব্য ধারার সবেধন নীলমণি। আর তারই ফলে তাবৎকাব্য শতযোজন ব্যবধান সত্ত্বেও হয়ে উঠেছিল সমগোত্রীয় সমাস্বাদ্য সমন্বিত। মনসার কাহিনী বলতে উঠে চণ্ডীর বন্দনা ধর্মের প্রতাপ প্রচার করতে গিয়ে শিবের অমুখ্যান, দ্বৈতলীলার বর্ণনার অর্ধেতের ইংজিত, দেবতার নামে মানবকথারসের পরিবেশন শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অসহ বা অবাস্তর মনে হয়নি। এমন কি, ইসলামী ও খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বকেও অনাগ্রাসে এর অংগীভূত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে; একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। নিরাকার আল্লাহ্ এসেছেন নিরঞ্জন

ব্রহ্মের পাশে, সবাহন শিববিষ্ণু বিনাবাধায় প্রবেশ করেছেন বেহেস্তে ইসলামী কাব্যে।
মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র তারই ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী।

কিন্তু সমাজ যেমন স্থাপু নয় গতিশীল, সাহিত্যও তেমনি। সাহিত্যের ভাবান্তর হয়, সেই সংগে আংগিকেরও রূপান্তর ঘটে। বাংলার ষট্‌পদী আংগিকও নিজ কর্তব্য সমাধা করে এক সময়ে গতানু হল। বেঞ্জে উঠল পদাবলীর ঝংকার। মংগলকাব্যের কথারস আর বৈষ্ণব কাব্যের গীতিরস নিয়েই শাক্তপদের সৃষ্টি। সমাজ গতানুগতিক পথ ধরে যেখানে এসে পৌঁছল, সে এক ক্রান্তিকাল। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, নতুনের অদর্শন। জীবন হলো আবিল, সাহিত্য পংকিল। আর বাংলা মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়, পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল ঝর্ণায় ঝর্ণায়। শাক্তপদকে ভেঙে কবিগান, তর্জী, আখড়াই ইত্যাদি দেখা দিতে লাগল। যে লিরিক দিয়ে প্রাচীন বাংলা কাব্যের আরম্ভ সেই লিরিকেই এসে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল সে; মধ্যের কটা দিন কেটে গেল কথা ও কাহিনীতে।

তারপর আধুনিক বাংলা সাহিত্য। নতুন ভাবের জোয়ার, আংগিকেরও পালাবদল। ১৪শ শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি রূপান্তরের সনাতনী চক্র। অভিন্ন আংগিক যেমন প্রাচীন কাব্যে সাম্প্রদায়িকতাকে উগ্র হতে দেয়নি, তেমনি ব্যক্তিচেতনাকেও উদ্বুদ্ধ হতে দেয়নি। তাই তা হয়ে উঠেছিল গতানুগতিক পল্লবগ্রাহী একঘেয়ে। আধুনিকযুগের নবজাগ্রত ব্যক্তিক ও সামাজিক ধ্যানধারণা এই পুরাতনী বেড়া ভেঙে বেরুতে পেরেছিল বলেই আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল; বাইরে থেকে ঘরে আসা বস্তুকে নতুন বাঁধ দিয়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন ভাবনা নতুন আংগিককে সংগে নিয়েই দেখা দিল। তাই-ই স্বাভাবিক। পুরাতন কলাকৌশলে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতে গেলে সেদিন ব্যর্থ হতে হ'ত ১৯শ শতাব্দীর কবিসাহিত্যিকদের; তা সম্ভবও ছিলনা। আধুনিক সংস্কৃতির এইখানেই আধুনিকতা, সবযুগের সবসংস্কৃতির প্রগতিশীলতাও এইখানে।

নীলম্বরতন মুখোপাধ্যায়ের
গল্পগ্রন্থ

★ অপরিচিতার চিঠি ★

॥ দাম দুটাকা ॥

অগ্রণী প্রকাশনী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

দ্রুতগম্য

মুকুল চট্টোপাধ্যায়

অরণ্যের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ আমার আছে। সেই দুর্নিবার আকর্ষণে অবসর পেলেই বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়ি বনেবাদাড়ে। এবারে গন্তব্যস্থল দার্জিলিং জেলার—তিনধরিয়া। সমুদ্রসমতল থেকে প্রায় তিনহাজার ফুট উচ্চে এর অবস্থান। বহুবর ত্রীশ্রামল দেব ও ত্রীরমেন মজুমদার এবারের শিকারযাত্রাকে তাঁদের সাহচর্যে ক'রে তুলেছেন আনন্দমুখর। তাঁদের অপরিমেয় ঋণের স্বীকৃতি দিয়ে কাহিনী শুরু করছি।

তিনধরিয়া ছোট জায়গা; লোকসংখ্যাও নগণ্য। একমাত্র রেলওয়ে কারখানার দৌলতে এর প্রসিদ্ধি। চারিপাশের গহন বনানী এর চৌহদ্দি। দার্জিলিং ও তরাইএর মিলন হয়েছে এখানেই। এ ছাড়া আছে ত্রি-ধারা অর্থাৎ তিনটি পাহাড়ী নদীর ধারা—যা শিবখোলায় (শিবের নদী) মিশেছে অপক্লপ ভাবে!...এ স্থান আমার অতি পরিচিত তবু এবারেও যখন চব্বিশঘণ্টার রেলযাত্রা শেষে ২৪শে মার্চ পৌঁছলাম তিনধরিয়ায়, নতুনদের আশ্বাসে মন ভরে উঠলো আমারও। ম্যানেজারবাবুর ক্রটিহীন ব্যবস্থার ফলে, আহার বিশ্রাম ও দিবানিদ্ৰায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি।

অমাবস্তার বন অন্ধকার বা নৈশ শিকারের প্রশস্ত সময়। অন্ধকার দুর্গম পাহাড়ী পথে অনিশ্চিত শিকার সন্ধান অনভ্যস্ত, লব পথচারী বহুদের পক্ষে দুর্লভ হলেও তাঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে সেইদিনই শিকারে বেরোতে হলো। সঙ্গে কালুসন্ধ্যাসী, কাঁধে একনলা ১২ বোর বন্দুক। এ-বন্দুক বড় শিকারে অনুপযোগী কিন্তু কাকার হরিণের পঞ্চদ্ব ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। রয়েল বেঙ্গলের প্রাক্তর্ভাব এদিকে কম, চিতুয়া (চিতাবাঘ) কিছু পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় বৌদেল (বুনো গুয়ার) তাও বর্ষার আগে নয়; পাহাড়ের গায়ে খেতের মকাই পাকলে প্রচুর বস্তবরাহের এ-পথে নিয়মিত আনাগোনা হয়। ছোট টর্ট জালিয়ে এগিয়ে চলে কালুসন্ধ্যাসী!

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত এর নামের সঙ্গে চরিত্রের সামঞ্জস্য নেই। সন্তানস্বর্গের চেয়ে শিকারধর্ম এর প্রিয়। জাতিতে নেপালী, আমরা মাঝে মাঝে বলি নেপালবাবা। ধুরন্ধর সাহসী, নৈশশিকারে সিদ্ধহস্ত কালু আমার ব্যর্থমুগ্ধার সঙ্গী হয়েছে ইতঃপূর্বে। পাকা শিকারী হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীরা একে খাতির সমীহ করে। শিকারকে কাঁদে ফেলার জন্যে বৈজ্ঞানিক টর্ট চালনার কালুর জুড়ি মেলা ভার!

চড়াই বিসর্পিল পথ বেয়ে শুধু অবরোহণই করে চললাম সকলে। আরোহণ সে ভুলনায় সামান্ত। শিবখোলা বয়ে চলেছে কলতানে মুখরিত ক'রে রাতের নীরবতাকে।

এখন শান্ত রূপ, বর্ষার সগর্জন ভয়াল সুন্দর রূপও এর আমি দেখেছি। নীরবে পথ চলতে চলতে নদীকিনারে চা-বাগিচার টেবল ল্যাণ্ডে এসে পড়ি এক সময়ে।

“হুজুর, একটু এগিয়ে আসুন”—আমাকে লক্ষ্য ক’রে কালু ক্ষীণকণ্ঠে জানায়। আমি অনুসরণ করি ওকে বন্দুকে টোটা পুরে। যাত্রীদলের অন্তান্ত্রজনেরা পথ চলা বন্ধ করে দেয় আমার নির্দেশে। কালুর নিপুণ হাতে পাঁচ ব্যাটারী টর্চের আলো অভিনব কায়দায় জঙ্গলের কিনারে ঘুরতে থাকে। কাতুর্জ পুরে বন্দুক বাগিয়ে আমিও চরম মুহূর্তের অপেক্ষায়; প্রায় মিনিটদশেক পরে একটা আমলকী গাছের নিচে চক্রাকারে টর্চ চালিয়ে স্পটার কালু আমাকে ইশারা করে একসময়ে। হরিণের চোখ, দেখলেই বোঝা যায়। আঁধার রাতেও। অভিজ্ঞ স্পটারের স্থির লক্ষ্য এখন যুগনয়নে; টর্চের পেছন থেকে নিশানা ঠিক ক’রে, আলোকের সমান্তরাল রেখায় ট্রিগার টেনে দিলাম। একটা আলোড়ন হ’ল ঝোঁপের কোলে...তারপর সব চুপচাপ। ছুটে গেল কালু তার অনুচরদের নিয়ে শিকার ভূলে আনতে। বেশ বড় আকারের কাকার হরিণ—পাহাড়ীরা যাকে বলে ‘দারে’ বা পুরুষ। গুলি ওটার ষাড়ের একপাশে বিদ্ধ হয়েছে দেখলাম। বহুরা মহানন্দে কলবোল তুলে। অনভ্যস্ত ক’লকাতাবাসীদের কাছে এ-বস্তু অত্যন্ত রসাল। অনেকরাত্রে শিকার কাঁধে বাংলোর প্রত্যাবর্তন করলাম। বলাবাহুল্য ভূরিভোজের আয়োজনটা যুগমাংসে বধিত হ’ল। এরপর বৈচিত্র্যহীনতার কেটে গেছে কয়েকদিন।

একদিন রাতে ধারাপাত হ’ল। প্রভাতেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে আমার। সারারাত অজস্র বর্ষণের পর তখন চারিদিকের পর্বত প্রকৃতি স্নিগ্ধ, শান্ত। অলস গতি, ইতস্তত সঞ্চরমান মেঘপুঞ্জ, পর্বতশিখরে ব্যাহত হয়ে তুষার-গুল আন্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে চূড়ার চূড়ায়। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণপ্রান্তে তিস্তার বে অনতিবিস্তৃত রবি-কর-দীপ্ত ধবল গতিপথ নিরীক্ষণ করা যায়, তা তখন দৃষ্টির অন্তরালে। মেঘমালা জমাট তুলোর মত পুঞ্জীভূত হয়ে তিস্তার গতিপথে বিশ্রামমগ্ন। তিস্তার সমগ্রউত্তরপ্রান্তে তরাইএর গহন বনানী সামান্তরাল রেখায় চলে গেছে দূর হতে দূরান্তরে। এর গহন অঞ্চল বাঘ, বুনোমহিষ, হাতী ইত্যাদি নানা হিংস্র স্থাপদে পূর্ণ; অনিন্দ্যসুন্দর ত্রী এর শ্রাম শোভায়। অপরিসীম আনন্দ অনুভূতিতে তরাই অঞ্চল ও অনতিদূরস্থ পর্বতশ্রেণীর মধ্যভাগের বনাঞ্চলকে মনে হয় যেন শ্রামঘন মোহশয্যা। দীর্ঘকাল ষাঙ্কিক মহানগরীর কৃত্রিম জীবনধারায় অভ্যস্ত মনের কোমল অনুভূতিগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত স্ত্রিয়মাণ আমাদের। মনের সেই বন্ধ ছয়্যার আকস্মিকভাবেই যেন আজ উন্মুক্ত হ’ল—অনেকদিনের ক্রুদ্ধ শ্রোত যেন আজ ছাড়া পেয়ে অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হ’ল। অনুভব করলাম, মুহূর্ত আমার কাছে অনন্ত হ’ল।

আগের রাতে কালু একলাই শিকারে গিয়েছিল। সকালে সে ফিরলো বিজয়গর্বে; আধঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার পর দেখলাম দু’জন বলিষ্ঠ লোক বহন ক’রে আনছে একটি বৌদ্ধেন্দু। সত্যিই কালু বাহাদুর শিকারী। সাধারণত এ সময়টার গুরুর পাওয়া যায় না তথাপি সে বৃষ্টির লক্ষণ দেখে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিল। সে জানে কখন কোন্ সময়ে পাওয়া

যায় কোন্ কোন্ শিকার। বাংলার বারান্দায় এনে যখন শুয়োবটাকে বাহকরা ফেললো দেখলাম দস্তহীনা অর্থাৎ মাদী—ভাইটালু পরেটে গুলি লেগেছে। ওজন ক'রে দেখা গেল মাঝারী আকারের—মাত্র ত্রিশ সের ওজনের। এ-অকালে বুনোশুয়ো ৪।৫ মন ওজনের পাওয়া যায়। শুয়োবের মাংসের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। পাহাড়ীদের বরাহমাস অতিপ্রিয় খাদ্য। কালুসন্ন্যাসী সের পনেরো ছ'টাকা সের দ্বয়ে বিক্রি করলো বাজারে। বিক্রি করতে ওর আধঘণ্টা সময়ও ব্যয় করতে হয়নি। চাহিছাটা উপলব্ধি করার মত!

একদিন শ্রামল ও রমেন স্থির করলো শিকার করবে। জীবনে ওরা বন্দুক ছোঁড়েনি। বেকুবের আগে তালিম নিল কিছুটা। ওদের দ্বন্দ্ব তাড়িয়ে শিকারের ব্যবস্থা করা হল। বাংলার নিচে ছোট টিপাটাতে হরিণের ডাক শুনে ওটা খেদানো হ'ল। দশ-বাবোজন তাড়ুরা সোরগোল তুলে নিচের দিক থেকে উপরে উঠতে লাগলো। উপরে একপাশে গাছের আড়ালে আমরা তিনবন্ধু আশ্রয় নিয়েছি। ইঠাৎ একটা হরিণ ছুটে বেরিয়ে গেল এক ঝোপের দিকে। রমেন নিশানা করতেই বহু সময় কাটিয়ে দিলে। ওর একটিমাত্র সুযোগের অপব্যবহার হ'ল দেখে খেদ হ'ল সকলের মনে। আমারও আপশোসের অন্ত রইলো না। পরবর্তী সুযোগ শ্রামলের। বীটাররা এখনই উঠে আসবে। আমি কিরে যাবো মনস্থ করেছি ঠিক এমন সময় একটা 'মুড়ঙ্গী' (মাদী হরিণ) আমার কাছ দিয়ে লাকিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো আর এক দিকে। লক্ষ্য করলাম দৌড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে হরিণীর। শ্রামল ফায়ার করতে বাচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম। হরিণীর গর্ভে শাবক আছে। শ্রামল ও রমেন—হায় হায় করতে লাগল। বীটাররাও আমার কাণে দেখে ধমকে গেছে। জানি মৃত্যু ওটার অব্যর্থ ছিল, এমনকি শ্রামল ছুঁড়লেও। হরিণী কেন, কোনো দৃষ্টিকে গর্ভাবস্থায় মারা আইনবিরুদ্ধ, শিকারনীতি বিরুদ্ধ; তাই বাধা দিয়েছি; অবশ্য শ্রামলের পয়লা মওকা ভেঙে দেওয়া হল।

চা-বাগানের ক্যাকটরীবারু জীবর্ধন গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি শহরে কার্ত্তব্য সংগ্রহের জন্যে। কলকাতা থেকে যা' এনেছিলাম সবই শেষ—সরকারী টোটাভবিলও খালি। সন্ধ্যার দিকে বর্ধনবারু কিরে এলেন শুধু টোটা নিয়েই নয় একজন ভ্রমণলোককেও নিয়ে। শিকারের সরঞ্জাম আর তাঁর পিছনে অঁহুচরও প্রবেশ করলো। বুঝতে বিলম্ব হলনা ভ্রমণলোক শিকারী। পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রান্ত হ'ল—নাম ত্রিশচীন্দ্রনাথ দাস, শিলিগুড়ির কল্কাটর। শিকারে প্রচণ্ড সখ বন্দুকের দোকানে পরিচয় হয়েছে ওঁদের। কর্মকান্ত দিনান্তে চেলা আইডুকে নিয়ে জীপ্ চালিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই এঁর নেশা। বলা বাহুল্য, ভ্রমণলোক অমায়িক, এবং পাঁচ মিনিটেই তিনি আমাদের আপন ক'রে মিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বে ও রসাল কথাবার্তার। আমার জীবনে এমন অপূর্ব ভ্রমণলোক খুব কমই এসেছেন; আমাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। কাজেই কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হতে না হতেই দাদা-ভাইয়ের সখকে আবদ্ধ হলাম আমরা। চা, কেক সহযোগে তাঁর শিকার জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী শুন্তে শুন্তে সন্ধ্যা উৎরে গেল। প্রস্তুত হলাম তাঁকে

শিকার সম্বন্ধে জানাবার জন্যে নৈশযাত্রায়। তাঁর একমাত্র রাইফেল 375 Cordite Magnum—Holland & Holland. তিনি এর কার্যপ্রণালী দেখালেন এবং তার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন সংক্ষেপে। ১০ সেলের বড় স্পট লাইট দেখালেন। রাইফেলের টেলিস্কোপ ফিটিং-এর উপায়ও বাৎলে দিলেন। রাইফেলের রেঞ্জ এক মাইল, একএকটি গুলীর দাম আড়াই টাকা। সবশুদ্ধ রাইফেলটির দাম চার হাজার টাকা। শুনে মনে মনে ভাবলাম একেই বলে যুগ্ম—রাজসিক কাণ্ড।

অধিক রাত পর্যন্ত সেদিন শিকার সন্ধান চললেও শিকার মেলেনি। শুরুপক্ষ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনভূমি, শিকার ও শিকারীর ব্যবধান দিচ্ছে। প্রকৃতির এই লুকোচুরি খেলা শিকারের নেশাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। হঠাৎ শুরু হলো তড়িৎপ্রবাহযোগে শীলাহুটি। হুড়ির মতো অসংখ্য কুচি টুকরোর জমাট ঘল এসে আছড়ে পড়তে লাগলো মাটির কোলে। আমাদের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। মিঃ দাসের অবস্থাও ত্রিশছ—জ্বর নিয়ে শিকারে এসেছেন এটা টেরও পাইনি। সত্যি চটুলবাসীদের হিন্স আছে।

রমেনের দক্ষিণপা গেছে মচকে এরই মধ্যে পিছলে পড়ে গিয়ে। মহা কঁাসাদে পড়ার জালা থেকে পাহাড়ী এক কুলি উদ্ধার করলো তাকে কাঁধে বহন ক'রে নিয়ে। হাওয়ার বেগ কম ক'রেও ঘণ্টায় ৫০ মাইল—চরাচর বিস্তৃতি যেন কোন অতলে গেছে ভলিয়ে। বাহোক কোনক্রমে সেযাত্রা ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বাংলার প্রবেশ করলাম এবং তৎক্ষণাৎ জামা-কাপড় বদল ক'রে নেওয়া হল। মিঃ দাসের অবস্থাও সঙ্গীন। তাঁর দক্ষিণহস্ত আইতুও ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত দেখে বিচলিত হলাম আমরা। একদিন বিশ্রাম করতে বলেছিলাম ওঁদের কিন্তু শচীনবাবু নারাজ—শারীরিক অবনতি বর্ধিত হতে পারে ভেবে তিনি এতো রাতেও ফিরে যেতে চাইলেন শিলিগুড়ি। অগত্যা তাদের বিদায় দিতে হ'ল। যাওয়ার সময় এক মহা-শিকারের প্রতীক্ষা করতে বললেন।

কিন্তু আর সময়ই বা কোথায়? ৩০ তারিখ থেকে প্রায় সবরকমের জীবজন্তু শিকারই আইনবিরুদ্ধ। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর জীবজন্তুর গর্ভাবস্থা ও প্রসব করার কাল। ভেবেছিলাম শিকারের এ-বৃহৎ আয়োজন বুঝিবা পণ্ড হ'ল মিঃ দাসের অসুখের দরুন। কিন্তু ৩০ তারিখে তার পেলাম তাঁর কাছ থেকে। শেষদিন ৩১শে তরাই-এর কোল ঘেঁষে রোহিনী চা বাগানের বৃহৎ এলাকার শিকারের আয়োজন করা হয়েছে—আমরা নিমন্ত্রিত। পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা শচীনবাবুর কোঠায় হাজিরা দিলাম বধাসময়ে। মহাসমাদরে তিনি আপ্যায়ণ করলেন আমাদের। বেলা ৩টার পর জীপে শিলিগুড়ি শহরে বন্ধুকের দোকানে—‘ইষ্ট এন্ড আর্মারী কোম্পানীর’ ভুলুবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনিও শিকারবাদী। অসংখ্য জার্মান ও বেলজিয়ান কার্তুজ সঙ্গে নিলেন তিনি। প্রথম আলাপেই তাঁর অমারিকতার পরিচয় পেলাম। আমার জন্যে তিনি একটি ভালো দোনলা বন্ধুক নিলেন।

যথাসময়ে জীপ দাঁড়ালো রোহিনীর উদ্দেশে। মাটিগাড়া-বাগডোগরা অঞ্চল থেকে রসিকপ্রবর মাধনপ্রসাদকে তুলে নেওয়া হ'ল। ইনি মারোয়াড়ের অধিবাসী হলেও শিকারযাত্রায় ভালো সঙ্গী। স্পটটারের কাজও কিছু জানেন। মিঃ দাসের আইভু বা আমার কালুসন্ন্যাসী পরিশ্রাস্ত হলে ওঁকে দিয়েই কাজ চালানো হবে এই স্থির হয়েছে। জীপের যাত্রী সবশুদ্ধ নয়জন। শচীনবাবু, ভুলবাবু, আমি, শ্যামল, রমেন, মাধন, আইভু কালুসন্ন্যাসী ও সারথি লাকৃপা। আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পশ্চিমবঙ্গ শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিম কোণে।

ভরাইয়ের জঙ্গল কি বিশাল। কি ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য বিরাজমান চারিদিকে। প্রসিদ্ধ সুকনা রিজার্ভ ফরেস্টএর কোলবেসে আমাদের রোহিনী চা-বাগান আত্মন জানাচ্ছে। বেলা প্রায় চারটে ছহু শব্দে গাড়ী এসে পৌঁছালো নিচ কামানে, শচীনবাবু ও ভুলবাবু যে-স্থানে ওখানকার একমাত্র এবং সর্ববৃহৎ নব্বাদক রয়েল টাইগারের কবলে পড়ে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচেছিলে, তা দেখালেন। জায়গাটা দেখে একটু আঁৎকে উঠলাম। বেলা চারটে থেকে শুরু ক'রে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত কয়েকটি ধনেশ ময়ূর ধরগোশ মুরগী যাবা হ'ল। আমি আর ভুলবাবুই সটুগানে নিশানা ঠিক ক'রে নিতে লাগলাম এভাবে। গাড়ী স্থির হয়না কোন সময়েও—টহল দিতে থাকে। শচীনবাবুর রাইফেল মাঝে মাঝে আকাশ বিদীর্ঘ করলো শব্দে। চকর দিতে দিতে বাংলোয় পৌঁছলাম। বাগানের মালিকের তৃতীয়পুত্র ঋবরমল অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে।

জীপে বসেই শিকারপর্ব সমাধার চেষ্টা হচ্ছিল। অথচ রাত এগারটা পর্যন্ত ক্রমাগত টহল দিয়েও যখন শাহজলরাজ বা যুগয়া সন্ধানে যুগও পেলাম না তখন নিতান্তই পিস্তি চটে গেছে, উদ্ব্রপ্তিরও প্রয়োজন হয়েছে খেরাল হ'ল।

তেরো মাইল বৃহৎ চা বাগিচা পরিভ্রমণ চলছে। কাকজ্যোৎস্না রাত। চারিদিক নিঃশব্দ। মুখে কথা নেই কারোর। নিশাচর ছ' একটা পাখী উড়ে যায় বিকট শব্দ ক'রে। সকলে সচকিত হই। গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে থাকে পথ ঘুরে। স্পট লাইটের প্রয়োজন ছিলনা। তবুও অবাধ্য মন...দশ ব্যাটারীর সেল থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় দূরের জঙ্গলে। চোখে পড়ে চিত্রল হরিণীর আলোক বিকীরণ। সংখ্যাভীত জমাট জোনাকীর আলোর মত জঙ্গল জল করে, ধমকে দাঁড়ায়। শচীনবাবু রাইফেল তাক করেন, কিন্তু কার্য্য করার আগেই তা বনের গহণে মিলিয়ে যায়। পালানো সম্ভব হয় প্রকৃতি রাতকে শুভ্র রূপ দিয়েছে বলেই।

সকলেই বাংলাতে ফিরে যাওয়া মনস্থ করি। রয়েল বেঙ্গল বা মধ্যরাজ্যীয় বড় কিছুই শাস্ত্রাং আজ মিলবে না বুঝতেই পারা যাচ্ছে রাতের রূপ দেখে। রাত যেন প্রহসনে মগ্ন আমাদের নিয়ে।

আজকের শিকারায়োজন আমার সন্মানে, কাজেই আমি ফিরে যেতে না চাইলে যাত্রা বধাপূর্ব চলতে থাকবে। রাত্রি প্রায় পৌনে বারো—হঠাৎ স্পটার কালুর সন্ধেতে জীপ

নিশ্চল হ'ল। আলোর রেখা একটা বড় জঙ্গলের কোলে চক্রাকারে ঘুরতে থাকল।
মিঃ দাস বললেন—বোধ হয় হরিণ। কালু কিস্ কিস্ ক'রে জানালো। শচীনবাবুর ধারণা
অমূলক কেননা চোখ দুটো জ্বলছে বাঘের। প্রায় পনেরমিনিট বন্দুক বাগিয়ে বসে আছি।
শীতে ও উত্তেজনায় হাত পা হিম হয়ে গেছে। বাবরমলও অবশ হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে কাতরতা
প্রকাশ করলো—ইক ইট এ বিগ টাইগার মিঃ চ্যাটার্জি? বুঝলাম একটু ভয় পেয়েছেন,
শিকারে নতুন এসেছেন বোধ করি। জ্যোত্স্নালোকে দেখলাম বেচারার মুখমণ্ডল
পাংশুবরণ ধারণ করেছে। অন্য যাত্রীরা নিশ্চুপ। জঙ্গল আর রাস্তার কিনারে লক্ষ্য
স্থির রাখি।

মিঃ দাস গাড়ী থেকে নেমে কালুর সঙ্গে একপাশে দাঁড়িয়ে কোথা-থেকে কিভাবে নিশানা
করবেন তা' দেখছেন। একটু বিচলিত মনে হলো তাঁকে। কালু অর্ধৈর্ষ্য হয়ে ওঠে ঠায়
আলো ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। এবার স্পষ্ট দেখা যায় একজোড়া অগ্নিগোলক এগিয়ে
আসছে সস্তূর্ণপে। শচীনবাবু আর দেবী করলেন না। এই চরমমুহূর্তের জন্তেই তিনি
অপেক্ষায় ছিলেন। রাইফেল আর্ডনাদ ক'রে ওঠে গগণভেদী। একটা আলোড়ন হল। বাঘটা
জঙ্গল থেকে বিরিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল আমার বন্দুকের নাগালের বাইরে দিয়ে। সকলে
বললো ডোরাকাটা অর্থাৎ রয়্যাল টাইগারের জাতভাই।

রাত পোঁণে একটা পর্যন্ত বহু অল্পসন্ধান হ'ল। গুলী লেগেছে কিনা তাও বোঝা
গেলনা সঠিক। সকালে জঙ্গল বীট ক'রে দেখবার প্রস্তাব নিয়ে নিরুৎসাহচিত্তে ফিরে
চলেছি—সকলেরই ধারণা লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন মিঃ দাস। হতাশায় তাঁর মুখ পাণ্ডুর। এ-দৃশ্য
শিকারীদের পক্ষে বড় লজ্জার। মাধনপ্রসাদ বারবার হা-হতাশ করছে। ভুলুবার টিপ্পনী
কাটছেন থেকে থেকে।.....গাড়ী গতি বাড়িয়ে দিয়ে বাংলোর দিকে চলেছে।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাতে কটক পেরিয়ে গাড়ী বারান্দায় এসে জীপ নীরব হ'ল। এসে শুন্লাম
স্থানীয় অধিবাসীরা নাকি বাংলোর কাছেই একটি প্রায় পনেরো-বিশ ফুট পাইথন ময়াল সাপ
ঘেরেছে। শিকারীরা অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের দেখাবার জন্তে অপেক্ষা করেছিল। ফিরতে
বিলম্ব হওয়ায় তারা শিকার সমেত প্রত্যাবর্তন করেছে।

ভক্ষণপর্ব শেষ ক'রে ভোররাতেই আবার শার্ছলবধের প্রস্তাব নেওয়া হল সর্বসম্মতিক্রমে।
শোবার আগে মিঃ দাস কিছু লোক চাইলেন, সকালে বাঘ জখমের জায়গা বীট করবেন বলে।
তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম গুলীতেই বাঘ জখম হয়েছে। কিন্তু আমরা বাকী সকলে সন্ধিক্ষমণা।
বাঘ জখম হলে রাস্তা পার হবে কি করে রাইফেলের গুলী ধরে! যে গুলীর চাপ চারশো
পর্যন্ত এবং যার একটিমাত্র সটে হাতী-গণ্ডার জাতীয় জীব অন্তত মিনিট পাঁচেক পঙ্গু হয়ে
যায় সেখানে বাঘ তো কোন ছায়।

ভুলুবার আর একবার টিপ্পনী কাটলেন মিঃ দাসের উদ্দেশে। বাবরমল ও মিঃ বোষ
শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমরা শিকারী পোশাকেই শয়্যা নিলাম।

বীট করার লোক আসার আগেই জীপ নিয়ে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম।

জায়গাটা ফাক্টরীর কাছেই। এগিয়ে চললাম আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে। রক্তের সন্ধান মিলল কাছেই। সকলেই বিস্মিত হলাম। শচীনবাবু পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে। বেচারাকে ভুলবাবু বড়ই কানু করেছিলেন গতরাত্রে। এখন ভুলবাবু নির্বিকার।

জীপ থেকে জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতরে প্রবেশ করেছি। বন্ধুদ্বয় ও অন্যান্য অনেকেই নিষেধ করছে আর এগিয়ে যেতে। বীটারটাও কখন আসবে তার স্থিরতা নেই।

মিঃ দাস দুজন অনুচরকে নিয়ে আর একদিকে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটা বড় চালের গা ঘেঁষে। তাকিয়ে দেখলাম পেছনের প্রধান সড়ক থেকে এসে পড়েছি অনেকটা। জীপের আংশিক দেখা যাচ্ছে। বন্ধুরাও উৎকণ্ঠিত। আহত বাঘের মত ভয়ঙ্কর হিংস্র আর কিছু নেই। ভুলবাবুও গাড়ী থেকে তাই জানাচ্ছেন।

কালুসন্ন্যাসী রক্তের সন্ধান পেয়েছে—দাগ দেখে দেখে অনুসরণ করে চলেছে আর একদিকে। সকলে ছিটকে পড়েছি একে অপরের কাছ থেকে। কালু উচ্চকণ্ঠে নেপালী ভাষায় লাকপাকে জানালো...না জেনে বা না-দেখে যেন গুলি ছোঁড়া না হয়। যে-ভাবে ব্যাভ্রানুসন্ধান হচ্ছে তার ফলে ভুল করে মানুষ শিকার না হয়। কালুর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই পাশের অগভীর খাদের কাছ থেকে একটা চাপা হুঙ্কার এলো। চমকে পিছনে ফিরে দেখি গতরাত্রের গুলিতে আহত বাঘ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। মানুষের কলরোলে নিজের অবস্থিতিকে গোপন করতে পারেনি সে আর। তখনও যেন ও পালাতে চায় কিন্তু সে শক্তি আর নেই। দেখলাম, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। একেবারে পুল অফ ব্লাডএর সামিল।

মিঃ দাস একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে সঙ্গেই মৃতপ্রায় চিতার উদর বিদীর্ণ করলেন। সামান্য একটু আর্তনাদের পর চিতাবাঘিনীর ভবলীলা শাক্ত হলো। প্রথম গুলিতে চিতার চোয়াল খুলে ফেলে তার রূপকে ভগ্নাবহ করে তুলেছিল। চিতাকে ফিতা দিয়ে মেপে দেখা গেল ৭ফুট ৯ ইঞ্চি—নেহাৎ ছোট নয়। সকলে একবাক্যে জানালো, আমার দৃষ্টি নাকি একেবারে ছরবীণের! মহান্মুতিতে গানের কলি ভাজতে ভাজতে বাংলার দিকে ফিরে চললাম। পথে গোটাবারো মুরগী আর দু'একটি খনেশ যা পড়লো তা আমাদের কবলে পড়ে প্রাণ হারালো। দু'একটি আহত হয়েও বনাঞ্চলে বিলীন হলো। বাংলার ফিরলাম বেলা পোনে আটটার। ঝাবরমল তার ক্যামেরায় আমাদের শিকার-সমেত গ্রুপফটো নিলেন।

চতুঃশ্লোক
(দিলীপ যুগ্মাকী-কে)
জ্যোতির্বিদ্য গল্পোপাখ্যান

সন্ধ্যার তারা আকাশে উঠলো
পাখীরা ফিরলো ঘরে
তার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমি
ব্যথা পাই অন্তরে ।

সে চলে গিয়েছে
রেখে গেছে তার
বেদনা সে অকপটে
(সে বলে গিয়েছে
এই মেয়েটিকে
ভালোবেসেছিলে বটে)

আরো কতো তারা আকাশে উঠলো
পাখীরা ফিরলো ঘরে
সে আমার কেন ব্যথা দেয়
কেন ব্যথা পাই অন্তরে ।

তার ব্যথা সে তো কমন
তার
বেদনা ছড়ানো বহুদূর
অস্থির তার সীমানায়
আমি
কতোবার হবো মোহাতুর :
এই বিচিত্র পৃথিবী সে জানে
কী বিচিত্র সে কী মোহময়
তার জ্ঞাতব্য আরো কিছু তাই
নব জানা তার মোহ নয়

তার

হাত ধরে আমি বহুদিন
দেখেছি পৃথিবী কী প্রাচীন
সূর্যের রং আকাশে হারালো
যৌবন ধ্যানে সমাসীন

তার

মধ্যাহ্নের হাঁটা পথ
হেঁটে দেখি আমি কম নয়

তার

দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণায়
কেউ তার প্রিয়তম নয় ।

তার

আবো কথা এই শেষ নয়
হোক

মৃত্যুর শত অপচয়

কেন

মিথ্যার এতো সঞ্চয়
চারিদিকে তার জয় জয় ?

তার

যৌবন এতো নিষ্ঠুর .

তাকে

দীপ্তি দিয়েছে-পরিমার
ছু চোখে যখন ক্লান্তি নেমেছে
চেয়ে দেখে তার চারিধার
জলে পুড়ে গেছে অতিদূর :

তাকে

ভালোবেসে তাই হুঃখ

তার

করতলে চাপি ওঠ

তাকে

অভিমান ভরে ভালোবাসি ফের
আমারি যা কিছু দোষ,তো !

বেলা অবেলায়

ভরুণ সাত্তাল

॥ এক ॥

আমার আকাশে যদি আমিই না সূর্য হলাম, যদি
প্রতিদিন মেঘচাপা মুখে বেলা গেলে
দিগন্তে উন্মুখ আমি কপালে ছড়ানো এলোমেলো ক্লক চুল ধুলো মেখে হাঁটি, যদি
হুহাত আমার শুধু মুখখুবড়ে পড়ে কঁকরের কঠিন ধাবায়
রক্তমাখা, প্রশ্ন করি, উত্তর পাই না, আমি
আমারি আকাশে কেন সূর্য নই, শুধু ক্লাস্তিকর ধুলো, আর
ধুলোর একমুঠো অপব্যয়

বসন্তে কঠিন কালো পাখর ফাটিয়ে তুলে ধরে পলাশ
পতাকা, শালবনে উদ্ভাস্ত হনুদ পাতা ঝরে যায়, বনাস্তরে
ফুল ফুটলে অন্তর্যর আমার হৃদয়ে কঁটা বেঁধে, যদি আমি
জীবনের জনারণ্যে বুনো ফুল নই, কিংবা ফণীমনসার
কঁটা নই, ঘাসের ডগায় এক কঁটা রোদের হাসিও নই, তবে
জন্য কেন, আমি জনের মুহূর্ত হতে এখনো কী অজ্ঞাত যদিও
দেহধারী, চৈতন্য যদিও বুকে তৃষ্ণার তুণীর হতে একাঙ্গি বানের জ্বালা
মুক্ত করে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে নিতে চায়, হত হৃদয়ের অন্ধকারে
তবু আমি সূর্য নই কেন

সারারাত পাঁকে শুয়ে আফোটা পদ্মও ভোরে পাগড়ি মেলে, আমি
চোখ মেললে কেন মনে পাঁকের বিশ্বাস ভরে ওঠে ॥

॥ দুই ॥

চোদ্দোজন তারা, তাঁর আটজন পুরুষ, আর ছয়জন নারী, ঠিক
চতুর্দশপদী কবিতার একেকটি চরণ যেন, বসলো তারা মুখোমুখি
ঘরোয়া বৈঠকে

পদাবলী বাঁধতে চেয়ে কেন সুর কেটে যায়, একজন করুণ স্বরে কথা বললে
বাকি তেরজন হাসিতে বাকায় ঠোট তারপর পাঁক ছোঁড়ে পরস্পর, আর

কথা যদি ধেমো যায়, নিশ্চকতা জমে যেন বুকচাপা পাথর, সব
সাক্ষ হলে ক্লাস্ত তারা, তখন এ-ওর দিকে ক কোঁটা চোখের জল
তুল ধরে, ক কোঁটা শিশির হয়ে তাদের হৃদপিণ্ডে রক্ত চেয়ে থাকে
এ-ওর যুগের সূর্যোদয়ে, তবু কেউ তারা এক নয়, সবাই মিলে
চতুর্দশপদী, তবু কেউ যদি ঘর বাঁধে পশ্চিম দিগন্তে তবে আরেকজন
ঘর ভাঙে পূবের আকাশে, তারা কত কাছে বসে থাকে তবু যেন
দূরের তারারও বহুদূরে ॥

॥ তিন ॥

ছধারে ধানের ক্ষেত বর্ষার ছোঁয়ায় চমকে যৌবন পেয়েছে, দূর গ্রামে
মরাই খড়ের চালা নারকেল শিমুল গাছ ঝাপসা হয়ে এলো
বুড়ি নামলো, শাসি টেনে বসে থাকি দ্রুতগামী ট্রেনের কামরায়
বাইরে বুড়ি, বুড়ি ঝরে, বুড়ি শাসি গড়িয়ে ছড়িয়ে গেলো, ঝাপসা কাচে
জ্ঞান হয়ে এলো মাঠ, দূর গ্রাম, নারকেল, শিমুল গাছ, কানে আসে
অস্পষ্ট বুড়ির কান্না, আর চাকায় দ্রুত লাইন বদলীর শব্দ
কঁকি দেয় চেতনায়, শরীরের প্রতিটি পেশীতে যন্ত্রণায়
হয় তো বা ধানিক সেই কাচের শাসিতে যদি ঠোট রাখি, মনে হয়
বাইরে এত বুড়ি ঝরে, অঝোর ঝরায় কান্না, বুঝি বাইরে
বুড়ি ঝরে মাঠঘাট আকাশ একাকার, বুঝি যেন চেতনার
অন্ধকার ঘরে কড়া নাড়ে হয়তো কেউ পরিচিত
তবু তাকে জেনেও জানিনা

এই তো আমি, কিংবা আমরা প্রতিদিন কাছে আর কাছে
জীবনের এ লাইনে কিছু সওয়া সাক্ষ করে ও-লাইনে বেচে দিই সব
সময়ের গীত ক্ষতি জমা হয় মৃত মনে, হৃদয়ের ঠাণ্ডা শব্দধারে
যাঝে যাঝে মনে হয় বুড়ি ঝরে দৃষ্টির ওপারে, কান্না ঝরে যায়
ঝরে রাত্রিদিন, জানি যেন, যদি মনের ফ্যাকাশে শাসি ভেঙে দিই
দেখবো, বুঝবো প্রাণ দিয়ে, অনুভব করব মন দিয়ে, দেহ দিয়ে
তুলে নেবো তাকে—সেই যার
হৃদয় রক্তাক্ত হল কোঁটা কোঁটা রক্ত ঝরে ঝরে, তবু এ-লাইনে
ও-লাইনে চাতুর্ঘ্যের বিকিকিনি করি বলে হয়তো তাকে
জেনেও জানবো না ॥

॥ চার ॥

দেওয়ালের বুকে লেখা, জানি কে লিখেছে, তবু তাকে
চিনি বললে ভুল হবে, সেখা :

আমরা জুটেছি সবাই রঙের খেলার
জেনেও জানিনে হাতে যে কার কী তাস
নিজের রঙেই নিজে বুঁদ হয়ে থাকি
এ যুগে আমরা সবাই নার্সিসাস ॥

হঠাৎ একপসলা বৃষ্টি সাজ হলে ক্যাকাশে মেবের ওড়নার
চাদ উঁকি দিলো, আজ একাদশী, হঠাৎ সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলো বলে
অন্ততমা নাগিকাকে কাছে পাওয়া হলো না, কেবল বৃষ্টি ভিজে সঁতে গেল
ইন্দ্রিকরা জামা, মন বিকৃত বন্ধুদের অশ্লীল সংলাপে, ক্রমমেটের
শেলফে এলোমেলো স্টালিনের গ্রন্থাবলী ছড়ানো, হাওয়ায় ওড়ে
নীল লাল দাগদেওয়া পাতা আর আরেক দেওয়ালে চুপচাপ
ফিলিপ্সের বিজ্ঞাপনে রাজপুত বধু শূন্যবড়া সামনে রেখে
কুঠায় করুণ

দেওয়ালের বুকে লেখা, জানি কে লিখেছে, তবু তাকে
চিনেও চিনবোনা ॥

। পাঁচ ।

এ যুদ্ধও শেষ হবে, আমরা যারা চেতনায়, অথবা বাহুর
শাবলে বেঁধেছি বাঁধ, রক্তের উৎসারে সব আরক যুছেছি
তাও সাজ হয়ে যাবে, এবং সে কুরুক্ষেত্রে একা
তোমার আমার মৃতদেহ গুনবে স্থির চোখে আকাশের তারা, আর
ভাগ্যবান ভীষ্ম শুধু শুয়ে থাকবে চেতনার দুঃখভীর, ভীকৃতর
মানির শব্দায়

আমরা কী ভাবি এই জীবন ট্র্যাজেডি, কিংবা অন্ধকিছু, শুধু
চায়ের পেয়ালার ঠোঁটে যতক্ষণ, যতক্ষণ ঠোঁটে ঠেকে তলানী অন্তত
ততক্ষণ জ্ঞান, কিংবা অস্বখামা, কর্ণ কিংবা কুপ, অবশ্যই .
দুর্ঘোষন হতে কারো সাধ নেই—অতবড় অহঙ্কার নেই, অহঙ্কারে
স্বপ্নের সজিনী শুধু জোপদী বা রাণী ভানুমতী

জানি তো, সব সাক্ষ হবে, আঠারো দিনের রক্তে রাঙা হবে
কুরুক্ষেত্র ; যে-আমরা নায়ক শুধু একটি দিনের
তাদের অরণ রইবে ছছ বওয়া উত্তরে হাওয়ায়
তাদের অরণ শুধু শ্রীকৃষ্ণের গীতার দর্শনে
মরণমারণ, আর সংঘর্ষের সত্যসন্ধ ত্রুতে যা কিছু করার বাকি
সে শুধু কর্মীর জন্যে, আমরা শুধু ভাঙতে চাই
সত্তা ভাঙি । আত্মার নিটোল মুখে ঘৃষি মারি, শুধু
ভাঙতে চাই ভাঙতে চাই, অবশ্য চেতনা আর বাহু আত্ম
ভাঙনের ভূমিকার বিরাটের নাটমঞ্চে ক্রিব বহরলা -

হায়রে নায়ক ।

দূরের দিগন্ত

শঙ্খ ঘোষ

এই উঁচু পাথরে পা খুয়ে দাঁড়িয়েছো তুমি, কী
দেখা বার দূরের দিগন্তে ? আমার সমতল একটা
নিঃশব্দ জীবনের মতো শুয়ে থাকছে আকাশের তলে,
তাকে তুলে ধরো ।

সন্ধ্যার মদে ভ'রে গিয়েছিলো ঠাণ্ডা আকাশ । তোমার
কি মনে হয়নি সেই গলে-বেড়ানো রঙ একটা উচ্চ
হাহাকাবের চিরে-বাওয়া বাষ্প ? হঠাৎ তার মস্ত রঙ
দেখে আগুন লাগলো হুচোখে, আর তোমার হিরণকান্তি
ভরে গেলো আগুনের আভার ।

এখন স্পষ্ট দেখতে পাইনে মুখ । কালো সরু
হুঃখের মতো রেখাগুলি ঝে পে দিয়েছে তোমার শাদা
ছই গাল,—আর

আমার সমতল কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, ঝেঁকে
ঝেঁকে । চেউ হয়ে উঠতে চাইছে তোমার দিকে, যেখানে
ঐ উঁচু পাথরে পা খুয়ে তুমি দাঁড়িয়েছো, দূরের
দিগন্তে চোখ রেখে ॥

জোয়াল

সুবোধমোহন ঘোষ

ঘুম ভাঙল শিউশরণের। ভাঙল গোলমালে। ঝাপটা মেরে ঠোঁটের দু'পাশে মাছিগুলো উড়িয়ে দিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল। নাছোড়বান্দা মাছি। কঁাক বেঁধে ঘুখের চারপাশে উড়তে থাকে। তার সারা গা জুড়ে বাসি মদের গন্ধ। উৎকট ঘাম আর ঘরের ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে মিশে মদের গন্ধটা বেশ পচা পচা। বড় উৎফুল্ল মাছিগুলো। ভেঁ। ভেঁ। করে উড়ে উড়ে গা চাটতে চাটতে সোহাগ জানাতে লাগল।

‘তেরী নানী!’ বেগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দুই হাতের তালুতে জোরে শব্দ করল শিউশরণ।

ভাগ্য ডাগর কয়েকটা মাছি লেপটে গেল হাতে : শালে!

তবু বেহাই নেই। ঘর ময় ভেঁ-ভেঁ-ভেঁ। ইচ্ছা ছিল আর একটু ঘুমবার। ঘুম না আসছে, চোখ বুঁজে চুপচাপ পড়ে থাক। রাতের কুলি সে। আড্ডায় ফিরতে কোনদিন রাত দুটো, কোনদিন রাত একটা, কোনদিন ফেরেই না। গাড়ীর পাদানীর একপাশে গদিটা রেখে মাথা হেলিয়ে অন্ধুত কোঁশলে শরীরটাকে ভেঙেচুরে নেয়। দু' ফুট বাই দু' ফুট একটা সংকীর্ণ পরিসরে জীবন্ত পুরস্কৃত একটি মানবদেহ। আট-দশ ঘণ্টা ঘোড়ার মত ছুটে ছুটে গভীর রাতে শরীরটাকে এইভাবে ভালগোল পাকিয়ে ফেলাটা ঠিক যৌগিক প্রক্রিয়ার মত। টানটান দেহটা আরাম পায়। দেহের গাঁটে গাঁটে রক্তের মধুর প্রলেপে ঘুম নামে। পরম তৃপ্তির ঘুম। নাক ডাকে।

ভোরবেলা রাস্তায় বাতি নেবানো শুরু হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙে। সকালের কুলিকে গাড়ী জিন্মা করতে হস্তদস্ত হয়ে ছোটে। তখন হাজার লোভনীর ভাড়া পেলেও সে মুখ ফেরাবে না। জুড়িদারের হাতে গাড়ী না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এদিকে দেবী হলে বিকেল চারটের আর গাড়ী পাওয়া যাবে না। যদি না দেখে বিকেলের ছায়ায় সকালের বিলম্বটুকু পুষিয়ে নেবে জোড়দার। সকালের কুলির অবস্থাটাও ঠিক তাই। তিনটা পর্যন্ত ভাড়ার জন্তে যদি বা একটু আনমনা হয়, সাড়ে তিনটার পর একরোখা হয়ে ছুটবে। প্রেতের মত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে বিকেলের ছায়া।

‘এই রোখো—ভাড়া যাবি?’

‘নেহি বাবুজী, হাত বদলিকা টাইম হো গৈল—’

সোয়ানি বোকার মত তাকিয়ে থাকে। চোখের পলক ফেলে আর একটি কথা বলতে গিয়ে দেখে নাগালের বাইরে চলে গেছে গাড়ীটা। পঁই পঁই করে ছুটছে কুলি—যদি কি

বাঁচি। চলতি আর একটি রিকসাওয়ালাকে ডাকো। সেই এক-ই জবাব। খালি গাড়ী দেখে সোয়ারী যতখানি উৎক্ল হই, ততখানি হতাশা জাগে। হয়ত সেই মুহূর্তে একটি রিকসার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

‘একটু পরেই না হয় হাত বদল করবি।’

‘ঘড়ি দেখিয়ে বাবুজী, তিন বাজ গিয়া—’

কেউ মুচকি হেসে, কেউ জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ না-করে উদ্দ্বিগ্নসে ছোট্টে খাটালের দিকে। বড় মনিবদের খাটাল, ক্ষুদ্রে মনিবদের কুলিদের নিজস্ব আড্ডা—কোন বস্তির একটি খুপরি আর পনেরো ঘোলজন কুলি।

রাতে ঘুমবার সুবিধা হল না যেদিন, সেদিন সকালে পুষিয়ে নাও। সকাল থেকে তিনটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তি। কোন কোন রাতে ঘুমবার সুযোগ আদৌ জোটে না। নিশ্চিন্তি রাতেও ভাড়া পাওয়া যায়। সেও বরাত। বিচিত্র মহানগরীর বিচিত্র সোয়ারী সব। ঘাপটি মেরে বসতে হয় বিশেষ বিশেষ জায়গায়। তাও নিরাপদ নয় সব সময়। ভয় আছে পুলিশের। আছে বেমক্কা সোয়ারীর জুলুম। গায়ের জোরে পেরে ওঠা যাবে না। জানেন ভয় নাই। সমস্ত কথা বলতে হয়। রাতে কোন মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে? জঙ্গলের জানোয়ার হয়ে যায় মানুষ রাতছপূরে। হেলায় খুলে ফেলে মুখোস। বেকাঁস কথা বললেই চোট খেতে হবে। কত, কত দেখল সে, নিজেও চোট খেয়েছে কত। নিশ্চিন্তিরাতে মহাশয়ানে দাঁড়িয়ে গুমরে গুমরে কেঁদেছে, নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকেছে, ভয় পেয়েছে। তবু ঘাপটি মেরে বসতে হয়। পয়সা আছে। একদিনের রোজগারে কয়েকদিনের জমার ভাবনা থেকে রেহাই। পেটপূরে মদ খাওয়া যায়। রোজগারের এই লোভ ছেড়ে রাত্রে বাসায় ফিরে সুখটা কী? গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হয়ে শোওয়া। কাঠ হয়ে। ডাইনে-বামে কোন দিকেই ফিরতে পাবে না। খুপির এক ইঞ্চি জমিও কঁাক থাকে না। রাতছপূরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে আরো অস্বস্তি। উঠে বাইরে রাস্তায় এসে বিড়ি হয়ত খাওয়া যায়, বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেশের কথা ভাবতে ভাবতেই খাওয়া যায়, আবোলতাবোল আকাশপাতাল চিন্তা লাগেও ভালো—কিন্তু কবে এসে আর জায়গা পাওয়া যাবে না। ঘুমে অচেতন আড়ষ্ট দেহগুলো সে-ফাঁকটুকু ভরিয়ে নিয়েছে। নিজের মাপের জায়গা পেতে গেলে একজনকেই ঠেললে চলবে না; সবাইকেই ঠেলতে হবে। রাত বারটার মধ্যে ফিরলে জায়গা পাওয়া যায়, তখনও অনেকের ঘুম দানা বাঁধে না। গভীর রাতে ঘরের আর এক রূপ। তেলতেল ঘুম-ঘুম কাতর মুখগুলো এক নজরে দেখে আর গাড় প্রাঙ্গণের আওয়াজ শুনে কারোকে ডাকতে আর ইচ্ছা হয় না। একা শিউশরণ নয়, সবাই এই অবস্থাটা মেনে নিয়েছে। একার দুর্ভাগ্য সবার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা কেউ করে না। তাই রাত্রির নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে বাসায় কেউ ফিরতে চায় না। ঘড়ি না দেখে রাতের বেলায় টের পাওয়া যায় তা।

মদের নেশাটা কেটেছে, কাটেনি কিছুনি। কাটিয়ে ওঠবার জন্যে আর একটু গড়িয়ে নেওয়া। তার পরেই মেজাজ কুরকুরে। মদে দেহের গরম কেটে যায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়,

সায়ুশিরার জখমগুলো যবে আসে। পাল্লা-বান্না থাকলে এত বেলা পর্যন্ত গড়ানো সম্ভব হয় না। পনেরো-কুড়ি জনের জোট বাঁধা একটা দল। খোরাকির পরস্য সকালেই দিয়ে দিতে হয়। এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। তোমার জমা উঠেছে, খোরাকি ওঠেনি, বেশ কাল দিও। আজকের খোরাকি আমরা চালিয়ে দেব। প্রত্যেককে প্রত্যেকের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। বিদেশে কে কর্জ দেবে কে বিশ্বাস করবে? লেখাপড়া না জানলেও মনের খাতায় সে-হিসেব পাকা হয়ে থাকে। মদে বেসামাল হয়ে পড়লে পাল্লা বান্না থেকেও রেহাই আছে। তবে আজকের ছুটি আর একদিন পুষিয়ে দেওয়া চাই।

সুতরাং সকালে তাড়া ছিল না। আর একটু গড়িয়ে নিয়ে বাসিমুখে কড়া একশাস চা খেলেই—ব্যাস! কিন্তু বাইরে গোলমালে আর চুপ করে থাকতে পারল না শিউশরণ। একটি বিষয়ে সবাই নির্বিকার। যে যার মনিবের সঙ্গে পাল্লা দাও, কেউ নাক গলাবে না।

রোদ এখনও ঝাঁজেনি। রাতকুলিদের খোসগল্পের সময় এটা। গতবাতের অভিজ্ঞতা, সোয়ারী, পুলিশ, খানা, ভাড়ার বাজার, দেশের কথা—টুটিটাকি আলোচনার সবাই মশগুল হয়ে থাকে। নতুন কেউ দেশ থেকে এলে কথাই নেই—গাঁজার ককে সেই আগে পাবে। দেশের কথা আর ফুরুতে চায় না। একজনের কথা ফুরুলে আর একজন খেই ধরিয়ে দেয়। সেদিনটা বড় আনন্দে কাটে।

গল্পে গল্পে বেলা বাড়ে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে লম্বা ঘুম। সারারাতের জন্তে তৈরী হয়ে নেওয়া। তিনটে বাজলেই চাক্ষা হয়ে বসে-দাঁড়িয়ে চারিদিকে চনমন করে তাকাও। আর আলিস্তি নয়। সকালের মজলিস এখন স্বপ্ন।

বাইরে ভুমুল হট্টোরোল। রাস্তার পাশেই বস্তি। নর্দামার গা-বেঁধে সারি সারি খান কুড়ি রিক্সা থাকে। কাছেপিঠে স্ট্যাণ্ড নেই। কাজটা বেআইনী। কিন্তু আশপাশের বাসিন্দারা মেনে নিয়েছে অবস্থাটা। মাঝে মাঝে পুলিশের ফুলুম হয়। নর্দামা সাক করা অসুবিধা হলে ধাওড়রা অল্লীল ভাষায় আপত্তি জানায়। ছ'চার পরসায় ওরা সম্বল্ট। মুশকিল হয় নতুন কোন জমাদার বদলি হয়ে এলে। কিছুই সে মানে না। কোন উপরোধে কান দেয় না। দড়ি দিয়ে বেঁধে একাই খানায় টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করে কোন কুলিকে। রাস্তাবন্দী কেসের আওতায় পড়ে খানাকোর্ট করে হয়রানি হয় কুলিরা।

হট্টোরোল ক্রমশই বাড়ছে। সকালেই পালে বাষ পড়েছে। নতুন এক জমাদার লাঠি ঠুকে ঠুকে চীৎকার করছে, 'এসব গাড়ীর কুলি কারা—জলদি আও—'

কেউ ধরা দিতে চায় না। সবাই চুপচাপ। বাগে লাল হয়ে উঠছে জমাদার, উন্মত্তের মত চীৎকার করছে, 'আও—আও—শালা লোঁগ—'

বাইরে এসে দাঁড়ালো শিউশরণ। এসব গা-মহা। খানা-কোর্টের ঝামেলাও অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তেড়ে এল জমাদার শিউশরণকে দেখে। ষাড়ে এক বন্দা দিয়ে বলল, 'কাল রাতে ভাগলি কেন? কোথায় নিয়ে গেছিলি ও সোয়ারীকে?'

‘রাস্তায় ছটো ঘোড়াই টুটে গেল। নেমে গেল সোয়ারী।’

‘গাড়ী কোথায়?’

‘কারখানায়। জোড়দার নিয়ে গেছে।’

‘চোরাই আফিং-এর কারবার ঐ সোয়ারীর—খাল্লা সব কামিয়ে দিলি!’

‘কেমন করে জানব আমি।’

‘তুই ভাগলি কেন? তাকে খাড়া থাকতে বলে গেলুম না?’

শিউশরণ মরিয়া হয়ে উঠল, ‘মনিবকে জমা দিতে হবে তো? নিজের পেট আছে। দেশের বালবাচ্চার কথা ছেড়ে দিলাম। হমলোগা শুধু বোড়ে—এত্যা জুলাম নোহ সহগা!’

স্তুভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে জমাদার। পশুর মত হিংস্র হয়ে ওঠে চোখ। তপ্ত নিশ্বাসে মোমে মাক্রা গৌফের মোম একটু একটু গলে।

কুলিরা প্রমাদ গোণে শিউশরণের বুকের পাটার।

রাস্তায় ভিড় জমে।

একমিনিট লাগল ভাবতে জমাদারের। বেতপ গলায় বলল, ‘চোরের সঙ্গে হাত সাফাই করে মেজাজ দেখানোর মজাটা কি এখনি টের পাইয়ে দিচ্ছি—তোর ঘর তলাস করব...’

ঠুং। একটা রিক্সা এসে দাঁড়াল। সাহেব বাগানের মনিব ছোট্টে সিং। পাকা আম। গিলে করা পাঞ্জাবী। উগ্র আতরের গন্ধ।

‘কেমন আছে খেদার?’

‘ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।’ ভিড় করা কুলিরা সমস্বরে বলল। এবার সাহস হয়েছে তাদের। দেখে থাক মনিব, জমাদাররা কিভাবে জুলাম করে তাদের ওপর। ছোট্টে সিং ক্র কোঁচকালো, ‘বেটারা পয়সার লোভে যা খুশি করবে আর আমরা তার ঝুঁকি সামলাব! গাড়ী উল্টে গিয়ে ভেঙেচুরে গেল, তার বেলা কিছু নয়। অর্থম হয়েছে কুলি সেটা আমার অপরাধ। আমি খেদারত দেব—দানছত্র খুলেছি—’

সকালে খুব ক্ষেপিয়েছে তাদের শরতানগুলো। সব শুনেছি সর্দারের মুখে।’

জমাদার বলল, ‘ঠিক বলেছেন বাবু সাহেব।’

ক্র কুচকে তাকালো ছোট্টে সিং।

‘আমি এই ধানার জমাদার। নতুন এসেছি।’

মনিব্যাগ খুলল ছোট্টে সিং। চোখ ছোট করে একটা চকচকে টাকা বের করল। ‘পান সিগারেট খেও।’ বলেই ছুঁড়ল টাকাটা জমাদারের দিকে। হাত কসকে ঠিকরে পড়ল টাকাটা রাস্তায়। গড়িয়ে চলল। তিনখান দেহ নিয়ে ছুটল জমাদার। টাল সামলাতে কয়েক পাক ঘুরল। উঠিয়ে নিল টাকাটা রাস্তা থেকে।

হো হো করে হেসে উঠল ছোট্টে সিং।

‘একদিন যেও আমার কারখানায়। এখন ব্যস্ত আছি।’

‘জী হুজুর।’ সেলাম ঠুকে বিদায় হল জমাদার। চুনোপু টিঙলো হাতে রইল। চার ঘুলিয়ে এখন লাভ নেই।

শিউশরণ বিরস মুখে বলল, ‘ও লোকগো লালচ আপলোক বাড়ি দেতা হায়।’

‘তুই খাম হতভাগা। তোর বুদ্ধি নিয়ে আমার কাজ করতে হবে?’ ধমকে ওঠে ছোট্টে সিং। সুগন্ধি লালচে থুহু ছিটকে আসে শিউশরণের মুখে।

চুপসে যায় শিউশরণ।

‘বাঁচবে তো খেদারু?’

‘বড়া ভারী জখম হায় বাবুসাহেব। বহুৎ খুন গিরা মুখসে’ ভিড়-করা কুলিরা আবার সমস্তরে বলল।

‘যেমন লোভ তেমন শাস্তি। লোভের মা-বাপ নেই!’

উঠে দাঁড়ালো ছোট্টে সিং। না, ভয় পাবার কিছু নেই। সর্দারের কথা শুনে অবিশ্বাস বুক ধড়ফড় করে উঠেছিল। সব নাকি একজোটে হয়েছে। ধর্মঘট করবে। চিকিৎসার খরচ মনিবকে বইতে হবে এই ছিল কুলিদের দাবী। সকাল থেকে কারা ক্ষেপিয়ে গেছে নাকি ওদের। না ভয় পাবার কিছুই নেই।

ঠুং---

ছুটল রিক্সা। বাড়ি কাত করল ছোট্টে সিং হিলানে। ডিবে খুলে দুটো পান এক সঙ্গে গালে পুরল। এ-সর্দারকে বরখাস্ত করতে হবে। কুলিদের মুঠিতে রাখতে পারার কৌশল যার জানা নেই, কী কাজ হবে তাকে দিয়ে।

রাতকুলিদের আড্ডা আজ আর তেমন জমল না।

মাথাটা ঝিম ঝিম করে। সকাল সকাল খেয়ে আর একবার ঘুমবার চেষ্টা করল সে। কিছুতেই ঘুম আসে না। কাল রাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা চাঙ্গা দিয়ে ওঠে। মদে ডুবে সে ভুলতে চেয়েছিল সব। তা আর হল না। কোন লাভ হল না। কোন লাভ হল না মদ খেয়ে। খাড়ি বেজিটা সকালে জ্বালাতন করতে আসবে কে ভেবেছিল?

কাল রাতে বাজারের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। মাসের শেষ। ছাপোষাভ্রলোকদের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। কাপ্তেনবাবুদের পকেটও গড়ের মাঠ। পাদানিতে বসে চঞ্চল হয়ে তাকাচ্ছিল সে চারপাশে। লোকের হাঁটার ধরন দেখে, চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারে রিক্সা চাই।

পেছনে হেঁড়ে গলার আওয়াজে চমকে উঠেছিল, ‘চোল—’

‘গাড়ী জখম হায় জমাদার সাহেব।’

‘চো—চো—’

‘দেখিয়ে ঘোড়া টুট গিয়া—’

‘চো-চো ডাকু শালে—’

‘গাড়ী টুটনেসে হমু দায়ী নেহি। জখম হোগা আপ—’

একটা বন্ধা, ‘আসামী যদি ছুট যার তোর মাথা চিবিয়ে ধাব উল্ল—চো—’

মুখ হাঁড়ি করে উঠিয়ে নেয় কমপাশ শিউশরণ। কখন ছাড়বে তার ঠিক নেই। একটি পরসাত দেবে না শুধু বেগার খাটো।

ঠুং ঠুং ঠুং...

ছুটতে ছুটতে সে বলে, ‘বউনি হয়নি জমাদার সাহেব।’

‘তোরা কামাই হয়নি, আমার কিসের মাথা ব্যথা রে উল্ল!’

একটা বস্তির সামনে এসে থামে সে। প্রকাণ্ড বস্তি। এলোমেলো খাপছাড়া সব ধুপরি। মাঝে মাঝে কাঁচা নর্দমা। মানুষের চিড়িয়াখানা।

গাড়ী থেকে নেমে জমাদার বলে, ‘এখনি ফিরব, খাড়া থাকবি।’

‘গাড়ী মচমচাতা ছায়—দেখিয়ে—’

খাপড় মেরে আদর করে বলে জমাদার, ‘আচ্ছা, কুছ মিলি তোরা, কামাই যব হো যাব্বেগা বস্তিমে।

বসে বসে কিমুচ্ছিল সে। আজ আর রেহাই নেই। কত হুঁস রাখা যায়!

‘এই রিক্সা চলো—জোরসে—’

লাফিয়ে এসে বসল একটা লোক রিক্সায়। অভ্যাস মত কমপাশ তুলে সে ছুঁটল। চেপে বসে বকসিসের লোভ দেখালো সোয়ারী। যে রেসের ঘোড়ার পা—উখাও, উখাও, এ-তল্লাট পেরিয়ে গেল সে

ভাড়া মিলল, বকসিস মিলল। তবু চাক্ষু হলে ওঠে না মন। চুকল সে মদের দোকানে। তারপর টলতে টলতে বাসায় ফিরেছে।

গাঢ় ঘুম নেমে আসছে। আঠার মত ঐটে যাচ্ছে চোখের পাতা। দুপুর গড়িয়ে গেল।

বিকেল জোড়দার জোড়ে জোড়ে ধাক্কা দিল বার কয়েক। বেছস সে।

বিকেল গেল, সন্ধ্যা হল, রাতের ছায়া নেমে এসে।

‘ঘুম তার ভাঙ্গল না। বহুদিনের ক্লান্তি নিঃশব্দে শুয়ে নিচ্ছে ঘুম।

কপাল কেটে গেছে। নাক দিয়ে গড়িয়ে আসছে রক্ত। ভিজে জামা ফালা ফালা। ধুকতে ধুকতে বাসায় ফিরে এসে শিউশরণ।

রাত দশটা। মুসলধারে বস্তির আরম্ভ হয়েছিল সন্ধ্যা থেকে। এখনো বিরাম নেই, গতি কিছুটা মন্দর।

বাসার লোক চোঁচিয়ে উঠল, ‘কে মারলে? কি হয়েছিল?’

‘সোয়ারী।’

‘কেন?’

ওদের মধ্যে এসে বসল শিউশরণ। জমজমাট আড্ডা। দেশ থেকে রামতর এসেছে। তার সঙ্গে নাচের দল। হারমোনিয়ম, ঢোল, খড়ুনি, বাঁশী। মাথায় কাঁকড়া কাঁকড়া চুল

রামতরের। আমুল বদলে গেছে রামতর। তিনবছর আগে রিক্সা চালাত সে। সেই বেসে দেশে গেলি, আর ফেরিনি। গঙ্গা ভালো ছিল ওর। বেশ মিষ্টি মেয়েলী গলা। দেশে গিয়ে নাচের দলে ঢুকেছে। অবাক হয়ে দেখে শিউশরণ।

‘নমস্ते শিউশরণ ভাই।’ হাত জোড় করে রামতর।

‘নমস্ते!’ শিউশরণ তাক্সব হয়, আগাগোড়া চাল বদলে গেছে রামতরের, খুব ভদ্র হয়েছে।

আবার প্রশ্ন উঠল, ‘কে মারলে?’

বলল শিউশরণ তার বেইজ্ঞতের কাহিনী। এ-তো জানা কথা বৃষ্টির সময় ভাড়ার বেট একটু বেশিই হয়। এইটুকু লাভের আশা আছে বলেই মুমলধারে বৃষ্টির মধ্যেও বোড়ার মত ছোট্টে তারা। তার থকল সহিতে হয়। বৃষ্টির সময় জর বোখার লেগেই আছে। তখন দেখবে কে? ধোয়াকির খরচ দলের সবাই পালা করে ছ’চার দিন চালিয়ে দিতে পারে। অসুখে কে দেখবে, কে খরচ দেবে? শহরে অসুখের খরচ ত অনেক। আট আনার ভাড়া, চেয়েছিল বার আনা। খুব মিষ্টি কথা সোয়ারী, এক কথায় রাজী। কিন্তু গলির মধ্যে বাড়ির দরজায় নেমে ছ’ আনা দিয়ে অনুগ্ৰহ হয়ে গেল।

তাই নিয়ে সে হাঁক-ডাক করেছে। প্রথমে কাকুতি মিনতি। কোন ফল হয়নি। শেষে ছ’চারটে কড়া কথা সে শুনিয়েছে। শীতে কাঁপছিল সে ঠকঠক করে।

তেতে এল সোয়ারী। পাড়ার আরো ছ’চার জন ভদ্রলোক জুটল।

‘জুলুম বাজির জায়গা পাওনি—শুয়ার!’ কিল চড় ঘুসি। বৃষ্টির মত মুমলধারে জুঁসে এল।

রামতর বলল, ‘এ বড়াভারী জুলুম কী বাত—’

হালফিল দেশের খবর বলে চলল রামতর। উঠে যাচ্ছে জমিদারী, বড়লোকদের সে দেমাক নেই, তারা চায় না চর্চাতে আর প্রজাদের। বলতে বলতে গর্বে আনন্দে হাসতে লাগল রামতর।

শিউশরণ ভুলে গেল তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কপালের কাটা দাগটা হাঁ হয়ে আছে। অবাক হয়ে শুনতে লাগল দেশের কথা। লোভী কুকুরের মত চকচক করে তার চোখ। চারবছর দেশে যায়নি শিউশরণ। হাওড়া স্টেশনে ভাড়া নিয়ে গেলে দেশের অন্তে মন কেমন করে ওঠে। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় দেশের গাড়ী ছাড়ে এখান থেকে। আজ সকালের গাড়ী কাল সকালে পৌঁছবে মোকামাঘাট। তারপর জাহাজে গঙ্গা পেরিয়ে সমস্তিপুর। আবার রেল। তারপর গাঁয়ের হাওয়ার এই ধুলো ধোঁয়া ভরা শহরের সব ক্লাস্তি মুছে যাবে।

স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে রেলের বাঁশী শুনতে খাড়া হয়ে ওঠে ছোয়। দেহের সব গ্রাস্থ শিথিল হয়ে যায় বাঁশীর আওয়াজে। ভেতরটা ছুঁ করে। কেমন চোখে বল এসে পড়ে। ভাবতে ভাবতে অভ্যাস মত হুঁহুঃ বন্টি বাজাতে বাজাতে হাওড়া ব্রীজের মাঝে এসে পড়লে আরো উদ্দাম হয়ে যায় মন। মোকামাঘাটেও এমনি হাওয়ার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে কি ভালোই লাগে!

‘নাক মুখ ধুয়ে আর শিউশরণ। ঘাস চিবিয়ে কপালে লাগিয়ে দে।’ কে বলল পাশ থেকে।

উঠতে হল শিউশরণকে।

তারপর দেশের গল্লে গল্লে রাত গভীর হল।

নাকের যন্ত্রণা টের পেল সে রাত্রে। অসহ্য যন্ত্রণা। ভেতরটা দপদপ করছে। ঝাঁঝির ডাকের মত দমকে দমকে বেদনা কমছে, বাড়ছে।

ঘুম এল না চোখে।

তার পাশে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে কেউ কেউ চোঁচিয়ে উঠছে। উত্তেজিত অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ দিচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে।

জেগে থেকে চারবছর আগেকার এক দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল শিউশরণ। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে তাকে সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। এই বুঝি ধরা পড়ল। ধরা পড়লে বন্ধা নেই। অথচ ধরা একদিন পড়তেই হবে। তখন—

বিভীষিকার মত তাড়া করে আসে সেই দুঃস্বপ্ন।

টেলিগ্রামটা হাতের মুঠিতে। কাঁপছে সে। দেশে বোয়ের বাড়াবাড়ি অসুখ, তার পেলেই যেন চলে আসে শিউশরণ।

‘রামতর ভাই!’

‘কি খবর রে?’

‘তার আয়া দেশসে। বহুকা বেমার।’

‘দেশে যাবি তাহলে?’

‘যাব তো, মনিব ছাড়তে চাইলে হয়!’

ক’মাস গাড়ী চলাচ্ছিস?’

‘দশ মাস।’

বড়ে মিন্নার খাটালে দশ মাস কাটল তার। খুব ভারী মনিব বড়ে মিন্না। স্বনামে বেনামে পাঁচশো গাড়ী। খাটালের ছোট ছোট খুপরি মোমাছির মত সব সময় গুনগুন করছে।

‘তবে তো বকসিস পাবি।’

‘ছাই। কার্জ নিয়েছিলুম তিন কুড়ি টাকা। ছাড়লে হয়—’

রামতরকে সঙ্গে নিয়ে এল সে খাটালে। তদারক সেরে উঠতে বড়োমিন্না টেলিগ্রামটা সে দিল হাতে।

চোখ বুলিয়ে বড়ে মিন্না ক্রোধে উঠল, ‘যত সব বুজঝুঁকি।’

‘নেহি জানেসে বাবু—’ কথা জড়িয়ে যার শিউশরণের।

‘তুই গেলেই বোয়ের বেমার সেরে যাবে? ভগবানকে ডাক। টাকা দিচ্ছি দেশে পাঠিয়ে দে।’

মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে শিউশরণ। সত্যি টাকা পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

দেশে যাবার খরচও তো কম নয় । নগদ টাকাও কিছু চাই সঙ্গে ! কয়েক মিনিট দোঙ্গা খায় মনটা ।

‘বাবুসাহেব হমকো যানেই হোগা—’

‘যানেই হোগা’ সর্দার মুখ ভেংচাল, ‘এসে কি বলেছিলি পুরো দু-সাল গাড়ী চালাব । কর্জের টাকা কে শুধবে ?’

‘কত বয়স তোর বোয়ের ?’ ঠোঁট রসিয়ে ওঠে বড়েমিয়ার ।

সর্দার, মিস্ত্রীর দল, আর আর কুলি, বড়েমিয়া নিজে হেসে উঠল ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে আসে ওরা ।

‘পালা ?’ হাঁটতে হাঁটতে বলল রামতর ।

‘তারপর ?’ চমকে উঠল শিউশুরণ ।

‘আর আসবি না ।’

কি বলছে রামতর, মাথা ধারাপ হল নাকি ? হেসে ফেলল শিউশুরণ, ‘দেশে থাক কী ?’

‘তোর জমিন ক’বিঘা ?’ ঘরের খবর জানতে চায় রামতর ।

‘এক বিঘে ।’ চুপচাপ হাঁটে দু’জনে ।

‘পালা ।’

কিরে এসে দাঁড়াব কেমন করে মনিবের কাছে । কর্জের টাকা বেড়ে বেড়ে অনেক হবে ।’

‘অন্ত মনিবের গাড়ী চালাবি ।’

‘বাপরে !’ আবার হেসে ওঠে শিউশুরণ ।

‘তবে চটকলে কাজ করবি, জোগাড় খাটবি ।’

‘কলকাতায় পা দিয়েই তো পাওয়া যাবে না ও-কাজ । যতদিন বসে থাকব ধোঁরাকী চালাবে কে ? নতুন কোন নেশায় আর মন বসে না ।’

‘তবে ছেড়ে দে বোয়ের আশা । মালিকের কথা মত গাড়ী চালা । সর্দারকে খুশি রাখ ।’

কোন জবাব দেয় না শিউশুরণ । শোকের দ্বিতীয় অবস্থা যেন শুরু হয়েছে । মন ক্রমশই দমে যাচ্ছে । সহজে তার আসে না দেশ থেকে । গিয়ে কি দেখবে কে জানে । টিপ টিপ করে বুক ।

‘বড় মনিবদের গাড়ী চালানোর ঠেলা বোঝ । খাটালে থাকার ভাড়া লাগে না, দেশে যাবার সময় বকসিস মেলে, ধার পাওয়া যায় । কিন্তু চাবুক হাতে থাকে ওদের ।’

কারোকে না জানিয়ে সে পালিয়ে গেছিল শেষপর্যন্ত । আবার কিরতে হয়েছে । ক্ষুদ্রে মনিবের গাড়ী চালাচ্ছে । ধার পাওয়ার লোভ সংবরণ করেছে । উত্তর ক’লকাতা থেকে চলে এসেছে দক্ষিণ ক’লকাতা । কয়েকবার ধরা পড়তেপড়তে কপাস ঘোরে বেঁচে গেছে ।

কত সতর্ক থাকতে পারে মানুষ । মরিয়া হয়ে ভেবেছে কতবার স্বৈচ্ছায় ধরা দেবে

সে। প্রাণপণে খেটে কর্জের টাকা শোধ করে দেবে। শোধ যে আর হতে চায় না—দেশের অভাব অভিযোগের চিঠি এসে মাথা খারাপ করে দেয়।

ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল শিউশরণ। ঘুম ভাঙল যখন, চারদিকে রোদ ঝিকমিক করছে। রামতরকে ঘিরে রাত কুলিদের মজলিস বসেছে।

ফোলা ফোলা চোখ মুখ নিয়ে ওদের পাশে এসে বসল শিউশরণ। মাথা ঘুরছে। দেহে এতটুকু বল নেই। মন দিয়ে শুনস সে ওদের কথা। কিছুই ভাল লাগে না। ঘরে এসে মুড়ি দিয়ে শুল। আবার নাকে যন্ত্রণা হচ্ছে।

একা, বড় একা সে।

এবারও খাটতে এসেছে রামতর। নাচের দল নিয়ে সে ঘুরবে চটকলগুলোতে। সব জায়গায় দেশের লোক আছে। পয়সা রোজগার তো হবেই, কত খাতির পাবে রামতররা। ক’দিন এখানে বিনা পরসায় নাচ গান করে তল্লি খুটিয়ে ফেলল রামতর।

প্রথমে ওরা যাবে চাক্কাইলের চটকলে। হাওড়া স্টেশনে ওদের পৌঁছে দিতে গেল শিউশরণ। সারাটা পথ দেশের গল্প করতে করতে চলল। এক কথা হাজারবার জিগগেস করল। তার নিজের গাঁ, পাশাপাশি আর আর গাঁয়ের সুখদুঃখের কথা খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চায়। কোন লাভ নেই এত সব খবরে। তবু কেমন ভালো লাগে।

‘এবার চ’ আমার সঙ্গে দেশে।’ রামতর বলল।

শিউশরণ বলল, ‘এখন নয়। কর্জের টাকা শোধ হয়নি। এখানে কিস্তিওয়ালার ধার আছে। ধার না করে উপায় ছিল না।’

‘রামতর হাসল, বলল, ‘কোন দিন শোধ হবে না ধার। দেশে যদি যেতিস আর আসতে ইচ্ছা হত না।’

তা জানে সে। কেমন হিংসা হয় শিউশরণের। রামতরের মত তারো যদি মিষ্টি গলা থাকত! শুধু খাটতে পারে সে ঘোড়ার মতন, আর কোন গুণ নেই। কিন্তু খাটতে পারাটাই কি একটা গুণ নয়। শহরে বৃষ্টির জল নর্দমা দিয়ে বয়ে যায়, কোন কাজেই লাগে না। তার পরিশ্রমও তেমনি। শহরে অকাজে ঝরে যাচ্ছে। পাঁচ বিঘে জমি থাকত যদি তার, এই খাটুনিতেই স্বর্গ বানিয়ে দিত। নিজের শক্ত পেশীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে দৃঢ় স্বরে বলে, পারত, পারত সে।

ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মনমরা হয়ে আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে ফিরছিল সে। বড়বাজারের সন্ধিমুখে এসে থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় ভিড়। একটা রিক্সা উণ্টে গেছে। মুখ বাড়াল শিউশরণ ভিড়ের মধ্যে। বাড়ি গুঁজে পড়ে আছে রিক্সাওয়াল। গল গল করে রক্ত বেড়িয়ে আসছে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে।

‘বৈচে আছে?’ পাশের লোককে জিগগেস করে শিউশরণ।

‘না, মরে গেছে ।’

চোখ ভরে দেখতে লাগল সে । ভর যোয়ান কুলি । কেমন করে মরল রিক্সার উন্টে ষাওয়া অবস্থা দেখে আশ্চর্য করবার চেষ্টা করছিল শিউশরণ ।

‘কি রে, দেশ থেকে আসছিস ?’ গারে হাত পড়ল তার ।

মুখ ফেরাতেই শিউশরণের গারে কাঁটা দিয়ে উঠল । মুহূর্তে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল তার মুখ । বড়েমিয়ার সর্দার । যেন কত আপ্যায়িত হয়েছে এমনভাবে হাত চেপে আছে তার ।

‘কেইসে মরা ?’ সহজ গলায় বসল শিউশরণ ।

‘কলিজা ফাট গিয়া । শালা এক নম্বর বুদ্ধ ।’

‘নয়া কুলি ?’

‘হ্যাঁ । খেয়াল নেহি সামনে লাল বাতি । ঝটসে ঠার গিয়া, দম ফেললে নেহি সকা, চোট লাগ গিয়া ছাতি—বাসু !’

‘আপকা কুলি ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘কোই বন্দোবস্ত কিজিয়ে ।’

‘খতম হো গিয়া, কেয়া বন্দোবস্ত কদেগা । বকসিসকা লাসচমে সোয়ারী আউর ডাঁইসে মাল লে কর তুফান গাড়ীকা মাকিক ছুটতা থা । আতি চিনাই দেনেসে পুলিশ হুকুম করেকা । আও—’

শিউশরণের হাত ধরে একটা খাবারের দোকানে এসে উঠল সর্দার । কি খাবে শিউশরণ, বিদেয় পেট তার চিঁ চিঁ করছে নিশ্চয় । কাল কখন বেরিয়েছে দেশ থেকে ? কি সমাচার দেশের ? বালবাচ্চা ভালো আছে তো ?

জোয়ালে জোতার আগে গোয়ার বলদকে যেমন ষাওয়ানো হয়, তেমনি বড় করে ষাওয়াতে লাগল সর্দার শিউশরণকে ।

রিক্সা গাড়ী চালানো ছাড়া আর কোন পেশাই বা ধরবে সে ? কী এক নেশা আছে এ-পেশায় । আর রিক্সাই যদি চালাতে হয়, বড়েমিয়াকে অস্বীকার করা যাবে না তার । সর্দারের সাথে ছোট্ট সিংএর মত সব হাত ধরা বড়েমিয়ার ।

‘আধা পোয়া জিলিবি লে ।’

আপত্তি করে না শিউশরণ । মনের মধ্যে প্রাণপণে কে যেন ছটফট করছে, আর ছটফটানি বন্ধ করার অন্তে মুখ চেপে চেপে ধরছে সে তার ।

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা । ভয়ানক ষামতে শুরু করল সে ।

ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক ভূমিকা

বৈদ্যনাথ ঘোষ

শুধা-মানবের শিল্পসৃষ্টির নমুনা তাদের হস্তচালনাকৌশলের হৃদিশ মিললেও তাদের কণ্ঠ কৌশলের কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া সম্ভব নয়। ধ্বনিকে স্থায়িত্ব দেবার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। তাই যতদিন না মানুষ স্বরের উঁচু-নিচু প্রকাশ করার জন্যে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলো, ততদিন তার সংগীতের ধারা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারলো না; অবশ্য এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছিল ভারতে অণু উপায়ে, এক পুরুষানুক্রমিক ধারার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সেটা অনেক অর্বাচীন কালে। আদি মানবের সংগীত কল্পনার স্থির করা ছাড়া উপায় নেই।

ভাষার পূর্বে শব্দ : ভয়ের শব্দ, আনন্দের শব্দ, দুঃখের শব্দ, ক্রোধের শব্দ, এই নিয়েই শুরু হলো আদি-মানুষের ভাবপ্রকাশের সৃচনা। এ কথা অনুমান করা চ'লতে পারে। বন্যজন্তু তাড়িয়ে দেবার জন্যে কোন বস্তুতে বস্তুতে আঘাতজনিত শব্দভেরী তার মনের কল্পনাকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছে হয়তো বাতাসের আবিষ্কারের দিকে। মৃত পশুর শুক ওস্ত্রীর ওপর খেলার-ছলে টান মারতে গিয়ে হয়তো এমন ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হলো যার প্রলোভনে আদি-মানব অবসর সময় সেই ধ্বনি বারে বারে শোনার জন্যে, শোনার জন্যে, কৌশল আবিষ্কার করতে শুরু করলো।

বন্যজন্তুর গর্জন শুনে, নিজেকে সেই জন্তুর সমতুল্য করার ইচ্ছায় হয়তো বা সেই শব্দ অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে। প্রভাতপ্রকৃতির মাধুর্যে বিভোর হয়ে পাখীর ডাকের অনুকরণে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য পরমানন্দে উপভোগ করেছে। মৃত পশুর শুক চর্মের ওপর আঘাত দিয়ে অঙ্গবাস করার সময় হয় তো আবিষ্কার করেছে ছন্দমাধুর্য; সমতার মধ্যে পেয়েছে আঘাতের ছন্দবদ্ধ অনুপ্রেরণা। সেই ছন্দের আঘাতে প্রকাশ করেছে তার মনের আনন্দ ধ্বনির সাহায্যে, তার সারা দেহে সেই আনন্দের প্রকাশ করতে গিয়ে আদি নৃত্যের ভঙ্গিমা জেগে উঠেছে; দৈনন্দিন জীবনের যে সব আনন্দময় মুহূর্ত তাদের মনে গাঢ় ভাবে ছাপ দিয়েছে সেইসব মানবিক প্রবৃত্তিগুলির সার্থক অনুকরণ করার মধ্যে তারা আনন্দলাভ করেছে।

সুর, ছন্দ, নৃত্য, জন্ম নিয়েছে আদি-মানবকে এইভাবেই হয়তো। আজও তাই অনেক আদি-মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এইজাতীয় সংগীতের সন্ধান মেলে। সুরের মধ্যে মেলে ভয় ও আনন্দের ইঙ্গিত, নৃত্যের মধ্যে আনন্দ ও যৌনচেতনায় ভঙ্গি, ছন্দের মধ্যে সরল সাম্য। তখন থেকেই সুর ছন্দ নৃত্য ভিনে মিলে সংগীতের সামগ্রিক রূপ মানবসমাজে প্রচলিত হয়েছে।

সংগীত ইতিহাসের গোড়ার কথা সবদেশে প্রায় একই বন্দা চলে। শুধু ভাষার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, ভাষা এতে যোগ দিয়েছে ভাবপ্রকাশের সহজ পন্থা হিসাবে ; যুধভঙ্গি ভাষা ব্যবহারে হয়েছে আরো প্রকাশধর্মী। ভাষার ওপর সুর বসাতে সময় লেগেছে অনেক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ; প্রথম প্রথম হয়তো ভাষা উচ্চারণ করা হয়েছে কথার মত, তারপর বলার কথা শেষ হলে দু'একটা পর্দার ওপর স্বরবিন্যাস ক'রে আনন্দ বা ভয় প্রকাশ করা হয়েছে বাস্তব ও নৃত্যের সহযোগে। এককথায় ভাষা সুর ছন্দ নৃত্য সবই পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাত্রা শুরু করেছে সেকালে।

আদি মানব গোষ্ঠীর সংগীত সম্বন্ধে এ ছাড়া সঠিক কিছু বলা যায় না। চিত্রকলার মত তার কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন মেলে না। পশুপক্ষীর ডাকের সঙ্গে সুরসম্পদের বা গ্রামের সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থকারগণ এইটুকু বলা যেতে পারে।

ক্রম-বিকাশের ধারায় যৌনবোধ, আনন্দ, ভয় এই কটি মূখ্য ভাব প্রকাশের পন্থা হিসাবের সংগীতের বিকাশ। ক্রমে অত্যাগত ভাবপ্রকাশের আধার হ'য়ে উঠলো সংগীত ; শিক্ষা ও সভ্যতা এবং শ্রেণী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষমানবদের বুদ্ধির প্রয়োগ শুরু হলো সংগীতে। পুরোহিতশ্রেণী সংগীতের সাহায্যে তাদের দার্শনিক মতবাদ প্রচারে উৎসাহি হয়ে উঠল। স্বরস্থান নিয়ে তখন থেকেই মানবের মনে একটা সঠিক কৌশল আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এমন অনুমান করা চলে।

পণ্ডিতদের বিশ্বাস ভারতে সামবেদ সংগীতআকারে ছিল। চীন দেশে খৃঃ পূর্ব ২৭০০ শতকের সময়ে সংগীতের নজির মেলে। গ্রীকদেশে প্যাথাগোরাস প্রথম স্বরগ্রাম সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। পরের যুগে গুইদো ডি এরেস্জো নামক একজন ইতালীয় কঙ্গাবিদ এসে সুরগ্রাম শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ বিশেষ Syllables-এর মাধ্যমে যথা Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, এই সংগীত শিক্ষকের কাল হচ্ছে ১০৫০ খৃঃ। ছটিমাত্র স্বরস্থান নির্ণয় ক'রে ইনি ইউরোপে প্রসিদ্ধ হলেন।

খৃঃ পূর্ব ৩০০ শতকেরও পূর্বে ভারতযুনির নাট্যশাস্ত্র সংগীত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ একথা প্রমাণিত হয়ে আসছে। জয়দেব, লোচন কবি প্রভৃতির সংগীতে গভীর জ্ঞান সে-যুগের বিশ্বয় স্তম্ভ। শুধু আট, রে, মি, ফা, সোল, লা নয়, শ্রুতিস্থান সূক্ষ্মতম স্বরস্থানের সাহায্যে বিভিন্ন মেলোডি সৃষ্টির হুঁশ দিয়ে গেছেন, নাট্যশাস্ত্রের পর সংগীতরত্নাকর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি শাস্ত্রদেব কৃত।

ভারতীয় সংগীতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সবে শুরু হয়েছে ; অনেক ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের সংগীতশাস্ত্রগুলি নিয়ে গভীর গবেষণা করছেন। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র আলোচনার বিশ্বয়কর ক্ষমতা দেখিয়েছেন চতুর পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে ; তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থগুলি উত্তর ভারতীয় সংগীতকে নানা বিকৃতি, ও আঙ্গবিলুপ্তি থেকে রক্ষা করবে আগামী যুগে। ভারতযুনি, ও লোচনকবির কাঙ্গনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্রান্ত ছিল না বলেই কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লোচন কবি সংক্রান্ত কাল নির্ণয় করেছেন। লোচন কবি বল্লাল সেনের আমলের লোক ছিলেন, ১০৮২ শকাব্দ ১১৬০ খৃঃ দি. এইচ, বাগাডে নামক পুণার পণ্ডিত ও শব্দবিজ্ঞানী ভরতযুনির কালনির্ণয় করেছেন ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বেরও আগে। ভরত-যুনির ঋতি গ্রাম মুচ্ছ'ণা সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি বলছেন,—the foundations of the Physics of Indian music were well and truly laid by the time of Bharata. এ-সময় ইউরোপীয় সংগীত প্রায় folk music-এর পর্যায় ছিল।

রামায়ণে, মহাভারতে, বিভিন্ন পুরাণে নানাবিধ বাস্তবস্ত্রের সন্ধান মেলে; অজস্তা, সাঁচীর স্থাপত্যের মধ্যে অনেক রকম বাস্তবস্ত্রের নিদর্শন পাই; অতি সাধারণ জিনিস যেমন বাঁশ কাঠ মাটি লাউ তাঁত ইত্যাদি দিয়ে বাস্তবস্ত্র প্রস্তুত করার পদ্ধতি আজও চলিত রয়েছে। অতিপ্রাচীন বাস্তবস্ত্র আজও দক্ষিণ ভারতে লোকপ্রিয় হয়ে আছে। বহু পণ্ডিত মনে করেন, অনেক পাশ্চাত্য বাস্তবস্ত্রের বিকাশ হয়েছে ভারতীয় বাস্তবস্ত্রের নমুনার তথ্য আর্ন বাস্তবস্ত্রের অনুরূপে। পারস্যদেশে কানুন নামে এক যন্ত্র আজও ব্যবহার হয় যা কাত্যারন বীণা বা শততন্ত্রী বীণার থেকে উৎপত্তি এবং যা মধ্যযুগে তাঁতের বদলে তার লাগিয়ে বাজানো হতো দুটি ছড়ি দিয়ে এবং এই জিনিসই পশ্চিমে 'Dulcimer' নামে খ্যাতনামা যন্ত্রের বিকাশ ঘটানো এবং পরে এইপদ্ধতি ইউরোপীয়দের পৌঁছে দিলে জটিল বাস্তবস্ত্র Pianoforte প্রস্তুতের দিকে। এর জন্যে ভারত গর্ব বোধ করার অধিকারী। রবাব নামে আর এক যন্ত্র তৎকালে প্রচলিত যা Relec নামে ইউরোপে জনপ্রিয় ছিল। এই যন্ত্র মুর-রা স্পেনে নিয়ে গেছিলো যা তারা পেয়েছিল পারস্য থেকে আরব থেকে এরও সেই আর্ন সংগীতে উৎপত্তি; পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থ অনুসারে এটি একপ্রকার বীণা। আজও উত্তর ভারতে ও আফগানিস্থানে এর সাক্ষাৎ মিলবে। আধুনিক ভারত, ভারতীয়ের পূর্বপুরুষ হিসাবে গণ্য। বহু প্রাচীন কাল থেকে বাজালে, বাজাল-সারেঙ্গী হয়তো আদি-মানব গোষ্ঠীর নিশানা বহন করে আসছে। রবাব ভারতীয় এর উত্তরপুরুষ হতে পারে কি-না বিচার্য বিষয়। ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বাস্তবস্ত্রের নমুনা মেলে, বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, জাভায় গুপ্ত যুগের সমতুল্য বাস্তবস্ত্রের প্রমাণ মেলে। খুব প্রাচীন বীণার সাতটি তার লাগানো থাকতো নাম ছিল সপ্ততন্ত্রী বীণা। এই বীণা সারা প্রাচীন ছনিয়ায় একই রকমের দেখতে পাওয়া যায়। ইজিপ্টেও এই বীণার নাম ছিল বীন্। হারপ, এই বীণার অপর নাম মাত্র। এই বীণা পরের যুগে বাইশ তারের সুর মণ্ডল নামে বাইশ ঋতির বাহন হয়ে ভারতীয় সংগীতবিদ্যার মান আরো উচ্চ স্তরে নিয়ে গেছে। এ-ছাড়া পুরানো নজিরে গিটার ধরনের এক প্রকার বীণা প্রকাশিত ছিল যা সরস্বতীর হাতে শোভা পেতো। এই বীণা জাপানেও অষ্টম শতাব্দীতে দেখা যায় যার নাম জাপানীতে বিউয়া। মৃদঙ্গ অতি সাবেক কালের যন্ত্র। হিন্দুস্তি ঢাকা ইত্যাদি জাতীয় যন্ত্র হয়তো আদিম মানব গোষ্ঠীর সাক্ষ্য বহন করে আসছে। ইজিপ্টে কোণারকে মৃদঙ্গ কাঁধে নারীমূর্তির নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গী যেন প্রাচীন ছনিয়াকে একই ভাবে বিস্তার করেছিল! ইজিপ্ট, অজস্তা, উদয়গিরি, খাভা,

জাপান পারস্য আরব চীন সর্বত্র বাঁণী বাঁশী মৃদঙ্গ যেন ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখে ছিল! কি ক'রে? এর মূলে কি আদিম মানবগোষ্ঠীর রসসৃষ্টি লুকিয়ে নেই?

ভারতবর্ষে লোক সংগীত প্রায় সর্বত্র একই প্রকারের। এ ব্যাপ্তার কোন কোন পণ্ডিত যাচাই ক'রে দেখেছেন। যন্ত্রের ব্যবহারও প্রায় একই প্রকারের দেখা যাচ্ছে। সরল সুরে ছন্দের মধ্যে, বাক্যের সাহায্যে এবং অধিকাংশক্ষেত্রে দৈহিক অঙ্গভঙ্গী সহযোগে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয়বিধ সুরবিজ্ঞাসের মধ্যে এই সংগীত প্রচলিত। এই সংগীত ক্রমবিকাশের দ্বারা বহন ক'রে যখন বৈদিক সময়ে পৌঁছলো তখনও তার আদিম রূপ নিশ্চয় ছিল। বেদের স্তোত্র সংগীতের মাধ্যমে প্রচারিত হতো এ কথা সব পণ্ডিতই মেনে থাকেন কিন্তু কি সেই সুর তার হৃদিশ্ মেলে না পুরোপুরি। বেদগান সামগান আজও প্রচলিত ভারতীয় সমাজে, কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন এই গায়নপদ্ধতি ছনিয়ায় সর্বপ্রাচীন সংগীতের নিদর্শন বহন করে এনেছে আজকের দরবারে। আচিক, গথিক, সামিক প্রভৃতি পদ্ধতিতে গীত। মানে এক সুরে, দুই সুরে, তিন সুরে গাওয়া আধুনিক বেদগান প্রাচীনকালের সুরবিজ্ঞাসের সন্ধান মিলিয়ে দিচ্ছে ব'লে অনেক পণ্ডিত নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন।

এর পর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আমরা পাই চর্যাগীতিগুলি; চর্যাগীতির ৫০টি গান ১০টি রাগে গাওয়া হতো; এই সব রাগ বাংলার দেশী রাগ তথা বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি এ-কথা আলোচনা করার অপেক্ষা রাখে। অবশ্য সবগুলি রাগ এই পর্যায় পড়বে না তবে আমার মনে হয় বেশির ভাগ রাগই বাংলার প্রচলিত আদিরাগের গোষ্ঠীভুক্ত এবং কিছুকিছু তৎকালীন ভারতীয় রাগ মিশ্রিত। বিভিন্ন রসসৃষ্টি ও মেলোডি সৃষ্টির কাজে ভারতীয় সংগীত বহু প্রাচীনকাল থেকেই ধারাবাহিক ভাবে নবনব রূপের মধ্যে আত্মবিকাশ লাভ করেছিল, এর সঠিক প্রমাণ না পেলেও বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ৭টি ধারা তৎকালে পর পর হয়েছে; তার মধ্যে ছন্দ, গীত, প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু হৃদিশ পাওয়া গেছে। একাদশ শতকের শেষের দিকে প্রবন্ধ প্রচারিত ছিল। এই পদ্ধতিতে কবি জয়দেব তাঁর গীত-গোবিন্দ রচনা করেছিলেন। জয়দেবের রচনায় দুটি ভাগ ছিল ক্রিয়া ও অভোগ। অনেকে মনে করেন ঐ শব্দ ক্রবপদের সংক্ষেপ। এই পদটি বারে বারে গাহিবার রীতি; যাকে বাংলার বলা হয় 'ধুয়া'। এর পর লোচনপণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এটি বাংলার একটি সম্পদ। আজও কালের কবলে লুপ্ত হয়নি। উত্তর ভারতের তথা হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে লিখিত একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ যা পাওয়া গেছে। লোচন কবি সম্বন্ধে ভাতখণ্ডেজীর কালনির্ণয় পণ্ডিতরা মানেন না আগেই বলা হয়েছে। লোচন কবি রাগতরঙ্গিনী ছাড়া আর একটি সংগীতগ্রন্থ লিখেছিলেন, নাম রাগসংগীত সংগ্রহ। সে-গ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে। তাঁর সময় আরো অনেক সংগীত শাস্ত্রকার ছিলেন সে-কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাগীতি, জয়দেব, লোচনকবি আলোচনা করলে অবশ্য প্রমাণিত হবে ছনিয়ার কোন জায়গায় সে-সুগে এত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংগীত বিচার সম্ভব হয়নি। সুন্দর স্বরস্থানযুক্ত জনক রাগ বিভিন্ন রাগিনী ও পুত্র কন্যার

পরিবেষ্টিত হৃদয়বদ্ধ আকারে ভারতীয় কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। ইউরোপ যখন কয়েকটি হারমনি আবিষ্কারে ব্যস্ত তখন সহস্র সহস্র মেলোডি সৃষ্টির অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কারে ভারত ছিল ব্যস্ত। যে সব মেলোডির মধ্যে হারমনি অনিবারণ হিসাবে শোভা পাবে ভাববিকাশের পন্থা হিসাবে।

ঐতিহ্যের সাধনপদ্ধতির ভাঙ্গিছে যে ইউরোপীয় সংগীত প্রচলিত মেলোডিকে কোণঠেসা করে আপন আসন বিস্তার করেছে তার ঐতিহাসিক কারণ আছে; চার্চে বহুলোকের সমবেতকণ্ঠস্বর একই স্বরস্থানের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বা হয়তো সম্ভব হয়েছিল লোক সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরস্থানের সরলতার জন্যে। লোকসংগীত কাটিয়ে সংস্কৃত সংগীত সৃষ্টির পন্থা হিসাবে তাই ইউরোপকে হারমনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হ'য়েছে; তাঁদের সংগীত সংস্কৃত হয়েছে, নানা রসে সমৃদ্ধ হয়েছে, সংগীতের গভীরতা বেড়েছে যার নাম একজন ইংরাজ পণ্ডিত দিয়েছেন "Musics third dimension" এবং যিনি মনে করেন ১৩২২ খ্রীঃ পর থেকে—"Music no longer a hand-Maid to Poetry thou still hand-Maid of religion proving often rebellious in Europe." কিন্তু সত্যি কি তাই? hand-Maid থাকার দূর্ভাগ্য কি সে-সংগীত কাটাতে পেরেছে? পুরাতন সত্যতার মেলোডির রস নেবার আগ্রহ ও আশাও তিনি রাখেন। অবশ্য তাই তিনি বলেছেন—"Harmonic system which differentiated the music of modern Europe from all the rest of the world and which seems capable of absorbing into itself all that can be gleaned from the Melodic fashions of older civilization. সন্দেহ ইচ্ছা সম্বোধন নাই।

কিন্তু আমাদের সংগীতে সে সমস্ত নেই, লোকসংগীত থেকে, চাই কি, আদি-মানব গোষ্ঠীর সংগীত থেকেই আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে উঠে এসেছে। এর বহু প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে। তাই আমাদের পণ্ডিতরা বলতে দ্বিধা করেন না "if we liken Music to a flowering plant, the Folk forms represent its roots and stem surrounded by mud and water while Classical forms represent its branches clad in rich green robes and crowned with beautiful fragrant flowers dancing to the rhythm of fresh breeze... classical music adopts what is best in Folk music" ভারতীয় সংগীতে হারমনি প্রয়োগ অজানা নয় শুধু প্রয়োগকৌশলের পার্থক্য ও এর নানা বিচিত্র রস আন্বাদনে পরিভূক্ত ভারতীয় সংগীত অগ্রগতির আপন পন্থা খোঁজার পক্ষপাতী। সকল সম্যদেয়ে পুরাকাল থেকে সংগীতকে কলাবিদের ব্যক্তিগত বিকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে; এই স্তরে পৌঁছতে বহু সহস্র বৎসর ব্যক্তির স্বার্থশূন্য সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল।

অন্নবী

॥ অষ্টম বর্ষ, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৬২ ॥

তিন মানুষের মিছিল

বাশীর আলহেলাল

হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে স্বর্ষ অনেকখানিই উঠেছে। কিন্তু বাধা একমাত্র মিয়াদের বাড়ির উঁচু চালটাই। মাঘের সকালে এ-বাড়িতেও বরফের মত শক্ত শীত ঠোকর মারছে নাকে চোখে গালে ঠোঁটে কানের ফাঁকে। সুদীর্ঘ রাত। কাহাঁতক আর রোদ ওঠার পরেও দরজা আর দম বন্ধ করে ধনুকের মত কুকুড়ে গাড়ি থাকা যায়। কিন্তু বাইরে এসেও বিশেষ লাভ নেই। ছোট্ট আঁধার ঘরটাতে দীর্ঘ সারাটা রাত শীতের স্যাংসেতে কামড়ে কামড়ে অস্থির হয়ে সকাল বেলায় একটুখানি বাইরে বেরিয়ে যে প্রকৃতির নগ্নদেহের রূপ তাপ গন্ধকে মুঠো মুঠো করে ভোগ করবে তারো উপায় নেই। ছমিনিট দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পুখুখো পা ভেঙে বসে যে আরামের আতিশয্যে চোখ দুটোকে বন্ধ করে বুক ভরে গরম গরম রোদ চেখে দেখবে সে-উপায় নেই। বাধা মিয়াদের বাড়ির ঐ উঁচু চালটাই। ছমড়ি খেয়ে পড়ে আটকে যাচ্ছে রাজ্যের যত রোদ ওই চালেই।

শীতে মেজবোয়ের সমস্ত শরীরটা ধরধর করে কাঁপছে আর পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে রোদ কোনখানেই নেই এক ফাঁটা। মিয়াদের উঁচু চালটা এ বাড়ি থেকে সোজাশুজি পুবে হলেই বা ক্ষতিটা কি ছিল? মাঘমাসে স্বর্ষটা উঠছে দক্ষিণ দিকে সরে কোণাকুনি। উঁচু চালটাও ঠিক ওখানটাতেই।

মোটামোটো ধপধপে গোলগাল শরীর মেজবোয়ের। ছেলে হল না একটার বেশি। বয়েস বাড়ার সাথে দুই উরু আর পেটে মাংস জমে গেল বিস্তীর্ণকম। ছোটবো ভংগি করে বলে, মাংস সয় লো, চর্বির ঢালা জমে উঠছে তোর প্যাটে। পানের পানির পর্শ পেয়ে পেয়ে, যা খেয়েচিস তাই তোর চর্বি হয়ে গেছে।

উত্তরে হাওয়া এর ওপর আবার বয়ে যায় এক ঝলক। মিয়াদের পুব-দক্ষিণের উঁচু চালটাকে আর তার মালিকদের বিস্তী ভাষায় গাল দিতে যায় মেজবো। কিন্তু কি

ভেবে হঠাৎ ধমকে ধেমে যায়। এ-রকম ধারা সে ধেমেছে আরো অনেকবার। নিজের স্বামীকে সে কতবার ওলাওঠায় মরো, নামুনি হোক, হাড়ে পোক। পড়ুক, ইত্যাদি যথেষ্ট ভাষায় গালাগাল দিয়েছে; কিন্তু মস্ত কি এক দৌর্বল্য এখনো তাকে এখানেই কাবু করে ফেলে। মুখ মন কিছুই ছুটতে দেয় না। ঘোবনের সে কড়া-মিঠে দিন শুলা করে পড়েছে কবে। গাল পেট বাহুর স্থলতার প্রোঢ়ের স্ববিরতা ঝড়তা; তবু হঠাৎ ধেমে যায় মেজবোয়ের মুখ আর মন দুটোই এখনো যখন অবধারিত যুহুর্তে বিলী ভাষায় গাল বেরিয়ে পড়তে চায় ব্যথা-নিষ্পিষ্ট অন্তর থেকে।

মেজবো ভাবে, হয়তো তার বরাতটাই মন্দ। তা না হলে বুড়ো হয়ে বড়বোয়ের দেহটা যখন দিন দিন হাড়ে চামড়ায় ঠেকছে, সে তখন এ ভাবে মূটিয়ে যাচ্ছে কেন। মোটা হয়ে এক তিলও যদি সুখ থাকতো। রাত্তির বেলায় গুর স্বামী কেমন লিকুলিকে শরীরটাকে ভেঁজে-ভুজে গুটিয়ে-গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোর। হাত দুটো পেটের কোন্ অন্তরে দেয় তলিয়ে। আর সে না পারে পাছটোকে গুটিয়ে দুই উরুর গরম ঝাঁকে হাতের হিম-শীতল চেটো দুটোকে একটু ঠাই করে দিতে; না পারে উপুড় হয়ে মাথা গুঁজে গুয়ে পিঠের বর্ম দিয়ে শীতের তীরগুলোকে আটকাতে। বাধা চর্বি-ঠাসা কুলেওঠা ওই ছুঁড়িটাই। শয্যা ছেড়েও এখন কি কম অসুবিধেটা হচ্ছে। পাছটোকে ভাঁজ করে বুকের দিকে টেনে নিয়ে আঁটো হয়ে একটু বসার এখন দরকার। কিন্তু তা হবার জো-টি নেই।

বড়বো দু গুণা মাহুলি ঝুলিয়েও মোটা হতে পারল না, আর সে মাহুলি না ঝুলিয়েই এত! তা হলে কি শুকিয়ে যাওয়ার জন্তে, পাংলা হওয়ার জন্তেও তাবিজ মাহুলি ধারণ করতে হয়। পুকের উঁচু চালওয়াল বাড়ির ছোট মিয়া মোলুবি সাহেব, তাবিজ লেখেন; পেটের কামড়ে, জিনের আসরে, রোগে ব্যাধিতে, পোয়াতি খালাস হতে দেরি হলে দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁকে দেওয়া পানি দেন খেতে। যাবে নাকি তাঁর কাছে তার এ-ব্যাধিটার জন্তে তাবিজ কিম্বা পানি-পড়া নিতে।

মরদ-ব্যাটাছেলেদের কিন্তু এত দুঃখ মরদ পোয়াতে হয় না। সকাল হতেই ঝটাং করে দোর খুলে কেমন তার স্বামী পাঁচ হাতি ধুতিটা গায়ে একটুখানি জলটিয়ে নিয়ে ছুট দিয়েছে নিমতলার দিকে। সেখানে অসুস্থ মন-কুড়ানো তাজা-টাটকা রোদ। মস্ত চাটান। অনেক লোক—গোটা পাড়ায়, এমনকি গোটা গাঁয়েরও—বসে রোদ পোহাতে পারে। কোন্ বুগের মস্ত এক বিরাট-বপু নিমগাছ পশ্চিম বেষে দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে—পুবে না। পোষ-মাঘের প্রভাতী রোদুরের পথে মিয়াদের উঁচু চালটার মত বাধার সৃষ্টি করে না। বরং ফাগুন-চৈতে দখনেহাওয়া কিবুন্নির করে বইবার সময় নিমের কুলকে ছুয়ে এসে মন প্রাণ মাতিয়ে দেয় সবার।

খাস-খামারি চাটান। যদিও আসলে জমিদারের। চাষাদের বারোমাসের সখের গান-বাজনা, যাত্রাগান, ল'টোর গান, দু'একটা দেশের মজলিস বা বিচার-আচার, মহরমের তাকিয়া তৈরী, লাঠি খেলা ইত্যাদি সর্বসাধারণী অনুষ্ঠানগুলো এখানেই সম্পন্ন হয়। এদের

মধ্যে দু'একজন মোড়লগোছের লোক যাদের একাধি বিধে নিজস্ব জমি রয়েছে, নিমন্তলার উত্তর দিকে এক পাশে দু'একটা ধানের পালাও বাঁধে। এব জন্তে সাধারণ তহবিলে ভাড়া দিতে হয় আটদশ আনা পয়সা।

স্বামী পুরুষতার সৌভাগ্যের ঈর্ষায় জলতে লাগল মেজবোঁ। আর বোশেখ-জন্তিতেই কি ছাই সুখ আছে এ ফোলা ফাঁপা দেহ নিয়ে। তার স্বামীকে কি গ্রীষ্ম কি শীত বাবো মাসই স্বচ্ছন্দ্য আর সুখ। আর তার কি গরম কি জাড়া সব সময়েই অস্বস্তি আর কষ্ট। বরং ভেবে দেখতে গেলে শীতকালটাতেই অস্বস্তিটা কম। গরমের সময়ে সে কি যায়। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে সে কি প্যাচপ্যাচানি। একটুকরো কাপড়কেও কি আর গায়ে রাখতে ইচ্ছে যায়। কাপড় নামালেও আবার এসে বেঁধে ফলাসু—বিল্মী গরম বাতাস। ঘরের ভেতরে পানি ছিটানো ঠাণ্ডা মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে দিতে আর হাঁসফাঁস করতে করতে জানু হয়ে যায় ওঠাগত।

মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর জালাই কি কম! ফুটন্ত দুপুরে বারবার কাজটা স্টপটু সেয়ে নিয়ে একটু জুড়োতে যদি পা ছড়িয়ে বনলো দাওয়ায়, বুক থেকে চবচবে আঁচলটা একটু নামালো, মলিন শাড়ীর বেঁটনীটা কোমরে একটু টিলা করে নিল, অমনি মাঠ থেকে কিরে এসে ময়জদি, তার স্বামী, চিংকার জুড়ে দিল, হারামজাদি বুড়িয়ে গেলি, তবু ও বাড়ির দিকে টানটা তোর একটুকুনও কমলো না রে। জানলাটা মিয়াদের খোলা হাঁ-হাঁ করচে, আর এখানে তুই জাংটা হয়ে পড়ে আচিসু! এবয়েসেও শরম বলে জিনিসটাকে তুই জানলি না রে!

মেজবোঁ আর কি করে। কোনো কোনো দিন কিছু বলে না, বীরে সুখে আঁচলটা তুলে নিয়ে কোমরের কাপড়ে হাত দেয়। আর কোনো কোনো দিন সমান টিটকিরি মেয়ে প্রভুত্তর করে, তা বুড়িয়েই যদি গেলাম তা'লে শরমের আর অভ দরকার কি, আর এ-বুড়ো গত্তরের ওপর লোকে জানলার ফাঁক দিয়ে নজরই বা দেবে ক্যানে? তার আঙুল একটা লেংটি পরে মর্দানি সবাই করতে পারে। কই বুক কাপড় জড়িয়ে বেঁধে-বেঁধে একটা দিন খাওয়াও দেখি আমাকে।

আর এই শীতকালেই কি স্বামীর জালানিটা কম! এ সময়টায় ক্ষেত-খামারের কাজ প্রায় শেষ। বকি-শস্তের কাজ যা একাধটুকু চলছে মাঠে। কটাই বা আর মজুরের দরকার তাতে। কাজেই ময়জদি বাড়িতে বসে। এক পয়সার রোজগার নেই, আর সারাদিন শুধু ঘ্যানঘ্যানর করবে বিবির সাথে। মেজবোঁ যদি বলে, কই দাওনা একটা মোটা-সোটা কমদামি কাপড় কিনে। এবার যে আর ঘরের বার হওয়া যাবে না। কে দেবে তোমাকে বেঁধে-বেঁধে? আর মিয়াদের ঘরের জানলাটা খোলাই থাকে বারোমাস। একটু লজ্জিত হওয়া দু'রের কথা, উল্টো অল্লীল মন্তব্য করে ময়জদি, ক্যানে, ও-বাড়ির তোর বড়মিয়ার কি হল, তিনি বুঝি আর কাপড়-চোপড় দিতে চান না রস তোর শুকিয়ে গেচে বলে?

নিজের বোকে যে এমনধারা নোংরা নোংরা কথা শোনাতে পারে, সে আবার মানুষ।

স্বামীর মনের আর যুদ্ধের নোংরামির জন্তেই না মেজবৌ-র নাম মিয়াদের বাড়ির সাথে এ-ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। অপরাধ কি আর একসার।

কিন্তু তবু—মেজবৌ ভাবতে থাকে—স্বামী তার মানুষ হিসেবে ভালোই। কারণ বাই হোক, খতিয়ে দেখতে গেলে, জীবনে সে যত বদনাম কুড়িয়েছে, তা কি অল্প কোনো একটা জীবন খুঁজলে পাওয়া যায়? তাকে নিয়ে কোনো স্বামী কোনোকালে একসাথে ঘর করতে পারে? কিন্তু কই তার স্বামী তো তাকে ভালো দেখেনি। আত্মীয় কুটুম, আপনার লোক, এমনকি যুরুরিরা পর্যন্ত পরামর্শ দিয়েছে মেজবৌকে ভালো দিতে—ও-মেয়েকে নিয়ে ঘর করা নাকি পাপ; তবু—আম্মাই জানে, কেন ও ভালো দেখেনি ওকে। সস্তা এবং ভালো অল্প মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে লোকে; যুক্তি দেখিয়েছে, মেয়েটাও শেষে দেখবি মায়ের মতন হয়ে যাবে, তবু রাজি হয়নি। বরং সেই আবার উন্টে যুক্তি দেখিয়েছে, রাহেলার জন্তেই তো ওকে ছাড়তে পারছে না। ওঃ—ভাবতেও শিউরে ওঠে মেজবৌ সত্যিই যদি ভালো দিতে দিত ময়লাদি, কি-দশটা দাঁড়াত। স্বজাতিদের মধ্যে গাঁয়ে তিন গাঁয়ে কেউ যে তাকে আর নিকা করত, এ চিন্তা মনে ঠাই দেওয়াও বাতুলতা। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরতে হত তাকে। স্বামীকে তার ভালো লোক না বলাটাই পাপ। পুকের উঁচু চালওয়াল বাড়ির পাশের বাড়ির পূর্বকার বোটার কথা মনে পড়ে যায়। ওরা তো সব শিক্ষিত সভ্য ভদ্রলোক। তবু তো বোটাকে ক্ষমা করতে পারেনি। মেজবৌয়ের মতই সে আরেকটা ঘটনা। ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করেন। বোটা তিন ছেলের মা। হঠাৎ ভালো দিতে দিল। তা-ও আবার কেউ বলে, ঘটনাটা মনগড়া; কেউ বলে, না সত্যি।

এতক্ষণে সূর্যটা মিয়াদের উঁচু চালটার মাথা ডিঙিয়ে উঁকি মারলো। তা হলে বেলা হয়েছে নিশ্চয় অনেকখানি। সোয়ামি আসবে এখনি পাশ্চাত্য খেতে। বেড়ে দিতে হবে মেজবৌকে। তবু, স্বামীকে সে খোড়াই কেন্দ্র করে গোছের ভাব নিয়ে আনন্দে বিভোর ভংগিতে চোখ বুজে রোদ পোহাতে থাকে।

পেছনে সত্যিই পারের শব্দ হয়। মেজবৌয়ের চোখ-বোজা চেহারাতে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। বাবু এলেন এবার গিলতে এতক্ষণ ধরে সস্তা রোদে শরীরটাকে চাংগা করে। এদিকে এ-বাড়িতে যে মাত্র রোদ উঠল তার খেয়াল নেই।

কিন্তু রোজকার মত আজ আর ময়লাদি ঢুকতে ঢুকতেই পাশ্চাত্য ভাতের জন্তে হাঁক পাড়ছে না। বরং পদধ্বনির রবটা যেন দ্বিগুণ শোনাচ্ছে। আর কেউ কি আসছে সাথে—তোরাব সেখ কিবা এক ছিলিম তায়কের আকার নিয়ে দেওর আগুনদি?

আসলে কিন্তু ওদের কেউ নয়। মেজ বৌ মুখ ঘুরিয়ে দেখল, বাপের পেছন পেছন আসছে একটা ছোট পুঁটলি বগলে রাহেলা—তার একমাত্র এবং প্রথম সন্তান।

রাহেলা যখন বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘর করতে যায়, বওয়ানা হয় রূপোর তোড়া তোড়া পায়ে পরে ছম্ছম্ করতে করতে। আর যখন পালিয়ে আসে একআধ মাস পরেই

তখন বাড়ি ঢোকে নীরবে। ভোড়া ভোড়া বগলের পুঁটুসিটার মধ্যে বৈধে রাখে। এই একমাত্র গহনাটি স্বামীর ঘরে ফেলে কিংব আসে না কখনো।

রাহেলার পালিয়ে আসা নতুন নয়। তবু মেজবো এবারও চমকে ওঠে। চেহারা দেখে বোঝা যায়, বিষম ছুঃখও পেয়েছে। বাবড়িয়েও গেছে খানিকটা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নড়ে চড়ে বসে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে পারে না মনে।

রাহেলা নীরবে ঘরে ঢুকে পুঁটুসিটা এক কোণে রাখে। ইচ্ছে করেই একটু বেশি সময় খরচ করে পরনের শাড়িটা গোছ-গাছ করতে থাকে। মায়ের স্মৃতিতে এত ভাড়াভাড়ি বেরোতে কেমন যেন ভয় ভয় করে। মুখটাকে ওর যা গস্তীর গস্তীর দেখাচ্ছে।

ময়জন্দি এবার চোঁচিয়ে ডাকে, আয় রাহেলা বেরিয়ে আয়, পাস্তা খাবি আয়।

বৌকে মোলায়েম সুরে বলে, দাও, আমার সাথে রাহেলারও পাস্তা দাও। দেখলে, ছেলে আমার কি রকম ধারা শুকিয়ে গেছে। আহা, বাছাকে আমার সেখানে কষ্ট দেয় বলেই না পালিয়ে আসে বারে বারে।

মেজবো দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকে। রাহেলা কাঁচু-মাচু মুখে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

মেজবো ভাত বাড়তে উঠে পড়ে। মায়ের একটু খোশামুদির জন্মেই যেন রাহেলা কথা বলে, থাক বাপু, আমি একটুকু পেরেই খাব মায়ের সংগে। কিন্তু বাপের স্নেহ যেন বাধা মানতেই চায় না। পাস্তার সান্ধি নিয়ে রাহেলাকে বসতেই হল তার বাপের সাথে।

একটু দূরে বসে মেজবো। সে তার ভাগ্যের কথা নিরুন্ম হয়ে ভেবে চলেছে। এ দুর্ভাগ্য রাহেলার নয়—তার নিজের। বরং এ প্রায়শ্চিত্ত। রাহেলাকে প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বইতে হচ্ছে তার মায়ের হয়ে। হয়তো সারাটা জীবনই বয়ে বেড়াতে হবে। হয়তো রাহেলার পরেও ছচার পুরুষের হতভাগা মেয়েগুলো এভাবেই বয়ে বেড়াবে এ বোঝাগুলো। মেজবোয়ের কলুষ রক্তই তো বইবে এদের শিরায় শিরায়।

মেজবো মায়ের অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝতে পারে। সে-ও ভুক্তভোগী কিনা। স্বামীর ঘর ফেলে কিসের আকর্ষণে এখানে বারবার সে পালিয়ে আসে তা-ও বোঝে। এই মেয়ে এত ভালো বর পেল কি করে?—ভাবতেও তাজ্জব ঠেকে মেজবোয়ের। শান্তিষ্ট কর্মঠ জামাই। অথচ এর সাথেও বনি-বনাও হয় না রাহেলার। পালিয়ে এসে বলে, মেয়ে ঘরে তাড়িয়ে দিলে। দু এক মাস পরে আবার কত সেধে বুঝিয়ে স্মৃতিতে পাঠিয়ে দেয় ওকে বাপ মা ছুজনেই। কিন্তু পালিয়ে আসে আবার। আবার সেই একই অভিযোগ। কিন্তু মেজবো জানে, সর্বৈব মিথ্যা এ-অভিযোগ। ওকে কেউ তাড়িয়ে দেয় না—নিজেই পালিয়ে আসে কোন এক আকর্ষণে। সব চেয়ে ছুঃখের কথা—অসুদর্শী ছুঃখের কথা, এ আকর্ষণটাও মিরাদেব সেই বাড়িটারই; যে-বাড়িটা পোষ মাথের সকালে সূর্যের ছটাকে এ-বাড়িতে প্রবেশাধিকার দেয় না, যে-বাড়ি উপলব্ধ করে রাহেলার মায়েরও দুর্গাম রটেছে।

যতবার রাহেলা পালিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি, মেজবৌ কি কম চেষ্টা করেছে তাকে বোকাবার ? কত অমুনয় করেছে, কত ধমক দিয়েছে, এমনকি নিজের জীবনটাকে একেবারে উলংগ করে চিরে কেড়ে দেখিয়েছে, বুঝিয়েছে তিল তিল করে। কিন্তু কিছুই ফল হয়নি এতেও।

ময়জন্দি কিন্তু কিছুই খবর রাখে না এ সবের। লোকটা বদরাপি হলেও সত্যিই ভারি সোজা আর বোকা। ময়জন্দি জানে সত্যিই জামাই নির্ধাতন চালায় তার মেয়ের ওপর। তাই সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। একমাত্র মেয়েকে ময়জন্দি ভালও বেসে এসেছে অন্ধভাবে। তাই রাহেলার বাস্তব দিকটা তার সামনে আঁধার।

কখন থেকে যে দরদর করে অশ্রু বয়ে চলেছে মেজবৌয়ের গণ্ড বেয়ে তা সে খবরই রাখে না। ময়জন্দির কথায় সে সশ্বিং ফিরে পায়। ময়জন্দি বলল, শোন মেজবৌ তোর মেয়ের কাছ থেকে, কত জুলুম ওরা এবারও করেছে ওর ওপর। তুই তো শুধু ওকে ধমকাস আর বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচিস।

মেজবৌ আর চুপ থাকতে পারেনা। ঠিক করে, আত্মোপান্ত সব বুঝিয়ে বলবে সে আজ স্বামীকে। এখনো যদি রাহেলাকে বাঁচানো যায়। চোখ মুছতে মুছতে সে বলল না না, রাহেলার এসব সাজানো কথা। রাহেলার ওপর কেউ কোনো জুলুম করেনি। সব ওর বদমাইনী। এখানে ও পালিয়ে এসেছে শুধু ছিনালি করার জন্তি।

ময়জন্দি ভীষণ রেগে ওঠে। ঠিক করে, রাহেলা এর প্রতিবাদ করলেই তখন এক চোট নেবে মেজবৌকে।

কিন্তু হঠাৎ রাহেলাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় যেন। এরকম অতর্কিত আক্রমণ আসবে সে ভাবেনি। কিছু বলতে পারে না। মুখটাও যেন মলিন হয়ে ওঠে।

রাহেলাকে নীরব দেখে ময়জন্দিও মুসড়ে পড়ে। রাহেলা সম্পর্কে তার মনেও যেন এক বিন্দু সন্দেহ জমে ওঠে।

যতই হোক, চোরের মন। রাহেলা নিজেকে বড্ড অসহায় মনে করতে থাকে। আত্মপোষা করে উঠে পড়ে সে। মাটির কলসিটিকেই উপুড় করে হাতটা যেমনতেমন করে ধুয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ির বাইরে। কৈফিয়ৎ দিয়ে যায়, ক্ষিদে নেই, দেখা করতে যাচ্ছে চাচাতো বোন তকিমুনের সংগে।

বাপ কিন্তু অল্প অর্ধ করে নেয়। ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দিলিনে তো খেতে। জবাব দে, কোন সাহসে বললি তুই, ছিনালি করতে এসেছে ও ? সবাইকেই তুই নিজের মতন মনে করিস ?

স্বভাবসিদ্ধ কঠোর বাচন-শৃংগি পরিহার করে মেজবৌ কিন্তু একেবারেই নরম হয়ে পড়ে। বুঝিয়ে বলে সব কথা আত্মোপান্ত ধীরে ধীরে নরম নরম করে বুজ্ঞাশা গলায়।

চোখ খুলেছে এবার ময়জন্দির। তাই দু দিনেই পাকাপাকি প্রমাণ পেয়ে গেল মেজবৌয়ের কথার সত্যতার।

ছপুররাতে রাহেলাকে যখন তার বাপ সম্পূর্ণ চিনস, তখনকার তার চোখের অস্বাভাবিক আগুন অঙ্ককারে মেজ বৌ লক্ষ করেনি। সম্পূর্ণই অপ্রস্তুত ছিল সে, শুধু এটুকুই আশা করেছিল যে, রাহেলা এবার তার নিজস্ব নীড়ে স্থায়ী হবে। তাই যখন সে পরদিন রাতে সন্ধ্যার পরেই প্রথম লক্ষ করল মিয়াদের উঁচু চালের কোণে ধিক্ ধিক্ করে আগুন জ্বলছে, সাতংকে চিৎকার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু জোরে মুখ চেপে ধরলো ময়জদি। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল, তোরা কাকামি আমি আর সইব না মেজ বৌ চুপ করে দেখে যা বলচি। বেশি বাড়াবাড়ি করবি যদি, গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে আগুনে ফেলে দেব।

মেজবৌয়ের মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয় ময়জদি। একটিও কথা বলে না মেজ বৌ। প্রথমে কিছুক্ষণ কাঁপে। তারপর শক্ত করে নেয় মনটাকে।

আগুন ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে থাকে। এখনো কেউ দেখতে পারনি আগুনটা।

মেজ বৌ নিজের মোটা শরীরটাকে আস্তে আস্তে দেওয়ালের আশ্রয়ে ঝাড়া রেখে অপলক চোখে চেয়ে থাকে ক্রমসংক্রামণ লেলিহ আগুনের দিকে। না, সে আর চেষ্টাও না। কাউকে ডাক দেবে না মিয়াদের উঁচু চালের আগুন নেভাবার জন্যে। অত উঁচু আর অত বড় বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক। পুড়ে ছাই হয়ে যাক ওদের গোলা-ভতি ধান, বাকসো-ভতি টাকার নোট, গয়না-গাটি, দামী দামী কাপড়-চোপড়, আর সর্বনাশা ওষুধের সেই ঝাপটা, যা রাহেলার পরে কাউকে জন্মাতে দেয়নি মেজবৌয়ের গর্ভে, যা চির-বন্ধ্যা করে দিত রাহেলাকেও, যা ময়জদি মেজবৌয়ের নাম স্মৃতিকে মুছে ফেলত এ বিশ্ব থেকে। ধ্বংস হয়ে যাক মিয়াদের গোটা বাড়িটাই। ও বাড়ি ঝাড়া হয়ে থাকলে—ওদের বাড়-বাড়ন্ত হলে পৃথিবীর লাভ কি? বড় মিয়া, ছোট মিয়ার ছেলেরা, তাদের ছেলেরা, তাদেরও ছেলেরা হয়তো ছুহাতে বিষ ছড়াবে শুধু বন্ধ্যাদের। পুড়ে শেষ হয়ে যাক মিয়াদের ও বাড়ি—পৃথিবীকে বন্ধ্যা করার ষড়যন্ত্র স্থল!

আগুন অনেকখানি উঠে গেছে। ও-পাশ থেকে এবার চাঁচামেচি সোরগোল শুরু হল। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল গেটা পাড়া, গোটা গ্রাম।

মেজবৌ একইভাবে মনে মনে বকেই চলে। মিয়াদের বাড়ির উদ্দেশে কঠিন আর অশ্লীল গালাগালি দিতে গিয়ে এর আগে অনেকবার দমন করেছে সে নিজেকে। কেন যে করেছে, সে নিজেই বুঝতে পারে না আজো। বড় মিয়া (ছোট মিয়াও নিশ্চয়ই) প্রথম প্রথম ভালবাসার অনেক পচা পচা বুলি কপচাতেন। হয়তো গাল দিতে গিয়ে প্রত্যেকবার মেজবৌয়ের নাকে তারি দুর্গন্ধ লেগে কণ্ঠ কুঙ্ক করে দিয়েছে। কিন্তু এখন নাকে লাগছে সেই মিয়াদেরই উঁচু চালের খড় পোড়ার গন্ধ। কণ্ঠের জড়তা এবার ছিঁড়ে গেল। গলা ছেড়ে দিয়ে এবার মেজবৌ চাঁচাতে লাগল—ওগো, তোমরা কেউ আগুন নিবিয়োনা ও চালের। ওরা পুড়ে যাক, মরে যাক; ওরা মানুষ নয়, ওরা শয়তান...

লোক জমে গেছে বিস্তর। এক দল কাপিয়ে পড়েছে বালতি আর কলসি হাতে

আগুন নেভাতে—মাটির আর পেতলের কলসি। বাসতি কলসি বা অন্তবিধ পাত্রের অভাবে অধিকাংশ লোকই জটলা পাকাচ্ছে আশেপাশে দাঁড়িয়ে। একদল আবিষ্কার করতে চাচ্ছিল, আগুনটা লাগল কি করে বা লাগালো কে। মেজবৌয়ের বকুবকানিগুলো শুনে অনেকে স্থির নিশ্চিত হল, কার কাছ এ। একজন তো হল্লা করেই উঠল, লাগিয়েছে ঐ ময়জদি শালাই। শালাকে ধরো, পালাতে দিয়ো না।

অনর্গল বকতে বকতে মেজবৌ এক সময়ে ধপাসু করে লুটিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞানও হারালো সাথে সাথেই। ভাগ্যক্রমে লোক এবার এর অর্থ করলো অন্তরূপ। একজন বললো, নারে, ভয়ের চোটে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মুছ' গেল। তা ছাড়া নিছের বাড়ির পাশেই কেউ কারো চালে আগুন লাগাতে পারে!

এই সিদ্ধান্তটাই শেষে সত্য বলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

আগুন নেভানো সম্ভব হল না! সবাই বুঝলো তা আর সম্ভব হবে না। এবার ছড়াতে লাগবে আগুন। নিছের নিছের ঘরের চাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। লাঠি-সোঁটা, ঘলের পাত্র নিয়ে উঠে পড়লো আপন আপন চালে। আগুন না লাগতেই কলসি কলসি বাসতি বাসতি জল ঢালতে লাগল চালে। কাঁথা-কম্বল ভিড়িয়ে চাপাতে লাগল যার যত ছিল। মেজবৌদের ঘরটাকে শুধু বাঁচাবার আগ্রহ দেখা গেল না কারো। মিয়াদের ঘরটা শেষ হতে না হতেই আগুন ধরে গেল ময়জদিদের ভাঙা-চোরা ঘরটাতে।

আঁতকে উঠে ছুটে এল ময়জদি। পিছু পিছু রাহেলাও। ধরাধরি করে ওরা বাইরে তুলে নিয়ে গেল মেজবৌয়ের নিষ্পন্দ নিথর দেহটাকে।

ভোরের পাখি কুজন করে ওঠার আগেই মেজবৌয়ের জ্ঞান ফিরে এল। বাপকে আগেই রাহেলা সব বলে রেখেছে। এবার মাকে বলল, চলো মা, তোমার জামাইয়ের বাড়ি গিয়ে উঠবে চলো। তারা খুব ভালো লোক। আদর করেই তোমাদেরকে নেবে তারা।

মাঘের দীঘল রাত্রি শেষ হয়ে পূর্ব আকাশ এবার শাদা হয়ে উঠছে। একটু পরেই সূর্য উঠবে। কোনো বাধা পাবে না কোনো আড়াল থাকবে না আর। মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তিন মানুষের একটি মিছিল—মাঘের হিম শীতল মেঠো বাতাসে শীতার্ঘ জড়ো-সড়ো তিনটি মানুষ। আগে গিছে দুপাশে শুধুই জমি আর জমি—সন্ত-বান-কেটে-নেওয়া জমি। মেজবৌয়ের মনে যত সব আনন্দ টপ্পন করছে, তাতে মনে হয় না, এ তিন মানুষের মিছিল, তিন কোটি মানুষের মিছিল। এত মানুষ যে এত বড় মাঠটার তাদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত।

মেজবৌ বারবার মুখস্থ করছে মনেমনে—জামাইকে গিয়ে বলবে, তোমাদের আর আমাদের বংশ রক্ষ করতে ধরে নিয়ে এসেছি বাবা রাহেলাকে তোমার কাছে। আর ও পালাবে না।

পৰ্বতকন্যা

দেবকুমার মৈত্ৰ

জৰ্জ লিংডোর কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে ভোরা লিংডোকে। মঙ্গোলীয় ছাঁচের মুখের গড়ন,—তবু মিষ্টি। ধবধবে গায়ের রং ছোটছোট সরল চোখ। বনপন্ন জু হুটোর মাঝখানে আঙনের মতো জলজলে নিপুণ হাতে আঁকা টিপ। পাখির পালকের মতো মসৃণ পাতলা ঠোঁট। লিপাস্টিকে লাল। ঠোঁটের নিচে মুক্তোর মতো দুসারি দাঁত। সব মিলে আশ্চর্য লাভণ্যে ঢগঢগ চেহারা। দেহের প্রতিটি বিন্দু থেকে যৌবন ঝরে পড়ছে যেন। একবার চোখে পড়লে কিছুক্ষণ তাকিয়ে না থেকে পারা যায় না। তবু, এত লাভণ্যের আড়ালেও কেমন যেন একটা বিবাদ, ক্রান্তির ছাপ জমে থাকতো ডোরার চোখের পাতায় পাতায়। কথাবার্তার সারল্য, আচরণের হাসিখুশির ভিতরে কোথায় যেন জমে ছিলো গভীর দুঃখ। বাইরে থেকে বোঝা যেতো না। কিছুকের দেহের ভিতর যেমন থাকে মুক্তো।

একটির পর একটি চুলের কাঁটার মতো বাক ঘুরে, বিপজ্জনক খাদের গা বেঁসে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে আমার বাস শিলং এসে পৌঁছেছিলো একটি শীতের কুয়াশাহিম সন্ধ্যায়। গল্পের শুরু ওইখানেই।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। বাতাসে কনকনে হাড় কাঁপানো শীত। শীতে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে—মালপত্তর নিয়ে বাসস্টেশন থেকে বেরোতেই সাতআটজন লোক এসে ছেকে ধরলো।

‘হোটেল বাবু?’

বললাম ‘হ্যাঁ।’

অমনি সবক’টি লোক মিলে বোঝাতে আরম্ভ করলো যে, তাদের হোটেলই সর্বশ্রেষ্ঠ। চার্জ কম, অঞ্চ, এমন আরাম আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

নতুন জায়গা। কিছুই জানা নেই। চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনলাম কিছুক্ষণ। তারপর একটি হোটেল বেছে নিয়ে এসে নোডুর ফেললাম অবশেষে। হোটেলটা অত্যন্ত সাধারণ। এক ঘরে চারজনের সিট। খাটে খাটে ঠাসাঠাসি হয়ে ঘরের মেঝেতে আর জায়গাই নেই প্রায়। সে-রাস্তিরে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলো, আর কিছু খেয়াল করবার সময় পাইনি। শিলং এসেছি চাকরী করতে, বেড়াতে নয়। মনে মনে তাড়াহড়ো ছিলো না কোন। শিলং পাহাড়ের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবার যথেষ্ট সময় মিলবে।

শেষের কবিতা পড়ে ধারণা হয়েছিলো শিলং পাহাড় প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোরম তো বটেই

অতি নির্জন স্থানও। এ ধারণা কেন হয়েছিলো আমি নিজেই বলে বোঝাতে পারবো না। পরদিন সকালে শহর দেখতে বেরিয়ে হতচকিত হলাম। পথেঘাটে, হাটেবাজারে জলমোতের চেউ। গায়ে গায়ে লাগালাগি বাড়িঘর, রাস্তার দু'ধারে পশারির ভিড়। ভারতবর্ষের যে-কোন বর্ষিক মকসল শহরের মতোই। তবু ভালো লাগলো। উঁচুনিচু রাস্তা, কাঠের তৈরী বাংলা টাইপ বাড়িঘর, পাইনের সবুজ শাড়ীপরা পাহাড়ের সারি, আর নীলাকাশ।

দিন কয়েকের মধ্যেই শহরের যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস দেখা হয়ে গেলো। হোটেলের এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়েছিলো ইতিমধ্যে। অনন্ত শর্মা রায়। অনন্ত বাবুই দেখিয়েছিলেন সব। এবং অনন্তবাবু খাতিরেই হোটেল টেম্পোরারি বদলে পার্মানেন্ট সিট পেয়েছিলেন। চার্জ অর্ধেকেরও কম।

লাইডং থেকে লুম্পানিং, গল্ফ লিংক্‌স্ থেকে রিলবং, সব রাস্তাঘাট চিনে গেছি দিনে দিনে। একা একাই ঘুরি পথেপথে। অনন্তবাবু যদিও যেতে আলাপ করেছিলেন সাথে, স্বতঃপ্রসব হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন, চিনিয়ে দিয়েছিলেন পথ, কিন্তু যেই আমি পুরনো হয়ে গেলাম এড়িয়ে চলতে লাগলেন আমাকে। আমারও কেমন যেন ভালো লাগতো না ভদ্রলোককে। ছোটখাটো, টাক মাথা, গাল তুবড়ানো চেহারার জন্তে। মনে হতো অত্যন্ত নিরস। তার চাইতে একা একা ঘুরেই আনন্দ পেতাম।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বিডন্ ফল্‌সের নিচে পাইনবনের ভিতরে পাথরের ওপর বসে কেমন উদাস হয়ে যেতো মন। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। সশব্দে পায়ের নিচে ফল্‌সের জল শুঁড়ো শুঁড়ো হয়ে পড়ছে। আর শোঁ শোঁ হাওয়ার পাইনপাতার দীর্ঘশ্বাসের মতো আওয়াজ।

উৎসাহ নিভে এলো ধীরে ধীরে। আর ঘুরতে ভালো লাগেনা। ভালো লাগেনা কিছুই। হোটেলের অন্তান্ত বোর্ডারদের সাথে মৌখিক আলাপই শুধু হয়েছে। বনিষ্ঠ হবার তাগিদ পাইনি মনে মনে। তবু ওদের দেখেও দীর্ঘা বোধ হয়। বেশ সুখেই আছে নিজেদের একটা গোষ্ঠীর মধ্যে। সকালে ঘুম থেকে ওঠে, টুকটাক কাজকর্মের পর ব্যস্ত হয় জান খাওয়ার চেষ্টায়। বাধক্রম নিয়ে ঝগড়া করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে স্নানের পরম জলের জন্তে, তারপর খাওয়া শেষ ক'রে দৌড়ায় অফিসের পথে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সকালের মারামারি গালাগালি দিবি ভুলে গিয়ে তাস খেলতে বসে দল বেঁধে।

‘ওয়ান হার্ট।’

‘নো বিড্।’

‘টু হার্টস্।’

‘টু-স্পেডস্।’

রাত ন'টা পর্যন্ত খেলা চলে।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কেমন সুন্দর আছে ওরা, অথচ, ওদের সাথে আমি কিছুতেই মিশতে পারিনি। প্রথম দু'চারদিন ওরা আমার সবকিছু আগ্রহ দেখিয়েছিলো। এখন আর উৎসাহ প্রকাশ করেনা।

একএকটা দিন যেন আর কাটতে চায়না। হোটেলের আবহাওয়া কদৰ্শ লাগে। এইভাবে মানুষ কি ক'রে বছরের পর বছর সুস্থ জীবন যাপন করে ভাবতেই পারিনা।

মনের এই অবস্থাটা প্রায় অসহ্য হয়ে এসেছে এইরকম সময় আলাপ হলো মনের মতো একটি মানুষের সাথে। জর্জ লিংডো। হাসিখুশি আর আমুদে। জাতে পাহাড়ী। শারীরিক আকারে বৃহৎ। স্বাস্থ্যবান। গায়ের রং হলুদে-সাদায় মেশা। কথায় আদব কায়দায়, পোশাকে চালচলনে একেবারে সাহেব। চোখ দু'টো ছোট ছোট, গোলাকার। কিন্তু বুদ্ধির ছাপে ভীষণ। তার সাথে পাহাড়ীজাতির স্বাভাবিক সরলতা মেশানো।

প্রথমদিন জর্জ লিংডোর সাথে আলাপ হয়নি ঠিক, তর্ক হয়েছিলো। আমি যে অফিসে কাজ করি সেখানে নতুন চুকেছে জর্জ লিংডোও। আমাদের সেকসনে এসেছে দু'দিন আগে। আমার পাশের টেবিল ওর। টিফিনের সময় কথায় কথায় তর্ক বেধে গেলো রাজনীতি নিয়ে। স্টেটস্‌ ডিঅরুগ্যানাইজেশন্‌ কমিটি সেই সময় শিলং এসেছিলো আঞ্চলিক লোকের সাক্ষ্য নিতে।

স্থানীয় লোকেরা স্বতন্ত্র পার্বত্যরাজ্য চায়। জর্জ লিংডো সেই দলে। পার্বত্য জাতিরা শিক্ষায় দীক্ষায় অশ্রুত, সমতলের লোকেরা দারী সেজন্তো। তারা এদের উন্নত হবার সুযোগ দিতে চায়না। কাজেই নিজেদের শাসনভার নিজেদের হাতে না থাকলে সেটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

‘তাছাড়া, আমাদের ভাষা কুটি সবই স্বতন্ত্র।’—বলেছিলো জর্জ লিংডো।

জর্জ লিংডোর বক্তব্য বিষয়ের বিরোধিতা করেছিলাম আমি এটুকু মনে আছে। স্বপক্ষে একটির পর একটি বুক্তি খাড়া ক'রে খণ্ডন করেছিলাম জর্জের মতবাদ। জর্জ লিংডো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো, রক্তাধিক্য লাল হয়ে গিয়েছিলো মুখ। উত্তেজনার ঝোঁকে কথা কাটাকাটি করেছিলাম দু'জনে। শেষে তর্কে হেরে গিয়ে আর কোনো জবাব দেয়নি জর্জ, মুখ গোঁজ ক'রে বসে ছিলো অনেকক্ষণ। তারপর কোনো কথা না বলে উঠে চলে গিয়েছিলো।

যদিও প্রথমদিন আলাপের সূত্রপাত হয়েছিলো কথা কাটাকাটি দিয়ে, তবু, দিনে দিনে আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে গিয়েছিলো। অনাস্থীয় অচেনা আরগার একমাত্র জর্জ লিংডোর সাথে কথা বলেই আরাম পেতাম, আনন্দ পেতাম একমাত্র ওরই সাহচর্যে।

আমাদের হোটলে সন্ধ্যার দিকে তারপর থেকে মাঝে মাঝেই আসতো জর্জ লিংডো বেড়াতে বেরোতাম দু'জনে। পোলো গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়ে শট রাউণ্ডের রাস্তা ধরে। গলুফ লিংকস্‌কে বেটন ক'রে গোলাকার হয়ে আবার পোলো গ্রাউণ্ডে যুবে এসেছে রাস্তাটি। পরিধি দু' আড়াই মাইল।

একদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে জর্জ লিংডো বললো, ‘আচ্ছা রায়, এই নরককুণ্ডে তুমি থাকো কি ক'রে? তোমার অসুবিধে হয় না?’

বললাম, 'কি করবো বলো ? বাধ্য হয়েই থাকতে হচ্ছে ।'

জর্জ লিংডো কোন জবাব দিলো না । চূপচাপ হ'জনে রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম । পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরলাম নিঃশব্দে, যান্ত্রিকভাবে ।

'এক পক্ষে ভালোই ।' জর্জ লিংডো বললো হঠাৎ, 'তোমার ভবিষ্যৎ লেখকজীবনে এই হোটেলের অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে দেবে । কি বলো ?'

'তা হয়তো দেবে ।' বললাম, 'কিন্তু হোটেলের ওই হট্টগোল মধ্য থাকলে এক কলমও আর লিখতে পারবো কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার ।'

'চিরকাল তো আর ওখানে থাকবে না ।' বললে লিংডো, 'এখন শুধু চোখ মেলে দেখে যাও ।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে ঘন হয়ে এসেছিলো বেড়াতে বেড়াতে । উঁচুতে, টিলার মাথায় আলো হয়ে জলছিলো শিলং পাহাড়, ফুটি ফুটি তারার মতো আলোর বিকিমিকি । যেন নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে ঘুমিয়ে একরাশ সোনালী স্বপ্ন দেখছে শিলং ।

পরদিন টিকিনের সময় লিংডো বললো, 'রায়, হোটেলের হট্টগোল ছেড়ে নিরিবিলা একটা ঘরে আসবে ?'

'ঘর ? কোথায় ?'

'সে পরে বলছি । আসবে কিনা বলো ।'

বললাম, 'হোটেল ছাড়তে পারলেই তো বাঁচি । ওই আবহাওয়ার হাঁপিয়ে উঠেছি । কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে ? নিজে রান্না করা সম্ভব নয় ।'

'সে একটা ব্যবস্থা হবেই ।' জর্জ লিংডো জবাব দিলো, 'পাশেই একটা মেসু আছে বাঙালীদের । সেখানকার কয়েকজনের সাথে আমার আলাপ আছে । খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাবে ।'

বললাম, 'তা যদি হয় তাহলে কোনো আপত্তিই নেই । বরঞ্চ সুবিধেই হবে ।'

'তাহলে রাজী ?'

'রাজী ।'

'ছুটির পর চলে যেওনা । আমি নিজে সাথে ক'রে তোমাকে ঘর দেখিয়ে আনবো ।'

জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যায় সবুজ,—শুধু সবুজের মেলা । পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি । পাহাড়ের মাথায় মেঘের দল ভেসে বেড়ায় । কখনো মেঘের পর্দার ঢেকে যায়, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝলমল ক'রে ওঠে সবুজ পাহাড়, মেঘের আবরণ সরিয়ে দিয়ে । ঘরটি বাড়ির এক প্রান্তে । ঘরের পর থেকেই শূন্য,—খাদ্ । নিচে ছোট ছোট সুড়ির মতো ছড়ানো পাথরের টুকরো । তার ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে নদী । পাথরে পাথরে বাধা পেয়ে জল ফুলে ফেনা হয়ে ওঠে । অনেক উঁচুতে ঘরের ভিতর বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে অপক্লপ লাগে । জর্জ লিংডোকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না । এমন সুন্দর

পরিবেশের মধ্যে নিবিবিলি এই ঘরটি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই একই বাড়িতে জর্জ লিংডো থাকে। বাড়িটা ওদেরই।

হোটেল ছেড়ে দিয়েছি জর্জ যেদিন আমাকে এই ঘর দেখাতে নিয়ে এসেছিলো তার পরের দিন। সেদিন জর্জকে বলেছিলাম, ‘আচ্ছা জর্জ, তুমি তো এবার আসতে বলছো আমাকে, কিন্তু তোমার বাড়ির লোকের এতে আপত্তি নেই তো?’

জর্জ লিংডো হাসলো উত্তরে।

‘বাড়ির লোক বলতে তো আমরা দু’জন মাত্র। আমি আর ডোরা। আমার যে আপত্তি নেই সে তো পরিষ্কার। আপত্তি থাকলে তোমাকে নিয়ে আসতাম না। আর ডোরার কথা তার মুখ থেকেই শুনতে পারো ইচ্ছে করলে।’ বলে একটু খামলো লিংডো, ‘দাঁড়াও ডোরাকে ডাকি।’

ডোরা লিংডো জর্জের বোন। নাতিদীর্ঘ সুগঠিত দেহ। মঙ্গোলীয় ছাঁচের মুখের গড়ন, তবু মিষ্টি। ধবধবে গায়ের রং। ছোট ছোট সরল চোখ। পাখীর পালকের মতো মন্থণ পাতলা ঠোঁট। লিপটিকে লাল। ঠোঁটের নিচে মুক্তোর মতো দু’শারি দাঁত। সব মিলে ভারি সুন্দর লাগে। আশ্চর্য লাবণ্যের মূর্তিতে উজ্জল; দেহের প্রতিটি বিন্দু থেকে যৌবন বারে পড়ছে যেন। চোখে পড়তেই খানিকক্ষণ মস্তমুস্তের মতো তাকিয়ে না থেকে পারলাম না।

জর্জ বললো, ‘আমার বন্ধু অশোক রায়। একচামিং ম্যান এ্যাণ্ড এ রাইটার টু। এর কথাই কাল বলেছিলাম তোমাকে।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আমার বোন ডোরা।’

পরিচয় করিয়ে দেওয়া শেষ হয়ে গেলে ডোরা লিংডো বললো, ‘আপনি তাহলে কবে আসছেন?’

বললাম, ‘আপনাদের যদি অসুবিধে না হয় তাহলে আগামী রবিবারেই।’

‘আবার রবিবার কেন?’ জর্জ ধমক দিলো, ‘ইউ মাস্ট কাম টুমরো।’

‘নিশ্চয়। আপনি কালকেই আসুন।’ ডোরা লিংডোও গঙ্গা মেলালো জর্জের সাথে।

তার পরেরদিনই এসেছি হোটেল ছেড়ে। থাকি জর্জ লিংডোর দেওয়া ঘরটিতে, বাই অনতিদূরের একটি মেসে। এ-ব্যবস্থাও জর্জ ক’রে দিয়েছে, যেমন কথা দিয়েছিলো।

শিলংএ যখন প্রথম এসেছিলাম তখন শীতকাল। নামপাতি গ্রাম পিচ এ্যাপ্রিকট গাছগুলি পাতাবিহীন, ক্লক, রিক্ত। শীত কমে গেলে গাছগুলিতে নতুন পাতা ধরলো, ধরলো ফুলের কুড়ি। দিনকয়েক পরেই সাদা ফুলের অজস্রতায় ভরে গেলো। এখন ফুল থেকে পুষ্ট হয়ে গেল ফল। এসেছে ডালিয়া ভেজি আর সুইট পি ফুলের মরশুম। রংএর আঙুনে বাগানে বাগানে জ্বলছে গাছগুলি। বর্ষা নেমে গেছে। সারা দিনরাত অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে। সমতলের বৃষ্টির সাথে অনেক তফাৎ এ-বৃষ্টি। আকাশে যতোই মেঘের ঘনঘটা

ধাক্ক না কেন, কিছুতে বৃষ্টি শুরু হবে না, যতোক্ষণ না মেঘগুলি এসে জমছে শহরের প্রান্তের পর্বতশিখরটির গায়ে। প্রথমে মেঘগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে ধীরে ধীরে জমতে থাকে পাহাড়ের মাথায়। কিছুক্ষণ। তারপরেই ঘন মেঘের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, ওখানে-যে কোনো পাহাড়ের অস্তিত্ব আছে একথা তখন বিশ্বাস করাই শক্ত। আর তখনই বৃষ্টি নামে, প্রথমে যুগলধারে, ক্রমে কমে যায় বৃষ্টির তীব্রতা,—টিপ্ টিপ্ টিপ্ টিপ্, হয়তো সাতদিন ধরেই, এক সুরে। সূর্য দেখা যায় না সে কয়দিন। বাড়ির কাঁটা দেখে নির্ণয় করতে হয় সময়টা সকাল না বিকেল না দুপুর। তবু মাঝে মাঝে কখনো হয়তো বৃষ্টি থামে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকে। পাহাড়ের গায়ে জমেথাকা মেঘগুলি ধাক্কা খেয়ে ছিটকে এসে ছড়িয়ে পড়ে শহরের মধ্যে। কুয়াশার মতো মেঘের গাঢ় আবরণে ঢেকে যায় চারিদিক। যেদিকেই তাকাও সাদা, শুধু সাদা, অন্তহীন ক্যাকাসে সাদা। দশগজ দূরের ঘরবাড়ি গাছপালাও বৃষ্টির আড়ালে অবনুপ্রায়। ছায়া ছায়া! কিন্তু সে-ও ক্ষণিক। বাতাসের ঝাপটায় মেঘের দল শহর থেকে তাদের সাদা তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার চলে যায়। আর অমনি বৃষ্টি। সেই এক সুরে, বিলম্বিত লয়ে রাগিনীর আলাপের ছন্দে—নাসপাতি পাতায় টুপ টুপ বাজনা বাজিয়ে।

এমনি এক বৃষ্টির দিনে জর্জ লিংডোকে বললাম, ‘চলো কাল চেরাপুঞ্জী বেড়িয়ে আসি।’

‘চেরাপুঞ্জী, হঠাৎ?’

‘কাল তো ছুটি অকিস, নংক্রেম নাচের জন্যে।’

‘তাহলে নংক্রেম যাওয়াই উচিত। চেরাপুঞ্জী পবেও যেতে পারবে। কিন্তু নংক্রেম নাচ বছরে একবারই হবে।’ জর্জ লিংডো বললো হেসে।

নংক্রেম নাচের মেলার উৎসব দেখতে শহর থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়। এমন সময় ধূধু কাঁকা মাঠ, নাচের দিনে ভরে যায় অগুনতি দোকানে। নানা জিনিস কেনাবেচা হয়। আর নাচটাও উপভোগ্য।—এ সংবাদও জর্জ লিংডোই দিয়েছিলো। অতএব ঠিক হয়েছিলো নংক্রেম নাচের মেলাই দেখতে যাবো, চেরাপুঞ্জী নয়।

পরদিনও সকাল থেকেই বৃষ্টি। এক ছন্দে। কিন্তু কপাল ভালো ছিলো, বেলা দশটার পর হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেলো। মেঘ সরে গিয়ে আকাশ নীল হয়ে উঠলো, আর নীলাকাশে সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি জ্বলিয়ে দিলো রামধনু। নংক্রেম পৌঁছলাম বেলা দু’টোর সময়, আমি জর্জ আর ডোরা। জর্জের হাতে তার বেহালার বাক্স, আমার কাঁধে খাবারের ব্যাগ, ডোরা খালি হাতে। প্রথম সাত মাইল পথ বাসে, পরের সাত মাইল পাহাড়ের চড়াই ভেঙে পায়ে হেঁটেছি। অতোটা পথ, অতোটা চড়াই হেঁটে আমাদের শরীর তখন অবসন্ন। অত্যন্ত শ্রান্ত।

বললাম, ‘জর্জ, তার তো পা চলে না।’

জর্জ লিংডোও ক্লান্ত । তবে আমার চাইতেও কম । বললো, ‘এই তো এসে গেছি ।
ওখানে বিশ্রাম নেবো ।’

তাকিয়ে দেখলাম দূরে বিরাট প্রাস্তরের মাঝে অগণিত মানুষের ভিড় । সারি সারি
টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরী দোকানঘর—মাঠের একদিকে মোটর গাড়ীর অরণ্য । পৌঁছে
প্রথম খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম নিয়ে তারপর গেলাম নাচ দেখতে । খড়ের চালের বিরাট মণ্ডপ,
সামনে প্রশস্ত আঙিনা । সেই আঙিনায় নাচ । আঙিনার একধারে বাঁশের তৈরী উচু
মাচায় বসে একদল পুরুষ অদ্ভুত সুরে বাজাচ্ছে বাঁশি আর মাদলজাতীর বাঁশ । মাথায়
রূপোর মুকুট, গায়ে হাতে রূপোর ভারি ভারি গহনা, মাথার চুল গেরো দিয়ে পেছন দিকে
বঁধে মেয়েরা নাচছে । সমস্ত শরীর স্থির, এতোটুকু হিলোল নেই, শুধু বাজনার তালে পায়ের
পাতা ছুঁটি ধর ধর করে কাঁপছে । আর মেয়েদের ঘিরে বৃত্তাকারে পুরুষেরা চামর হাতে
এলামেলা ছন্দে প্রদক্ষিণ কবে চলেছে ।

নাচ দেখে তারপর চা খেয়েছি গিয়ে প্রাস্তরের মাঝে টিনের ছাউনির অস্থায়ী দোকান-
গুলির একটিতে বসে । প্রাস্তরের অনতিদূরে পাইনগাছে ঢাকা একটি ছোট টিলা । সেখানে
গাছের ছায়ায় বসে বেহালার তারে ছড়ের টানে ঝঙ্কার তুলেছে জর্জ লিংডো, গানের ধ্বনি
তুলেছে ডোরা বেহালার সুরের সাথে সুর মিলিয়ে । নির্বাক হয়ে বসে দাঁতে পাইনের পাতা
কাটতে কাটতে আমার মন ছড়িয়ে গেছে অজস্র চসমান মানুষের স্রোতে ।

দারিদ্র্যের সাথে দৈনন্দিনের লড়াই একটি দিনের জন্তেও ভুলে গিয়ে আনন্দে যেতে
উঠে কেমন সজীব হাসি ফুটেছে সকলের মুখে, একথা ভেবে আশ্চর্য হয়েছি । জাত হিসেবেই
এরা সবল এবং সজীব । আয়োদপ্রিয়, হাসিখুশি । দারিদ্র্যের অনটনকে তুচ্ছ ক’রে
হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া, সামান্য আনন্দের বিনিময়ে, এদের অন্তর্জ্ঞেও দেখেছি । শিলং
শহরেই তো কতোদিন চোখে পড়েছে সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর হয়তো সামান্য
অর্থ পেয়েছে, তারপর সন্ধ্যাবেলা দলবঁধে জমায়েত হয়ে স্প্যানিস গিটার আর এ্যাকডিয়নের
সুরে গলা মিলিয়ে সন্মেলক কণ্ঠে মাতিয়ে তুলছে আকাশ বাতাস । কিংবা বামুথানা । যাকে
আমরা বলি চড়িভাতি । এক মহিলার আবালবৃদ্ধ বণিতা একসাথে মিলে বনভোজন ।
প্রত্যেকটি উৎসবে, সাধারণ ব্যাপারেও, এরা অত্যন্ত সামাজিক । প্রাণোচ্ছল ।

নংক্রম নাচের মেলা থেকে ফিরতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো । সমস্ত পথ
হেঁটে, পাহাড়ের উৎরাই হেঁটে শিলং পৌঁছেছিলাম রাত দশটার সময় । পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত
অবসন্ন । পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায় । সর্বাঙ্গে ব্যথা । অসহ্য ব্যথা । নড়তে
ইচ্ছে করছে না এমন অবস্থা ।

ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত লিখে জর্জ লিংডোর হাতে দিয়ে বললাম, ‘এটা সেক্সনে
দিয়ে দিও । আজ আর অফিস যাবো না ।’

‘অফিস যাবে না, কেন ?’ জর্জ লিংডো প্রশ্ন করলো, ‘আজ তো শনিবার । হাফ্ ডে
অফিস । শুধু শুধু ছুটি নষ্ট করবে কেন ?’

বললাম, ‘সেসব হিসেব বুঝিনা। সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে গেছে কাল অতো হেঁটে।’

হেসে উঠল জর্জ।

‘ও। এই কারণে!’

ডোরা লিংডোও উপস্থিত ছিলো। হাসলো সে-ও।

‘আমি মেয়েমানুষ হয়েও কারু হইনি। আর আপনি—’

‘তোমাদের কথা আলাদা—জবাব দিলাম, ‘আমি সমতলের মানুষ, এতো চড়াই হাঁটা, একি আর আমার ঘাতে সহ হয়!’

তারপর জর্জ লিংডো অফিস চলে গেলো। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ডোরা এলো কিছুক্ষণ বাদে, বাইরে বেরোবার সাজপোশাক সেয়ে।

‘এ কি, আপনি এখনো শুয়ে আছেন?’

কোনো জবাব না দিয়ে নীরবে হাসলাম।

‘পুরুষমানুষের শরীর এতো অল্পে কারু হয়ে পড়লে চলবে কেন? উঠুন শিগগির!’

কপট ধমক দিলো ডোরা।

তবু আমি শুয়ে রইলাম। ডোরার দিকে চেয়ে। লাল গ্যাভার্ডিনের কাপড় জড়িয়েছে দেহকে ঘিরে, মাথায় দিয়েছে অবগুণ্ঠন। লাল কাপড়ের ঘেরা টোপে মুখ ঘেরা। অদ্বিত সুন্দর লাগছে। ঠোঁটে লিপটিকের রং, গালে রুজ, চোখে হালকা ক’রে সূর্য টেনেছে। ছুই ভর মাঝখানে আগুনের মতো জ্বলজ্বলে নিপুণহাতে আঁকা টিপ। আমার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো ডোরা।

বললাম, ‘ডোরা, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো, খুব কড়া?’

‘চা? কিন্তু আমি যে দোকানে যাবো এখন।’

‘তাহলে থাক।’

‘দাঁড়ান ক’রে আনছি। তবে চা নয়, কফি। তাতে শরীরের ম্যাজম্যাজানি কমবে কিছু।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী কফি নিয়ে এলো ডোরা। বললো, ‘এবারে উঠুন।’

‘উঠতেই হবে?’

‘না উঠলে দেবো না। কফি কেবল নিয়ে যাবো তাহলে।’

অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো। বললাম, ‘জানো ডোরা, তোমার সাথে আমার ছোট বোনের স্বভাবের বেশ মিল আছে।’

‘তাই নাকি?’ ডোরা লিংডো হাসল। হাসির আভাস সুন্দর চেউ খেলে গেলো ওর গালে।

‘আমার ছোট বোনের কথাবার্তার ধরন অনেকটা তোমার মতো। সে-ও এইরকম করে। বলে আমি নাকি ভীষণ আলসে। বিছানায় শুয়ে থাকলে কিছুতেই দিতে চায়না চায়ের কাপ।’

ডোরা লিংডো লজ্জা পেলে একটু ।

‘আপনার বোনের ব্যেস কতো ? আমার সমান ?’

‘ব্যেস প্রায় তোমার মতো । সামান্য কম হতেও পারে ।’

উৎফুল্ল হয়ে হাসলো ডোরা লিংডো, ‘কি নাম তার ?’

বললাম, ‘নমিতা ।’

‘নমিতা ? বাঃ বেশ সুইট তো ! বিয়ে হয়ে গেছে ?’

‘না । এখনো হয়নি । এমু এ পড়ে, পাশ করলে তখন চেষ্টা করবো ।’

‘এমু এ পড়ে ?’ ডোরা বিস্মিত হয়ে বললো, ‘আমার সাথে তার তুলনা করছেন ?’

আমিও অবাক হলাম ডোরার কথায় । ‘কেন ?’

‘আমি তো পড়াশোনায় একেবারে মুখ ।’

বললাম, ‘তাতে কি হয়েছে ?’

কথাটা ঘুরিয়ে নিলো ডোরা লিংডো । বললো, ‘আমারও কম ব্যেসে লেখাপড়ার দিকে প্রচুর উৎসাহ ছিলো । অচ্ছ হয়নি । আমাদের সমাজব্যবস্থাই এমন যে—’ কথাটা শেষ না ক’রে বিষমভাবে হাসলো ।

আমিও আর কথা বাড়ালাম না । লেখাপড়া জানা লোক সম্বন্ধে ডোরা লিংডোর দুর্বলতা অনুভব করতে পারলাম বলেই মনে মনে ঈর্ষ্য গর্বিত বোধ হলো নিজেকে ।

জর্জ লিংডোর সাথে যেমন ডোরা লিংডোর সাথেও আলাপ—বনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিলো তেমনই । মেয়েটি মিশুক স্বভাবে কথাবার্তায় সরল । শুধু অবাক লাগতো এইরকম সুন্দরী একটি মেয়ে, সে কিনা জীবিকার জন্তে সারাদিন বড়বাজারে একটি ফলের দোকানে বসে কাটায় ! কিন্তু এদের সমাজে এটাই স্বাভাবিক । মেয়েরাই প্রধান । কাজ কর্ণে, দোকান বাজারে, সব জায়গাতেই ডোরা লিংডোর মতো মেয়েরাই ছড়িয়ে আছে । আমি অন্য সমাজের, অন্য দেশের মানুষ বলেই আমার চোখে প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য লাগতো । অবাক বোধ হতো ।

কিন্তু মানুষের মনে কতো সাধারণ কারণে ঈর্ষা, ঈর্ষা থেকে ইতর ধারণা এসে কবে আমার জানা ছিলো না । নংক্রম নাচের মেলা দেখতে আমি গিয়েছিলাম, ডোরা লিংডোও সঙ্গে গিয়েছিলো । এই সামান্য সূত্র থেকে পত্রপুষ্পে পল্লবিত করে কতো কিছু অনুমান করা সম্ভব এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে ঈর্ষাবিত হয়ে ডোরা লিংডোর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা বলে আমাকে জর্জ লিংডোর বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবার হীন চেষ্টা কেউ করতে পারে ধারণাই করতে পারিনি । আমি যে মেসে ছ’বেলা খেতাম সেখানকার লোকেরাই আমাকে এই না-জানা জিনিসগুলি জানিয়েছিলো ।

সেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি একেবারেই বৃষ্টি হয়নি । আকাশ নির্মল,—নীল । পাইনবনের ওপারে সূর্য ঢলে গিয়েছিলো । পাহাড়ের ঢালু দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এসেছিলো অন্ধকার ।

রাতিরে খেতে গিয়েছি যেসে, একজন বোর্ডার বললো, ‘কি দাদা, কাল নংক্রেম কেমন দেখলেন?’

‘এ্যা?’

‘কাল নংক্রেম কেমন দেখলেন?’

‘ভালো।’

‘ভালো তো লাগবেই।’ বললো আর একজন, ‘অমন মজী যদি পাওয়া যায়।’

কথাটা বললো এমন স্বরে, আর এমন একটা ইঙ্গিত দিয়ে যে, ষট্ করে কানে বাধলো।

বললাম, ‘তার মানে?’

‘মানে আর কি! আপনি বাগিয়েছেন ভালো।’

এইবারে হৃদয়ঙ্গম করলাম কি বলতে চায় ওরা। অত্যন্ত ইতর মন তো! প্রত্যেক জিনিসেরই কদর, খারাপ দিকটা ছাড়া কি কিছু ভাবতে পারেনা!

‘কি বলতে চান আপনারা?’

আমি নিজেই অনুভব করলাম আমার কথার সুরে রাগ এবং বিরক্তি দুইই একসাথে প্রকাশ পেয়েছে। হেঁ হেঁ করে বিনয়ের হাসি হেসে বললো, ‘কেন আর লুকোচুরি খেলছেন শুধু শুধু। ধরা পড়ে গেছেন। চাক্ষুষ দেখেছি। আমরাও নংক্রেম গিয়েছিলাম কাল।’

আর একজন বললো, ‘কিন্তু ওই মেয়েকে দেখলে যতো নিরীহ মনে হয় আসলে ততো নয়। ওর কাণ্ডকারবার যদি জানতেন!’

কথাগুলি শুনে শরীরের প্রতিটি ধমনীতে রক্তস্রোত উষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু দমন করলাম বহুকষ্টে। একটা কথা বলার অর্থ ই এদের ইতরামিকে প্রশ্রয় দেওয়া। তার চাইতে চুপ ক’রে থাকাই ভালো। একদিন হু’ল্লিন এরা এ নিয়ে মন্তব্য থাকবে, কানামুখো করবে, তারপর আপনমনেই ভাটা পড়বে ইতরামির স্রোতে।

গম্ভীর মুখে গিয়ে খাবার টেবিলে বসলাম। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ ক’রে উঠে চলে আসছি, পেছন থেকে ডাকলো একজন, ‘আপনি কি রাগ করেছেন?’

গা জলে উঠলো ঝাকামিতে। তবু বললাম, ‘না, রাগ করবো কেন?’

‘তাহলে একটু বসুন। কয়েকটা গুরুতর কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।’

এমন গম্ভীর স্বরে বললেন ভদ্রলোক যে, চমকে উঠলাম। কি এমন গুরুতর কথা! তারপর মনে হলো, সত্যিই কি গুরুতর কিছু, না সেই এক ইতর আলোচনা! কিন্তু ভদ্রলোকের স্বরে এমন একটা কিছু ছিলো যে, না বসে পারলাম না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

খাওয়া শেষ ক’রে মন্থর গতিতে এলেন ভদ্রলোক। সিগারেট ধরালেন আয়েস ক’রে তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘মেয়েটিকে কেমন মনে হয় আপনার?’

মেয়েটি বলতে তিনি যে ডোরা লিংডোর কথাই বোঝাচ্ছেন এটা স্পষ্ট। প্রশ্নটাও অত্যন্ত সোজা।

‘আমার ?’

সিগারেটে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে পানুটা প্রশ্ন করলাম।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার।’

‘ভালো। অত্যন্ত সরস। মিষ্টি চেহারা। কথাবার্তায় অনেকটা আমার ছোট বোনের মতো।’

সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং তৈরি করতে করতে তাক্সিলোর সুরে বললেন ভদ্রলোক, ‘তুমি এই ? না, মিছে কথা বলছেন ?’

এবারে বিরক্ত বোধ হলো। কি বলতে চায় এরা ! কথাবার্তার ধরনে মনে হচ্ছে কোন রহস্য আছে ভিতরে।

‘বড়বাজারে ওর একটা ফলের দোকান আছে, জানেন ?’ ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন।

‘জানি।’

‘ওর দোকানের বিক্রী খুবই ভালো, হয়তো অন্যান্য দোকানের তুলনায় বেশিই, তাও বোধ করি জানেন ?’

‘জানি কিন্তু তাতে হয়েছে কি। বিক্রী বেশি হওয়াটা নিশ্চয় ডোরার দোষ নয় !’

‘কেন এতো বিক্রী জানেন ?’

‘না।’

‘ওর চেহারার জন্তে।’

বিরক্তি সঞ্চার করতে পারলাম না আর। বললাম, ‘সেটাও ডোরার দোষ নয়। ভাছাড়া, এইসব অর্থহীন কথা শোনার জন্তেই কি আমাকে বসিয়ে রেখেছেন ? আমার সময়ের মূল্য আছে।’

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক চোখ কুঞ্চিত করলেন। তারপর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন একরাশ। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। চটি দিয়ে সেটা দলিত করতে করতে বললেন, ‘কথাটা আপনাকে বলতে একটু বিধাবোধ করছিলাম। কিন্তু আপনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। কাজেই বেশি না বাড়িয়ে বলে কেলাই ভালো।’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন ভদ্রলোক।

‘বড়বাজারে ওর ফলের দোকানে সবসময়ই ছ’একটা লোক আছেই, এটা আপনি যে কোনোদিন গেলেই বুঝতে এবং দেখতে পারেন। তার কারণ ওর চেহারা ভালো। মৌ-লোভী মৌমাছিদের মতো ওর পেছনে তাই অনেকেই ঘোরাফেরা করে। আমি যখন প্রথম শিলং আসি, ঘুরতে ঘুরতে বড়বাজারে গিয়ে প্রথমদিনই ওকে দেখেছিলাম। চোখে আটকিয়ে ছিলো ওর চেহারা। তার পর থেকেই কল কেনবার প্রয়োজন হলে সর্বাত্মে ওর দোকানে যেতাম। কিনতাম বেশি দাম দিয়েও। এরকম অনেকেই যেতো, এখনও যায়।’

সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ডোরা লিংডোও এ-সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। ওর দোকানেই কেন এতো লোক ভিড় করে তা ডোরা বোঝে খুব ভালো করেই। এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করে। তা কল্লক।’

ভদ্রলোক আবার ধামলেন।

বললাম, ‘আপনার কথার কিছুই বুঝিনা। আপনি কি প্রমাণ করতে চান?’

ঈশং হেসে ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনি যেমন স্বর্জ লিংডোর বাড়িতে আছেন, কিছুকাল আগে আরো এক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। অমলেন্দু সেন। আমার বিশেষ বন্ধু ছিলো সে। বয়েস আপনারই মতো, চেহারা সুন্দর। ক’লকাতা থেকে এসেছিলো একই চাকরি নিয়ে। একটি আশ্চর্য্য গুণ ছিলো অমলেন্দুর। কথায় বলে সংগীতের এমন প্রভাব—এমন ক্ষমতা আছে যে, চৈত্রেয় ধররৌদ্রতপ্ত আকাশেও মেঘমল্লারের সুর বর্ষার ধূসর মেঘ আনতে পারে—নামাতে পারে ধারাবর্ষণ। আবার দীপক রাগিণীর সুর জ্বালতে পারে বিশ্বব্যাপী দাবাঘি। সত্যি কিনা জানিনা। তবে বেহালার তুরে ছুঁড়ের টানে মানুষকে মুগ্ধ, মোহিত করতে পারতো অমলেন্দু। সেটা সত্যি। এবং সেই কারণেই ডোরা লিংডো মুগ্ধ হয়েছিলো, আকর্ষিত হয়েছিলো অমলেন্দুর প্রতি। ডোরার চেহারা আগের তুলনায় অনেক ধারাপ হয়ে গেছে এখন। সে সময় এমন জৌলুষ, এমন মাদকতা ছিলো ওর দেহের স্ফুটাম গঠনে যে, আকর্ষণ অসুভব করেছিলো অমলেন্দুও। আর সেই আকর্ষণের থেকে জন্ম নিয়েছিলো ভালোবাসা।’

ভদ্রলোক আর একটি সিগারেট ধরাবার জন্তে ধামলেন।

সেই অবসরে আমি বললাম, ‘এ তো আপনি নিটোল প্রেমের গল্প কাঁদছেন একটি।’

‘তাই’ ছাই-দানিতে নিভে যাওয়া দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিয়ে বললেন ভদ্রলোক, ‘কিন্তু অমলেন্দুর ভাগ্য মন্দ ছিলো। ডোরা লিংডোর মতো রূপবতী মেয়ে বিদেশী একটি ছেলেকে ভালোবাসে, এটা অনেকেই মনে মনে নিতে চাইলো না। ঈর্ষা এসে দেখা দিলো তাদের মনে। ঈর্ষা থেকে রেবারেসি। সেই রেবারেসির আঙুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো অমলেন্দু। একদিন অকস্মিক থেকে ফিরে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলো একা একা, আর ফিরলো না। পরদিন বিডন কনসের কাছে পাইনবনের ভিতর পাওয়া গেলো তার মৃতদেহ। অজস্র বক্তৃকরণে সমস্ত দেহ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো। শরীরের তিন জায়গায় বড় বড় ক্ষত। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে কেউ বা কারা রুদ্ধ আক্রোশে। অপরাধীদের কোনো চিহ্নই পুলিশ বার করতে পারেনি।’

‘কিন্তু আপনার কাহিনা থেকে ডোরা লিংডোর কোন অপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।’

বললাম, ‘আপনার কাহিনী সত্যি হলেও এটাই প্রমাণিত হয় ডোরা সত্যিই ভালোবাসতো অমলেন্দুকে সে ক্ষেত্রে—’

বাকী কথাটা আর শেষ করতে দিলেন না ভদ্রলোক। বললেন, ‘এ পর্যন্ত ডোরা লিংডোর কোনো দোষ ছিলো না, সেটাও আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু—’

‘কিস্ত, কিস্ত কি ?’

‘কিস্ত তারপর থেকে আশ্চর্য ভাবে বললে গেছে মেয়েটা। অর্থাৎ অমলেন্দুর মৃত্যুর পর। শি-ইজ্ নাউ অলমোস্ট এ প্রস্টিটিউট।’

ডোরার সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত কথা শোনবার ক্ষেত্রে প্রস্তুত ছিলাম না আদৌ। চমকে উঠে বললাম, ‘আপনি কি বলছেন ? এ আমি বিশ্বাস করি না।’

‘হোয়াট আই এ্যাম সেইং ইজ টু।’ সিগারেটের শেষ টুকরোটা একইভাবে চটি দিয়ে দলিত করতে করতে বললেন, ‘শি হ্যাক বিকাম এ প্রস্টিটিউট নাউ। আপনি যদি একটু মনোযোগ দিলে লক্ষ্য করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি কিনা। রাত কিছুটা গভীর হলেই, বারোটা একটা, দেখবেন ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় লিংডোর বাড়ির সামনে, ডোরা বেরিয়ে যায়। অভিসার শেষ হলে ফিরে আসে, ট্যাক্সির আরোহীরা এসে নামিয়ে দিয়ে যায় রাত দু’টো আড়াইটে নাগাদ। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি অনেকদিন। দেখবার ক্ষেত্রেই জেগে বসে থেকেছি রাতের পর রাত।’

বললাম, ‘আপনার কথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া, জর্জ আছে। ডোরার বড় ভাই সে। চোখের ওপর বোনকে উচ্ছ্বসে যেতে দেবে এমন লোক জর্জ নয়।’

‘উপায় নেই জর্জ লিংডোর। ওদের সমাজ তো জানেন, স্ত্রীপ্রধান। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় মেয়েরা। বিয়ের পর ছেলেরা ঘর করতে আসে মেয়ের বাড়িতে। মেয়েরা হুকুম করে, ছেলেরা পালন করে। ওই বাড়ির মালিক ডোরা লিংডো, নিজে দোকান ক’বে উপার্জন করে সে। কাজেই জর্জ লিংডোর আপত্তি থাকলেও রোধ করবার ক্ষমতা নেই। এই নাটকের সে একজন সাধারণ দর্শক যাত্র ?’

‘সব বুঝলাম। কিস্ত এসব কথা বললেন কেন, হঠাৎ ?’

‘আপনাকে বললাম তার কারণ আপনার মজল চাই। যদিও জানি অমলেন্দুর দশা আপনার হবার কোনো সম্ভাবনাই আর নেই। আপনার সাথে যদিও ঘনিষ্ঠতা জন্মে ডোরার তাহলেও, কেউ আর ঈর্ষা করবেনা আপনার সৌভাগ্যকে। কারণ, ডোরা লিংডো এখন সহজলভ্য। কিছু টাকা খরচ করলেই তার দেহের স্বাদ পেতে পারে যে কেউ। আপনি ওখানে, ওই পরিবেশে, এমন একটি মেয়ের সান্নিধ্যে আছেন না জেনেই, এইটাই আমাদের ধারণা। আপনাকে সতর্ক করে দিলাম। এখন আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন।’

রাত সাড়ে এগারোটা। মেস থেকে বেরিয়ে রাস্তার এলাম। ঝিরঝির ক’রে বৃষ্টির ঝড়ো ঝরছে। মেঘের লেপ গায়ে জড়িয়ে আকাশের তারারা ঘুমিয়ে পড়েছে। চাপা অন্ধকারে নাসূপাতি গাছের ঋদ্ধু ঝড়িগুলি রাস্তার ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। রাস্তার মাঝে কোন কোন জায়গায় ইলেকটিক আলো মিটমিট ক’বে জ্বলছে। স্বল্প আলো, চারপাশে ঘন অন্ধকার ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুযোগ পেলেই আলোকে গ্রাস করবার আশায়। পথে জনপ্রাণী নেই। নেই রাস্তার লোমশ কুকুরগুলোও। হয়তো কারও বারান্দায় গিয়ে শুয়েছে

কুণ্ডলী পাকিয়ে। অন্ধকারে ভয় পেয়ে পাইনগাছগুলি জড়াজড়ি করে এক হয়ে 'কাঁপছে, বাতাসের দোলায়।

একা হাঁটতে হাঁটতে ডোরা লিংডোর কথাই ভাবছিলাম। ওরা যা বললো তা আমার বিশ্বাস হয়নি ঠিক। কেন না, যদিও ডোরা লিংডোর সাথে পরিচয় আমার বেশিদিনের নয়, তবু, যতোটুকু দেখেছি—যতোটুকু মিশেছি তাতে ও-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। আর, আমি তো একই বাড়িতে আছি কয়েক মাস ধরে, কিছুই কি টের পেতামনা এতোদিনে? রাস্তিরে মাঝে মাঝেই অভিসারে বেরোয় অপরিচিত পুরুষের সাথে, শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে, যদি সত্যি হতো একথা, তাহলে, এই যতোদিন আমি এখানে আছি তার মধ্যে একদিন না একদিন আমার চোখে পড়তোই! যদিও শিলংএ এ-জিনিসটা অত্যন্ত সাধারণ, অনেক মেরেই অর্থ উপার্জন করে এইভাবে, তবু ডোরা!

কিন্তু শুধু শুধু মিছে কথা, এমন সাজাতিক মিছে কথা, কেন বলবেন ভদ্রলোক! কি উদ্দেশ্য! এমন হয়তো হতে পারে ডোরা লিংডোর রূপের ওপর লোভ আছে মেসের অনেকেরই, ওই ভদ্রলোকেরও! ওরা কেউ আলাপ করতে পারছেন ডোরার সাথে, কাছেই ঘেঁষতে পারছেন, আর আমি কয়েক মাস এখানে এসেই নিবিড় আলাপ জমিয়ে নিজেছি, সাহচর্য পাচ্ছি ডোরার, পাচ্ছি সান্নিধ্যও। আমার ওপর ঈর্ষা জমার পক্ষে এই কারণ-গুলি যথেষ্ট। আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্তেই এতো কথা ওদের। ওদের কথা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্তে খুব বেশি সময় বা কষ্ট, কোনোটারই প্রয়োজন নেই। জর্জ অথবা ডোরা যে কোনো একজনকে প্রশ্ন করলেই হবে অমলেন্দু সেন নামে কোন লোক এ বাড়িতে ছিলো কিনা। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে কেমন যেন বাধা বাধা ঠেকে। যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে কেন?—তার চাইতে কয়েকদিন রাত জেগে লক্ষ্য করলেই সন্দেহ নিরসন হয়ে যাবে।

বাড়ির গেটের ভিতর ঢুকতেই বারান্দা থেকে কুকুরটা ষেউ ষেউ ক'রে উঠলো। ছুটে নেমে এলো বারান্দা থেকে। অন্ধকারে চিনতে পারিনি আমাকে। কাছে এসে গা শুকে লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেলো। ঘরে ঢুকে আলো জালিয়ে জামাকাপড় বদলে নিলাম। ডোরা লিংডো জেগে ছিলো। আমার ঘরে আলো জলতে দেখে দোর খুলে মুখ বার ক'রে প্রশ্ন করলো, 'মিস্টার রায়, আপনার আজ এতো দেরী হলো যে?'

বললাম, 'ভাস খেলছিলাম একটু।'

'ও!'

দরজা বন্ধ ক'রে দিলো ডোরা। জানালার কাচের গা থেকে মুছে গেলো আলোর

আভা। একটু বাদেই আলো নিভিয়ে হয়তো শুয়ে পড়লো ডোরা।

যতো সব বাজে কথা! রাস্তিরে অভিসারেই যদি বেরোবে, তবে এতো তাড়াতাড়ি বিছানার শুয়ে পড়বে কেন? ঘুমের চেষ্টায়! সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে ভেবে হাসি পেলো। ঈর্ষার মানুষ কি না করে?

তবু সন্দেহের একটা তিল আঠার মতো আটকে থাকলো মনে। আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বসে রইলাম। এই জানালা দিয়ে তাকালে বাইরের গেটুটা দেখা যায় পরিষ্কার।—টুপটুপ ক'রে বৃষ্টির ফোঁটা বাজনা বাজাচ্ছে ঘরের টিনের চালের ওপর; অবিশ্রান্ত। একবেয়ে একটা শব্দ কেঁপে কেঁপে ভেসে যাচ্ছে বিরঝিরে বাতাসে, রাত্রির অতলান্ত নিস্তরুতা শব্দের চেউয়ে ভরিয়ে দিয়ে। একটানা, একাকার—ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে অন্ধকারের কানে কথা বলার মতো। জানালায় চুপচাপ বসে আছি, এক একটি ক'রে মিনিট ঘড়ির কাঁটায় ঘুরে ঘুরে সময় এগিয়ে চলেছে। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার অন্ধুরাণ। পথে লোক নেই, আকাশে তারা নেই। স্তরুতা। এই বৃষ্টির বিরঝির ও ডো, অক্লান্ত অশ্রান্ত, যদিও এ আমার ভালোই লাগে, তবু, এই মৃত্যুর মতো আড়ষ্ট অন্ধকার—এই মৃতদেহের মতো। অতিব্যক্তিহীন রাত্রি, আর শোক বিলাপের মতো আকাশের অন্ধুরস্ত কান্নায় দেহমন যেন অলস হয়ে আয়ছে। জানালায় নিশ্চুপ বসে তাকিয়ে আছি প্রথর দৃষ্টিতে গেটের দিকে, কোন ট্যান্ডি এসে দাঁড়ালেই দেখতে পাবো।

কিন্তু ঘুম। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা। বৃষ্টির আবিস্তার সুরে আমার মনও যেন অজান্তেই বাঁধা পড়ে গেছে। ওদিকে, ওই কোণে টেবিলের ওপর টাইমপিস্টার টিক্‌টিক্‌ আওয়াজ ঘরের নিস্তরুত বাতাসে ধ্বনি তুলেছে। কতো রাত হয়েছে ওই যন্ত্র তা অনায়াসেই বলে দেবে। কিন্তু উঠে গিয়ে যে দেখবো তা-ও ইচ্ছে করছেন। ঘুমের আবেশে লুপ্ত হয়ে গেছে দেহ। বারবার তুলে পড়ছে চোখ, আবার চেপ্টা ক'রে খুলছি। সমস্ত রাত আমাকে লক্ষ্য রাখতেই হবে।

বৃষ্টির টিপটিপ ফোঁটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। কিছু পরে একটু একটু ক'রে পরিষ্কার হতে লাগলো আকাশ। হেঁড়া হেঁড়া মেঘের ফাঁকে মৃদু দীপ্তিতে হেসে উঠলো তারার ঝাঁক। ঘরের টিনের চালের ওপর সেই একটানা টুপটুপ শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। কতো রাত এখন? চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে খুঁজে বার করলাম দেশলাই। ফস্‌ ক'রে একটি কাঠি জ্বলে দেখলাম রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। এইবার ঘুমোনো যায় নিশ্চিত চিন্তে।

এইভাবে পাহারা দিয়েছি পর পর সাত রাত। আগাগোড়া অজ্ঞান বিগল। সন্দেহের যে তিলুটা আঠার মতো আটকে ছিলো মনে, সেটা ঝড়ে পড়ে গেলো। তারপর কেমন ভেদ চেপে গেলো। ওরা আমাকে সরাতে চায় জর্জ লিংডোর বাড়ি থেকে। তার জন্তে ডোরা লিংডোর সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছে আমাকে, সন্দেহের বিভ্রী ধারণায় যাতে ঘণা করি ডোরাকে। কিন্তু আমার চরিত্রের হিসেব করতে একটু ভুল করেছে ওরা। আগের চাইতে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করলাম ডোরার সাথে। ওরা দেখুক : ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

জোর ক'রে জর্জ আর ডোরাকে একটি ছুটির দিন নিয়ে গেলাম চেরাপুঞ্জী বেড়াতে। আর একদিন মফলং আর একদিন পাইন্‌ উরস্লা। এইসব জায়গায় বেরিয়ে কিরকম

ভালো লেগেছে, কতো আনন্দ পেয়েছি, তার পূর্ণ বিবরণ মেসের প্রত্যেকটি লোককে গায়ে পড়ে শুনিয়েছি। ওরা কোনো জবাব দেয়নি, নিশ্চুপ হয়ে শুনেছে। দীর্ঘায় ওদের হৃদয় কেমন জ্বালা করছে সেকথা কল্পনা ক'রে নিষ্ঠুর আনন্দ পেয়েছি।

আমার ছোট বোন নমিতা কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে একটি সোয়েটার বুনে পাঠিয়েছিলো। প্রথম দিন সেই সোয়েটার গায়ে দিয়ে মেসের সকলকে এক এক ক'রে দেখিয়েছি। বলছি মিথ্যে ক'রেই, 'ডোরা বুনেছে। সুন্দর হয়েছে, না?'

প্রতিটি কথায়, প্রতিটি আচরণে এটাই শুধু ওদের চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি : দেখো, তোমাদের উদ্দেশ্য কেমনভাবে ব্যর্থ করছি আমি।

এর মাঝে হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম একটি। কলকাতা থেকে লিখেছে নমিতা। কয়েকদিন আগে রেজেষ্ট্রি ক'রে বিয়ে করেছে তারই এক সহপাঠিকে। এ খবর গোপন রেখেছে এখনও কেউ জানেনা। আমার সমর্থন চায়। আমার সম্মতি পেলেই বাড়িতে জানাবে। চিঠিটা পড়ে ক্ষুব্ধ হলাম। আমাকে জানানো না কেন? আমি কি বাধা দিতাম? বরঞ্চ আমি চেষ্টা করলে শুভকাজটা সাড়ম্বরে হতে পারতো। কোন প্রয়োজন হতো না এই গোপনীয়তার। একটি মাত্র বোন নমিতা, তার ইচ্ছের বিপক্ষে আমরা যাবো একথা সে ভাবলো কি করে?

ডোরা লিংডো সাজপোশাক সেরে বেরোচ্ছিলো বাড়ি থেকে। দোকানে গিয়ে বসবে। বারান্দার চেয়ারে আমাকে বসে থাকতে দেখে বললো আপনাকে চিন্তাশ্রিত মনে হচ্ছে। চিঠিতে কি কোনো দুঃসংবাদ আছে?

বললাম, 'না, দুঃসংবাদ নয়। তবে চিন্তিত ঠিকই।'

'কেন?'

'চিঠি পেলাম নমিতা হঠাৎ বিয়ে করেছে তারই এক সহপাঠিকে।'

'তাই নাকি?' উৎফুল্ল হলো ডোরা, 'সার্টেন্‌লি ইট ইজ্‌ দি ম্যান্‌ শি লাভ্‌স্‌!'

'কিন্তু যুক্তি কি জানো, এ বিয়ের খবর আমার বাড়ির কেউ এখনও জানেনা। সকলেই যে খুশি হবে তা নয়। নমিতা নিজেও এই ভয় করছে। আমার সমর্থনের সঙ্গে অপেক্ষা করছে এখন। অথচ আগে যদি আমাকে জানাতো কোন অসুবিধেই হতো না ওর।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডোরা বললো, 'এ-নিয়ে কোন সাংসারিক গুণগোলের আশঙ্কা আপনি কি সত্যিই করেন?'

চট্‌ ক'রে জবাব দিতে পারলাম না। একটু ভেবে বললাম, 'সম্ভাবনা যে আদৌ নেই তা নয়।'

'তাহলে কাল সকালেই আপনি কলকাতা রওনা হয়ে যান।'

'কলকাতা?'

'হ্যাঁ। সেখানে আপনি উপস্থিত থাকলোঁহয়তো অশান্তি এড়াতে পারবেন।'

কথাটা মন্দ বলেনি ডোরা।

বললাম, ‘তাহলে ছুটির চেষ্টা করি। যদি সম্ভব হয় কালই রওনা হবে।’

ছুটির বন্দোবস্ত করতে বেগ পেতে হলো অনেক। মাত্র সাত দিনের ছুটি, তারই তদ্বির তদারকে সারাদিন গলদ্বর্ম হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছিলো।

রাস্তিবে ডোরা লিংডো দোকান থেকে ফিরলো প্রায় ন’টার সময়। হাতে একটা বেশ বড়রকমের বেতের বাস্কেট। বললো, ‘এটা নিয়ে যাবেন সাথে। আপনার বোনের জন্যে।’

‘কি ওটা?’

‘সামান্য কিছু ফল। আপনার বোনকে দেবেন।’ একটু গেম্বে বললো তারপর, ‘ফলওয়ালী আমি। আর কিছু তো দেবার সামর্থ্য নেই।’

ডোরা লিংডোর কথার কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। এমন আশ্চর্য সরলতা এদের কথায়, আচার-আচরণে যে, মনে দোলা লাগেই।

রাস্তিবে কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। মনে উদ্বেগ ছিলো। নমিতার বিয়ে নিয়ে কোনো অশান্তি যদি হয়। আর সকলকে হয়তো বুঝিয়ে রাজী করানো যাবে। কিন্তু বাবা। পুরনোকালের মানুষ তিনি। প্রতিটি বটনা বিচার করেন রক্ষণশীল যুক্তি দিয়ে। একালের সমাজকে, আধুনিক রীতি-নীতিকে মানতে চান না। ভয় একমাত্র তাঁকে নিয়েই। যা রগ্‌চটা স্বভাবের মানুষ, একবার বেকে বসলে আর কিছুতেই টলানো যাবেনা।

চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ওলট পালট করবার জন্যে ঘুম আসছিলো না। কতো রাত জানিনা। বিহানায় গুলে এপাশ-ওপাশ করতে করতে হঠাৎ মনে হলো বাড়ির গেটের সামনে একটি মোটর থামার আওয়াজ পেলাম যেন। চমকে উঠে বসলাম। রক্তশ্রোত উদ্দাম হয়ে উঠলো ধমনীর ভিতর। নিঃশব্দে জানালায় ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। জ্যোৎস্না প্রাবিত রাত্রি, আকাশে অসংখ্য তারার দেওয়ালী। চাঁদ মাঝ আকাশে। জ্যোৎস্না থাকার জন্যে দেখতে পেলাম স্পষ্ট : গেটের সামনে কালো রংএর ঢালু-ছাদ একটি মোটর দাঁড়িয়ে।

কয়েক যুহুর্ভ। বারান্দা পার হয়ে লঘুপায়ে আঙিনায় নামলো ডোরা। নিষ্পেষ চোখেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। স্বপ্ন দেখছি নিশ্চয়। ভালো ক’রে তাকালাম আবার। যদিও অন্ধকার, তবু চিনতে পারছি পরিষ্কার, দ্রুতপায়ে আঙিনা পার হয়ে গেট খুললো ডোরা। মোটর থেকে নেমে এলো একজন লোক। গেটের একটা পালায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অল্পক্ষণে তাকে কি যেন বললো ডোরা। লোকটা আবার গিয়ে উঠে বসলো মোটরে। ডোরা তেমনি লঘুপায়ে ফিরে এলো বারান্দায়। মোটর চলে গেলো তারপর।

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো সমস্ত বোধশক্তি আমার বিকল হয়ে গেছে। অনেক কথা মাথার মধ্যে একসাথে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরছে যেন। মেসে সেই রাস্তিবে খাওয়ার পর ভ্রমলোক যে কথাগুলো বলেছিলেন তার এক বর্ণও এতোদিন বিশ্বাস

করতে চাইনি আমি ! অথচ সবই সত্যি । আবার মনে হলো, তাই যদি হবে, তাহলে ডোরা ফিরে এলো কেন ?

সব বিচার বুদ্ধি চিন্তাশক্তি গুলিয়ে যাচ্ছে মনে হলো ।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরোলাম । বাধরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল ছিটোতে হবে । নইলে ঘুম আসবেনা আজ । করিডরে পা দিয়েই দেখলাম ডোরা লিংডোর ঘরের দরজা খোলা । আলো জ্বলছে । আমার পায়ের শব্দে ডোরা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে ।

‘আপনি ঘুমোননি এখনও ?’

হঠাৎ মনে হলো সোজাসুজি প্রশ্ন করি ডোরাকে । সন্দেহ নিরসন হয়ে যাক ।

‘একটু আগে একটা ট্যাক্সি এসেছিলো, না ?’

তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকলাম ডোরার মুখের দিকে । কোনো ভাবান্তর হয় কিনা দেখবো ।

কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবেই জবাব দিলো ডোরা, ‘হ্যাঁ এসেছিলো ।’

‘এতো রাত্তিরে হঠাৎ ট্যাক্সি এলো কেন ?’

‘বড়বাজার থেকে কেববার পথে বলে এসেছিলাম কাল সকালে দরকার হতে পারে । গ্যারেজে ফিরে যাবার সময় যেন সঠিক খবর নিয়ে যায় । কাছেই গ্যারেজ । তাই এসেছিলো । কাল সকালে ঠিক সময় আসবে । বাস স্টেশনে যেতে আপনার কোনো অন্তর্বিধে হবে না ।’

তীব্র চোখে ডোরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও কোনো কঁাকি ধরা পরলো না আমার চোখে । এতো সহজভাবে, এতো তাড়াতাড়ি বানিয়ে মিথ্যে কৈফিয়ৎ কেউ দিতে পারেনা । তাছাড়া কাল সকাল হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে কথাটা সত্যি না মিথ্যে । বাধরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল ছিটিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম । কয়েক মিনিটেই ঘুম এসে ছেয়ে দিলো চোখের পাতা ।

পরদিন সকালে ছ’টা বাজবার আগেই ট্যাক্সি এসে পৌঁছে গেলো । আর সাথে সাথেই আবার গলে গেলো সন্দেহের দলটা ।

ক’লকাতা থেকে সব মিটিয়ে ফিরে এলাম সাতদিনের মধ্যেই । ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে সব । ভয় পেয়েছিলাম বাবা হয়তো গণ্ডগোল করবেন । কিন্তু তিনিও মেনে নিয়েছেন । স্বীকৃতি দিয়েছেন নমিতাদের বিয়েকে । অসম্ভব সম্ভব হয়েছে । মন তাই আনন্দে ভরপুর ছিলো । নমিতা যাকে পছন্দ ক’রে বিয়ে করেছে সেই ছেলেটিও মন ভোলাবার মতোই । লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা । টানা টানা চোখের ওপর ঘন কালো ভুরু, প্রশস্ত ললাট, টিকোসো নাক, মাথায় একরাশ চুল সমস্ত ব্যাকব্রাশ করা । উজ্জস শ্রাম গায়ের রং । সচরাচর এমন বলিষ্ঠ অথচ লাবণ্যময় চেহারা চোখে পড়েনা ।

ডোরা আমি আসতেই জিজ্ঞাসা করেছিলো ক'লকাতার খবর। শুনে খুশি হয়েছে। হেসে প্রশ্ন করেছে, 'তাহলে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন কবে ?'

কিন্তু ক'লকাতা থেকে ফিরে আসার পরপরই অফিস থেকে আদেশ হলো আমাকে বাইরে যেতে হবে। ছ'মাসের জন্তে ঘুরে বেড়াতে হবে সমস্ত আসাম প্রদেশ অফিসেরই কাজে। সাধারণত অন্তান্ত লোকে এতো বোরাঘুরি ভালোবাসেনা। আজ এখানে, কাল সেখানে, খাওয়া শোওয়ার ঠিক নেই,—যাযাবর জীবন। কিন্তু আমি এই আদেশে খুশিই হলাম। কারণ, আমি জানি সেই এক নিয়মের চক্রে ঘুরে ঘুরে আমার জীবন কাটবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় বই নয়তো খবরের কাগজ পড়া, তারপর স্নান সেরে গোত্রাসে ভাত খেয়ে অফিসের পথে হাঁটা, আবার বকেলে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ পরেই ক্লাবে গিয়ে টেবল টেনিস খেলা—কিংবা কোনো আড্ডায় জমে নিরর্থক সময়ের গলা টিপে হত্যা করে বাড়ি ফিরে এসে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে বিছানায় শুয়ে পড়া—এ তো সারাজীবন, জীবনের প্রত্যেকটি দিনের জন্তেই অনিবার্যভাবে সত্যি। তার মাঝে যদি এতোটুকু ব্যতিক্রমের সুযোগ পাওয়া যায় সে তো সৌভাগ্য। ছ'মাসের জন্তে যাযাবর জীবন, চরকিবাজীর মতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, হাজার হাজার বিচিত্র নরনারীর সংস্পর্শে আসা, অচেনা অজানা সমাজ আচার-আচরণের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ—না-ই বা থাকলো থাকা খাওয়ার নিয়মানুবর্তিতা—এসবের মধ্যে কিছু এ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি আছে। যদি এমনভাবেই ঘুরতে হতো সমস্তজীবন তবে সেটাই গতানুগতিক হয়ে যেতো। ক্লাস্তি আসতো। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস, আবার তো ফিরে এসে বসবো স্থায়ী হয়ে। একেবারে শাস্ত নিক্রপজব ছকে-বাঁধা জীবন আমার ভালো লাগেনা। বৈচিত্র্যের জন্তে সর্বদাই উন্মুখ থাকি। তার জন্তে শারীরিক কষ্ট বা বিপদের ঝুঁকি নিতেও আমি রাজী।

ডোরা লিংডো বললো, 'যদিপূর্বে তাঁতে বোনা সুন্দর নানারকম জিনিস পাওয়া যায়। আমার জন্তে কয়েকটা বেডকভার নিয়ে আসবেন।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

ডোরা লিংডোকে নিয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত লিখেছিলাম এক বাতীরে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত, একটানা। একসাথে আট ঘণ্টা নিবিষ্টমনে ক্রমাগত লিখে হাত তখন ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো, শুধু সেগুলো সাজিয়ে গেছি পর পর, এইমাত্র। কিন্তু ঘটনাক্রমে সাজিয়ে সাজিয়ে গল্পকে এই পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসে কলম বন্ধ হয়ে গেলো। এর পরেই আমার কথা গল্পের ক্লাইম্যাক্স, অর্থাৎ চূড়ান্ত নাটকীয় পরিণতি। ডোরার জীবনে ক্লাইম্যাক্স এসেছিলো কখন কিভাবে তা-ও আমার জানা। কাজেই আমার কথা নয় কলম, কিন্তু—। আর ওই 'কিন্তু'র জন্তেই লেখার সাবলীল গতি শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

নিশিথ বাত্রি, বোধ হয় পূর্ণিমা। চারিদিক নিঃশব্দ নিশ্চুপ। জ্যোৎস্নার আলোর

জানালার নিচে—অনেক নিচে, পাথরের টুকরোর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জল চিক্ চিক্ করছিলো। মাথা তুলে দাঁড়ানো পাহাড়ের সারি আকাশের দিকে তাকিয়ে রাত্রিভাগর। আর বাতাসের হাহাকার।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে শেষ সিগারেটটি বার ক’রে ধরিয়েছিলাম।

ডোরা লিংডোর জীবনে যেটা ঘটেছে ছব্বছ সেইভাবেই গল্প শেষ করবো কিনা এই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ওর জীবনে যা সত্যি হয়েছে কাগজের পাতায় অঙ্করে আর ভাষায় তাই যদি পরিবেশন করি তাহলে এ-গল্পটাও ট্র্যাভিক্ হয়ে দাঁড়াবে। আর আমার সব গল্পই শেষ হয় ট্র্যাভেডিতে—এবং সেজন্যে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব অসন্তুষ্ট। বলে, জীবনের অঙ্ককার দিক ছাড়া তোমার চোখে অন্য কিছু কি পড়ে না? মানুষের জীবনে অঙ্ককার যেমন আছে, তেমন আলোও তো আছে, ছুঃখ আছে আবার সুখও আছে, বেদনার মতো আছে আনন্দও। জীবনের পঙ্কিন দিক বাদ দিয়ে মহৎ দিকে আলোকপাত ক’রে এবার গল্প লেখো একটা।—ডোরা লিংডোর গল্প লিখতে লিখতে তাই এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো কলম। ইচ্ছে করলে এইখানেই ঘুরিয়ে দিতে পারি গল্পের মোড়। বাস্তবে যে-ডোরা গভীর ছুঃখ পেয়েছে, গল্পে তাকে—তার জীবনকে সার্থক করে দেখাতে পারি।

প্রায় একমাস ধরে চিন্তা করেছি, গল্প অসমাপ্ত রেখে। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম ডোরা লিংডোর জীবনে যা সত্যি হয়েছে গল্পে তাকে বদলাবার কোনো অধিকারই নেই আমার। জানি, কিছু বদলালে, কিছু বাদ দিলে গল্প হিসেবে এটা অধিকতর সফল হবে। এমন কি, উচ্চস্তরের শিল্পকর্ম বলে পরিগণিত হবারও একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু এ-গল্প লেখার কোনো অর্থই হয়না যদি শেষের অংশ বদলে দিই। কারণ, ডোরা-লিংডোর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো, তার জীবনের একটা অদ্বুত দিক—মনের একটা গোপন কোণের পরিচয় দেবার জন্যেই এ-গল্প লিখতে আরম্ভ করি। সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে, মিছে ঘটনার স্রোতে যদি গল্পকে অন্যদিকে নিয়ে যাই। আজিকে ক্রটি যদি ঘটেই ঘটুক, গল্প হিসেবে যদি সার্থক না-ও হয়, তাহলেও, ডোরা লিংডো যে বেদনার মুহূর্তমান হয়ে গিয়েছিলো তারই কথা আমি লিখবো। যেমন দেখেছি—যেমন ঘটেছিলো।

গারো-মুসাই-মিকির-আবর-নাগা পাহাড়, মণিপুর-ইম্ফল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে সমতলে অকিসের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কোথাও তিন চার দিন, কোথাও সাত আট দিন, কোথাও আরো বেশি। ডোরা লিংডোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম নিত্যনতুন মোহে।

শিলং ফিরে এসেছিলাম ছ’মাস পর। সেদিন শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলো। এসে কোনোরকমে হোটেলে ধেরে বাড়ি এসেই শুয়ে পড়েছিলাম। জামাকাপড়ও ছাড়িনি। ঘুমের অতলে ডলিয়ে গিয়েছিলাম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই।

ডোরা লিংডোর সাথে দেখা হলো পরদিন সকালে। মণিপুর থেকে ওর জন্যে

কয়েকটা বেড-কভার কিনে এনেছিলাম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বার করলাম বাস থেকে।

ডোরাকে দেখে চমকে উঠলাম। এ-কি চেহারা হয়েছে ওর! ছ'মাসে কারো চেহারার এমন পরিবর্তন হতে পারে ধারণাই ছিলোনা। মুখের সেই লাবণ্য নেই, যৌবন ঝরে গেছে দেহ থেকে। চোখের নিচে গভীর কালো দাগ। ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে স্পষ্ট দু'টি রেখা গিয়ে মিশেছে নাকের দু'পাশে। চুলগুলি অবিচ্ছিন্ন, জট বাধা। পোশাক অপরিষ্কার। অত্যন্ত গভীর পরিবর্তন। যেন বয়েস ডবল হয়ে গেছে হঠাৎ।

‘অবাক হচ্ছেন?’ ডোরা প্রশ্ন করলো।

আমি তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম, ‘তোমার চেহারা এ কি হয়েছে?’

ডোরা হাসলো। হাসির ডেউয়ে গালের ভাজ দু'টো আরো প্রকট হয়ে উঠলো।

‘কেন, বেশ ভালোই তো আছি।’

‘আমনাতে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখো একবার।’

‘দেখেছি। রোজই দেখি।’

‘তবু বলছো কিছু হয়নি? তোমাকে চেনাই যায় না।’

প্রসঙ্গটা বদলে নেবার চেষ্টা করলো ডোরা লিংডো।

‘বেড-কভার এনেছেন? দেখি দেখি। বাঃ বেশ সুন্দর তো! কতো দাম?’

বললাম, ‘আমাকে তোলাতে চেষ্টা করছো?’

ডোরার চেষ্টাক’রে তৈরী উৎসাহ নিভে গেলো একটি কথায়। দাঁড়িয়ে রইলো নতমুখে।

‘কোনো গুরুতর অসুখ হয়েছেছিলো কি ইতিমধ্যে?’

‘অসুখ? না।’

‘তবে?’

জবাব দিলোনা ডোরা। দাঁড়িয়ে রইলো তেমনই নতমুখে। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় মনে হলো। কিন্তু কেন? অসুখ হয়নি কোনো বলছে, অথচ—

‘আপনি এখান থেকে যাচ্ছেন কবে?’ হঠাৎ মুখ তুলে তীব্রদৃষ্টিতে তাকালো ডোরা।

‘আমি?’

‘হ্যাঁ আপনার আর এখানে থাকা চলে না।’

অত্যন্ত আশ্চর্য হলো। কি বলছে ডোরা! হঠাৎ এ-ধরনের কথা বলবার অর্থ কি?

‘আপনি শিগ্গির পালান এখান থেকে। নইলে—’

বলেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল ডোরা। আমি কোনো কথা বলবার অবকাশই পেলাম না। কিছুক্ষণ স্থাগু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডোরা কি বলে গেলো, তার অর্থ কি, কেনই বা হঠাৎ এমন অদ্ভুত কথা বললো তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই

টুকু শুধু বুঝলাম একটা কোনো কারণ নিশ্চয় আছে, না হলে, এমন অসংবদ্ধ খাপছাড়া কথা কখনো ও বলতো না। ডোরা লিংডোর চেহারা যে কারণে ছ'মাসের মধ্যে এমন অবিখ্যাত ভাবে বদলে গেছে তার সাথে এই আচরণের নিবিড় যোগাযোগ আছে, কালো আকাশে যেমন বিদ্যুৎের হালুকা রেখা ঝড়ের রাতে চমক দিয়ে যায় তেমনি একটা চকিত চিন্তা হঠাৎ ধোয়ার মতো পাক খেয়ে গেল মনে।

জর্জ লিংডোর সাথে দেখা হয়েছিলো আগের দিনই। তখনও ডোরার সাথে দেখা হয়নি। কিন্তু জর্জ তো কোনো কথাই বলেনি। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে দেখেছি : ডোরার সম্বন্ধে জর্জ বরাবরই নীরব। কোনো কথা, কোনো মন্তব্য, ডোরার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই করে না। এমন কি, ডোরার সাথেও বিশেষ কথা বলতে দেখিনি জর্জকে। যেন এড়িয়ে চলে ডোরাকে। অথচ ডোরা ওর ছোট বোন, এবং একমাত্র বোন। পুরনো কথাগুলি ভেবে একটু আশ্চর্যই বোধ হলো, একটু অস্বাভাবিক।

বিকেলে জর্জ লিংডোর সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আগেকার মতো। গল্ফ লিংকসুকে বেটন করা শট রাউণ্ডের রাস্তা ধরে। ছ'ধারে পাইনের বন। রেজিন্ ট্যাপিংএর জন্তে প্রত্যেক গাছের কাণ্ডকে ভেদ করে টিনের পাত ঢোকানো, তার সামনে মাটির গেলাসের মতো ছোট ছোট ভাঁড় টাঙানো।

বললাম, 'জর্জ, ডোরার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেছো ইদানীং ?'

জর্জ লিংডো যেন চমকে উঠলো আমার প্রশ্নে।

'কেন ?'

'কি চেহারা ছিলো, আর কি হয়েছে ? আমি তো চিনতেই পারিনি প্রশ্ন।'

নিশ্চুপ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জর্জ।

'রোজই তো দেখছি।'

'এমন হলো কি ক'রে ? কোনো অসুখ হয়েছিলো কি ?'

'না।'

'নিশ্চয় কোনো অসুখ হয়েছে। নইলে এরকম শারীরিক পরিবর্তন অসম্ভব। তুমি ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত করো অবিলম্বে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো জর্জ।

অসুখ নয় ঠিক, মানসিক বিকার। কিসে থেকে যে কি হয়ে গেলো।' অত্যন্ত নিচুস্বরে বললো জর্জ। যেন নিজেকেই বলছে এমনভাবে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে বন সাদা মেঘ জমেছে। আকাশ থেকে অন্ধকার গলে গলে ঝরছে মাটিতে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে পাইন বনে। আর শির শির বাতাসের আওয়াজ। হাঁটতে হাঁটতে লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছি। জর্জ লিংডোর মুখ কেমন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে।

'অনেক দিন তো তুমি আছো এখানে, ডোরাকে দেখে কোনো সম্ভেদ জাগেনি তোমার মনে ?'

এক মুহূৰ্ত্ত ভেবে জবাব দিলাম, 'না।'

সময় সময় মিথ্যে কথা বলতেই হয়। কারণ, জৰ্জের প্রণেয় সত্যি উত্তর দিলে খুশি নাও হতে পারে। হয়তো আবার প্রশ্ন ক'রবে : কি কথা মনে হয়েছে ? তখন কি জবাব দেবো ?

'তুমি হয় তো ভুল বুঝবে ডোরাকে।'

আপনার মনে, যেন নিজেকে বলছে, এমনভাবেই আবার বললো জৰ্জ।

চুপ ক'রেই রইলাম। জৰ্জ লিংডোর মুখ দেখে বুঝতে পারছি গভীর কোনো আলোড়ন তুলেছে ওর মনে। একা একা, নীরবে লালন করেছে অনেক দিন ধরে, এখন আর পারছে না। বলে হালুকা করতে চায় বুক। আমাকেও দিতে চায় সেই দুঃখের ভাগ। কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে পারি না। অকারণ কোতুহল প্রকাশ করা হবে তাতে।

'একটা মানসিক বিকার, মেন্টল কমপ্লেক্স ভুগছে ডোরা।' একটু খেমে বললো, 'ডোরার মনে বন্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে ওর সংস্পর্শে যে-পুরুষই আসবে মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি।'

নিঃশব্দে হাঁটছিলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম চমকে। জৰ্জ লিংডো এই মুহূৰ্ত্তে যে-কথাটি বললো তা অত্যন্ত অসাধারণ, অস্বাভাবিক, আশ্চর্য।

'মৃত্যু ?'

'মৃত্যু।'

'ই'টস এ স্ট্রেঞ্জ কমপ্লেক্স !'

'স্ট্রেঞ্জ।'

বললাম, 'কিন্তু এই অদ্ভুত ধারণা হঠাৎ কি ক'রে হলো ?'

জৰ্জ লিংডো পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরালো। বনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে এসেছিলো জৰ্জের মুখ। দেশলাইএর কাঠিটা জলে উঠতেই দেখতে পেলাম আবার, মুহূৰ্ত্তের অন্তে : গভীর। বেদনার আলোড়ন ঢেউ তুলেছে, তার চিহ্ন মুখের অভিব্যক্তিতে সুপরিষ্কৃত।

'এ পর্যন্ত দু'টি পুরুষের সাথে নিবিড়ভাবে মিশেছে তোরা। মারা গেছে দু'জনই। প্রথম জনের মৃত্যু হয়নি ঠিক, তাকে হত্যা করেছিলো একদল লোক। ডোরা সবসময়, ডোরার দেহের ওপর একসময় লোভ ছিলো অনেকের। নিজের বোন বলে বলছি না, ডোরার চেহারা সত্যিই ভালো ছিলো তখন, লুকু হবার মতোই। সে যাই হোক, ডোরা ভালোবেসেছিলো বিদেশী একটি ছেলেকে। এবং সেজন্তে লুকু হয় এখানকার অনেকেই। ফ্লোভ থেকে জের্সা, জের্সা থেকে রেয়ারেয়ি। একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বেড়াতে বেরিয়েছিলো অমলেন্দু, একা। আর ফেরেনি। তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো পরদিন বিড়ন ফলুসের নিচে—পাইনবনের ভিতর।'

শরীরের প্রতিটি শিরায় চলমান রক্তশ্রোত একটা ঝাঁকি দিয়ে খেমে গেলো যেন। কি

বললো জর্জ ! অমলেন্দু ! প্রায় চোঁচিয়ে উঠতে গিয়েছিলাম, কেন না, মেসে সেই রাত্তিরে ওই ভক্তলোকও ঐ একই কথা বলেছিলেন । তখন বিশ্বাস করিনি । অথচ—

কিন্তু সে আঘাত শেষপর্যন্ত সহ্য করতে পেরেছিলো ডোরা । সময়ের মলমে, একে বারে আরোগ্য না হলেও, অনেকটা আশ্বস্ত হতে পেরেছিলো—কতচিহ্নটা শুকিয়ে গিয়েছিলো । আর তার পরই আলাপ হয়েছিল আর একটি পুরুষের সাথে । হরদোয়াল সিং । আর্মিতে লেফটেনেন্ট । দিনে দিনে নিবিড় হয়ে এসেছিলো ছ'জনে । আমিও দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম । অমলেন্দুর মৃত্যু যে ডোরা ভুলতে পেরেছে এই যথেষ্ট । কিন্তু আমারও বুঝতে ভুল হয়েছিলো । এই কমপ্লেক্সের বীজ তখন থেকেই ওর মনে জুড়ে বসেছে । অমলেন্দুর মৃত্যুর জন্তে সে-ই দায়ী, ভুলতে পারেনি বলেই ভীতি এসে জড়ো হয়েছিলো ডোরার মনে : পাছে হরদোয়াল সিংএরও এক অবস্থা হয় । তার রূপের আঙুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অমলেন্দু, দৃঢ় ধারণা জন্মেছিলো ডোরার—একথা আগেই বলেছি । এ পিকিউলিয়ার অবসেসন ক্রেপট ইনটু হার মাইণ্ড । ওর জন্তে, ওর রূপের জন্তেই যখন এতো ঈর্ষা আর রেবারেশির জন্ম, লেট পিপল এনজয় হার বডি । তাতেই যদি লোকে তৃপ্তি পায়, যদি নিভে যায় ঈর্ষার আঙুন, তবে হরদোয়াল সিংএর জীবন নিরাপদ । অমলেন্দুকে হারিয়েছে, হরদোয়ালকেও হারাতে আর রাজী নয় ।’ খেমে সিগারেটে আলতো একটা টান দিয়ে বললো, ‘শি বিকেম্ অলমোস্ট এ প্রণ্টিটিউট । কিন্তু শুধুমাত্র হরদোয়াল সিংএর জীবন নিরাপদ করবার জন্তেই এই পথ অবলম্বন করেছে একথা হরদোয়ালও জানতে পারলে বিশ্বাস করবে না । যথেষ্ট গোপনতা, যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিলো ডোরাকে ।’

জর্জ লিংডোর কথা শুনতে শুনতে বারবার মনে পড়ছিলো মেসের সেই রাত্তিরের কথা । গেটের সামনে গভীর রাত্তিতে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে—নিঃশব্দ পদক্ষেপে ডোরা গিয়ে উঠে বসলো গাড়ীতে । চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম এই দৃশ্য ।

ডোরা লিংডোর জীবনের পরতে পরতে, হৃদয়ের কোষে কোষে যে রহস্য জন্মেছিলো হঠাৎ তা উন্মোচিত হয়ে গেলো । ভালোবাসার জনকে একবার হারিয়েছিলো, তার রক্তাক্ত স্মৃতি ডোরার মনে ফসিলের মতো চিরস্থায়ী দাগ রেখে গিয়েছিলো । তারপর আবার আর একটি পুরুষকে ভালোবেসেছে—ভালোবাসার আরকে যদি গলে যায়, মুছে যায় ফসিলের দাগ । কিন্তু মোছেনি । আর মোছেনি বলেই শক্তিত হয়েছিলো, ঈর্ষার আঙুনে অমলেন্দুর মতো ছাই হয়ে যেতে পারে হরদোয়াল সিংও । ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবে না আর । নিশিথ রাত্তির অভিসারে সামান্য কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে : শব্দ দূর হয়নি তবু । হরদোয়াল যুগাক্ষরও যেন না জানে কিছু । আর হরদোয়াল সিংএর অস্তিত্বের সংবাদ একমাত্র নিজের বুকেই লালন করেছে সঘন্যে—নারী-চরিত্রের একটি অচিন্ত্যপূর্ব দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সিনেমার ছবির মতো ।

‘কিন্তু তুমি বাধা দাওনি কেন ? তোমার উচিত ছিলো—’

আমাকে কথা শেষ করতে দিলো না জর্জ লিংডো ।

‘আমার কোনো উপায় ছিলো না। আমি বাধা দিলে শুনতো না। তবু আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, তুমি ভুল করছো ডোরা। কোনো ফল হয়নি।’

গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে পাইনবন। সন্ধ্যা ঘন হয়ে রাত্রি নেমেছে। আকাশে তারা নেই, চাপ চাপ মেঘ। বাতাসে শীতের চাবুক। ঝিঝিদের একঘেয়ে কলতান বন্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রাণ, সব হাসিগান গেছে ফুরিয়ে। শুধু নৈঃশব্দ্য। অস্বস্তিকর নীরবতা।

বললাম, না বলে পারলাম না, ‘আমি এতোদিন আছি কিছুই টের পাইনি।’

জর্জ হাসলো। একরকম হাসি আছে যা কান্নার চেয়েও কঠিন। সেই রকম ভাবে হেসে জর্জ লিংডো বললো, ‘যাতে কেউ টের না পায় সেজন্যে সতর্কতার অস্ত ছিলো না ডোরার। কিন্তু এতো সতর্ক সাবধানতা সত্ত্বেও কোনো ফল হলো না। হরদোয়ালও মারা গেলো অস্বাভাবিক ভাবে। অমলেন্দুর মতো তাকে হত্যা করেনি কেউ। চেরাপুঞ্জীর পথে জীপ্-এম্বলিডেন্টে নিহত হয়েছিলো। সে একটা সাধারণ দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু ডোরা একে দুর্ঘটনা বলে মনে করতে পারেনি। অমলেন্দুর মৃত্যুতে মুহমান হয়েছিলো, তবু সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো ধীরে ধীরে। কিন্তু হরদোয়ালের মৃত্যু ওকে আবার নাড়া দিয়ে পুরনো ক্ষতটাকে দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে দিয়েছে। ডোরার মনে বন্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে ওর সংস্পর্শে যে-পুরুষই আসবে মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি।’ আবার কিছুক্ষণ ধেমো জর্জ লিংডো দম নিলো যেন, ‘শাখাধানে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলো ডোরা। এখন সে তুলনায় অনেক ভালো হলোও একেবারে সুস্থ নয়।’

জর্জ লিংডো কোনো কথাই ভালো করে শুধিয়ে বলতে পারে না। যা বলে তার মধ্যে বলতে চাওয়ার অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। সেই অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি জোড়া দিয়ে জর্জ এতোক্ষণ যা বললো সেইটেই আলোচনা করছিলো মনে মনে। ডোরা লিংডো মানসিক বিকৃতিতে বিকারগ্রস্ত হয়ে আছে। অথচ এমন অল্প একটা কম্প্রেন্স যে, ভাবতেও অবাক লাগে। এইজন্মেই সকালবেলা আমাকে অমন খাপছাড়া কথা বলেছিলো : ‘আপনি শিগগির পালান এখান থেকে। নইলে’—মৃত্যুর কথাটা আর বলতে পারেনি।

বাতাস ছুঁছুঁ করে বইতে শুরু করলো হঠাৎ। ঠাণ্ডা। ডিসেম্বর মাস। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে দু’জনেই কিরছি বাড়ির দিকে। হাত পা শীতে জমে অসাড় হয়ে গেছে। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে বৈকে পথ চলেছি। পথের দু’ধারে পাইনবনে ঝিঝির ডাক ধেমো গিয়েছিলো অনেক আগে, ডোরা লিংডোর জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী শুনে বেদনার মৌন হয়ে গিয়েছিলো। আবার শুরু হয়েছে ঝিঝিদের কলতান—আর ঝোড়ো হাওয়ায় পাইনের ডালে ডালে পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাসের মতো একটানা আওয়াজ নিরন্তর অন্ধকারের গ্রাসে হারিয়ে গিয়ে যন্ত্রণায় যেন বিলাপ করছে পৃথিবী। পাইনবনের দীর্ঘশ্বাসে তার সমবেদনা। আর টুপ টুপ করে বরছে শিশির : আকাশের অশ্রু।

অশ্রুস্রাবী

ভূর্গেবিভ

অনুবাদ—শিল্পির সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাট্টা

—‘সুসুসের বাইরের পর্দা ফেটে গিয়েছিল’—দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন প্রফেসর—
‘গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দিব্যি ভাল ছিল। তারপর কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল। অবশ্য
এরকম যে একদিন ঘটবে তা আমি জানতাম। ওখানে থাকতে মিলিটারী ডাক্তার নিজে
আমায় বলেছিলেন—’

—‘এসব কথা ত এই প্রথম আপনার মুখে শুনলাম’—না বলে থাকতে পারলাম না
আমি।

—‘তোমার জানাতে অল্প কিছু এসে যায় না। কিন্তু তিনি সব সময় আমায় সাবধান
করতেন।’

প্রথমটা প্রফেসর নিচু গলায় শুরু করেছিলেন। তারপর ধাপে ধাপে তার গলায় স্বর
চড়তে লাগল। শেষ অবধি গলা তার ঘরের দেয়াল ছাপিয়ে গম গম করে বাজতে লাগল।
যেন সারা বাড়িকে তিনি গুনিয়ে বললেন—‘তিনি বারবার বলতেন, প্রফেসর খুব সাবধান।
তোমার সং মেয়ের বুকের দোষ আছে। একটু উত্তেজনার কারণ ঘটলেই ওর একটা
ভালোমন্দ হয়ে যেতে পারে। আমিও ভয়ে ভয়ে ওকে সবসময় উত্তেজনা থেকে বাঁচিয়ে
বাঁচিয়ে চলতাম। কিন্তু তা কি আর চলেবে বাবা। তুমিই বল না, কাঁচা বয়সের মেয়েরা
কি কোনো যুক্তির ধার ধারে। না কথা শোনে—’

বলে হা হা করে তিনি হেসে উঠলেন।

দীর্ঘ দিনের স্বভাবে অকারণ হাসিটা যেন প্রফেসরের কথার সঙ্গে লেগেই থাকে।
কিন্তু আজ দেখলাম সেই হাসির দমকটা বড়ো বেশি। হাসতে হাসতে প্রবল কাশিতে শরীর
বঁকে গেল তার।

প্রফেসরের বক্তব্যের সার মর্ম শোনা গেল। অন্তত তার কাছ থেকে এর বেশি আর
কিছু আদায় করা যাবে না। সে আশা বৃথা। শেষ অবধি জিগ্যেস করলাম—‘ডাক্তার
ডাকা হয়েছিল?’

আমার কথা শুনে প্রফেসর যেন লাফিয়ে উঠলেন—‘আলবার হয়েছিল। দু’জন ডাক্তার
এসেছিলেন। কিন্তু ডাক্তার এসে পৌঁছানোর আগেই সব শেষ। দেখে শুনে তারা ঐ একই
রায় দিয়েছেন। সুসুসের পর্দা ফেটে মারা গেছে সুসানা। ওরা শব ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব
করেছিলেন কিন্তু বাপ হয়ে আমি কি এ প্রস্তাবের রাজী হতে পার? আমি রাজী হয়নি।’

— ‘শব সমাধির দিন কবে করেছেন ?’

— ‘কাল সকাল ঠিক এগারটার মৃতদেহ বেরুবে। এখান থেকে সোজা গীর্জায়। তুমি নিশ্চয় আসছ। তোমার সঙ্গে পরিচয় বেশিদিনের নয়। কিন্তু তুমি আমাদেরই একজন হয়ে গেছ।’

আমি তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

প্রফেসর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন— ‘সত্যিই, এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।’

— ‘মরার আগে সুসানা কোনো কিছু বলে যাবনি ? কোনো লেখাটেখা ?’

— ‘কিছু না। কালির একটা আঁচড়ও না। যখন ওরা আমার ঘুম থেকে ডেকে তুললে সুসানার দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। উঃ সে কি দৃশ্য! বলতে বুক কেটে যায়। সুসানা আমাদের মনে বড় দাগা দিয়ে গেছে। ফান্তোভ গুনলে বড় ব্যথা পাবে। হ্যা, ও নাকি এখন মস্তোতে নেই ?’

— ‘কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল বটে।’

এমনসময় কে এসে খবর দিলে— ‘ভিক্টর বকাবকি করছে। ওর গাড়ী নাকি অনেকক্ষণ আটকে রয়েছে।’

অল্পবয়সী কির চোখে মুখে কেমন একটা অশ্লীল দপদপানি। বাড়ির দাসী চাকররা যখন বোঝে যে কর্তা ওদের হাতের মুঠোয়, তখন এমনিধারা ছবিনীত তাক্সিলাই ফুটে বেরোয় তাদের চোখ মুখ থেকে।’

দরজার বাইরের দিকে ভারী কি একটা নড়াচড়ার শব্দ হোল। সেই সঙ্গে ভিক্টরের বজ্র গর্জন সোনা গেল।

প্রফেসর কাঁপা গলায় বললেন— ‘তাড়াতাড়ি যাও। দেখ ত ও কি চায়।’

প্রফেসরের স্ত্রী তখনি ছ’ আঙ্গুল দিয়ে গলায় একটা কুমাল জড়াতে জড়াতে এলেন। গায়ে একটা র‍্যাপার। আমার বোতাম লাগানো হয়নি—চুলও এলোমেলো। প্রফেসর কেন যেন হঠাৎ তারপ্রতি মারমুখো হয়ে উঠল।

— ‘কানের মাথা ধেয়েছ নাকি ? শিগগীর যাও, ভিক্টর ওর স্নেজের খোড়ার জন্যে টেচামেচি করছে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর গে, বুঝলে।’

— ‘আমি নিজে সহীসকে বলেছি। তা ছেলের তোমার মাথা ধরাপ! ষোড়াকে ছোলা খেতে দিয়েছে।’—উত্তর দিল গিন্নী।

কি জানি কেন, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন— ‘দেখ ত হঠাৎ কোথা দিয়ে কি সর্বনাশ হয়ে গেল। সুসানার যে এরকমটি হবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি।’

— ‘ঐ রকম যে ঘটবে আমি কিন্তু সবসময় ভয় করতাম’—হাত পা ছুঁড়ে বললেন প্রফেসর— ‘হুসহুসের পর্দা ফেটে গেছে। হাইপারট্রফি।’

— ‘ঘাই হোক, বড় দাগা দিয়ে গেল মেয়েটা।’

ধসধসে মুখখানি তার বিকৃত হয়ে উঠল। দু ফোঁটা জলও টস টস করে গাল বেয়ে পড়ল। ‘এত অল্প বয়স। কত দেখবার, ভোগ করবার ছিল। হঠাৎ শেষ হয়ে গেল।’

—‘থাক। থাক। কাজে যাও’—মাঝ পথে খামিয়ে দিয়ে বললেন প্রফেসার। গিন্নী আর কথা কইলে না। নিঃশব্দে ঘর ছাড়লে।

আমিও আর রইলাম না।

গলিপথটায় দাঁড়িয়ে ছিল ভিক্টর। মাথায় টুপিটা একটু তেরছা করে বসানো। আমার দিকে তাকাল কি তাকাল না বোঝাই গেল না। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছি দেখেই বোধ হয় আমার কলারটা একটু টান টান করে নিলে।

ও যে আমার চিনলে না তার জন্তে আমি ওকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। মনের এই অবস্থায় ওর সঙ্গে আর কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না আমার।

আমি ফাস্তোভের কাছে ফিরে চললাম।

॥ ২৫ ॥

হাত দুটো বুকের উপর চেপে ধরে ঘরের মেঝেতে বসে ছিল ফাস্তোভ। মাথাটা ওর বুকের পড়েছিল মাটির দিকে। কেমন যেন একটা আড়ষ্ট অচেতন অবস্থা। গভীর ঘুম থেকে সত্ত্ব জেগে ওঠা মানুষ যেমন হাবা হাবা চোখে তাকায় তেমনি একটা ঘোলাটে বিশ্বয়ের ষোর ওর চোখে।

প্রফেসরের বাড়ির যেমন সব ব্যাপার ওকে বললাম। প্রফেসার ও প্রফেসারগিন্নীর কথাগুলিও উল্লেখ করতে ভুললাম না। ওদের কথাবার্তায় এইটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, হতভাগিনী মেয়েটা আত্মহতিনী হয়েছে.... আমার কথা শুনেও ফাস্তোভের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। তেমনি বিস্মিত বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

—‘তাকে দেখলে তুমি?’—শেষ অবধি যেন মুখ খুললে ফাস্তোভ।

—‘দেখেছি বই কি।’

—‘কফিনে রাখা অবস্থায়?’

—অর্থাৎ সুসানার মৃত্যু সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে ওর মনে।

—‘হ্যাঁ, কফিনে রাখা অবস্থায়।’

শুনে ফাস্তোভের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখ নত করে ও হাত ধসতে লাগল।

—‘শীত করছে?’—প্রশ্ন করলাম আমি।

—‘শীত করছে’—একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল ফাস্তোভ। কেমন যেন বোকার মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

সুসানা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, নয়ত বিষ খাইয়ে ওকে হত্যা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহের কথা বললাম ওকে। কিছু না করে সমস্ত ব্যাপারটা খামাচাপা দিয়ে ফেলে রাখা অত্যাশ্চর্য হবে। ফাস্তোভ আমার দিকে নিখর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

—‘কিন্তু কি করবার আছে?’—ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকিয়ে ও বললে আমাকে।
কিন্তু পর মুহূর্তেই চোখ বন্ধ করে আনত মুখ হয়ে রইল।

—‘জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে। ওর মৃতদেহ সংকার করাই
মুক্তিল হবে। আমার মনে হয় এ নিয়ে কোনো গোলমাল না করাই ভাল।’

কথাটা খুবই সহজ সরল, কিন্তু কেন জানি না এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি।
ভাবলাম এত দুঃখেও বছর আমার সাংসারিক বুদ্ধি নষ্ট হয়নি।

—‘ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কখন হবে?’

—‘আগামী কাল।’

—‘তুমি যাচ্ছ ত?’

—‘যাব বই কি।’

—‘ওদের বাড়ি হয়ে যাবে, না সোজা গীর্জায়?’

—‘ওদের বাড়ি যাব—গীর্জাতেও যাব। সেখান থেকে কবরস্থানায়।’

—‘আমি যাব না। আমার যাওয়া চলে না—যেতে পারি না।’ ফান্তোভ আবার
উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ঠিক এই কথাকয়টি উচ্চারণ করতে গিয়েই সকালে সে
কেঁদে ফেলেছিল। মানুষের কান্নার রীতিই এইরকম। এমন তুচ্ছ কথা আছে অস্তুর
কাছে যার কোনো মূল্যই নেই, অথচ যা আর একজনের হৃদয়ের তন্ত্রীতে এমন যা দেয় যে
কান্নার সাগর উধলে ওঠে। তাকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলে। নিছক প্রতি, বিশ্বসংসারের
প্রতি মন অপার মমতায় ভরে ওঠে।

কিন্তু সকালের মত এখনও ফান্তোভের চোখের জল আমাকে একটুও বিচলিত করতে
পারলে না। সুশানা ওকে কোনো কথা বলে গেছে কিনা তাও কেন জিজ্ঞেসা করছে না ভেবে
আমার আশ্চর্য বোধ হতে লাগল। ওদের ভালবাসা আমার কাছে বহুস্ত। যে বহুস্তের
মর্মোদঘাটন আজও আমি করতে পারিনি।

দশ মিনিট কাঁদার পর ফান্তোভ দেওয়ালের দিকে মুখ করে সোফায় গুয়ে পড়ল।
গুয়ে রইল হৃদয়ের মত নিশ্চল হয়ে। আমি ওর মুখের উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে
লাগলাম কিন্তু ও আমার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিল না। তখন আমি ওকে ঐ অবস্থায় রেখে
চলে আসা মনস্থ করলাম। হয়ত আমার পক্ষে জিনিসটা খুবই হৃদয়হীনতা হবে। কিন্তু
কি করব? ফান্তোভকে দেখে মনে হল ও ঘুমিয়ে পড়েছে। অবশ্য এইটাই প্রমাণ নয় যে
ও একটুও দুঃখ ভোগ করছে না। হয়ত ওর দুঃখ অন্তঃহীন। ওর বেদনার সমুদ্রের গভীরতা
পরিমাপ করবে কে? ফান্তোভের প্রকৃতি এমন খাতুতে গড়া যে গভীর বেদনাময় অনুভূতি-
যেন ওর মনে রেখাপাত করতে পারে না। অন্তত বাইরে তার খুব একটা আভাস
থাকে না।

সংসারে সব দিক বাঁচিয়ে যারা পা ফেলে ফান্তোভও যে সেই জাতের মানুষ, তাতে আর
সন্দেহ কি?

॥ ২৬ ॥

পরের দিন বেলা ঠিক এগারটায় আমি সুসানাদের বাড়ি হাজির হলাম। ঝির ঝির করে শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। হাকা কুয়াশার পর্দা মোড়া চারিদিক। বরফ গলতে শুরু করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে হাড়কাঁপানো হাওয়ার ঝাপট।

বাড়ির দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফেসার। গায়ে কালো কোট মাথায় টুপি। প্রফেসার হাত পা ছুড়ে হাঁটুতে চাপড় মেরে হৈ চৈ করে একটা সাড়া জাগিয়ে রেখেছিলেন চারিদিক।

মৃত দেহ বয়ে নিয়ে যাবার গাড়ীটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল চার জন বিষণ্মুখ সৈনিক। পুরানো ময়লা কোর্টের উপর শোকের চিহ্ন হিসেবে কালো ফিতে ঝুলিয়ে নিচ্ছে তারা। মাথার টুপি এমনভাবে টেনে নামিয়েছে চোখের উপর যে ছায়া পড়েছে চোখে। মশালের পিছন দিকের লাঠিটা দিয়ে ওরা জামা থেকে তুষার ঘসে ঘসে ফেলছিল। লাল মুখ প্রফেসারের মাথার চুলগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। গলায় মৃত জোর আছে সব জোর দিয়ে তাক কঁশির মত আওয়াজ বের করছিলেন তিনি গলা থেকে।

—‘পাইনের ডালগুলো কোথায়? এদিক নিয়ে এস। এখুনি শব বের করে নিয়ে আসা হবে। পাইনের ডালগুলো গেল কোথায়? শিগগীর আনো—দেবী কোরো না—দেবী কোরো না—’

প্রফেসার তখন এক ছুটে চলে গেলেন বাড়ির ভিতর। আমার হয়ত একটু দেবী হয়ে গিয়ে থাকবে। প্রফেসার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করার জন্যে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন। বাড়ির ক্রিয়াকর্মও সামান্য হয়ে গেছে। পুরোহিত দুজন সদলবলে সিঁড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ওদের মধ্যে যিনি বয়সে তরুণ তেল মেখে চুল বেশ পরিপাটি করে আঁচড়িয়েছেন। দেখতে দেখতে সহীস, দুজন বারী আর ভারী কঁধে কফিন এসে পৌঁছল। কফিনের পিছন পিছন এলেন প্রফেসার। ‘এক আঙ্গুল দিয়ে তিনি কফিনটা স্পর্শ করে আছেন। ভাবখানা যেন তিনিও বহন করে আনছেন। মুখে বাহকদের খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন প্রফেসার—‘ভারী আবার কোথায়—এত বেশ হাকা।’ এদের পিছনে কালো পোশাকে বাড়ির অল্প সব লোক। সবার শেষে ভিক্টর। গায়ে তার নতুন ইউনিকর্ম, হাতে তরবারি। তরবারির হাতলে কালো রেশমী ফিতে জড়ানো। শব বাহকরা কফিনটা এনে গাড়ীতে তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জলে উঠল সৈন্তদের মশাল। কট কট শব্দে মশাল থেকে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ হতে লাগল। প্রতিবেশীরা এক বুড়ী হঠাৎ করুণ সুরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

পুরোহিত মন্তোচ্চারণ করতে লাগলেন উদাস্ত কণ্ঠে। আর ঠিক সেই সময় প্রবল তুষার বর্ষণ হতে লাগল। প্রফেসার হুকার দিয়ে উঠলেন—‘যাত্রা শুরু কর।’

শোকশোভাযাত্রী এগোতে লাগল ধীর পায়ের। প্রফেসারবাড়ির লোকজন ছাড়াও আরো চার পাঁচজন বাইরের লোক শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই শোভাযাত্রায় সুসানার কোন বন্ধু-বান্ধবকে না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। কিন্তু তখন ভাবলাম

যে এই স্বাভাবিক। সিংসকচারিণী ছিল সুসান। সংসারে তার প্রাণের মানুষ কেই বা ছিল? প্রাণের পড়নী তার কেউ ছিল না। গীর্জায় অনেক লোক এসেছিল। কিন্তু সুসানার আত্মীয় স্বজন তারা কেউ নয়। সবাই বাইরের লোক।

— অমুঠান শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। প্রকেশার এমন গভীর আবেগের সঙ্গে ক্রশ করলেন, এমন অমুরাগের সঙ্গে পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করলেন যে দেখে মনে হবে তিনি বুঝি অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক।

শেষ বিদায়ের বেলা আমি মাথা নামিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু শবাবার চুপন করতে পারিনি। প্রকেশার এই মর্মান্তিক পরীক্ষা কঠোর সংঘর্ষের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। হৃদয়াবেগের সামান্যতম উচ্ছাসও প্রকাশ পেল না তার। কিন্তু বাড়ির ফিরে কান্না আমি ভুলব না। তার আর্ত কান্নার রোল গীর্জার ঘরখানিতে যেন ভেঙে আছড়ে পড়তে লাগল। তবু যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলে সে। এই সমস্ত অমুঠান থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে ছিল ভিক্টর। আমার মাসীমাও গীর্জায় এসেছিলেন। কেমন করে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে মেয়েটি সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসেছিল এ মৃতদেহ সেই মেয়েটির। এ ব্যাপারে যে কোনো হাত নেই তা তিনি জানতেন। কিন্তু এই বিচিত্র ঘটনার বিস্তারিত আমার স্থানটি কোথায় তা বোধ করি ঠিক করতেও পারছিলেন না তিনি। মেয়েটি হয়ত আমার প্রতি প্রেমামুরাগে আত্মবাহিনী হয়েছে এমন ধারণা করাও অস্বাভাবিক নয় তাঁর পক্ষে। কি তিনিও হৃৎকাতারাক্রান্ত মনে মৃতের আত্মার শাস্তির জন্য প্রার্থনা করলেন। হৃচোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরে পড়তে লাগল। ফিরে যাবার আগে সজের টাকাকড়ি তিনি গরীব ছুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ে গেলেন।

শেষ বিদায়ের পালা এস। এবার কফিনের ঢাকনি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সমস্ত অমুঠানের মধ্যে আমি একবারও হতভাগিনীর বিকৃত মুখের দিকে তাকাইনি। কিন্তু শেষবারের মত আমি যখন ওর দিকে তাকালাম আমার কেমন মনে হোল ঐ মুখের নীরব ভাবায় শুধু একটিমাত্র কথাই বলতে চেয়েছিল সে—‘ও কেন আসেনি। ও কেন আসেনি?’

—‘কেন একাঙ্গ করলে তুনি সুসানা?’

এ কথার উত্তরে—‘সে কেন আসেনি?’ এই কথাটিই যেন আমার কানে বারবার বাজতে লাগল।

পেরেকের উপর হাতুড়ির বা পড়ছে। আমার কাপসা চোখের সামনে একটি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে গেল।

। ২৭ ।

তারপর কতদিন কেটে গেল।

খুড়িমা মারা গেলেন। যজ্ঞার বাস ভুলে দিয়ে আমি পিটাসবার্গে গিয়ে উঠলাম। বন্ধু আমার সেইখানে চাকুরী করছিল। তবে দেখাসাক্ষাৎ হত আমাদের কথাটিং।

শুনেনিলাম আজও অবধি বিস্ময়-ধা করেনি সে। এখানকার সমাজে ডন জুয়ানের জীবন যাপন করে চলেছে সে। কোনোদিন কোনো মেয়ে তাকে ভালবেসে দুঃখ পেয়ে গেছে, সে কথা তার বোধ হয় বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল। অন্তত তার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, সুসানার কথা একবারও সে বলেনি আমার কাছে।

এই সময় ব্যবসার প্রয়োজনে মস্কোতে ফিরে এসাম কদিনের ছুটি। এসে যে সব খবর শুনলাম তাতে অবাক হবার আর দোষ কি?

শুনলাম প্রফেসরের দুর্দশার আর শেষ নেই। বাড়িখানা গেছে আগুন লেগে। চাকুরীটিও গেছে ইতিমধ্যে। ছেলে ভিক্টরের স্বতাবচরিত্রের কোন উন্নতি হয়নি। আজকাল দেনার দারে শ্রীবরেই তার চিরস্থায়ী বাস হয়েছে। ভালোর মধ্যে প্রফেসরের গিন্নী এককোড়া ছেলে উপহার দিয়েছেন স্বামীকে। দীর্ঘদিনের তফাতে সুসানার স্বতির সঙ্গে এই দেশ আমার মনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে দেখলাম। কতবার করে আজ তাকে মনে পড়ল।

বাইরে বড়ের হাওয়ার গাছপাতারা উদ্ভ্রান্তের মত দুলছে, কঁপছে শিরশিরিয়ে উঠছে, ঘরের জানালার কনকনে ভুয়ার জমে যেন দুধের আস্তরণ পড়েছে। বাড়ির দান আলোর তাকে দেখতে পাচ্ছি যেন। আমার ঘরের জানালার ধারে নিখর পাষাণীর মত বসে আছে সুসানা কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদছে তার বিফল যৌবনের বাসনা। সে বেদনার ছবি বেঁচে থাকতে আমার স্বতির পট থেকে মুছবে না কোনোদিন।

আজ ভাবি ফাস্তোভকে কি করে এমন ভাল বেসেছিল সুসানা। যদি বেসেই ছিল ত অত সহজে হতাশার ভেঙে পড়েছিল কেন? দুটো দিনও অপেক্ষা করতে পারলে না সুসানা? প্রিয়তমের মুখে দুটো কটু কথা শুন গেলেও অন্তত তার মোহ কাটত। মোহহীন মনে আপন ভাগ্যের পথে যেতে পারত অভাগিনী। একখানা চিঠি লিখেও ত ভালবাসার মানুষের কাছে উন্মোচিত করতে পারত নিজের জীবনকে। জানাতে পারত তার বিগত জীবনের কথা। তা না করে এমনভাবে আত্মবিসর্জন দিল কেন অভিমানিনী।

কিনো কি জানি ভালবাসার রীতিই বোধ হয় এই। প্রেমের এতটুকু আপমান তার সহ্য হয় না। ভালবাসার জনের কাছে সহ্য হয় না এতটুকু অনাদর।

হয়ত আমারই মনের ভুল এসব। ভেবেছিলাম ফাস্তোভকে খুবই ভালবাসত সুসানা, হয়ত সে ভালবাসার ততখানি যে গভীরতাই ছিল না যতখানি আমি মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম। যেহেতু জীবনে দুবার ভালবাসতে পারে না এই আজ আমার ধারণা।

সংসারের ঘূর্ণিতে পড়ে জীবন তার দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। একদিন বড়ো ইচ্ছায় ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেছিল সুসানা। কিন্তু সংসার শুধু তার ইচ্ছেটাই নয় তার জীবনকে নিয়েই ছিনিমিনি খেলেছিল সেদিন। তার প্রথমযৌবনের যুগতার কোনো মূল্যই হয়নি।

আর একবার ভালবাসায় যে কতখানি মিথ্যা তা বোধ করি সুসানা ভালকরেই জানত। ভালবাসা সে চায়নি। চেয়েছিল একটি নিরাপদ আশ্রয়। একটি নিশ্চিত বন্দর। তারই লোভে জেনেওনেই সে ফাস্তোভকে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু যে দিন দেখল সে তার একটি মিথ্যা। কলঙ্কের কথা লোকমুখে শুনে তাকে পরিত্যাগ করলে ফাস্তোভ, সেদিন বড়ো দুঃখই পেয়েছিল সুসানা। ফাস্তোভ তাকে যত ঘৃণা করেছিল হয়ত সংসারকে তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করেছিল সুসানা সেদিন।

যে আশ্রয় সে চেয়েছিল যত্নের কোলে তা কি পেয়েছে সুসানা? কি জানি। যত্নের রসস্ত ত মছন করতে শিখিনি।

তবু তার কথা যতবার ভাবি, আমার মনের সেই ত্রাস্তি বারবার ফিরে আসে। যরণাহত বিহগীর অধরে সেই অশ্রুট কথাগুলি শুনতে পাই—‘সে আসেনি। সে আসেনি।’ সেদিন তার প্রাণের কান্না বলে ভেবেছিলাম আজ মনে হচ্ছে সে তার স্বার্থের যুধরতা। যত্নের আলোতে সুসানা এখন তার মিচেলের হাত ধরেছে। মিচেল তাকে ভালবেসেছিল। বলেছিল, তোমার কোনোদিন কাঁদাব না সুসানা। সেই যুহুর্তে ফাস্তোভের প্রবঞ্চনা সইতে পারত না সে। তাই বুদ্ধি প্রাণের স্বস্তি অমন করে শেষ বিদায়ে রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

প্রাণের রহস্ত কে কবে জেনেছে সংসারে। জেনেছে কে রহস্ত ভালবাসার। সে বুদ্ধি আরো বচনাভীত, আরো গভীর।

ভাগ্যের হাতে যত ব্যথাই পাক, তবু হার মানেনি সে। যত্নের আনন্দালোকে এক অপক্লপ বাসর রচনা করেছিল অশ্রমতী।

সকলের হাত পেলে অজিত মুখোপাধ্যায়

গ্রামে আমার ঘউ আছে, ঘর আছে পাড়ায়
তবু একটি ঘর নেই যাতে সম্মান বাড়ায়
আমার আর আমাদের, নেই কোনো গান
যে গানে বাঁধব ঘর পাব পরিজ্ঞান
বিমর্ষের হাত থেকে, এতদিন সুর সাধা
সার হল। নতুন গানের ভিত্তে ঘর বাঁধা
হবে না কি। কী চিংকার কী পরিশ্রম
পেলো না সামান্ত সঙ্গম।

এত বড় মাটিতেও দিল না যে এতটুকু স্থান
আমার স্বদেশ। এ দেশে রাজির পরিমাণ
এত কম! স্বস্তির আবেশ
দিল না রাজির এত অঙ্ককার, আলোকের রেশ
নেই সূর্যেও! সূর্য, ভূমিও ফুরোলো!
লক্ষ বছরের সোয়গোলে
গোলাপ পদ্মের আসর
ভূমি কি এতটা কাল করনি মুখর।
সেই সূর্য, কোথায় তোমার আলোভাপ।
আজ ঘর বাঁধার ইচ্ছায়
স্বস্তি কেউ দিলে না, দিলে না বুকের উত্তাপ,
পেলায় না রাস্তা সাধনায়।
সড়ক সঙ্কীর্ণ যেন, পৃথিবীও ছোট,
কোকিলের সংগীত অফোট,
ভালোবাসা দিলে কেউ করলে না আমার সবল,
ভালোবাসা আমার যে একমাত্র বাঁচায় সখল।

মানুষের ইতিহাসে কোথা গেল এত ভালোবাসা,
এমন তো বধনো ছিল না। এমন নিরাশা
কোনোদিন শত্রু হয়ে কারুর শ্রমুখে
দাঁড়ায়নি। বুকে বুকে
এত ভীতি ওঠেনিতো কেঁপে !

শ্রম তুমি যেপে দাও আলো, বেয়লা তোমার
শ্রমও শুকোলো। সত্যতার
প্রসন্নতা কোথায় মানুষ। তোমার মনভার
সর্বদাই। এত কান্না ! এত শোক !
তাহলে আলোক
ভেসে যাবে অশ্রুর ধারায়।
আজ ঘর বাঁধবার সাড়ায়
তোমরা আয় দাও স্বস্তি, গান। প্রসন্নতার
পা বাড়াই আমি। সব আছে অথচ কিছুই
ছিল না আমার, এখন শুধুই
মনে হয় পেতাম সব কিরে,
নিঃসঙ্গ তিমিরে
এত শান্তি হত না নিহত,
সকলের হাত পেলে আমাদের ঘর বাঁধা হত মনোমত ।

তোমার জন্যে গৌরীপদ দত্ত

“If I would weep for fear in a lonely house,
If I could tear my eyes out and devour them,
I would do it for your voice of morning orange trees
And for your poetry that emerges uttering cries”

সোনালী সূর্যের রংয়ে হেসেওঠা ফসলের মত,
—তোমার আকুল-করা সূরের আশায়
—বেদনার বুক চিরে জেগে-ওঠা কবিতা তোমার,
আমার হু চোখ ছিঁড়ে কোনোখানে ডালি দিলে যদি,
যদি এ জীবন দিলে সে গান পেতাম—

—তোমার সে কবিতার রূপ ।
—তা’ হলে দিতাম তাই ।

যদি এ ঘরের কোণে ভীতির ছায়ায়
নীরবে লুকিয়ে মুখ চোখের জলেতে,
মাটিকে মুছিয়ে দিলে গান গেয়ে উঠতো পাখীরা,
আমার বকের রক্তে এই বক্যা দিন হোতো ফসলে উর্বরা
—তা হলে ভাগ্যের মত পথের পাথরে
—মাথা কুটে হোতামনা
ঘরছাড়া দিগন্তে কেবরী !

অমিত জেনেছি মুক্তি আছে শুধু আনন্দ নক্সানে ।
—সে আনন্দ প্রতীক্ষিত চোখের উচ্ছ্বাস,
—সে আনন্দ করে পড়ে শিশিরের সৌরমহিমায়,
—সে আনন্দ ব্যাপ্ত ভূমা কবিতা তোমার,
—পর্বত নিষ্কর হয় সে অব্যক্ত গানে !

তুমি যবে ডাক দাও প্রত্যাহের জীবিকার লড়াইয়ের পরিখা পেরিয়ে
 ট্রামের বর্ষর শব্দ, বাসের হুকার, চতুর্দিকে রক্তমুখ মৃত্যুর নখর
 মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়, মুগ্ধ বা হয় কণ্ঠতবে—
 আকাশে তাকিয়ে দেখে অগ্নিময় কাব্যের অঙ্কর !

আমার শৃঙ্খলধ্বনি অস্ত্রে ঝনঝনা,
 আমার ক্ষুধিত লোভ মুক্তি পায় অসীমের গানে
 আত্মির চীৎকার থেকে জন্ম নেয় তোমার কবিতা,
 —ভয়ের গরাদ ভেঙে নির্ভয়ে বেরিয়ে
 জীবন মৃত্যুকে নেয় দৃঢ় আলিঙ্গনে ।

তাই সে উজ্জাপ মেঘে অশ্রু যত দিগন্তে দিশারী,
 অসংখ্য প্রত্যাশী চোখ তারা হয়ে আকাশে ভাস্বর,
 নিশ্চিত আরাম ছেড়ে পথে পথে আমিও ফেরারী,
 দিনান্তের শ্রান্তি দিয়ে লিখে রাখি প্রাণের স্বাক্ষর ।

উপমা হয়ে থেকে মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই আমার স্বপ্ন সখি এই আমার সাধ
হাত বাড়াও কিঞ্চি ভেবে দারুণ অপরাধ
ও মুখে নয় অসহনীর অপরাধিতা ঐকো
ভূমি আমার যন্ত্রণার উপমা হয়ে থেকে ।

মমতা নত আকাশ দেখে শ্রামল স্নেহশীলা
ধিরেছে এই দ্বিগন্তের পাহাড় নদী টিলা
তীব্র সাধ করেছি কবে জীবন রাখবার,
আজকে যৌবনের কাছে নিজেই তাই ধার ।

বৈচে থাকার প্রস্তুতিত প্রতিশ্রুতি খুটে
বৈধে বধন আয়ুর কটু কুপণ দোরে জুটে
ভিক্ষে ক'রে ক্লক হয়ে ফিরি
কোথায় পাও তখন সেই ভীষণ ভালো ছিরি ;

সে যে কী জালা আমার সে কী তোমার জালা সখি
কী বেদনায় যৌবনের ভাঙা সে কলসীর
জল সরিয়ে কুড়িয়ে আনো শ্রাবণী আমলকী
বনের খুশি ছড়িয়ে চল বাহুর ত্রততীর ।

তাই আমার স্বপ্ন সখি তাই আমার সাধ
হাত বাড়াও কিঞ্চি ভেবে দারুণ অপরাধ
ও মুখে নয় অসহনীর অপরাধিতা ঐকো
এমনি যেন যন্ত্রণার উপমা হয়ে থেকে ।

কবিগান প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সেও কি কবির কণ্ঠে অন্তহীন গানের আশ্বনে
জ্বালাবে নিজের তৃষ্ণা, ব্যথা, আর প্রেমের সুরভি,
নাকি তার তীব্ররূপ, স্বাতি-সুখ-স্বপ্নসাধ, সব
এঁকেছে নিপুণচিহ্ন বাসনার পাড় বুনে' বুনে' !

সে কথা জানে না কবি, শুধু জানে প্রতীকার পালা
যতো তার দীর্ঘ, ততো আকাজিকত আবেশে উজালা
অন্ত কোনো ঢগ নামে, শ্রোতস্বিনী প্রণয়ের টানে
বিহঙ্গমা ভেসে আসে, সপ্রতিভ—সৃজনের গানে ।

সেও তো পরম কাম্য, যন্ত্রণার দীপ্ত অভিমান
ছিন্ন করে স্নানতন্ত্রা, রূপদর্শী, কঠিন, প্রবাল
ইন্দ্রলেখ্য। তুলে ধরে বিচ্ছুরিত জীবনে বিশাল,
তখনি ঝঙ্কত আগে মুহূর্তের তীব্র কবিগান ॥

রাগিনী

মানিক মুখোপাধ্যায়

প্রাত্যহিক যন্ত্রণার আগ্রের পথে
কবন্ধ রাত্রির মৃত ; রৌদ্রের ডানায়
নেমে এলো শস্তময়ী স্বপ্নের অঙ্গরা,
শান্তময়ী অপক্লপ দাক্ষিণ্যের মতো ;
ধূলিকণ্ঠ জীবনের মর্মে লাগে দোল,
অভীপ্সার গ্রামে গ্রামে ভারি বার্তা ফেরে ।

জনারণ্যে কামনার উত্তাল রাগিনী
সংহত গমকে আনে শাস্তির আবেগ,
হৃদয় বিকীর্ণ তাই আলোর প্রবাহে ;
কর্মের ছরস্তু সুর দেশ দেশ ছেয়ে
শ্রমিক হাওয়ার তোলে আনন্দ হিল্লোল,
সে সুরে তন্ময় আত্ম সৃষ্টির চেতনা !

আমাদের জীবনের ক্লাস্তি নেই তাই,
আমরা বেঁধেছি আজ মমতার নীড়
দেশে দেশে , তাই আজো প্রসন্ন আকাশ
আমাদের পথে পথে ব্যপ্তিতে মহান,
যে আজো সূর্যের মতো আমাদের মনে
প্রদীপ্ত উচ্ছল হর অমের বিশ্বাসে !

বিশিষ্টতা

অনাদি মণ্ডল

নিজের পিঠ দেখে না বটে মানুষ, তবে একটা ঘিনিস সবাই দেখে আর বড্ড বেশি দেখে—তা হোল স্বার্থ।

বস্তুজগৎ বিচিত্র কিন্তু বিচিত্রতর মানুষের মনোলোক। আদিকালের জ্ঞানবৃদ্ধ যুগি থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের ফ্রেড, জেমস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যত অমুমত্বান করেন ততই অবাক হন; অন্তর বাহির অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নয়। উত্তর হিমালয়, ভয়ঙ্করী নায়েগ্রা বা গহনবন আফ্রিকা যত কৌতূহলোদ্দীপক হোক, অতসান্ত আটল্যান্টিকে যেমন এমন পর্বত আছে যার পাশে হিমালয়ও শিশু তেমনি মনের গভীর কোণে কোণে এমন সব রহস্য লুকানো যা এককথায় অভূত। আর পদার্থজগৎএর উপর মোটামুটি খবরদারী করবার অধিকার মানুষের এসে গেলেও মনোলোক এখনও অজ্ঞেয়, অপরাঙ্কিত।

তবু এমন কতক তত্ত্ব মানুষের জ্ঞানের ভাঙারে জমা পড়েছে যার সাহায্যে মনো-বিচিত্রার কিছু হৃদিশ মিলে যায়। যেমন মানুষের কর্মচেতনার মূলে কি কাজ করে? এই বিস্তৃত ও জটিল প্রশ্নের কাজ-চলা-গোছের উত্তর মানুষের হাতে এসেছে।

মানুষের কর্মচেতনার মূলে কি কাজ করে? ফ্রেড, যিনি মনস্তত্ত্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন, বলেন—মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের উৎস হচ্ছে (১) কামের উত্তেজনা (২) বিশিষ্টতার বাসনা।

সর্বাঙ্গিক কামময়তা ফ্রেডের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো অতএব দু'নম্বর সিদ্ধান্তকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি—এ নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সুতরাং কামই আমাদের কর্মপ্রেরণা—ফ্রেডের মত হচ্ছে এই। এই লাইনটা পড়ে আপনি যতখানি চমকচ্ছেন, তৎকালীন মুখীমণ্ডলীও ঠিক ততখানিই চমকেছিলেন। দেখা যাক, ফ্রেডের সিদ্ধান্তে সোনা কতখানি বা সবটাই খাদ কিনা!

হিন্দুশাস্ত্রে ষড়রিপুর উল্লেখ আছে। কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। লক্ষণীয় বিষয় এই, এখানেও কামকে প্রথম ও প্রধান আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ, কাম যে কেবল রিপুদের 'সর্দার' এমন নয়। অত্যাচর রিপু কামেরই বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ এবং গুঢ়ত কামাশ্রয়ী। প্রকাশ বিভিন্ন হলেও আস্তরযোগ এই আত্মীয়তা প্রমাণ করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দুতে সর্বপ্রকার কামনা বাসনার মূসাধার এই কাম এবং চলিত অর্থে কাম বা যৌনকাম একান্তভাবে আদি ও অকৃত্রিম কামের ভগ্নাংশমাত্র।

বিশিষ্টতার বাসনা কামনারই ব্যবহারিক রূপ। বৃক্ষের পক্ষে বীজ যেমন, কাজের যেমন কারণ—সমস্ত কার্য-ইচ্ছার পশ্চাতে আছে বিশিষ্টতার বাসনা। ‘রক্তকরবী’ নাটকের রাজার মত এই বিশিষ্টতার বাসনা গোপনে থাকে কিন্তু বহির্লোক এর ইচ্ছিতেই উঠে বসে।

আমেরিকার প্রখ্যাতনামা দার্শনিক জন ডিউই এই কথাটাই একটু অন্তভাবে বলেছেন। ডাঃ ডিউই বলেন : মনের গভীরতম প্রবেশের উদ্দেশ্যে হোল বিশিষ্ট হবার বাসনা।

লিংকন একটা চিঠির প্রারম্ভে বলেছিলেন—প্রত্যেকেই কিছু বাহবা চায়। উইলিয়াম জেমস্, যিনি দর্শন জগতে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন, বলেন—মানবচরিত্রের গভীরতম মূলকথা হোল বিশিষ্ট হবার আকৃতি।

কথাটা মনে রাখুন, ‘বিশিষ্ট হবার আকৃতি।’ মিঃ জেমস্ ‘ইচ্ছা’ বা ‘আকাংখা’ বলেছেন না, বলেছেন ‘আকৃতি’। তীব্রতম তৃষ্ণা। প্রচণ্ডতম ক্ষুধা। খাদ্যের ক্ষুধা বা মৈথুনের ক্ষুধা যেমন ঠিক তেমনি। আপনি যদি ব্যক্তিবিশেষের সত্যিসত্যি এই ক্ষুধাশাস্তি করতে পারেন তবে সে আপনার হাতের তেলোর থাকবে, আপনার কথাই উঠবে বসবে।

তবে দেখুন সমগ্র জীবজগতের মধ্যে এই ক্ষুধা মাত্র মানুষেরই আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই বিশিষ্টতার জন্যে আকৃতি ছিল বলেই সত্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ঐ আকৃতির অভাব ঘটলেই আমরা হব অ-মানুষ—গরু ভেড়ার মতো।

এই বিশিষ্টতার জন্যে একজন অল্পশিক্ষিত দারিদ্র্যপীড়িত মুদী দোকানের কেরানী লুকিয়ে লুকিয়ে আইনের বই পড়তে শুরু করেছিলেন। এই কেরানীর নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনে থাকবেন। তাঁর নাম হোল এব্রাহাম লিংকন—আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

ঐ আকৃতিই ডিকেন্সকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অমর উপন্যাসগুলো লিখতে। ক্রিস্টোফার রেনএর হাতে কালো পাথর প্রাণ পেল—এর পিছনে ঐ মনোভাবই কাজ করেছে। বকফেলার সাহেব কোটি কোটি টাকা জমালেন কিন্তু খরচ করলেন না ব্যক্তিগত ভোগবিলাসে—তার কারণও ঐ। আপনার পাড়ায় যে ভদ্রলোক নিম্নশ্রোত্রে বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছেন—তাও ঐ জন্যেই।

আপনি নিজে যে সবচেয়ে নূতন ক্যাসানের পোশাক পরছেন বা বড়াই করছেন নিজের কৃতিত্বে বা অন্য কোনো কারণে, জেনে রাখুন তা ঐ কারণেই।

আবার মানুষ যে খুনী, গুণ্ডা বা বদমায়ের হয় তারও একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ হোল ঐ বাসনা। নিউইয়র্কের ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার মলকুনি সাহেব বলতেন : সাধারণত ছোকরাবয়েসী গুণ্ডাবদমায়েররা গ্রেপ্তার হবার পরেই চায় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাদের সঙ্গে দেখা করুক এবং তাদের মূল্যবান ‘বিরতি’ কাগজে ফলাও করে ছাপুক। ছদ্ম বাদে ঘানিটানার আপত্তিকর সম্ভাবনা থাকে তাদের অগোচরে, বেব রুখ, লা গার্ডিয়া প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তারাও হবে অচিরে বিখ্যাত—এই স্বপ্নেই তারা বিভোর।

আপনি যদি বলেন কিভাবে আপনার বিশিষ্টতার ক্ষুধা তৃপ্ত হয়, তাহলে আমি বলে দেব আপনি নিজে কি। কারণ ঐ বিশেষ ধরনের চাওয়া-যে চরিত্রগঠনের মালমশলা যোগায়! কেমন জানেন? জন ডি রকফেলার চায়নার পিকিংএ লক্ষ লোকের উপকারে আধুনিক হাঁসপাতাল তৈরী করে গর্ববোধ করেন—সেই লক্ষ লোকের জন্যে, যাদের তিনি কখনও চোখে দেখেননি বা দেখবেনও না! অপরদিকে মানসিং কুখ্যাত দস্যু হয়েও নিজেকে গণ্যমান্য ভাবত। একবার মধ্যপ্রদেশের পুলিশ তার খোঁজে পাহাড় বন চুঁড়ে কিরছে এমন সময় মানসিং রেওয়ার এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে ঢুকে পড়লো। ভয়বিহ্বল গৃহস্থামী চীৎকার শুরু করবে কিনা ভাবছিল। মানসিং তাতে বলল : দেখ, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না কিন্তু মনে রেখো আমি সর্দার মানসিং!

এখন রকফেলার আর মানসিংএর লক্ষ্য এক, ঐ বৈশিষ্ট্যবোধের আকৃতি কিন্তু পথ আলাদা। তাই মানুষ হিসেবে দুজনের আকাশপাতাল প্রভেদ, পথের পার্থক্যই এর জন্যে দায়ী।

পৃথিবীর খ্যাতিমান লোকেরা ঐ আকৃতির জন্যে কত অদ্বুত কাণ্ডকারখানা না করতেন—এর সরস বিবরণী আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। সম্রাট আকবর রাজপুতানার মরুপ্রান্তরে লক্ষ সৈন্য ও অজস্র ধনবল খোয়ালেন কোনো সম্পদশালী রাজ্যাধিকারের জন্যে নয়—মেবারের ক্ষুদ্র কিন্তু বীর্যবান ভূম্যাধিকারী রাণা প্রতাপ তাঁর মৌখিক অধীনতা স্বীকার করুক এই ইচ্ছায়। মহাসমুদ্রের অধিকর্তা ও ভারতের ভাইসরয় এই উপাধির জন্যে দরবার করেছিলেন আবিষ্কারক কলম্বাস স্পেনরাজের নিকট। রাণী ক্যাথারিন সে-চিঠি খুলতে অস্বীকার করতেন যাতে না লেখা থাকত ‘মহামহিম মহারাণীর বরাবরে’। মিসেস লিংকন একবার মিসেস গ্র্যাণ্টের উপর বাধিনীর মতো তেড়েফুড়ে উঠেছিলেন : আমি বলবার আগে ভূমি চেয়ারে বসে পড়েছ, আচ্ছা আস্পর্শ তো তোমার!

আমেরিকান কোটিপতিরা এডমিরাল বার্ড-এর মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের ব্যাপারে অর্থ-সাহায্য করেছিলেন এই শর্তে—চিরতুষারাবৃত সুউচ্চ গিরিশিখরগুলোর নাম যেন তাঁদের নামে হয়। সুন্দরী পারী নগরী ভিক্টর হুগোর নামানুসারে পুনর্নাম পাক—ঔপন্যাসিক সম্রাটের এই ছিল একমাত্র বাসনা। সেক্সপিয়রের ভাগ্যে লক্ষী ও সবস্বতীর অকুপণ কুপালাভ ঘটেছিল তবু যাতে তাঁর বংশমর্যাদা আবও বৃদ্ধি পায় সেজন্য ‘কোট অব আর্মস’এর জন্যে লালারিত হয়েছিলেন তিনি।

মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে ও সহানুভূতি পাবার আশায় মানুষ অনেক সময় চিরক্লম্ব হয়। বৈশিষ্ট্যবোধের ক্ষুধা তৃপ্ত করার এও এক পন্থা বিশেষ। মিসেস ম্যাকিন্সলের উদাহরণই ধরুন। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন আমেরিকার খোদ প্রেসিডেন্ট সাহেব। স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীমতী স্বামীকে বাধ্য করতেন গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য ফেলে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে—দয়িতের সোহাগসরস আলিঙ্গনের বন্ধনে সুস্থিত হওয়ার মধ্যে তিনি পেতেন সীমাহীন তৃপ্তি।

মহিলা সাহিত্যিক মেরী রবার্ট ব্রিগেহাট তাঁর একটি রচনায় জনৈক রমণীর চাকসাকর জীবনগাথা বিবৃত করেছেন। ঐ রমণী বিশিষ্টতার লোভে চিরকুণ্ডা হয়ে পড়েছিলেন। ব্রিগেহাট বলেন : একদিন ঐ মহিলা নিজের বয়স ও রূপের কথা বিবেচনা করে অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন জীবনে বিবাহের সম্ভাবনা অত্যন্ত। সুস্থ সবল পুরুষকে নিয়ে একটা মিষ্টি নীড় রচনা করার স্বপ্ন, সব নারীর আদি মানবী ইন্ডের কাছ থেকে পাওয়া। বলা বাহুল্য রমণীটি অত্যন্ত মুগ্ধে পড়লেন।

ক্রমে নিয়মমাক্ষিক তিনি বিছানা নিলেন। তারপর দীর্ঘ দশবছর যাবৎ বৃদ্ধা মা রুগ্না মেয়ের সেবায় ধাবার, জল, পোশাক নিয়ে ওঠানামা করতে লাগলেন তিনতাল। থেকে একতাল।। বৃদ্ধার এই ‘হোসটাইম’ চাকরী থেকে মুক্তি দিলো মৃত্যু। রুগ্না রমণী হস্তাধানেক বিছানায় কাতরালেন। তারপর, বোধ হয় জীবনধর্মের খাতিরে বিছানা ছাড়লেন এবং দিক্সি ভালমামুষ বনে গেলেন।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে মানুষ যে পাগল হয়ে যায়, অনেকক্রে তার কারণ হোল ঐ বিশিষ্ট হবার লোভ। বিশিষ্টতা যা মানুষ ক্রুত কঠিন বস্তুজগতে বঞ্চিত হয়ে কিয়ে পেতে পারে মস্তিষ্কবিকৃতির স্বপ্নলোকে। জানা গেছে দুনিয়ার ইাসপাতালে মনোরোগে ভুগছে এমন রোগীর সংখ্যা আর সমস্ত রোগে আক্রান্ত লোকের সমান। আমেরিকা ফ্রান্স ইংল্যান্ড প্রভৃতি অতিআধুনিক দেশগুলোর অন্ত অন্তরত দেশ অপেক্ষা মনোরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। শুধু নিউইয়র্ক শহরের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আপনি যদি নিউইয়র্কবাসী হতেন এবং আপনার বয়স যদি ২৫-র উর্ধ্বে হয় তবে ২০ মধ্যে এক সম্ভাবনা হচ্ছে যে আপনাকে উন্মাদ-আলয়ে অন্তত দশ বছর কাটাতে হবে।

মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ কী ?

উত্তরে সাধারণভাবে বলা হয় সিক্সলিস জাতীয় কয়েক প্রকার রোগবিজ্ঞানু ব্রেশ সেলকে নষ্ট করে দেয় কলে জন্ম নেয় ঐ রোগ। প্রকৃতপক্ষে ও-রোগের উৎপত্তি অর্ধেক-ক্রে অত্যধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণে আর বাকী অর্ধেক ক্রে ? সে বড় মজার ব্যাপার। দেখা গেছে তাদের কোনো রোগই নেই। দিক্সি সুস্থ সবল মানুষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত। বিজ্ঞানীরা এদের মস্তিষ্কে পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করে বলেছেন—নির্দোষ। আমার, আপনার যেমন—ওদের মস্তিষ্কের তত্ত্বগুলো সাধারণভাবে কর্মরত। তা হলে খুঁতটা কোন জায়গায় ? কেন তবে মানুষগুলো পাগল ? চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় এ-নিয়ে বহু আলোচনা ও তথ্যমূলক বিশ্লেষণ মেলে। সেখান থেকে একটি মহিলার কাহিনী উদ্ধৃত করছি।

এই মহিলার বিবাহ বিরোগাস্ত নাটকবিশেষ। জীবনে সে চেয়েছিল ভালবাসা, যৌন-তৃপ্তি, সম্মানসমৃতি। কপালদোষে কোনোটাই সে পায়নি। আশার ইমারত চুরমার হয়ে গেছে।

তার ঘটল মস্তিষ্কবিকৃতি। এখন ভাবে তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে কবে। তবে, বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ায় তার পুনর্বিবাহ হয়েছে, মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায় বলে পরিচিত সে সবখানে।

সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে সে আর কান্দাল নেই এখন। প্রতি সকালে বসে : ডাক্তারবাবু, কাল রাত্রিতে আর একটি খোকা হয়েছে আমার। ভারী সুন্দর খোকা, দেখবেন ?

জীবনযুদ্ধে সে পরাজিত, কঠিন বাস্তবের আঘাতে তার সাধের স্বপ্নপোতগুলো বিধ্বস্ত। কিন্তু মস্তিষ্কবিকৃতির সোনালী আলোর মোড়া আনন্দলোকে বসে সে যেন দেখছে তার কোনো তরুণীই খোয়া যায়নি...একটার পর একটা লাগছে বন্দরে, তাদের পাল্পে পালে হাওয়া, মাস্তলে মাস্তলে গান।

ভারী দুঃখের, তাই না ? তবে ডাক্তারবাবু বলেন : না। এমন যদি হয় যে আমি তাকে স্পর্শ করলাম আর সে সুস্থ হয়ে গেল তবু আমি তা করব না। কারণ এ অবস্থায় সে অনেক বেশি সুখী !

দলবেঁধে পাগলেরা যখন বসে থাকে, দেখবেন নিজের কৃতিত্বে কেমন তারা ডগমগ। এই একজন হয়ত লাখ টাকার চেক কেটে দিল কাকুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, ওদিকে আর কেউ হয়ত তার 'পরম বন্ধু' মহামহিম আগা খাঁর নিকট পরিচয়পত্র লিখে দিলো। বিশিষ্টতার ক্ষুধা মিটোচ্ছে তারা খুশিমত।

আচ্ছা, বিশিষ্টতার ক্ষুধা যদি এমন হয় যে তার তাড়নায় মানুষ পাগল হতেও কুণ্ঠিত নয়, তাহলে আমরা যদি মানুষের এই ক্ষুধা, পাগলামির এই দিককে তৃপ্ত করতে পারি তবে তার দ্বারা কাজ আদায় করা খুব কঠিন কাজ হবে কি ?

যদুর জানি, দুনিয়ার বোধ হয় দুটি মানুষই আছেন যাদের বছরে লাখ ডলার দেওয়া হয় মাইনে বাবত। তাঁদের নাম ওয়াল্টার ক্রিস্লামার ও চার্লস স্কোয়াব।

এন্ড্রু কার্ণেগী চার্লস স্কোয়াবকে দৈনিক ৩০০০ ডলার মাইনে দিতেন। কেন ? স্কোয়াব কি একটা বিরাট প্রতিভাবান কিছু ? না। কার্ণেগীর কারবার ইম্পাতের, স্কোয়াব কি ইম্পাত সম্পর্কে অন্তসব কর্মচারী অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ? মটেই না। স্কোয়াব নিজে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অধীনে এমন সব কারিগর আছেন যারা ইম্পাতের ব্যাপার বোঝেন বেশি।

স্কোয়াব বলেন, মানুষের সঙ্গে সাক্ষ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনা করার জন্যে তাঁর এই খাতির। তাঁর অবিদ্বান্ড সাক্ষ্যের গুণমন্ত্রটি কয়েকটি কথায় প্রকাশ করেছেন নিজের মুখে।

নিচে রয়েছে সেই কয়েকটি কথা। সেই গুটিকয়েক কথা যা পাথরে কুঁদে আটকে রাখা উচিত হোকানে, অফিসে ও স্কুলের দেওয়ালে—যা স্কুলের ছেলেদের ধরে ধরে মুখস্ত করানো দরকার সংস্কৃত ব্যাকরণ বা চেরাপুঞ্জির বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হিসেব ফেলে রেখে। যে কথাস্ত্রো মনে রাখলে আমারআপনার জীবনের মোড় পর্যন্ত ঘুরে যেতে পারে।

“মানুষের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারাকে আমি আমার আসলগুণ বলে বিবেচনা করি। আরও জানি সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বারা মানুষের ভাল দিককে বাড়িয়ে তোলা যায়।

মানুষের উত্তমকে নষ্ট করতে গুরুজন বা মনিবের রূঢ় সমালোচনার তুল্য কিছু নেই জগতে। আমি কক্ষনো কারুর রূঢ় সমালোচনা করিনা। কাজে যাতে আরো মন যায় তেমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করাই আমার চেষ্টা। ভাল কিছু দেখলেই আমি পূর্ণ সন্তোষ দিই আর প্রশংসা হই পক্ষমুখ।”

স্কোয়াব ঐ করে থাকেন। আর সাধারণ মানুষ কি করে থাকে? ধারাপ লাগল তো হেঁকে পাড়া মাথার করল আর ভাল লাগলে চুপচাপ, রা-টি আর কাড়বে না।

স্কোয়াব বলেন : মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশা বহু বিস্তৃত। আমার সুযোগ ঘটেছে হুনিয়ার নামী লোকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার। তবু আমার একান্ত বাসনা তেমন লোকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করি—তিনি যত বড় পদস্থই হোন—যিনি রূঢ় সমালোচনার তাড়না অপেক্ষা সহানুভূতির আবেশে বেশি কাজ না করেন।

কার্ণেগী সাহেবের অবিদ্বান উন্নতির একটা কারণই এই। তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশ ভাবে কর্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা করতেন। তাঁর কবরখানায় উৎকীর্ণ করবার জন্যে এই কয়টি কথা লিখে রেখে গিয়েছিলেন : এখানে শাস্তিত রয়েছেন সেই মানব যিনি তাঁর অপেক্ষা শুণী লোকদের আপন করতে জানতেন।

আপনারা নিশ্চয়ই ‘জিগফিল্ড ফিল্ড’ দেখেছেন এবং জিগফিল্ডের নাম শুনেছেন। নাচ গানের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপক পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায়নি! তাঁর ছিল এই নীতিবোধ। নতুবা ভাবতে পারেন, নিতান্ত অখ্যাতা ও যৎকিঞ্চিৎ রূপলাবন্তায়ুক্তা যুবতীদের কি করে রাতারাতি একএকটি মলিন মনরো বা জা জা গ্যাবর করে তুলতেন? প্রত্যেকটি নর্তকনর্তকীর জন্যে তাঁর প্রভূত উৎসাহ এবং উদার সহনশীলতা তো ছিলই তাছাড়া ছিল এই অকৃত্রিম আন্তরিকতার বাহ্যিক প্রকাশ; কুশীলবগণ যেন তাঁর মাইনে করা কর্মচারী নয়, তারাও যেন সমগ্র প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। একবার জর্নৈক নবীনা নর্তকী একটা বিরাট অনুর্তান নষ্ট করে দিয়েছিলো নিজের দোষে। জিগফিল্ডের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল প্রভূত। রোক্তদমানা নারিকাকে সাম্বনা দিতে দিতে জিগফিল্ড বললেন : তুমি দুঃখ কোরো না। you have done your best। তারপর সেই নারিকাকে নিয়েই বোষ্টন শহরে উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা কুড়োলেন এবং ভবিষ্যৎকালে ঐ নর্তকী হলেন জগতে অদ্বিতীয়া।

কিছু পাঠক এঙ্কুনি লাকিয়ে উঠে নিশ্চয়ই বলছেন : দূর, বস্তাপচা কথা সমস্ত। তোষামোদ? তোষামোদে অভিষ্ট সিদ্ধ হবে? তাহলে ভাবনা ছিল কী! না বাবা, বুদ্ধিমান লোকদের কাছে তোষামোদ একেবারে ভোঁতা অজ্ঞ!

তোষামোদে যে ফল দেখা দেয় না এমন নয়। স্বার্থপর, আত্মসুখী লোকেরা তোষামোদ ভারী পছন্দ করে। অনাহারী মানুষ যেমন খাত্ত-অখাত্তের বিচার করে না, এদের কাছেও তেমনি তোষামোদ ও প্রশংসার পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়।

উদাহরণস্বরূপ, বহুপত্নীক ডিভানি ভাতৃবৃণ্ডলের কথাই ধরুন। বিবাহের বাজারে এমন অদ্ভুত সাফল্য কি করে তাঁরা অর্জন করলেন? দু ভাই বিয়ে করলেন দুই

জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত্রীকে—প্রাইমা ডোনা ও বারবারা হার্টন। তাঁদের সাফল্যের চাবিকাটি কি ?

এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মিস জোন্স 'লিবাটি' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক নিবন্ধে। তিনি বলেছেন তোষামোদকে দুই ভাই আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। যা এই অতি-বাস্তব যুগে বেশ নূতন ও চটকদার। ওদের নারীজগৎ জয় করার গুপ্ত খবরই এই।

এমন কি মহারানী ভিক্টোরিয়া বড় তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ডিসুরেলি স্বীকার করেছেন যে সস্তা ও শুষ্ক প্রশংসা করে তিনি কাজ আদায় করতেন সবসময়। তবে ইয়া, একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে ডিসুরেলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, মার্জিত ব্যক্তি। সুতরাং ডিসুরেলির তোষামোদ 'ডিসুরেলি মার্ক' হত নিশ্চয়ই।

কিন্তু সাধারণভাবে তোষামোদ অচল উপায়। অচল টাকা পরসার মতো—চলে না এমন নয় তবে এই করে ক্ষেত্রবিশেষে পুলিশ চালান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

প্রশংসা ও তোষামোদ আলাদা করব কি করে ? উপায়টা সোজা। প্রথমটা আন্তরিক আর দ্বিতীয়টা একান্তই বাহ্যিক। প্রথমটার জন্ম মনে, অপরটার মুখে। একটার সুনাম বিশ্বজোড়া দ্বিতীয়টার দুর্নাম।

মেক্সিকো শহরের চপাল্টেপেক্ প্রাসাদে জেনারেল ওবরেগনের এক আবক্ষ মূর্তি আছে। মূর্তির নিচে জেনারেলের এই অমূল্য বাণীটি ক্ষোদিত আছে : শত্রুর তরবারিকে ভয় কোরো না, ভয় কোরো মিত্রের তোষামোদকে।

না ! না ! না ! তোষামোদ করার পরামর্শ আমি আপনাদের দিচ্ছি না। আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি জীবনের নূতন এক দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছি।

রাজা পঞ্চম জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদে তাঁর পড়বার ঘরে ছ'টা অরণ্যোগ্য উপদেশবাণী দর্শনীয়ভাবে আটকে রেখে ছিলেন। তাদের একটা হোল : বিনা কারণে আপনা থেকে কিছু দেওয়ার কথা-বা সস্তা প্রশংসা নেওয়ার কথা আমায় বলো না। এই 'সস্তা প্রশংসা'ই হোল তোষামোদ। তোষামোদের একটা চমৎকার সূত্র এস্থলে উল্লিখিত করা যায় : অন্তে নিজের সম্বন্ধে ঠিক বা ভাবে তাই বলার নাম তোষামোদ।

না, এমন তোষামোদের কথা আমি বলছি না। করবেন প্রশংসা ; আন্তরিক প্রশংসা ; সত্যিকারের ভাল লাগার নিঃসংশয় প্রকাশ।

ইমারসন বলতেন : প্রত্যেক লোকের কাছে কিছু না কিছু শেখবার আছে। মহাজ্ঞানী ইমারসনের কাছে যা সত্য, আমার আপনার কাছে তা সহস্রগুণ সত্য নিশ্চয়ই। এই সত্যকে সম্মান দিয়ে মানুষের ভালদিক আন্তরিক সমর্থন ও উচ্ছসিত প্রশংসায় অভিব্যক্ত করুন। দেখবেন, ক্রমে ক্রমে দূর কত নিকট হয়ে গেছে, পর হয়ে গেছে আপন ভাই।

॥ চন্দ্র ৫ ॥

॥ ডকুমেন্টারী ছবিতে বুদ্ধের জীবনী ॥

ভারত সরকারের প্রযোজনায় ফিল্ম ডিভিসনের পক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক আহুত হয়ে প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় বুদ্ধদেবের জীবন সম্বন্ধীয় একখানি ডকুমেন্টারী ছবি তুলবার প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছেন। ছবিটির স্টুডিংয়ের কাজ সম্ভবত জাম্মুয়ারীর মধ্যে শেষ হয়ে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মুক্তিলাভ করবে। দৈর্ঘ্যে চার-পাঁচ হাজার ফুটের এই ছবিটির বেশির ভাগ অংশ জুড়ে থাকবে ইলোরা ভাস্কর্যের সংগে মথুরার বুদ্ধমূর্তির কারুকর্ম, এবং অমরাবতী ও সাঁচী প্রভৃতির অন্যান্য বহুবিধ শিল্পসম্পদগুলি। ছবিটিতে প্রতিফলিত হবে বৌদ্ধধর্মের মূল উৎসের পটভূমিকা—বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তদনীন্তন সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় উন্নত জীবনানয়নের প্রয়োজনীয়তা। ভারতীয় ভাস্কর্য ও অঙ্কন ক্রেশ্চার শিল্পকর্মে বুদ্ধের জীবনগাঁথা। সেই সংগে থাকবে ভারতে এবং বিদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও বিস্তারের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা। ছয়েন সাঙ-এর ভারত-ভ্রমণ রত্নান্ত ও স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হবে এর মধ্যে। ছবিটির অধিকাংশ স্টুডিংয়ের কাজ ভারতেই হবে কিন্তু কিছু লোকেশন স্টুডিংয়ের কাজের জন্য পরিচালককে বর্ম ও সিংহলেও যেতে হতে পারে। এই ছবির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন ভারত সরকার। ভারত সরকারের পক্ষে ডকুমেন্টারী ছবি তুলবার জন্যে বেসরকারী প্রযোজককে এই প্রথম আহ্বান। সেইদিক দিয়ে চিত্রশিল্পের প্রযোজকদের কাছে এটা একটা শুভ সূচনার ইংগিত বহন করছে।

উক্ত ডকুমেন্টারীটি ছাড়াও, সরকারের নামমাত্র সাহায্যে বিমল রায় আরো একটি ছবি তুলবেন স্থির করেছেন। এ-ছবির প্রযোজক হবেন তিনি নিজেই। তাঁর ইচ্ছা জাতকের চার-পাঁচটি ছোট গল্পকে নিয়ে একটি রঙীন ছবি তোলার, এবং সেই গল্পগুলি কাটুনের মাধ্যমে পরিবেশন করা। এবং তা করতে হলে, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের মত এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো দেশের টেকনিশিয়ানদের সাহায্যও তিনি নিতে পারেন। রঙীন ছবিতে ব্যালে নৃত্য সংযোজনের ইচ্ছাও তাঁর রয়েছে এবং সেই কাজের জন্য প্রয়োগকর্তা হিসাবে সম্ভবত উদয়শংকরই মনোনীত হতে পারেন। ব্যালে নৃত্য ছাড়াও অধিক আকর্ষণ হিসাবে এ-ছবিতে থাকবে সমৃদ্ধ সুরের রবীন্দ্রসংগীত।

এই ছবির মধ্যে বুদ্ধকে মানুষ গোতম হিসাবে দেখাবার জন্যে জোর দেওয়া হবে বলে সিদ্ধার্থ যশোধারা এবং রাহুলের কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়ে বুদ্ধের জীবনের মহত্ব ভরা কোমল-কঠোরে মেশানো মধুর দিকগুলিকে তুলে ধরা হবে। আরো প্রকাশ, তাঁর বৃহত্তর মানবিক সত্যকে পর্দার প্রতিফলিত করতে যে শক্তিশালী অভিনেতৃবর্গের প্রয়োজন হবে, তাদের

নির্বাচনকালে, পাছে অর্থসিপ্পাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় সেজন্যে বঙ্গমফিসের তথাকথিত জনপ্রিয় চিত্রভারকাদের এড়িয়ে যাবার কঠোর মনোভাব প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিচালক। কারণ হিসাবে বলেছেন, এ-ছবি দিল্লীতে আগামী বছরে ‘প্রেমিক কিল্লি’ হিসাবে প্রথম মুক্তি পাবে ইউনেস্কোর জেনারেল কনফারেন্সে। মানবতার প্রতি বুদ্ধের মহান বাণী বহন করে নিয়ে যাবে এ-ছবি আন্তর্জাতিক লোকচক্ষুর সামনে, তাই এ ছবির সম্মানের কথাটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। বিমলবারু চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং নির্ভাবান পরিচালকও। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

॥ চিত্রলোকের খবরাখবর ॥

পিকিং-এর একটি খবরে জানা গেছে যে, চীনে ভ্রমণরত ভারতীয় ফিল্ম প্রতিনিধিদের অগ্রতম সভ্য শ্রী চেনন আনন্দ চীন সরকারের সঙ্গে একটি যুক্ত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে যে, ভারত, চীন ও সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে হিউয়েনশাঙের জীবন অবলম্বনে একটি ছবি তুলবেন। বিগত সাত খুঁটাকে চীন দেশ হতে হিউয়েনশাঙ ভারতবর্ষ পর্যটনে আসেন। সোবিয়েৎ সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার পর কাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ করা হবে।

॥ চীনে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল ॥

ভারতীয় চলচ্চিত্রদলের প্রতিনিধিরা গত ২৮শে অক্টোবর নানকিংএ পৌঁছান। শিল্পীরা ইয়াংশি নদী অতিক্রম করে একটি সার উৎপাদনের কারখানা পরিদর্শন করেন। ঐ কারখানাটির শ্রমিক সম্বন্ধে উদ্বোধনে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিনিধি দল ছপুয়ের শোর ঠিক পূর্বে প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছান এবং দর্শকরা তাঁদের বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করেন। ছবিঘরটিতে ভারত সরকারের ডকুমেন্টারী ছবি ও রাজকাপুর প্রযোজিত “আওয়ারা” প্রদর্শিত হয়।

চীন গণরাষ্ট্রের সভাপতি মাও সে-তুং এক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কুড়ি মিনিটের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, ভারতীয় বন্ধুদের আমরা সম্বর্ধনা জানাই, কেননা তাঁরা শান্তিকামী। অতীতে আমরা উভয়দেশের জনসাধারণ বহু অত্যাচার সহ্য করেছি এবং বর্তমানে স্বাধীনতা অর্জন করেছি।...আপনাদের দেশের চলচ্চিত্র দুই জাতির ব্যবধান অতিক্রম করেছে এবং সেই কারণে এগুলি প্রকৃত শিল্প।’ চীন দেশের ২০টি শহরে ৩৫ লক্ষাধিক লোক ভারতীয় ছবি দেখেন। দেড়শতাব্দিক ছবিঘরে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পিকিং, নানকিং ও চ্যাংচু-র সংগীতজ্ঞ, সুরকার এবং চিত্রসমালোচকেরা ভারতীয় ছবির সংগীতাত্মক ভূমিকা প্রশংসা করেন এবং বলেন এই সুর চীনা দর্শকদের সবিশেষ মুগ্ধ করেছে। তারা প্রসঙ্গক্রমে, “আধিয়া” ছবিতে শরোদিয়া আলি আকবরের উচ্চাঙ্গ সুর এবং “দোবিবা জমিন”-এর লঘু সুরের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

॥ পাকিস্তানী ছবির পরিচয় ॥

করাচী ও লাহোরের বিভিন্ন সংবাদে জানা গেছে যে, পাক-সরকার দেশের ফিল্মশিল্পের উন্নতিকল্পে একটি সরকারী ফিল্ম সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ হবে পাক-ফিল্মের ব্যবসায়ের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং কি পরিমাণ কাঁচা মালের প্রয়োজন তার হিসাব নেওয়া। দেশী ফিল্ম মন্দাভাব নিবারণ করার কথাও তাঁরা ভাববেন। পাক-ফিল্মশিল্পে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় কিনা সে সম্পর্কেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

সংবাদদাতা দুটি নতুন ছবির কথা জানিয়েছেন। সে দুটি হলো 'ইস্তেখাব' 'আনোখী'। দেশবিভাগের পর 'ইস্তেখাব' হলো পাকিস্তানের দ্বিতীয় ছবি। ছবিটির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। অভিনেতাদের মধ্যে আছেন, মামুদ, মহম্মদ ইসমাইল, জামিলা বেজাক প্রভৃতি। পাকিস্তানের প্রথম ছবি "মান্দী" শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে।

'আনোখী' ছবিটি প্রযোজনা করছেন লতিফ হোসেন। শাহনওয়াজ পরিচালিত এই ছবিটিতে বোম্বাই-এর শীলা রামানী অভিনয় করেছেন। পূর্বে ছবিটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন ও, পি, দত্ত। কিন্তু পাকিস্তানী কলা-কুশলীরা ভারতীয় পরিচালকের নির্দেশে কাজ করতে অস্বীকার করার পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। শোহিল হাসমী কটোগ্রাফীতে আছেন।

॥ নতুন ছবির খবর ॥

ভাতুড়ী মশাই : পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের এই ছবিটির কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। এতে সংগীত পরিচালনা করেছেন অনিল বাগচী। আলোকচিত্র ও সম্পাদনার দায়িত্ব যথাক্রমে বিভূতিদাস ও রাজেন চৌধুরীর ওপর অর্পিত হয়েছে। ভূমিকালিপিতে পাহাড়ী সান্ধ্যাল, বিমলকুমার, নীতিশ, সবিতা চ্যাটার্জী, চন্দ্রাবতী, অরুণপ্রকাশ, আবু বোস প্রভৃতি রয়েছেন। নাম ভূমিকায় একজন সৌখিন অভিনেতা অংশ গ্রহণ করবেন।

মুলার ধরনী : প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পরিচালনা করছেন অর্ধেন্দু সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় সন্ধ্যারানী, অসিতবরণ, বিকাশ, বীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্ধ্যাল, সবিতা, শোভা সেন, রাজলক্ষী, প্রেমাংশু বোস, তরুণকুমার প্রভৃতি শিল্পী অভিনয় করেছেন। সুরারোপ করেছেন যানবেজ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদন শব্দগ্রহণ ও চিত্র গ্রহণে আছেন যথাক্রমে শিব ভট্টাচার্য, গৌর দাস ও সন্তোষ গুহরায়।

দেবী ফুল্লরা : শ্রী আর্টস প্রোডাকশন্সের এই ছবি ফনী বর্মার পরিচালনায় দ্রুতগতিতে নির্মিত হচ্ছে। ছবিটিতে সুরযোজনা করছেন রবীন চ্যাটার্জী। নাচ গানও নয়নাভিরাম বহিদুর্গ এ ছবিটির আকর্ষণ হবে। আরো জানা গেছে যে, শতাব্দিক সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ ছবিটিতে অংশ গ্রহণ করবে।

এরা কারা : গত ২০শে অক্টোবর নবগঠিত আরবি ফিল্মসের প্রথম ছবির ছুঁড়িতে

সুসম্পন্ন হয়েছে। 'এরা কারা' ছবিটি প্রশান্ত চৌধুরীর হামির গল্প 'ছুট' অবলম্বনে গৃহীত হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন দিলীপ মুখার্জী। কটোগ্রাফীতে আছেন ধীরেন দে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা ভূবীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। মহরতের দিন বাবুয়া ও মাস্টার বিভূকে নিয়ে একটি দৃশ্য গৃহীত হয়।

চারমিনার : মুলুক্রাজ ভক্সীর কাহিনী অবলম্বনে নাগিনা ফিল্মসের আগামী ছবি 'চারমিনার'-এর মহরৎ ২৯শে অক্টোবর বোম্বাই-এর এম-টি ষ্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন রবীন্দ্র দাভে। সংলাপ ও গীত রচিয়তা হিসাবে রয়েছেন বিশ্বামিত্র আদী। সংগীত ও নৃত্য পরিচালনা করবেন যথাক্রমে শারদুল কাতরা এবং শারদ গুপ্তা।

মহরৎ উৎসবে অভিনেত্রী মনোরমা ক্যাপস্টিক ধরেন এবং জীবনের একটি চিত্র গৃহীত হয়।

ছবিটিতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নানীর খান ও জবীন অবতীর্ণ হবেন। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রেণু মেকার, রমেশ সিংহ, এসকে প্রেম, ভগবান প্রভৃতি।

নাইট ক্লাব : যুভি ইণ্ডিয়ার প্রথম ছবি 'নাইট ক্লাব'-এর মহরৎ উৎসব গত ২৬শে অক্টোবর আন্ধেরীর এম-টি ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেমনাথ পারাজ-এর লিখিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটির পরিচালনা করছেন এল রঞ্জন এবং চিত্র গ্রহণ করবেন ওয়াই. ডি. সারপটদার। সংগীতাংশে আছেন হুসলাল এবং ভগতরাম।

বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছেন শ্যামা, সুনীল দত্ত, প্রাণ, ইন্দিরা, কাকনমালা, জুনি ওয়াকার, মালতী প্রভৃতি শিল্পীরা।

বাঁশরীবালা : দেশাই প্রডাকসনের উদ্যোগে এই ছবিটির শুভ মহরৎ সম্প্রতি বোম্বাই-এর মোহন ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নানুভাই ভমিল পরিচালিত এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন এম. আর. নবাব। সংগীত পরিচালনা করবেন কমল মিত্র এবং রাজকুমার ভাখারী চিত্র গ্রহণ করবেন।

মহরৎ উৎসবে বাঁশী বাদনের একটি রেকর্ড বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ছবির নায়িকা চিত্রার বাঁশী বাদনরতা একটি চিত্রগ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন মহিপাল, দলজিৎ, কৃষ্ণাকুমারী, রামসিং প্রভৃতি।

পানিং শো : মেক্সিকোর পটভূমিকায় রচিত এই ছবির কাজ মহরৎ ব্যতিরেকেই সম্প্রতি বোম্বাই-এর রংজিৎ ষ্টুডিওতে শুরু হয়েছে। ছবিটির প্রযোজনা করছেন রামদয়াল। ছবিটির সংগীত পরিচালক এখনো নির্বাচিত হয়নি। শ্রীরামদয়াল পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন শাকীলা, পুর্ণিমা, দলজিৎ, টুনটুন, রমেশ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পীরা।

॥ সমালোচনা ॥

পরেণ : কাহিনী : শরৎচন্দ্র ; চিত্রনাট্য জ্যোতির্ময় রায় ; অতিরিক্ত সংলাপ : সজনীকান্ত দাস ; পরিচালনা ও সংগীত : অম্বপম ঘটক ; শব্দগ্রহণ : বানী দত্ত ; ভূমিকায়—পাহাড়ী,

কমল মিত্র, নির্মলকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংগু, জহর, তুলসী, সাবিত্রী, মলিনা দেবী, মঞ্জু, শোভা সেন প্রভৃতি।

ইদানীংকার বাংলা ছবি'র নৈরাশ্রের মাঝখানে এই ছবিটির আপাতপরিচ্ছন্নতা দর্শকদের মুগ্ধ করবে, শব্দচ্ছত্রের ২০-২২ পাতার একটি গল্পকে নাট্যরসসমৃদ্ধ করে পর্দার উপস্থাপিত করে জ্যোতির্ময় রায় বেশ মুগ্ধমানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত, ছোটো গল্পটিতে নাটকীয় উপাদান উল্লেখযোগ্যরূপে কম ছিলো। শব্দচ্ছত্রের কাহিনীর ওপর অতিরিক্ত সংলাপকার ও চিত্রনাট্যকার যা রঙ ফলিয়েছেন তা সর্বত্র মুঠু ও স্বচ্ছন্দ হয়নি একথা বলাই বাহুল্য। বহুক্ষেত্রে ছোটোখাটো বিষয়কে ইচ্ছে করে জটিল করে দেখানোর কাহিনীর দৈর্ঘ্য অনেক বেড়ে গেছে। উদাহরণত, পরেশের মতো বুদ্ধিমান শিক্ষিত ছেলে জ্যাঠামশাইকে অতো সহজেই ভুল বুঝতে লাগলো, এটা অনেকক্ষেত্রেই অবিদ্যাস লাগে। তেমনি অদ্ভুত লাগে, আরেক দৃশ্বে কুচক্রী হরিচরণের অকস্মাৎ ভালো মানুষ হওয়া; গুরুচরণ গোয়ালিনীকে ছ-এক বা প্রহার করার পর ভাই হরিচরণ অতি সহজেই দাদাকে বিপদে ফেপতে পারতো। তা'ছাড়া ডাকাতির ব্যাপারটা কাহিনীর জটিলতা বাড়াতেও একটু খাপছাড়া লাগে। শেষদৃশ্বে গুরুচরণকে খেমটার আসরে নিয়ে যাওয়াটা নিতান্ত বিসদৃশ। তাঁর মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্ন লোকের পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক নয়।

পরিচালনার যে জাতীয় ক্রটি বাংলা ছবিতে বহুল পরিমাণে দেখা যায়, এখানেও তা বর্তমান। প্রণয় দৃশ্যগুলি অবাস্তব ও হাস্যকর। নায়কের চুরি করে নায়িকার গান শোনার দৃশ্য শতকরা আশিটি বাংলা ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়; এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই।

অভিনয়াংশে পাহাড়ী সান্তাল দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্য ও জায়নিষ্ট গুরুচরণের চরিত্রে তিনি বেশ আবেগ সঞ্চার করেছেন। কিন্তু পরেশের ভূমিকায় নির্মলকুমার মোটেই দাগ কাটেন না। সাবিত্রীর অভিনয় জ্বাকামো বলে মনে হয় এবং এ জাতীয় হবার জন্য তাঁরও কিছু দায়িত্ব ছিলো না। বইটি সাধানোর দোষেই এরূপ মনে হয়। মঞ্জু দে কুটিল। স্ত্রী হিসাবে স্থানে স্থানে ভালো করেছেন। একটি বিপরীতধর্মী চরিত্রে মলিনা দেবী সহজ অভিনয় করেছেন। প্রেমাংগু বসুর বখাটে ছেলের রূপায়ণ বেশ ভালো। 'অজ্ঞাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাজ অমূল্যেখ্য।

কিছু খুচরো ক্রটি থাকলেও ছবিটির কিয়দংশ সাধারণ দর্শকদের তৃপ্ত করবে। তাছাড়া গল্পটির ভিতর দিয়ে আদর্শনিষ্ঠ একজন স্কুল মাষ্টারের জীবনের মাধ্যমে সত্যতা ও ন্যায়ের প্রতি যে আনুগত্য প্রতিফলিত হয়েছে, তা দর্শকদের অনুপ্রাণিত করে।

চিত্রগ্রহণ, ও শব্দগ্রহণ মাঝারি রকমের। শিল্পনির্দেশক কি কাজ করেছেন বোঝা গেল না। সংগীতাংশ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া একটি গান শ্রুতিমধুর হলেও, প্রয়োগের দোষে হাস্যকর ঠেকে।

॥ সংস্কৃতি-প্রদর্শন ॥

॥ যাত্রাঘরে রামায়ণ প্রদর্শনী ॥

জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে রামায়ণ কাহিনীর মূন্যমূর্তির যে-প্রদর্শনীটি দেখসাম ভাতে রামায়ণের সমগ্র কাহিনীটিকে মৃৎকানিনির্মিত পুতুল দ্বারা একশো আটটি খণ্ডদৃশ্যে হাজির করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার মাটির পুতুলকে বিভিন্ন রঙে চাঙা এবং বেশবাসে সজ্জিত করে রামায়ণ কাহিনীকে সাধারণের মধ্যে প্রসারকল্পে দৃশ্যনাট্যের মারকং উপস্থিত করার এই প্রয়াস যে প্রচুর শ্রমসাধ্য ব্যাপার সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কক্সবাজারের যোগজন মৃৎশিল্পী এই মাটির পুতুলগুলি তৈরী করেছেন। গ্রামীণ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও শিল্পীদের উৎসাহিত করার দিক থেকে উদ্যোক্তাদের এ উদ্যম প্রশংসনীয়।

রামায়ণের চরিত্রগুলির ভূমিকার পুতুলগুলিকে কোথাও বঙ্গমঞ্চের পটভূমিকার পরিবেশে, কোথাও চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের দ্বারা অনুসরণ করে যথাযোগ্য ভাব-ভঙ্গিমায় দাঁড় করিয়ে দৃশ্যনাট্য রচিত হয়েছে। পুতুলগুলির গড়ন এবং গঠনের কায়দায় এবং দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে সাজিয়ে তোলার নিপুণতার মধ্যে রামায়ণের অখণ্ড সুরটি অটুট রয়েছে। মূন্যমূর্তির দৃশ্যনাট্যের মাধ্যমে এই ধরনের প্রদর্শনী লোকশিল্পের সহায়ক। কিন্তু কারুশিল্পীর চোখধাঁধানোর ঝোঁকে দৃশ্যসজ্জার আড়ম্বর অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বল্প বাস্তবতাবোধের সমতা রক্ষা করতে পারেনি। ফলে, সমগ্র প্রদর্শনীটির মধ্যে মাত্র কয়েকটি দৃশ্যই চিত্তাকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। লক্ষ্মণ কর্তৃক সুপ্ননখার নাসিকা কটন, সাধুবেশে সীতার নিকট রাবণের উপস্থিতি, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, সেতু বন্ধন, কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, হনুমানের গন্ধমাদন বহন করা, রাম এবং বানরসেনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রজিত এবং রাক্ষসদের যুদ্ধ প্রভৃতি দৃশ্যগুলি মনোরম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

দর্শকের কাছে দৃশ্যবস্তুর যেখানে কাহিনীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের মাধ্যম, সেখানে সাজসজ্জা, রঙের কাজ এবং পশ্চাদপটের দৃশ্যগুলির প্রতি অনাড়ম্বর অথচ বাস্তব শিল্পকৃতির পরিচয় দিতে পারলে এ-ধরনের প্রদর্শনী স্নিগ্ধতায় মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে—এ সম্বন্ধে উদ্যোক্তাদের সচেতন থাকা উচিত।

একটা ক্রটি বড়ো বেশি চোখে পড়লো এ-প্রদর্শনীতে। নিরক্ষর দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার জন্যে কোনো গাইডের ব্যবস্থা করা হয়নি। যে প্রদর্শনীর আয়োজন লোকশিল্পের উদ্দেশ্যে, সেই প্রদর্শনীতে এই ধরনের ক্রটি লক্ষ্যকর; আশা করি একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

॥ হালডর কিলিয়ান ল্যাক্সেনস ॥

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আইসল্যান্ডবাসী বিখ্যাত লেখক হালডর কিলিয়ান ল্যাক্সেনস। আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত না হলেও ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি বহুপূর্বেই খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু খ্যাতি লাভ করা ও নোবেল পুরস্কার পাওয়া এককথা নয়। বিশেষ করে, বর্তমান দুনিয়ায় যখন ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের চরম দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলেছে, ঠিক সেইসময় মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী একজন লেখক সুইডিশ একাডেমীর সাম্প্রতিক সংকীর্ণ দৃষ্টিবাদের গভী উত্তীর্ণ হয়ে যে নোবেল পুরস্কার লাভে সমর্থ হলেন—এ-থেকে লেখকের অসামান্য প্রতিভার কথাই প্রমাণিত হয়।

বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে এবং ভাবরচনায় আপনাকে চালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুইয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।

আলোচ্য লেখকের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে স্বচ্ছদৃষ্টির স্বকীয়তা ও মননশীলতা নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বমানবের কাছে যে ইতিহাস সৃষ্টি করলো, এর পিছনে লেখকের সাধনা কি কি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর রচনার প্রচার আমাদের দেশে অত্যন্ত হওয়ার দরুন তাঁকে নিয়ে ভালভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই লেখকের এবং তাঁর রচনার একটা মোটামুটি পরিচয় দিয়েই আপাতত আমাদের ক্ষান্ত হতে হচ্ছে।

হালডর ল্যাক্সেনস একজন চাষীর ছেলে। তাঁর জন্ম হয় ১৯০২ সালে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চাইল্ড অব নেচার’। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনা : ‘দি গ্রেট উইভার ফ্রম কাস্মীর’, ‘সল্কা ভল্কা’, ‘ইণ্ডিপেন্ডেন্ট পিপল’, ‘ফায়ার ইন কোপেনহেগেন,’ ‘দি বেল্ অব আইসল্যান্ড,’ ‘দি বিউটিফুল হেভন,’ ‘ক্যাসল্’ ‘দি বুক অব দি পিপল’ প্রভৃতি। শুধু উপন্যাসিকই নন, তিনি হচ্ছেন কবি নাট্যকার এবং প্রাবন্ধিকও। তাঁর সংযত লেখনী দরদী ও জীবনধর্মী।

একাদিক্রমে প্রায় ১০।১২ বছর ধরে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু ভ্রমণে ভ্রমণ করেছেন, মিশেছেন অগণিত সাধারণ মানুষের সংগে। আর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন সর্বদাই। অগাধ নিষ্ঠা নিয়ে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে ব্যাপ্তি লাভ করার পর তিনি বঞ্চিত মানুষের যুক্তির সন্ধানে দিকে দিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশেষে আলো দেখতে পেয়েছেন সমাজতন্ত্রের মধ্যে। দীক্ষা নিয়েছেন কমিউনিজমে।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

॥ বিয়োগপঞ্জী ॥

। রামনাথ বিশ্বাস ।

বাঙালী জাতি ঘরকুনো বলে একটা অপবাদ প্রচলিত আছে। কথাটা যে সত্য নয়—তারই দীপ্ত চালেঞ্জ হিসাবেই বুঝি জন্ম হয়েছিল বাঙালার কীর্তিমান পুরুষ বিখ্যাত ভূপৰ্যটক রামনাথ বিশ্বাসের। তাই, ৬২ বছর বয়সে হলেও, সম্ভ্রতি তাঁর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ আত্মীয় বিয়োগ ব্যথার মতই শোকের ছায়া ফেলেছে বাঙালার অগণিত জনসাধারণের মনে।

শ্রীহট্ট জেলার এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে ১৮৯৩ সালে রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সংগে তাল বেখে জীবনটাকে চালাতে হলে যে আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন, তা তাঁর জীবনে কখনো আসেনি। কিন্তু এসেছে দুর্গম পথের ডাক, মরুপ্রান্তরের হাতছানি, সমুদ্রের আহ্বান। কানে এসে বেজেছে তাঁর গহন অরণ্যানীর মর্মর-ধ্বনি, বিশাল সমুদ্রের বুকে উর্মিমালার কলকল্লোল, দিকেদিকে অসংখ্য নরনারীর কলঙঙ্কন,—আরো কত কি; সব মিলিয়ে এক রঙীন কল্পনার আবেশমাখা স্বপ্ন। পৌরুষ এবং বীর্যবতায় উচ্ছল মানুষের কাছে যে-স্বপ্ন নেশা জাগায়।

সুদূরের তীব্র আহ্বানে কণ্টকাকীর্ণ হবার সম্ভাবনা পদে পদে। কিন্তু সব বাধ-বন্ধ-সংকটকে উপেক্ষা করাই তো বীরের চিরন্তন ধর্ম। তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। ঋজুদেহটা সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠার সংগে সংগে কাঁধে কোলা চাপিয়ে তাঁর অজানা পথের একমাত্র সাথী স্বিচক্রযানে চেপে বাঙালার দামাল ছেলে রামনাথ বেরিয়ে পড়েন পথে।

বহু বাধা-বিপত্তিকে জয় করে নদী-মাঠ-গিরি-প্রান্তর পার হয়ে তিনি সমগ্র-পৃথিবী পরিক্রমণ করেন। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বিশেষ বিশেষ জটিল স্থান ছাড়াও যখন যেখানেই তিনি গিয়েছেন মিশেছেন সাধারণ মানুষের মাঝে, পরিচিত হয়েছেন তাদের বৈচিত্র্যময় রীতি-নীতি এবং সমাজ-জীবনের ধারা-প্রকৃতির সংগে। তাঁর দরদী মন যেমন বিচলিত হয়ে উঠেছে নিপীড়িত মানবের অবিচার এবং অসাম্যের কাহিনী শুনে, তেমনি তিনি প্রকৃতির মাকেও পেয়েছেন দেশেদেশে নিত্য-নূতন স্বাদ। নিঃস্বপ্ন অবস্থায় পৃথিবীর কোটি কোটি পথের আনাচে-কানাচে কোথাও পদত্বজে কোথাও সাইকেলে-সাইকেলে ঘুরে এমনি করে তিনি তাঁর কাঁধের ঝুলিটি জীবন ও জগতের বিরাট অভিজ্ঞতায় বোঝাই করে দেশে ফিরেছেন।

দেশে ফিরে রামনাথ তাঁর ঝুলি থেকে অভিজ্ঞতার শিক্ষাপ্রদ-সকল বিতরণ করেছেন মুক্তহস্তে। তাঁর ‘তরুণ তুর্কী’, ‘মরণবিজয়ী চীন’, ‘আমেরিকার নিগ্রো’ প্রভৃতি বিখ্যাত

এই বাঙলাদেশের জনসাধারণের কাছে বাস্তব দুনিয়ার যে স্বাভাবিক অবস্থাকে পরিবেশন করেছে, তাতে তাঁর সত্যসঙ্গ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তিনি আরো বহু ভ্রমণ-কাহিনী পুস্তকাকারে প্রণয়ন করেছেন। এ ছাড়া সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতেও তিনি বহু ভ্রমণকথা প্রবন্ধাকারে লিখেছেন শেষ বয়স পর্যন্ত। স্কুলপাঠ্য হিসাবেও এখনো তাঁর অনেকগুলি বই ছাত্রমহলে পঠিত হয়। শুধু ভূপর্ষটক হিসাবেই নয়, লেখক হিসাবেও প্রভূত সমাদর লাভ করেছিলেন তিনি।

ছাত্র ও যুবসমাজকে তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং দেশ-ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি জানতেন, জগত ও জীবনকে না জানলে জীবনই বুখা। বলতেন, দেশের উন্নতি করতে হলে বিদেশের সক্ষম আনতেই হবে আহরণ করে। এ-থেকেই বোঝা যায়, এমন করে দেশের কথা তিনি ভাবতেন তিনি কতখানি ভালবাসতেন দেশকে।

তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বন্ধু-বাৎসল্য, কর্তব্যনিষ্ঠা—সর্বোপরি তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখখানি সকলের কাছেই ছিল এক দুনিবার আকর্ষণ।

জীবনের একটানা দারিদ্র্যের সাথে চলতে চলতেও কখনো তাঁকে মুগ্ধে পড়তে দেখেনি কেউ। আজীবন তিনি অক্লান্তদার ছিলেন। কিন্তু সাংসারিক কর্তব্য ছিল তাঁর প্রচুর। সংসারে একাধিক বিধবা ভ্রাতৃবধু এবং তাঁদের সম্মান-সম্মতির একমাত্র নির্ভরস্থল ছিলেন তিনিই। হাসিমুখে শেষজীবন পর্যন্ত তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করার জন্য অমাতুল্যিক পরিশ্রম করেছেন। তাঁর অন্তিমস্থিতিতে তাঁর পোষ্যবর্গ আজ সংকটের মুখে।

রামনাথের মত দেশপ্রেমিক ভ্রমণবীরের অকস্মাৎ মৃত্যু তাই আমাদের এতখানি ব্যথিত করে তুলেছে যে তাঁর পরিজনবর্গকে সাহায্য জানাবার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

রামনাথ বিশ্বাস আর নেই।

কিন্তু একথা কি বিশ্বাস করা যায়! তিনি-যে ছিলেন বাঙালীর অলসতা জড়তা ও ক্রীবৎসের মুক্তিদাতা। তাঁর স্মৃতিকে ছাপিয়ে তাঁর কীর্তির কথা-যে চিরদিন বড়ো হয়ে থাকবেই বাঙালীর মনে, স্বর্ণাকরে তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙালীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

রামনাথ ভারতসরকারের কাছ থেকে সাহায্য হিসাবে মাসিক ৭৫ টাকা করে পাচ্ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর পোষ্যপরিজনবর্গের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লক্ষ্য রাখা হলে আমরা খুশি হবো।

॥ দস্তাজেয় বিষ্ণু পালসকর ॥

কার্তিকের কুয়াশামান এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় বেতারযন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে যে-সংবাদ কানে এসেছিলো, তা বিশ্বাস করতে মন সহজে রাজি হয়নি। কয়েক মুহূর্ত বেদনার বিমূঢ় নির্বাক থাকার পর মনে পড়েছিলো ঠিক এক বছর আগে অক্টোবরের এমনি হিমে ঢাকা এক দিনে আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দের মৃত্যুসংবাদ শুনেছিলাম। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই অক্টোবরে আমার প্রিয় সুরশিল্পীর জীবনাবসানের সংবাদ শুনেলাম। এবং এই কারণে হেমন্তের বিষণ্ণতা আমার স্মৃতিতে আরো বিধুর, আরো যন্ত্রণাকরুণ হয়ে রইলো।

গায়ক সমাজে সুরেলা কণ্ঠস্বর হয়তো দুর্লভ নয় অথবা সঙ্গীতের জটিলতম কারুকর্ম অতি সহজে ব্যক্ত করতে পারেন এরূপ শিল্পীও হয়তো পাওয়া যায়—কিন্তু একই ব্যক্তির মধ্যে এই উভয়গুণের অবস্থিতি সত্যিই দুর্লভ। দত্তাত্রেয় পালুমকর ভারতবর্ষের সেইসব দুর্লভ সঙ্গীতসাধকদের একজন যার কণ্ঠে সুর ও কপাকৌশল ছাড়া আরেকটি পদার্থ ছিলো যাকে আখ্যা দেওয়া যায় বৈদগ্ধ্য। আশ্চর্য পরিমিতি ও মাত্রাবোধ ছিলো তাঁর গীতিক্রপায়নে। মহারাষ্ট্রের অসামান্য গায়কদেব মতো সঙ্গীতের সংঘত সংহত দিকটির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো।

দত্তাত্রেয় পালুমকরের পিতা বিষ্ণু দিগম্বর ছিলেন হিন্দুস্তানী উচ্চ সঙ্গীতের একজন দিকপাল পুরুষ। ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতকে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে যে দুজন নিরলস সাধক জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিষ্ণু দিগম্বর। অন্তর্ধ্বন হচ্চেন স্বনামধন্য পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। অতি শৈশবে মিত্রাজের ত্রীবাঙ্গকৃষ্ণ বুয়ার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন বিষ্ণু দিগম্বর। ত্রীবাঙ্গকৃষ্ণ বুয়া ছিলেন গোয়ালিওর ঘরানার একজন সার্থক প্রতিভা। দীর্ঘদিন গুরুর কাছে শিক্ষার পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি উচ্চ সঙ্গীতের প্রচার করে বেড়ান এবং বহুস্থানে সঙ্গীত বিদ্যাসয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলির মধ্যে বোম্বাই ও পুণার গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গান্ধীজির বিশেষ অনুগামী ছিলেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে কয়েকবার ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করেন। বিষ্ণু দিগম্বরের বাদ্যটি সস্তানের মধ্যে একমাত্র জীবিত সস্তান ছিলেন দত্তাত্রেয়। ১৯২১ সালের ২৮শে মে কোলাপুরের করুছাড়ে তাঁর জন্ম হয়।

দত্তাত্রেয়ের বাল্যজীবনের কাহিনী অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। বিশেষত তাঁর অনুরাগী শ্রোতাদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে শিশুকালে সামান্য অন্ন সংস্থানের জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। পিতা বিষ্ণু দিগম্বর পুত্রকে বিশেষ কিছু শিখিয়ে যেতে পারেননি। পুত্রের মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। দত্তাত্রেয় তাঁর পিতার ছাত্রদের সহায়তায় সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিতার শিষ্যদের মধ্যে পণ্ডিত বিনায়করাও পট্টবর্ধন, পণ্ডিত নারায়ণরাও ব্যাস প্রভৃতির। শিশু দত্তাত্রেয়কে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। পণ্ডিত পট্টবর্ধন তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। আর্থিক কারণে, তাঁর স্কুলে বেশী দূর লেখাপড়া করা সম্ভবপর হয়নি। নতুবা তিনি যে অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। সংসারের প্রয়োজনে তিনি কিশোর বয়সেই বাড়ী বাড়ী মাত্র তিন-চার টাকা বেতনে সঙ্গীত শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু অসাধারণতা ছিলো যার শিরায় শিরায়, এই সঙ্কেটে তিনি ভেঙে পড়বেন কেন। সমস্তার এই জটিলতায় তিনি একদিনের মধ্যেই দিগ্ভ্রাস্ত হয়ে পড়েননি। প্রতিদিন নিয়মিত স্বর সাধনা করে ভারতীয় সঙ্গীতের কঠিন কারুকর্ম অভ্যাস করেছেন, তাকে সহজভাবে রূপ দিতে শিখেছেন এবং সব সাধনার শেষে সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়েছেন। পনরো-

বোলো বছরের একজন কিশোরের পৃষ্ঠে এই গুরু দায়িত্ব সমাধা করা কি পরিমাণ শ্রমসাধ্য তা ভাবলেই বোঝা যায়। কিন্তু হতাশা তাঁর চরিত্রে ছিলো না। তাই তাঁর অতি স্বল্প দিনকার শিল্পী জীবনে জনপ্রিয়তার শিখর দেশে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

যতদূর জানা যায়, ১৯৩৫-৩৬ সালে জলন্ধরের এক সম্মেলনে তিনি সর্বপ্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বেতার মাধ্যমে তিনি গান শোনাতে শুরু করেন এর তিন-চার বছর পর থেকে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার করে জনচিহ্নে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। কলকাতার নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি সর্বপ্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন আজ থেকে আঠারো বছর আগে। ১৯৩৭ সনের নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি ভেরোবাহার রাগে গান গেয়েছিলেন। স্বীয় সঙ্গীতগুরু পণ্ডিত পট্টবধন ও নারায়ণ রাও ব্যাস তাঁকে কলকাতার রসিক মহলে পরিচিত করেন। শুধু মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য নয়, তাঁর অনুকরণীয় গীতিভঙ্গীমার জন্য প্রথম অধিবেশনেই তাঁর সঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ১৯৪০ সালে বোম্বাই-এর গান্ধী মহাবিদ্যালয় তাঁকে “সঙ্গীত প্রবীণ” উপাধি দান করেন। ১৯৪৬ সালে বেনারসের রসিক সমাজ তাঁকে “সঙ্গীত সুরেশ্বর” উপাধিতে ভূষিত করেন।

এ বছর তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম সমস্তা হয়ে চীন দেশে যান এবং ভারতীয় সঙ্গীতে অনতিজ্ঞ চীনা শ্রোতাদের তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ করেন। চীন দেশের সঙ্গীত সমালোচক ও সুরশিল্পীরা এক বাক্যে দস্তাভ্রের পালুসকরের সঙ্গীতের প্রশংসা করেন। এর আগে রাশিয়া পরিভ্রমণকারী ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের ইচ্ছায় তিনি ভ্রমণ বন্ধ রাখেন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বহুবিধ কাহিনী শোনা যায় যা সাধারণ শ্রোতাদের কাছে কিশকস্তীর মতো শোনাবে। সরল সহজ পৃষ্ঠচরিত্র এই সুরসাধকের সংস্পর্শে একবার ধারা এসেছেন তাঁরা সকলেই দস্তাভ্রের সহৃদয় ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে বে কুচিজ্ঞানের পরিচয় মিলতো তা বহু প্রথম শ্রেনীর গায়কের মতো দুর্লভ। গাইতে বসার ভঙ্গীমা থেকে শুরু করে যুজাদোষহীন সঙ্গীত পরিবেশন এবং অতি দ্রুত লয়ে শাস্ত্র সমাহিত ভাবে গান শেষ করা—সবই আশ্চর্যকর বোধ হতো। গাইবার সময় অচঞ্চল ভাবে কলাকৌশল প্রদর্শন করতেন তিনি। অহেতুক ওস্তাদী করে বাহা বা কুড়োবার চেষ্টা করেননি কখনো। সব মিলিয়ে তাঁর গানে সংহত ক্লাসিক সুষমা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতো।

ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত সুযোগ কখনো ঘটেনি। বেতারের মাধ্যমে অথবা মঞ্চের কাছাকাছি বসে তাঁর গান শ্রবণ শুনেছি, তখনই একটি মহৎ প্রাণের যুগ্মিত অনন্তসাধারণ শিল্প কর্মের আভাস পেয়েছি। চেতনার সুগভীরে তাঁর কণ্ঠ দাগ রেখে গেছে।

উচ্চ সঙ্গীতের খেয়লাভের গান ছাড়াও ভজন গান তাঁর অতি প্রিয় ছিলো।

ভুলসীদাস, মীরা, কবির এবং তাঁর পিতার রচিত ভজনগুলি তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। হিন্দী ভজন গানের ভক্তিরসাম্বিত যে আদর্শ বিষ্ণু দিগম্বর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর অন্যান্য শিষ্যের মতো পুত্র দস্তায়েয় তাকে শ্রোতৃমহলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দস্তায়েয় ঠুংরী গাননি কখনো। এই শ্রেণীর গানের প্রতি বিষ্ণু দিগম্বরের শিষ্য-প্রশিষ্যদের কোনোদিনই ঝোঁক ছিলোনা। খেয়ালি ও ভজন ছাড়া তারানা, চতুর্দশ, ত্রিবিট এবং মারাঠী ভজন ও মারাঠী রঙ্গমঞ্চের গান পালুসকর বহু সময়ে গেয়েছেন। মিক্রা-কি-মলুহার ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় রাগ। এ ছাড়া মালগুঞ্জী, দেওগান্ধার, নায়কী কানাড়া, গোড় সারং, নন্দ, চৌড়ী প্রভৃতি শ্রুত তাঁর কণ্ঠে শ্রোতার বহুবার শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। এই বৎসর জাতীয় সঙ্গীতাস্ত্রীতে তাঁর কণ্ঠে ‘ভূপালী’ ধারা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কি পরিমাণ সঙ্গীতিক মেধাসম্পন্ন হলে এ জাতীয় সঙ্গীত সৃষ্টি সম্ভবপর।

মৃত্যু মাত্রই বেদনাবহ ; কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের চোখে, তাঁর অগণ্য শ্রোতাদের কাছে নিদারুণ শোকাবহ কেননা, স্বীকৃতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠবার মুখেই তাঁর জীবনাবসান ঘটলো। ভারতীয় সঙ্গীতের যে রসমিষ্ট সবলস্বচ্ছরূপটি তাঁর প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে উঠেছিলো তা সম্পূর্ণ হবার বহুপূর্বেই তিনি এ পৃথিবী ত্যাগ করলেন। এ বেদনা অমূল্য হিসাবে আমাদের যেমন, তেমন আরো কয়েকজন নেপথ্যচারী মানুষের। তাঁদের মধ্যে একজন দস্তায়েয়র বৃদ্ধা মা। স্বামী ও বহু সন্তানের মৃত্যুশোক সহ করেছেন তিনি। বার্লুকোর এক নিদারুণ পুত্রশোকে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। দস্তায়েয়র বিধবা স্ত্রী ও তাঁর দুই সন্তান পুত্র বসন্তকুমার ও কন্যা রঞ্জনার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতের দুর্ভাগ্য জড়িয়ে রইলো। আরেকজন মানুষ পণ্ডিত পটবর্ধন, যিনি দস্তায়েয়কে অপত্যস্নেহে লালন করেছেন, পরিণত বয়সে এ-শোক তাঁর কাছে মর্মান্তিক। ভারতীয় উচ্চসঙ্গীতের আসরে দস্তায়েয় পালুসকরের স্থান বহুদিন অপূর্ণ থাকবে।

মানস রায় চৌধুরী

অগ্রণীর বই

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ
চলছে। ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর ক'রে বাংলা
ভাষায় আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাধাই।
তিনখানি ছ'রঙা ছবি। ৬/

অনুবাদ গ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড়
গল্প, ডায়েরীর বাছাই করা কয়েকটি অংশ, জবানবন্দী,
একটি সম্পূর্ণ নাটক ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন
“শিল্প ও সংগ্রাম। ৩৥০

রম্যাঁ রলার। I WILL NOT REST-এর
বাংলা 'শিল্পীর নবজন্ম' ৫/

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের
অন্যান্য বিখ্যাত কয়েকজন লেখকের গল্পসংগ্রহ “বিদেশী
গল্প”। ২৥০ লিও টলস্টয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাহিনী
'ক্রুৎজার সোনাটার' বাংলা অনুবাদ “রাহু”। ২/
আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না
সেগেরসের সাবোতিয়ারস্—২/

ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২৥০
রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২/
শান্তি দেবীর 'শান্তী' ১৥০ ; সুবোধমোহন ঘোষের
'উৎস' ২/

উপন্যাস : গুণময় মাস্তার 'সখীন্দর দিগার'। ৪৥০
মিহির আচার্যের 'দিনবদল'। ২/

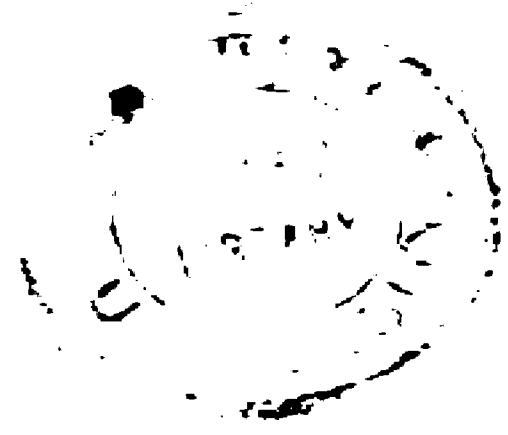
ভ্রমণকথা : ডাঃ গৌরমোহন দাস-এর “মহাযুদ্ধের
পরে মালয়” ২৥০

কবিতা : ময়্যাকভ্‌স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন
সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র। ২৥০ এঁরই স্বরচিত 'আকাশের
মুখ'। ১৥০ । চিত্ত ঘোষের “অস্তরা” ১৥০ ।
রামেন্দ্র দেশমুখের “জনসমুদ্র” ১৥০

বিবিধ : সরোজ আচার্যের “মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান” ২/

॥ অগ্রণী বুক স্টোর ॥

। ১৩, শিবনারায়ণ দাস সেন, কলিকাতা-৬ ॥



অন্নদা

॥ অষ্টম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ ॥

বন্দ্য

মদন দাস

ভাগ্য ভালো দেখা হয়ে গেল রহমানের সঙ্গে। যদি দেখা না হোত ? শিউরে ওঠে ও। ট্রেনে চেপে বসবার আগে তলিয়ে দেখেনি তবিস্তারের ভাবনা। শেষ সম্বল জমিটুকু বন্ধক দিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল কলকাতার পথে। কলকাতায় কত লোক কাজ করে—তার কপালে কি কিছুই জুটবে না ? কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেই স্বপ্ন গেল ভেঙে। এ-কলকাতা কৈশোরের স্বপ্নঘেরা কলকাতা নয়, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে নির্মম। ধরো যৌবনের যেন রক্তমুতি। এখানে-যে ককির হয়ে বাসা বাঁধতে হবে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

প্রথমে চিনতে পারেনি রহমান। যখন চিনতে পারল তখন ওর পিঠের ওপর এসে পড়লো বিরানীসিকার সোহাগী ধাপ্পড়। কুঁজো পিঠটা আরো কুঁজো হয়ে গেল, বুখিয়া মড়্ মড়্ করে উঠলো শুকনো হাড়গুলো। ছোটবেলার বন্ধু। পাঠশালার সেই জীর্ণ আর রোগা বন্ধু নয় এখন। দশমই বুক আর চওড়া পেশী, চামসেধরা মুখটাতে লাবণ্যের ত্রী। যদিও খোঁচা খোঁচা দাড়িতে চোয়ালটা ভর্তি।

মাঝে মাঝে যেত ও গাঁয়ে যতদিন ওর বুড়ী চাচী বেঁচে ছিল। বুড়ীকে কতবার ও নিয়ে আসতে চেয়েছিল কলকাতায়। বুড়ী আসেনি। মন চায়নি স্বপ্নের ভিটে ছেড়ে আসতে। চাচা কি সহজে ছেড়ে আসতে চায় তার মাটিকে। কিন্তু রহমানের বন্ধে বুখি ছিল না চাচীর ধার্মা। চিরকালটাই ও চাষআবাদকে এড়িয়ে চলতো। আক্সাজান এ-নিয়ে ওকে যখন তখন মারতো কিন্তু পাহাড়প্রমাণ গোঁকে টলাতে পারতো না একটুও। নদীতে নৌকো চুরি করে খেয়া দিতো, না-বলে পরের পুকুরে মাছ ধরতো, ধরা পড়লে মার খেত আর পরক্ষণেই হাওয়ায় উড়ে যেত যেন। দু'তিনদিন পরে আবার ফিরে আসতো গাঁয়ে। পাক্ক আর না-পাক্ক মারামারি ছাড়া পথ হাঁটতে জানতো না ও। এ-হেন দজ্জাল হোঁড়াও যখন বেশ কিছুদিনের অন্তে পালিয়ে গেল তখন ওর আক্সাজান মুখড়িরে পড়লো। হরতে-বা

একমাত্র পুত্রের শোকে ভেঙে গেল শরীরটা। সেই ভাঙনের আর জোড়া লাগেনি। কবরের লোনা মাটিতে কান পাতলে হয়তো এখনো শোনা যাবে তার অস্তিত্ব কান্না।

বুড়ী চাচী আঙিনার রোজ প্রদীপ দিতে আর খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকতো পথের দিকে। রহমানের প্রত্যাশায়। ক্রমশ ছানি পড়লো বুড়ীর চোখে। শরীর হয়ে এলো কীর্ণ, ক্ষিপণ।

রহমানের পালিয়ে যাওয়া আর ওর আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বলতে আর কেউ ছিল না বুড়ীর। পরের বাড়িতে খাটতে যেতে পারে না। ফলে আহা! কোনোদিন জোটে কোনোদিন জোটে না। ঠিক এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলো রহমান। বুড়ী চিনতে পারেনি তার খোলা চোখ নিয়ে। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কিছুটা অনুভব শক্তি দিয়ে যখন বুঝলো এ তারই রহমান তখন ছানীপড়া ছ'চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের দ্বারা।

নির্মম রহমান কিছুক্ষণের জন্তে হলোও অভিভূত হয়ে পড়ে। চাচীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে : চল চাচী কলকাতায়।

মন যেতে চায় ওর সঙ্গে। কিন্তু মায়ী ছাড়তেও পারে না বুড়ী। বিদেশে বিজু'য়ে কে দেবে তার কবর। রহমানকে বিশ্বাস কি? এখানে না-থেকে মরলেও তার পূর্বপুরুষের মাটির পাশে কেউ না কেউ কবর দেবে।

চাচী গেলনা।

ফিরে গেল রহমান।

টাকা আসে প্রতিমাসে রহমানের। বুড়ী চাচী কাদতে কাদতে চিঠি দেয় মাঝে মাঝে আসার জন্তে।

রহমান আসেও না খবরও নেয় না কোনো।

বড় সাধ ছিল চাচীর মরবার সময় যেন জল পায় রহমানের। সে সাধ পূরণ হয়নি বুড়ীর, তারো অনেক পরে রহমান এসেছিল গায়ে একবার। তখন ওর ভিটেতে বৃষ্টি ঘুঘু চরে বেড়াচ্ছে। আর সে আসাই তার শেষ আসা।

রহমান যে ষাটগাটায় নিয়ে এলো সে ষাটগায় কোনোদিন যে আসতে হবে ভাবতেও পারেনি নিশিকান্ত। সারি সারি ঘর। ঘরের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে অর্ধউলঙ্গ নারীর দল। নিসর্জ ওদের ভদ্রিমা। দুর্বল ওদের শরীর। সবল ওদের পোশাকের চাকচিক্য। ধারের চেয়ে তার বেশি। একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ও। হরত-বা ওদের সীমানার পা-টা চলে গেছিলো নিজের অজান্তে। কোঁচার খুঁটে টান পড়তেই চমকে উঠলো নিশিকান্ত। পেছন ফিরেই মরমে মরে গেল ও। ওদের মধ্যে একজন সাহস করে টান দিয়েছে ওর কাপড়ের খুঁটটা। লক্ষ্য করেনি মেয়েটা রহমানকে। লক্ষ্য করলে এমন কাজ করতো না সে। রহমান ধমকে দিলো না চীৎকার করে উঠলো বুঝতে পারলো

না নিশিকান্ত । তবে সেটা যে একটা বীভৎস অশ্লীল আওয়াজ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । ভয়ে মেয়েটা ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল । ওর খাপ্পড়কে ভয় করে না এমন মেয়ে নেই এখানে ।

এ কোন যায়গার নিরে এলো রহমান । সাঁকের স্বাধার ঘনিয়ে আসতে না আসতেই যায়গাটার আবহাওয়াই পালটিয়ে গেল । ইতিমধ্যে বিড়সার গেঞ্জিকলের আওয়াজ ধেমে গেছে । পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে বাইজীর গান, ভবসার লহরা, পুরনো দ্বারেডীর আর্তনাদ । রাস্তার ওপরে মাতালের ছল্লোড় । হিন্দুস্থানী কুঙ্গী আর তার সঙ্গে মুসলমান উজানিয়ার দল লোলুপদৃষ্টিতে (বেশ একটা ছোটখাটো ভিড়ের মত) তাকিয়ে আছে মেয়েগুলোর দিকে । মিনিটের পর মিনিট কখনো-বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা । ওদের সঙ্গে রসিকতা জুড়ে দিয়েছে মেয়েরদল । ওস্তাদ মাহ শিকারী যেন চার দিকে মাহ খেলিয়ে বেড়াচ্ছে পুকুরের মধ্যে । মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ অশ্লীল খিস্তি করছে । লোহার খাটুনি খেটে বুঝি পুরুষগুলোর দেহমন ইম্পাত হয়ে গেছে । কোনো খিস্তিতে কাবু হচ্ছেনা ওরা বরং হাসছে হিঃ হিঃ করে । হয়ত মনে মনে ঠিক করে রাখছে হপ্তার শেষে সমস্ত পয়সা তেলে দিয়ে যাবে কোন দিল-কে রানীর পাদপদ্মে ।

যেখানে সে উঠেছে আর যে ঘরে থাকে তাকে ঠিক ঘর বলা চলে না । বলা চলে বরং খাঁচা । চারিদিক চাপা । বারান্দাবেষ্টিতসমুদ্রে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত । ঘরে বসেই শুনতে পাওয়া যায় জাহাজের সিটি । সকের কান্না । বন্দর । কত দেশবিদেশের লোক আসে । জাহাজ থেকে নেমেই ওরা ছুটে আসে এখানে । ছুধের স্বাদ মেটাতে আসে বোলেতে । প্রিয়তমকে বুঝি ভুলতে চায় কৃত্রিম প্রেয়সীতে । নাম যায়গাটার মুল্লিগঞ্জ । ক্ষুদ্র রাস্তা । উত্তরে ওয়াটগঞ্জ । তার পাশে বরফকল । দক্ষিণে ট্রাম রাস্তা । বায়ে নেত্যা ঘোষ ষ্ট্রীট, ওয়াটগঞ্জ, তারও কিছু দূরে ডকের পয়লা নম্বর গেট । কিং জর্জ ডক । কলকাতার প্রাণকেন্দ্র । বিদ্যাপুরের মধ্যমণি ।

কথার কথার কখন বলে ফেলেছে ওর মনের কথা : বেশি নয় ছশো টাকা পেলেই ছাড়িয়ে নেবে জমি । আর সঙ্গে সঙ্গে বরও ।

: ওর জন্তে ভাবনা কি—

পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে দরাজ গলার বললো রহমান : সেরকম দাঁড় পেলে চাই কি আজকেও হতে পারে ।

: কেমন করে ?

বিস্ময়ে ডাগর হয়ে ওঠে নিশিকান্তের চোখ । ওর হাতে আছে কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ? না ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছে রহমান ।

: ভোজবাজি দেখেছিস কখনো ? থাক দেখতে পাবি । জমি ছাড়িয়ে তারপর কি করবি বল ।

: গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল । আগে জমি ছাড়াই তারপর—

: ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ছাড়িয়েই বিয়ে করবি। তারপর ছেলে...
লেড়কা...

হো হো করে হেসে ওঠে রহমান।

: ছেলের কথা বললে লীলা কি বলে জানিস?

কি যে লীলা বলে অনেকবার শুনেছে নিশিকান্ত। লীলা। লীলাবতী। বেণী।
নাচিয়ে গাইয়ে বলায় সব দিক দিয়ে চৌকস। এখানকার বাড়িওলা মণ্ডলের আপন
মাসভুতো বোন। বিধবা মাসভুতো বোন আশ্রয় নিতে এসেছিল মণ্ডলের কাছে। মণ্ডল
তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। চিরদিনের মত যে-আশ্রয় থেকে মাথা খুঁড়লেও কোনোদিন মুক্তি
মিলবে না আর।

মুন্সিগঞ্জের পেছন দিয়ে বয়ে গেছে আদি গঙ্গা। শীর্ণকায়া। ওপারে হেষ্টিংস। খাউড
পটি। আর তারই গা বেঁসে উচ্চমধ্যবিস্ত আর অফিসারদের বাড়ি। খাউডপটি যতটা
নোংরা ঠিক ততটাই পরিকার উঁচুমহলের সীমানাগুলো। পরিকার ঝক ঝকে ইম্পাতের
পাতের মত। পণ্যাদনা লীলাবতী যখন নিজের উলঙ্গ দেহের পণ্য থেকে নিস্তার পেল
তখন রাত আড়াইটে। শরীরটা অসহ্য ক্লান্তি আর শ্রান্তিতে বিধ্বস্ত। ঠিক এই সময়ে চান
করতে না পারলে সমস্ত শরীর কেমন যেন বিন বিন করতে থাকে। ওর ঘরের পাশ দিয়ে
চলে গেছে একফালি পায়ে চলা কাঁচা রাস্তা গঙ্গার কাঁচা ঘাটের দিকে। এবং তারই কাছ
বেঁসে উঁচু মাটির টিলার ওপর বসে টিউন বাজাচ্ছে রহমান। কখনো সিনেমার কখনো বা
আপন মনে কি সুর বাজায় কে জানে। সে সুরের বর্ম ভেদ করতে না পারলেও বুকটা টন-
টনিয়ে ওঠে ব্যথায়।

সণ্ড-স্নান করা ভিজে রঙিন শাড়ীটা ছেড়ে পরলো লালপাড় শাদা শাড়ীটা নতুন
বৌয়ের মত ঘোমটা টেনে দিলো মাথায়। রহমানের পিঠের ওপর এলিয়ে দিলো তার মাথাটা।
ক্লান্তি আর শ্রান্তিতে বুকে এলো চোখ দুটো। রহমানের শরীরটা ছলে উঠলো সামান্য।
তারপর আবার আপন মনে বাজাতে লাগলো টিউন। টাইপিষ্টের দ্রুত দায়ের মতই টিউনের
চাবিকাঠিগুলো ছলে উঠলো গমকে।

লীলাবতী বেণী। আর ও ভবঘুরে। বাউঙুলে। স্থায়ী ঘর নেই ওদের। প্রায়
নেই কেন তারা দিনের শেষে ক্লাস্টেদেহে এক জায়গায় এসে মেলে দেয় তাদের মনের ডানা।
লীলাবতী দেহ বেচে পেট চলায় অন্তে। প্রাণহীন কর্মীর মত রহমানও চুরি করে কিছুটা
পেটের দায়ে। এরই কঁাকে ওরা খুঁজে নেয় ওদের মনের মানুষ। সেই ধরনের মানুষ যারা
তাদেরই মত ঘরে ফিরতে পারে না কোনোদিন।

ঘুম ভেঙে গেল নিশিকান্তর। রহমানকে দেখতে পেল না ঘরে। এ-রকম অনেক
বার ঘুম ভেঙেছে ওর। মনে মনে ভাবে বাউঙুলে মাতাল কোথায় না কোথায় বেরিয়েছে।
কিন্তু একটা সুর ভেসে এলো রাত্রির অন্ধকারকে খানখান করে। টিউনের। সুরটা কেমন
যেন তাকে উতলা করে দিলো। আর সেই সুরে বুঝতে পারলো রহমান কোথায়।

জ্যোৎস্নার আলোয় ওদের ছজনকে পিঠে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে দেখে বুকটা কেমন যেন করে উঠলো নিশিকান্ত। সেও তো পেতে পারে পরশা দিয়ে ভাড়া করা নয় চিরকালের প্রেয়সী। উদ্ধত আর উদ্ধত নিঃশ্বাস চেপে ফিরে গেল নিশিকান্ত।

রহমান ঘুনাঙ্করেও জানতে পারলো না ওদের এই গোত্রহীন অভিসার আর একজনের হৃদয়সমুদ্রে ঝড়ের বেগ তুলেছে।

গণপতি সর্দার লোক খাটায়। অর্থাৎ লোক সাপ্লাই দেওয়া ওর কাজ। কখনো ডকে কখনো অন্তকাজে। মাসে পনের দিন কাজ জুটলে ধন্যবাদ দিতে হবে নিজের সৌভাগ্যকে। খেয়ে দেয়ে যা আর হয় তাতে জমার ঘর শূন্যই থেকে যায়। কোনদিন জমার ঘরে অঙ্কের রেখা ফুটে উঠবে ভাবতে পারে না নিশিকান্ত। গণপতি সর্দারের অধীনেই কাজ করে সে।

কোনো কোনোদিন রহমানও কাজে যায় ওদের সঙ্গে। যেদিন ও কাজে যায় সেদিন ওকে বিশেষ কাজ কোনো করতে দেখে না কেউ। কখনো খোস গল্প করছে কাজে কঁাকি দিয়ে কখনো-বা থেকে থেকে ডকের চারপাশটা ঘুরে আসে আপন মনে। গণপতি ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। আর রহমান যখনই ডকে আসে কাজ করতে ওদের সঙ্গে তখন কিছু একটা মতলব নিয়েই আসে ও।

হঠাৎ রহমানের চোখের মণি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডিউটির রাতপুলিসটিকে দেখে। বিড়িতে শেষবারের মত মোক্ষম এক স্মৃতিচান দিয়ে রহমান বললো : কি দোস্ত !

: চূপ।

: রাত্রিতে কত নম্বর ? খাটো গলায় রহমান বললো।

ওর জবাবে পুলিসটি ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বললো। শোমা গেল না। কিন্তু রহমানের মুখটা কোঁতুকে কিলমিল করে উঠলো বর্ষার গাঙের মত। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক থেকে একটা টাকা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিলো।

চকিতে দেখে নিলো এদিক ওদিক পুলিসটি। কেউ নেই তো। যখন বুকলো কারুর দেখবার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে তার মধ্যে রেখে দিলো টাকাটা ! চার আনার বেশি পকেটে রাখার নিয়ম নেই। বেশি থাকলেই আইনের চোখে অপরাধী হতে হবে ওকে।

: পুরো একটা টাকাই ওকে দিয়ে দিলি। তুই যে দিন দিন দাতাকর্ণ হয়ে উঠছিস্।

রাগত আর উচ্চ কণ্ঠে নিশিকান্ত বললো।

: অতো রাগিস কেন। গস্তীর আর ভারিকি চালে রহমান বললো : টাকার টাকা আসে দোস্ত। তোর না ছশো টাকার খুব দরকার।

রাগ এবার বোধ হয় বাধা মানবে না। ঠাট্টা করছে বুঝি ওর সঙ্গে রহমান ?

: ইয়া দরকার, দিতে পারবি ?

জানে পারবে না। মিথ্যে কথা বলা ছাড়া ওয়া আর কি জানে ? লম্পট, মাতাল, চোর।

ইচ্ছে করলে মদ খেতে পারতো নিশিকান্ত। কিন্তু খায়নি কোনোদিন। রহমানের অনুরোধেও না। তাকে জমি ছাড়াতেই হবে। ঘর বাঁধতেই হবে। এমনি ছন্নছাড়া জীবন ভালো লাগে না ওর। হালটানা হাতটা কেমন ওমরে ওঠে ব্যথায়। এখানে সেই হাতে বইতে হয় কখনও ইটের পাঁজর কখনো বা প্যাকিং বাক্স।

: হেই হট যাও।

জাহাঙ্গের মোটা কাছি নিয়ে কুলিরা দৌড়ছে। গোল-মাথাওয়ালা লোহার পশুজে পরিবে দিচ্ছে কাছির মালা। ওদিকে জাহাঙ্গটাকে টেনে নিয়ে চলেছে, লক গেট পার করে নিয়ে ছুটা লক। জাহাঙ্গের পপ্লার বন্ধ। জাহাঙ্গের ওপর থেকে খালসীদের চীৎকার আর নিচের কুলিদের হুকার সব মিলে একটা হটমালার বাজার বসে গেছে। মুখে চোঙ লাগিয়ে ডকের সিমেন্টের বাঁধাই পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে হুঁসিয়ারী হুকার ছাড়ছে কোরমান সাহেব।

: ইয়া দেব। প্রস্তুত থাকবি আজ। রাত বারোটোর সময় বেরুবি আমার সঙ্গে। আমি যা করবো তুই খালি দেখে যাবি। পারবি বেরুতে বারোটোর সময়। ওর পারি না তো ? ভেবে দেখ। এর মধ্যে বিপদ আছে।

ছশো টাকা ! অবিশ্বাসের কুঞ্জন রেখা দেখা দিল কপালে। একবার না-হয় সাহস করে বেরুবে ওর সঙ্গে। ছশো টাকা পেয়ে গেলে কে থাকে আর এখানে। সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে গাঁয়ে। আর এ-মুখে হতেই হবে না কোনোদিন।

: ইয়া রাজি।

: বেশ।

ওয়াটগঞ্জের কোনো এক হোটেলে ছুজনে পেট ভরে খেয়ে নিলো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল রহমান উত্তরে আর সে দক্ষিণে বিশেষ কাজে।

ধীরে ধীরে পা ফেলে যখন ও পথ চলে তখন যে কেউ ওর কাছে করুণ আবেদন নিয়ে হাত পাতলে বিমুখ করে না ও। কিন্তু কুঁচকিয়ে ওঠে শারা শরীর। স্থগায় বিকৃত হয়ে ওঠে মুখ। ইচ্ছে করে টিপে ধরে ওদের গলা। চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে থাক ওদের কণ্ঠস্বর। খেতে পায় না চুরি করে না কেন। ভিক্ষে করা, পা চাটা কুকুরের মত বেঁচে থাকার চেয়ে বুদ্ধির দীপ্তিতে চুরি করে খাওয়ার মধ্যেও পৌরুষ আছে। আর কেবা চোর এখানে ? দারোগা সাহেবকে দিতে হয় রোজ নজরানা। না হলে যখন তখন হামলা করবেন বেস্তাদের ওপর দারোগা সাহেব। সমাজসংস্কারে উন্মত্ত হয়ে উঠবেন তিনি। শুধু কি এখানেই শেষ ? এরপরেও আছে বেস্তাদের দেহ বেচার জন্তে ট্রেড লাইসেন্স। লাইসেন্সের টাকা না পেলে

পুলিসরূপী নট-রাজদের মহানৃত্যে সমস্ত এসাকা হয়ে উঠবে শশানভূমি। দেহ বেচলেও ট্যাক্স দিতে হয়। কোনো যায়গা থেকেই রেহাই নেই ওদের। এর চেয়ে আরো যদি নিকট নরক থাকে সেখান থেকেও নয়।

অনেক ঠেকে বুঝেছে সে। করুণ আবেদন নয়। বলিষ্ঠ বুদ্ধি দিয়ে জয় করতে হবে পেট। ভিক্ষে করে খাওয়ার চেয়ে সম্মানে জেলে খাওয়ার মধ্যে লজ্জা নেই কোনো। রহমান সাফ বোঝে।

১ রহমানের মত নিজেকে শক্ত করতে পারে না নিশিকান্ত। কোনোদিনও পারবে কিনা সন্দেহ। তার রক্তে নেই বুদ্ধি বেরোয়া উদ্ধত উদ্দাম বেগ। বরং রক্তের মধ্যে রয়েছে ভীতি। পেছুর টান। মনে পড়ে যায় এখনো তার পথ চেয়ে বসে আছে সরলা। তাকে কথা দিয়ে এসেছে যত তাড়াতাড়ি পারে টাকার বন্দোবস্ত হলেই ফিরে আসবে গাঁয়ে। তারপর ছাড়িয়ে নেবে জমি। ঘর বাঁধবে সে। সরলা আর নিশিকান্ত। অন্তত সেই কটা দিন তার জন্তে ঘেন অপেক্ষা করে ও। কথা দিয়েছে সরলা।

যত তাড়াতাড়ি সাগ দিয়েছিল ওর কথায় কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কেমন ঘেন শিথিল হয়ে আসছে হাত-পা। বুকের হাড়গুলো লাকাত্তে থাকে আশা ও আশংকায়। আশা ছশো টাকা পাবে সে। আশংকা যদি ঘরা পড়ে যায়। তাহলে চিরকালের মত শুদ্ধ হয়ে যাবে ওর স্বপ্ন। বাতাসে মিলিয়ে যাবে সরলার সরল মুখখানা। বারবার মনে পড়ছে আজ সরলাকে। চিন্তার রাজ্যে ঢেউ ওঠে। কাজ হাসিল হয়ে গেলে যদি টাকা না দেয় ও। রহমানদের মত লোককে বিশ্বাস কি? ওরা লম্পট, চোর। এরকম তো হামেশাই হয় এখানে। তাই নিয়ে হয় মারামারি। লাঠালাঠি। এমন কি খুনোখুনি পর্যন্ত।

রাত যত গভীর হয়ে আসে আশার চেয়ে অশংকাই প্রবল হয়ে ওঠে নিশিকান্তর।

: কিরে ভয় পেয়ে গেলি।

রহমান হাসতে হাসতে বললো।

রক্তশূন্য মুখে চেয়ে থাকে ওর দিকে নিশিকান্ত। রহমানের মুখে তো সেই একটুও ভয়ের চিহ্ন। বরং কোঁতুকে ঝিলমিল করছে বর্ষার গাঙের মত।

: দেখ ভেবে এখনো। যদি না যেতে চাস না যাবি কিন্তু গিয়ে যদি—

অর্থাৎ প্রয়োজন হলে, কাজে ব্যাঘাত ঘটলে রহমান ক্ষমা করে না কারকে।

নিজেকে কাড়া দিয়ে-কাড়া করবার চেষ্টা করলো নিশিকান্ত। দেখা যাক মা একবার ভাগ্যের পাশা খেলায়। অনেক চেষ্টা তো করেছে সৎপথে থেকে, আজ না হয় একটু বাঁকা পথেই পা বাড়াবে সে।

শক্ত করে নিজের বুক বাঁধবার চেষ্টা করলে কি হবে। ঠিক জায়গায় এসেই কাঁপতে লাগলো নিশিকান্তর বুক। গদার ঠাণ্ডা হাওয়াও রোধ করতে পারলো না ওর শ্বদবিন্দুর স্রোতকে। সারী দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গদার বুক গাধাবোটগুলো। কেরোসিনের কুপি জালিয়ে মাঝিরা খাওয়াদাওয়া করছে। কেউ-বা পড়ছে বায়ারণ। সেই শব্দ বাতাসে

তরঙ্গান্বিত হয়ে শ্রোতের বুকে আছড়ে পড়ছে। ওর স্বাধু আর তীতু অতিব্যক্তিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে রহমান। এরকম পরিস্থিতিই বিপদের সম্ভাবনা ডেকে আনে। বাড়ে একটা খুঁচু বদা। মেয়ে রহমান বললো : চল রে শালা এগিয়ে।

অন্ধকারে পালটিয়ে গেছে রহমান। এ আর সোহাগী ধাপ্পড় নয় দস্তুর মত শয়তানের হাট্টার পেটা। পিঠটা জালা করে। চোখেও বুদ্ধি নেমে আসে অন্ধকার। কি কুন্ধপেই না মাকড়সার জালে আটকা পড়ে গেছে সে।

বালিশের তলার রেখে দিলো টাকাগুলো রহমান। অনেকগুলো টাকা। এতোগুলো টাকা জীবনে একসঙ্গে দেখেনি নিশিকান্ত। চোখটা জালা করে উঠলো। কোনো শব্দ করলো না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। কি করে দেখা যাক।

বালিশের ওপর মাথা দিয়ে, হারিকেনের মলতেটা কমিয়ে চোখ বুজলো রহমান।

নিশিকান্তের বুকটা হঠাৎ যেন কেমন ছলে উঠলো। যদি টাকা না দেয় রহমান। তিনদিন ধরে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেনি রহমান ওর সঙ্গে। হয়তো ওকে কীকি দিতে চায়। কি বিশ্বাস ওদের? ঐ যে টাকাগুলো কাল সকালেই পার হয়ে যাবে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উড়িয়ে দেবে ও। আর সে? পাবে না এক পরসাত। অথচ টাকাগুলো পেলে তার জীবনের মোড়টাই ঘুরে যাবে। সরল...পথ চেয়ে বসে আছে। হয়তো বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। নিশিকান্ত কোনোদিনই আর ফিরবে না বুদ্ধি।

টাকা সম্বন্ধে কোনো কথা রহমান না-বললেও অন্তত আভাসে ইংগিতে তার প্রতিশ্রুতির কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—নিশিকান্ত ভাবে। আসলে ওরা চোর। সকালেই বলবেখন তেমন দর পাওয়া যায়নি, এই নে দশ টাকা।

না, এমন সুযোগ জীবনে একবার আসে। যেমে উঠে নিশিকান্ত। ঝি ঝি পোকাকর মত ঝিম ঝিম করে। উঠে পড়ে ও।

ঘুম ভেঙে গেল রহমানের। সজাগ প্রহরীর সচেতন ঘুমের মত। হারিকেনের বাতিটা উসকিয়ে দিতেই অবাক হয়ে গেল। নিশিকান্ত! চোখটা একবার রূপড়িয়ে নিলো ভালো করে। পরিস্থিতিটা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাপিয়ে পড়লো বাঘের মত নিশিকান্তের ওপর। টুঁটি বুদ্ধি ছিঁড়ে ফেলবে ওর।

: শালা বেইমান। চোর—

রোজকার মত ওদের ঘরের পাশ দিয়ে গদার ঘাটে বাচ্ছিল লীলাবতী। ঘর থেকে ভেসে আসছে একটা বীভৎস গোঙানী।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই লীলাবতী থমকে দাঁড়ালো। নিশিকান্তের বুকের উপর চেপে বসেছে রহমান। একুনি বুদ্ধি জীব ঠেলে বেরিয়ে আসবে নিশিকান্তের। মেয়ে ফেলবে না কি ওকে? লীলাবতী ঝাপিয়ে পড়লো রহমানের উপর। পারবে কেন ওর সঙ্গে। অগত্যা না পেরে লীলাবতী সোক্ষম কামড় দিলো ওর পিঠে।

: উঃ । বল উঠে দাঁড়ালো রহমান
কি হয়েছে তোদের । লীলাবতী বললো ।

: শালাকে সব টাকাই দেবো ভেবেছিলুম । ভেবেছিলুম সংসার পাতুক সুখে থাকুক ।
শালায় তবু সইলো না । আমাকে বিশ্বাস হলো না । আরে কুস্তার জাত, কারুর
পা চাটলেও দুশো টাকা কি একসঙ্গে দুশো পরস্যাও জোটাতে পারবি না ।

লীলাবতী ওকে আর বেশি বকতে দিতে রাজী নয় । এ-রকম সময় ও যাহুয খুন
করতেও পেছপা হয় না ।

: যা শালা ছেড়ে দিলুম । ছুচো মেরে আর হাত গন্ধ করবো না । এখুনি বেরিয়ে
যা এখান থেকে । তোরা মুখ যেন এ-তল্লাটে আর না দেখি ।

টলতে টলতে বেরিয়ে গেল রহমান । লীলাবতী ঘরের কোণ থেকে ভুলে নিলো
টিউন । ওর পেছন পেছন সেও চলে গেল ।

কিছুক্ষণ পরেই ভেসে এলো সেই সুর । বিবাদ । রণক্লাস্ত যোদ্ধার বিধ্বস্ত মর্মবেদনার
গত । পিঠের ওপর আজও বুঝি লীলাবতী এলিয়ে দিয়েছে তার সর্বশরীর ।

চোখ মুখ কুলে উঠেছে নিশিকান্তর । সমস্ত শরীর অসহ্য বেদনার টন টন করছে ।
হাত-পা ভেঙে গেছে বুঝিবা । নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে ঘরের চারিদিকে । মুখ দিয়ে
রক্ত গড়িয়ে পড়ে ঠোঁটে, আর রক্তের স্বাদ কি যে সোনতা আজ প্রথম অনুভব করলো
নিশিকান্ত ।

মেয়েটা

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

মেয়েটাকে দেখেই পিস্তি জলে গেছলো।

ছাইবুড়া একটা সস্তা ছিটের প্যান্ট পরনে। তাও তালিমারা। খালি পা, খালি গা। আলকাতরার মত কালো সেই গায়ের বড়। চেহারাটি নোড়রা বস্তির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কানটি ধর ছেলেকে ধমক দিলাম : সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই যার-তার সংগে মিশতে আবস্ত করেছিস্ ?

মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে রইলো আমার পুতুর। আর সেই সংগে দেখলাম, আমার কথা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। কেমন শংকিত চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

‘কিবে, অমন করে তাকাছিস্ কেন ?’ বললাম, ‘যা-যা, বাড়ি যা একুনি। আর কখনো আসবি না। বুঝলি ?’

তবুও মেয়েটা তাকিয়েই রইলো। ডাব ডাবা চোখদুটো বার করে এমনভাবে তাকালো, পৃথিবীর একটা দারুণ বিষয় যেন আমি।

‘মা এলেই আমি চলে যাবো মামা,’ মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, ‘মাকে বলবো, মামা যখন পছন্দ করেন না—তুমি আর আমাকে রেখে যেও না এখানে।’

মামা ! বলে কি মেয়েটা ? বনবিস্ময়ে চোখ কঁচকালাম, এইটুকু মেয়ের মুখে অমন পাকা কথাই বা কেন ? কোথেকে এল মেয়েটা ?

‘ওগো শুনছো—’

আমার ডাক শুনে মঞ্জু এল। খোকাকে কোলে করে। ছ’মাসের কোলের খোকাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল সে।

‘দেখ তোমার বড়ো ছেলের কাণ্ড। খেলার সাথীটি কেমন জুটিয়েছে দেখ।’

‘ও মা, ও ছোটোতে যাবে কেন ?’ মঞ্জু হেসে ফেললো, ‘ও তো সরমার মেয়ে। তোমাকে বলতে খেরালই ছিল না একদম।’

‘সেই যে গো, যে মেয়েটি রাতে হাসপাতালে থাকতো আমার কাছে। আমার এই খোকনমনির সময় ?’ বলেই কোলের ছেলের ওপর মঞ্জুর সোহাগভরা চুদন পড়লো।

‘তা এখানে কেন ?’

‘সরমা কাল দেখতে এসেছিল আমার। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। মেয়েটাকে তখন বাড়ি পৌঁছে ডিউটিতে যেতে দেবী হোত, রুগী মুখ করতো সময়মতো না গেলে।’

ওরা তো নার্স নয়। তাই আমিই বললাম—খাকনা রাতটা এখানেই, সকালে ফেরার পথে নিয়ে যেও। সন্ধ্যায় খেয়েদেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে দেখতে পাওনি। আমিও বসতে ভুলে গেছি।’

‘তাই বলো! আমি ভেবেছিলাম খোকাই বুঝ,—আচ্ছা যাও তুমি।’

খোকনমণিকে চুমু খেতে খেতে আবার চলে গেল মধু। মা হওয়ার আনন্দেই বিভোর সে। মধুর ছেলে সোহাগ-করা দেখতে কী মিষ্টিই যে লাগে! অভিজুতের মত চেয়ে দেখলাম ওর চলে যাওয়া।

তারপর লক্ষ্য করলাম, আমার নরম হয়ে যাওয়া দেখে মেয়েটার মুখে খুশির আভা ফুটে উঠলো। আয় খোকন ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটাকে ‘তোরা নাম কিরে?’

‘হুন্না!’ সাদা ফকফকে ছোট ছোট দু’পাটি দাঁত চকচক করে উঠলো মেয়েটার।

হাসি পেল। ভীষণ হাসি পেল নাম শুনে। এ যেন কানাছেলের নাম পল্পলোচন! কিন্তু মনের হাসি মনে চেপেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘বাড়ি কোথায় তোদের?’

‘ঢাকা।’

আর কি জিজ্ঞেস করবো! ভাবলাম, একটু আগেই তো তাড়িরে দিছিলাম মেয়েটাকে। ওর মার কাছে গিয়ে নিশ্চয় বলবে সেকথা। যাতে সে-কথা ভুলে যায় মিষ্টি কথা বলে একটু রসিকতাই করা যাক ওর সংগে। তাই বললাম, ‘তোরা তাহলে বাঙাল?’

‘কে বলেছে তোমায়?’ বাঙাল বলার মোটেই সম্ভব হয়নি বুঝলাম।

‘তুই-ই তো বললি?’

‘ঢাকায় বাড়ি হলেই বুঝি বাঙাল হতে যাবে!’

‘হবেই তো।’

‘ইস্! আমি তো এখানে হয়েছি।’

‘কোথায়?’

‘নারকেলডাঙ্গা সাহেব বাগান।’

‘সাহেববাগানে থাকিস? তোরা বাবা কি করে?’

‘করবে আবার কি? খালি চা’র দোকানে আড্ডা—’

‘কাজ করে না?’

‘করতো কাঁচের কারখানায়। এখন ফেরী করে, আর আড্ডা।’ হঠাৎ মেয়েটার গলার সুর পালটে যায়, ‘আচ্ছা মামা, তুমি আমার কোলে নেবে?’

মেয়েটার আকস্মিক খেলালে চমকে উঠে ক্র জোড়া কুঁচকে গেল আমার। এ কি উদ্ভট কথা? কি চেহারা কি কথার ধ্বনধারণ যে-মেয়েকে একেবারে বস্তির মেয়ে ছাড়া ভাবা যায় না, তাকে কোলে নিতে হবে! গম্ভীর গলায় বললাম : আমি তোরা মামা, কে বলেছে রে?’

‘বলবে আবার কে ?’ মিটিমিটি হেসে জবাব দিল মেয়েটি, ‘মা যে তোমাকে দাদাবাবু বলে ! মার যদি ভাই হও, আমার তবে মামা না ?’ বলেই হাসতে থাকলো মেয়েটা । নির্মল হাসিতে ভরে উঠলো তার মুখখানা । ওই হাসিটুকুর মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই কোথাও । কচি প্রাণের ঐ হাসিতে নির্মমভাবে নাড়া খেল আমার মন । কেমন করে বছর সাত-আঠেকের এই শিশুটিকে বোঝাই যে আমি তার সত্যিকার মামা নই । তাই না বলে পারলাম না, ‘হ্যাঁরে, আমি তোর মামাই ।’

‘তালে আমার কোলে নাও !’ বলেই মেয়েটা একেবারে আমার সামনে এসে পড়লো ।

এবার বেশ বিব্রত বোধ করলাম । লাই দিয়ে তো ভালো করিনি দেখছি । ঝোড়ো কাকের মতো কটকটে চেহারায় বাড় পর্যন্ত একমাথা রুক্ষ চুল—ওর মধ্যে কত উকুন যে বাসা বেঁধেছে কে জানে ! গায়েও ষত রাজ্যের ধুলো জমে আছে---একটা চিমটি কাটলেই এক খাবলা উঠে আসবে একুনি । বিরক্তিতে মনে মনে মুখ ত্যাংচাললাম : ‘এই অপরূপ চেহারায় তোমায় কোলে নেবো না কিন্তু—’

মুন্সিলে পড়ে গেলাম পরক্ষণেই । চেহারার জন্তে ওর কি দোষ ! অবোধ সরল শিশু । তাই তো একটুক্ষণের মধ্যে একেবারে আপনজন ভেবে নিয়েছে । আর স্বীকারও করেছে । আমি ওর মামা । আমার খোকনকে কোলে দেখে ওরও বোধহয় ওঠার সাধ হয়েছে । শিশুদের স্বভাবই তো এই । এখন ইচ্ছা পূরণ না হলে দুঃখ্য পাবে হয়তো মনে । কিন্তু, ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে ওঠে, কি করি এখন ? এই সংকটের হাত থেকে ত্রাণ করলো আমার খোকন ।

‘না বাপি, ওকে কোলে নিতে পাবে না ।’ - শিশুসুলভ দীর্ঘায় বাধা দিল সে ।

তখন মেয়েটাকে সিক্কিসিয়ে বললাম, ‘পরে নেবো । বুঝলি ?’ ইসারায় খোকাকে দেখালাম ।

একথায় দেখলাম, খুশিই হোল সে । বললে, আচ্ছা ।

খোকাকে নিয়ে উঠে পড়লাম । ভাবলাম, ভালই করেছি ধমক-ধামক না দিয়ে । ওর মা এসে তো নিয়েই যাবে এখনি । ঝগাট মিটে যাবে ।

‘মা-আ-আ, মা-আ—’

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেই অবাক হয়ে যাই । গলার্কাপিয়ে আনন্দের সংগে হাসিভরা মুখে ডাকছে আমার ।

‘কিরে, তুই বাস্‌নি ?’

‘মা যে আসেনি ।’

মেয়েটার অবস্থিতি প্রসন্নমনে নিতে পারলাম না । সকালের ব্যাপারটা মনের মধ্যে অস্থিতি জাগাচ্ছে তখনো । আবার যদি কোলে-টোলে উঠতে চায় ?

সবমার কথায় মগ্ন বললে, হয়তো কোনো কাজের জন্তে আসতে পারেনি । কাল এসে নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই ।

তার পরদিনও এস না।

‘আচ্ছা, তোমার সরমার আঙ্কেলটা কি ! তিনদিন হতে চললো মেয়েটাকে রেখে গিয়ে একবার খোঁজটি পর্যন্ত নয় !’

‘আমি ভাবছি, অসুখ-বিসুখ করলো না তো সরমার ?’

আরো তিনদিন কাটলো। তারপর এস। মঞ্জু যা ভেবেছিল তাই। অসুখের জন্তেই আসতে পারেনি সরমা।

কিন্তু মেয়েকে নিয়ে গেল না কেন ? একবার জবাবে-মঞ্জুর কাছে শুনলাম, মেয়ে নাকি একেবারে বঁকে বসেছিল। পা ছড়িয়ে কান্নাই জুড়ে দিল : না আমি যাবো না, মামার বাড়ি থাকবো। অগত্যা মঞ্জু বলতে বাধ্য হোল : আচ্ছা সরমা, থাক আঙ্কেলের দিনটাও। কাল এসে নিয়ে যেও তুমি।

সকালে মেয়েটা বলেছিলো : মামা, পরশা দাও।

‘কি করবি পরশা দিয়ে ?’

‘লজেন কিনবো।’

‘না লজেন কিনতে হবে না।’

‘খোকনকে দিতে পারো, আমার দেবে না কেন ?’

ঐ একরত্তি মেয়ের কথায় ব্রহ্মতালু রী রী করে উঠেছিল আমার। খোকনের সংগে তুলনা !

একটা পরশা ছুঁড়ে দিয়ে রাগ সামলে নিয়েছিলাম কোনোরকমে। কিন্তু সেখানেই কি চুপ করেছিল ও !

সেই পরশা নিয়ে লাফাতে লাফাতে পাড়ায় বল বেড়ালো : এই দেখ, মামা আমার পরশা দিয়েছে, চেনা-অচেনা সকলকেই। মঞ্জু বললে, সে-কথা নাকি সরমাকেও বলেছে আমার সংগে সংগেই।

দিয়েছি তো একটা ফুটো পরশা। পাড়ার বাচ্চাদের না হয় দেখিয়েছি, কিন্তু তোর মাকে বলতে যাওয়া কেন আবার। কম লজ্জার কথা—আদর করে মাত্র একটা ফুটো পরশা দেওয়া ?

বিত্তী লাগছে নোঙরামেয়েটার অবস্থিতি। তার চেয়ে আরো বিত্তী লাগছে ওর ধরনধারণ।

মঞ্জু কোলেরটাকে নিয়ে পাশের ঘরে শোয়। আমি বড়টিকে নিয়ে এ-ঘরে। রাতে শুতে যাবার সময় বলে কিনা : মামা আমি তোমার কাছে শোবো। শুনে তো চোখ কপালে ওঠে আমার। আদর তো মন্দ নয় !

‘না, ও ঘরে গিয়ে শোও।’ গম্ভীর গলায় বলি।

‘কেন, খোকন শুতে পারে আর আমি বুঝি শুতে পারি না তোমার কাছে ?’

এ-কথার জবাব দিতে হলে ঠাসু করে একটা চড় মারতে হয় গালে। তাও তো পারি না। কি মুন্সিলে যে পড়েছি।

জীবনটা যেন অতিষ্ঠ করে তুললো।

ভাবলুম, কালকের দিনটা এলে বাঁচি। এতদিন যখন সয়েছি, আর এই রাতটা বইতো নয়।

পরদিন সকাল হতেই আরম্ভ করলো।

‘মামা—’

‘কি!’

‘তোমরা খুব বড়লোক, না?’

‘কে বলেছে তোকে?’

‘আমি বুঝি আর জানি না! এইরকম গদিয়েলা বিছানা আছে আমাদের? এইরকম খাট?’

চুপ মেয়ে শুনেই যাবো ভাবছিলাম এবার। কাঁহাতক বকবক করা যায়। কিন্তু চুপ করে থাকবার কি জো আছে!

‘বলো, বলো?’

‘আছে বৈকি! তোদেরও আছে।’

‘ঈসু! আছে তো ছেঁড়া বিছানা আর কালো কালো বালিশ। তোমাদের মত এত জামাকাপড় আছে?’ বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল মেয়েটার : ‘মামা, আমার একটা জামা কিনে দেবে?’

‘কি বললি?’ যেন শুনতে পাইনি আমি।

‘একটাও জামা নেই আমার।’ মেয়েটার কণ্ঠে করুণ আমেজ মেশানো : ‘সত্যি বলছি, একটা মাত্র ছেঁড়া ফ্রক। দেখাবো?’

এই সেরেছে। মনে মনে ভাবি, কি ক্যাসাদ!

‘না-না। আর দেখাতে হবে না।’ গলটিকে বেশ ভারিঙ্গী করেই বলি।

‘তাহলে দেবে বলো?’

‘এখন যা, দেখা যাবে।’

কি মজা! সংগে সংগে হাততালি দিয়ে উঠে লাফাতে লাফাতে চলে গেল মঞ্জুর কাছে : ‘কি মজাগো কি মজা! মামা আমাকে ফ্রক কিনে দেবে বলেছে, জানো? হাসি আর তার মুখে ধরে না। হাসতে হাসতে এখানে সেখানে ফরফর করে ঘুরে বেড়ায় লাঠুটির মত। যাকে সামনে পায় তাকেই বলে একথা হাসতে হাসতে।

এমনিথারা যে কত দৌরাস্রা শুরু করলে, বলে শেষ করা যায় না।

খোকন ইস্থলে যাবার সময় বলে কি : ‘মামা, আমাকে বই কিনে দেবে?’

‘সে কিরে?’

‘হ্যাঁ, আমি ইস্থলে যাকো খোকনের মতন।’

‘তোমার বাবা কিনে দেবে, তাকে বলিস।’ বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললাম।

‘না তুমি দেবে।’

‘আমি দিতে যাবো কেন!’

‘বাবা যে দেবে না।’

‘কি করে জানলি?’

‘বাবার তো পয়সা নেই। মাই-তো বাবাকে পয়সা দেয় বিড়ি কেনার।’

‘আচ্ছা দেবো-যা।’ শোকবাক্যে থামবার চেষ্টা করি।

দিতেও হয় এটা-ওটা-সেটা। কিন্তু সেদিন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। আমার ঐ বই কিনে দেবার শোকবাক্যকে সত্যি মনে করে হাসিখুশিতে ফেটে পড়লো আটখানা হয়ে। ছেলেমানুষ তো! হাসুক যত পারে, হাসতে হাসতে পেট ফাটাক। তাতেও আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে খুশির আবেগে আমার খোকনকে জড়িয়ে ধরবে নাকি? শুধু কি তাই! একমাথা উকুনভর্তি কুক্কু চুপ নিয়ে সেই নোঙরা মুখখানা খোকনের মুখে ঘষে দিয়ে বলে: জানিস খোকন, আমিও তোর মত ইন্তুলে যাবো। কি মজা রে কি মজা! বলেই দেই দেই নাচতে শুরু করলো।

আমার তো মেজাজ তিরিকি হয়ে উঠলো ঐ দেখে। ইচ্ছে হোল, এক খাপড়ে ওর আদর বার করে দি। কিন্তু খুব সামলে নিয়ে মজুর ওপর দিয়েই গানের ঝালটা মেটানাম: ‘যেমন করে পারো, এখুনি সরমাকে খবর দিয়ে আনিয়ে বিদেয় করো ও-মেয়েকে। এসব আমি বরদাস্ত করতে পারবো না।’

সরমাকে অবশ্য খবর দিতে হোল না। কথামত সেদিনই এস। এসে নিয়ে গেল মেয়েকে। যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

উঃ, কি ধকলটাই যে গেছে! কি বিক্রী চকস স্বভাব মেয়েটার! কথা বলবে আর হাসবে, হাসিতে ফেটে পড়বে একেবারে। হাসি তো নয়, একটুখানি আদর পেলে, যেন হাসির ঝড় বইয়ে দেয়। হাসির তাগুবও বলা যেতে পারে। ষাকু, আপদটা বিদেয় তো হয়েছে।

দিন যায়। আর মেয়েটার কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। ধীরে ধীরে তার স্মৃতিও স্তিমিত হয়ে আসে।

‘মামা—’

আচমকা ডাক শুনে কেঁপে উঠি।

মেয়েটা আবার এসে হাজির হয়েছে! মেয়ের সংগে মেয়ের মাও ঢুকলো পেছন পেছন। কিন্তু সরমার হাতে পুটলী কিসের!

শুধু মেয়েই নয়, মা-মেয়ে দুই-ই এসে জেঁকে বসতে চায় নাকি? গালে হাত দিয়ে কত কি ভাবতে শুরু করি।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসে কাণে। উৎকর্ণ হয়ে উঠি সংগে সংগে। উৎকর্ণায় বুক ছরছর করে। মজুর সংগে সরমার কান্নাভরা কণ্ঠের কথাবার্তা ভেসে আসে এ ঘরে।

‘.....শোনপাপড়ীর ব্যবসায় ফেল মারলো। তারপর মোয়ার ব্যবসা শুরু করলে। তা থেকে একটাকা পাঁচশিকে এনে দিচ্ছিলোও রোজ। হঠাৎ কিনা নেশা করা ধরলে। ভালকথায় বোঝাতে গেলাম উন্টে আমাকেই মারধোর ! তাই আর সহ্য করতে পারলাম না দিদিমণি। আমিও খুব শুনিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মুরোদ তো জানি.....’

ষেটুকু কানে এল, ওতেই বুঝলাম সরমা স্বামীর সংগে ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছে। কিন্তু মনে হোল, এইভাবে স্বামীর সংগে রাগারাগি করে একেবারে চলে আসাটা কি ঠিক হয়েছে ?

‘মায়া—’ চোখমুখে একরাশ হাসি নিয়ে সেই নোঙরা মেয়েটা এসে দাঁড়াল : ‘বলো তো আমার হাতে কি ?’

ওকে দেখে মেজাজ আমার সপ্তমে চড়ে গেল। বদ্বরসের একটা সময়-অসময় আছে তো ? ভাবলাম, এক খাপ্পড়ে ভেঙ্গে দিই ওর দাঁতকটা।

কিন্তু সেই একই দুর্বলতার হাত উঠলো না। কথাও বললাম না।

‘কি,—বলতে পারবে না তো ?’ আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সেই বললো। ওর কথার জবাব দেবো কি, রাগে তখন আমার সর্বশরীর জ্বলছে।

এবার আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে সে। এসে বললো আন্তে আন্তে : ‘তোমার জন্তে একটা খাবার জিনিস এনেছি।’ বলেই কাগজে মোড়া কী একটা যেন দিল আমার হাতে।

‘কি আছে এতে ?’ মুখ ঝিঁচিয়ে উঠলাম রাগের জ্বালায়।

‘বলবে না মাকে ?’ আশ্চর্য, আমার মুখ খেঁজানিতে একটুও দমলো না মেয়েটা। ভাবলাম, এত কায়দাও জানে !

‘বলো, বলবে না তো ?’

‘না’ অনিচ্ছাসঙ্গেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘বাবা না,—কিসকিসিয়ে বললো মেয়েটা, ‘মার সংগে ঝগড়া করে মোয়ার হাড়িটা ভেঙ্গে কেলেছে আছড়ে। বেশ মজা হোল, কোনোদিন তো খেতে দেয়নি একটাও। অনেক খেয়েছি আজ কুড়িয়ে কুড়িয়ে। ঐটাই খালি আন্ত ছিল, তাই তোমার জন্তে নিয়ে এসেছি।’

হাতের মোড়ক খুলতেই দেখি সত্যি সত্যিই আন্ত মোয়া একটা।

হাসি

অবাদি মণ্ডল

পরকে আপন করার জরুরী সমস্যা। ব্যবসায়ীকুলের ষতখানি তেমনটি আর কিছু নয়। ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য হচ্ছে খরিদারকে জিনিস বিক্রী করা। আর, খরিদার অল্প সমব্যবসায়ীদের ছেড়ে বিশেষের কাছে ধরা দেবেন তখনই, যখন তিনি বিক্রেতাকে বিশ্বাস করবেন; যখন ক্রেতার আস্থাভাজন আত্মীয় হবেন বিক্রেতা।

সন্দেহ হচ্ছে, কথাটা ভুল বলেছি। এ সমস্যা কি শুধু ব্যবসায়ীর—চিকিৎসকের নয়? নয় এটা কেরানীর, শিক্ষকের, প্রতিষ্ঠান-পরিচালকের? এ সমস্যার সম্মুখীন হন না কি একজন স্বামী বা স্ত্রী, একজন পিতা বা পুত্র? এ সমস্যা কি আপনার নয়? আমার নয়?

পরকে আপন করার সমস্যা সকলের।

সভ্যতা ও সামাজিকতার পরিধি যত বাড়ছে এই সমস্যাও বাড়ছে সমহারে। বেশি বেশি লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ করতে হচ্ছে, মন মেলাতে হচ্ছে বহুতর মনের সঙ্গে। একক আত্মসন্তুষ্ট জীবন গুহাগুপ্ত মুনিষ্কমি ছাড়া আর কারুর কোনোক্রমেই লভ্য নয়। সকালে চোখ মেললেই তো দেখেন একজোড়া চোখ (কালো হরিণচোখ বলাই বিধের) তারপর আরো চোখ, আরো কত চোখ! কত না অসংখ্য কারণে আপনাকে তাদের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে, চেষ্টা করতে হচ্ছে স্বমতে আনবার। এ কি কম দুর্লভ কাজ? এমনকি ঐ-সে কালো হরিণচোখের কথা বললাম, বিবেচনা করুন, তাঁর মনটিও কবিগুরু ভাষায় সহস্রবর্ষের সাধনার ধন! সুতরাং?

প্রথম সাক্ষাতে মনে দাগকাটা মন পাওয়ার প্রথম সূচক। অনেকটা ‘প্রথমদর্শনে প্রেম’এর মতো। কার্যকারিতার গ্যারান্টি নেই তবে আশা প্রদ শুরু বলা যেতে পারে।

এই শুরু যে কত প্রয়োজনীয়—আমার পাঠকদের মধ্যে যারা সেলসম্যান বা অর্ডার সাপ্লায়ার, তারা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। কলনা করুন, এরা মালপত্র নিয়ে বিক্রী করার বা সাপ্লাই দেওয়ার জন্তে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। দারোয়ান মারফত ‘স্লিপ’ দিয়েছেন এবং ধরুন, তা মঞ্জুরও হয়েছে। তবু স্যুইং ডোরটি কঁক করা মাত্রই একজোড়া কুৎকুতে চোখে ‘আবার জালাতে এল রে’ এই উক্তিটির নির্মূল নির্বাক অভিনয় হয়ে যাবে। আর এই আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয়ের সামনে পড়ে একটিবারও ঢোক গিলবেন না এমন ধুরন্ধর সেলসম্যান এখনো মাতৃগর্ভে! তারপরের ঘটনাগুলো বাদলাদিনের মতো ম্যাকগ্যাফে ও একধেয়ে; সেলসম্যান মশাই নিজের জিনিসের

শুণগাম করবেন এবং যাকে উদ্দেশ্য করে এই কীর্তন, তিনি শোনার ভান করে একটি কথাও কানে নেবেন না। ফলাফল যা দাঁড়াবে, তা তো বুঝতেই পারছেন।

প্রথম সাক্ষাতে মনে দাগ কাটবেন কি করে ?

উপায়টা খুব সহজ ; হাসবেন।

হ্যাঁ, হাসবার ভন্টেই বলছি। ‘হাসির কথা’ নয় এটা মটেই। মিষ্টি হাসি হাসবেন।

জানেন কি, জগতে একটি মাত্র জাতি আছে যারা অজাতশত্রু। সাম্যবাদী রাশিয়ানদের শত্রু আছে, আছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান ইংরেজের। এমন কি শাস্তিবাদী ভারতবাসীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন এমন জাতও কম নেই। কিন্তু শিশুজাতির কোনো শত্রু আছে ? সোনালী রোদ্দু পড়া কচি পাতার মতো স্নিগ্ধ শিশুদের ? নেই। এরা একেবারেই নিঃশত্রু। অথচ শিশুর মতো এমন আশ্চর্য, স্বার্থপর এবং একগুঁয়ে জীব দুনিয়ার ছুটি নেই। (যারা প্রত্যয় যাবেন না তাঁরা দয়া করে মনঃসমীক্ষকদের জিজ্ঞেস করুন) তবু সবাই ভালবাসেন শিশুদের, আদর করেন, আবদার পূরণ করেন সাধ্যমত।

কারণ ? কারণ, শিশুরা হাসে। কারণে হাসে, অকারণে হাসে। আনন্দে হাসে আবার কান্নার মাঝখানে চিক্চিক্-করা-হাসি হাসে। এই হিসেবী দুনিয়ার অসহায় মানবকণ্ডলির হাসি ছাড়া অন্য মূলধন নেই যে! ঐ হাসি ভাঙিয়েই তারা নিজেদের প্রয়োজন জোগাড় করে আর সেই বিন্দুপ্রমাণ হাসিতেই মানুষের রসসিদ্ধ ছলছলিয়ে ওঠে। মাধুর্যমণ্ডিত হয় মর্ত্যভূমি।

আমার একজন পরিচিতার কথা অনিবার্যভাবে মনে আসছে। ইনি পোস্ট গ্র্যাডুয়েটের ছাত্রী এবং কফিহাউসের অন্ততমা স্রষ্টব্য। মনে হয়, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তিনি চেষ্টার তিলমাত্র ক্রটিকে নিশ্চিন্ত মনে করেন।

যেহেতু জানেন চুড়ির সংখ্যার সেই সীমারেখাটি যার অধিক রূপবিচারে দোষের ; জানেন লম্বাহাতা ব্লাউজ আধুনিক ক্যাসান হলেও তার প্রাত্যহিকতা দৃষ্টি বিকর্ষক ; আরো জানেন, কেমন করে শাড়িটার এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনে টিল দিয়ে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ রহস্যভেদ হয় না।

রূপকলার আদি-অন্ত জানা আছে মেয়েটির। কেবল একটি বিষয় ছাড়া। সেটি হচ্ছে মুখের অভিব্যক্তির ভূমিকা। এমন গোমড়ামুখ মেয়ে সচরাচর আমার চোখে পড়েনি। আশপাশের আলাপচারী পুরুষদল ও সমবয়সী মেয়েদের প্রতি তাঁর আছে অপরিণীত ভাঙ্গিল্য। সেই ভাঙ্গিল্য আর বিদ্বেষ রূজ-পাউডারের গভীর স্তরকে ভেদ করে যেন ক্ষণে ক্ষণে হিস্‌হিসিয়ে উঠত ; একটা বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করতাম আমরা সবাই। আকর্ষণীয় করবার ভন্টে তাঁর শত আয়োজন যেন ঐ একটি কলুষস্পর্শে ব্যর্থ হয়ে যেত ; যে কেয়াতলার কেউটের আড্ডা, তার ফুল কে ছোঁয়।

মনে হত একদিন ভাতাকে ডেকে বলি, একটা হাসি-হাসি মিষ্টি মুখ পাউডার নোএর প্রলেপ লাগানো মুখের চেয়ে অনেক বেশি মধুর ও সোভনীয়।

আমার জনৈক সাংবাদিক বন্ধু বলেন, নেহেরুজীর হাসির দাম লাখটাকা। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। সম্প্রতি জহরলালজী যে দিগ্বিজয় করে এসেছেন এবং শান্তিসংস্থাপনার ব্যাপারে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার কারণ খুঁজলে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নিরপেক্ষতা ছাড়াও একটা কথা সবাইএর মনে উঁকি দেবে ; তা হোল, নেহেরুজীর মধুর ব্যক্তিত্ব—কানাডার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সেন্ট লুই স্প্রেটএর ভাষায়, *grand and impressive personality*. এই মনোগ্রাহী ব্যক্তিত্বের মূলকথা হল তাঁর হাসি। জহরলালজীর মধুর হাসির সত্যিই কোনো তুলনা নেই।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই হাসির নীতি কেমন কাজ দেয় ? এ তত্ত্ব জানবার জন্যে কোনো কমান্স কলেজে পড়বার প্রয়োজন নেই ; দৈনন্দিন ঘটনার টুকিটাকি পর্যবেক্ষণ করলেই বোধগম্য হবে। দেখবেন, বাজারে গিয়ে আপনি একটি বিশেষ দোকান থেকে আলুপটল কেনেন, তেলসাবান কেনেন হয়ত এমন একটি স্টেশনারীশপ থেকে বা সাধারণত চোখেই পড়েনা আর সবাইএর। এতে যে আপনার পয়সার খুব দাশ্রয় হয় এমনও নয়। আমার বন্ধু শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায়এর বাড়ি রামচন্দ্র চ্যাটার্জি সেন-এ। ইনি বই ও সাময়িক পত্র কেনেন শ্রামবাজারের পাঁচরাস্তার মোড়ের একটি স্টল থেকে। কলেজ স্ট্রিটের জংশন তাঁর দুয়ার থেকে অদূরে। তবু দূর শ্রামবাজারে কেন তিনি মিছামিছি আসেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—স্টলওয়াল ছেলেটির ব্যবহার বড় ভাল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই ভাল ব্যবহারের প্রাণ হচ্ছে হাসি, মিতহাসি। কথায় বলে, কথার চেয়ে কাজ বড়ো। আর হাসি ? হাসি হচ্ছে কাজের উদ্বোধক। সে বলে আমি ‘আপনাকে পছন্দ করি’....‘আপনি আমার সুখী করেছেন’....‘আপনাকে দেখে আনন্দিত হয়েছি’....‘বলুন, আপনার কি উপকার করতে পারি’। তবে হাসি মানে কি নিপ্রাণ দস্তবিকাশ ? শুধু মুখের পেশীর স্থান পরিবর্তন ? মোটেই না। হাসি আপনার আন্তরিক হওয়া চাই ; চেষ্টাকৃত না হয়ে হবে সহজ ও স্বতস্ফূর্ত। যার সঙ্গে কথা কইছেন তিনি যদি অপরিচিতও হন, তবুও যেন আপনার হাসির সোনার কাঠির ছোয়ার তাঁর বিশ্বাস ও আত্মীয়তাবোধ সজীবিত হয়।

কিছুদিন আগে শিল্পমেলা দেখতে দিল্লী গিয়েছিলুম। মেলা দেখার পর কনট প্লেসে ঘুরছি এমন সময় এক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রলোকের ক্যান্সী গুড্‌স্ ও কিউরিওর দোকান এবং এর শাখাপ্রশাখা ছড়িয়েছেন বের্লিন, নৈনিভাল ও মুনসেরী। তাঁর দিল্লীর দোকানেই খাটছে চারজন সেলস্‌গার্ল। লক্ষ্য করলুম ছিটি মেয়ে খরিদারদের কিউরিওগুলোর উপযোগিতা সম্যক বোঝাতে পারছে না। লেখা পড়া কম। ভদ্রলোককে কথাপ্রসঙ্গে বললাম—ইচ্ছা করলেই আপনি আরও শিক্ষিতা মেয়েদের রাখতে পারেন আর তাতে ব্যবসায়ও জোর চলত।

তিনি হেসে বললেন—বিক্রীর কাজে আমি ম্যাট্রিক-ফেল মেয়েকেও রাখতে রাজী যদি তাঁর মিষ্টি হাসি থাকে তবু গম্ভীর মুখওয়ালীকে দণ্ডবৎ, হোন না তিনি দর্শনশাস্ত্রের ডাক্তার !

এই প্রবীণ ও নিপুণ ব্যবসায়ীর নাম আমি ভুলবশত সংগ্রহ করিনি। উচিত কাজ হত যদি তাঁর নাম এখানে উল্লিখিত করতে পারতাম। কারণ, তিনি এই ছোট ও সংযত মস্তব্যের মধ্যে দিয়ে এমন একটি অমূল্য সত্যের আভাস দিয়েছেন যাকে অমুভূতির মধ্যে পেতে আমাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হত।

হাসি কাজের উৎসাহ বাড়ায়। কাজ মাত্রেই বিরক্তিকর যদি না তার ফল আনন্দদায়ক হয় অথবা যদি না আনন্দিত মনে তা করা হয়। মনস্তত্ত্বের এই আবিষ্কারটি আপাতচক্ষে যতই জটিল ও অবিদ্বান্স মনে হোক না কেন, এ সত্য এবং এর চেয়ে কঠোরতর সত্যের সংখ্যা ঐ শাস্ত্রে করাঙ্গুলিগণ্য! সাঁওতাল নরনারীরা হাসিঠাট্টা করতে করতে কাজ করে। শ্রমসাধ্য কাজের দ্বারা তাদের জীবন যেমন ঠাসবুনানী এমন সহসা দেখা যায় না। তবু কাজ তাদের মোটেই বোঝাস্বরূপ নয়। কোনো গুরুভার জিনিস ওঠানামার সময় পশ্চিমী মজুরেরা এক আপনার-আমার-অবোধ্য ভাষায় পাঁচালী গায়, বোধহয় লক্ষ্য করেছেন। কিছু নিম্নস্তরের রসিকতাপূর্ণ পদসমষ্টি এই পাঁচালী। মজুরেরা তার ব্রহ্মস্বাদন করে ও হাসে, ফলে পরিশ্রমটা তত কষ্টকর লাগে না।

রাশিয়ার প্রত্যেক কারখানায় একটি করে প্রমোদগৃহ থাকবেই। শ্রমক্লান্ত শ্রমিকেরা কাজের ফাঁকে সেখানে খেলাধুলা আমোদ আহ্লাদ করে। সমবেতভাবে হাস্যকৌতুক করা এই সময়ক্ষেপের একটি বিশিষ্ট অংশ।

সুতরাং যারা বলেন, দমন্তরে খাটতে পারলেই জীবনে উন্নতি করা যায়, তাঁরা বহুচলিত প্রবাদবাক্যটির আক্ষরিক অর্থই বোঝেন মাত্র। পরিশ্রম অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও তৃপ্তি যে চাইই। আনন্দরসপুষ্ট পরিশ্রম কাজের পরিমাণ বাড়ায়, চাই কি, পরিপূর্তি আনে। আনন্দধন যে কাজ খেলার নামান্তর তার চেয়ে সুচারু-নিষ্পন্ন কিছু হতেই পারে না।

অর্থাৎ আনন্দের মধ্য দিয়ে কাজটি করা চাই। কিন্তু ঘন-শ্রাবণ-মেঘের মত মুখে কি আনন্দের আলো ফুটতে পারে? অতএব, মুখটি হাসিধুসি রাখবেন সবসময়। মাঝে মাঝে হো হো কোরে ফেটেও পড়তে পারেন। ভয় নেই। তার সঙ্গে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাবে না!

যে মানুষ হাসে না সে হাসতে হাসতে খুন করতে পারে—বলেছেন কবির ঈশ্বরগুপ্ত। ইংরাজী সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিকপাল মার্ক টোয়েনএর ভাষায়: হাসি বিধির দেওয়া আশ্চর্য অস্ত্রবিশেষ।

অপরের মনে দাগ কাটতে এই ‘আশ্চর্য অস্ত্রের’ প্রয়োগ করুন। দেখবেন, অপরিচয়ের চীনপ্রাচীর কেমন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। হাসি—মানবজাতির এক সাধারণ ভাষা, ভিন্ন ভাষাভাষির সঙ্গে আলাপ করবার এই একমাত্র প্রথমিক মাধ্যম। হাসি—বৈক্য কবির ভাষায় সেই বৃন্দাচুতী বা দুই মনের মিতালীকে করে সম্ভব ও সোচ্চার।

এমন কি কারুর ক্রটি দেখানোর ব্যাপারে বা পুত্রকন্টার অস্তায় কাজের প্রতিকারের

সময় যখন আপনার মুখ রাগে লাল টকটকে হয় তখনও এই হাসবার পরামর্শ দোব আমি। কেমন করে হাসবেন? কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের অবতারণা বা মৃদু শ্লেষের ভঙ্গিতে প্রসংগটা শুরু করুন। যেমনটি শ' তাঁর সাহিত্যে করেছেন। আমার মনে হয় এই গুণটি না থাকলে জগতের এই শ্রেষ্ঠ রুচিবাদী সাহিত্যক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতা অর্জন করতেন, সার্থকতা নয়। সুতরাং, নড়া দাঁত যদি তুলতেই হয়, পূর্বাঙ্কে পর্যাপ্ত লাকিং গ্যাসের যোগাড় রাখবেন।

ভারতের রজনীতিক্ষেত্রে একটি মানুষ ছিলেন এবং একটি মানুষ আছেন যারা হাস্যরসের সত্যিই রসিক। প্রথমজন মহাত্মা গান্ধী ও দ্বিতীয় জন শ্রীডাঙ্গ, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্ততম নেতা। জাতির জনকের বক্তৃতায় যেমন ছিল বাইবেল-মুসল সারসংক্ষেপ তেমনি ছিল হাসির ছটা। ডাঙ্গেরও তাই। '৪৮ সালের বোম্বাইএর এক বিকেলের কথা মনে পড়ছে। পার্টির অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে বেশ খানিক ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে সভ্যদের মধ্যে। সেই মত বিরোধের খাড়া এসে লেগেছে সৌহকঠিন কামগার ইউনিয়নেও। ছশিস্তার কালো মেঘ বাজপাখীর মত পাখসাট মারছে ফিরোজশা মেটা রোডের ৪ তলা বাড়ির উপর।

কমরেড ডাঙ্গের স্থির করলেন বিরোধটির মীমাংসা খোলাখুলিই করবেন। মিটিং ডাকা হোল কামগার ময়দানে নয়—হস্তর আরব সাগর আর বোম্বাই এর মাটি যেখানে উদার আলিঙ্গনে বন্ধ সেই চৌপাতিতে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসেবে আমি উপস্থিত হলাম সেখানে।

যে নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় রিপোর্টাররা বক্তৃতা টোকে ভেবেছিলাম আমিও তাই করে পেশাটি বজায় রাখব। কিন্তু তা কি হবার জো আছে! কমরেড ডাঙ্গের বিশ্লেষণী বক্তৃতায় কতবার যে আমার কঙ্গম শুরু হয়ে গেছে তা আমি বলতে পারব না। এদিকে ডাঙ্গের উপমাছলে দৈনন্দিন ঘটনার টুকিটাকি তুলে শ্লেষ, বিদ্রূপ, উৎপ্রেক্ষা, ব্যঙ্গস্তুতির—এককথার সমগ্র অঙ্গকার শাস্ত্রের আশ্চর্য এক ডিমন্স্ট্রেশনএর মধ্য দিয়ে তুল বোঝাবুঝির মূল কারণটি বুঝিয়ে দিলেন। সবাই হাসতে লাগল। নিরঙ্কর শ্রমিক, শিক্ষিত জনসাধারণ সবাই। যারা চোখে চোখে চাইবে না ঠিক করেছিল, হাসির আলোকে চোখ মেলাস আবার। কামগার ইউনিয়ন এ-অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল।

কিন্তু এমন যদি হয় আপনার, যে হাস্য পেলে আপনি 'চোয়ালযুগল ঈষৎ কঁক করে তবে হাসেন (ডি, এল, রায়-এর অনুরোধে বললাম) বা যদি হন 'রামগুরুড়ের ছানা'র সগোত্র তা হলে? সেক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি, আপনি এই পর্যন্ত পড়ে ভবিষ্যতে হাসবার কলমে নিমরাজী হয়েছেন। কিন্তু যখন তখন হাসবেন কি করে? হাসি যে আপনার হৃদয়ের বিষ। হাসি যে আপনার পায় না। তখন? উপায় আছে। খুব সোজা উপায়। যখন একলা আছেন তখন আপন মনে গুন গুন করুন বা পরিচিতগানের কলিটা মাঝাঘসা করুন। তারপর সংসারের সমস্তাগুলো হাকাতাবে আলোচনা করুন। স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে আনন্দলাপ করুন, স্থান বিশেষে রসিকতা। এমনভাবে দিনকতক নিয়মিত হাসির চর্চা করতে থাকলে দেখবেন, এ দুনিয়ার হাসি না পাওয়াই বিরাট হাস্যকর ব্যাপার।

খাল-বিল-পারের কাহিনী

ফণীকুনাথ দাশগুপ্ত

॥ এক ॥

নাম বটে পুবের বিল। আসলে সবটাই কিন্তু বিল নয়। বিল শুধিয়ে মাঠ হয়েছে অনেকটা, সেখানে ঘর বেঁধেছে মানুষ। গাঁয়ের নাম আর খালের নামে তাই কোনো প্রভেদ নাই। বিলের এক মুখ পড়েছে ভৈরবে, আর এক মুখ শুধিয়ে গেছে বলেই আজ মানুষের দাপট বেড়েছে। নইলে দুর্ভেদ্য কাঁটালতার আর কালকেউটে-চৌড়া সাপে কিলবিল করত পুবের বিলের জল। তাছাড়া ডাকাতের বিলের ডাকসাইটে নামও শ্রান হয়ে যেত বিলের খালের কাছে। ভিন্দেশী কেউ যদি পথ ভুলে ভৈরবের ওপারে বিলের পথে পা বাড়িয়েছে তবে তার আর রক্ষা নাই! স্বয়ং খাজা খানজাহান আলীকে পর্যন্ত তাঁর দিগ্বীজয়ের সময় পুবের বিল এড়িয়ে ছুঁচোহাটির মাঝ দিয়ে পথ করে নিতে হয়েছিল! সে সব ইতিহাসের কথা!

আজ আর পুবের বিলে কাঁটালতা-সাপ ভরা জলের একাধিপত্য নাই। জঙ্গলও ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে। মানুষ সেখানে নিজের ঠাই করে নিচ্ছে! জঙ্গল কেটে আবাদী জমি তৈরী করেছে মানুষ পুবের বিলে! পুবের বিলে বিলের আয়তন অনেক কমে গেছে। বর্ষার জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র সাপসা আর পদ্মকুল ফুটে ওঠে বিলের জলে। বড় ছোট সাপও আছে, কাঁটালতার কমতি নাই! বিলের জলে তালের ডোঙ্গা চলে, ডিকিও চলে। ভৈরবের মুখে পড়তে সময় বেশি লাগবে না। ভৈরবের ছ'পারে রয়েছে বড় বড় গঙ্গ বন্দর, হাটবাজার, রেল স্টেশন আর বড় বড় বাবুদের গাঁ, তাদের ইস্কুল আর হাসপাতাল! দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য ভৈরবের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে হয় বিলের বাসিন্দাদের।

বিলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নিত্যন্ত গতানুগতিক সাধারিণী নয়! বৈচিত্র্য আছে। সে-বৈচিত্র্য কখনও-বা আসে স্বাভাবিক ভাবে, কখনও জোর করে। দারুণ শীতে মড়ক লাগবার কিছু আগে রক্ষাকালীর পূজা হয় খালপারের শ্রমানে! চাকের বাজনা চলে রাত ভোর। পাঁঠা বলি হয়। মদ, সিদ্ধি আসে, স্মৃতি হয়। সারারাত হৈ-হল্লা করে ভোররাতে রাস্তার উপর সারি সারি কলাপাতার মহাপ্রসাদ পড়ে। কবি-ভরজার দল আসে। গান হয়, হল্লা হয়—হাতাহাতি থেকে শেষ পর্যন্ত মাথা ফাটাকাটি। চৈত্রসংক্রান্তির সময় মেলা বসে, সং বের হয়। পাটপূজার নাচ হয়। শেষরাতে শ্রমানে এসে শেয়ালকে মা



মা বসে শিবাঙ্গানে খাওয়াতে হয়। সবার হাতে মা খান না। দুঃখাধ্য সে তপস্কা! শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মা মনসার পূজা। দুধ, কলা, তাল, কুস ঘট নিয়ে পদ্মাবতীর পূজা দিতে হয়। অষ্টনাগের মা বিষহরী রক্ষা কর সন্তান সন্ততিদের মাগো! দুধ কলা মা প্রসাদ করে দেন। তারপর রাত দুপুরে চক্রবর্তীদের মনসামণ্ডপের গায়ে কান পাতলে শুনবে চুক্‌চুক্‌ শব্দ আর কোঁস কোঁস আওয়াজ! পদ্মাবতীর সন্তানেরা তার প্রসাদ নিচ্ছে! দোলদুর্গোৎসব দু'চারটে বাড়িকে ঘিরে সাধারণের উৎসব হয় কিন্তু কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে মা লক্ষী ঠাকরুণ আসেন সবার ঘরে ঘরে। চিড়ে মুড়ি গুড় নারকেলের ছড়াছড়ি! খাও, খাও, কত খাবে খাও! রাতে আর হাড়ি উঠবে না উঠুনে! রাতে তার বাড়িতে গিয়ে কাজ কি! যাত্রার আগর বসেছে বউমারির ভিটের। তারপর ভৈরবের ওপারে বাবুদের গায়ে সিন খাটিয়ে থিয়েটার হয়। ওরা দল বেধে নৌকা করে যায়! বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণ-ব্রত সব কিছু নিয়েই ওরা উৎসব করে।

খালের মুখে বড় নদীর চরে লম্বা বাঁশের মাথায় পেতলের কলসী রোদুর পড়ে চিক্‌ চিক্‌ করছে। পাশে উড়ছে লাল কাগজের নিশান। বোদের ঝাঝ একটু কমতে না কমতে লম্বা লম্বা তালপাতার মত ডিঙ্গি সব এসে হাজির হবে। নৌকার গলুই পেতল দিয়ে মোড়া। যেমন লম্বা তেমন সরু গড়নের ডিঙ্গি নৌকা, জলে ভাসছে না ডুবছে বোঝবার উপায় নাই! পার থেকে শিঙে বাজিয়ে সংকেত হবে অমনি নৌকা ছুটবে। কলসির আর কত দাম! ইজ্ঞতের দাম অনেক বেশি! তার জন্তে জান দেওয়া যায়, নেওয়া যায়। সামান্য কারণে বৈঠা তুলে পেটাপেটি শুরু করবে। বর্ষা ছুড়ে মারবে। নদীর জল লাল হবে। লাস গুম্ব করে দেবে। খানা, পুলিশ হবে, হাজত বা ফাঁসিও হতে পারে তবু উৎসবের শেষ নাই! জমির দু'হাত একটা আলু নিয়ে চপছে মন কষাকষি! এর জন্তে কোর্ট উকীলের প্রয়োজন আছে কি! লোক না থাকে, পরসা ছাড়। তোল পিটিয়ে শক্রপক্ষকে জানিয়ে দাও: আজ ভোর রাতে আলু দখল হবে ক্রমতে পার যোথো! বোশনাই জলবে, বাজনা বাজবে গাট বন্দুক ছুটবে। খালের দু'পাশে মজুত হবে গাড়ী লাঠি-বর্ষা-সড়কি! তারপর চলবে মানুষ নিয়ে অমানুষিক এক খেলা! দু'হাত জমির জন্তে দু'শো লোক জখম হবে, দু' দশটা মরবে! খানা-পুলিশ-কোর্টের জন্তে ভাবনা নাই! মানুষের রক্তে হাত লাল হয়েছে, জল দিয়ে ধুয়ে ফেল। পরদিন হাসিমুখে গলুই নিয়ে হাটে সব বাজার করতে যাবে। কিছুই যেন হয়নি এমন ভাবখানা! জীবনটা একেবারে সহজ সরল করে নিয়েছে এরা!

পুন্ডের বিলের বাসিন্দাদের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি। ক্ষেতচাষী ছাড়া মুচিরা আছে ক'ধর। চামড়া নিয়ে কারবার তাদের। পুরুষরা মরা গরু ধোঁজে। চামড়া নিয়ে কারবার তাদের। কখন-সখন বাজারে হাটে বাবুদের জুতো মজবুত করতে বসে। ঢাক, তোল বানায়। মেয়েরা বাড়িতে বসে ডালা-কুলো-খলুই বানায়। মেলা বসবার আগে বাচ্চাদের জন্তে খেলনা বানায়। তাদেরও জমি আছে। জেলেও আছে ক'ধর। পুন্ডের বিলে মাছের

অভাব নাই। তারা জমির ধার বড় ধারে না। বাকি যত বর আছে তাদের জমি নিয়েই কারবার। লাঙল গরু আছে। ধান বা রবিশস্ত উঠে গেলে কখন কখন দুধ, তরিতরকারী বিক্রি করে। অবসর সময় বাইচ খেলে, হাঙ্গামা বাধায়, সং সেজে গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। চাল পয়সা বেশি হলে মজ্জ্ব দেয়! নিরীহ ধরনের আছে কেবল ক'বর যজ্ঞমানী বামুন। তৈরবের ওপারের বড় বড় পণ্ডিত বামুনরা অবিদিত তাদের পাত্তা দেয়না কিন্তু তাতে তাদের এসে যায়না কিছু। ব্যবসা ভাল চলে!

॥ দুই ॥

বর্ষার জল বেড়েছে তৈরবের—কুল ছাপিয়ে ধারে কাছের মাঠ ভেসে গেছে। খালে গাঙের ঘোলা জল এসেছে। কাকে কাকে মাছ কচ্ছপ যেমন এসেছে তেমন এসে ঢুকেছে কুমির, হাঙ্গর। স্নান করবার ঘাট ছেঁচা বাশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে মাতব্বরেরা। বউ-ঝিরা চান করবে, বাচ্চারা এসে দাপাদাপি করবে। তাদের ত সাবধানে রাখতে হবে।

বউ-ঝিরা নেমেছে জলে। সন্ন পরিধির ভেতর খলবল করে করে সব চান করছে প্রাণের আনন্দে।

হঠাৎ হাউ মাউ করে উঠল হারাণের বউ।

—কুমু দিদি গেলি ক'নে!

সঙ্গীরা আসেপাশে চারিদিক সতর্ক দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। তাইত, গেল কোথায় কুমুদ?

—এই ত জলে ছিল, ডুব সাতারে কেঁরদানি দেখাল, গেল কনে?

তাকিয়ে দেখল সবাই ঘাটের পারে পড়ে রয়েছে কুমুদের গামছা আর মেটে কলসি!

ভয় পেয়ে ধড়মড় করে সবাই গিয়ে পাবে উঠল। ছেঁচা বেড়ার খানিকটা কোঁকর হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে তবে কি কুমির, হাঙ্গর এসেছে!

ভয় পেয়ে সবাই সম্মুখে চেঁচিয়ে উঠল।

—খেলে, নাকসে খেলে কুমুদিকে—

তখন বাজার বেলা। পুরুষরা কেউ বড় নেই বাড়িতে! চিংকার শুনে আরো ছ'একজন মেয়ে মানুষ এল ছুটে।

যে-বিপদের আশঙ্কা করে তারা চেঁচিয়েছিল তা কলল। সকল সন্দেহের নিরসন হল।

—ঐ দেখ দিদি, জলের ভিত্তি'নস্ত!

বাশের বেড়ার বাইরে তাকাল লাল রক্ত জলের উপর ভেসে উঠল!

মেয়েগুলো হাপুস নরনে কাঁদতে লাগল।

আর একটু দূরে চুলের গোছার মত কিষেন ভেসে উঠল, লাল কাঁচের চুড়ি পরা মুঠোল একখানা হাত যেন জল থেকে ভেসে উঠে সঙ্গীদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। তারপর সব মিলিয়ে গেল। আর কোনো আলোড়ন জলের বুকে শোনা গেল না।

এতক্ষণ মেয়েগুলো যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গিয়েছিল। এবার সব্বিং ফিরে পেল।
উদ্ভেজনার হারাণের বউ জলে কাপ দিতে গিয়েছিল আর কি। আর ছ'টি মেয়ে দৌড়ে এসে
তাকে জাপটে ধরল।

—তুই মরবি লো ছুড়ি, কামটের সাথে কামড়াকামড়ি করবি তুই?

বার্ট থেকে হারাণের বউকে আর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে না! পাগলের মত
কী ছটকটানি মেয়েটার!

রাত না পোহাতেই নটবর গিয়েছিল স্টেশনের বাজারে চামড়ার কারবারী সহদেবের
সঙ্গে মোলাকাত করতে। অনেক টাকা তার কাছে বাকী পড়েছে।

নটবর যখন বাড়ি ফিরল তখন সূর্য মাথায় উঠেছে। বাড়ি ঢুকে দেখে ঘর দোর সব
খাঁ-খাঁ করছে। রান্নাঘরে রান্নার ছ্যাক-ছ্যাক শব্দও নাই। কি ভেবেছে আজ কুমুদ!
ঘরের ভেতর তিন বছরের ছেলে অক্ষয় ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে।

—কই, ক'নে গেল?

উত্তর নাই।

—ও অক্ষর মা—

কোনো সাড়া শব্দ নাই।

ঘর দোর খুঁজে বাইরে বেরিয়ে এল নটবর। বাচ্চা ছেলে ফেলে গেল কোথায় কুমুদ!
হারাণের বউ উঁকিঝুকি মারছে। কি যেন বলি বলি করে বলতে পারছে না।

নটবর এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। বউমাকে নজরে পড়তে চেষ্টা করে বসল : গেল কনে
মাগী? রোদ্দুরে তাতে পুড়ে আসেছি সে খেয়ালভা নাই!

হারাণের বউ আর চেপে রাখতে পারল না। কেঁদে ফেলে বলল : তেনারে
জলদেপ্তা ধায়েছেন।

—কি কও?

একটা দানবের মত নটবর হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

—খালে নাতে গিয়ে কামটে ধরেছে দিদিরে— দিদিগো—

বউটা আর বলতে পারল না।

নটবর আর কোনো প্রশ্ন করল না। ঘরের মটকায় উঠে ই্যাচকা টানে বের করে
নিয়ে এল স্মৃতিষ্ক কোচ। বউএর জন্যে শোক করতে বসল না। ছেলের কথা ভাবল না।
কোনো কথা না বলে ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আগেই রক্তাক্ত একটা হাঙরকে ডালের ডোঙায় বেধে টানতে টানতে
একেবারে বাড়ির উঠানে এনে ফেলল নটবর। পাড়াগাঢ় লোক এসে ভেঙে পড়ল তার
উঠানে। নটবরের অসম সাহসিকতার প্রশংসা কেউ কেউ করল। কেউ তার অক্লান্ত
গোয়াতুমি দেখে অবাক বনে গেল।

নটবর স্ত্রীর যত্নসংবাদ পাওয়া অবধি কোনো কথা বলেনি। এইবার মরা হাঙরটাকে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে বলল : শালা এ তোঁর ভৈরব পাসনি পুঁবের বিসে কোনো ক্যারদানি খাটেনা ! সে, কত কাটবি কাট শালা—

বলে পাগলের মত হাঃ হাঃ করে হেসে একখানা হাত হাঙরটার মুখের ভেতর সে দিয়ে দিল।

—সে, কাট, কাটে ফ্যাল শালা, স্মৃষ্টির বেটা ! মাইয়ে মানুষ, তার অবলা পাইলি—
—সে-সে-সে—

জানোয়ারটার দাঁতের সঙ্গে হাতের ঘষাঘষিতে চামড়া কেটে রক্ত গড়াতে লাগল তবু নটবর থামল না।

—বেকারদার ধরিলিরে শালা নলি অমন সহজে ঘায়েল হবার মত মাইয়ে মানুষ নয় আমার ! আহা, জলের ভিত্তি কনে নিয়ে রাখলি, তারে খুঁজে ত পালান না ! ওরে অক্ষর, তোঁর মা কনে গেলরে—

দানবের মত শক্ত ঋজু লোকটা সহসা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। হাঙরের রক্তাক্ত দেহটার উপর গড়াগড়ি দিয়ে সে কী কান্না নটবরের।

সংসারে আর কেউ নাই, শুধু ঐ তিন বছরের ছেলে অক্ষর ছাড়া। নটবর থাকবে বাইরে বাইরে ছেলেটার দেখাশুনা করবে কে ! সারাদিন রোদে দলে মাঠে বাজারে ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে নটবর যখন ঘরে ফিরে আসবে একটু সেবা, একটু ভালবাসা কার কাছে আর সে প্রত্যাশা করবে ! কুমুদ এ বাড়িতে আট বছর বয়সে এসেছিল। সংসারে থাকবার মধ্যে নটবর আর তার বুড়ি পিসি। বাপ মা বছরদিন গত হয়েছে। কত ঋড় ঋপটা গেছে তাদের উপর দিয়ে। বয়স কম হলে হবে কি, অমিত স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিল কুমুদ। আট ন' বছরে মনে হোত যেন চোদ্দ পনের। সেই বয়স থেকেই নটবরের সংসারের হাল সে ধরে এসেছে এতদিন। প্রথম ঘোঁরনে নেশা ভাঙ করত নটবর। নানা রকমের বদ খেলা ছিল। নানাতাবে পয়সা নষ্ট করত সে। বাড়িতে ফিরে কারণে অকারণে কুমুদকে ধরে বেদম প্রহার দিত। কুমুদ তবু হাল ছাড়ে নি—সব সহ্য করেছে। ক্রমে নটবরের বাউণ্ডলে স্বভাব গেল। কুমুদের আকর্ষণেই সংসারী হোল সে—বিষয় আসন্ন করল। অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হোল, ছেলে হোল ! পরিপূর্ণ সংসারে ভোগের মাঝখানে হঠাৎ সেই কুমুদই সরে গেল পৃথিবী থেকে। বত্রিশ বছরও পূর্ণ হয়নি তার। মরবার দিন ত আর আসেনি।

পরশরই সব ব্যবস্থা করল। বলল : নটবরদা, তোঁর ভর ভাবনা নেই। অক্ষর ত হারাণের বউএর স্ত্রীওটা। ওর কাছে ওডারে দে, মানুষ করবে ! তোঁর ভাত খলও দিতি পারবে।

ক'দিন ধরে নটবরও তাই ভাবছিল। পাড়াপড়শীদের মধ্যে হারাণের বউএর সঙ্গে বনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল কুমুদের। ছেলেটাকে ওর কাছে দিলে থাকবে ভাল। হারাণের

অবস্থা ভাল নয় আরও কিছু বেশি দেবে। হারাণ আর তার বউ দু'জনেই ভাল। ওদের পেলে সাংসারিক দিকটা সে বেশ খানিকটা নিশ্চিত হবে। আর তা না হলে সংসার রাখতে আবার তাকে বিয়ে করতে হয়। তার বয়স এখনও চারের ঘর পেরোয়নি। বিয়ে অবিশ্রি করা যায় তবে বয়স্থা মেয়ে পাওয়া যায় না যে! আবার একটা কচি খুকি এনে ঘরে ঢোকাতে সাধ যায় না তার। বিয়ের কথা না হয় পরে ভাবা যাবে। এখনকার মত ত সংসারটা বাঁচুক, ছেলেটা মানুষ হোক! পরাশরের কথায় নটবর রাজী হয়ে গেল।

হারাণ হাঁপানীর রোগী। ভাল করে কথা বলতে পারেনা। কাশতে কাশতে মাথা নেড়ে সে সায় দিল। হারাণের বউ শংকরী ত রাজী হয়েই আছে। নিজের পেটে ছেলে পূলে ধরে নাই। নিজেরা ভাল করে দু'বেলা খেতে পায় না তবু তার মাতৃহৃদয় ত বুকু হয়ে আছে। আর তা-ছাড়া অক্ষর তার আবাল্য সহচরী কুমুদিতর ছেলে। মা হারা ছেলেটার পর শংকরীর ত একটা দারিদ্র্য আছে। অক্ষরকে সে পরমাদরে কোলে ভুলে নিল।

॥ তিন ॥

ঘরে নিজের মেয়েমানুষ না থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। সংসারে শ্রী নাই, সবই ঘেন এলোমেলো। নটবরের অবস্থা ভাল। চামড়ার কারবারে একটা মাতব্বর সে। ছোট খানি ক্ষেতও আছে। বাইরে যতক্ষণ থাকে বেশ ভাল থাকে নটবর। শহরের বাজারে, খালের ডিকিতে, নদীতে, ঘাটে মাঠে ক্ষেতে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বাড়িতে যতক্ষণ কাজ নিয়ে মশগুল থাকে ততক্ষণ কিছুই মনে হয় না। কিন্তু সব কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যখন সে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢোকে তখন সব ঘেন ফাকা ফাকা বোধ হয়। কুমুদ ঘরে নেই। আর সে আসবে না কোনোদিন! সত্যি আর তাকে পাবেনা নটবর? নটবরের চোখ ভরে জল আসে। মরবার কি বয়স হয়েছিল অক্ষরের মায়ের?

মরবার কি বয়স আছে নাকি আবার! কচি কচি দুধের শিশু সব কেমন টাপুনি খেয়ে মরে যায়—মরেও ত মরেনা সস্তর আশি বছরের বুড়োবুড়ি! পড়সী বিটুর মা, চুলগুলি শনের দড়ির মত, দাঁত নাই, দৃষ্টি নাই। ঘরের মধ্যে কুকড়ে কেন্নর মত পড়ে আছে। দিনরাত ছেলে বউ গালাগাল দিচ্ছে মর বুড়ি মর, তবু সে ত মরে না! অন্ধকার ঘরে বসে নটবর তামাক টানে আর হাসে। অদ্বুত এই পৃথিবী!

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নটবর। কিসে পয়সা আসে তার জন্তে নানা কিকিরে ঘুরে বেড়ায়। ভোরবেলার বেরিয়ে যায় ফিরে আসে বেলা দুটো তিনটের সময়। ঘরে এসে দেখে হারাণের বউ ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। অক্ষরও নাই, সে ওদের ঘরে সর্বক্ষণ থাকে। কোনোরকমে খাল থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে ঠাণ্ডা ভাতগুলো গোত্রাসে গিলে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে সেই রাত নটা দশটায়। হাতে কাঁচা পয়সা আসে সোম শুক্রবারে। ঘরে

কুমুদ নাই যে গণে গণে দেখবে, কাছার খুট দেখবে তারপর দু'হাত দিয়ে মুখটা টেনে ধরে তার গন্ধ শুকবে। ঘোবনের বদধেনালগুলি বহু কষ্টে ছেড়েছিল এতদিন বাদে আবার যেন সেগুলি মাথার ভেতর ঢুকে কিলবিল করছে। রেল বাজারের বড় খোঁটা কারবারী সহদেব হয়েছে অন্তরঙ্গ দোসর। সে নটবরের ঘরের সব খবর জানে! বহুদিন বাদে সে আবার টানছে, লোভ দেখাচ্ছে। তার আকর্ষণ দুর্নিবার।

সোম, শুক্রবার নটবর রাতে আর ঘরে ফেরেনা। সে-দুদিন সে দোস্ত সহদেবের অতিথি। সহদেবের শুদামে আসর বসে। স্টেশনের স্টলভেঙার তেওয়ারী আসে। তাড়ি খায়, খাসি খায়। অনেক রাত পর্যন্ত হৈ হল্লা হয়। সঙ্গীরা সব যখন আস্তানায় ফিরে যায় তখন সেজেগুজে বেয়ঙ্গ সহদেব আর নটবর। হাটের পেছনে নদীর পার বেঁধে সব টিনের চালা ধর। সেখানে স্মন্দরীরা কেরোসিনের টেমি জ্বলে বসে অপেক্ষা করছে। পছন্দের বালাই নাই। বাধা ঘর আছে। সেখানেই চোখ বুজে ঢুকে পড়ে। তারপর ভোর হলে ডিক্রি ভাসিয়ে গাঁয়ের পথে রওনা হয় নটবর।

এইভাবে দিন কাটে।

ছেলে মানুষ হয় হারাণের বাড়ি! শংকরীকে মা বলে ডাকে অক্ষয়। নটবর ধরচ দেয়। তাতেই সব ঝগাট মিটে যায়। নটবরের সঙ্গে অক্ষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই বললেও চলে। ফের বিয়ে করে সংসারী হবার সাধও আর নেই নটবরের। কি হবে বাঁধাধরা জীবনে। এইত বেশ আছে, দিব্যি নিশ্চিন্তে দিন কেটে যাচ্ছে।

দোস্ত সহদেব হেসে বলল: আরে ভেইয়া, জোকৃত গোকুরা মাকিক আছে! উসকো খেইল দেও, ঘাস দেও, খাটাল বানাও। বাচ্চা হোনেসে উসকোভি সেবা কর, তব দুধ মিলেগা, খানেসে আনন্দ হোগা! কেতনা তকলিফ! লেকেন পোয়ছা ছোড়, গোকুর জোকুর কিসিকা জরুর নেহি হ্যায়। বড়া বড়া দুধ মিলেগা, খাওনা কেতনা খায়েগা! হাঃ হাঃ হাঃ—

—বাঃ বাঃ দোস্ত ঠিক কথা বলিছ এবার! জোকুর আর গোকুর—হিঁ হিঁ হিঁ—
নটবরও হাসে।

নেশার কোঁকে দুজনে গ্রাণ খুলে হাসতে আরম্ভ করে। হাসি আর খামেনা।
ওদের অট্টহাসি শুনে পুষ্পরানী ভয় পেয়ে যায়।

—কি গো অমন করে হাসতিছ কেন তোমরা? নেশা বুদ্ধি খুব ধরিছে!

নটবর হাসতে হাসতে বলল: হ ধরিছে। তোমরা তাহলি ঠারোন গোকুর না জোকুর?
হিঁ হিঁ হিঁ—

সহদেবের তখন সঙ্গীন অবস্থা। চোখ মেলেতে পারছে না, কথা একেবারে জড়িয়ে গেছে, বোঝে কার সাধ্য! রাজ্যের পেরাজি আর কচ্ছপের মাংস গিলে ঘরময় বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে। তার দুর্গন্ধ ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে! নেশা করলে নটবর কখনো বেসামাল হয় না। তার মাত্রাবোধ আছে। তাছাড়া নতুন ধরে এসে অবধি সে বিব্রত

বোধ করছে। পুরানো ঘরে আজ আর সহদেব কিছুতেই ঢুকতে রাজী হয়নি। টেনে নিয়ে এসেছে একেবারে এই ঘরে!

হাসি থামিয়ে নটবর অপলক দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটার মুখ দেখছে।

—দেখ কি অমন করে?

—তোমারে।

—পছন্দ হয়?

—ও কি কথা! তুমি মাধব ঠাকুরের ইস্ত্রি না?

চমকে উঠল পুষ্পারানী। ছুচোহাটির লোক বুঝি!

—মাধব ঠাকুর! সে আবার কেডা?

খিল খিল করে হেসে উঠল পুষ্প।

—হ, হ। আমার চোখে ধুলো দিওনা ঠারোন! তোমাগো ভৈরব কুলির কাণ্ড কারখানা পুবির বিলি বসে আমরাও শুনে থাকি। মুখে যতই হাস, যতই রং চং মাখ নক্ষী, আমি শুনেছি মার খায়ে আর হেনস্তা সয়ে সয়ে মনের ভিত্তি পদার্থ নেই তোমার। এই নেও টাকা রাখ! আজ তাহলে চললাম।

নটবর উঠে দাঁড়াল।

অবাক পুষ্প হাত পেতে টাকা নিল। লোকটির শুনতে তবে বাকি নেই কিছু! সব জানে, সব শুনেছে মাধব ঠাকুরের বাড়ির কেছা! এর কাছে তবে আর ফাঁকি চলবে না! টাকা নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল পুষ্প। সংসারে সব মানুষই আলাদা, কারো সঙ্গে কারো মিল নাই!

নটবর বলল: সহদেব থাক শুয়ে। ভোরের আগে ও আর উঠতি পারবে না!

নটবর বেরিয়ে এল। নেশা তখনো ভাল করে কাটেনি। মাথা টলছে তবু আর দাঁড়াতে পারল না। মুচির ছেলে নটবর মাধব ঠাকুরের জীবন কথা কিছুতেই মন থেকে ভাড়াতে পারছে না।

--বামুনের মায়ে—ছিঃ ছিঃ! মা কালী রক্ষে করেছেন!

নৌকার বসে নদীর জলে ভাল করে মাথা, মুখ ধুয়ে নিল নটবর। রাত তখনো তিন চার ঘণ্টা আছে। কৃষ্ণপক্ষ নয় আবার খর জ্যোৎস্নাও নয়। মেটে জ্যোৎস্নার নিস্তর নদীতীর তখনো ঘুমন্ত! অল্প হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ বাধানৌকার আছড়ে পড়ে বৃহৎ শব্দ করছে। সেই সঙ্গে নৌকার ভেতর ঘুমন্ত মাঝির নাকডাকার শব্দ ভেসে আসছে।

নটবর নৌকা ছেড়ে দিল। ভাগ্য ভাল বে-গোন নয়। পুরো জোয়ার। বাতাসও আছে অল্পবিস্তর। ছোট ডিঙ্গি তরতর করে এগিয়ে চলল। পার থেকে বুনা ফুলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে কখনো-বা কামিনী ফুলের হাল্কা গন্ধ এসে নাকে ঢুকছে। বাঃ

বেশ লাগছে ! শরীরটা এতক্ষণে যেন শান্ত হোল । এতক্ষণ একটা বদ গন্ধ সর্বাঙ্গে সেগে ছিল ! গামছা নদীর জলে ভিজিয়ে আবারও মুখ পুঁছে নিল নটবর ।

নৌকা চলছে বাতাসে । বৈঠা ধরে চুপ করে বসে আছে নটবর । ভাবছে কুসুদের কথা । বিপুল এই অনন্ত জলরাশির ভেতর কোথায় সে তলিয়ে গেল ! আর ত সে ফিরে আসবে না ! সংসার স্বামী সন্তান পড়ে রইল, কারো কথা ত সে আর ভাববে না ! আজ সংসার আর কোথায় আছে নটবরের । খাট, বিছানা, হাঁড়ি আর একখানা চাল। থাকলেই ত আর সংসার হয় না ! শ্রী নাই, শাস্তি কোথায় ? সুখ ত বহুদিন বিদায় নিয়েছে । একমাত্র ছেলেরটা পর্যন্ত মানুষ হচ্ছে পরের ঘরে । কোনো সম্পর্ক নাই । বাপ বলে কাছেও আসে না । সেও ডাকেনা আদর করে । মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে এই উচ্ছৃঙ্খলতা আর কেন ? অনেক ত হয়েছে, অনেক অর্থ গিয়েছে ! শাস্তি কই ? সুখ কোথায় ? নেশার সাময়িক উন্মাদনা শেষ পর্যন্ত চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে আসে । এ-পথে তবে আর নয় । অক্ষয়কে সে নিয়ে আসবে নিজের কাছে । সাত বছরের ছেলে এবার ঘুরুক তার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবসা বুঝে নিক এখন থেকেই । আজ বাড়ি ফিরেই সে অক্ষয়কে নিয়ে আসবে শংকরীর কাছে থেকে । ভাত জল দেবার জন্তে, সংসার দেখবার জন্তে পুতুনীকে না হয় নিয়ে আসবে । পুতুনী নটবরের মাথার মেয়ে । পুতুনীর সোয়ামী চালনার হাটে সুপারীর ব্যাপারীর নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে বন্দুকের গুলীতে মরেছে গত বছর । পুতুনী নিরাশ্রয় হয়ে আছে শওরের ভিটের, সেই দামোদরে । কি আশ্চর্য, আজ এতদিন বাদে পুতুনীর কথা মনে পড়ল তার ! তবে তাই হোক, নটবর মনস্থির করে ফেলল । দুতিন দিনের ভেতরই সে পুতুনীকে নিয়ে আসবে । মেয়েটার একটা হিলে হবে, তারাত বাঁচবে !

—কে যার ?

নটবরের এতক্ষণে নজরে পড়ল । বড় বজরা নোঙর করেছে মাঝ গাঙে ।

—আজ্ঞে নটবর বিনী ।

—ঋষি হও মুনি হও, নৌকো ইদিকে ভিড়াও বাপধন !

এত সহজে ভিড়বার মানুষ নয় নটবর । এত বড় বজরা নিয়ে ডাকাতি করতে আসে না কেউ তবু লোকটার কথার ভঙ্গি ভাল নয় । বদ মতলব আছে মনে হয় ।

নটবর নৌকা বইতে বইতে বলল : মশার পেরোজন ?

অচেনা বিদেশী লোক বলে নটবর সাধু ভাষা প্রয়োগ করল ।

লোকটা নৌকার একেবারে গলুইতে এসে দাঁড়িয়েছে, নটবরের জবাব শুনে মোলায়েম সুরে বলল : ভাল মানুষের বেটা, কাছে আস । বড় বিপদ আমার, নৌকো কাছে আন ভাই ।

নটবর গলল না । দূর থেকে বলল : যা বলার আছে বলেন ! সময় নাই আমার গল্পো করবার !

নটবর বৈঠা ধামাল না ।

আশ্চর্য, এবারে লোকটা কেঁদে ফেলল। বলল : নৌকা যদি না ভেড়াও তবে আশ্চর্যাতী হব আমি। এই দেলাম লাফ—

—আরে—আরে, ও করেন কি, দাড়ান—

তাড়াতাড়ি নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এল বজরার ধারে। তারপর বলল : কি, কন কি ?

লোকটি কোনো উত্তর দেবার আগেই বজরার ভেতর থেকে মেয়েলিকণ্ঠ কে যেন বলে উঠল : কে—কে, বাইরে কথা বলে ? রামকমল ! ওঠ বাবা, দেখ আবার বুঝি বাইরে গেছে ! আলো জ্বালা শিগ্গির !

ভেতর থেকে আরও কটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল !

নৌকার ভেতর সাড়া পেয়ে বাবুটি একটা লাফ দিয়ে এসে নটবরের ডিকিতে পড়ল। ততক্ষণে ভেতর থেকে আলো নিয়ে দু'জন লোক এসে গেছে। একটি মেয়েও দৌড়ে বেরিয়ে এল। চোঁচিয়ে বলল : দেখ, দেখ, কোথায় লাফ দিল !

গলুইএর ধারে আলো নিয়ে এসে রামকমল বলল : ভয় নেই মা, বাবু এই যে এই ডিকিতে—

বাবুটি নটবরকে একটা ঘুমি মেরে বলল : এই তুমি কেয়া দেখতা হ্যায় ? জোরসে চালাও পানসী উল্লুক—চালাও—চালাও—

রামকমল এসে পড়ল ডিকিতে। তিনজনের ভারে ডিকি টলমল। এ আবার ক্যানাদে পড়ল সে !

রামকমল বাবুকে জাপটে ধরে বলল : ও বড়বাবু, রাতবিরেতে এসব কি কাণ্ড ! আসেন আমাগো বজরায় চলেন—

বজরা থেকে মেয়েটি কঠিন সুরে বললেন : এস, উঠে এস শিগ্গির। এখুনি ডুবে মরেছিলে আর কি !

পরে আর একটি ছেলের দিকে ফিরে বললেন : ওরে সতু, কার ডিকি জিজ্ঞাসা করত ? নটবর উঠে দাঁড়িয়ে বজরার চাল শক্ত করে ধরেছে নইলে নৌকা সামলাতে পারবে না। মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে সে বলল : আজ্ঞে মা-ঠারোন—নাম নটবর রিশী, শাকিন—পুনের বিল !

নাম ধাম বলে নটবর আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বলল।

বাবুটি বজরায় উঠে নটবরকে গালাগাল দিতে শুরু করল। রামকমল জোর করে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। মেয়েটি কিন্তু শাস্ত হাসি হাসছেন। বললেন : তুমি আজ বাঁচিয়েছ আমাকে নটবর। তারপর আঁচল থেকে কটা টাকা বের করে বললেন : এই নাও, ছেলেকে মিষ্টি দিও !

নটবর হাত জোর করে বলল : টাকা কেন ? না—না, ও নিতে পারবোমানে ঠারোন ! মুখ ফুটে বলিছেন তাই যথেষ্ট। বাই মা, পেরাম—

নটবর আর দাঁড়াল না। নৌকা ছেড়ে দিল।

মাধব ঠাকুরের খুঁট পুষ্প নটবরের মনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তার বাউণ্ডলে ছন্ডছাড়া জীবনে বিতৃষ্ণা ধরিয়ে দিয়েছিল সে। মন হাহা করে উঠেছিল কুসুদের জন্মে। পুতুনীকে দিয়ে ত্রিহীন সংসারে শান্তি কিরিয়ে আনতে ইচ্ছা হয়েছিল। এমন সময় এই নাটকীয় ঘটনা! মন ভরপুর হয়ে আছে অদ্ভুত এক কোঁতুহলে। ভদ্রলোকের ঘরেও এমন অপকল্প রূপ সচরাচর দেখা যায় না। ভৈরবের পারে গ্রাম শহরে অনেক ভদ্রলোকের মেয়ে দেখেছে নটবর কিন্তু এমনটি কখনো নয়। রাত শেষ হয়ে এসেছে মেটে জ্যোৎস্না সূর্যের প্রচ্ছন্ন আলোকে আরো একটু প্রখর হয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে খাল-বিল-নদী পারে কর্মচাকল্য নাই। বেলা হলে কিছুটা দেখা যাবে। সুস্তিমৌন নদীতীরে বৃহৎ বজ্রার উপর মহিমাময়ী এক রাজরানীর দর্শন যেন পেয়েছে নটবর। কে সে, কোথায় তার ঘর? বাবুটি কে তার? এত রূপের ভেতর এমন বিষয় মুখ নটবর আগে আর কখনো দেখেনি। অবস্থাপন্ন ঘরের ঘরনী হয়েও অসুখী কেন সে।

বৈঠা ঘরে ভাবতে ভাবতে চলেছে নটবর। বৈঠা বাইতে হচ্ছেনা, শুধু হাল ঠিক রাখলেই হোল। কড়া জোয়ারে নৌকা ছুটে চলেছে। খিরখিরে বাতাসে তন্দ্রার ভাব আসছে। নটবর কত কি ভাবছে,—চুলছে আর স্বপ্ন দেখছে।

ঘুমিয়েই পড়েছিল নটবর। অনেকক্ষণ গাঢ় ঘুমে অটুতন্ত ছিল মনে হোল। পর পর ক'রাত শরীরের উপর অপরিণীম অত্যাচার হয়েছে। দেহমন শান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতি তাই শোধ নিয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই চোখে মুখে গরম রৌদ্রের তাপ এসে পড়ল। ধড়মড় করে উঠে বসল নটবর। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ল জোয়ারের সুযোগ নিয়ে বৈঠা তুলে রেখে নৌকার পর শুয়ে পড়েছিল। উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। জোয়ার শেষ হয়ে গেছে। ভাটা এসে গেছে। বিলের ত্রিসীমানাও দেখা যায় না। বড় নদীতে নৌকা এক হোগলা বনে আটক পড়েছে। নটবর তাকিয়ে দেখছে। জোয়ারে নৌকা ভেসে এসেছে বিলের মুখ ছাড়িয়ে বহুদূর। ঐত ওপারে দেখা যায় বৌমারির ঘাট। বৌমারির ঘাটে এসে পড়েছে তবে সে—বাক্সা! হঠাৎ নটবরের মনে পড়ল বাড়ির কথা—অনেকক্ষণ বাদে আবারো মনে পড়ল পুষ্পর কথা, তারপর পুতুনীকে মন পড়ল। পুতুনীর খণ্ডর বাড়ি ত দামোদর। দামোদর আর এখান থেকে কতদূর! এই ভাটার ও নৌকা ছাড়লে তিন চার ঘণ্টা হয়ত নেবে! সেই ভাল, এতটা পথ যখন নিজের অজ্ঞাতে চলে এসেছে তখন বিধির ইচ্ছাই তাই। পুতুনীর খণ্ড বাড়ির উদ্দেশ্যে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিল নটবর।

[ক্রমশ]

প্রাকৃত সংলাপ

শিবশঙ্কু গাঙ্গ

হে খেতকরবী, তোমার তুলনা নেই,
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে ।

(ছত্তিশগড়ী গান : বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ)

অনেক ভিড়ের হকা । ট্রাম-বাস, কলেজের ক্লাসে
রাশিরাশি অঙ্ককার জুগে ওঠে রাশি রাশি চোখে ।
তারি ছায়া বিকলাঙ্গ চতুষ্কোণ ঘরটাতে হাসে ;
সময়ের প্রাণ যেন সুরকানা গানের সপ্তকে ।

এই যদি সব হয়, তবে কেন আজো কেউ কেউ
জাগায় ঘুমন্ত মন বৈতালিক অনুভব নিয়ে :
সমুদ্রের ভাষা পেয়ে অনেক ভিড়ের বোবা ডেউ
কথাময় হবে অঙ্ককার উপকূল ভেঙে দিয়ে ।
তবে কেন কেউ কেউ দুঃখের আঙনে পুড়ে গিয়ে

কবি হয়, শিল্পী হয়—দৃশ্যপ্রাণ, মাটির আত্মীয় :
সৃষ্টির প্রাস্তরে যার নিত্য ঋরে বাচার মৌসুমী ।
সেতো শুধু সবশেষে আছে বলে কিছু রমনীয়—
আকাশ, ফুলের হাসি যেখানে পেয়েছে পটভূমি,
তারি রূপচিত্র এঁকে । সেতো আর কেউ নয়, তুমি ॥

একটি মানুষের কাহিনী

সরিৎ শর্মা

বয়েস অনেক হোলো তবু তার জীবনের স্বাদ ফুরোলো না—
বয়েস অনেক হোলো তবু তার যৌবনের তাপ জুড়োলো না :

গাঁয়ের মাঠের থেকে পেরিয়ে শহর কত, মহানগরীর
জীবন-ভাঁড়ার থেকে আয়ুর ঐশ্বর্য নিয়ে, মহাসাগরের
আকাশ-দোলানো ঢেউয়ে ভাসিয়ে জাহাজ, কত বন্দরের ভিড়
দেখে দেখে, সে গিয়েছে ডাক শুনে অল্প এক মহানগরের,—

সে দেখেছে রাত্রি-দিন পৃথিবীর যতিহীন আদ্রিম আকাশ,
সে দেখেছে বছবর্ণ নদী-বন পাহাড়ের পৃথিবী প্রাচীন,
সে ছুঁয়েচে রোমে রোমে সব গন্ধ স্পর্শময় নিরন্তর বাতাস,
তার কাছে তরংগিত সব আলো অমলিন, ধ্বনি অসুহীন ;
কৃষাণ গাঁয়ের থেকে শ্রমিক বন্দর আর সে মহানগর—
উলংগ শিশুর আগ থেকে মুমূর্ষুর প্রাণে আকাজক্ষা অমর

সে দেখেছে : মানুষের বাঁচা তার হৃদয়ের অমরতাতেই,
সে কেনেছে, শরীর জরার দেশ—হৃদয়ের স্থবিরতা নেই !

ভয়

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শকুনছানার গলা আমাদের বাড়ির পিছনে ;
শতরক্ত মাঠে যেই সাক্ষ্য দূর হাওয়া ভেসে যায়
আশ্চর্য শব্দের লক্ষ স্রোতধারা বাজে একমনে
তরঙ্গিত ভীতিপ্রদ অন্ধকার আকাশে ঘনায় !

এহো বাহু এহো বাহু বলে আমি অনেক বছর
কাটিয়ে দিলাম, আর সেতুবন্ধ বেঁধে নিয়ে একা
তাত্রপর্ণী দেশে গিয়ে খুঁজি যেন স্বর্ণরোপ্যপূর্ণ বাসুচর
প্রেমের অন্তরা তাতে আভ্রপ্রেত, কিছু দেখা কিছু-বা অদেখা !

অস্থির তবুও থাকি, স্বভাবজ, চিন্তামনোহারী
জীবন সমুদ্র যদি তবু তাতে প্রাণঘাতী ঢেউ—
নিত্য বাঁচি ভয়ে ভয়ে, রোগ শোক হুঃখ মহামারী
ব্যথার মলিন ছন্দে ভাঙা তরী তবু ভাসবেও !

আমিও ত বৃদ্ধ হব, বেঁচে থাকবো মনছোড়া ভয়ে
যে-ভয় প্রারম্ভে শুরু শেষাবধি তার ঐকতান
শকুনছানার কণ্ঠে কেঁদে যাবে, পরম বিশ্বয়ে
আমি ভাবি আমি তবে শৈশবের নিশ্চর সমান !

আমার সাক্ষ্য শুধু—রৌদ্ররাগে দারুণ যন্ত্রণা
প্রশমিত সূর্যমুখা যেন এক মন্ত্র নত মুখে
দেখেছে অনেক কিছু বিচিত্র ও বহুল করুণা—
স্বতি হয় ইতিবৃত্ত পোড়ো বাড়ি যেই পড়ে রুঁকে ।

আচ্ছন্ন আকাশ থেকে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

সূর্য জ্বলে দেয় জীবনের
অশেষ আকাশ
ঢেউ ভরিয়ে তোলে গাঙের উচ্ছ্বাস
আদলে জাগিয়ে তোলে খলখল হাসি
নিঃশব্দে এগোর অরণ্যের মৌন মিছিল

সূর্যকে জাগিয়ে দেয়
ভোরকে ডাকে
পূর্বদিকে মুখ-করে দাড়িয়ে-থাকা
বহুদিনের অস্থির অপেক্ষা
আবার অবাক গোধূলিতে
অন্তোন্তীর্ণ পশ্চিম তীর
দিগন্তে মিলেয়
প্রান্তরে সাগরে

বহুদিনের এ-প্রতীক্ষা তীব্র-ভাবময়
ধমনীর উত্তাল রক্তস্রোতে
সহস্র প্রপাতের গর্জন
বহুদিনের এ-প্রতীক্ষা বিয়ে
কতো স্বপ্ন কতো উফতা কতো ঐচ্ছল্য
প্রাণের নিকড়তায়
অস্থির এ মুহূর্তগুলি
বহুদিনের

কোনো সুন্দরীর বিহীন উন্মেষ
কোনো শিশুর টলটল ভাষা
তার পক্ষের কোটার আবেগ
জামার গর্ভে আচ্ছন্ন
তার বেরিয়ে আসে দিনের আলোয়
তার ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আলোকে
তখন অনন্ত নীল জুড়ে শুধু প্রচণ্ড তাপের বিক্ষোভ

আবার কখন আকাশ নীলে
কুলকুল গাঙের উচ্ছ্বাস
সারাটি আদল জুড়ে থলথল হাসি
আর অরণ্যের মৌন মিছিল
মাটির আকাশে সবুজ শ্রবণের মতো
ভাস্বর ।

উৎস

অরুণ শুভ

সামনে ধূসর পাহাড় তুলেছে উদ্ধত মাথা
পাথুরে জমির রুম্ম এ পথে হাঁটতে
পায়ের জালা ধরে,
সপিল পথে কাঁটাবন ঘন
জঙ্গলে সাপ, চিতার হিংস্র চোখ জলুক
আমি হেঁটে চলি স্মরনী বরনার সন্ধানে।

সামনে ধূসর পাহাড় দাঁড়িয়ে উদ্ধত মাথা নিয়ে
ঘন জঙ্গলে ছুঁগম তার পথ
আমি খুঁজে মরি এক মুখ হাসি নন্দিনীকে
ঝির ঝির গানে সুর ছড়িয়ে
যেখানে খুঁজছে ব্যর্থ আকাশে একটি আলোর ফুল।

সামনে ধূসর পাহাড় তুলেছে উদ্ধত মাথা
কাঁটাবনে বেরা বন্দীশালার
বন্দীক রছে তাকে,
আমি খুঁজে মরি ঝির ঝিরসেই
উৎসের মুখখানি।

তিনজন মোহিত চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সুচির আঁধারে কী করুণ এই আত্মগোপন !
কতদিন সেই নীল কালিন্দী রাতের শরীর
দীর্ঘ-যুগলে ভোরের কমল দেখিনা, শুনি না—
রাত্রি তো নয় কৃষ্ণের বাণি : যে সূরে তিমির
ভেঙ্গেচূরে আসে শুভ্রশরীর গোপিনীর রূপ ;
তমালে যখন রোঁজের ফুল, তুণে জলে ধূপ ।

কতদিন সেই সাগর দেখিনা যেখানে হৃদয় প্রতীকে নিত্য
প্রতিমূর্ত্তে নদীর সৃষ্টি ;
যেখানে অরূপ কমলে স্বপ্ন,
হৃ-চোখে প্রদীপ : অলোকদৃষ্টি ।

হাজার হাতের মিলনে আবার বলোনা কখন
আকাশে তুলব রূপ-প্রমূর্ত্ত মাটির ভুবন ।
সুচির আঁধারে কী-করুণ এই আত্ম-গোপন !
আলোর সংগী ছোট এক পাখী তবুও নিত্য
উজ্জল স্বরে ভরে আনে মেঘ, আলোর রক্ত
পালকে ফোটার পৃথিবীর ফুল, রোঁজ দীপ্ত ।
এক-ই ঘর তবু তার মেঘে নেই আমার সঙ্গ !

॥ দুই ॥

আর সেই যুগ : অন্ধকারের গভীর দুঃখ
ভেঙে ভেঙে যাকে ভংগুর তবু
জ্যোতির শিল্পে নিত্য সাক্ষী
তারো ধূলা বং ছায়ার শরীর এই ঘরে ভাজে !
দুই হাতে খুঁজি তার মৃত মন—
অন্ধপ্রদীপ বসে : নাই-নাই !

সেই ছোট পাখী তাকে বলি তাই,

তুমি তো সাক্ষী

বলো তো কী করার আছে ? সূচির আঁধার

তার ঘরে তুমি তবু কী বলেছ আলো বিনত পৃথিবীর কথা,

শাস্ত স্বরের হাঙ্গা নৌকায় আজো কি খুলেছ মিথ্যে দুরার ?

॥ তিন ॥

ছোট পাখীর দু'-চোখে হয়ত এখনো অতল

নিহিত-কল্প সূর্যের স্রোত ; ডানার মুখে রোদুর মেঘ

বৃষ্টির শব্দ সব কিছু ফিরে গেছে রেখে জয়

তাইতো চোখের স্বচ্ছ প্রদীপ ছিন্ন-তিমির তার সে আবেগ !

ধীর-চোখে ছুই পাখীর শরীর

ঘুমের দীঘির জল ভেঙে জাগে

তার ফোটা-খুশি অরূপ-কমল ।

খুলে ফেলে চোখ—সোনা-রূপো কাঁপি :

দিনের রোজ হীরে ছরে আছে । ক্লান্ত তিমির

মুছে দিয়ে ভাবি—কাল ভোরে যাব আমিও সূদূর

পাখীর আগেও ছুয়ে দেব মেঘ, সূর্যের সুর ।

॥ চার ॥

পথে বেড়োতেই ভোরের শংখ হাতে তার ছবি,

মৃতসুর মুছে অন্ধকারের সেই চেনা মুখ :

দু চোখে দ্বিগুণের কাস্তি ;

পুল্লিত ঘন ভূণের তীর্থে চূড়াল স্বর্ণে ঘেন মন্দির ;

শাস্ত বকুলে নির্জন সিঁড়ি ; শিশিরে শাস্তি ।

তার খুশি তাও বিলোল মালিনী—

পায়ে পায়ে তার জলতরংগ :

ঐ ত আমার পথের চিহ্ন,

ঐ ত আমার স্রোতেরো অংগ ॥

কবিতা-পাঠে আপত্তি কেন

সুধারচন্দ্র রায়

কবিতা সম্বন্ধে সমালোচনা আমরা পড়লেও পড়তে পারি, কিন্তু কবিতা যে পড়ি না একথা খুব তর্ক ক'রে বোধ হয় বোকাতে হয় না। কবিতা পড়ার-মতো করে হয়ত পড়ি, কিন্তু আগ্রহ নিয়ে, আনন্দ নিয়ে যে কবিতা খুব পড়ি না—একথা প্রায় স্বীকৃত। ‘কাব্য-টাব্য আমার আসেনা’—এই আশ্চর্য্যের মূল কারণ—কবিতার প্রতি সাধারণের মনের উপেক্ষা। পঁচিশ-বৈশাখ আর বাইশ-শ্রাবণ তারিখ-ছোটোর দিকে হয়ত কেউ-কেউ নজির হিসাবে, এ-মতের বিপক্ষে, দৃষ্টি দিতে পারেন—কিন্তু আর একটু গভীরভাবে দেখলেই দেখা যাবে ঐ ছোটো তারিখের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ অন্তর।

কবিতার প্রতি এই উল্লাসিকতা কেন—বুদ্ধিমান পাঠকেরা তার অনেক কারণ প্রবাদ-বাক্যের মতো প্রচলিত ক'রে দিয়েছেন—কিন্তু তার মধ্যে যুক্তি যে খুব বেশি নেই তা সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারেন।

রস নিয়ে তর্ক থাকুক ; রস-তর্ক অত্যাশ্রম মনে করি না, কিন্তু অশ্রম হয়েও তর্কটা বড় ভারী। রস ছাড়াও কবিতার আরো সাধারণ গুণ আছে, এবং তারই জোরেই আগ্রহী কবিতা-পাঠকের সংখ্যা-বৃদ্ধির আশা আমরা করতে পারতাম।

কবিতার একটা বড় গুণ তার শব্দ-চয়ন। কবিতায় প্রযুক্ত মানানসই শব্দ আর তার সম্বন্ধে ব্যবহার সমগ্র ভাষা আর সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে। মনের চিন্তাকে সংক্ষেপে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ভাষাব্যবহারের একটা বড় গুণ। এই গুণটিই কবিতাতে দেখতে পাই। নিতান্ত তুচ্ছ কবির নিকৃষ্ট কবিতার মধ্যেও লেখকের এই বৈশিষ্ট্য আর দান একটু ঠাহর করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পের মধ্যে যুক্তি প্রধান হলেও কবিতার মধ্যেই সেই যুক্তি সূক্ষ্ম। গল্পের যুক্তি মস্তিষ্কের আয়ত্তে, কিন্তু কবিতার যুক্তি যেন সমগ্র শরীর-বুদ্ধি-আবেগকে অনুরণিত ক'রে তোলে। মধুসূদনের কবিতায় শব্দের যে-শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র অজ্ঞাতসারে সেই শক্তিকে যে জাগ্রত ক'রে গেছেন এমন প্রমাণ বঙ্কিম-সাহিত্যে দুর্লভ নয়। কবিতার পদক্ষেপ একটু আগে-আগে। একজন ইংরাজ কবির একটা কথা তুলে ধরি। তিনি বলছেন, “আমাদের কাব্যের শুরুতে অশ্রু কোনো অশ্রু নেই আছে শুধু শব্দের প্রতি ভালোবাসা আর বিশেষ-ধরনের মন-মেজাজ।” আর-একটু অগ্রসর হলে এই শব্দ-প্রেম প্রতীকতার প্রতি বুকে পড়ে। সমাজ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকতার মূল্যমানের অদল-বদল হয়। বলতে বাধা নেই, বর্তমানকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই তৃতীয় স্তরেই উন্নীত হয়েছেন ; শব্দ-ধ্বনির দিকে শব্দের সংগীত রূপায়নের দিকে নজর দিয়েছিলেন

বুদ্ধদেব বস্তু। আরো অনেকের নাম করা যেত, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এই প্রস্তাবনা করা খুব সমীচীন হবে বলে মনে করি না; কারণ বক্তব্য আমাদের অন্তঃ।

কবিতার একটা সুর-ও আছে। বক্তৃতার চেয়ে তা স্থায়ী আর বাস্তব। এই সুরটি চেয়েছিলেন বলেই গিরীশচন্দ্র নতুন ছন্দ বাধলেন; মাইকেলে তার চলল না। বিহারীলাল নতুন পথ কেটে উঠলেন নতুন সুরটিকেই ধরতে। আমাদের মন কোনো সময়েই আবেগবিহীন নয়। কবিতা সেই আবেগকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ক'রে ফুটিয়ে তোলে। সে আবেগ প্রত্যক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত আর নিশ্চিত। যে-কোনো কবিতাতেই এর কিছুনা-কিছু পাওয়া যায়-ই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ইঙ্গুলের ছেলেদের কবিতার মধ্যেও এর অনেকটাই দেখতে পেরেছি। হয়ত তা এলোমেলো, হয়ত অস্পষ্ট কিন্তু তা ধর্মচ্যুত নয়। কেমন ক'রে যে ফুল ফুটছে, কেমন ক'রে চিন্তা জন্ম নিচ্ছে, জীবন বিকশিত হচ্ছে—সেসবের ছবি ওদের কবিতায় এমন মন্থর ভঙ্গীতে এসে দেখা দেয় যে, না-দেখে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ওদেরই প্রবন্ধের মধ্যে দেখি যুক্তির নেশা, প্রকাশের দ্রুততা, কৃত্রিম বিভ্রা-বস্তুর ভার ওদের আসল মনকে অনেকখানি চাপা দিয়েছে। কবিতা যেন আত্ম-বিকাশ আর গন্ত্য আত্ম-কণ্ঠস্বর। কবিতায় আছে প্রেরণা, গন্ত্যে আছে আরাম বা স্বস্তি।

গন্ত্যের চেয়ে কবিতার আর একটু স্বাভাব্যতা আছে। গল্প বা উপন্যাসে লেখকেরা একটা পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তোলেন। সংগীতেও তাই-ই দেখি। এই উদ্গ্রাহ-ই বৈষ্ণব সংগীতে অনেকটা 'গৌরচন্দ্রিকার' মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিবেশ সৃষ্টি করবার হেতু পাঠকের মনকে লেখকের 'ভাবে' আত্মস্থ করা। গল্প বা উপন্যাসে এর যথেষ্ট পরিসর। অনেক কৌশলে এই পরিবেশ বুননের কাজ চলে। কিন্তু একই লেখক তাঁর ভিন্ন ভিন্ন লেখায় বিভিন্ন রকমে পরিবেশ সৃষ্টি করেন। অনেকটা সময় তাঁর হাতে থাকে বলে পাঠক অনেকটা সময় নিরে মনকে প্রস্তুত করে। কবিতায় কিন্তু কবি একেবারে মর্মে ব'সে এই পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কবির হাতে কোনো সময় নেই; তাঁর আছে সংযম আর ভাব-নিয়ন্ত্রণ। পাঠককে এইদ্রুত প্রস্তুত থাকতে হয়। কবির চেষ্টা ছাড়াও পাঠককে নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে হয়। এইজন্যই কবিতা পড়তে গেলে সেই কবির কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটিয়ে নিতে হয়। কবির-ও দরকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। বহু কবির বহু-কবিতা সংকলন গ্রন্থ এইজন্য খুব কাজের হয় না। একই কবির বহু কবিতা একত্র পাওয়ার দরকার।

এইখানেই কিন্তু একটা কারণ র'য়ে গেল কবিতা-বিরূপতার। বর্তমান কাল এমন ছেঁড়া-ছেঁড়া জীবন-যুহুর্ভের সমাবেশ যে হঠাৎ কবিতা পড়তে বসব এমন মন পাইনা। অভ্যাসের তিষ্ঠিতে ঠায়ে ব'সে বহুদিন ধ'রে পড়ে আসতে হবে। গানের 'ত্রুণ' অংশ এই ক্ষেত্রেই সার্থক।

কবিতা-না-পড়ার আরো কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এই প্রবন্ধে আমি বিশেষ ছোটো কারণ উল্লেখ করতে চাই।

কবিতা-পাঠের আপত্তির একটা বড় কারণ আমাদের বিদ্যালয়-পাঠনার ক্রটিতে আছে। ইন্সলের শিক্ষক আর কলেজের অধ্যাপক অল্প ন'ন, কিন্তু বিজ্ঞ। তাঁদের বিজ্ঞতা কবিতাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তাকে গন্ধে আর ব্যাখ্যায় পরিবর্তিত করে। গন্ধকরণ আর মোক্ষম-শব্দ (Pivotal words) পাঠনার একান্ত কর্তব্য হয়ে যায়।

অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কথা বাদ দিয়ে বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কথাই বলি। এঁরা পেন্ডালংকী-শিখ হার্বার্ট সাহেবের পঞ্চস্বকী বা ত্রিশুর পদ্ধতির পক্ষপাতী। কবিতাকে মুড়িয়ে মুড়িয়ে, ভেঙে ভেঙে, নস্যা কেটে কেটে হার্বার্ট সাহেবের পদ্ধতির ছাঁচে খাপ খাইয়ে তাঁরা চলে থাকেন। এতে ক'রে কবিতা বেশ 'কঠিন' আর 'পাঠ্যোপযোগী' হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কবিতায় ছাত্রদের আর আগ্রহ থাকে না।

আর এক ধরনের শিক্ষক আছেন যারা ফ্রয়েব্ল-মন্ডেসরী-ডিউদে তত্ত্বের পরিপোষক। কবিতাকে ছেলেদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ব্যাখ্যা দ্বারা পড়িয়ে থাকেন। এঁরা বিকাশবাদী। কিন্তু এ বিকাশ যে স্বল্প অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে ঘটছে সে-কথা এঁরা বুঝতে চাননা। কবিতার অভিজ্ঞতা অনন্ত। আর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর মিল নেই। কবিতার শব্দ-প্রয়োগ ছন্দোময়মা, তরঙ্গায়িত চিন্তা-স্রোত, সংঘত রূপটান—দিনের কাজের কোন্ অংশটার সঙ্গেই বা মেলে। হয়ত প্রতিরূপ (Image) আহরণ তারা করতে পারে, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-বোধও তাদের মনে জন্ম নেয়, কিন্তু তারও বাইরে যে কাব্য-ব্যঙ্গনা। সেই সামগ্রিক-প্রভাব বরঞ্চ আর অভিজ্ঞ শিক্ষকের মারফৎ-ই তারা জানবে। বেশি কবিতা-পড়ার অভ্যাসই কবিতা-উপলব্ধির একমাত্র সরল পথ। এই অধিক-কবিতা পাঠের আগ্রহ শিক্ষকই সঞ্চার করবেন। আবার, শিক্ষক যখন কবিতা অতীত হয়ে ওঠেন তখনো কবিতায় আগ্রহ থাকে না। এই কবিতা-অতীত শিক্ষকই কলেজের অধ্যাপকের মনোবৃত্তিতে। সেখানেও কবিতা ব্যর্থ হয়ে যায়। বেশি আলো যে অধিক আলোক সৃষ্টি করতে অক্ষম তা বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-সম্পাতের তরঙ্গ-গতি-ধর্মিতা দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন।

অভ্যাস-গঠন আর মুক্ত-করণ নিশ্চয়ই এক কথা নয়। আবার, অভ্যাসের অন্ধ-আবর্ত রচনা শূন্য-অভ্যাসের পরিচায়ক নয়। এইসব দিকে নজর রেখেই আমরা হার্বার্ট-সাহেবের পদ্ধতি আর বিকাশ-পদ্ধতি অনুসরণ করব। আসলে, ঐ দুটো পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাগ করতে বলছি। শিক্ষাবিদেয়া রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছেনে বলছি, রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি কবিতা-পাঠের সত্যিই সহায়ক। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা পূর্বের লেখা থেকে তুলে দেই। কবি ডে-লেউইস বলছেন, “আমরা উপলব্ধির অন্ত্রে লিখি, কবিতা-বোঝাবার ক্ষমতা নয়; তবু, যত ভালো ক'রে কবিতা লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে পরিণামে ততই কবিতা নিজেকে বোঝাতে পারে।”

শিশু-পাঠক কবিতার শব্দ আর ছন্দে নিজের প্রেরণাতেই আকৃষ্ট হয় তারপর দিন যায়, সে ক্রমেই কবিতার মধ্যে নিজকে দেখতে পায়। এই ‘দেখতে-পাওয়া’-টুকু ফুটিয়ে তোলার কর্তব্য শিক্ষকের। শিশুরা প্রথমে যে ছড়া আওড়ায়-তার মূল প্রেরণা আছে

নিজের মধ্যে। প্রথমে তারা ভাষা ব্যবহার ক'রে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষা সমাজীয় ক'রে তোলে। ভাষার এই সমাজীয় দিকটির দিক আমাদের নজর থাকেনা ব'লেই ইহুঃল কবিতা-পাঠনার আমরা অক্ষম হয়ে পড়ি। এমনি ক'রে ছোটবেলা থেকেই আমরা পাঠককে কবিতা বিমুখ ক'রে তুলি। ঠিক যেন, আট নয় বছর বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েরা কবিতা-নিষ্পৃহ হয়ে উঠে। এ দোষ কেবল আমাদের দেশের ইহুঃলে নয়, ইংল্যান্ডেও এই দোষই বর্তমান। তবে, তারা এই নিয়ে চিন্তা করে, ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আর, আমরা হয়ে পড়ি সাংখ্যের পুরুষ।

কবিতা-বিমুখীকতার দ্বিতীয় কারণ আছে কবি-দের কুপণতায়। মানসিক স্তর অনুযায়ী কবিতা আমাদের দেশে লেখা হয় না। টেনিসন বা ডে-লেউইস-এর মতো কবি আমাদের দেশে দেখতে পাইনে। শিক্ষক-কবিদের মধ্যে আছেন কালীদাস রায় আর কুমুদ রঞ্জন মল্লিক। কিন্তু তাঁদের কবিতাও যে সর্ব স্তরের পাঠনার উপযোগী এমন কথা স্বীকার করতে পারিনে। আমাদের দেশে শিশুদের জন্যে আছে ছড়া আর সেখানেই কবিতার রসের পরিসমাপ্তি। তারপরের কবিতা (ওদের উপযোগী) যেন প্রবন্ধ হলেও চলতে পারত। নজরুলের 'বাবুদের তালপুকুরে' (লিচু-চোর) কবিতাটি খুব চ'লে থাকে। কিন্তু বেশি চলে বলেই মনে হয় ঐ ধরনের কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। সুনির্মল বসু সত্যিই শিবরাত্রির সলতে। কিন্তু তারপরের স্তরের কবিতা কোথায়? পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোন উপযুক্ত কবিতা-গ্রন্থ (যা বর্তমান বয়স্ক কালের কাবতার যোগ সাধন করতে পারে) সত্যিই পাওয়া যায় না। দশম শ্রেণী থেকে বি-এ ক্লাস পর্যন্ত কবিতার পার্থক্য রাখা হয়নি; শুধু শিক্ষক আর অধ্যাপকের জ্ঞানের পরিধির যেটুকু মাত্র ব্যবধান। মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এদের মধ্যে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সত্যি ক'রে বলতে গেলে, ঠিক এদের মধ্যে কি তাঁরা লিখেছেন? তা ছাড়া, যুগ অনুযায়ী কবিতার-ও মূল্যমান বদলে যায়। ওদের কবিতা বর্তমানকালের কবিদের সঙ্গে কতটুকু যোগসাধন করতে পারে? বর্তমানকালের মধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথকে ব'রে নিয়েই বলছি। বহু কবির লেখা থেকে সঞ্চয়ন ক'রে শিশু-কিশোরদের উপযোগী কবিতা আমরা সংকলন করতে পারি সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে ক'রে কি কাব্যে আগ্রহ জন্মানো সম্ভব? যে-কবিকে তাদের ভালো লাগল তাঁর মনোবর্ধের সঙ্গে মিল করিয়ে দেওয়া আগ্রহ-সঞ্চারের একটা বড় উপাদান।

কথা উঠতে পারে, এমন ধরনের কবিতা-গ্রন্থের চাহিদা বাজারে নেই। কেউ কেউ বলবেন, "আমরা যে অতি-বর্তমান কালের। আমাদের নাম ছাপার অক্ষরে ওঠা শিক্ষা অধিকর্তাদের মনঃপুত নয়।" এসব কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তবু দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ধরুন, কোনোরকমে শিক্ষক সক্ষম হলেন ছেলেদের মনে আগ্রহ জন্মাতে; কিন্তু তারপর তাদের মনোবর্ধ অনুযায়ী কবিতার বই হাতে তুলে দিতে পারা গেল না। ছেলেদের মনে যে-মুহূর্তের সৃষ্টি করা গেল—এমনি ক'রে বইয়ের অভাবে তা

গেল উবে। আমি কিন্তু মানসিক-স্তর অক্ষুণ্ণ কবিতা-ক্রমের কথাই বলছি। অবশ্য, লিখতে চাইলেই আর লেখা যায় না। শিরালশায়ুক-রত্নীনপরী ব্যবহার করলেই যেমন শিশুদের কবিতা হয় না, 'আগে ঝলমল' ব্যবহারেও তেমনি কিশোরদের কবিতা হয় না। এ বেপরোয়া বয়স নামানো মনের পরিচয় বহন করার কিশোর সাহিত্য যেমন ব্যর্থ হয়েছে, কবিতার বেলাতেও হয়ত তাই-ই হবে। কিন্তু তবু বলব, কিশোর-সাহিত্যের সে ক্রটি বোধ হয় বর্তমানে অনেকটা কেটে আসছে। আধুনিক কবি-প্রতিভা যদি এমনি নানা ক্রটির মধ্য দিয়েও আসেন তবু বলব বাংলা কবিতার আয়ুর্জিহ্নর সম্ভাবনা রইল। শুধু চাই, রাতারাতি যশ অর্জনের প্রলোভন একটু কমানো !

একটি অবিম্বরণীয় দিন

কাজটা মনে হয় ছতোমের দ্বারাই সম্ভব। ‘নক্সা’-রচয়িতা ছতোম। মঃ বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ-এর কলকাতা পরিদর্শন উপলক্ষে যে ধুমধাকা হল, তার একমাত্র তুলনা, বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা ; তাও আবার যদি চারদিনের পূজা মাত্র ছোটো দিনে ঘনীভূত করা যায়, তবে। সেকালের দুর্গাপূজার নিখুঁত কথাচিত্র এঁকেছেন ছতোম ; সুতরাং একমাত্র ছতোমের দ্বারাই বোধ করি সুবর্ণিত হতো। এই অদ্বুত ও অদ্বিতীয় ঘটনার সঠিক ও সঠিক বিবরণী।

দুর্গাপূজা বললেও যে দোষ কোথায় তা তো বুঝি না! দু’দিনের রোশ্‌নাইএর জন্মে পক্ষকালের আয়োজন, সপ্তাহভর উৎকর্ষা, বৎসরব্যাপী আকাংখা। সেই-যে কবে নেহেরুজী রুশিয়া গিয়েছিলেন আর বলেছিলেন মঃ বুলগানিনও বদলী সফরে আসবেন—তখন থেকেই মানুষের আশা, একবার দেখবে এই কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রীকে। রাশিয়া বলতে যারা প্রভাতকুমারের ভাষায় ‘Ignorant বা অজ্ঞান’ তাঁদের তো কথাই নেই, যারা রাশিয়ার নামে রাগে রি-রি করেন, দেখা গেল, তাঁরাও যেন খেজুর খেতে খেতে দিন গুণছেন ; আজ ২১শে আর আটদিন ; আজ ২২শে আর সাতদিন। ঠিক যেমন দিন গোণে ছেলেমেয়েরা মহালগ্না থেকে পূজার ‘উঃ কি মজা’ স্বরণ করে, আর যেমন একই কারণে গানের কণ্ঠেই সজল চোখে আঙ্গুল গোনে। ঠিক তেমনি।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়, কর দ্বরা কর দ্বরা। ওরা দিল্লী পৌঁছে গেছেন সুতরাং আর দেরী নয়, তাড়াতাড়ি কর। বন্ধ কর খাটখন্দ, দূর কর আবর্জনাস্তূপ। গরম পিচ আর বালি দিয়ে রাস্তাকে কর মোলায়েম। তারপরে দাও আল্পনা। রঙ দিয়ে ব্রিককে কর নুতন, বাড়িগুলো চক্‌চকে। টিমলাইন্ড বুইকটা ‘পার্ক’ করিয়ে কেউ-বা বউবাজারের বড় গয়নার দোকানে পাথর-বসানো পেন্ডেন্টএর অর্ডার দিয়ে যায়—২২ তারিখে চাই কিন্তু। আবার বেলগাছিয়ার ‘আরতি লগ্নী’তে যে তার সব-ধন-নীলমণি ভাল কাপড়-সাঁটটি ‘আর্জেন্ট’ দিয়ে গেল, তারও চাই ঐ ২২শে।

সস্তা রূপোপজীবিনী শাসালো ধরিদার পেলে যেমন দিশেহারা হয়ে সারাসক্ষে সাজগোজ করে কলকাতাও তেমনি করে সাজছে। পুরনো জংঘরা টিনের ভাঙ্গাচোরা বাড়িগুলো চুণজল দিয়ে সাদা করা হল রাতারাতি। খড়খড়ে বারান্দাগুলো কাঠ দিয়ে ‘রিপিট’ করা হল। সাদা সাদা রঙ-করা বাঁশ পুতে তাদের মাথায় বসানো হল রঙীন চুবড়ী, খড়খড়ে নারকেল পাতার মধ্যে ছুটি-একটি ভাব দিয়ে খাওয়া দেওয়া হল লটকে। ভেরুদা আর লাল পতাকার পতাকার লোকে চোখে পতাকা-ফুল দেখতে লাগল। যে রাস্তা রাত্রে ছেলে বুড়োকে ভুতের ভয় দেখাত তাও নীল লাল বেগুনী আলোর চুম্বকিতে চিক্‌চিকিয়ে উঠল।

মঞ্জুলিকা সেন পাটনা থেকে টেলিগ্রাম করেছে—Coming by Toofan on 29th। পুরী এক্সপ্রেস ফিরতি পথে গাড়ী বোঝাই ‘ভীর্থযাত্রী’ আনছে—বুলগানিন বেকটক যাচ্ছেন না। বৃদ্ধা ঠাকুরা সিট রিজার্ভেসন পেয়েও কানী যাওয়া স্থগিত রাখলেন—দুদিন পরে গেলেই বা ক্ষতি কি! বারান্দার দাঁড়াবার ক্ষেত্রে ‘কনকিডেন্শিয়াল এণ্ড প্রাইভেট’ টিকিট বিক্রী করে বেশ কিছু কামিয়ে নিলেন অনেকে। যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ-এর হোমরা চোমরারা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—ওঁরা নাকি আসছেন আপনার সাকুলার ঘরে, হায় কি অবিচার! শুধু কি এই? কত রকম অশ্রুতপূর্ব কথাও তো শোনা গেল: দেখুন, আপনার বাড়ি বেলগাছিয়া বোড়ে বলেছিলেন না?...আরে, ঘোড়া-হাঁসপাতালের গায়ে তাতে হয়েছে কি, আপনি তো আর হাঁসপাতালের পেসেন্ট নন মশাই! হেঁ হেঁ!...যাক শুনুন, আমরা যাচ্ছি কিন্তু আপনার বাড়ি ২৯শে। বৌদীকে বলবেন—ইত্যাদি।

আজ রামের অধিবাস, কাল রামের বিয়ে। সাজসজ্জার উপর ফিনিশিং টাচ দেওয়া হচ্ছে। মানসরাত্নের কনুকে ঠাণ্ডাতেও মজুরগুলো বাসছে। উপায় নেই, সময় মাত্র ঘণ্টাকয়েক। ফাইলের আওয়াজ যেন খন্খন্মে রাত্তিকে চিরে চিরে দিচ্ছে। পাইপের বেড়া দেওয়া হচ্ছে রাস্তার কোণে কোণে। আগ্রহের চোটে ছুটপাথের অ-নির্দেশিত বেড়া যদি ভেঙ্গে ফেলে মানুষ, তাই।

অবশেষে ২৯শে নভেম্বরের সকাল হলো। বাড়ির কর্তা কাল সন্ধ্যাতেই বাজারটি সেরে রেখেছেন সকালের কাগজ নিয়ে গুলুতানি করবার ক্ষেত্রে। আজ তিনি ‘সিক’ করবেন এ নিশ্চিত। সুতরাং কাপড়ের খুঁটটি গায়ে দিয়ে আড্ডাতলার দিকে পা বাড়াতেই গৃহিণী খন্খন্ করে উঠলেন—আপিস ডুব দিচ্ছ বলে যে একটায় ভাত খাবে সে চলবে না। আমরাও বেরুব ১০টায়—টে পি, আমি, সোনা আর রানু। ও বাড়ির পিসিমারা যাচ্ছেন, ওদের সঙ্গে। পুলের উপর দাঁড়িয়ে বুলগানিন দেখব।

সব বাড়িতেই তাই। ফোঁটা ফোঁটা করে মানুষ জমছে রাস্তার, বারান্দার, ছাদে। মায়েরা কোলেরটি কাঁখে নিয়েছেন অস্ত্রটিকে নিয়েছেন হাতে। মেরেকে বইতে দিয়েছেন ছেলের দুধ। ১০টা থেকে ২টো—সোজা কথা নয়। খিদের চোটে চেঁচাতে শুরু করলেই হয়েছে! আর দেখা হবে না!

তিনি আসবেন, তাই রাস্তার আল্পনা। তিনি আসবেন, তাই মঙ্গলঘট ও আত্মপল্লব। তিনি আসবেন, তাই ফুল ও সাজাঞ্জলির সংগ্রহ। তিনি আসবেন তাই অলিন্দে অলিন্দে উলু আর শঙ্খধ্বনি। আসবেন কোথায়, তিনি যে আসছেন! ঐ তো পতাকাগুলো পতপত করে নড়ে উঠল; ঐ তো সহস্রবাহু সমুদ্রের মতো হাতগুলো আন্দোলিত হলো, করতালিতে মুখরিত হল দিক।

কেউ বা আশীর্বাদ মাগল, কেউ বা পদধূলি নিতে হাত বাড়াল। মহাষ্টমীর পূজালগ্নে
এয়োত্রীরা যেমন আকুল হয়।

‘কে আসছে বাবা, বলনা। ও বাবা—’

‘বুলগানিন’।

‘কই?’

‘ঐ যিনি মোটরে বসে চলে গেলেন’।

শিশুর চোখে অবিশ্বাস আর বিস্ময়। বুলগানিন কোথায়, ও তো মাগুষ।

অঃ মঃ

২৯শে নভেম্বর

মহাবীর সিদ্ধার এসেছিলেন, দেখেছিলেন তবে জয় করেছিলেন—ভিনি, ভিডি, ভিসি। কিন্তু
রাশিয়ার নেতৃত্ব নিশ্চয়ই সিজারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তা না হলে, কলকাতাবাসীদের
চোখে দেখার আগেই হৃদয় জয় করলেন কি করে?

৩০শে নভেম্বর ময়দানের জমায়েত লক্ষ্য করে পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন—এমনটি হয়নি,
হবেও-না। পণ্ডিতজী ব্যক্তিগতভাবে কবিপ্রকৃতির এবং কিছু ভাবপ্রবণও বটে; মাঝে মাঝে
অতিশয়োক্তি তিনি করেনই। কিন্তু ঐদিন যে মন্তব্য করেছেন, তা উচ্ছ্বাসদোষহীন নয়।
কত লোক যোগ দিয়েছিল ময়দানের মিটিংএ? রাম-শ্যাম-যদু গণনাকে গণ্য না করে
নামকরা খবরের কাগজের শীর্ষলেখাগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন, কেউ কারুর
সঙ্গে ঐক্যমত নন। কেউ বলেন বিশ লক্ষ, কেউ বলেন পঞ্চাশ লক্ষ আবার কেউ কোটি
বলতেও ইতস্তত করছেন না। সঠিক সংখ্যা কেউ বলেননি, বোধ করি, বলা সম্ভব নয়
বলে। সমগ্র বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড ও ময়দান জনময়ুজে পরিণত হয়েছিল এই কথা
বললেই যেন নির্ভুলত্ব পৌঁছানো যায়! এসব সত্ত্বেও আমি বলব ‘ন ভূতো ন ভবিষ্যতি’র
প্রশংসাপত্রখানি ২৯শে নভেম্বরের প্রাপ্য। এটি লাল কালিতে দাগ দেওয়ার মত দিন—শুধু
বাংলার দেওয়ালপত্রীর নয়, ভারতের তথা সারা বিশ্বের।

মঃ বুলগানিন ও ক্রশ্চেভ সত্যিকারের সম্বর্ধনা পেয়েছেন এই ২৯শে নভেম্বর; যে
সম্বর্ধনা আন্তরিক স্বতোৎসারিত ও প্রাণবন্ত। ময়দানের সভায় নেতা ও জনতার মধ্যে
খানিক ব্যবধান ছিল। বাইনাকুলার ও মাইক্রোফোনের ঘটকালী ছাড়া অসম্ভব ছিল কাছে
আসা বা কথা শোনা। ফলে হৃদ্যযোগ যে কিঞ্চিৎ শিথিল ও অসংলগ্ন ছিল তা সহজেই
অনুমেয়। প্রসংগত অগ্রণীর আর একটি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। সেদিনের প্রচণ্ড ভিড় ও
ময়দানের অপরূপ আলোকসজ্জা যে বহু কোতুহলী দর্শককে (যারা নিছক দর্শকমাত্র)
আকর্ষণ করেছিল তা বলা বাহুল্য। তাই সম্পর্ক এখানে ভয় ভক্তি ও কুণ্ঠার—
ভালবাসার নয়।

২৯শে নভেম্বর যে দৃশ্য দেখা গিয়েছে তার চরিত্রই ভিন্ন। চাই কি, বোধ করি, বিপরীত। সম্পর্কটা এখানে ভাসবাসার—আত্মীয়কে কাছে পেয়ে অদর্শনবিধুরের মনে যে অপক্লপ পুলকের সঞ্চার হয়, তারই একটা প্রকাশ যেন দেখলাম। প্রত্যেকটি নরনারী ভেবেছে, এ নেতা আমার, একান্তভাবে আপনার। তারা আকুলভাবে একটি হৃদয়বেগকে মূর্ত করেছেন। তা হল—তোমায় ভাসবাসি। খেয়ালগানে যেমন একটিমাত্র পদ নানা ভঙ্গীতে আত্মদান ও উচ্চারণ করেন গায়ক, কবি যেমন একটি তত্ত্ব বহু চিত্রকল্প, বহু ব্যঞ্জনা, বহু বিভূতির দ্বারা সুসমামঞ্জিত করেন, সেদিন সুবিশাল জনসমুদ্রও বিচিত্র অভিব্যক্তির দ্বারা একটি অনূভবকেই রূপদান করতে চেয়েছে—তোমায় ভাসবাসি। কেউ একমুঠো ফুল ছুড়ে বলেছে—তোমায় দিলাম। কেউ করজোড়ে ছোট্ট একটি নমস্কারে বলেছে—তোমাকে। আহা, অভিবাদনের এই সূচাক্র ভারতীয় ভঙ্গীটির কি তুলনা আছে সারা ব্রহ্মাণ্ডে? কেউ-বা সরকারি নির্দেশে শুধু করতাসি দিয়েছে। আর করেছে একজোড়া চোখের দুঃখিময় আবেগ। স্যোমযান থেকে যারা সন্ধ্যা করেছেন এই অভাবনীয় দৃশ্য তাঁদের স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা স্মরণে আসবে; তাঁদের কখনও মনে হবে বর্ণাঢ্য পুষ্পমাচ্ছন্ন বিচিত্র বনবীথিকা; তারপর মনে হবে, বনবীথিকা কোথায়, এ-যে কাতারে কাতারে যুগবদ্ধ আশ্চর্য জনসমষ্টি! আবার নিমেষে চিত্রের প্রকৃতি যাবে বদলে; মনে হবে, এ হচ্ছে তরঙ্গভঙ্গিম নৃত্যমুখর নদীপ্রবাহ; আবার,—না না এতো শান্তস্রোত স্তব্ধ মহাসাগর! চিত্রীপ্রতিভা অবনীন্দ্রনাথ টুকরো কাঠকুটো কাগজকুচি দিয়ে সুন্দর ছবি-ছবি খেলা করতেন শেষজীবনে। কিন্তু বহুধাবিভক্ত বিপরীতধর্মী ছিন্নভিন্ন অর্থলব্ধ মানুষদের নিয়ে এমন মনোমুগ্ধকর চিত্র রচনা করল কোন প্রতিভা?

প্রশ্ন জাগে, কেমন করে হল এমন? কেন কলকাতার মানুষ ইতিহাসের একটা অধ্যায় দখল করে নিল একদিনে? ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমিউনিস্টরা বলেন, এ হচ্ছে প্রিয় নেতার উদ্দেশ্যে সর্বহারা জনতার প্রজ্ঞাঞ্জলি। কেউ বলেন, তা নয় এটা নিছক লেনদেনের ব্যাপার; জহরলালজীকে রাশিয়ানরা যে সম্বন্ধনা দিয়েছে কড়ায় গলুয় তা শোধ দিল ভারতবাসী। কেউ বলছেন, নেতি নেতি, মুখ্যমন্ত্রী রায়ের হুকুমনামায় এ হয়েছে। আবার ‘সিনিক’রা বলছেন—সব বাজে কথা, এ হচ্ছে পিওর এণ্ড সিম্পল হুজুগ! কিন্তু আমার মনে হয় সব মতই ঠিক আবার কোনোটাই নয়; বলছি না অন্ধের-হস্তীদর্শনের মত হয়েছে, তবে বিচার যে একদেশদর্শী এ নিশ্চিত। সেদিনের অভিনয়ের দ্বারা নায়ক-নায়িকা ভাষান্তরে সাধারণ মানুষের (অভিনয় নয়তো কি, world is a stage!) সবাই যে নেতৃত্বকে জানতেন বা কমিউনিজম মানেন এমন নয়। আবার একটা সরকারী নির্দেশে অথবা হুজুগে যে এমন যুগান্তকারী অবটন-ঘটন হয়—এ-যুক্তিও স্বীকারের অযোগ্য। তাহলে?

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Love breeds love. আপনি ভাসবাসলে আমিও বাসব। সাধারণ মানুষ ভাষালেকটিকস্ জানেনা মার্কসিজম বোঝেনা বা জাতিসংঘ

নামধারী ডিবেটিং সোসাইটিকেও চেনে না। তারা জানে ভালবাসা। ভারতবাসী জানে রাশিয়ার ক্ষমতাশীল শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে ভালবাসে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের সহানুভূতি ইতিহাসখ্যাত। গোয়ার ব্যাপারে তারাই, (একমাত্র তারাই) স্বার্থহীন ভাষায় ভারতের স্বায়সত্ত্ব দাবী স্বীকার করেছে। সর্বোপরি, সারা দুনিয়ার সাদা কালো সমস্ত সংখ্যক মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্যে তাঁদের নিরলস সাধনা দুনিয়ার আর সকল মানুষের সংগে ভারতবাসীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাই রাশিয়ান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কলকাতাবাসী এত উচ্ছল, এত আগ্রহাকুল, এত স্বতস্কৃত। এক ঝাঁক স্নেহ কপোতের সমবেত আকাশস্রানের মত ছন্দোপিনক, ঋষিবালকদের প্রাতঃকালীন স্তোত্রোচ্চারণের মত শাস্ত্রিনিক, উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় শিখার মত একমুখী যে-আকৃতি সেদিন হেমস্তের মধুর অপরাহ্নে বাণীময়, বর্ণময় হয়েছে তা হোল—আমরা তোমাদের ভালবাসি মঁসিয়ে বুলগানিন, আমরা শান্তি চাই।

মহাবিক্রম সিঙ্কার বলে বিশ্বাসী ছিলেন ; যে বল বাহুবল ; পাশবশক্তির ইংগিতে যার সৃষ্টি ; লোভ, ঘৃণা আর বিবেকের আবহাওয়ার যার জন্ম। কিন্তু মঃ বুলগানিন ও ক্রশভের কলকাতা আগমনের মধ্য দ্বিগে আমরা আর এক মহাশক্তির পরিচয় পেলাম যার সমকক্ষ নয় এটম বোম্ব বা হাইড্রোজেন বোম্ব। সে-শক্তি ভালবাসার, প্রেমের ও প্রীতির। তাই নিরস্ত্র বুলগানিন পঞ্চাশ লক্ষ কলকাতাবাসীর মন জয় করেছেন তাদের চোখে না দেখেই—যা উত্তম দিবাস্বপ্নের মধ্যেও সিঙ্কার কল্পনা করতে পারতেন না।

অনামিকা গুপ্তা

মৈত্রী পরিকল্পনা

এন. এ. বুলগানিন ও এন. এস. ক্রুশ্চেভ
(বেসরকারী অনুবাদ)

ভারত গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণে মৈত্রী পরিকল্পনার জন্য আমরা ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আমাদের ভারত সফর এবং বর্তমান বৎসরের জুন মাসে ত্রীনেহরুর সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রে মৈত্রী সফর আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিবিড়তর ও সমগ্র বিশ্বে শান্তি দৃঢ়তর করার দিক দিয়া এক অসামান্য গুরুত্বের বিষয়।

পতকল্য স্বাক্ষরিত ভারত-সোবিয়ৎ যুক্ত বিবৃতির কথা আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হইয়াছেন। এই যুক্ত ঘোষণায় উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্তাবলী সম্পর্কে সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের রাষ্ট্রনীতি-বিদদের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই যুক্ত বিবৃতি সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর করার দিক দিয়াই শুধু এক অপরিমীম গুরুত্বের বিষয় নহে, ইহার আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও অসামান্য।

আমাদের ভারত ভ্রমণকালে আমরা দেখিয়াছি আপনাদের এই সুন্দর দেশের কতিপয় নগরী ও অঞ্চল, কতকগুলি বৃহৎ কর্মকাণ্ড স্থল, বোম্বাই, কলিকাতা, বাকালোর ও মাদ্রাজের শ্রমশিল্পকেন্দ্র, কৃষিকার্যের উন্নয়নকেন্দ্র, ভারতের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনগুলি। বহুজাতিক ভারতবাসীর জীবন ও কাজ-কর্মের সহিত, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে তাহাদের কৃতিত্বগুলির সহিত, আমরা পরিচয় লাভ করিয়াছি। ভারতের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তিসম্ভাবনা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে।

আমাদের মনের উপর সর্বাধিক ও অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলিয়াছে মহান ভারতীয় জাতি — তাহার উৎকৃষ্ট শিল্প ও তরুণতা, তাহার প্রতিভা ও নৈপুণ্য, শান্তি ও সকল জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার জন্য তাহার একনিষ্ট আকাংক্ষা। আমরা যেখানেই গিয়াছি সেখানেই আমরা সব সময় ভারতবাসীদের আতিথেয়তা ও সহৃদয়তার দ্বারা সন্মোচিত হইয়াছি। ইহা সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।

জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে, বিশেষ করিয়া শ্রমশিল্পের অগ্রগতি সাধনে ভারতবাসীর প্রচেষ্টায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রমশিল্পই হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নতির

ভিত্তিভূমি ও দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখার মুখ্য অবলম্বন। দামোদর উপত্যকা ও নাংগলে নির্মাণমাণ বৃহৎ বাঁধ, প্রস্তাবিত ধাতু-উৎপাদন কারখানাগুলি ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্বোধন আয়োজন নিঃসন্দেহে আপনাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ভারতগতর্পমেণ্ট কর্তৃক অবলম্বিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

জাতীয় অর্থনীতির সকল অগ্রগতির সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থা ভারতে রহিয়াছে। এই অবস্থা হইতেছে অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, উর্বর জমির সুবিশাল আয়তন এবং সর্বোপরি প্রতিভাবান ও শ্রমসহিষ্ণু ভারতবাসীদের অক্লান্ত সৃজনীশক্তি—যে ভারতবাসীরা তাহাদের বহু শতাব্দীর ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে গড়িয়া তুলিয়াছিল অমর সংস্কৃতি-সৌধগুলি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার অধিকারী আমাদের, সোবিয়েৎ জনগনের, এই ধারণা হইয়াছে যে, জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনের এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকবলের পূর্ণ সম্ভাব্যতার জন্ত ভারতের বর্তমান আয়ুস ও প্রয়াসের ফলে ভারত স্বল্পকালের মধ্যেই শ্রমশিল্প ও কৃষিকাজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া তাহার জনগণের জীবনযাত্রার মান বহুলাংশে উন্নীত করিতে পারিবে।

আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বের বর্তমান সম্পর্ক উভয় দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক-টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভাগ দিবার জন্ত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং কলকারখানা ও জলবিদ্যুৎ স্টেশন নির্মাণের কাজে অভিজ্ঞতার অংশ দিবার জন্ত সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে। অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাগও সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র সানন্দে গ্রহণ করিবে। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ ও সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগের সম্প্রসারণ আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর করার সহায়ক হইবে। আমরা ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি যে, আমাদের ভারত সফর এবং ত্রীনেহরুর সহিত ও অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের সহিত কথাবার্তার ফলে সোবিয়েৎ দেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার আরও উন্নতি সাধনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের ভারত সফরের ফলে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিবাসীদের শক্তির কামনা অত্যন্ত প্রবল এবং শাস্তিরক্ষা ও সুদৃঢ় করার জন্ত আশ্রয় সংগ্রাম করিতে তাহারা প্রস্তুত।

আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে ভারত এখন ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। ভারত ও চীনা জনগণতন্ত্রের যোগদান ব্যতীত এশিয়ার (শুধু এশিয়ারই নহে) কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারই সমাধান এখন হইতে পারে না। আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ভারত ও চীনের জনগণতন্ত্রের সক্রিয় ও কলপ্রসূ অংশ গ্রহণের চমৎকার দৃষ্টান্ত হইতেছে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে

তাহাদের অংশগ্রহণ এবং বান্দুং সম্মেলনের কার্যকলাপে ঐ দুই দেশের সক্রিয় যোগদান। আন্তর্জাতিক রেবারেখি ট্রাস এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির কাজে বান্দুং সম্মেলন এক অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিখ্যাত পঞ্চনীতির ভিত্তির উপরে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকিবে, কারণ এই সম্পর্ক সমস্ত শান্তিকামী জাতির ও শান্তি সুদৃঢ় করার স্বার্থের পরিপোষক।

এই পঞ্চনীতি সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির সহিত সুসঙ্গত। সোবিয়েৎ গভর্নমেন্ট সোবিয়েৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকাল হইতেই এই নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। উক্ত পঞ্চনীতি কতকগুলি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং বান্দুং সম্মেলনের ঘোষণার ভিত্তি গৃহীত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য সব দেশ এই পঞ্চনীতি মানিয়া লইলে আন্তর্জাতিক রেবারেখির আরও ট্রাস ও জাতিসমূহের মনে অত্যাবশ্যক আস্থার ভাব সৃষ্টির কাজে সেই সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইবে। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বলিতে পারা যায়, এই দেশ মানিয়া আসিয়াছে ও মানিয়াই চলিবে শান্তির ও জাতি সমূহের সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃতির নীতি, অনাক্রমণ, সমানাধিকার, পারস্পরিক লাভ, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার নীতি, ভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নীতি। এই নীতি সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। সোবিয়েৎ রাষ্ট্র অবিচলিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। এই কথা বিদিত যে, দূরপ্রাচ্যের বহু জরুরী সমস্যা এখনো সমাধানের অপেক্ষার আছে। বিশেষ করিয়া ইন্দো-চীনের সমস্যার পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত সমাধান হইতে পারে একমাত্র ইন্দো-চীন সম্পর্কিত ভ্রেনেতা চুক্তিরই ভিত্তিতে সন্নিহিত জাতিপুঞ্জ সংঘে চীনের জনগণতন্ত্রকে তাহার ত্রায়সঙ্গত আসন প্রদানে এবং চীনা জনগণের জাতীয় অধিকারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চীনা জনগণ-তন্ত্রের সনাতন ভূখণ্ড তাইওয়ান ও অন্যান্য কতিপয় দ্বীপ সম্পর্কিত প্রশ্নের ত্রায় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে আর কিছুতেই বিলম্ব ঘটানো চলে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে-কোনোরূপ সামরিক জোট গঠন ও অপর দেশের ভূখণ্ডে সামরিক ঘাটি স্থাপনের বিরোধিতা সোবিয়েৎ গভর্নমেন্ট সবসময়ই করিয়াছেন। এরূপ জোট ও ঘাটি গড়িয়া তোলার কাজ শান্তির পক্ষে এক মারাত্মক বিপদ এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসের ও শান্তি সুদৃঢ় করার পথে অতিরিক্ত অন্তরায়। আমরা মনে করি, জাতিসমূহের প্রকৃত নিরাপত্তা আসিতে পারে সামরিক জোট-গঠনের দ্বারা নয়, শান্তি সুদৃঢ় করার অভিযুখে পরিচালিত রাষ্ট্র সমূহের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা। এই কথা স্মরণ রাখিয়া সোবিয়েৎ গভর্নমেন্ট ইউরোপে যৌথনিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার সুবিদিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা এবং পারমাণবিক ও উদ্যান অস্ত্রের উৎপাদন ও

মজুত বুদ্ধি শাস্তির পথে মহা বিঘ্ন। ইহা জনগণের স্বক্কে আরও ভারি বোঝা চাপায়। সামরিক ব্যয়ের মুখ্য অংশ বহন করিতে হয় জনগণকেই। আমরা মনে করি যে, অস্ত্রশস্ত্রের হ্রাস, পারমাণবিক ও উদ্যান অস্ত্রের সম্পূর্ণ ও বিনা শর্তে নিষিদ্ধকরণ রাষ্ট্রসমূহের কাছে এক জরুরী কর্তব্য, বিশেষ করিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে। এই কথা পরিষ্কার যে, এই বিষয়ে একটা ঐকমত্য বা চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রতিরক্ষার ক্ষমতা ছোরদার করিতে এবং পারমাণবিক ও উদ্যান অস্ত্র উৎপাদন করিতে এখন বাধ্য ও ভবিষ্যতেও বাধ্য হইবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নাই।

অতিথিপরাগণ ভারতভূমি ত্যাগের প্রাক্কালে ভারতের জনগণ, তাহাদের গভর্ণমেন্ট ও আমরা যেসব রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছি সেই সব রাজ্যের গভর্ণমেন্টদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি—সর্বত্র আমাদের বিপুল প্রগাঢ় সম্বন্ধনা জ্ঞাপনের জন্ত। আন্তরিক সম্বন্ধনা সোবিয়ৎ জনগণের প্রতি ভারতের জনগণের সত্যকার মনোভাবের প্রমাণ। আমাদের ভারতীয় বন্ধুগণকে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, ভারতের জনগণের প্রতি সোবিয়ৎ জনগণের মনোভাবও অনুরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ।

যে সুযোগ আমাদের দেওয়া হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের আন্তরিক ও সৌজাত্রমূলক অভিনন্দন ভারতের জনগণের নিকট পৌছাইয়া দিতেছি।

আমরা আশা করি, আমাদের দুই জাতির সমৃদ্ধির জন্ত বিশ্বশান্তির স্বার্থে আমাদের দুইটি দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা ক্রমশ আরও সুদৃঢ় ও আরও সম্প্রসারিত হইবে।

আমাদের সফরের ফলাফল ও আমাদের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বিবৃত করিতে গিয়া আরও দুইটি প্রশ্নের অবতারণা না করিয়া পারা যায় না। সেই দুইটি প্রশ্ন ভারতের জনগণকে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং কেন করে তাহা আমাদের কাছে বেশ বোধগম্য। আমাদের চোখের সামনে পভু'গাস কর্তৃক বেআইনীভাবে দখল করিয়া রাখা ভারতের ভূখণ্ড গোয়ার প্রশ্নটি রহিয়াছে, আর রহিয়াছে কাশ্মীর সমস্যা।

আমাদের সফরকালীন বক্তৃতাগুলিতে এই দুই প্রশ্ন সম্পর্কে সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব আমরা খোলাসা করিয়া জানাইয়াছি। পচাগলা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টের উচ্ছেদ সাধনের আমরা বোর সমর্থক। সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, উপনিবেশ-ভোগীদের দ্বারা বহু যুগ ধরিয়া বেআইনীভাবে পদানত ও নিষ্ঠুরভাবে শোষিত জনগণ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে নিজেরাই।

এই কথা সুবিদিত যে, গোয়া ভারতেরই ভূখণ্ড। সকলেই জানে যে, মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত অচ্ছেদ্য রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা তাহাদের ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।

এই বিষয়ে আমাদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ নাই যে, গোয়ার প্রশ্নের মীমাংসা হইবে

ভারতের জনগণেরই স্বার্থে, উপনিবেশভোগীরা তাহা চাউক বা না চাউক। বিদেশের ভূখণ্ড হইতে উপনিবেশভোগীদের নিজের বরে ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলিতে পারি আমাদের কাশ্মীর সফরকালে আমরা দেখিয়াছি প্রজাতন্ত্রী ভারতের এক অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাশ্মীরের জনগণ তাহাদের জাতীয় মুক্তিসঙ্গে কী অপরিণীম উল্লসিত! এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই যে, বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই কাশ্মীরের জনগণ তাহাদের বিষয়াবলীর নিষ্পত্তি করিয়া লইবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে কাশ্মীরের জনগণেরই অভিপ্রায় অনুসারে।

আমরা মনে করি, আমাদের এই বিরূতি আজ ও গতকল্য সাংবাদিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব। আমাদের কাছে বহু প্রশ্ন আসিয়াছে। এই সকল প্রশ্নকে কয়েকটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

প্রথমত, আপনাদের অনেকেই ভারত-সোবিয়ৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতার কতিপয় বাস্তব দিক সম্পর্কে আগ্রহশীল। আপনাদের অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে সহযোগিতার সম্ভাবনা কতখানি, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা প্রযুক্ত হইবে ইত্যাদি। এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ভারতগভর্নমেন্টের সহিত এই বিষয় সইয়া কথাবার্তা চালানো হইতেছে। এই কথাবার্তার প্রথম সফল আপনারা গতকল্য স্বাক্ষরিত ভারত-সোবিয়ৎ অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যুক্ত ভারত-সোবিয়ৎ বিরূতি হইতেই জানিতে পারিয়াছেন। এই কথাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে, পারম্পরিক শ্রদ্ধা ও লাভের ভিত্তিতে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের এক পাকাপোক্ত ভিত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, বহু অভ্যন্তরীণ সাংবাদিক তাহাদের সূচিস্থিত উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্যিক সহযোগিতা ভারতবর্ষ অস্বীকার করুক এইরকম কোনো দাবির দ্বারা সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের সহিত তাহার মৈত্রী-সম্পর্কের উন্নতিকে গণ্ডীবদ্ধ করিতে চায় কিনা। এই ধরনের প্রশ্ন কেবল তাহারাই করিতে পারেন যাহারা ভারত ও সোবিয়ৎ দেশের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করার জন্য আগ্রহশীল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও আর একবার পুনরাবৃত্তি করিতেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সহ সমস্ত দেশেরই সহিত শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও বন্ধন আমরা চাই। ভারত-সোবিয়ৎ বন্ধন অন্যান্য দেশের সহিত ভারত ও সোবিয়ৎ দেশের সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে, এক্ষণে স্পষ্টত অহেতুক ভীতির কোনো অর্থই হয় না।

তৃতীয়ত, বহু সাংবাদিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। কেহ কেহ এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন যে কোনো কোনো মহল—কোন্ কোন্ মহল তাহা আপনারা ভালোই জানেন—বার বার বলিতেছে যে, “জেনেভার মনোভাবের” মূর্ত্যু হইয়াছে এবং পূর্ণোচ্চমে আবার “ঠাণ্ডা যুদ্ধ” আরম্ভ করার সময় আসিয়া গিয়াছে। ইত্যাদি।

আপনারা নিজেরাই দেখিতেছেন যে, আমাদের ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ সর্বদা আসন্ন

আফগানিস্তান সফরে বিরক্ত কোনো কোনো লোক “ঠাণ্ডা যুদ্ধের” আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনাদের অসাধু সহকর্মীরা আমাদের বক্তৃতাগুলি সম্পর্কে কী না লিখিয়াছে, কী ভাবেই না ঐগুলিকে বিবৃত করিয়াছে! কিন্তু আমরা, সোবিয়েৎ দেশের অধিবাসীরা, ধৈর্যের অভাব দেখাইতে জানি না। “কুকুর খেউ খেউ করে, তবু পথিক পথ চলে”। ঐ সব বিবৃত লেখাগুলিকেও পাশ কাটাইয়া আমরা চলিয়া যাই। লোকে ঠিকই বলে : “যাহা ধারাপ তাহা ভালোর গায় লাগিয়া থাকিতে পারে না।”

এই প্রশ্নটির সার মর্ম সম্পর্কে এই কথাই বলিতে চাই যে, গত গ্রীষ্মকালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রপ্রধানদের সাফল্যমণ্ডিত বৈঠকের সুফলস্বরূপ সৃষ্টি হইয়াছিল যে “জেনেভার মনোভাব” তাহা এক মহতী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং এই মনোভাবকে কবরস্থ করার যে-কোনো অপচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চালাইয়া যাওয়ার ও বৃদ্ধি করার সমর্থক এবং সকলদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পক্ষপাতী। জেনেভায় চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রসচিবদের সম্মেলন যদি পৃথিবীর জাতিসমূহের প্রত্যাশা পূরণ করিয়া সুফল প্রসব করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে কারণ হিসাবে বলিতে হইবে—যাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—সম্ভবত উপযুক্ত অনুকূল সময় এখনো আসে নাই। স্পষ্টতই কতিপয় রাষ্ট্র বহু পূর্বে নিশ্চিত “শক্তির ভিত্তির উপর হইতে” নীতি এখনো ত্যাগ করিতে পারে নাই। দৃঢ়তার সহিত এই কথা জানাইতে হইবে যে, এই নীতি পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনা হইতেই কোনো সুফল পাওয়া যাইবে না।

আপনারা জানেন, যৌথ নিরাপত্তা, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস, পারমাণবিক মারণাস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, আন্তর্জাতিক সংযোগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পর্কে জেনেভা সম্মেলনে সোবিয়েৎ প্রতিনিধি দল বাস্তব ও কার্যে পরিণত করার উপযোগী কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সুতরাং কোনো ঐকমত্যে পৌছিতে না পারার জন্য আমরা দায়ী নহি! ভবিষ্যতেও আমরা এই সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্তার সমাধানের জন্য সর্বাতোভাবে চেষ্টা করিব।

এই প্রসঙ্গে বহু সাংবাদিক প্রশ্ন করিয়াছেন যে, দূরপ্রাচ্যের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা-বলী আলোচনা করার উদ্দেশ্যে জেনেভা সম্মেলনের অনুরূপ বৃহৎ শক্তিবর্গের রাষ্ট্রপ্রধানদের নূতন সম্মেলন আহ্বান করার সময় আসিয়াছে কিনা। আমাদের অভিমতে, এইরূপ ধারণা সমর্থনের যোগ্য। এইরূপ সম্মেলন হইতে সুফল পাওয়া যাইতে পারে একমাত্র শর্তে যে, সম্মেলনের সকল যোগদানকারী এইসব সমস্তার আলোচনা করিবেন কুখ্যাত “শক্তির ভিত্তির উপর হইতে” নীতি পরিত্যক্ত হইবার পরে। এই কথা না বলিলেও চলে যে, এইরূপ সম্মেলনের যোগদানকারীদের মধ্যে চীনের জনগণতন্ত্র ও ভারতবর্ষকে থাকিতে হইবে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আমরা বহু প্রশ্ন পাইয়াছি। আমরা মনে করি, এই প্রশ্ন সম্পর্কে এখানে আবার সবিস্তারে আমাদের অভিমত জানাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের অভিমত আপনাদের ভালো করিয়াই জানা আছে। বর্তমান বৎসরে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংঘের দরবারে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে উপস্থাপিত সোবিয়েৎ

প্রস্তাবগুলি নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরী সমাধানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অকস্মাৎ তাহার নিষেধই পূর্বকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতিগতির এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন না ঘটিলে ইতিমধ্যে ঐ সব সমস্যার প্রায় সমাধান হইয়া যাইত।

কোনো কোনো সাংবাদিক এই রকমের প্রশ্ন করেন : পশ্চিমের শক্তিবর্গের নিকট একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র একতরফা তাহার অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিতে রাজি হইবে না কি ? আমরা মনে করি, এবং এই বিষয়ে আপনারও একমত হইবেন যে, এইভাবে প্রশ্ন করায় গুরুত্ব প্রকাশ পায় না।

আমাদের আলোচনার অন্ত্যন্ত অংশীদাররা যখন তাহাদের সমস্ত শক্তি হ্রাস করার কোনো অভিপ্রায়ই দেখাইতেছেন না, পরন্তু তাঁহারা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করিতেছেন যে তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবেন, ঠিক সেইসময় সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র একতরফা অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসে কেমন করিয়া রাজি হইতে পারে ? এরূপ পরিস্থিতিতে একতরফা অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের কাজ আরম্ভ করিলে তাহা হইবে মুক্ততা এবং সেই কাজ ক্ষতিকর হইবে কেবল সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই নহে, সমস্ত শান্তিকামী জাতিরও পক্ষে।

আমরা নিরস্ত্রীকরণের সমর্থক—সমর্থক একটি সুস্পষ্ট ও অপরিহার্য শর্তে। তাহা এই যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলোচনার অন্ত্যন্ত সব যোগদানকারীকেও নিরস্ত্রীকরণে রাজি হইতে হইবে। এই কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা অবলম্বিত ব্যবস্থাদি কার্যে পরিণত হইস কিনা তাহা তদারক করার জন্য কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠারও পক্ষপাতী।

চতুর্থভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলি সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে। আমাদের দেশের জীবন সম্পর্কে ভারতের জনমতের ঔৎসুক্য দেখিয়া আমরা ধুশি। এই প্রশ্নে মস্তোত্তে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থায়ী সংবাদদাতাদের অবস্থান আমরা সানন্দে স্বাগত করিব। এই সম্পর্কে আপনাদের কেহ কেহ প্রশ্নও তুলিয়াছেন। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী ভারতীয় সংবাদদাতাদের থাকার ব্যাপারে বর্তমানে প্রতিবন্ধক স্বরূপ যে কতিপয় আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন রহিয়াছে তাহার সমাধান করা কঠিন হইবেনা বলিয়াই আমরা মনে করি। এইদেশে অন্ত্যন্ত সব দেশে যে-সব প্রশ্ন আমাদের কাছে আসিয়াছে সেইসব প্রশ্ন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনো বস্তুনিষ্ঠ তথ্যপরিবেশনের অভাব আছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কোনো কোনো লোক প্রশ্ন করেন : সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র পার্টি বা দল রহিয়াছে কেন ? আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি সম্পর্কে অপ্রতুল জ্ঞান হইতে এইরকম প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে।

এই কথা সুবিদিত যে, বুর্জোয়া শ্রেণী-রাষ্ট্রগুলিতে বহু পার্টি আছে। এইসব পার্টি নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থের পোষক ও রক্ষক। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক শ্রেণীরই

নিজস্ব পাটি আছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র জন্মযুক্ত হওয়ার ফলে সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এক সম্পূর্ণ নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং এই সমাজে এমন সব বিবদমান শ্রেণী ও গোষ্ঠী নাই যাহাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। আমাদের এমন এক অখণ্ড সমাজ যাহার শক্তির মূলে রহিয়াছে উহার ঐক্য ও সংহতি।

প্রাগবিপ্লব ভারশাসিত কৃষিকার বহু পাটি ছিল—পুঁজিপতিদের পাটি, জমিদারদের পাটি, কুলাকদের পাটি যাহারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের পাটি এই গালভরা নামে অভিহিত করিত। ইহা ছাড়াও মেহনতী শ্রেণীর পাটি, মহান লেনিন কর্তৃক সৃষ্ট বলশেভিক পাটি। এই পাটিই পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে, ভারশাসনব্যবহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়। এই পাটিই কৃষকদের সহিত শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য হয়। এই পাটিই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রগতিশীল অংশকে টানিয়া লইয়া আসে। এই পাটিরই নেতৃত্বে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জন্মযুক্ত হয়, শোষকদের শ্রেণীগুলি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এক নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সোবিয়ৎ জনগণ এখন সাক্ষরতার সহিত সাম্যবাদী সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে।

সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রে আজ পুঁজিপতি ও জমিদারদের শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব করিবে কাহাদের? আমাদের দেশে কোনো পুঁজিপতি ও জমিদার নাই। অর্থাৎ আমাদের দেশে পুঁজিপতি ও জমিদারদের কোনো পাটির অস্তিত্বের প্রশ্নই একেবারে অর্থহীন। আমাদের দেশে কুলাকদের পাটি আজ কাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবে? ঘোঁষখামার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া আমরা গ্রামাঞ্চলে চিরতরে বিলুপ্ত করিয়াছি পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থায় দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ আমাদের যুবক-যুবতীরা কেবল বই পড়িয়া ও বুদ্ধবুদ্ধাদের মুখে গল্প শুনিয়া কুলাকদের কথা জানিতে-পারে।

সোবিয়ৎ সমাজ মেহনতী জনগণের সমাজ—শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী বুদ্ধিজীবীদের সমাজ। সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই কথা লিপিবদ্ধ আছে যে, কমিউনিস্ট পাটি সাম্যবাদী সমাজ গড়িয়া তোলার অভিযানে মেহনতী জনগণের পুরোধা বাহিনী এবং মেহনতী জনগণের সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থা-সংগঠনগুলির পরিচালিকা শক্তি।

এই হইতেছে আমাদের সমাজ, এই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থা কাহারো উপর আমরা চাপাইয়া দেই না। তবে অকপটে এই কথা বলিব যে, এই সমাজ-ব্যবস্থাকে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি। কোনো কোনো লোক বিষয়টাকে এমনভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, সারা দুনিয়ায় কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রসার যেন সোবিয়ৎ যুক্তরাষ্ট্রেরই ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহুকাল পূর্বেই ইউরোপে কমিউনিস্ট ভাবধারার অস্তিত্ব ছিল এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের সৃষ্ট কমিউনিস্ট মতবাদ মেহনতী জনতার মধ্যে শিকড় চালাইয়া দিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি প্রশ্ন সইয়া আলোচনা করিতে চাই। কতিপয় সাংবাদিক এই প্রশ্নটি আমাদের সামনে তুলিয়াছেন। ইহা হইতেছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তথ্যাদি পরিবেশন সংস্থা বা কখনো কখনো যাহাকে “কমিনকর্ম” বলিয়া অভিহিত করা হয় সেই সংগঠন সম্পর্কে প্রশ্ন। এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত আছে ইউরোপের কতকগুলি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইহার লক্ষ্য হইতেছে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও সাংবাদিক বিনিময়। এই সংগঠনের কার্যকলাপ সেই সব লোকেবই কাছে বাধাঅসুবিধার সৃষ্টি করে যাহারা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পুরাতন অকেজো ব্যবস্থাটাকে চিরকাল বজায় রাখিতে চায়।

মাঝে মাঝে তাহারা প্রশ্ন করে : কমিনকর্মের উচ্ছেদ করা কি সম্ভব নহে? অকপটে কথা বলিলে বলিতেই হয় যে, কী কারণে ও কিসের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলি আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সহযোগিতার সাধারণভাবে গৃহীত কাঠামোটিকে ত্যাগ করিবে? কেনই বা কমিনকর্মের উচ্ছেদের প্রশ্ন উৎপাদনকারীরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগঠন সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যকলাপে কোনোরূপ আপত্তি তোলে না? কেনই বা তাহারা এই ব্যাপারকে স্বাভাবিক ও আইনসম্মত বলিয়া মনে করে যে, পুঁজি-পতিরা আন্তর্জাতিক একচেটে সংঘগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হইতেছে ও নিয়মিতভাবে বৈঠকে মিলিত হইতেছে তাহাদের নিজেদের ব্যাপারগুলি একযোগে পরিচালিত করার জন্য, অথচ মেহনতী শ্রেণীকে আন্তর্জাতিক সংহতির মহান আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে দিতে অস্বীকার করে—যে আদর্শের বাণী হইতেছে মার্কস ও এঙ্গেলস্ কর্তৃক বিধোষিত ও সমগ্র মেহনতী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের পরিপোষক আওরাজ : “সকল দেশের শ্রমিকগণ, ঐক্যবদ্ধ হও।”

মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর ও উন্নততর করার সমর্থক আমরা সব সময়েই হিসাম এবং ভবিষ্যতেও থাকিব। এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্য হইতেছে মেহনতী জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করা ও শাস্তির জন্য সংগ্রাম করা।

শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতী জনগণের স্বার্থের রক্ষক পার্টিগুলি অনুসরণ করিয়া চলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বাধিক অগ্রগামী মানবিক চিন্তাধারা—যে চিন্তাধারা সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে, চীনের জনগণতন্ত্রে ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া উহার অপূর্ব সার্থকতা প্রমাণিত করিয়াছে। এই চিন্তাধারা ক্রমশ আরও বেশি করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে সমগ্র দুনিয়ায়। লেনিন বলিয়া গিয়াছেন, আমরা “বিপ্লব রপ্তানী করার” বিরোধী, কারণ যেভাবে ঐ প্রশ্নটির অবতারণা করা হয় তাহা অবৈজ্ঞানিক। প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিজেরই জোরে পথ করিয়া লয় এবং পুরাতন অকেজো চিন্তাধারাকে হটাইয়া দেয়। মানব সমাজের অগ্রগমনের ইতিহাসে সবসময়ে ইহাই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহাই হইবে।

আপনাদের প্রশ্নাবলীর জবাবে এই আমাদের বক্তব্য।

পরিশেষে আপনাদের উৎসুক্যের জন্য আপনাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বিদায়।

—তাসের সৌজন্যে

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

নহবৎ : চিত্তরঞ্জন ঘোষ ; প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, মূল্য—আড়াই টাকা ॥

যারোটি ছোট গল্পের সমষ্টি। বাংলাসাহিত্য ছোট-গল্প রচনায় বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছে। একসময়ে ছোটগল্পের আঙ্গিক এবং রূপ নির্ণয় নিয়ে বাংলাসাহিত্যের সমালোচকেরা বহু চেষ্টা করেছেন। উপন্যাস থেকে ছোটগল্প কতখানি পৃথক, ছোটগল্পের চরিত্র সৃষ্টি বড়, কি, প্রকাশভঙ্গিমা বড় এই সব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছোট-গল্পের বে-বুনন দেখিয়ে গেলেন সেই রীতি সাহিত্যিকদের মনে বিশেষ ছাপ রেখে যায়। তারপর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসন্ন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন মিত্র ঐ রীতিকে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে ক'রে ছোট গল্পকে বিচিত্র এবং বিশিষ্ট ক'রে উত্তীর্ণ ক'রেছেন। কিন্তু পুরনো রীতির সঙ্গে মিল ঐ শক্তির উৎসটুকু পর্যন্ত। তারপর সেই শক্তিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায়। কোথাও আছে আলোক, কোথাও আছে উদ্ভাপ।

তবে একথা অসত্য নয় যে, বাংলাসাহিত্যের ছোট-গল্পে শ্লেষ এবং ব্যঙ্গের ব্যবহার যথেষ্ট হয়নি। এ বিষয়ে কবিতা তবু কিছু এগিয়ে গেছে। শ্লেষ-বিঙ্গপ ব্যবহার করতে হলে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, শব্দের প্রতি মনোযোগ দরকার। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সেইদিক দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। 'দাও ফিরে সে অরণ্য' এইজন্তই তাঁর সমস্ত গল্প থেকে ভালো উত্বরে গেছে। তাঁর হাতে শ্লেষ-বিঙ্গপই যেন বিশেষ ক্ষমতার সঙ্গে প্রকাশ পায়। কেবল বিশেষ শব্দ বা বাক্যের মধ্যেই যে তাঁর এ-ক্ষমতা তা নয়, গল্পের ক্ষমপ্রতিভাও এই দিকটি বড় হয়ে ওঠে। এইদিক দিয়ে লেখক নবীন হয়েও যথেষ্ট প্রবীণ। 'প্রোটিন' 'সে' 'স্বপ্নাবাত্রা' প্রভৃতি গল্পগুলোতে ভাষার সেই তির্যক-রশ্মিই প্রতিফলিত হয়েছে।

লেখক যেখানে তাঁর এই ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে চাননি, সেখানে গল্পগুলো তেমন জমে ওঠেনি, যেমন 'নহবৎ' গল্পটাই তেমন সুন্দর হয়ে উঠল না। অবশ্য 'পূর্বরাগ' উত্বরে গেছে। এই গল্পগুলি সার্থক হয়ে উঠতে না-পারার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন একটা কাব্য, এগুলির মধ্যে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী, বড় বেশি পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় লেখকের মৌলিকতার ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়তে চায় না। 'জরুরী' গল্পটিও এই শ্রেণীতেই পড়ে।

সমালোচনায় সত্যক আলোচনা করা উচিত। তাই লেখকের দুটি ক্রটির কথা বলব। গল্পগুলোর বিস্তারিত শব্দ-বোঝা ভাব বেশি। মানুষের পরিবেশের মাত্র একটি দিক তিনি ধ'রে দিয়েছেন। কেমন যেন হাঁক ছেড়ে নিখাস নেওয়া যায় না। চোখেও প্রতীকতাগুলি বড় কটকট করে লাগে। মানুষের মনের সামগ্রিক দিককে নাড়া দিয়ে তিনি যেন কথা বলেন না। এই জন্তই পড়বার পর ছাপ বড় বেশি থাকেনা, গল্প মনের উপর কোনো প্রভাব

আনে না। ছোটগল্পকে যদি লিরিক ধর্মী ব'লে মনে করি, তবে মনের উপর এমন প্রভাব তো আনাই উচিত। এইজন্যই মনে হয়, লেখকের মন বড় একরোখা আর শুভনাস্তিক। একটি গল্প তো নয়, অনেকগুলো গল্প তিনি লিখেছেন, অথচ লেখকের মনের বিচিত্রভঙ্গী দেখতে পেলাম না।

দ্বিতীয় ক্রটি, তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে অভিভাষণ রয়ে গেছে। কেবল অভিভাষণই নয় যথেষ্টমাত্রায় আবেগও বটে। সময়ে সময়ে 'অভিপ্রায়' থেকে 'অভিসন্ধি'-তে নেমে গেছে। সাহিত্যের ভাষায় যখন এই 'অভিসন্ধি' বা 'intention' বেশি উগ্র হয়ে ওঠে তখন তা আর সাহিত্য থাকে না—প্রচার কার্যের নামাস্তর হয়ে ওঠে। এই দুইটি ক্রটির জন্যই তাঁকে এখনও নবীন ব'লে মনে হয়, নতুবা—তাঁর রচনা-শৈলী, প্রবীণেরই সম্ভাবনা রয়েছে।

জনপদের ছন্দ : রাহুল (রামেন্দ্র দেশমুখ্য) : প্রকাশক, অগ্রণী বুক স্ট্যাব, ১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

কতগুলি লেখা আছে যা এক নিঃশ্বাসে পড়তে ইচ্ছে হয়। এর মধ্যে আবার আর এক শ্রেণীর লেখা আছে যা পাঠকের চিত্তে ভিটেবটিত উপন্যাসের মতো আদৌ কোতুলক জাগায় না কিন্তু কবিতার মতো যেখানে লেখা থেমে যায় সেখানে এক অপূর্ণ মনের-আলোড়ন ঘটিয়ে দেয়। আলোচ্য পুস্তকখানি এই শেষ-পর্যায়ভুক্ত। লেখক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে সেখানকার আশ্চর্য দিকটির সন্ধান নিয়েছেন। জনপদের ছন্দ রয়েছে সেখানকার জনচিত্তে। সেই চিত্তকে লেখক সুনিপুণভাবে কথাশিল্পে রূপ দিয়েছেন।

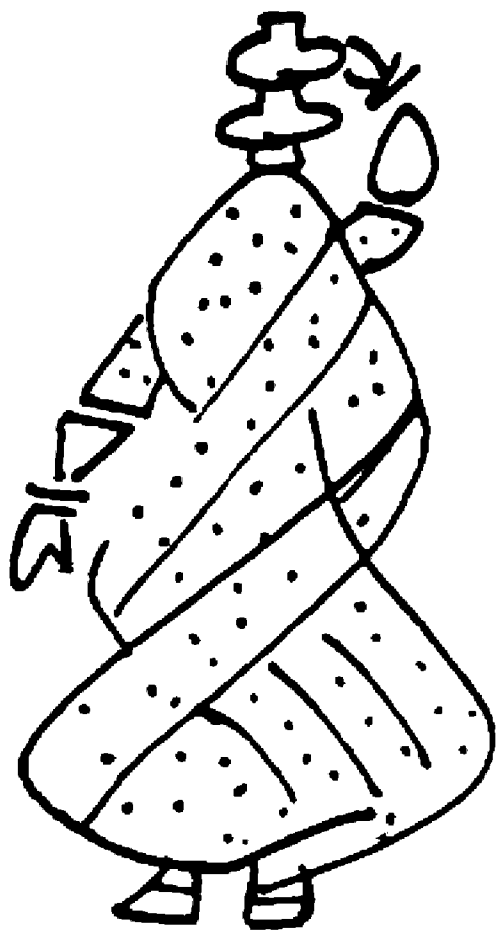
ভ্রমণের গল্পকে তিনি নিঃশেষ ক'রে জানাননি, ছোট গল্পের লেখকের মতো বিশেষ এক চরিত্রকে প্রাধান্য দেননি, নাটকের মতো কথার সংলাপ পদ্ধতিকে অবলম্বন করেননি, কবিতার মতো মেপে-মেপে শব্দ সংযোজনা করেননি। অথচ প্রত্যেক সাহিত্যিকর্ম এই পুস্তকের প্রতিটি ছত্রে রয়েছে। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যিক আর সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ জাগে, নির্ভর করতে ইচ্ছে হয়। এমন গ্রন্থকে কেবল স্বাগত জানিয়েই সমালোচকের কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না, এসব গ্রন্থকে মৃতসঞ্জীবনী বলতে ইচ্ছে হয়। 'বাংলা সাহিত্যে কিছু নেই,' 'বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে অবনতি ঘটেছে' এসব কথার প্রতিবাদ, উজ্জ্বল প্রতিবাদ যেন এই লেখা। বাংলা ভাষায় এত সম্ভাবনা বাংলাভাষা এত সমৃদ্ধ, ভাষাকে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়, এই গ্রন্থ এইসব কথা-কেই প্রমাণ করে। উচ্ছাস নেই, আবেগ নেই, 'অভিসন্ধি' নেই শুধু 'দেখা'টাই কত বড় হয়ে উঠেছে, পাঠকের চোখের সামনে এই দেশের মানুষকে এমন সমস্তে তুলে ধরেছেন যে, ভারতবর্ষের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ আসে, দেখবার শুধু দেখবারই স্পৃহা জাগে, সেই সঙ্গে মনের দৃষ্টিভঙ্গী এমনভাবে বদলে যায় যে মনে হয় নিজস্ব গণ বটল। লেখককে অভিনন্দন জানাই।

সুধীরচন্দ্র রায়

রাহুলের লেখা বই

॥ জনপদের ছন্দ ॥

পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি নিজে পড়ুন এবং শ্রিয়জনকে পড়ান। চার রঙা প্রচ্ছদপটে এবং পরিচ্ছন্ন ছাপায় বইখানি অপূর্ব। দৈনিক যুগান্তরে বইখানির সমালোচনায় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন :



“আমলে ভ্রমণটা উপপক্ষ মাত্র, লেখকের আসল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজের দিকে। ভারতবর্ষের যে বিরাট মনুষ্যসমাজ বহু বিচিত্র নরনারীর মিছিল লইয়া ইতিহাসের এক পর্যায় হইতে অন্য পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেই গতিপথে সমাজের যে বিচিত্র ভাঙাগড়া চলিতেছে, শক্তিশালী লেখক সেই দিকটাই এই গল্পগুলিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল—বঙ্কিত, দ্বিভ্রম ও শোষিত মানুষগুলির জন্য তাঁহার যথেষ্ট দরদ এবং এই দরদের পরিচয় বহুদূর অতীতের বৌদ্ধযুগ হইতে আধুনিকতম কংগ্রেসী যুগ পর্যন্ত। শিল্পশৈলীর নাচের নর্তকী হইতে বোম্বাইয়ের মারাঠী বধূ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ও অনেক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন এই পুস্তকের নায়ক রাহুল ; কিন্তু যে সমস্ত জীবনের রেখাচিত্র ইহাতে পড়িয়াছে, সেগুলি বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া আগামী যুগ পর্যন্ত পদক্ষেপ করিয়াছে।

“রম্যরচনার যে নূতন ঢেউ আমাদের সাহিত্যে আসিয়াছে, এই বইটিও সেই প্রাবনের মুখে পড়িয়াছে। তবে, ভরসা এই যে, এগুলি রম্যরচনার অর্থহীন গল্প নহে। ব্যঙ্গনায় ও ভাবের গভীরতায় ইহা নূতন সমাজ ও নবসংস্কৃতির জন্য অপেক্ষমান। সেখানেই এই পুস্তকের সার্থকতা। লেখকের স্টাইল সহজ ও স্বচ্ছন্দ এবং গল্পগুলি মুখরোচক। যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তিনি ভারতীয় সমাজকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, উহার বিচিত্র নরনারীকে অবলোকন করিয়াছেন, তাহাতে খানিকটা চাপা বিজ্রপ হয়ত আছে, কিন্তু সেই বিজ্রপ আমাদের সমাজের ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত মনুষ্য সমাজের প্রগতির প্রতিই তিনি আস্থা রাখিয়াছেন—কেবল নৈরাশ্রের চিত্রই থাকেন নাই। বইটির প্রচ্ছদপট সুন্দর।”

দাম সাড়ে তিন টাকা

অগ্রণী বুক স্টোর

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

অবনী

॥ অষ্টম বর্ষ, পৌষ, ১৩৬২ ॥

এক নায়িকা

বনলতা সেন

—“যাই বসো না কেন, সেন না-হলে নায়িকা হয় না”—মিহির কথাটা অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছিল আমাদের কফিহাউসীয় বৈকালিক আড্ডায়। শুনে সকলেই অল্পবিস্তর প্রতিবাদ করেছিল, সে কি, কত ঘোর বোস মিস্তির মুখুজ্যে আছে, তাদের বাদ দিয়ে শুধু মাত্র সেনরাই নায়িকা হতে যাবে কেন। মিহির তখন বলেছিল যে সেন পদবীধারিণীদের মাঝে নায়িকা-জনোচিত গুণ না থাকলেও তারা জন্মগতভাবে নায়িকা। অর্থাৎ যদিও তাদের অধিকাংশেরই অজানুলব্ধিত কেশ, বাঁশীর মত নাক আর খঞ্জনাগজ্ঞন নয়ন থাকেনা, তবুও তাদের মাঝে এমন একটা বস্তু থাকে যা একমাত্র নায়িকাদেরই থাকে। সে অবাঙমনসোগোচর গুণটি শুধু সেনদুহিতাদেরই একচেটিয়া। মিহির হয়তো আরো কিছু বলতো, কিন্তু আমরা তাকে ওখানেই থামিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। আমরা জানতুম এর পরই মিহির উদাহরণস্বরূপ বনলতা সেন আর মলি সেনের দোহাই পাড়বে। ওর দৌড় ঐ পর্যন্তই।

কথাটাকে আমিও গুরুত্ব দিইনি। দিইনিও না, যদিনা এত বছর পর স্মৃতি সেনের সাথে এমনভাবে হঠাৎ দেখা না-হয়ে যেতো।

স্মৃতি ছিল আমাদের সহপাঠিনী। ওর সাথে আমাদের পরিচয় নিতান্তই মৌখিক থাকলেও, ও ছিল আমাদের কয়জনের নিত্য নিভৃত আলোচনার বিষয়। আমরা কয়জন, অর্থাৎ আমি অবনী চাক্র বিকাশ আর মিহির—প্রত্যহ শুধুমাত্র ওকে দেখবার জন্যই দ্বারভাঙা থেকে আশুতোষ বিল্ডিংএ যাতায়তের পথে দাঁড়িয়ে থাকতুম। প্রতি বণ্টাতেই স্মৃতির ইউনিয়ন অফিসে যাতায়ত ছিল অবধারিত। যাবার পথে আমাদের পাঁচজনকে দেখে ও কখনো একটু হাসতো, কখনো থেমে দাঁড়িয়ে দু একটা কথা বলতো। যাবার পথে

শুধিয়ে বেতো, “ভাল আছে। ;” ফেরার পথে শুধাতো, “ক্লাস নেই ?” আমরা ও যাবার আগে পথে এসে দাঁড়াইতুম, ও ফিরে গেলে, দৌড়তে দৌড়তে দ্বারভাঙার চারতলায় উঠে পেছনের দরজা দিয়ে ক্লাশে ঢুকতুম ; অধ্যাপক সরকার ততক্ষণে ফারিস্ট আর মিডল ইন্সটের ঐতিহাসিক পারস্পর্ষের তাৎপর্য বোঝাতে শুরু করে দিতেন ।

তারপর প্রতিদিন বিকালবেলা কফিহাউসের একটি কোণে বসে আমরা পাঁচজনে আড্ডা দিতুম—রাজাউজির বধ হোত । অনেক তত্ত্ব আর তথ্যের চর্চিতর্চনের পর আমরা যখন ক্লাস্ত হয়ে পড়তুম, চুপ করে যেতুম কিছুক্ষণের জন্য, তখন হঠাৎ মিহির অন্তমনস্কভাবে মন্তব্য করতো, “আজ যেন সূজাতাকে একটু শুকনো শুকনো দেখাচ্ছিল ।” আমরা সকলেই যেন এই কথাটির অপেক্ষায় থাকতুম । আমাদের নিশ্চেষ্ট রসনা পুনরায় সজীব হয়ে উঠতো । হয়তো বিকাশ বলতো, “দেখাবে না, কতদূর থেকে রোজ আসে ।” চারু বলতো, “আজকাল ইউনিয়নের ইলেকশান নিয়ে বড্ড খাটেছে সূজাতা ।” আমি বলতুম, “শুনেছি ক্লাসের পর ছোটো টুইশানী করে তবে বাড়ি যায় ।” এমন কি বাচাল অবনী, যে, অন্য যে-কোনো মেয়ে হলে শারীরিক শুষ্কতার সাথে একটা কল্লিত ফ্রেডেডিয়ান ব্যাখ্যা জুড়ে সরস মন্তব্য করতো, সে পর্যন্ত বলতো, “বড্ড খাটে মেয়েটা ।” তারপর যতক্ষণ থাকতাম, শুধু সূজাতা, সূজাতা আর সূজাতা । আজ সূজাতা কার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, ফিরে যাবার পথে কারদিকে চেয়ে কুশলপ্রশ্ন করেছিল, এবার ইলেকশানে সূজাতা দাঁড়ায়নি কেন, বাড়িতে ওর কে কে আছে, ইত্যাদি । বলা বাহুল্য এসব কথায় মিহিরের উৎসাহই ছিল সবচাইতে বেশি । ওই সব ধবর সরবরাহ করতো আর আমরাও এই নিয়ে মিহিরকে ঠাট্টা করতুম । কিন্তু সবই শালীনতা আর সূক্ষ্মচির মাত্রা বজায় রেখে । কেননা সূজাতাকে আমরা পাঁচজনেই অসীম শ্রদ্ধা করতুম । ভালোও হয়তো বাসতুম । ওর সম্বন্ধে আমাদের মনের তারগুলি খুব চড়া সুরে বাঁধা ছিল । অন্য যে-কোনো মেয়ে সম্পর্কেই আমরা মুখরোচক আলোচনা করতুম, স্থূল রসিকতা করতুম । কিন্তু সূজাতা ছিল আমাদের মনে এসবের অনেক উর্ধ্বে । আমরা আড়ালে ওকে শ্রদ্ধা করেই খুশি ছিলাম, সামনে আলাপপরিচয়কে পাকা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা আমাদের ছিলনা । সূজাতা যেন আমাদের মনে দেবীকার আসনে বসে ছিল ।

আমাদের ভক্তির মাত্রাহীনতা দেখে যে-কোনো অপরপক্ষ ভাবতে পারতো যে সূজাতা ছিল সেইসব স্নানরীতির অন্ততমা, পশ্চাতে যারা একদল ভক্তকে নিয়ে বোরে । সূজাতার আদৌ রূপ ছিল না । যা ছিল তাকে শুধু মাত্র লাবণ্য বল্লোও ভুল বলা হবে । ওর মুখে সেই অভূতপূর্ব আভাস ছিল, যা একমাত্র বিশেষজনের মনকেই অলঙ্কিতে টানে । এ-বস্তু কেমিষ্ট্রির গবেষণাগারের ফরমুলায় বাঁধা নয় । এ কোনোমতেই ফিজিক্যাল নয়, একান্তভাবেই মেটাফিজিক্যাল ।

ওর ঐ টান্টান-করে-বাঁধা বেনী, দীর্ঘ কৃশ দেহ, বড় বড় কটাক্ষবিহীন চোখ, ব্যঙ্গনাহীন ওষ্ঠ, ভংগীহীন চলা, সোজাসুজি কথা বলা, শাড়ীর আঁচলটি একটি বিশেষ ভংগীর

সাথে ঘুরিয়ে এনে কোমরে গাঁজা—সবই যে কেমন করে আমাদের পাঁচজনের মনকে টানতো, এ বলে বোঝানো যাবেনা।

এ মেয়ে যেন অত্যন্ত ঘরোয়া মেয়ে। ও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওর অঙ্গ থেকে ঘরের সহজত্বটুকু মুছে যায়নি। অধিকাংশ মেয়েরই বাইরে বার হতে হলে প্রয়োজন হয় সজ্জার। সে সজ্জা শুধুমাত্র বস্ত্রের অথবা মুখশ্রী প্রসাধনের নয়। সে সজ্জা সব কিছুর। হাঁটা, চলা, বলা—সবেরই। একটা নকল প্রসাধনের অন্তরালে আবৃত থেকে প্রায় মেয়েই অন্দর থেকে সদরে নামে।

শুধু মেয়েরাই নয়, আমরা সকলেই এই মেকি কুটো পোশাকে আমাদের দেহমনকে ঢেকে বাইরে আসি। যাদের দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে, তাদের সাথে দেখা হলে হাসিমুখে বলি ভালো আছতো, বড় খুশি হনুম তোমাকে দেখে।” আর সেই সাথে যথেষ্ট ক্র-ভংগী আর রসাতাষ মিশিয়ে কথাকে সভায় উপস্থিত করি, যেন প্রতিপক্ষ আসল না কুটো বিচার করার সময় না পায়।

সুজাতা যেন এই পোশাকী পোশাকটা পড়ে আসতে ভুলে গেছে। তাই বাইরে দাঁড়িয়েও এ মেয়ে সহজ, অত্যন্ত সহজ। সেটাই ওর বৈশিষ্ট্য। সুজাতা যখন কথা বলে, তখন সে কথা বাঁকা চলনে চলেনা। ওর চলন কখনোই গজগামিনী বা মরালগামিনীদেব সাথে পাল্লা দেয়না। ওর সহজ চাহনীকে কোনোমতেই ভাবগর্ভ বলে ভুল হয় না। আর ও যখন হাসে তখন সেটা হো হো হয়েই বাজে—শ্মিত বা মৃদু হয় না। তবুও সব মিলিয়ে ও যেন এক নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা চৈনিক ছবি, যাতে রংএর বাহুল্য নেই, কিন্তু আভাস আছে।

এই সহজ সুজাতাকে যে আমাদের ভালো লাগবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। আর সে ভালো লাগা আমাদের অরুণ মনের রং লেগে আরো উজ্জল হয়ে উঠেছিল। আমরা অবসর পেলেই তাই এই একটি মাত্র ছবিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতুম। পাঁচজনে একটি ছবিতেই মুগ্ধ হতুম। পাঁচজনের মনের মিল ছিল এইখানেই।

আমাদের নিজেকেই মাঝেই শুধু নয়। বাইরে অজ্ঞাত ছেলেদের সাথে যখন সহপাঠিনীদের কথা নিয়ে গল্প হতো, আমরা পাঁচজন সুজাতার পক্ষই নিতুম। হয়তো বিশাখা তালুকদারের কথা হচ্ছে; সকলেই যখন প্রায় একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে যে এমনিতে যাই হোকনা কেন বিশাখা সত্যিই সুন্দরী, চারু হয়তো উদাসীন ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মস্তব্য করতো যাই বলে না কেন, সুন্দরী হলে কি হবে, বিশাখা বড্ড আর্টিকিশিয়াল এত সাজে! অথচ সুজাতাকে দেখো, কিছুই সুন্দর নয়, তবু কত সহজ। কিংবা হয়তো সন্ধ্যা ভট্টাচার্যের আশ্চর্য ইংরেজি দক্ষতা নিয়ে কথা হচ্ছে, বিকাশ আচম্কা বলে বসতো, “জানিস, সুজাতাও কিন্তু বেশ ভালো বলতে পারে।” এমনি করে কত হেনা বসুমল্লিক, কত মিনতি মজুমদার, কত অনিতা সান্যালদের কথাই হতো, কিন্তু আমরা ঘুরে ফিরে সুজাতাতেই ফিরে আসতুম।

অস্তিত্ব ছেলেরা আমাদের এই স্মৃতি-ঐতি নিয়ে হাসিঠাট্টা করতো, কিন্তু তা অমাব্যক্ত বা আদিরসাত্মক কখনোই হতো না। কেননা, স্মৃতি-আচরণব্যবহার কথাবার্তা চলাফেরার মাঝে, এমন কোনো রক্ত ছিল না, যার গুপ্তপথে আমাদের এই একনিষ্ঠতার হৃদয়তা হতে নিষ্কার বীজ মাথা তুলতে পারে।

একমাত্র একজন, যে আমাদের এই নিয়ে সব চাইতে বিজ্ঞপ করতো সে রঞ্জন।

রঞ্জন বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে। ব্যাঙ্কে অগাধ টাকা, আর সে টাকাকে পাহারা দেবার পিছুদেব বছদিন আগেই গত হয়েছেন। দুহাতে টাকা উড়াবার পথে প্রতিবন্ধক হবার মত কোনো রক্তচক্ষু অভিভাবকও ছিল না। কাজেই টাকাটা ওর হাতে খুব স্বাভাবিক গতিতেই উড়তো। সিনেমা, রেস্তোরাঁ আর খেলার মাঠে বান্ধবীদের নিয়ে হো হো করায়, নিত্য নতুন পোশাকে, যথেষ্ট পরিমাণে ক্লার্ট করায়, টাকার অবলীলাক্রমেই ওর হাত পিছলে বেরিয়ে যেতো। বন্ধুও জুটেছিল একদল। হেঁ হেঁ করাই যাদের বিশিষ্ট স্বভাব, ওর পার্শ্বের রূপালী চাকচিক্যই যাদের অন্ততম লক্ষ্য।

আমরা পাঁচজনেই শুধু নয়, আর অনেকেই রঞ্জনকে বিন্দুমাত্র বরদাস্ত করতে পারতো না। তবু নায়ক হবার সবকটা গুণই ওর মাঝে ছিল। নাস্তিক্যও অভাব হতোনা।

চেহারায় কন্দর্প না হলেও অত্যন্ত সুশ্রী ছিল রঞ্জন। দীর্ঘ দেহ উজ্জ্বল রং, সব চাইতে উজ্জ্বল চোখ আর হাসি। কিন্তু শুধু আকর্ষণীয় চেহারাই নয়, আকর্ষণীয় ছিল ওর কথা বলার ভঙ্গী। চতুর কথা সুন্দর ভাবে উপযুক্ত পরিবেশে বলে, কি করে মধুর রসের সৃষ্টি করা যায়, এ বিষয়ে রঞ্জন ছিল উঁচুদের আর্টিষ্ট। কথা বলে তাক লাগিয়ে দিতে পারতো ও। হয়তো এই জন্যই মেয়েরা ওকে দেখে এত ভুলতো। চিরকালেই দেখে এলুম মেয়েরা বাইরের কথাতেই বেশি ভোলে, আপাতঠাট্টাতেই ওদের চোখ ঝলসায়। রঞ্জনের তাই বান্ধবীর অভাব ছিলনা। এদিক দিয়েও রঞ্জন ছিল পাকা আর্টিষ্ট। রাজা দুহন্তের মত ওরও লক্ষ্য ছিল সক্রিয়প্রণয়োহরং জনঃ—একবার মাত্র প্রণয় করেই ছেড়ে দেওয়া।

আমরা বিশেষ করে এইজন্যই রঞ্জনকে সহ করতে পারতুম না। এমনিতে মেয়েদের নিয়ে নিজেদের মাঝে হাস্যপরিহাস করলেও সম্মুখমুখে আমরা ছিলাম নিতান্তই কাপুরুষ। এর কারণ হয়তো এই যে আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—নিত্য নতুন অবস্থা বিপর্যয় আর সংকীর্ণ দারিদ্র্য অঞ্চল ঠুনকো আত্মসন্তরী আত্মসন্মানের মধ্য দিয়ে যাদের দিন কাটাতে হয়। আমরা বাড়ির রেশন এনে, বাজার করে দিয়ে কলেজে আসতুম, আর সন্ধ্যাবেলা টুইশানী সেরে বাড়ি ফিরতুম। আমরা ভালো করেই জানতুম যে আমাদের উপর নির্ভর করে আছে অনেকগুলি নাবালক ভাইবোন, বৃদ্ধ পিতা ক্রমশঃ মারা যাচ্ছে। আমাদের পাঁচজনের অবস্থাই প্রায় এই ছকে গৎ বাধা ছিল। আমরা ভালো করেই জানতুম সৌখীন প্রেম করবার মত অর্থ আমাদের পকেটে নেই, আর প্রেমে পড়বার মত সামাজিক পথ আমাদের কাছে খোলা নেই। আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে, পাশও করতে হবে, তারপর লোন্সার ডিভিশনের কেবানী হলেও হতেই হবে। কাজেই রঞ্জনের অপরিচিত নাস্তিক্য সংখ্যায়

আমাদের যদি অসন্তোষের কারণ ঘটে তবে সেটা এমন কিছু অমার্জনীয় অপরাধ নয়। কিন্তু আমাদের প্রতি রঞ্জনর গাত্রদাহের কারণ খুঁজে পেতুম না। রাস্তায়ঘাটে, ক্লাশে করিডোরে, স্থানে অস্থানে, যেখানেই দেখা হোক না কেন ও আমাদের বিজপ না করে ছাড়তো না। চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করতো, “এই যে পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চালী কোথায়?” কিংবা, তোমাদের জৌপদীকে তো দেখে এলুম ইউনিয়ান অফিসে দুর্ঘোষনের সাথে আড্ডা মারছে!” আমরা ওর কথা বিশেষ গ্রাহ্য করতাম না। শুধু একদিন রঞ্জন অবনীকে ‘ভীম’ বলে সম্বোধন করে সুজাতা-প্রসংগে একটা অশোভন ইংগিত করেছিল। এমনিতেই অবনী ছিল একটু স্থল চেহারার। রঞ্জনর ঐ মন্তব্য শুনে ও হাতের আঙ্গিন গুটাতে গুটাতে বলেছিল, “আচ্ছা, এসো, পরীক্ষা হয়ে থাক, ভীমের ঘুঁষির জোর বেশি, না তোমার নাকের জোর বেশি?” আমরা সবাই সেদিন অবনীকে শাস্ত না করলে নিশ্চিত রক্তপাত ঘটতো। তারপর থেকে রঞ্জন একটু সংবত হয়ে কথা বলতো আমাদের সাথে।

কিন্তু এরপর যে ঘটনা ঘটলো, তারজ্ঞ আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

চিরাচরিতভাবে সেদিনও আমরা কফিহাউসের কোণে বসে বৈকালিক আড্ডা দিচ্ছিলাম। নানা কথার পথ ঘুরে অবশেষে সত্ত্ব সুজাতা-প্রসংগে এসে পৌঁছেছে; মিহির গলার স্বর অত্যন্ত নিচু করে সুজাতা সম্বন্ধে ওর সত্ত্ব আহরিত সংবাদ বলতে শুরু করেছে; এমনি সময় অবনী বাধা দিয়ে বললো, “চুপ করো, রঞ্জন আসছে!” আমরা চোখ তুলে দেখলাম রঞ্জন আমাদের দিকেই আসছে। গায়ে ওর গেরুয়া পাঞ্জাবী; বুকের বোতামগুলি খোলা সেখান দিয়ে ওর সাদা ধবধবে গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে, আর পাওয়া যাচ্ছে ঈষৎ রোমান্ডাস। ধূতির কোঁচাটা প্রায় ধুলো ঝাট দিচ্ছে; বাঁ হাতে কপালের ওপর নেবেআসা কৌকড়ানো চুলগুলিকে পেছনে ঠেলতে ঠেলতে, রঞ্জন এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো আমাদের টেবিলে। বললো, “কি পঞ্চপাণ্ডব, কি কথা হচ্ছিল এত নিবিষ্ট মনে?” মিহির একটু উত্তেজিত হয়ে বললো, “তা দিয়ে তোমার কি দরকার?” রঞ্জন ওর সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসলো, বললো, “বুঝেছি, সুজাতার কথা হচ্ছিল।”

তারপর বেশ গম্ভীর মুখ করে বাঁ হাতের ওপর চিবুকের ভারটা রেখে প্রশ্ন করলো, “আচ্ছা, সত্যি করে বলতো, সুজাতাকে নিয়ে তোমরা এত উচ্ছ্বসিত কেন? কি আছে ওতে?”

মিহির বললো, “সে তুমি কি বুঝবে?”

রঞ্জন বললো, দেখো, আমার নারীঘটিত দুর্নাম আছে। মেয়েদের আমার সচরাচর ভালোই লাগে; কিন্তু সে ভালো লাগারও যথেষ্ট কারণ থাকে। হয়তো কারো গলার স্বর শুনে মনে হয় ঐ সুরে একটি বিশেষ কথা শুনি, হয়তো কারো চলার ছন্দ দেখে ইচ্ছে করে হৃদয় পেতে দিই, হয়তো কারো মুখের একটি বিশেষ হাসির ক্ষণ ইচ্ছে করে চিরটাকাল তাকে পাশে নিয়ে চলি। কিন্তু সুজাতার মাঝে কোথাও এমন কোনো কিছু আমার নজড়ে পড়েনি,

যার ঋতু আধবর্ষটোও অস্তুত ওর সাথে দাঁড়িয়ে মনের খুশিতে গল্প করা চলে। কি দেখে ভুললে তোমরা ?”

একথার জবাবে বিকাশ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললো, “রঞ্জন, মেয়েদের সাথে অত্যধিক মেশো বলেই তাদের সম্পর্কে তোমার মনে কোনো সঙ্গম বোধ নেই। আর যে সব মেয়ে তোমার বান্ধবী, তাদের মাঝে সম্মান করারও কিছু নেই। তুমি মেশো তাদের চোখে দেখে, হাসি দেখে, চলা দেখে, বলা দেখে ; আর তারা মেশে তোমার টাকা দেখে, চেহারা দেখে, গাড়ী দেখে, বাড়ি দেখে। কিন্তু সূজাতা এমন মেয়ে যাকে একবার চিনলে তার চোখে আর হাসি, চলা আর বলার কথা মনে থাকেনা। সূজাতার মাঝে এমন কিছু আছে যা অন্তরে মনে মোহ সৃষ্টি করেনা, কিন্তু সম্মান করায়। আমরা সূজাতাকে সম্মান করি, তাই ওকে আমাদের ভালো লাগে।”

রঞ্জন একথার প্রত্যুত্তরে সিগারেটটা অনাবশ্যক এ্যাস্ট্রেতে বার কয়েক ঝেড়ে একটু মুচ কি হাসলো।

ওর হাসি দেখে অবনী চড়া সুরে বললো, “দেখো রঞ্জন, তুমি ঐ হেনা রেখা সিন্ধাদের সাথেই প্রেম করতে পারো। ওরাই তোমার যোগ্য। কিন্তু তোমার মত ছেলে কোনোদিন সূজাতার কাছেও আসতে পারবে না। একথা শুনে রঞ্জন হো হো করে হেসে উঠলো ; তারপর দুহাত প্রসারিত করে বললো, “এসো, ক’টাকা বেটু ? একমাসের মধ্যে যদি সূজাতার সাথে প্রেম না করতে পারি তবে আমার নাম রঞ্জন চৌধুরীই নয় !”

একমাস নয়। হয়তো মাস আষ্টেক, হয়তো একবছরই। কিন্তু রঞ্জন পারলো। সূজাতাকে ভোলাতে।

কি করে ভোলালো, তার ভুচ্ছাতিভুচ্ছ অংশগুলি রঞ্জন আমাদের বলেনি। ছবির মোটা তুলির কাজটাই আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল ; তার ভেতর নিপুণ শিল্পীর সূক্ষ্ম রেখার টানগুলি রঞ্জন আমাদের বুঝতে দেয়নি ; বুঝতে দেয়নি, হৃদয় নিয়ে যখন সস্তাদরের নীলাম ডাকা খেলা চলে, তখন শুধু ডাকের বস্তুটাই সস্তা হয়না, নিজের পকেট থেকেও কিছু খরচা যায়। কিন্তু রঞ্জন শুধু গল্পের প্রথমটা আমাদের শুনিয়েছিল, নাটকের প্রথম অংক।

ও বলেছিল, সেই এক পৌষের অপরাহ্নে, ক্লাশ ছুটির পর সূজাতা যখন বাড়ি যাবার পথ ধরেছিল, তখন কেমন করে পড়ন্ত সূর্যের সোনালী রোদ এসে পড়েছিল ওর মুখের বাম অংশে, আর তখনি কেমন করে রঞ্জন পেছন থেকে ডেকেছিল, “সূজাতা, শোনো, শোনো।”

সূজাতা ধমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রঞ্জন ওকে ধামতে না দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মাঠের কোণে, সেই জারুল গাছটার ছায়ায়। আর তারপর নানা সত্যমিথ্যার অনর্গল কথার স্রোতে যখন সময় অনেকক্ষণ বহে গিয়েছিল, আর একবিন্দু নিস্তেজ আলো জারুলের ডাল পালার কাঁক দিয়ে এসে সূজাতার চিবুকে গোল হয়ে চন্দনবিন্দুর মত ফুটে উঠেছিল,

তখনি, শুধুমাত্র তখনি রঞ্জন অত্যন্ত খুঁছ সুরে বলেছিল সেই কথাটি, যে কথাটি শুনে সবার কাঙাল, সবাই ভিখারী।

শুনে সুজাতা বলেছিল, “তুমি আমার সাথে বানিয়ে কথা বলতে এলে রঞ্জন?”

রঞ্জন বলেছিল, “সেই জন্তই তো এলুম, সুজাতা। আমি জানি আর কেউ না পারলেও, তুমি অনায়াসেই বুঝবে যে আমার সবটাই বানানো, সবটাই আপাত।”

“তাতে আমার লাভ?”

“তোমার লাভ আছে কি নেই জানিনে, শুধু জানি যে এই বানানো কথার আড়তদারটির তাতে যন্ত লাভ। ঘাটে ঘাটে কথার বেচাকেনা করে আজ সে ক্লান্ত; তাই তার ময়ূরপংখী নাও বাঁধতে চায় একটি ছোট বন্দরে, তার সব দায় সপে নিশ্চিত আশ্রয় চায় ঐ কালো পাড় আঁচলের তলায়।”

“—এরকম আঁচলের আশ্রয় এর আগেও তো বহুবার নিয়েছ।”

—“তা নিয়েছ, আর সে কথা অকপটে তোমার কাছে স্বীকার করতেই তো এসেছি। সুজাতা, আমার স্বভাবটাই স্রোতের মত। সে যখন ভেসে যায়, সেই সাথে আরো অনেককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই অনেকটাইতো তার জীবনের একমাত্র সত্য নয়, একমাত্র সত্য সাগর সংগমে পৌঁছানো। তুমি আমার সেই সাগর, পথের মোহনায় বাক ঘোরা মাত্র তোমাকে দেখতে পেয়েছি। এই দেখতে পাওয়ার জন্তই তো এত তোড়জোড়। পথের সন্ধানে অলিতে গলিতে এত ঠোকাঠুকি।”

এরপর সুজাতা কি উত্তর দিয়েছিল, রক্ত অমাদের বলেনি। শুধু সন্তর্পণে গেক্সো পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি নীলাভ খাম বার করে আমাদের সামনে রেখে বিজ্ঞতার হাসি হেসেছিল। খামের ওপর মেয়েলী সুন্দর লেখায় পরিভারতাবে রঞ্জনের নাম সেখা। আমাদের আর কোনো প্রশ্ন ছিলনা। সুজাতার হাতের লেখা আমরা প্রত্যেকেই চিনতুম।

এরপরে আর নাটকের কুশীলবের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রইলো না। আমরা হলুম দর্শক, তবে নিবিকার কোনোমতেই নয়।

আমরা দিনের পর দিন অকম্পিত চোখে দেখলুম কি করে একটি ভীকু পক্ষিনীহৃদয় এক নিপুণ শিকারীর জালে ধরা পড়ে। প্রথম প্রথম সুজাতা চেষ্টা করতো রঞ্জনকে এড়িয়ে যাবার। তারপর ওর সাথে গল্পের সময় বিস্তার লাভ করতে লাগলো; ওদের আশ্রয় দিলো মাঠের শেষের সেই একাকী জারুল গাছটার ছায়া। কিন্তু ক্রমে তাতেও ক্লান্তি। কলেজ স্ট্রিটের ছোট পরিধি ওদের ধরে রাখতে পারলো না। দুপুরবেলা ক্লাশ পালিয়ে কোনোদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোনোদিন ইডেন-গার্ডেন, কোনোদিন বটানীকুস, কোনোদিন-বা ডায়মণ্ড হারবার অভিমুখ যাওয়া ওদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠলো।

আর আমরা দেখলুম, সুজাতা ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠছে। ওর প্রতি পদক্ষেপে কিসের যেন নেশা লেগেছে। ওর চোখে কিসের যেন ঘোর, ওর সমস্ত মুখে কিসের যেন খুশি।

এর সবটাই যে আমাদের চাক্ষুষ এমন নয়। এর কিছুটা মিহিরের আর কিছুটা রঞ্জনর সংবাদ। রঞ্জন আসতো এক একদিন। বিকট উল্লাসে উপরওয়ালার মত আমাদের পিঠ চাপড়ানো হাসি হাসতো ; আর ক্র ভুলে বামচক্ষু অর্ধমুদিত করে যে ইংগিত করতো, তার একমাত্র অর্থ কি হে হুসেন, কেমন বোক ?

আমাদের দিনযাত্রায় আপাত কোনো কঁাক দেখা দিল না। নিয়মিত লেকচার শোনার ব্যতিক্রম হোলোনা, নিত্য বৈকালিক আসরে আমাদের উপস্থিতির অগ্রধা হোলোনা, কিন্তু আমরা যেন কেদ্রচ্যুত হয়ে গেলুম। আমাদের একটিমাত্র গোপন আনন্দে যেন কেউ লজ্জার কালি মেখে দিল। আমাদের পাঁচজনের একটিমাত্র আপন অনুভূতির কেন্দ্র যেন বিকল হয়ে গেলো। অথচ এ-নিয়ে আক্ষেপ করাটাও এমন হাস্তকর ছিল-যে ভুলেও আমরা কেউ ও প্রসঙ্গ তুলতে পারতুম না। সুজাতাকে আমাদের ভাল লাগতো অসাধারণ, যে ভালো-লাগা ওকে সম্মান আর শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে প্রায় দেবী করে ভুলেছিল। সুজাতা যে কোনো দিন কোনো ছেলেকে ভাসবাসবে না ; এমন আশা আমরা কখনো করিনি। কাজেই রঞ্জনকে সুজাতা ভালবেসেছে বলে আমাদের হৃৎপাথর কিছু ছিল না।

কিন্তু এতো শুধুমাত্র হৃৎপাথর নয়। এ যে লজ্জা। আমরা হেরে গেলুম, রঞ্জনর কাছে হেরে গেলুম, এই হারই আমাদের বিষম লজ্জা দিলো। রঞ্জনকে আমরা জানতুম। এও জানতুম সহজে মেয়েরা ওকে এড়াতে পারে না। যে সহজ বোহেমিয়ানীতে মেয়েরা ভোলে, যে আপাতখেরালীপনায় মেয়েদের স্নেহ উথলে ওঠে, সে রঞ্জনর পুরোমাত্রায়ই ছিল। কিন্তু আমরা জানতুম না যে সুজাতার মত মেয়েও শুধুমাত্র বাকচাতুরীতে ভোলে, শুধুমাত্র কথা শুনে মুগ্ধ হয়।

আমাদের বৈকালিক আসর একটি বিশেষ আলোচনার অবর্তমানে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেলো। আগের মতই কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা হতো, মিহিরকে নিয়ে সহজ পরিহাস হোত, দাক্ষবীদেয় সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে মুখরোচক আলাপ হোত ; কিন্তু এ-আলাপআলোচনার কোনো পরিণতি ছিল না। আমরা শুরু করতুম কিন্তু শেষ করতে পারতুম না। ঋণ্ডিতঙ্গ গানের মত পারতুম না সম্মে পৌছাতে।

সম্মে পৌছানো আরো একজনের হয়ে উঠলো না। সে সুজাতা স্বয়ং। রঞ্জনর প্রেমের ইতিহাসে ক্ষণবাদই একমাত্র সত্য। ওর প্রেমের জগতে তাই গুরুত্বকর দুইপক্ষে জোয়ার ভাঁটার নিত্য আসা যাওয়া।

রঞ্জনর পক্ষে সম্ভব ছিল না সুজাতাতেই সীমায়িত হওয়া। ওর কাছে মেয়ের মূল্য সাময়িক কয়েকবিন্দু আবেগ সৃষ্টি করাতে। যে অন্তরকয়েকমুহূর্তে চোখে ঘোর লাগে, নেশার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, আর বুকের ভিতর উষ্ণ রক্তের ঝড় উত্তাল হয়ে ওঠে, শুধু সেই কয়টি মুহূর্তই ওর প্রয়োজন।

আর সুজাতার ক্ষেত্রে ও-তো হৃদয়কে হাতের মুঠোয় নিয়ে পথেবু ধারে বাজি ধরতেই নেবেছিল।

কিন্তু সুজাতা তা তো বোঝেনি। ওর স্বপ্নায়ু সুখের দিনগুলি কেটে গেলো কিছুদিনের মধ্যেই। আর তারপর পড়ে রাইলো কতগুলি বিনিময় রাত, কতগুলি বেদনাতুর মধ্যাহ্ন ; আর একটি জ্বালাধরা অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

এসব কথা আমরা একদিনেই বুঝিনি। বুঝেছিলুম অনেক পরে, যখন দৈনিক কাগজে বড় বড় হরকে রঞ্জন চৌধুরী লেখত যাত্রার কথা ছবিসহ ছাপা হলো, আর অবনী খবর এনে দিলো, সুজাতা পড়াশুনো ছেড়ে চব্বিশ পরগণার কোনো অধ্যাত গ্রামের স্কুলটিচার হয়ে গেছে।

সুজাতা চলে যাওয়াতে আমাদের নতুন করে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটলো না। কেন্দ্রচ্যুত আমরা আগেই হয়েছিলুম। এবার এলো হিটকেপরার পালা। অবনী পরীক্ষার কিন্তু আগে মিলিটারীতে কাজ নিয়ে চলে গেলো দেবানন্দ ; মিহির অনিয়মিত ক্লাশে আসতে লাগলো, তারপর একদিন উধাও হলো। খোঁজ নিয়ে শুনলুম ইনসিওরেন্সের দালালী জুটিয়ে বর্ধমান, কাঁচড়াপাড়া আর ব্যারাকপুর করে বেড়াচ্ছে। বিকাশ এক শুভলগ্নে বড়লোক বাপের একমাত্র কুসুমা কন্যাকে বিয়ে করে খণ্ডরের টাকার কন্টিনেন্টে পাড়ি জমালো। রইলুম শুধু আমি আর চাকু। আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিলাম। পাশও করলুম কোনমতে। তারপর চাকু চুকলো ইনকামট্যাক্সে আর আমি হলুম কাগজের রিপোর্টার। আমাদের পাঁচজন হিটকে পড়লো এক এক জায়গায় ; পাঁচজনের একটিমাত্র বিশেষ প্রিয় আলোচনাও ভেঙে চূরে গুঁড়িয়ে গেলো ; আমাদের আড্ডা ভেঙে গেলো, আমরাও রইলাম না।

এরই মাঝে কানে ভেসে আসতো নানা কথা। সবই রঞ্জন-প্রসঙ্গ। বিলেতে গিয়ে ওর নানা কীর্তিকাহিনীর কথা। সেগুলি সুকীর্তি নয় বলা বাহুল্য। শেষ খবর পেলাম সুহাসের কাছে। সুহাস রঞ্জনদের সাথেই ইংরেজিতে পড়তো। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার বছর চারেক পর হঠাৎ একদিন দেখা হোস্তায়। কথায় কথায় ও বললো রঞ্জনের খবর। রঞ্জন নাকি পৈত্রিক সম্পত্তির কানাকড়ি পর্যন্ত মদ, রেস ও আনুসংগিকে বিক্রিয়ে দেশে ফিরে এসেছে কপর্দক শূন্য হয়ে। শুধু তাই নয়, রোগজরুর দেহে বিয়ে করেছে এমন একটি মেয়েকে যার আর যাই থাক, অভিজাত হমলে সোসাইটি গার্ল হিসেবে খ্যাতি নেই। সেই অধ্যাত নারী মেয়েটিই রঞ্জনের সকল ব্যয় নির্বাহ করছে। বলতে বলতে সুহাস বিশ্ব প্রকাশ করে ছিল, বলেছিল, একটা কাপুরুষ অসচ্চরিত্রের জন্য এতখানি ত্যাগ শুধু মেয়েরাই করতে পারে ওদের বোকা ভাব। শুনে আমার সুজাতার কথা মনে হয়েছিল। একটি মেয়ের ত্যাগ যে কতখানি হতে পারে তার ধারণা সুহাসের কোথা থেকে হবে। সুহাস তো সুজাতার কথা জানে না। হয়তো আজও সুজাতা সেই অধ্যাত স্কুলের ছাত্রীদের জিরাতিয়াল ইনফিনিটিভ বোকাতে বোকাতে শুধুমাত্র রঞ্জনরই প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সুজাতার আর কোনো খবরই পাইনি।

এমনি করেই বছর দশেক আয়ুর খাতা থেকে বাতিল হয়ে গেলো। কিন্তু দশ বছর

আগের সেই দিনগুলি আর কোনোমতেই কিরে এলোনা যে-দিনগুলিতে আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে ঝারভাড়া থেকে আশুতোষে আসতুম শুধুমাত্র সুজাতাকে দেখবার জন্য। টামে বাসে কত মেয়েকে দেখতুম, পেছন থেকে মনে হতো ঠিক সুজাতার মত দীর্ঘ গড়ন ; কারুর হাসি যেন সুজাতার হাসিকে ছুঁয়ে যেত ; কিন্তু সুজাতাকে কোনোদিনই পেতুম না।

সুজাতার কথা প্রায়ই মনে হতো। হয়তো সারাদিনের কাজের শেষে টামে চড়ে বাড়ি কিরছি, তখন ময়দানের পশ্চিমের ধূসর আকাশের এক টুকরো হালকা রক্তিম মেঘের দিকে তাকিয়ে সুজাতার কথা মনে হতো। যখন ফাল্গুনের শুরুতেই নিম্পত্র কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলিতে দু একটা সবুজ পাতার মঞ্জরী দেখা দিতো, তখনো সুজাতার কথা মনে হতো ; আবার যখন শীতের অনুস্তাপ রোদে অনেক ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে অজ্ঞানের নীল আকাশ তার সকল রিক্ততা নিয়ে চোখের সামনে প্রকাশ হতো, তখনো শুধুমাত্র সুজাতার কথাই মনে হতো।

তবু ক্রমে ক্রমে সুজাতার স্মৃতিও ক্ষীণ হয়ে এলো মনে। উজ্জল ছবিটা মলিন হয়ে গেলো। শতকাজের ব্যস্ত জীবনের মাঝে প্রথম যৌবনের একটি সুন্দর স্মৃতি, স্মৃতি হয়েই রইলো, সত্য হলো না কোনোদিন।

রোজকার মত সেদিনও যখন আমি কাগজের অফিস থেকে বার হয়ে এসে ট্রামস্টপেজে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন একবারও ভাবিনি, আজই এই হেমস্তের পড়ন্ত বিকালে দেখা হবে সেই সুজাতার সাথে, যার কথা নিয়ে আমরা অনেক অলস বিকাল গলে গলে কাটিয়েছি। যার কথা এই দীর্ঘ বছরগুলি ধরে অনেকবারই মনে হয়েছে।

ট্রামস্টপেজে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। আশেপাশে যারা আছেন— তাদের দেখার চেষ্ঠায় মুখ ফেরাতেই কয়েকজন অপেক্ষমানা মহিলার মাঝে একটি বিশেষ জনেই দৃষ্টি আটকে গেলো। ঐ বিশেষ দাঁড়াবার ভঙ্গীটি যেন বড্ড বেশি চেনা। সেই কালোপাড় সাদা তাঁতের শাড়ী, সেই রকম দীর্ঘগড়ন, হাঁতে সেই একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ধরা ধান কয়েক বই, একটা ফলের ঠোঙা। মনের সবকিছু চেতনাকোষ যেন একসঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো। ঐরকম শাড়ীপরা ঐ দাঁড়াবার ভঙ্গী, ওষ শুধুমাত্র একজনেরই হতে পারে। মহিলা এই দিকে মুখ ফেরাতেই সব সংশয় নিরসন হলো। সেই-ই। সুজাতাই।

চোখাচোখি হতেই সুজাতা দু এক পলক স্থির তাকিয়ে, তারপর ওর সেই পরিচিত মিষ্টি ধরনে হাসলো। কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো ; “তুমি যে ; কতকাল পর দেখা।” আমি বললুম, “ভয় হচ্ছিল হয়তো চিনতে পারবে না।”

সুজাতা বললো, “চিনতে পারবো না কেন ? বিশেষ বদলাওনিতো চেহারায়।”

আমি হাসলুম। বললুম, “তুমি এখানে কি করতে ?”

সুজাতা বললো, “এসেছিল সে অফিস ফেরৎ ফল কিনতে মার্কেটে। বাড়ি যাচ্ছি।”

“তুমি কোথায় স্কুলে চাকরী করতে ?”

সুজাতা একটু লজ্জা পেয়ে বললো, “ছেড়ে দিয়েছি সে কাজ।”

সুজাতার লজ্জাক্রম মুখটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ পরমবিশ্বাসে আবিষ্কার করলুম ওর সরু সিঁথিতে রক্তিম সিঁদুরের চিহ্ন।

কেমন যেন আহত হলুম মনে মনে। সুজাতা বিষে করেছে! মনের উজ্জ্বল ছবিটার সাথে ঐ সিঁদুরের চিহ্ন মেলাতে পারলুম না। সুজাতার সমস্ত দুর্ভাগ্যে দুঃখী হলেও, ও আমাদের মনে প্রেমের এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত হয়েছিল। সে দৃষ্টান্ত আত্মত্যাগের। একটি সুবিধাবাদী কাপুরুষকে ভালবেসে একটি মেয়ে সারাজীবন নিজেকে সুখের হাত থেকে বঞ্চিত করলে, এই ভাবনাই আমাদের মনে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা ছিল; এমন কি হয়তো আমাদের তুচ্ছ কেরানীজীবনের দৈন্যতা আর গানির মাঝে প্রেরণাও দিয়েছিল। সেই সুজাতা বিষে করেছে! সুজাতা যেন আজ ওর উঁচু আসন থেকে নেমে এসে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

আমার মনের এত কথা সুজাতা বুঝলো না। ও সকলের কথাই জিজ্ঞাসা করলো; চাক্র মিহির বিকাশ অবনী ও আরো অনেকের কথা। কতগুলি ট্রাম ছেড়ে একটা খালি ট্রামে চড়ে আমরা দুজনে পাশাপাশি বসলুম। কত পুরোনো দিনের গল্প হলো। প্রফেসরদের নিয়ে হাসলুম, বন্ধুদের কথা নিয়ে পরিহাস হলো। অনেক কথাই হলো, কিন্তু একজনের কথা হলো না। সে বঙ্গন। আমি সন্তর্পণে ওর নামটা বাহ দিয়ে গেলুম। আর সুজাতা যে কোনোমতেই ওর কথা তুলবে না, এ জানতুম। আরো একজনের কথা হলো না। সে সুজাতার স্বামী। বহুবার মনে হলো, জিজ্ঞাসা করি, সুজাতার স্বামীর কথা—সেই মামুলী প্রশ্নে, কি নাম, কি ধাম ইত্যাদি। কিন্তু কেন জানিনে রুচি হলো না। সুজাতার সিঁথি নিকলংক শুভ্র নয়, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই দশ এগারো বছর পর এইটুকুই যথেষ্ট।

যথেষ্ট হলো সুজাতা যখন ট্রাম থেকে নামবার সময় বল্লো, “চলোনা আমার বাড়িতে, এইতো কাছেই,” তখন না বলতে পারলুম না। কিছুক্ষণ হেঁটে ভবানীপুরের এক অখ্যাত গলির একতলা এক বাড়ির কাছে এসে দুজনে দাঁড়ালুম। গ্যাসলাইটের মৃদু আলোর প্রায়াক্রমিক কোণটিতে দাঁড়িয়ে সুজাতা যখন আমার দিকে চোখ তুলে হাসলো, বোকাতে চাইলো, এই ওর বাড়ি; তখন ইচ্ছে হলো বলি : তুলে যাও সুজাতা, এ তোমার বাড়ি। সুজাতা, তোমার বাড়ি নেই, ঘর নেই, তুমি কোনো বিশেষ কারো নও। তুমি আমাদের—আমাদের পাঁচজনের। তুমি জানতে না, কিন্তু আমরা পাঁচজন যে তোমাকেই ভালবাসতুম। কিন্তু কিছুই বলা হলো না। চিরদিনের মত এবারও সুজাতার হাসির উত্তরে শুধু একটুকরো হাসিই ফিরিয়ে দিলুম।

সুজাতা কড়া নাড়তে একটা বুড়ি ঝি এসে দরজা খুলে দিলো। সুজাতা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্লো, “এসো, আমার স্বামীকে দেখবে।” ঘরে আলো জলছিল। একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা নিয়ে সুজাতার পিছন পিছন ঘরে ঢুকলুম। ঢুকেই শুরু হয়ে গেলুম।

ঘরের একপাশে খাটে শোয়া চাদরে ঢাকা প্রায় বিছানার সাথে মিশে যাওয়া এক ক্ষীণ মানুষের দেহ। বাদিকে মুখটা বীভৎসভাবে বিকৃত—দেখলেই বোকা যায় যে প্যারালিসিস্ হয়েছে। একটা চোখের কোনো দৃষ্টি নেই। আর একটা বিস্ফারিত। তবু চেনা যায়।

সুজাতা দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে ফলগুলি টেবিলে রেখে বিছানার পাশে বসে, ঝুঁকে পড়ে বল্লো, “রঞ্জন, রঞ্জন, দেখো কে এসেছে।” খাটে শায়িত ক্ষীণ মনুষ্যাকৃতির মুখ দিয়ে কোনোমতে একটা অব্যক্ত গোড়ানীর আওয়াজ বার হলো। হয়তো বাকপটু রঞ্জন চৌধুরী বলতে চাইলো, “এই যে মহদেব, ভালতো?”

আমি শুক্ক বিষয়ে চোখ ফিরিয়ে সুজাতার দিকে তাকানুম। সুজাতা রঞ্জনের মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ দিয়ে বেন ওর অপরিণীম স্নেহ ঝরে পড়ছে। লাইটের উজ্জ্বল আলো পড়ছে সুজাতার বাহুতে, ললাটে চুলে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সরু শূন্য সিঁধির মাঝে রক্তিম সিঁহুরের রেখা।

সুজাতাদের বাড়ি থেকে বার হয়ে যখন ট্রামস্টপেজে এসে দাঁড়ানুম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। শীতের রাত্রির ঘোলাটে কুয়াসায় ঢেকেছে চারপাশ। তারই মধ্য দিয়ে এখানে ওখানে দু'একটা তারা চিকমিক করছে আকাশে। আশেপাশে লোকের চলাচল, ট্রাম বাসের কর্কশ শব্দ, ফেরিওয়ালার ডাকা নিম্ন আলোজ্বলা দোকানগুলিতে নরনারীর ভিড়।

এই প্রবহমান জনতার শ্রোতের দিকে তাকিয়ে আমার বহুদিন আগের মিহিরের কথাটা মনে পড়লো : সেন না হলে নায়িকা হয় না। সব সেনেরা হয়তো নয়। কিন্তু সুজাতা সেন সত্যিই নায়িকা। এক মহাকাব্যের নায়িকা, যে কাব্যের সন্ধান কেউ পেলে না ; পরিচিতেরা জানলো না, লোকচক্ষুর অন্তরালেই রইলো চিরটাকাল। এমন কি মিহিরও জানলো না।

মিহির কিন্তু সুজাতার সম্পর্কেই ঐ কথা বলেছিল ॥

নবজীবনের পথে জাগ্রত তিব্বত

ইস্রায়েল এপ্‌ষ্টেইন

[এশিয়ার সর্বাপেক্ষা অনুরূপ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তিব্বত অন্যতম। লামাশাসিত এই অঞ্চলের অগ্রগতি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জগৎ ব্যাহত হওয়ার কালে এই অঞ্চল বেশ কয়েক শতাব্দী পিছনেই পড়ে ছিল। হিমালয় বেষ্টিত এই দুর্গম এবং অনগ্রসর অঞ্চলটির সাথে বহু প্রাচীনকাল থেকে বাণিজ্যপথে ভারতের সংগে যোগাযোগ থাকলেও ভারতবাসীর কাছে তিব্বত ছিল প্রায় অজ্ঞাত। দালাই লামা এবং নয়াচীন সরকারের মধ্যে তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তিসাধন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫১ সালের ২৩শে মে। তিব্বত নয়াচীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বায়ত্ত-শাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদালাভ করে। তখন থেকেই নবজীবনের পথে তিব্বতের অগ্রগতির কাজ শুরু হয়।

এই প্রবন্ধে লেখক প্রধানত জোর দিয়েছেন চানের গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক নির্মিত সিকাঙ-তিব্বত সড়কের উপর। বহির্বিশ্বের সহিত হোগাযোগবিহীন তিব্বতের দুর্লভ্য পর্বতমালা ভেদ করে যে সড়ক নির্মিত হয়েছে—তা পূর্তবিচার তো বটেই, কর্মোত্তমেরও এক আশ্চর্য নিদর্শন। সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে লেখক প্রমাণ করেছেন যে এই সড়কের মাধ্যমেই তিব্বতী জনসাধারণের চেতনাসংস্কার হওয়ায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্ভাব্য রূপায়ন হয়েছে শুরু, তিব্বতের অগ্রগতির রূপপথ হয়েছে উন্মুক্ত। অনুবাদক।]

॥ লাসা ॥

তিব্বতের রাজধানী এই অতিপ্রাচীন ও প্রাচুর্যময় নগরী লাসা এবং তার খেত-রক্তিম বর্ণাভার শোভামণ্ডিত দালাই লামার প্রাসাদ ‘পোটালা’র দিকে তাকিয়ে আমার মনের মধ্যে কয়েকটি চিন্তার ঢেউ এসে খেলা করতে থাকে।

মনে হয় : কত জটিল অথচ কত আশাপ্রদ মানুষের জীবনের অগ্রগতির পথ—যে পথ পৃথিবীর বুকে আজ নববসন্ত আনয়নের কৃতিত্বে উদ্ভাসিত, সেই পথ সমাজতন্ত্রের পথ। স্থানীয় রীতিনীতি এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থেকে কোনো অনগ্রসর অঞ্চলের শতাব্দী-লাঞ্ছিত সমস্টাসমূহের সমাধানে অগ্রসর হয়ে সমাজতন্ত্র কি শক্তিশালী উপায়ই না অবলম্বন করতে পারে! পারে কত সুন্দরভাবে সাধারণের স্বার্থে জনসাধারণকে ভ্রাতৃত্বের সমন্বয়ে গোঁথে ফেলতে! ভাবতে ভাবতে মনে হয়, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা কত স্বচ্ছ ও সত্য; এবং সেই আলোকে প্রকৃতভাবে সজীবিত হয়ে অব্যাহত কর্মোত্তমের সংগে এগুতে পারলে কত প্রয়োজনীয় এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থাই না অবলম্বন করা যায়।

॥ সিকাঙ-ভিক্ত সড়ক ॥

পৃথিবীর সর্বোচ্চভূমিতে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিঘ্নসমূহতা সত্ত্বেও মহান চীনা জনগণ কর্তৃক মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৪০০ শত মাইল দীর্ঘ যে সিকাঙ-ভিক্ত সড়ক নিৰ্মিত হয়েছে সেই বিস্ময়কর কীর্তিপথ ধরে আমাদের একদল বৈদেশিক সাংবাদিক লাসায় এসেছিলেন। সমুদ্রোপকূল থেকে এই সড়কের উচ্চতা গড়ে ১০,০০০ ফিট। এখানকার কোনো কোনো পর্বতশ্রেণী উচ্চতায় প্রায়শঃই ১৫ থেকে ১৭,০০০ ফিট—সড়কটি এইরকম ১৪টি বিশাল পর্বতশ্রেণীকে অতিক্রম করেছে, আর তার গতিপথে শৃংখলিত করেছে গোল্ডেন স্তাণ্ড, ল্যাঙ-সাঙ, হু এবং ব্রুকপুত্রের মত পৃথিবীর চারটি বৃহত্তম নদীকে।

যারা এই সড়কটি নির্মাণ করেছে, প্রারম্ভে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল স্বল্প, সেই স্বল্প অভিজ্ঞতার সংগে ছিল সামান্ত কিছু যন্ত্রপাতি মাত্র। কিন্তু হ্যাঁ, তাদের ছিল শিখবার অদম্য উৎসাহ এবং সেই সংগে কর্ম সম্পাদনের অটল স্পৃহা। কাজেই তারা একটি প্রথম শ্রেণীর সড়ক নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছে। যে অঞ্চলে সারাদিনে ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করা ছিল একটা রীতিমত কঠিন কাজ, এখন সেখানে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল চড়াই-উৎরাই পথ অনায়াসে পার হওয়া যায়। আর একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষ অধিকতর কর্মদক্ষ হয়েছে এবং সে সমস্ত স্থানে আরম্ভের সময় সামগ্রিক জ্ঞানের তুলনায় প্রাথমিক সুযোগসুবিধাগুলি ছিল বেশি, সেই চীনা-অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলির চেয়েও দীর্ঘকাল ঘুমন্ত-লাসার সন্নিকটস্থ অঞ্চলগুলি হয়েছে আরও বেশি উন্নত।

আটাশ বৎসর বয়স্ক মুক্তিকৌজের বীর কর্মী হোয়াচেঙ হো-র কাছে শোনা গেল, এই সড়ক তৈরী করতে করতে সর্বপ্রথম যখন সিগাসিতে পৌঁছয়, তখন অন্ততম প্রধান বৌদ্ধ-ধর্মমাজক পাকেন লামা উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, ‘তোমাদের এই সড়ক নির্মাণের কাজ নিঃসন্দেহে পরমাস্তর্ঘ্য বলে গণ্য হবে।’

পরমাস্তর্ঘ্য বলে গণ্য করার মত এই কাজ কি করে করা সম্ভব হোল—এই কথা ভাবতে গিয়ে আমরা বুঝেছি যে ধীরবুদ্ধিতে প্রকৃত বাস্তবের পথে মহান বিপ্লবী উত্তমের সংগে তীক্ষ্ণ কর্তব্যজ্ঞান সংযুক্ত হওয়ার এ কাজ সম্ভব হয়েছে।

মুক্তিকৌজের সেই কর্মী হো আমাকে বলে, ‘আমি ছিলাম নিজে একজন দরিদ্র চাষী এবং যখন আমি দেখলাম যে ভিক্তীয় চাষীরা এখনো আদিযুগের যন্ত্রপাতি নিয়ে কৃষিকর্ম করে, তখন আমি অনুভব করি যে শুধু এই জোয়াল-বলদ দিয়ে এদের জীবন উন্নত হতে পারে না। তাই আমরা এই সড়ক নির্মাণের কষ্টকে কষ্ট বলেই গ্রাহ্য করিনি।’ হো নিজের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে এমন একটি কথা বললো, যেটাকে সে তার সবকিছু কষ্টের পুরস্কার হিসেবেই মনে করে। হো বললো, ‘যখন ভিক্তী কর্মীরা প্রথম আমাদের সংগে কাজ করতে এল তখন তারা বলতো যে তারা এই সড়ক নির্মাণের কাজ করে গণমুক্তি কৌজকে

সাহায্য করছে। কিন্তু যখন সড়ক নির্মাণ শেষ হলো তখন তারা বলতে লাগলো, গণমুক্তি ফৌজ আমাদের জন্যই এই সড়ক নির্মাণ করেছে।’

এই সৈনিক হো, তার জীবন যৌবনকে উপেক্ষা করে ১৯৪৬-৪৯ অব. যুক্তিবুদ্ধে কুও-মিনটাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ১৯৫০-৫১ সালে পায়ে হেঁটে, কখনো কখনো কোমর সমান তুষারচ্ছন্ন পর্বত পাড়ি দিয়ে, সে তিক্তে এসে পৌঁছয়। যেমন দুর্গম পথ অতিক্রম করে সে এসেছিল পায়ে হেঁটে, সেই সমস্ত জায়গা এখন মোটর গাড়ীর পক্ষে অনায়াস গন্তাঘাতের পথ।

প্রকৃত পক্ষে, এই সড়ক চীনা জনগণের সংগে তিক্তীদের এক ইচ্ছাতৃপ্ত বন্ধনের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। এ থেকে তিক্তীদের জীবনে এসেছে পূর্বাশ্রয় ভাস অর্থোপার্জনের পথ। তারা পাচ্ছে সম্ভার বিপণী, পাচ্ছে সরকারের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত জব্য-সমূহের ক্ষুদ্র আগেকার চেয়ে ভাল বিক্রয়ের ক্ষেত্র। তাছাড়া পাচ্ছে বিনাপয়সায় চিকিৎসার সুবিধা এবং বিনাবেতনে শিক্ষা। এবং এসব কিছুই তাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে হচ্ছে পরিচালিত। এই সড়ক তাদের সুযোগ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক চীনের সমৃদ্ধির সংগে যোগাযোগ স্থাপন করবার। সড়কের দ্বারা ভ্রমণের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় বৃহত্তর পৃথিবীকে জানবার পথও হয়েছে তাদের জন্য উন্মুক্ত। তারা পিকিং-এ এখন বিশেষ বিশেষ শিক্ষার সুযোগও পাচ্ছে; সুযোগ পাচ্ছে সিনেমা দেখবার এবং এমনি আরও কত কিছুর—যা তিক্তে ছিল নী কল্পনাকালেও।

॥ আঁধারে আলো ॥

চাষীরা এখন বিনামূল্যে কর্তৃক পায় (লামাদের পুরনো ব্যবস্থায় ফসলের শতকরা বিশভাগ দিয়ে দিতে হতো), পায় বিনা পরিশ্রমে ফসলের বীজ এবং কৃষির যন্ত্রপাতি। পশুপালকেরা নিখরচায় পশুর চিকিৎসা করতে পারছে। ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছে দ্রুতগতি যানবাহনের সুবিধা হওয়ায় (পশুপালক এবং ব্যবসায়ীরাও কর্তৃক পাচ্ছে)। আগেকার চেয়ে অল্পবয়সে এবং অল্পসময়ে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় পুরোহিত জাতীয় এবং সাধারণ ধার্মিক লোকদেরও ধর্মস্থানে তীর্থযাত্রার সুযোগও হয়েছে প্রচুর।

বিশাল চীনদেশ এবং তার মহান জাতির দিকে তাকিয়ে এখন তিক্তের সব স্তরের মানুষের মনই দেশপ্রেমের ভাবে উত্ত্বল হয়ে উঠছে। সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব-চীন সফর করে এসে দালাই লামা আমাদের বৈদেশিক সংবাদিকদের বলেন, ‘এখন আমরা এমন অনেক জিনিস উৎপাদন করতে পারছি যা আগে করতে পারতাম না এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত চীনা জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত তিক্তীদেরও ভবিষ্যত সমৃদ্ধির আশাপ্রদ সঞ্চার।’

সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভবিষ্যত আজ অজস্র সম্ভাবনার পরিপূর্ণ। সেই পথে নিজেদের উন্নতির জন্য তিক্তও অগ্রসর হওয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং

নিরাপত্তাবোধের চেতনা আজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান। সোভিয়েৎ এবং চেকো-স্লোভাকিয়ার প্রস্তুত ট্রাকগুলি তিব্বতের বাণিজ্য-সামগ্রী বহন করছে। কার্মান গণতান্ত্রিক সরকারের এক-রে যন্ত্রপাতি রোগগ্রস্ত তিব্বতীদের রোগনির্ণয়ে সাহায্য করছে। পরীক্ষা-মূলক কৃষিখামারে সোভিয়েৎ এবং হাঙ্গেরীর যন্ত্রপাতি কাজ দেখাচ্ছে কতখানি শ্রম ঐচ্ছিক তিব্বতের কৃষিব্যবস্থার কতখানি উন্নতি করা সম্ভব। যতরকম উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে, এর সমস্তই এসেছে ঐ সড়ক ধরে—যে সড়ক সত্যসত্যই সমাজতন্ত্রের অগ্রগমন সূচনা করেছে তিব্বতে।

কুবলাই খাঁর আমলে মঙ্গোল বিজয়ের পর তিব্বতীরা এক বিস্তৃত অঞ্চলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ায় তারা বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই সময় থেকেই তারা অত্যাচার-অনাচার ও অপমানের হাত থেকে কখনো রেহাই পায়নি। উপরন্তু, উচ্চনীচ সর্বশ্রেণীর লোকই এ যাবত কৃতদাসরূপে গণ্য হয়ে এসেছে। সে-সব কথা যেমন তারা ভুলে যায়নি, তেমনি ভোলেনি মাঝু ও কুওমিনটাঙের আমলে ক্রীতদাসত্বের দ্বন্দ্বতম অভিযাপকে অথবা সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তলোলুপ অভিযানকে (Young husband expedition of 1904) —যখন দেশরক্ষাকারী সাহসী তিব্বতী বীরদের অস্ত্রসম্পদ দ্বারা প্যারি ও গ্যাঙসিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সন্ধির পতাকা উড়িয়ে বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশ অধিনায়ক বিশেষ করে, গ্যাঙসিতে যে দ্বন্দ্ব আক্রমণ চালিয়েছিল, সে বিভীষিকার কথাও তাদের মন থেকে যুঁছে যাবার নয়। সেই সময়—যখন সেই উদ্ধত ব্রিটিশ অধিনায়ক দালাই লামার পবিত্র প্রাসাদ ‘পোটালা’তে বসেই তাদের হাতে তিব্বতকে ভুলে দেবার জন্য এক অপমানজনক শর্তে রাজী হবার জন্য হুমকী দেখাচ্ছিল, তখন তিব্বতীরা পিকিং-এর মাঝু সম্রাটদের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু সাহায্য করা তো দূরের কথা, সম্রাটরা তখন নিতান্ত নির্বিকারের মত চুপ ঘেরে বসে ছিল হাত গুটিয়ে।

কিন্তু এখন ?

এখন চীনের গণযুক্তি ফৌজ এবং হান (সংখ্যাগরিষ্ঠ) জাতির সবাই তিব্বতীদের ধর্ম সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিকে প্রচুর সম্মানের চোখে দেখে। চীনের গণযুক্তি ফৌজ তাদের উন্নতিকল্পে তাদের প্রতি সর্বদাই সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে আছে এবং তিব্বতীদের হুকুম করে কাজ করাবার বিন্দুমাত্র মনোভাব নেই তাদের। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের জীবন ধারণের রসদ পর্যন্ত পার তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ থেকে—তিব্বতীদের স্থানীয় তহবিল উদ্ধার করে নয়।

॥ জাতীয় ঐক্য ॥

জাতীয় ঐক্য বলতে যা বোঝায় তা কেবল পু খিগতভাবেই ওখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না, তিব্বতীদের জীবনের বাস্তবক্ষেত্রেও প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়। চীনাদের মত তিব্বতীরাও পিকিং-এর জাতীয় গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব করে। তার প্রমাণ তিব্বতী

জনগণ কর্তৃক দাঙ্গাই লামা গণপরিষদের ষ্টিয়াণ্ডিং কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিব্বতী অধ্যুষিত (তিব্বতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সোক তিব্বতের মূল ভূখণ্ডের বাহিরে বাস করে) সেচুয়াঙ, কাঙমু, চীঙহাই এবং য়ুনান প্রভৃতি চীনের প্রাদেশিক অঞ্চলগুলিতেও তিব্বতীদের জন্য স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সম্প্রতি সিকাঙ প্রদেশকে একেবারে ভুলে দিয়ে দাঙ্গাই লামা এবং পাঞ্চেন লামার প্রতিনিধি দলের সংগে পরামর্শ করে নয়াচীন সরকার তিব্বতে স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশ গঠনের জন্য ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেছেন। প্রস্তাবিত এই প্রদেশের মধ্যে থাকবে বর্তমান স্থানীয় শাসিত অঞ্চল, পাঞ্চেন লামা শাসিত অঞ্চল এবং সিকাঙের বিরাট চামদো অঞ্চল। এই ব্যবস্থায় চীনাদের মতই নিজেদের স্থানীয় বিষয়সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই পরিচালনা নিজেরাই করতে পারবে। এই ব্যবস্থায় তিব্বতীদের মধ্যে তাদের জাতীয় একতাবোধের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে-এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, বহুকাল যাবত প্রতিক্রিয়াশীল চীনা শাসক-শ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা দাঙ্গাই লামা পাঞ্চেন লামার মধ্যে যে বিরোধ জ্বীয়ে রাখা হয়েছিল, নয়াচীনের মহানায়কদের প্রচেষ্টায় তাঁদের অন্তর থেকে সেই বিরোধ একেবারে দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছে।

বহু চামোপযোগী উপত্যকা ও পশুচারণ-ভূমিতে প্রতিনিয়তই অসংখ্য হত্যাকাণ্ড এবং পশুাদি লুণ্ঠনের বর্বরতা চলতো এবং মানুষের দুঃখ-দুর্গতির আর সীমা-পরিমীমা ছিল না। সেইসব লুণ্ঠনরাজ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কানটিঙ নামক অঞ্চলের একমাত্র কাঙসে এলাকাতেই প্রায় দুই সহস্রের মত এক দুর্ভিক্ষ গোষ্ঠী তাদের সেই দুঃস্বস্তিপূর্ণ জীবনধারা পরিহার করে শান্তির পথ বেছে নিয়েছে। কারণ, শুভচৈতন্য উবুত হয়েছে তারা। কি করে এই-ই বা সম্ভব হোল—একথা ভাবতে গিয়ে অবাক হবার প্রয়োজন নেই। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির পরিবর্তে নয়াচীন যে তার ‘সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য জাতীয় সংহতি স্থাপন’ এই নীতির প্রয়োগ করেছে সর্বত্র, এইসব উন্নতি তারই প্রমাণ।

একথা আজ সুনিশ্চিত যে, কুটনীতি এবং দেশরক্ষার জন্যে বিশাল চীনা জাতির সংগে বন্ধুত্ব থাকলে, তিব্বত আর কখনোই সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে পড়বে না বা তিব্বতকে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কোনোরকম ঝাঁটিতে পরিণত করতে পারবে না। সকলেই জানেন, কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতে ঝাঁটি গাড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য জানতে পারার সংগে সংগে তিব্বত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কতখানি সচেতনতা প্রকাশ করে তার প্রমাণ রয়েছে যুদ্ধ এবং আগবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবীতে আন্তর্জাতিক সংস্থায় তিব্বতীদের অসংখ্য স্বাক্ষর দানের মধ্যে।

চীনগণতন্ত্রের কাজ হচ্ছে জাতিনিবিশেষে সকলের সুখশান্তি এবং দেশরক্ষার সহায়তা করা। সুতরাং নয়াচীন কখনো মানুষের মত তিব্বতকে সাম্রাজ্যবাদীদের আওতায় বেতে দেবে না। পুরাতন তিব্বতের সর্বপ্রকার উন্নতির পথকেই খুলে রাখবে, তাই তারা শোষকদের

পথকে রুদ্ধ করে রাখবার নিশ্চয়তা ঘোষণা করেছে সর্বদাই। সঙ্কটচ্যুত হয়ে তিব্বত এখন নয়াচীনকে নিজের ভবিষ্যত স্বার্থের গ্যারান্টি স্বরূপ গ্রহণ করেছে।

ভীষতীরা ভয়ানক ধর্মভাবাপন্ন এবং তাদের একটি সুবৃহৎ অংশ সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যদিও নিরাকারবাদী, তথাপি ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থক। চীনের মৌলিক নীতিতে নিশ্চয়তা ছাড়াও, তিব্বতের সংগে ১৯৫১ সালের মুক্তিসাধন চুক্তিতে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয় যে, তিব্বতীয় জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতি প্রথাকে সম্মান করা হবে এবং মঠ ইত্যাদিও রক্ষিত হবে; এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মঠসমূহের আয়ের উপর কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না।

লাসার শাসনাধীন অঞ্চলে তিব্বতীদের মধ্যে এখনো তাদের হাজার বছরের পুরোনো রীতি বিদ্যমান। চাষী, পশুপালক এবং কারুশিল্পীদের স্বাধীনতা বা নিজেদের সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। তারা এখনো স্থানীয় সরকার বা লাসা কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতদাসস্বরূপ। স্থানীয় সরকার-এর রূপ এখনও ধর্মাত্মকী রাজতন্ত্রের মত।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র চীন গণতন্ত্রের সংবিধানে লিখিত আছে—All the nationalities have freedom...to preserve or reform their own customs or ways...National Autonomous Areas are inalienable parts of the People's Republic of China." (Art-3)..."The form of each organ of self-government may be determined in accordance with the wishes of the majority of the people of the Nationality or Nationalities enjoying national regional autonomy in a given area. (Art. 67) •

এ ছাড়াও তিব্বতের সংগে চুক্তিপত্রে বিশেষ ঘোষণা করা হয়েছে :

"The Central authorities will not alter the existing political system in Tibet, there will be no compulsion by the Central Authorities. The Local Government of Tibet should carry out reforms of its own accord, and when the people raise demands for reform, they shall be settled by means of consultation with the leading personnel of Tibet." †

• সমস্ত জাতিই স্বাধীন হবে, তাদের সামাজিক রীতিনীতি রক্ষা বা সংস্কারের ব্যাপারেও তাদের স্বাধীনতা থাকবে এবং স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলগুলি চীনজনগণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে" (সংবিধান-৩)..."স্বায়ত্ত-শাসন প্রদত্ত জাতি বা জাতিগুলি স্ব স্ব এলাকায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাবলে এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রূপ ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করতে পারবে।" (সংবিধান-৬৭)

† কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তিব্বতের প্রচলিত রাজনৈতিক প্রথার কোনোরূপ পরিবর্তন করবে না বা এবিষয়ে কোনরূপ ক্ষমতাও প্রয়োগ করবে না। তিব্বতের স্থানীয় সরকার স্বকীয় অভিল্যব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংস্কার বিধান করবে এবং জনসাধারণ কর্তৃক যখন যেমন বিদ্রোহের দাবী উত্থাপিত হবে, তখন সেগুলি তিব্বতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে পরামর্শ করে মীমাংসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

সমাজতন্ত্রের স্বরূপটা ঠিকমত বুঝবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে এই বোষণাগুলি উদ্ধৃত করলাম। বোষণাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের স্বাধীনতা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তিব্বতী জনসাধারণেরই উপর, যারা চুক্তিপত্র অনুযায়ী তাদের দেশের অর্থনীতি শিক্কা এবং জীবিকার উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সবরকম সাহায্য পেতেই থাকবে।

দাসাই লামা আমাদের সংগে এক সাক্ষাৎকারে বলেন : চীনের সংগে শান্তিপূর্ণ গণমুক্তিসাধন চুক্তিই তিব্বতকে তার মাতৃভূমির বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে পুনঃসংস্থাপন করেছে। অন্ধকারে পিছিয়ে থাকার পথকে পরিহার করে তিব্বত এখন সুখসমৃদ্ধির দিকে নতুন আলোর পথে পা বাড়িয়েছে।

পাঞ্চেন লামা বলেন : আমি বেশ জোরের সংগেই বলছি যে বিগত চার বছরের সামান্য বেশি সময়ে তিব্বতে গণমুক্তি ফৌজ এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর কর্মীরাই চুক্তিপত্র অনুযায়ী ছবছ কাজ করায় তিব্বত ইতিমধ্যে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছে।

যে সমস্ত সাধারণ লোকের সংগে আমরা মিশেছি তারা সবাই বলেছে তাদের দেশ যে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে, তা সম্ভব হয়েছে তিব্বত-সিকাণ্ড সড়কর জন্মই।

এখন কথা হচ্ছে, দশম শতাব্দীর জীবনকে তো আর ভোজবাজীর মত রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক বিংশ শতাব্দীর জীবনে পৌঁছে দেওয়া যায় না! তাদের হয়ে তাদের কাজও অন্য কেউ করে দিতে পারে না, বা তেমন চেষ্টাও কেউ করবে না। সামাজিক সমৃদ্ধির পথে তাদের জাগ্রত চেতনাকে সাহায্য করা যেতে পারে মাত্র।

তিব্বতীদের নিজেদের মধ্যে যে ঐক্যবোধ জেগেছে এবং নয়াচীনে তাদের চীন ভাইদের সংগে যে রূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সন্ধি স্থাপিত হয়েছে—সেটাই হচ্ছে তাদের অগ্রগতির প্রথম ধাপ। মার্কস ও লেনিনের জাতীয় ঐক্য স্থাপনের মতবাদ প্রয়োগে এক জাজ্জল্যমান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে তিব্বতে। তাই সেই তিব্বত আজ প্রাণাবেগে চঞ্চল হয়ে নতুন পৃথিবীর দিকে পা বাড়িয়েছে।

অনুবাদ—নীলরতন মৃধোপাধ্যায়

আকর্ষণ

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯৪৭ সাল ১৪ই আগস্ট।

ছুটি পেয়ে বাড়ি আসছি। পথ চলতে চলতে মনটা কেমন হয়ে গেল।

আনন্দোৎসাহে ভেঙ্গে পড়ছে সমস্ত দেশ। তোরণ তৈরী হচ্ছে পথের মোড়ে মোড়ে—
গান্ধীজী, নেহরুজী, নেতাজীর কটো সাজানো হচ্ছে কতই-না বিচিত্রভাবে। পথের দুধারে
গাছগুলোতে বহু পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে,—বোধহয় পরদিন সময় পাবেনা বলে।
অনেকস্থানেই শহীদ বেদী স্থাপিত হয়েছে। ওই একটি জায়গায় যতবারই চোখ পড়ে—
অস্থির অনুভূতি ততই বেড়ে চলে।

কেমন যেন একটা পিছনের আকর্ষণ।

প্রায় চল্লিশবছর পাঠশালার পণ্ডিতি করে আসছি—এর মাঝে কত পাঠশালা ছেড়ে
নূতন পাঠশালার পড়াতে গিয়েছি। সেই পিছনের দিনগুলো টেনে নিয়ে চলেছে কেমন অদৃশ্য
আকর্ষণে! হঠাৎ আমার মনের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করে থমকে দাঁড়িয়ে
থায়। আমি যেন দেখতে পাই : একটি বালক, দক্ষিণের হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাড়াতাড়ি
ছুটে আসছে। মুখখানা ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুখটি তার হাসিতে ভরা! হয়তো কোনো
ছাত্র হবে। জীবনে চল্লিশটি বছরে ছাত্র-তো আর কম পড়াইনি! কিন্তু কি-একটা ছবি
যেন এর সঙ্গে নির্জন প্রান্তরের স্বতিকে সজোরে নাড়া দিয়ে মিলিয়ে যায়। সে-স্বতিতে
অপূর্ব কিছু না থাকলেও—ক্ষণিকের জন্যে অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এবার কানে এলো “নমস্কার পণ্ডিত।”

অনুভব করলাম যেন ঝোড়ো হাওয়া ছেড়েছে, অবলম্বনহীন দেহ এখুনি উড়িয়ে নিয়ে
যাবে। খোকাকে বুকে চেপে উল্লসাসে বাড়ি আসি।

দূরে জমিদার বাড়ির ঘণ্টা বেজে ওঠে মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে এক বিচিত্র
অনুভূতি জাগে। শোক, দুঃখ, বিরহ—কোনটাই নয়। তবু ক্ষুদ্র যুহুর্ভটিকে উপেক্ষা করতে
পারলুম না। অনেক চেঁচাতেও ঘুম এলনা। উঠে পরি বিছানা ছেড়ে।

দরজা খোলার শব্দ শুনে একটা পেঁচা নয়তো বাহুড় উড়ে গেল। আমার সমস্ত শরীর
ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আনমনে তবু বেরিয়ে পড়ি।

ছুঁ করে একটা দম্কা হাওয়া এসে ঘরের চালের উপর থেকে বাঁশের ডগাগুলো
সরিয়ে দেয়। উত্তরের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তারার আলোতে ওদিকের পথটা

বেশ দেখা যাচ্ছিল। সহজ সরল অনাড়ম্বর পথটি ধরে কোথায় চলেছি, যেন ঠিক করে উঠতে পারলুম না।

চলেছি ত চলেছি। কতক্ষণ চলেছি তা জানিনা। অশ্বখ গাছের ছায়ার মত একটা প্রকাণ্ড জমাটবাঁধা ছায়া এসে হঠাৎ সামনে দাঁড়ায়। শরীরটা কেমন যেন বোধ হতে থাকে। মনে হল একটু আলো যদি পাই? একটা হৌচোট খেয়ে টাস সামলে দাঁড়াতেই, কতগুলো পার্শ্বী কিচিড়মিচিড় করে ওঠে মাথার ওপর। শেষরাত্তির স্নিগ্ধ নীরবতা আর আশপাশের অজানাফুলের গন্ধে শরীরটা কেমন ভারী হয়ে আসে। গাছটি হেলান দিয়ে বসতেই কেমন যেন তন্দ্রা এসে যায়।

“পণ্ডিত, ভোর হল যে—ওঠ নাগো?”

“এ্যা!—হ্যা!” চেয়ে দেখি ভোর হয়ে গেছে। চতুর্দিকে শাঁক বেজে ওঠে। কে তাকে এত দূরে টেনে নিয়ে এল—এ যেন আর সববস্তুর মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাইশবছর আগের কথা।

এই গ্রামের অধর ধাড়ার বাড়িতেই পাঠশালা বসে। ছাত্রছাত্রী মিলে জন ত্রিশেক হবে। কোন্ সূত্রে এখানে মাষ্টারী করার জন্যে আমার যে ডাক আসে—আজ তা মনে আসছে না।

পাশের বাড়ি নীলমণি শাঁতের। সেখানেই বসেছি। একটু দূরেই বছরচারেকের একটি ছেলে তালের খুঁটিটি কান্ধে ধরে দাঁড়িয়ে। বেশ আনন্দেভরা তার মুখটি। চোখের জড়তা কিন্তু কাটাতে পারেনি—পাড়ারগাঁয়ের ছেলের যেমনটি হয়। নাক চোখ বেশ ভীক। এক নজরেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করবো এমন সময় চুদীর শব্দ শোনা গেল দরজার দিকে। চেয়ে দেখি একটি ছোট মেয়ের হাতের সঙ্গে ছকাটি বেরিয়ে আছে। ছকাটি নিয়ে তামাক খেতে খেতে ছেলেটির দিকে চেয়ে বললাম—“কাচ, তোমার নাম কি?”

হঠাৎ মেয়েটি বেরিয়ে আসে। এক হাতে ছেলেটির হাত ধরে অপর হাতে ঘোমটার একধার টেনে, হাসতে হাসতে দেয় ছুট।

বাওয়ার অপরদিকে বুলানো দোলনাটি নড়ে ওঠে একটু বাদেই। চেয়ে দেখি—দোলনার কাঁকে দুটি দুই চোখ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ছেলেটির বাবা আসতে পরিচয় হল। বললেন “আমার ধাকা এবং বাওয়ার জায়গা ঠিক হয়েছে এইখানেই।”

ভদ্রলোকের স্ত্রী নাই। ছেলেটি নিজে আর ঐ মেয়েটি। এই নিয়েই ওর সংসার। পরিচয় হতেই নীলমণি বলেছিল—এই মেয়েটিই যা হোক সিদ্ধ পোড়া বাগ্না করে দেয়। কষ্ট করে থাকতে হবে কিন্তু। কিগো, মনে কিছু করবে না তো?”

আমি বলেছিলাম—“না না, মনে করার কি আছে। ছ’দিন বাদে আমি আপনাদেরই একজন হয়ে যাব।”

নীলমণির মুখখানা খুশিতে ভরে ওঠে। হাঁক দিয়ে বলেছিল—“ওরে পেলু,—আয় দেখি, পণ্ডিতকে একটা ভাব পেড়েছি।” আর মেয়েকে বলেছিল—“ওরে কুন্সিনী, পণ্ডিতকে পা খোয়ার জল দে।”

পাশের বাড়ি অধর বাড়ার। মাঠের দিকে নতুন ঘর তুলেছে তারই লম্বা বারান্দার পাঠশালা বসে। সামনেই দক্ষিণের খোলা মাঠ। তারপরেই একটি খাল চলে গেছে ছুর্গাপুরের হাট পর্যন্ত। এখান থেকে তার দূরত্ব মাইলটাকু হবে।

পেলু আর কুন্সিনী সত্যি বড় দূরত্ব। যা নেই, সংসারের সমস্ত কাজ কুন্সিনীকে নিতে হয়েছে। এর মাঝে স্বভাবের নীরবতা এসে গেছে। পেলুর ছুটুখী কিন্তু দিনদিন চরম পর্যায়ে এসে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে প্রায় ছ’বছর কেটে যায়। এবার একদিন আমারই বসার আসনে শুয়োফল এনে লাগিয়ে রেখে দেয় পেলু।

সমস্ত দিন বাড়ি আসেনা। সন্ধ্যার তার বাবা কোথা থেকে ধরে এনে এমন মারলে যে ছুটে এসে আমার ছড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বলতে থাকে—“পণ্ডিত আমার বাঁচাও, আমি কোনো দিন আর তোমার সঙ্গে লাগতে যাব না।”

কপাটের আড়ালে কুন্সিনী চেয়ে আছে আমারই মুখের পানে। চোখে সে কি উৎকর্ষা!

আমার সমস্ত শরীর শুয়োফল লেগে ফুলে উঠেছে। তবু আমার অমুরোধে নীলমণির শাসন সেদিনের মত প্রশমিত হল। এরপর তার ছুটুখী বন্ধ না-হলেও, আমার সঙ্গে কোনোদিনই লাগতে আসেনি। তবু সে আমাকেই তার সব অপরাধের আশ্রয়স্থল ঠিক করে নেয়।

সেখাপড়া সে করবে না ঠিক করেই নিয়েছিল। কোথায় যাচ্ছিল ধরা হচ্ছে সেখানে সে ছাকুনী জাল নিয়ে হাজির। কোথায় রাখালেরা গরু চড়াচ্ছে সেখানে সে কপাটি খেলছে। পাঁচদশ গ্রামের মধ্যে কোথায় যাত্রা কীর্তন বা পাঁচালী পড়া হচ্ছে, এ-খবর জানতে হলে পেলুর কাছে গেলেই হল। কোথায় কসু কল পেকেছে পেড়ে আনবে মাষ্টার আর কুন্সিনীর জন্যে।

আজ সকল। থেকে বেরিয়ে গেছে, খাওয়ার সময়ও কেবেনি। কুন্সিনীর সে কি ছটফটানী—কেবলই ঘর আর বাব করছে।

বেলা আনন্দ চারটে হবে। তামাক খাচ্ছিলুম বের হব বলে দেখি সামনের দরজার দাঁড়িয়ে কুন্সিনী মুখটি শুধু বেরিয়ে আছে আর সমস্ত শরীর কপাটের আড়ালে ঢাকা।

বামগালে কপাটটি চেপে ডাকলে—“পণ্ডিত ?” উঠে এসে বল্লাম—“কি বাওয়া হয়নি তো ? যাচ্ছি দাঁড়াও । আশ্র ওকে লটকিয়ে বিষ পিঁপড়ে ছেড়ে দেবো না ?”

“এ্যাঃ !—রুস্বিনী শিউড়ে ওঠে । এবার কচ্ছি এসে সে বলে—“বাবাকে বলনা পণ্ডিত ।” মাথা নিচু করে থাকে উত্তরের আশায় ।

আমি একটু রেগেই বল্লাম—“আর কিছু বন্বিতো বল ?” শুধু উৎকর্ষার দৃষ্টি নিয়ে আবার বলে—“পণ্ডিত ?”

আমি বল্লুম—“ভয় নেই, মারবো না ।” তবু আমার পেছনে পেছনে খাড়াবের বাড়ি পর্যন্ত এসে পাঠশালার বারান্দার তালের খুঁটিটি ধরে দাঁড়ায় সে ।

একটি লোক বলে—ও বেলা তাকে খাল ধারে কাঁকড়া ধরতে দেখেছে । হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে যাই ।

খালের জল অনেক নিচে নেমে গেছে । অনেক দূরে মাটিতে গড়া একটি পুতুল বলে মনে হল । এবার তাকে চলতে দেখে বুঝতে বাকী বইল না যে এই আমাদের পেলু । গোয়া গাছের ডাল গুল্লুরী করে কাঁকড়ার গর্তে পুরে দিচ্ছে আর একটু বাদেই তাকে টেনে বের করছে । মাঝে মাঝে দু একটা কাঁকড়াও ছিটকে বেরিয়ে আসছে ।

আমার দেখেই চোঁচিয়ে বলে—“পণ্ডিত বামা আননি ? কিছু না বলেই ধরে নিয়ে আসি বাড়িতে । দূর থেকেই দেখতে পেলাম রুস্বিনী তখনো দাঁড়িয়ে । রুস্বিনীই এগিয়ে আসে । কাঁদা গায়েই আঁচল ঢেকে পুকুর ঘাটে নিয়ে যায় যেন বাপে না দেখতে পায় ।

গাঙ্গী টুপী মাথায় একদল ছোঁড়া এসেছে । বাড়ি বাড়ি গান করে চাল তুলেছে অনেক । পেলু তাদের সঙ্গে সমস্ত দিন ঘুরে একটি গান শিখেছে । সে কি আনন্দ ! সমস্ত দিন গলা ছেড়ে গান করে পেলু ।

গ্রামে এখন বন্দুকধারী পুলিশ মাঝে মাঝেই দেখতে পাওয়া যায় । পুলিশ বা কেন আসে আর স্বদেশীওলারাই বা কেন আসে, পেলু তার কোনো ধরই রাখেনা । পুলিশ দেখলেও তার আনন্দ—আবার স্বদেশীওলাদের দেখলেও তার আনন্দ ।

একদিন পণ্ডিতের সঙ্গে কি সব কথা হচ্ছে স্বদেশীওলাদের বোঝে না কিছুই, তবু ভাল লাগে । স্বদেশীওলারা চলে যেতে পেলু চুপি চুপি বলে—“পণ্ডিত, আমার স্বদেশী করে দিবে ?”

বলি—“মার খেতে পারবি ?”

ও বলে—“তুমি জাননা পণ্ডিত । আমার সঙ্গে পুলিশের খুব ভাব ।”

“তবেই তো সব বলে দিবি, না ?”

“খ্যাৎ—বলবো কেন । স্বদেশীওলাদের সঙ্গেও আমার খুব ভাব যে ।”

সত্যি পেলুর সঙ্গে ছ’পক্ষেরই ভাব । পুলিশ জানতে চায় কাদের বাড়ির ছেলেরা স্বদেশী করে ।

একদিন পাঁচ গ্রাম মিলে সভা বসেছে ওদেরই গাঁয়ের শীতলার খানে। পেলু এক নজর দেখে চলে আসে খালধারে, কি সর্বনাশ! একদল পুলিশ এদিকেই আসছে। পেলুর সে কি আনন্দ। ছোড় পায়ে লাফাতে থাকে হাততালী দিয়ে। বসছে—কি মজা পুলিশ এসেছে।

পুলিস অফিসার সামনে এসে বলে—“এই, কোথায় মিটিং হচ্ছে জানিস?”

“মিটিং!” পেলু অবাক হয়ে বলে “সে আবার কি?...ও—হোঃ! স্বদেশী ওলা তো অনেক এসেছিল? তারা কখন চলে গেছে।” গাল বাঁকিয়ে বলে পেলু। আবার বলে—“আচ্ছা, দাঁড়াও।” এই বলে কতকটা দৌড়ে যেয়ে, আবার এসে বলে—“ছোটো পয়সা দাওনা গো? সকাল থেকে কিচু খাইনি।”

ছোটো পয়সা দিয়ে পুলিশ বলে—“চল, আমাদের সঙ্গে। দেখিয়ে দিবি।”

মাথা নেড়ে পেলু বলে—“হু—এসনা?” এবার আনন্দে লাফাতে লাফাতে সামনের পাড়াটিতে চুকে চীৎকার করে বলতে থাকে—“বা কি মজা, পুলিশ এসেছে।” সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে শাঁক বেজে ওঠে, পুলিশ বোকা বনে যায়।

কেউ জানে না, অথচ এরকম অনেক বিপদ থেকে পেলু গ্রামকে অনেকবার বাঁচিয়েছে। ছব্বিশে জামুয়ারী। গ্রামে গ্রামে চলেছে স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি, প্রত্যেক বাড়ির প্রতিটি ঘরে, রাস্তার ধারে বত গাছ আছে, দেবালয়, স্কুলবাড়ি সর্বত্রই পতাকা ময় কান ফেলতে হবে। সমস্তদিন পতাকা তৈরী হচ্ছে গ্রামের গোপনীর স্থানে। ঐ কারণে আমিও পাঠশালা ছুটি দিয়ে দিয়েছি সেই সকালে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পেলু চুপি চুপি আমায় বলে—“পণ্ডিত, কি এনেছি দেখ?”

“চুরি করে এনেছিস বুঝি?”

“ইস্! চুরী করে আনবো কেন! দিদির কাছে পয়সা চেয়েছিলুম। দিদি বলে পয়সা কোথা পাব? তার পর জান? কলসী থেকে এ—ত চাউল ঢেলে দেয়।.....যাই দিদিকে দেখিয়ে আসি। “এই বলেই রুস্তমীর কাছে ছুটে যায়। বুঝতে বাকি রইল না যে ঐ চাল বিক্রি করে খদ্দের পতাকাটি কেনা হয়েছে।

সন্ধ্যায় পেলু বাড়ি এসে বলে—“দিদি, আমায় একটা বিছানা করে দেনারে। অনেক হেগেছি।” বলতে বলতে নেংটা হয়ে আবার বাঁধের ধারে বসে যায়। দেখতে দেখতে ভেদবমিতে অস্থির হয়ে পড়ে পেলু।

রুস্তমী কেবল ঘর বার করছে। আমিও নেই, ওর বাবাও গেছে কোন কুটুমবাড়ি। একটু রাত করেই বাড়ি ফিরি। এসেই কেউ বামুনের বাড়ি যাই। কবিরাজি করে কিনা। ওখান থেকেই নীলমণির ঘোঁষে যাই পেলুর কুটুম বাড়ি। এসে দেখি—ভাই বোনে যেন যুদ্ধ চলেছে। জিজ্ঞাসা করে নীলমণি—‘এ অবস্থা কতক্ষণ যাবৎ চলছে?’ রুস্তমী চোখ মুছতে মুছতে বলে—“পণ্ডিত চলে যেতেই—কেবল হাত গেল, পা গেল...আর চীৎকার—তারপর ছুটে পালাতে চায়।

পেনু আসতেই রুস্বিনী যখন বিছানা পেতে দেয়—পেনু তখন দ্বিধিক কত কথাই বলেছিল। সেই কথাগুলোই রুস্বিনীর কেবল ঘুরে ঘুরে মনে আসছিল—আর চোখের জল ফেলছিল।

—“জানিস্ দিদি ? হাটের উপর সেই যে অশ্বখ গাছটা—ঐটাই আমাদের পাঁচ গায়ের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু—নারে ? দেখ্‌বি কাল রাত থাকতে ঐ গাছের মাথায় আমি পতাকা তুলে দিয়ে আসবো।”

“ননা,—ওখানে তুলতে যেওনা ! ওখানে পুলিশ থাকে। দেখতে পেলো গুলি করবে।”

“ইস্—গুলি করবে কেন ? তুই ভারি বোকা। পুলিশের সঙ্গে আমার ভাব আছে না বুঝি ? তুই আর আমি রাত থাকতে যাব—কেমন ?”

সমস্ত রাত্রিটা বিকারের ঘোরে ঐ পতাকা তোলার কথাই বলেছে। সমস্ত রাত বসে রুস্বিনী পায়খানা যুক্ত করেছে আর কেঁদেছে।

রাত্রি প্রায় ভোর হতে চলেছে। নীলমণি ডাকে রুস্বিনীকে পায়খানা যুক্ত করতে। আমি বললাম—“সমস্ত রাত জেগেছে—একটুকু ঘুমাক। আমি যুক্ত করে দিচ্ছি।”

ভোর হতে গ্রামের হাড়ু মোড়ল দৌড়ে এসে খবর দেয়—রুস্বিনী পাতাকা বুকে করে হাটের উপর পড়ে আছে।

পাগলের মত ছুটে যায় নীলমণি রুস্বিনীর সন্ধানে।

নীলমণি সাঁতের মেয়ে পতাকা তুলতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মরে গেছে—একথা বিছাতের মত সোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, দশ বিশখানা গ্রামে। দেখতে দেখতে হাজার হাজার লোক এসে জড় হয়ে যায়। তারা রুস্বিনীকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করেছে।

এতক্ষণে পেনুর যেন একটু চেতনা ফিরে এসেছে। কিন্তু সে প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্বে জ্বলে ওঠার মত। ক্ষীণ স্বরে পেনু ডাকে—দিদি—দি—দি.....।”

দশগ্রাম প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রা এসে ঐ হাটের উপর থেমে যায়। অশ্বখ গাছের দক্ষিণে, যেখানে রুস্বিনী গুলিবিক্ত হয়, সেখানেই তার অন্তেষ্টিক্রিয়া মহা সমারোহে—বন্দেমাতরনধ্বনির ভিতর সম্পন্ন হয়।

পেনুকে, তার নানা, আমি আর পাড়ার কয়েকটি লোক মিলে খাল ধারেই দাহ করি।

চতুর্দিকে শব্দধ্বনি শুনে আমার তজ্জা ছুটে যায়। চেয়ে দেখি সেই অশ্বখের তলাতেই আমি বসে। পাশেই রুস্বিনীর শহীদবেদী। দেশের লোক রুস্বিনীকে যোগ্য সম্মানই দিয়েছে। তবু যেন আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে এক মর্মান্তিক অমুভূতি মনে এল—পেনু ? ওকে ত আজ দেশের লোক নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ? চল আসি নীলমণির বাড়িতে। বাড়ি বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরাধীর মত গিয়ে দাঁড়াই যেখানে ওকে দাহ করেছিলাম। রাস্তার ধারের গাছগুলি থেকে কয়েকটি পতাকা খুলে চিতার উপরে

গাছগুলির সংগে বৈধেদি। ঝিঝু ঝিঝে একটু হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো একটু নড়ে ওঠে। চলে আসি সেই নারকেল গাছটির কাছে। অবসাদে মন ভরে ওঠে। ওখানেই বসে পড়ি। মনে পড়ে : প্রথম মাষ্টারি করতে আসার দিনটির কথা। তারপরে কুন্সিনীর সেই হাত বাড়িয়ে তামাক দেওয়ার কথা, হোলনার কাঁকে পেলুর ছুঁ চোখ দুটি, অপরাধী ভাইকে কুন্সিনীর আঁচলে আড়াল করে রাখা। আহা,—সত্যি মা-হারা যেন মায়ের স্নেহ পেয়েছে। বুকের ভিতরটা আনন্দে শিড় শিড় করে উঠল। কানে এস—‘পণ্ডিত, ডাব এনেছি—ধাবে না?’

“এ্যাঃ—!” চেয়ে দেখি কেউ নাই। হু হু করে একটা দক্ষিণের হাওয়া এসে সমস্ত গাছগুলোকে নড়িয়ে দেয়।

খাল-বিল-পাতের কাহিনী

ফণীকুনাথ দাম্পত

॥ চার ॥

নটবর যখন পুতুনের খণ্ডরবাড়ী গিয়ে পৌঁছল তখন বেলা দুটোতিনটে হবে। পুতুনের খণ্ডর দারিক দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল। নটবরকে আসতে দেখে দাওয়া ছেড়ে উঠানে এসে বলল : কে নটবর না? আসো—আসো। অনেকদিন বাদে আসে। নাও, ধর ছাঁকো নেও।

বছর খানেক ঘুরতে এল দারিকের ছেলে মারা গেছে। তামাক খেতে খেতে বুড়ো অনেক ছঃখের কথা বলল। ষোয়ান বেটা পৈতৃক-ব্যবসা ছেড়ে গেল অর্থ করিতে, অপদাত মৃত্যুও তাই হোল। এখন বুড়ো বয়সে পুতের বৌ নিয়ে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে।

নটবর অনেকদিন বাদে এল এ বাড়িতে। আগে যখন আসত তখন দারিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। আজ দেখল খড়ের ঘর একখানা আছে বটে তবে একেবারে ভগ্নদশায়। মাটির দাওয়া একদিকে ধসে পড়েছে, বাশের খুঁটি নড়নড়ে হয়েছে। বেড়াগুলি জীর্ণ হয়েছে, খড়ের ছাউনি মাঝে মাঝে একেবারে পাতলা হয়ে গেছে। বাড়ির আসে পাশে আগাছা বেড়ে জংগল হয়েছে। চারিদিকে একটা লম্বীছাড়া ভাব।

বুড়োর কাছে তার আসার আসল উদ্দেশ্য ত হট করে বলা চলেনা। অবশ্য ভাব দেখাচ্ছে যেন তাদের সঙ্গে দেখা শুনাই করতে এসেছে নটবর। আসল কথা পাড়তে হবে পুতুনের কাছে। তারপর বুড়োকে বললে হবে।

দারিক বলল : এয়েছ যখন তখন খুদ হোক আর শাকপাতা হোক ছটো খাতি হবেনে। ও পুতুনী, ও বউ, তোর দাদা নটবর এয়েছেন। ত্যাল আনে দে, গামছা দে—

পুতুনী ঘরের ভেতর ছিল। তার বৈধব্য পুরানো হলেও নটবরের কাছে নতুন। একটু বাধ বাধ ঠেকছিল সামনে আসতে।

তেল নাই! একখানা জীর্ণ গামছা নিয়ে দাওয়ায় এসে পুতুনী নটবরকে প্রণাম করল।

নটবর পুতুনের হাত ধরে বলল : আর পুতুনী বুত্তি, আমার ধারে বস।

দারিক দাওয়ায় চাল থেকে ছেঁড়া জালটা নিয়ে বলল : বস নটবর, আমি আসতেছি।

পুতুনী বসে কাঁদতে লাগল।

নটবর তাকে সাধুনা দিয়ে বলল : কাঁদিসূনে বুজি, চুপ কর। অন্ধর মারে কামটে কাটে মারল। কত আপদ বিপদ আলো গেলো এ ক'বছর। তোরও কপাল ভাঙ্গল। ধোঁকধবর কিছুই নিতি পারিনি !

পুতুনী চোখের জল মুছে বলল : জ্বর জ্বালায় চোখের সামনে বিছানায় মরলি তবু সওয়া যায়, তা না একজন মরল বন্ধুকের গুলীতে, আর একজন কামটের কামড়ে।

পুতুনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থেকে বলল : মরবার ক'বছর আগে থাকতি মতিগতি ঠিক ছিল না। মাঝে মাঝে বাড়ি থাকত না। ও মা—মা, হঠাৎ আসে একদিন কয়, নটবর দার বউরে কামটে কাটিছে !

কথাগুলি বলে হাউ মাউ করে পুতুনী কেঁদে উঠল, যেন এইমাত্র সে মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে !

নটবর পুতুনীর পিঠে হাত রেখে বলল : ছাড়ান দে বুজি ওসব কথা !

পুতুনী কি সহজে ধামতে চায়। কেঁদে কেঁদে বলল : ছাড়ান দে—বাদ দে—

পুতুনী তারপর আরম্ভ করল তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ! সোয়ামী ত মরল, পুতুনীরও বাচার আশা নেই। বুড়োর এক পয়সা রোজগার নাই। বনের কচু শাক, ডুমুর আর লতাপাতা সেদ্ধ করে খেয়ে আর কতদিন চলে ! চাল যা যোগাড় হয় তাতে একজনের খোরাক হতে পারে মাসে। পুতুনী কি করবে ভেবে চোখে আঁধার দেখছে।

নটবর দেখল এইত সুযোগ। ' সেও আরম্ভ করল তার বাড়ির কথা। কুমুদ মারা বাবার পর থেকে তার কষ্ট হচ্ছে, ঘরের একটা ছেলে পরের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। অথচ তার সংসারে চাল ডালের অভাব নেই, অভাব শুধু মানুষের।

নটবর বলল : কদিন ধরে তোর কথা ভাবতিছি। তুই যদি যায়ে অন্ধররে কোলে নিস, আমাগো ছুটে। ভাত জল দিস তবে আমরা বাপ বেটা বাঁচে যাই। নিজির বাড়ির মত থাকবি আমার কাছে। তা তোর বুড়ো খউর আবার কি কবে তাই ভাবি !

এমন সুযোগ কি আর পুতুনী ছেড়ে দিতে পারে ! হুংকার ছেড়ে সে বলল : সে বুড়ো ঘাবার কবে কি ! সে আমারে খাওয়াবে কনখে ? আর দু'দিন কয়ে চোখ বুজলি আমার ঠৈরব ছাড়া আর গতি থাকবে না।

নটবর বলল : তাহলি বুড়োরে বলি ?

পুতুনী বলল : বাবা। বুড়োর আবার ভাবনা কি ! চলে যাক নদীর ওপারে মাইয়ের কাছে, তারাত বড়লোক শুনিছি !

স্মরিক কিরে এল। হাতের খলুই আর জাল দাওয়ায় রেখে বলল : ও বৌ সেও, মাছ সেও, মাছ সেও। তোমার দাদার ভাগ্যি ভাল, দু'ক্ষেপে কুড়ি তিনচার উঠেছে। ওও, কোলে ঘেন তার হয়, কুটুম এয়েছেন বাড়িতে।

নটবর হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল : ও খলুই, দেখি কি মাছ আনিছেন কুটুম খাওয়াতি !

হরেকরকমের নদীর কূঁচো মাছ। এ বাড়িতে এই যথেষ্ট। খুশি হয়ে নটবর বলল : বা-বা, বড় ভাল মাছ ধরিছেন ! ও পুতুনী, ভাল করে খাল কটকটে খোল করদিন বুড়ি ! আমি এই গেলাম আর আলাম।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে নটবর বেরিয়ে গেল।

নেহাৎ নটবর এসেছে তাই লুকানো চারটে পরসা বের করে একটু তেলের জোগাড় করল পুতুনী। মাছগুলি ত রাঁধতে হবে। রাঁধতে বসে কিন্তু মন দিতে পারল না সে। নটবরের মুখে খবরটি শুনে অবধি সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোনোমতে এ বাড়ি ছেড়ে এখন নটবরের সঙ্গে নৌকায় উঠতে পারলে হয়। বর্ষা আরম্ভ হলে চাল দিয়ে জল পড়ে ঘর ভেসে যাবে। শীতে অসহ্য ঠাণ্ডা—ভাঙ্গা বেড়া দিয়ে হু হু করে বাতাস চোকে। পরনে একখানা আস্ত কাপড় নেই তার উপর আবার গায়ের কাপড়। পেট ভরে দুটি খেতে পায় না, বুড়োর সঙ্গে খটিমিটি লেগেই আছে। এ আড্ডায় ও আড্ডায় নেশা ভাঙ করে বেড়ায়, রাতে একা একা বাড়িতে থাকতে ভয়ে কাঁপে পুতুনী ! সোয়ামী গিয়েছে কিন্তু তার যৌবনটাকে ত আর সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি ! আশেপাশে দুই লোকেরা কেবল ঘুর ঘুর করে।

খেতে বসেই নটবর প্রস্তাবটা উঠালে। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে নিষেদের অসুবিধার কথা সবিস্তারে বলে নটবর বলল : ভাল কথা তালুই মশায়, পুতুনীকে আমি নিয়ে যাই না ? বউমারা যাবার পর ছেলেটাকে দেখবার কেউ নেই। ছুটো যে রাঁধে বেবে এমন লোকও নেই। পুতুনী গেলি সেও ভাল থাকবে, আমাগোও সুবিস্তা।

দ্বারিক গরম ভাতের গরাস মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বলল : পুতুনীকে নিয়ে যাবা ? নটবর মাথা নেড়ে সায় দিল।

একচুয়ক জল খেয়ে দ্বারিক বলল : ও তাহলি বাঁচে যায় নটবর। এখানে কেডা বা ওরে দেখে, কেডা খাতি দেয়। কিন্তুক—

নটবর বুঝতে পেরে বলল : তা তালুই, আপনাগো কেবপায় ভাতের হাঁড়ি এখনও ফুঁটো হয়নি। দয়া করে আপনিও যদি যান মাখায় করে নেব।

কথা শুনে বুড়ো একেবারে কঁদে ফেলল।

নটবর বলল : আমার বাড়ি থাকবেন। ভাল না লাগে মাঝে মাঝে মাইয়ের বাড়িও যাতি পাবেন !

চোখ মুছে দ্বারিক বলল : কিন্তু মাইয়ে ত বলে না, এই যেমন ভুমি বললে নটবর ! বাপের বেটা ভুমি ! বুকের পাটা আছে তোমার ! সবার সাথে তোমার কথা খাটে না !

বুড়ো অনেক আশীর্বাদ করল।

পরদিন রাত থাকতেই ওরা রওনা হোল। সঙ্গে নেবার আর কি আছে ! ভাঙ্গা একটা টিনের রংচটা বাস্র আর ছোট একটা কাপড়ের পুটুলি। ছেঁড়া বিছানার খোকড় নেবার সঙ্গে বেঁধেছিল পুতুনী কিন্তু নটবর তা নিতে দিল না। তার বাড়িতে নতুন বিছানা

আছে। বুড়ো দ্বারিকও সঙ্গে চলল। পুতুনী অবশ্য খুব খুশি হয়নি। বুড়ো সঙ্গে থাকলে তার নানান হালান্না। কিন্তু নটবর যখন নিজে যেতে এনেছে তখন মন বিকল্প হলেও মুখ খুলল না পুতুনী। নির্বিবাদে সকলে মিলে ডিক্কিতে গিয়ে বসল।

॥ পাঁচ ॥

ছ'দিন বাড়িতে নেই তাতেই যা চেহারা হয়েছে ঘর দোরের পুতুনী দেখে অবাক হোল। নতুন শক্ত মজবুত বাড়ি, খটখটে তার উঠান অথচ ধুলো জঙ্গলে আর আগাছার ঘেন ভুতের বাড়ি হয়েছে।

ও দাদা, বৌ মরিছে বলে কি তুমি একেবারে অমানুষ হয়ে গেছ। বাড়ির এ কি চেহারা হয়েছে!

দাওয়ার এক পাশে দ্বারিক আর নটবর তামাক খাবার সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। পুতুনী কোমর বেঁধে ঝাটা নিয়ে ঝাড় পৌছে সেগে গেছে। ঘর দোর পরিষ্কার না করে সে আর কিছুতে হাত দিচ্ছে না।

দ্বারিক বুড়ো হয়েছে। ক'বছর ধরে ভাল করে খেতে পারনি। ওর কথায় কথায় কেবল দাওয়ার গল্প। পুতুনী বলে অনেক সরেস জিনিস আছে। তারই খোঁজ খবর নিচ্ছিল সে নটবরের কাছে।

হাসতে হাসতে নটবর হাঁক দিল : ও পুতুনী, হোল তোর? এইবার হাঁড়ি চড়া বুড়ি! আর শোন, তালুইমশায় সরপুটির ঝাল খাতি চাতেছে। পরাশর মাছ দিয়ে খাবেনে।

ধুলো কালি মাখা চেহারা নিয়ে পুতুনী বেরিয়ে এসে বলল : আসতি না আসতি বুড়োর সোলায় জ্বালা ধরিয়ে, হারে আমার কপাল।

নোন্নার কথা বললেই দ্বারিক চটে যায়। কুটুম বাড়িতে এসেই তাকে অপমান। রেগে সে বলল : বলি তোর বাপেরত আর খাতিছি না হারামজাদী!

পুতুনীও কম বায় না। সে মুখ নেয়ে বলল : বাপ না হোক ভাইত! লজ্জা করেনা বুড়ো কথা বলতি!

নটবর মিলিয়ে দিল। পুতুনীর কাছে গিয়ে বলল : আহা চুপ দে! বুড়ো আর ক'বছরই যা বাঁচবে। খায়ে লিক। ভাল করে রাঁধে দে তুই।

পরে দ্বারিকের দিকে ফিরে বলল ও তালুই, তাহলি আপনি তামুক খান, আমি একটু ঘুরে আসি!

দ্বারিক বলল : হ, যাও। দেবী কোরো না বেশি।

নটবর বুঝতে পারল বুড়োর মুড়ি-গুড়ে কিছু হয়নি। খিদে পেয়েছে আবার।

পুতুনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল : অন্ধগরে নিয়ে আসগে দাদা! কতদূর সে বাড়ি?

—হ, এই বাই। বাড়ি ত ঐ !

নটবর বেরিয়ে যাচ্ছিল। আবার এসে বলল : পরাশর মাছ পাঠাবানো। বরে দেখ সব আছে, বাগানের খে শাক পাতা আনে তরিকুং করে রাখ দেবি।

ঘরের পাশেই নটবরের ছোট ক্ষেত। ঠিক নটবরের বলসে ভুল বল হবে। ওটা কুমুদ নিজে হাতে করেছিল। বাগান করা তার বড় সখ ছিল। বউ মারা যাবার পর নটবর ওটাকে একেবারে নষ্ট হতে দেয়নি। এখনই বাড়ি এসেছে, ছ'দণ্ড বসেছে, তখনই ঐ বাগানে গিয়ে কাজ করেছে। ফল পাতা চুরি হয়েছে, বিলিয়ে দিয়েছে, তবুও রক্ষা করেছে গাছগুলি। লাউ, কুমড়া, বেগুন, কিঙে, পেঁপে, পুঁইডাটা, এখন যা হবার হয়।

পুতুনী বাগানে ঢুকে বলল : ও দাদা, এ যে অনেক গাছ ! ইস্ কি কুমড়া না হইছে !

জিবে জল এসে গেছে। পুতুনী এটা ধরে ত ওটা কাটে !

নটবর তার ভাব দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পুতুনী তাকে তাড়া দিয়ে বলল : কি হোস, হাস কেন ? যাও অক্ষরের নিয়ে আসোগে। পরের বাড়িতে আর রাখতি যাবা কেন ?

নটবর তাই ভাবছিল। পরের বাড়িতে আর ছেলেকে রেখে দরকার নাই। কিন্তু পর ত আপুন হয়। মা-মরা ছেলেকে শংকরী একদিন কোল পেতে নিয়েছিল। এই পাঁচ ছ' বছর ধরে পরম যত্নে অক্ষরকে সে মানুষ করেছে। নিঃসন্তান মেয়েমানুষের মায়ামমতা বলে যে একটি জিনিস আছে সেটার মূল্য নটবর আর দিতে চায় না। ছেলের বয়স প্রায় আট বছর হতে চলল। সে না হয় খোঁজ খবর নেয় না কিন্তু ছেলেও ত বাপের কাছ মাড়াতে চায় না। না—না, একটা মেয়েমানুষের পর ছেলেকে এ-ভাবে আর ফেলে রাখা চলে না। আজই ঘরের ছেলে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

নটবর গিয়ে হারাগের বাড়ির দাওয়ায় উঠে ডাকল : ও হারাগ, হারাগে—

ঘরের ভেতর থেকে নাকী সুরে চিঁ চিঁ করে উত্তরে বলল : আনো নটবরদা, ঘরের ভিত্তি আসো।

নটবর ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। ঘরে কেউ নাই। হারাগ শুয়ে শুয়ে কাশছে। নটবর প্রশ্ন করল : অক্ষর কই ?

কাশতে কাশতে হারাগ হাতের তালু এমনভাবে ওলটাকো যেন সে কোনো খবরই রাখেনা।

নটবর বুঝল শংকরী ছাড়া তার প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না। হাঁক ছেড়ে সে ডাকল : ও অক্ষর, অক্ষরে—

নটবরের গলা শুনতে পেয়ে ঘাট থেকে শংকরী তাড়াতাড়ি ফিরে এস। এসে একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়াল। সোয়ামীর ধরতে গেলে একরকম বড় ভাইএর মত। মাখনামানি কথা ত বলতে পারে না ! ঘোমটা টেনে হারাগকে উদ্দেশ্য করে বলল : বল, পড়তি গেছে।

হারাগকে আর কষ্ট করে বলতে হোল না। ঘোমটার কাঁক দিয়ে কথাগুলি যথেষ্ট উচ্চস্বরেই বেরিয়ে এসেছে, নটবরের শুনতে কিছু অসুবিধা হয়নি। সেও হারাগের দিকে চেরে-দেবিয়ে বলল : পড়তি মানে—নেকাপড়া করতি ? কনে ?

এইবার হারাগের কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ল। বিছানায় সবসময় শুয়ে বসে থাকলেও এ সম্বন্ধে বতটা সংবাদ সে রাখে কেশে হাঁপিয়ে তা নটবরকে নিবেদন করল।

কিছুদিন ধরে অক্ষয় শংকরীকে রীতিমত বিব্রত করে তুলেছিল সে পাঠশালার পড়তে যাবে। বাবুপাড়ায় নতুন পাঠশালা বসেছে। সেখানে সে যাবেই যাবে। শংকরী কত বুঝিয়েছে : তোর বাপের অনুমতি নিতে হবে। তার কাছে যা। তার কথায় সে কর্ণপাতও করেনি। জোর করে পয়সা নিয়ে গ্রেট, বই কিনেছে। পাঠশালাতেও যাচ্ছে। এখন নটবরের কাছে মুখ দেখানো-দায় হয়েছে তাদের, ইত্যাদি।

সব শুনে নটবর একেবারে থ' বনে গেল। এতখানি লায়েক হয়ে উঠেছে তবে তার ছেলে। একবার মুখের কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল না! মানুষই হচ্ছে না হয় শংকরীর কাছে কিন্তু টাকা যোগাচ্ছে কে ? বাপ বলে মান্ত করবে না, এতবড় নিমকহারাম ! মুচির ছেলে জানবে চাকু, ছুরি চামড়া, তার আবার পাঠশালা কি ? লেখাপড়া শিখে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে ছেলে ! রাগে গরগর করতে লাগল নটবর ! ইচ্ছা হোল এখুনি গিয়ে কান ধরে নিয়ে আসে ছেলেকে পাঠশালা থেকে। এগিয়েও গিয়েছিল ছ'পা। কি ভেবে শেষে ফিরে এসে বলল : হারাগ শোন, তুমিও শোন মা নন্দী। মুচির ছেলের আবার নেকা পড়া কি ? ওসব ফাজলেমতি আমি ঠিক করে দিচ্ছি। কাজের চাপে নজর দিতি পারিনি তাই নাই পাইছে ! ছেলে মানুষ করা মা নন্দী তোমার কাজ নয়, ও তোমার দিদি থাকলিও পারত না। তোমরা জান খালি ভালবাসতি। তুমি হুকু পায়েনা। আমি ওরে নিজির কাছে রাখবো।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শংকরী। ওর মাথার কাপড় যে অনেকটা সরে গেছে সে খেয়ালও নেই।

নটবরের কথা বলা শেষ হয়নি। সে বলল : আমার এক মাথার মায়ে, সোয়ামী নেই, শউরির ভিটেয় না খাতি পেয়ে মরতিছিল। তাবে নিয়ে আসিছি, শউরও এসেছেন। এতদিন তুমি অক্ষয়রে মানুষ করিছ মুখের কথায় তার কি শোধ দেব। তুমি কিছু মনে কর না নন্দী। ছেলে নিজির কাছে না রাখলি কেমন বেয়াড়া হয়ে যায় দেখতিছ ত !

শংকরী আর জবাব দেবে-কি। নটবর কোনো অন্তর কথা বলেনি কিন্তু তার মন নটবরের প্রস্তাবে সায় দিতে চায়না। মা মা বলে ডেকে ডেকে ছেলেটা নিজের পেটের ছেলের মত হয়ে গেছে !

হারাগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নটবর নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে এখানে ওখানে ক বাড়ি আর মাঠ ঘাট ঘুরল। তারপর বিল থেকে একেবারে স্নান সেরে যখন বাড়ি গিয়ে

উঠল তখন দেখে পুতুনী রান্না সেবে বসে আছে। দারিক বসে বসে ঝিমচ্ছে। তার খাওয়া হয়নি। একা তাকে ভাত দিতে পুতুনী কিছুতেই রাজী হয়নি।

নটবর বাড়ি ফিরতেই পুতুনী বলল : কই, অক্ষয় কই ? এত দেৱী করলে যে ?

নটবরের মুখ গম্ভীর। অক্ষয়ের কথা চিন্তা করে করে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগে যুদ্ধের জন্তেও চিন্তা করেনি, এখন যখন করছে, অক্ষয় করছে আর মাথা গরম করছে ! যুটির ছেলে থাকবে চামড়া নিয়ে তা নয় গেছে লেখাপড়া শিখতে ! বাপের কাছে এসে অনুমতি পৰ্যন্ত নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। অতটুকু ছেলের আশ্পর্শ দেখে।

নটবরের মুখের চেহারা দেখে আর কোনো প্রশ্ন করল না শংকরী ! ভাত বেড়ে সামনে রাখলে।

বুড়ো দারিককে আর ডাকতে হোল না। শ্রব শ্রব করে সে এসে নটবরের পাশে বসল।

খেতে খেতে হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল নটবর। পুতুনীর দিকে চেয়ে বলল : যাব নাকি সেই বাবুগো ইজুলে ? কান ধরে হিড় হিড় করে টানে আনব ছেমড়ারে ?

—কি কও, কার কথা কও দাদা ?

উদ্ভিগ্ন হয়ে পুতুনী প্রশ্ন করল।

নটবর ভাতের ধালে একটা কিল মেবে বলল : বলতেছি সেই হারামজাদার কথা। অতটুকু ছেলের দেমাক দেখেছ ! আমারে বাপ বলে মানতি চায় না ! ভাল ছেলে মানুষ করতি দিছিলাম শংকরীরে।

দারিক দেখল আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। নটবরের কথার পিঠে সে তাই বলল : যা বলিছ। কথায় বলে আপন ধন অপরে নলি কিছু থাকেনা আপন বলি।

পুতুনী ঝঁকিয়ে উঠল : তুমি থাম না ! জানলেনা শুনলেনা কিছু মাঝ দিয়ে কোড়ন কাটা। নাও, ভাত কোলে টানে নেও।

দারিক বিনা বাক্যব্যয়ে তাই করল।

এতক্ষণে নটবরের সামাজিকতা বোধ ফিরে এল : ও পুতুনী, তালুইমশায়রে আর ছুটো যাছ দে। না—না, আমারে না। দে-দে, ওনারে দে।

দারিকের মুখে আর কথাটি নাই। মাঝে মাঝে পুতুনীর মুখের দিকে তাকায় আর গোত্রাসে গেলে। মাছের প্রতিটি কাঁটা চুষে চুষে রস একেবারে নিংড়ে নিচ্ছে বুড়ো।

নটবর উঠে পড়ছিল।

পুতুনী বাধা দিয়ে বলল : ও দাদা মাথা খাও, বস। চুনো মাছের আখল ঝাঁঝিছি, খাও এটু !

নটবর ততক্ষণে দাওয়ার উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বলল : না—না, পেট ভরে গেছে বুড়ি। ও তালুই, আপনি খান বেশি করে। আমি যাই একবার হাবাণের ওখানে।

নটবর বেশি কিছু না বললেও পুতুনী ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে। নটবর বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে বলল : ও দাদা, মারধোর করোনা মা মরা ছেমড়ারে। ঠাণ্ডা মাথায় নিয়ে আসো।

নটবর কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শংকরী ঘরের ভেতরই ছিল। নটবরকে আবারও ঘরে ঢুকতে দেখে ভয় পেয়ে গেল।

—অক্ষয় কনে ?

নটবর হারাণের দিকে তাকিয়েই প্রশ্নটা করল।

হারাণ একবার বউয়ের দিকে তাকায় আর একবার নটবরের মুখের দিকে চায়।

—কি, কথা যে কোস না হারাণে ?

নটবর আড় চোখে তাকিয়ে দেখল শংকরী আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুচছে।

—কি তোমরা চুপ করে ক্যান ?

নটবর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

কুয়ুদ যেদিন মারা গেল সেদিন মহাবিপদে পড়ে তাকে নটবরের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। আজও বলতে হোল সরাসরি। ধীরে ধীরে সে বলল : অক্ষয় বাড়ি আসলি তারে সব বলিছি। বললাম, বাড়ি যা তোর পিসি আয়েছেন। তোর বাপ ডাকেছেন—

এইবার হারাণ কথা বলল। চিঁ চিঁ সুরে বলল : তা শুনল না কথা। বল নিয়ে গেল বাপু বাবুপাড়ায় খেলতি।

শংকরী মাথা নেড়ে স্বামীর কথায় সায় দিল।

হারাণ ও শংকরী এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন দোষ তারাই করেছে। আর নটবরেরও সেই ধারণা বন্ধমূল হয়েছে। কোনো কথা না বলে শংকরীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হন হন করে ভদ্রলোকদের ছোট পাড়ার দিকে নটবর ছুটছিল। যুটির ছেলের লেখাপড়া শিখে ভদ্র হতে সখ গিয়েছে। একবার যখন ঘরের দিকে মন দিয়েছে নটবর তখন সব সখ ঠাণ্ডা করে দেবে—শায়ের্তা করে দেবে ছেলেকে। আজই কান ঘরে হিঁচড়ে বাড়িতে টেনে এনে অক্ষয়কে জঙ্গ করবে সে। উত্তেজনার বসে পথের পাশ থেকে আসশেওড়ার একটা ডাল ভেঙ্গে নিল সে।

—কে নটবর না ? এদিকে যাও কোথায় ?

নটবর মুখ ভুলে দেখল অনন্ত চক্রবর্তী। রেল স্টেশনের ওপাশে কোন বড় গাঁয়ের বাসিন্দা ছিল সে। পেটের জ্বালায় জেলেদের পূজা পার্বণে মস্ত পড়ত বলে মান খুইয়ে পুনের বিলে চলে এসেছে।

অনন্তর কথার উত্তরে নটবর বলল : যাই একবার তোমাগো পাড়ায়।

গাঁট থেকে বিড়ি বের করে একটা ধরাল অনন্ত আর একটা নটবরের হাতে ঝুঁজে দিতে

দিতে বলল : কিছু মনে করোনা নটবর, মুচির ঘরে অমন কার্তিকও হয় ! আমিওত ভাবিলাম বামুনের ছেলে বুঝি ! আহা, যেমন রূপ তেমন কথা কয় : আমি লেখাপড়া শেখব !

উত্তেজিত নটবর কি যেন বলতে আরম্ভ করল : কিন্তু হাজার হাসিও গিয়ে তোমরা চোন্দপুরুষ কেউ ছুরি ছাড়ে কসম ধরনি ! তোমাগো রক্তে যে পেল্লাদ জন্মিছে এই মহাভাগ্য ! তবে কিনা বুঝি যে একটু মোটা সহজে রপ্ত হতি চায় না ।

বলে হো হো করে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসল অনন্ত চক্রবর্তী যেন বুঝির প্রাণধর্ষে সবশাস্ত্রে পারদ্রব্য হয়ে বসেছে সে—কোনো বিড়া আর রপ্ত হতে বাকী নাই ।

এইবার নটবরের পাগা । বিড়িতে বেশ করে একটা টান দিয়ে বলল : পেল্লাদ ত নয় এক বেটা ছুঁচো জন্মিছে ! রূপির মাকাল ফল কোন কন্ডে লাগবে—আমার ছেরাদে লাগবে !

বিড়িটা পুরো না-টেনেই ছুঁড়ে ফেলে দিল নটবর । উত্তেজিতকণ্ঠে সে বলল : ভিন্নরতিতে ধরিছে ঠাউর । বামুন কায়েতের আর মুচি মাটোর ছল সব এক জোয়ালে পুরে জাবনা দিয়ে জাবর কাটাচ্ছ—এটা কি খুব ভাল কথা ? ওই যে কথায় বলে : ওয়ার বাপ খাতো কাঠ টানে সেও নাড়ী ধরে !

অন্তত বলল : এ যুগি লেখাপড়া কি আর না শিখলি চলে ! ছেলেকে পড়াও নটবর—ভাল হবে ।

মুখে অসীম বিরক্তি প্রকাশ করে নটবর বলল খুঁজুরি তোমার ভাল ! ওসব ফাজলেমতি আমার কাছে চলবেনা । কানের মাধি ধরে টানে ঘরের ভিত্তি আটক করব । তোমাগো ইন্তুলের আমি—

অশ্রাব্য একটা কথা দিয়ে চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করল নটবর ।

একপাশে বিল আর এক পাশে স্মৃতির খাল । খাল মধ্যে হেঁকে এখন একটা ত্রিকোণ ডোবায় পরিণত হয়েছে । খালের ভরাট জমিতে এখন ধান চাষ হয় । দিগন্ত বিসারী মাঠে কচি ধানের সবুজ চারা বর্ষার জল পড়লে মাথা নেড়ে গান গায় । আলোর ফাঁকে ফাঁকে কাদার মাঝে খলবল করে শিঙি-মাগুর-সোল । বোচনো, কোচ, চারো নিয়ে চল, ধলুইতে মাছ ধরবে না । শুকনো জমির ছোট গর্তে নির্বিবাদে হাত ঢুকিয়ে দাও সাপের মত মনুষ্য কালো বা ধূসর রং কুচে মাছ বেরিয়ে আসবে । সাপের মত তোমার হাত কিন্তু পেচিয়ে ধরবে, ভয় নাই, ছোবল মারবে না । বাড়িতে নিষে কেটে কুটে গরম মশলা দিয়ে রাঁধো খেতে মাংসের মত লাগবে । বাতের অসুখ আছে, শরীরে রক্ত নেই কিবা অর্শ আছে খাও কুচে মাছের ঝোল । পুষের বিলের বিখ্যাত প্রাণহরি কবিরাজের সর্বত্র সেই একই নিদান । নিদান আছে বটে কিন্তু জল সরে গেলে সব গর্তে হাত দিওনা । বড় বড় গর্তে যা মনসার সন্তানরা আছেন তারা আদর করে চুমু খেলে আর রক্ষা নাই । ওস্তাদের কামড় থেকে রক্ষা করে বাসু ওকার বাপেরও সাধ্য নাই । কিন্তু সাবধান করলে কি হবে কি বছর কিছু ঘাবে কুমীর কামটের পেটে আর সাপের কামড়ে ।

বর্ষার জলে স্মৃতির ডোবার রং বেরং-এর অসংখ্য সাপসার ফুল ফোটে। পাতাল, ফুলে, শেওলায় আর কলমির ডগায় জল দেখবার আর উপায় নাই। বিল আর ডোবার মাঝে ছোট মাঠ—মাটি কেসে উঁচু করে দেওয়া হয়েছে, তার এক পাশে ছেলেরা ডিঙি পারে উঠিয়ে মেরামত করছে, জাল শুকোতে দিয়েছে, আর একপাশে ছেলেরা খেলছে। সামনে পাঠশালার নতুন টিনের ঘর। অনন্ত চক্রবর্তী সেই পাঠশালার একমাত্র গুরু।

নটবর এসে দাঁড়াল মাঠের পাশে। এক অক্ষয় ছাড়া তাদের পাড়ার আর কেউ নাই। নটবর শুটি শুটি এগোল। নাগালের বাইরে থেকে হাক দেবে না। সরাসরি গিয়ে বাড়টা একবার ধরতে পারলে হয় ছোড়ার।

নটবরকে চোরের মত এগোতে দেখে ছেলেরা হতভম্ব হয়ে গেল। খেলা থামিয়ে তারা চুপ করে দাঁড়াতেই অক্ষয়ের নজরে এল দৃশ্যটা। যেমন দেখা অমনি ছুট।

অক্ষয় দৌড়ায় নটবর পেছ ছোটে। শেষ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে না পেরে উঠে অক্ষয় সোজা ঝাঁপ দিল স্মৃতির ডোবার।

ডোবার পারে, এসে ধমকে দাঁড়াল নটবর। ডোবার জলে বড় সাপ আছে, রক্ত চোষা ঘোঁক কিল-বিল করছে জলে। শেষ পর্যন্ত নটবরকে নরম হতে হোল।

—ও অক্ষয়, উঠে আর শিগ্গির। সাপে কাটে শেষে মারবে। এই দেখ, কেসে দেলাম লাঠি। কিছু কবোনা, আর, উঠে আর।

অক্ষয় মাঝ ডোবার গিয়ে একটা বাঁশের খুঁটি ধরে নির্বিবাদে বলল : বল, পাঠশালার ঘাতি দেবা, মারবা না।

অতটুকু ছেলে হলে হবে কি, কথা শোন তার। একরকমি ভয়ডর নাই। দেখ, দেখ, প্রকাণ্ড এক জলডোড়া সাপ কেমন করে এগোচ্ছে! ওর কামড়ে হঠাৎ বটে ঢলে পড়বে না তবে যেখানে কাটবে বা হবে সেখানে তারপর পচে পচে খসে পড়বে মাংস। অতটুকু ছেলে সামলাতে পারবে না।

নটবর চেঁচিয়ে উঠল : ঐ-ঐ সাপ, ঐ-ঐ যে আর এটা। উঠে আর শিগ্গির। তোরে মারব না। পড়িস তুই ইজুলে—পড়ে নাট সাহেব হোল। এখন উঠে আর।

অক্ষয় উঠে এল। ঘোঁকে ধরে পা পিঠ রক্তাক্ত করেছে। নটবর কোনো কথা না বলে অক্ষয়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসতে লাগল।

পুতুনী ওদের ছ'জনকে দেখে ত আবাক! অক্ষয়কে আগে কখনো দেখেনি পুতুনী। সোনার টুকরো ছেলে কিন্তু ও-কি রূপ হয়েছে জলে আর কাদায়। নটবর কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল ছেলেকে?

ওদের দেখতে পেয়ে চুপি চুপি শংকরীও এল পা ঢাকা দিয়ে। না জানি কি হেনস্তা হয়েছে ছোট ছেলের। গাছতলার তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুতুনী এগিয়ে গেল।

পুতুনীকে দেখে শংকরী চুপি চুপি বলল : তুমি অক্ষয় গিসি নাকি?

—হ। তুমি কেডা।

—আমি শংকরী। অক্ষয় ছেল আমার কাছে।

একটু চুপ করে থেকে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করল শংকরী; কি হয়েছে, খুব মারিছে ছেলেডারে ?

টাকা নিয়ে ত পরের ছেলেকে ভাত দিয়েছিল, তার এত আদিখ্যেতা কিসের। তাচ্ছিল্যের স্বরে পুতুনী বলল : কি জানি বাপু। আমি লতুন এয়েছি, কিছুই জানি না বাপ-বেটার কাণ্ড। তোমরাই ত সব জান।

পুতুনী চলে যাচ্ছিল। শংকরী তার হাত ধরে বলল : এইষে অক্ষর পিরেন ছুটো, আর সব আছে এই বোঁচকায়।

শংকরীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

কাপড়ের পুটুলীটা নিয়ে পুতুনী ফিরে এল।

ছেলের গায়ে হাত তুলে নটবর কথার খেলাপ করল না বটে তবে অকথ্য গালাগাল দিতে কসুর করল না মায় হারাণের বউ শংকরীকেও। এতদিন ধরে ছেলেকে যে মানুষ করল তার জন্যে মুখেও আজ আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না নটবর।

রাগ পড়লে নটবর ছেলেকে ডেকে বলল : কালকের থেকে আমার সাথে কাজে যাবি। কাজ যদি না শিখিস, তবে খাবি কি ? অনন্ত ঠাউর তোর কি বাপের মাথা শিখাবে যে তাই দিয়ে খাবি।

অক্ষয় তেমনভাবে খুঁটি ধরে দাঁড়ায় বসে আছে। বাপের কথার উত্তরে বলল : আমি পড়ব। বড় হয়ে গাংএর ওপারে বাবুগো ইস্কুলে পড়ব।

এতক্ষণ ধরে গালাগাল আর বাক্যব্যয় বৃথা হয়েছে নটবরের। ছেলে এক রোখা হয়েছে ঠিক তারই মতন। এত দিন ছেলের দেখাশুনা করতে পারেনি তাই ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আরও একবার চোখ লাল করে নটবর বলল : খবরদার! আর কথা বললি আস্ত রাখবো নে। পাঠশালা-কাঠশালার গুটি কিলই আমি। হারামজাদা, ফাজিল।

পুতুনী এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। নটবরের মূর্তি দেখে সাহস পায়নি কিছু বলতে এবার এগিয়ে এসে বলল : ও দাদা, কেমা দেও এবার। ও অক্ষয় আমি তোর পিসি, আর কাছে আয়।

অক্ষয় এল না কিন্তু দারিক এল। পুতুনী কথা বলছে দেখে সে সাহস পেয়ে বলল : ও নটবর, এয়ে রাজার বেটা। আহা-হা, গভ্যখারিনী নন্দী ছিল—

বলে দারিক আকাশের দিকে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

বুড়ো খণ্ডরের দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে পুতুনী বিড় বিড় করে কি যেন বলে উঠল !

অক্ষয় কারও কোনো কথা কানে তুলল না। কারও দিকে ফিরে তাকাল না। যেমন বসে ছিল তেমনি ঠায় বসে রইল।

নটবর এবার বুঝতে পারল আর বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ছেলের গৌঁ বেড়ে যাবে। ওকে শাস্তা করতে হবে চুপি চুপি ওর আজ্ঞাতে।

পুতুনীকে আড়ালে ডেকে নটবর বলল : রাত থাকতি আমি কাজে যাব তুই অক্ষয়রে ঘরে ভাল। মারে রাখবি যেন বারোতি না পারে, বুঝলি !

পুতুনী ঘাড় নেড়ে বলল : আচ্ছা ।

ঘুম থেকে উঠে অক্ষয় দেখল তার বাপ পাশে নাই। যাক ভালই হয়েছে। বাড়িতে আজ নটবর থাকলে তাকে কিছুতেই পাঠশালায় যেতে দিত না। কালকের ঘটনার পর থেকে মনটা তার একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। তারপর আবার কোথা থেকে এক বুড়ো আর পিসি এসে উদয় হয়েছে। ওদের ভাল লাগে না। মার কথা বিশেষ মনে নেই তার। মা বলতে জানে শংকরীকে। বাপ ত নামেই আছে। কোনোদিন ডেকে এতটুকু আদর দেখায়নি তাকে। হাতে একটা পয়সা দেয়নি। আজ এসেছে মারতে' শাসন করতে। জোর করে বাড়িতে এনে রেখেছে, শংকরীর কাছে যেতে মানা। পাঠশালায় নাকি শুধু ভদ্র লোকের ছেলেরা পড়ে। কেন সে আর তারিণী ঠাকুরের ছেলে ভোলায় তফাৎ কিসে ! লেখাপড়া শিখে সে ভদ্র হতে পারবে না কেন ? পণ্ডিতমশাই ত বলেছেন : লেখাপড়া শিখলে ভদ্র হয়-লোকে, মান বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে। শংকরী মাও বলেছে লেখাপড়া শিখলে তার ভাল হবে। তবে ? ছুরি চাকু নিয়ে গরুর খোঁজে মাঠে ঘাটে ঘোরা আর গৃহস্থের গোয়ালে ঘুর ঘুর করে সন্দেহভাজন হওয়া তার ঘাতে সহ্য হবে না। লেখাপড়া সে শিখবেই।

বইপত্র রয়েছে হারাগকা'র বাড়ি। সেখানে বসে পড়তে বড় সুখ। এ বাড়ি তার ভাল লাগে না। শংকরীর মত ঐ পিসি কি তাকে ভালবাসতে পারবে ! আড়মোড়া ভেঙ্গে অক্ষয় বিছানা ছেড়ে উঠল। নাঃ আর ঘরে নয়, বেলা হয়ে গেছে। পড়াশুনা তৈরি করতে হবে আবার নাইলে অনন্ত পণ্ডিত ছেড়ে কথা কইবে না।

আরে খোলে না কেন দরজা ! অক্ষয় প্রাণপণে দরজার কড়া ধরে টানতে লাগল। কি বলে ডাকবে ওকে। পিসি বলতে লজ্জা হয় ! চেনা নাই জানা নাই পিসি বললেই হোল ! বুড়োর তামাক খাবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডাকবে নাকি বুড়ো বলে !

—ও বুড়ো—বুড়ো !

কালো নিশ্চয়ই নইলে শুনতে পেত।

—আরে দরজা দিল কেডা ! খোল-খোল।

অক্ষয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। দমাদম লাগি মারতে লাগল বন্ধ দরজাটার উপর।

শব্দ শুনে পুতুনী বান্ধা ঘর থেকে দৌড়ে এল।

—কি, অমন করতিছিস ক্যান ?

—দরজা আটকালো কেডা ? খোল—

—তোমার বাবা। বাইরি ভাল। মারিছে। আমার ছকুম নেই খোলার—
চাবিও নেই।

মিথ্যা কথা বলল পুতুনী। চাবি তারই আঁচলে।

কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ল অক্ষয়। দরজার উপর সমানে লাথি চালিয়ে চৌকিয়ে বসল খোস শিগ্গির না হলি ভাঙ্গলান সব।

পুতুনী ঘেন মজা দেখছে। হেসে বসল : অতো জোর তোর শরীলে নেই। শোন তোর বাপ আজ পাঠশালায় যাতি বারণ দেছে। সে আসে সব ব্যবস্থা করবেনে! আর ভেজাল করিসনে। চাভেড মুড়ি খাবি শুড়দে। নয় ত পাহা আছে হুন লকা দে খা। মাছ সাঁতলানো দেবানি।

অক্ষয় কোনো কথার উত্তর দিল না। দরজার উপর ক্রমাগত লাথি মেরে চঙ্গল। পুতুনী চৌকাল, ভয় দেখাল। অক্ষয় ধামল না। দ্বারিক এসে খোসামদ করল। অক্ষয় জানালা দিয়ে তার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে পড়ল অক্ষয়। বসে বসে ভাবতে লাগল কি করে এখন পালানো যায়। এ বাড়িতে তার আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম দর্শনেই পুতুনীকে তার ভালো লাগেনি। তার আজকের ব্যবহারে সে রীতিমত ক্ষেপে গেল। পিসি না ঘাসি! তার দরকার নাই কোন পিসি দিয়ে। শংকরীর মত তাকে কেউ ভাল বাসবে না—বাপও নয়। এতদিন কোনো খোঁজ খবর কেউ নেয়নি তার। আজ পাঠশালায় যখন পড়তে শুরু করেছে তখন এসে ঘরে আটক রেখেছে। পড়াশুনা দিয়ে হবে কি, চল গরু কাটতে। না, পারবে না সে। প্রাণ গেলেও পারবে না।

ঘরের পেছনের জানালাটা একবার পরখ করে দেখলে অক্ষয়। কাঠের গরাদ দেওয়া। তাও একটা ঘুনে খেয়ে লড়বড়ে হয়ে গেছে। এইটে সরাতে পারলে দিব্যি মাথা গলিয়ে যেতে পারবে। বহু দরজাটার দিকে তাকিয়ে অক্ষয় হাসল। ভালো মেরে তাকে কি আর আটকানো যাবে। পুতুনী একবার বাড়ির বার হলে হয় নিবিবাদে সে বেরিয়ে যাবে—আর ফিরবে না। কিন্তু থাকবে কোথায় গিয়ে? হারাণকা'র বাড়ি গেলে ত আবার ঘরে নিয়ে আসবে। সে চিন্তা আপাতত থাক। একটা ব্যবস্থা সে করবেই। পুতুনী বাইরে থেকে জানালা দিয়ে এক বাটি মুড়িশুড় ধরে বসল : নে অক্ষয়, খা বসে বসে।

অক্ষয় হাত পেতে বাটিটা নিয়ে তার সামনেই ছুঁড়ে ফেল দিল।

পুতুনী গালাগাল দিল, বাপকে সব বলে দেবে আসলে।

অক্ষয় ভেংচি কাটল! কোনো উত্তর দিল না।

পুতুনী কলসী নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই অক্ষয় তৎপর হয়ে উঠল। কোণ থেকে কাটারি ধানা নিয়ে জানালার লড় বড়ে কাঠখানা কোপ মেরে বের করে দিল। এর দ্বারা আর কোনো বেগ পেতে হবে না। অক্ষয় ভালো জানালা দিয়ে বেরিয়ে পেরারা গাছের ডালটা ধরে দিব্যি নিচে নেমে এল। তারপর চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে চৌচা দৌড় মেরে একেবারে হারাণের ঘরে এসে উপস্থিত।

শংকরী ঘরেই ছিল। নটবরের ভয়ে সে আর ওদিকে মাড়াতে সাহস পায়নি। ঘরে বসে বসে অক্ষয়ের ছর্দশার কথা ভেবে চোখের জল ফেলেছে। ঐ পিসি মাগীও কম নয়।

সেদিন কথা বলেই বুকেতে পেরেছে। অক্ষয়কে ও ভাল বাসতে পারবে না। বসে বসে হারাণের কাছে হুঃখ করেছে। অক্ষয় এসে দাঁড়াতেই শংকরী তাকে কোলের ভেতর টেনে নিল।

—কিরে ও অক্ষয় অমন করতেছিস ক্যান? খায়েছিস? খুব মারিছে বুকে? আহা, মগির আমার মুখ শুকোয় গেছে।

অক্ষয় বলল : আমার বই সেলেট কই? দেও শিগ্গির। পাছা থাকে ত দেও, খিদে লাগিছে। পিসি আসার আগেই দেও নালে ধরে ফেলবে।

—পল্লারে আইছিস? কেন, কিসের জন্টি?

—হ, হ, ঘরের জানালা ভাঙে আইছি।

হারাণ মুহূ আপত্তি জানিয়ে বলল : তোর বাপের দয়ার পড়ে আছি এক কোণে। সে আসে যদি সব শোনে।

ভয় শংকরীরও বধেই ছিল। নটবর এসে যদি জানতে পারে যে অক্ষয় পালিয়ে এসে তাদের কাছ থেকে বই খাতা নিয়ে গেছে তবে আর তাদের আশ্রয় রাখবে না। চণ্ডালের মত রাগ নটবরের, কোনো কৈফিয়ৎ শুনবে না। কি করতে কি করে বসবে কে জানে। ঐ পুতুনীও হয় ত তার নামে লাগাবে ভাঙাবে। স্বামীর কথায় মায় দিয়ে শংকরী বলল : তাই বা বাড়ি যা অক্ষয় নখি তোর বাপ আমাগো ধড় মাথা এক জায়গায় রাখবে না। বাবা হলেন গুরুজন, তার কথা শুনতি হয়। ও অক্ষয় আমার কথা শোন বাবা।

অক্ষয় বলল : খাতি না দেও, বই দেও তাড়াতাড়ি। পিসির আসার সময় হোল।

শংকরী অনুন্নয় করে বলল : তুই বাড়ি যা—বই আমি নিয়ে আসতেছি—

শংকরী কথা শেষ করতে পারল না অক্ষয় কান খাড়া করে আওয়াজ পেতেই মুহূর্ত মধ্যে উঠানে লাফ দিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অক্ষয় খেতে চেয়ে ভাত পেলনা, এ হুঃখ আর সহ করতে পারল না শংকরী। টেচিয়ে কেঁদে বলল : আমার বরাতে যা আছে হোক, তুই খায়ে যা। ও অক্ষয়, আমার মাথা খা, কিরে আর—অক্ষয়কে—

কে কার কথা শোনে। অক্ষয় শুধন দৃষ্টির বাইরে। শংকরী বসে কাঁদতে লাগল।

বোধ হয় ছ’ মিনিটও কাটেনি এমন সময় পুতুনী এসে দাপিয়ে পড়ল।

—কৈ কেডা আছ বাড়িতে?

উত্তরের জন্ত কোন সময় না দিয়ে সরাসরি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল পুতুনী। চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে প্রণী করল : অক্ষয় কৈ?

নটবর হলে অলজ্যাস্ত মিথ্যা বলতে মুখে বাধত।

পুতুনীর কথার উত্তরে শংকরী গম্ভীর হয়ে বলল : অক্ষয়? জানিনা ত।

পুতুনী আরও একবার ঘরের চারিদিক ঘেঁষে বলল : সত্যি বলতিছ, দেখনি তোমরা ছেমড়াবে?

এবারে উত্তর দিল হারাণ, বলল : মিথ্যে বলব কেন ? তা ছাড়া নটবর-দা আমাগো মুক্কি, তার অনিষ্ট করব ক্যান ?

অপমান আর অবিচারের ভয়ে স্বামী স্ত্রী মিলে অনর্গল মিথ্যা বলে চলল ।

তবু বাড়ির চার পাশ ভাল করে দেখল পুতুনী । শেষে শাসিয়ে বলল : বজ্রাত্তরে পালি নটবর-দা কেন আমিই আস্ত রাখব না । জানসা কাটে পলাইছে—ডাকাত হবে বরেন্দকালে হারামজাদা । যেমন একজন গেছে পুলিশের গুলীতে তেমনি যাবে একদিন । দাদার কপালে সুখ নেই । অমন লক্ষীছাড়া ছেলের মুগি আসুন !

আহা ! ছিঃ ছিঃ ষাট ! বলে কি মাগী ! ছুধের শিশুকে শাপমন্তি করেছে ! শংকরী ঘরে খিল এটে দিল ।

গালাগাল দিতে দিতে পুতুনী মুড়ি পথ দিয়ে এগিয়ে গেল ।

[ক্রমশ]

সম্রাজ্ঞী সতীশনাথ মৈত্র

সে যখন চেয়ে দেখে কোনদিকে এতটুকু আশা
তার জন্য ষমা নেই, বুকে বেঁধে পায়ের তলার
মাটি কসে যাচ্ছে ক্রমে, শেষাশ্রয় তার ভালবাসা—
সেদিন যখন তাও মধ্যরাত্রে তারই গলার
হারটা ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়—
তখনো সে সহ করে, ভাবে এই জরাজীর্ণ বাসা
আবারো সে গড়ে নেবে নিষ্ঠায়, প্রেমে ও মমতায় ।

খরশ্রোত সময়কে আঁজো সে ছ'হাতে তাই কাটে,
প্রতিদিন বর মোছে, ঝাঁট দেয়—পুরোনো গানের ছ'টি কলি
পেটের চিস্তার ফাঁকে আঁজো তার স্মৃতি বেয়ে হাঁটে
বাঁচার ছরস্তু ইচ্ছা দেয়নি সে একেবারে বলি
এই কক্ষ পৃথিবীতে,—যত হারে তত যেন আরো
ছ'হাতে জড়িয়ে ধরে সব কিছু, তীব্র অনুরাগী
চুল বাঁধে প্রত্যহই—বিস্মিত এ নিস্পৃহ সংসারো,
একান্ত প্রত্যয়ে নিজ যুগ দেখে রাত্রির সম্রাজ্ঞী ।

নিষ্ঠুর নায়িকা

রাম বসু

(সতীজননাথ মৈত্রকে)

আর ওই সস্তা, দিগদিগন্ত জোড়া খরখর বিস্তীর্ণ বিপুল ।
যদি সেই শুকতার ডুব দিলে তল খুঁজে পাই, যদি পাই
পাতালের গাছ মানিক মেঘমান প্রেমের প্রাসাদ
আকাশের তারা ছিঁড়ে ছড়াই তোমার মুখে, আবার
সকালে জাগাই আমার স্পর্শে, মধুবতী বসুন্ধরা
শিশিরে পাতার ছায়ায় দীষিতে মুখ ঢাকা গভীর লজ্জায়
আর তোমার মুখের মৌচাকে স্বপ্ন-পাওয়া আমি
দিন-রাত গান গাই, রাত দিন সৃষ্টি করি আমাদের
বাতাবি নেবুর গন্ধে, পাতার একতায়, স্বপ্নের সততায় ;—

কিন্তু তোমার শাস্ত দুই চোখ দুই শীতল ছোঁয়া বিদ্ধ করে হৃদয়
সম্রাজীর তুহিন গৌরব ছিন্ন করে আমাকে, তোমার নিখাস
চৈত্রেয় শুকনো পাতার মত উড়িয়ে দেয় পরিণামহীন ভুচ্ছতার
দিনরাত্রির হতাশার হাতুড়ির ঘায়ে আমি চূর্ণ, ছিন্ন
ছুটে যাই এক অন্ধকার থেকে অন্য এক অতল অন্ধকারে ।

তারপর রক্তক্ষয়ী বিকেল, বেদনাবিদ্ধ সন্ধ্যার কোলে তারা
এক থেকে অসংখ্য, কাঁপে, দ্রুতদ্রাস্ত জুড়ে ঝি ঝির ডাক
শিশিরের টুপটাপ, ঘাসের শিকড়ে জোনাকির কান্না
তারপর শুচি সকালে ব্যথার কাঁটায় ফোটা রক্তাক্ত গোলাপ
নিঃসঙ্গ গোলাপ একা পাতার নিচে ব্যথার কাঁটায় ।

হয়ত একদিন ষোঁয়াটে নদীর পাশে বিন্মরলী বিকেলে
দাঁড়াবে ভুবনমোহন স্বপ্নন রূপে, বুখে হেমস্তের হাসি
গর্বের উদ্ধত চূড়া থেকে নেমে ভুলে নেবে নিঃসঙ্গ গোলাপ
যেবে তোমার ওষ্ঠের উদ্ভাপ, কদম্বপুটের অর্চনায় দীন দীর্ঘশ্বাস
আর তাকে ঠাই দেবে কুণ্ডলী পাকানো ঘুমন্ত খোপায় ।

সেদিন তোমার একবারও মনে হবেনা, নিষ্ঠুর নায়িকা
যাকে বসালে গর্বের শিখরে—সেই আমি, অনাদৃত আমি ।



কথা কও জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কেন তার এতো দুঃখ সে কথা
কাউকে বলেনি কোনোদিন
অনেক দুঃখে পথে নেমেছিলো
গোপনে জেনেছি একথা
প্রেমের ক্ষণে সব কিছু দিয়ে
যত্না দেখেছে প্রেমেরই
তাই তার ব্যথা অসহ্য তাই
মুখের চেহারা পাণ্ডুর।

শরতের আলো স্বচ্ছ যখন
গ্রীষ্মে রোদ্দে অগ্নি
তখনো তো তাকে পথেই দেখবে
যেমন দেখেছো এ নীতে :

ছটি চোখ চেয়ে ভিক্ষা চাইবে
মুখে কথা নেই মৌন
বুঝি-বা জানাবে এ-পৃথিবী তাকে
কতোই দিয়েছে দু-হাতে
রাস্তার জল ফুটপাথে বাসা ভিক্ষার চাল
কতো কি !

দয়া ও করুণা অসুরান, শুধু
প্রেম নয় প্রেম নয়—
প্রেমিক কি তার এ খবর পেয়ে
আসবেনা ছুটে একদিন
বলবেনা তাকে এতোদিন ভিড়ে
হারিয়ে কতো না বুঝেছি
(ছটি পা যখন টানতে পারেনা আর—
তখনই তো শুধু বুঝেছি)
প্রেমের মতন আর কিছু নেই, বুঝেছি
তোমায় পেয়েছি

মৌন থেকে না মৌন থেকে না
কথা কও কথা কও ।

খানিকটা বাতাস

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুলঘুলি দিয়ে হঠাৎ চুকে পড়ে খানিকটা বাতাস।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পদক্ষেপ।

কতো গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের বাতাস

এসেছে

গেছে

ঘুলঘুলিটার এপাশ ওপাশ দিয়ে।

কোন দিন এ ঘরে আসেনি।

ঘুলঘুলিটা হয়তো ওদের চলাচলের অযোগ্য পথ।

অথবা ওরা বুঝতে পারেনি, এ ঘরেও কোন মানুষ থাকে।

আজ হঠাৎ এসেছে এক ঝলক বাতাস।

উন্মত্ত দস্যুর মতো বিশৃংখল আগমন।

ঘুলঘুলির মুখে মাকড়সার জালিটা গেছে ছিঁড়ে।

দেয়ালে ঝটপট করছে গত বছরের ক্যালেন্ডার

আর হুর্গতিনাশিনীর হুর্দশাগ্রস্ত পট।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি

প্রেতের মতো নাচছে কড়িবরগার ঝুলন্তুলে।

শুকোতে দেওয়া ধুতিটা শিরশিরিয়ে উঠেছে

অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে।

আর আমার চোখে মুখে সারা অন্ধ

প্রিয়ার স্পর্শের মতো মধুর স্পন্দন।

সমস্ত ঘরটা জুড়ে ফিসফিস করে কথা বলছে

এক ঝলক বাতাস।

আমার সমস্ত হৃদয়ে নেচে উঠেছে

হঠাৎ আসা এক মুঠো বাতাস।

বাইরে এ ঘন দারুণ ঝড়।

আমার ঘরে তাই এক ঝলক বাতাস

‘না’ নয়, ‘হ্যাঁ’

অবাদি মণ্ডল

জনসাধারণ বিশেষ করে যুবসমাজকে ভ্রান্তপথে চালনা করার মহা-অপরাধে খৃঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে জগতের অন্ততম জ্ঞানগুরু সক্রেটিসের যুড়্যদণ্ডাজ্ঞা দিল পাঁচশো লোকের ক্রুদ্ধ জনতা ; আদেশ হল, সুতীক্ষ্ণ হেমলক বিষ পান করতে হবে সক্রেটিসকে। নিরুদ্বেগ স্থিতধী অকম্পিতহস্তে বিষপাত্র গ্রহণ করলেন। অন্ততম অভিযোক্তা এনিটাস মন্তব্য করলেন— এই বেষ্টে-খাটো টেকো লোকটা যে কি করে পাঁচ লক্ষ এথনিয়ানের মাথায় অবিখ্যাসের পোকা ঢোকাল, সেইটাই আশ্চর্য !

একথা ঠিক, শুধু এথেন্সের যুবসমাজ নয়, সেই সুপ্রাচীন যুগের শিল্প-জ্ঞান-সংস্কৃতির অন্ততম পীঠস্থান এই এথেন্সে যাঁরাই জ্ঞানান্বেষণে আসতেন তাঁরাই একবার করে সক্রেটিসের ঠিকানা পকেটজাত করতে ভুলতেন না। তারপর যথারীতি সক্রেটিসের পায়ের তলায় বসে ছুটিএকটি আলোচনার পর এইসব আগন্তুকরা অকস্মাৎ উপলব্ধি করতেন—এমন সোজা কথাটা এদিন বুঝিনি, কি আশ্চর্য ! যেমন হয়েছিল প্লেটোর, জেনোফোনের।

যে সুত্রী দেহগঠন মানুষের মনে প্রভাবসৃষ্টির সহায়ক -- সক্রেটিসের তা ছিল না। ধন-দৌলত, গাড়িছুড়ি যা পরাম্বভোজীদের লুক করে এবং যা জনমনে ভয় মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চারক—তাও ছিল না সক্রেটিসের। এমন কি, তাঁর চালচলন ও বেশভূষা ছিল অত্যন্ত সাধারণ—সাধারণই বা বলি কি করে—ইংরাজীতে যাকে বলে shabily dressed, তিনি ছিলেন তাই। (প্রসংগত উল্লেখ করি, এথেন্সের সুবিশাল বাজারে ধনীদের অপরিহার্য দ্রব্যসম্ভারের আয়োজন দেখে দেখে তিনি বলতেন—হায়, কত জিনিস আমার না হলেও চলে !) এমন ‘বৈশিষ্ট্যহীন’ ব্যক্তি কিনা এনিটাসের ভাষায় ‘পাঁচ লক্ষ এথনিয়ানের মাথায় অবিখ্যাসের পোকা’ ঢুকিয়েছিলেন। তাদের তিনি স্বয়ং এনেছিলেন।

কোনু গুপ্তমন্ত্রবলে এ সম্ভব করেছিলেন সক্রেটিস ?

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, শুনে রাখুন, সক্রেটিসের ‘গুপ্তমন্ত্র’ ছিল, ‘হ্যাঁ’ বস।। আলাপ-আলোচনার সময় কখনো তিনি ‘না, কিছুতেই নয়’ এমন উক্তি করতেন না।

ইদানীং বিজ্ঞানের আশ্চর্যবরকম অগ্রগতির ফলে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর অল্পশীলনেও ইলেকট্রনিক্স-এর প্রয়োগ-পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। অতি-শক্তিসম্পন্ন মাইক্রোস্কোপ ও আণুবীক্ষণিক রেডিও যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভয়, ভালবাসা জুগুপ্সা প্রভৃতি মনোলোকের বিচিত্র ভাবের সংগে নার্ভ, গ্যাংগ ও মাস্কেল-এর সম্পর্ক লক্ষ্য করছেন বৈজ্ঞানিকগণ। ক্রমে ক্রমে এই

অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের পাতাগুলো যেন মানুষের চোখের উপর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রতিটি ক্ষুদ্র চাকস্যের সুস্পষ্ট প্রতিধাত আছে এবং উভয়ের সম্পর্ক অতীব নিবিড় ও অচ্ছেদ্য; শ্রামদেশীয় সেই বিখ্যাত যমজ ভাইএর মতো একজনের বেদনায় অন্যে ব্যথা পায়, একজনের আনন্দে অন্যের মুখে হাসি ফোটার। ‘ইয়া’ ও ‘না’ এই দুই ক্ষুদ্র শব্দেরও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া আছে মনের গভীরে দেহের কোণে কোণে। যে মুহূর্তে একজন ‘ইয়া’ পেল অর্থাৎ অপরের কাছ থেকে স্বীয় মতের সমর্থন পেল সেই মুহূর্তে প্রথমোক্ত ব্যক্তির দেহ মন receptive হয়ে উঠবে; স্বাগত আহ্বান জানাবার ক্ষেত্রে তার সমস্ত দেহভাগ উদ্ভূত হবে; ব্রেন শেলে জাগবে স্পন্দন; শিরা-সীমিত রক্ত-স্রোতে জাগবে পুলকনৃত্য; সে মস্তিষ্কে এক উত্তেজনা অনুভব করবে যার ফলে সে অপরের সঙ্গে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে ভাববে। আর ‘না’ বললে বা মতের বিরুদ্ধতা ঘটলে? আগেকার দিনে শত্রুর অমঙ্গল আবির্ভাবে যেমন দুর্গ-নগরীর সমস্ত আগমন-নির্গমনের পথ চকিতে বন্ধ হয়ে যেত শুধু মাত্র দুর্গ শীর্ষের কয়েকটি ছিদ্র ছাড়া যেখান থেকে আক্রমণ করা গলে, তেমনি ঐ ‘না’ কথাটা মনে এক যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। মতের বিনিময় অথবা পুনর্বিচারের সম্ভাবনা হয় দুঃস্থ, প্রতিপক্ষে পরাভূত করার দুস্পৃহা তীক্ষ্ণতম শারক-সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করে হৃদয়ের বণাঙ্গনে। এবার শুধু আদেশের অপেক্ষা!

তত্ত্বদর্শী সফ্রেটিসের সময়ে বিজ্ঞানের এই বিশ্বয়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। উদ্ভব হয়নি ইলেকট্রনিক্‌স্, রেডিওনিক্‌স্ বা অণুজ্ঞা জটিল শাস্ত্রের। কিন্তু প্রথম intuitive শক্তি প্রসাদাৎ মনোবিজ্ঞানের এই চাকস্যকর সূত্রের কথা অবগত ছিলেন সফ্রেটিস। তিনি জানতেন আলাপআলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অপরকে নিজের স্বমতে আনতে প্রথমে ‘ইয়া’ বলিয়ে নেওয়া বিরাট অয়। এইটাই সমাজবিজ্ঞানে ‘সফ্রেটিস-পন্থা’ নামে খ্যাত।

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাস ঘোষ ‘বানীপীঠ’ পুস্তকালয়ের একজন সেলসম্যান। এ বৎসর ‘বানীপীঠের’ প্রকাশিত একটি দ্রুতপঠনের বই মাধ্যমিক-শিক্ষা-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এবার তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর মুখ থেকেই শুধুন :

—বিছা ভবনের হেডমিষ্ট্রেসকে একটা ‘সহজ রানায়ণ’ দিয়ে এসেছিলাম। মতামত জানাবার ক্ষেত্রে তিনি একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। আমি গেলাম।

আমাকে দেখা মাত্র ভদ্রমহিলা প্রায় চীৎকার করে বললেন : দুঃখিত প্রভাসবাবু, আপনার বই আমি নিলেই কবতে পারব না।

শক্তিশেল লক্ষণকে কতখানি লেগেছিল জানি না তবে আমারও বড় কম লাগল না। অনেক আশা ছিল এখানে অন্তত বইটা ধরতে পারব।

টেবিলের উপর নজর পড়ে গেল। আমাদেরই কোন সমব্যবসায়ী কর্তৃক প্রকাশিত

নয়নলোভন গেট-আপওয়ালা একটা ভ্রমণ কাহিনীর বই। আমাদের সহজ রামায়ণ, অমনোনীত হওয়ার কারণ যেন অনুমানে বুঝলাম।

তবু বললাম—অমনোনয়নের কারণটা জানতে পারি কি ?

—রামায়ণ পড়বে ছোটরা ; উঁচু ক্লাসে কি রামায়ণ চলে ?

—চলে। আপনিই বলুন, রামায়ণ মহাভারত পড়বার বিশেষ কোন বয়স আছে ?

ভদ্রমহিলা একটু ভেবে বললেন—তা ঠিক !

আমি বলে চললাম—ছোটরা পড়ে টুকটুকে রামায়ণ, আমরা পড়ি কীর্তিবাসী আর আপনারা পড়েন মূল বায়িকীর। তাই নয় কি ?

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, তাই বটে।

—আরও, আজকাল ছেলেমেয়েদের হাবসাব চালচলন যা তাতে রামায়ণ মহাভারতের মত নীতিশিক্ষামূলক বইএর প্রয়োজনীয়তা যে কত তা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

তিনি একটু উত্তেজনার ভঙ্গীতে বললেন—ছেলেমেয়েদের কথা আর বলবেন না ! দিনের দিন যা হচ্ছে—

—তা হলোই দেখুন ! আচ্ছা, এই বিশেষ রামায়ণটি সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। মূল রামায়ণকে অনুসরণ করে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটদের জন্যে এটি লিখেছেন ! এই ধরনের বইএ সচরাচর যে প্রক্ষিপ্ততা ঘোষ দেখা যায়, এখানে তা নেই। এটা ভাল হয়নি ?

—নিশ্চয়ই ভালো। রামায়ণের নাম করে কতকগুলো গালগল্প শোনানো আমি অস্বস্তি মনে করি। আচ্ছা, দয়া করে পরশুদিন আর একবার আসুন। বই সিলেকশনের ব্যাপারে আমিই সব নই। আমাদের সেক্রেটারীর সঙ্গে খানিক আলোচনা করে আপনাকে শেষ কথা জানাব।

এটা যে নেহাৎ ছল তা বুঝেছিলাম ; সোজাসুজি শায় দিতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন। তাই ‘পরশুদিন’ গেলাম ও আমার বই মনোনীত হয়ে গেল।

এখন বুঝতে পারছি ‘আপনিই বলুন, রামায়ণ পড়বার কোন বয়স আছে’ এই কথাটা ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। প্রশ্নটি এমন যে যার উত্তরে দ্বিমত পোষণ করবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমার মনের কথা এবং তাঁর মনের কথা এক হয়ে গেল। পরের কথাগুলিতেও আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি এমন প্রাসংগিক বিষয়ের অবতারণা করতে যাতে আমি সর্বাধিক সংখ্যক ‘হ্যাঁ’ ‘তা তো বটেই’ আদায় করতে পারি। আমার কার্য সিদ্ধির এইটাই মস্ত বড় কারণ।

মনস্তাত্ত্বিকরাও এই ‘শায় দেওয়ার’ নীতি বিশেষ কার্যকরী বলে রায় দিয়েছেন। ইহুং বলেন : ‘না’ কথাটা অ-মিত্র আবেগের পোষক আর ‘হ্যাঁ’ গৃহীত করে বন্ধুত্বের।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে আপাত আলোচনার সময় শতকরা ৯৯টা ক্ষেত্রে আমরা

শুরু করি ‘না’ দিয়ে, ‘হ্যাঁ’ দিয়ে নয়। বলি, ‘না আপনার কথা ঠিক নয়’ অথবা ‘না আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই’ ইত্যাদি। ফলে সচরাচর সৃষ্টি হয় বাগবিতণ্ডার।

উদাহরণস্বরূপ, একটা সত্যি ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

বিখ্যাত ঔষধপ্রস্তুতকারক বেঙ্গল কেমিক্যালের সেলসম্যান হচ্ছেন—মিত্র। (সংগত কারণে তাঁর নাম গোপন রাখছি) এর এলাকা হচ্ছে হাওড়া। মোটামুটিভাবে তিনি সমস্ত ডিসপেনসারি ও হাঁসপাতালে কোম্পানীর ওষুধ ‘পুশ’ করতে পেরেছেন কেবল বেঙ্গলিয়াস রোডের কোন বিখ্যাত ডাক্তারখানা ছাড়া। এই ডাক্তারটির বিরাট পশার এবং একে হাত করতে পারলে সহসা বহু কাজ হয়ে বাবে এ নিশ্চিত। কিন্তু মিত্র বার কয়েক চেষ্টা করেও সফলকাম হননি এ ব্যাপারে।

ডাক্তারটির অতিরিক্তরকম ভক্তি বিদেশী ওষুধে। ভাবেন, দেশী ওষুধ মাত্রই জাপ বা এই ধরনের কিছু। তিনি বেশ গর্বের সঙ্গেই বলে থাকেন যে বোরিক কটন ও আয়োডিন ছাড়া কোন দেশী ঔষধদ্রব্যকে তিনি তাঁর টেবিলে জায়গা দেননা।

যখনই সাক্ষাৎ করেছেন মিত্র তাঁর সঙ্গে, তখনই তিনি প্রাণপণে বোঝাতে চাইতেন যে দেশী ওষুধগুলো বিদেশী জিনিসের তুলনায় কোন অংশে হীন নয়। সে ভাষা এমনই ওজস্বিনী, সে যুক্তি এতই অকাট্য যে, তাকে অবলম্বন করে ‘স্বদেশী কিছুন’ আন্দোলনের চমৎকার একটি প্রচার-পুস্তিকা রচিত হতে পারে।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর ‘ডাই-হার্ড’ হৃদয়ে এসব কথা কোনই দাগ কাটতে পারত না। তিনি বলতেন : ওষুধ সম্বন্ধে আপনার কোন আইডিয়াই নেই। You dont use the medicine, you sell.

অত্যন্ত আপত্তিকর কথা! মিত্রের রক্ত তখন স্ফুটনাকে পৌঁছানর কথা। তবুও ‘সেলসম্যানোচিত’ মিত্রমুখে যুক্তিভাল বিস্তার করে প্রমাণ করতে যান যে ডাক্তারবাবু prejudiced মনোভাব থেকে ওসব কথা বলেছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তর্ক বেড়েই চলে। এইভাবে ঘড়ির ছোট কাঁটা এক ঘর পার করিয়ে মিত্র যখন কক্ষ ছেড়ে বাইরে আসেন তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে একটি মাত্র স্বগতোক্তি খুঁজে পান : যাই হোক না কেন, ডাক্তার ব্যাটাকে কিন্তু বেশ দু’কথা শুনিয়ে দিয়েছি!

‘বেশ দু’কথা শুনিয়ে দিয়েছি’? সান্ত্বনার ভাষা কি এই! মিত্র কি দু’কথা শোনাতে গিয়েছিলেন না গিয়েছিলেন ওষুধ বিক্রী করতে? কি করতে গিয়েছিলেন তিনি? আর সে-কাজের কাজ কি হোল?

মিত্র আমার কাছে পরে বলেছেন যে এইভাবে বার কয়েক ব্যর্থমনোরথ হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করলেন অল্প কোন ‘অনেষ্ট’ উপায় অবলম্বন করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। তাই একদিন গেলেন তিনি নিছক শ্রোতা হিসেবে; ডাক্তারবাবু বলবেন আর তিনি শুনবেন। চেষ্টা করে দেখবেন, ডাক্তারবাবুর কথায় কতটা সার দেওয়া চলে! এইভাবে let him steam off। তাতে কাজ হলেও হতে পারে বা!

আর হয়েও ছিল। সেই দিনই মাত্র, (মাস ছয়েক wrangling-এর পর এই প্রথম) তিনি ঐ ডাক্তারকে কিছু ওষুধ 'পুশ' করতে পেরেছিলেন।

শুধু তাই নয়, তর্ক করে জেতাও প্রায়-অসম্ভব কাজ। মাসখানেক আগে মধ্য-কলকাতার এক সাহিত্যসভায় সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি কবিবল্লভের বিখ্যাত পদটি উল্লেখ করেছিলাম :

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

সভাশেষে আমারই কোনো সহকর্মী খেদের সঙ্গে বললেন : অনাদিবার, বিদ্যাপতির পদটি শেষে কবিবল্লভের নামে চালিয়ে দিলেন ?

চালিয়ে দিলাম ? আমি ঝটতি মুখ ফিরিয়ে বললাম : পদকর্তা কবিতল্লভ, বিদ্যাপতি নয়।

বন্ধুর একটু অমুকম্পার হাসি হেসে বললেন : না তা নয়। বিদ্যাপতির সঙ্গে কবিবল্লভের নাম জড়িয়ে ফেলেছেন বলেই এই ভুল করছেন।

প্রতিবাদ করলাম আমি। কক্ষনো নয়। হতেই পারেনা। কাম অনু বেট।

বাকী রাখা হোল পাঁচ টাকা। আমি প্রস্তাব করলাম, আমার বাড়িতে গেলেই হারজিতের মীমাংসা হবে। বৈষ্ণবপদাবলী আমার আছে।

বাড়িতে এসে ছুঁছুঁ বন্ধে পদাবলী খুলে দেখি আমিই ঠিক।

বন্ধুর চোখের উপর বইটা মেলে ধরলাম।

মিনিটখানেকের মধ্যে বন্ধুর মুখ কালো হয়ে গেল। কিন্তু কেবল মিনিটখানেকই। তারপর বইটা উল্টেপাল্টে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বললেন : ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ এটা। তাই তো বলি। এটা প্রামাণিক বই নয়। গ্রীয়ার্সনের 'মৈথিল পদসংগ্রহে' দেখবেন পদটি বিদ্যাপতির।

মৈথিল পদসংগ্রহ আমার নেই। না থাকুক ক্ষতি নেই। থাকলেও কি আমার বন্ধুটি স্বীকার করতেন যে তাঁর ভুল হয়েছে !

আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে এমন বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ যদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। ইংরিজিতে চলিত কথায় যাকে বলে—To avoid acute angle. এই কারণে স্বাধী সত্যিই বাগ্নিপুণ, তাঁরা সর্বথা ঐ 'স্বল্প-কোণ' বর্জন করে চলেন। তাঁরা কথার স্তর করেন এমন সব সর্বজনস্বীকৃত তথ্য বা তত্ত্ব দিয়ে, যাদের সম্বন্ধে প্রোতার লেশমাত্র সন্দেহ থাকে না। কলে বক্তা প্রথম পর্যায়ে কতকগুলো 'হ্যাঁ' আদায় করে সকলের মন সহানুভূতিশীল করে তোলেন। তারপর যখন তাঁরা তাঁদের 'আসল কথা'র যান তখন প্রোতার মোটেই ভাবতে পারেননা যে বক্তব্যটা তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা ধারণাটা foreign ! বরং তাঁরা ভাবেন তাঁদের মনের কথাটা যেন টেনে বলে দিলেন বক্তা !

নদী যেমন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নানা দিক ঘুরে শেষে সমুদ্রে মেশে, বিলিয়ার্ডএর বল যেমন এদিক ওদিক ঠোকা খেয়ে শেষে ঠিক খোপে পড়ে তেমনি কুশলী কথক ‘হ্যাঁ’ ‘হ্যাঁ’ এর মধ্য দিয়ে শ্রোতাকে স্বীয় দিকান্তে পৌঁছে দেন। তখন শ্রোতারা সফ্রেটিসের শিষ্যদের মত আপন মনে ভাবতে শুরু করেন—এমন সোজা কথাটা এদিন বুঝিনি কী আশ্চর্য !

শুধু আলাপ আলোচনা অথবা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নয় নিজের স্ত্রী বা পুত্রের কোন ভুল ধারণা নিরসন করবার বেলাতেও দেখবেন এই ‘হ্যাঁ’ এর নীতি কি আশ্চর্যরকম কার্যকরী ! আপনি পারেন বকেটকে বা হস্তিত্ব করে তাদের শেখাতে ; জোরজবরদস্তি করে তাদের মুখ দিয়ে এমন স্বীকৃতিও আদায় করা সম্ভব যে আপনি যা বলছেন তা নির্ভুল। কিন্তু

A man convinced against his will

Is of the same opinion still.

তাই দেখবেন, যেসব শিক্ষক ‘বেতের মুখে’ শেখান’র রাজপথ ছেড়ে উদাহরণ বা গল্পের গলিপথ ধরে ছাত্রদের শেখান তাঁরা যেমন ছাত্রদের প্রিয় হন তেমনি তাঁদের কাছে ছাত্ররা শেখেও অনেক।

রামকৃষ্ণ চরিতে আছে, যোর তাকিক নরেন রামকৃষ্ণদেবকে প্রথম সাক্ষাতে প্রশ্ন করেছিলেন : আপনি ভগবানকে দেখেছেন ?

এই বিশেষ প্রশ্নের আঘাতে নরেন এতাবৎকাল ব্রাহ্মনেতা, ধুরন্ধর মিশনারী ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতদের ধরাশায়ী করছিলেন।

কিন্তু অরিত উত্তর দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ : ‘দেখেছি’ কিরে ? অহরহ দেখছি। তুই দেখবি ?

যে blunt প্রশ্নের উত্তরে একটি ছোট ‘না’ ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না বা অল্প কথা ভাবা চলে না—একটা গভীর ‘হ্যাঁ’ এর যাদুস্পর্শ কি বিরাট পরিবর্তনই না এনে দিলে ! নরেন হলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দও স্বীকার করেছেন ঐ ক্ষুদ্র ঘটনা তাঁর জন্মাস্তর ঘটিয়েছে। নাস্তিক হলেন আস্তিক ; পঙ্গু লঙ্ঘন করল গিরিশিখর।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই ‘হ্যাঁ’ এর নীতি কেন মঙ্গল করে নেব না ?

॥ চন্দ্র ৭

দেবদাস :—বিমল রায় প্রোডাকশন্সের নিবেদন ; কাহিনী : শরৎচন্দ্র ; চিত্রনাট্য : নবেন্দু ঘোষ ; আলোকচিত্রশিল্পী : কমল বসু ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : বিমল রায় ; ভূমিকায় : দিলীপকুমার ; বৈজয়ন্তীমালা, নতিলাল, সূচিত্রা সেন ও অন্যান্যে ।

আলোচ্য ছবির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল যে চিত্রটি শুধু পূর্বর ছবির পুনর্নির্মাণ নয়, দেবদাস উপন্যাসের একটি যথাযথ চিত্ররূপায়ণ । দুঃখের বিষয় উপন্যাসের মৌলিক দুর্বলতা বাদ দেওয়া না গেলেও তার ছোটোখাটো চোখে পড়ার মত বিচ্যুতিগুলি চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক এড়িয়ে যাননি । ফলে, যেহেতু চলচ্চিত্রের আবেদন চোখের দরজা দিয়েই প্রধানত, ঘটনার আপাত বা বলা যায় বাস্তবোক্তেই বেশি উপন্যাসের মত মনস্তত্ত্বের দীর্ঘ বর্ণনার স্থলে—উপন্যাসের ছোটোখাটো ক্রটি কিয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় ।

ছবির আরম্ভ অপ্রত্যাশিতরকম কাঁচা কাজের মাধ্যমে । বাল্যের দেবদাস ও পার্বতীর রূপায়ণ দর্শককে রীতিমত বিমূঢ় করে । তাদের হাবভাব, সংসাপ, ঢং সবই মনে হয় বোম্বাই-ছবির তথাকথিত প্রাপ্তবয়স্কদের অসুসরণে দেখানো-পড়ানো । বালক দেবদাস শান্তি পেয়েছে বলে ওইটুকু বালিকারও রাতে যাওয়ার সময় পেট ব্যথা করার ভান হান্তকর লাগে ; উভয়ের একত্রে পার্বী ধরতে যাওয়ার নামে ডুয়েট গান ও তৎসহ অঙ্গ-ভঙ্গী দেখতে দেখতে সন্ধেদে বলতে ইচ্ছা করে : হায় ভগবান, শেষ পর্বন্ত এই ! অথবা যখন ভাবি বিমল রায়ের মত খ্যাতিনামা পরিচালক দেবদাসের কলকাতা যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বালিকা পার্বতীকে কি করে ওইভাবে গানের মারকৎ রাধাকৃষ্ণের লীলা শোনান, পার্বতীকে দিয়ে অমন এঁচোড়ে পাকা কথা বলান, তখন রীতিমত সজ্ঞাবোধ করি ।

ছবি ধীবনের ইতিবৃত্তে এসে অনেকটা সামলে নিচ্ছে, বাল্য-কথা চিত্রায়ণে যে স্কুলতা পীড়া দেয় তা আর পরে চোখে পড়ে না । কিন্তু ছবির এই মূল অংশটুকুর ট্রিটমেন্ট বা আদিকেও এমন কোনো গভীর যুগ্মিগান্য পরিষ্কৃট নয় যা বিমল রায়ের বর্তমান সুনাম আরো উজ্জ্বল করবে । মোটামুটি আধ্যাত্মিকতার আবেদনের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে, পরিচালনাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই । ছোটো পার্বতীকে কুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটা ও ফলের তরঙ্গের উপর বড় করে তোলার গতানুগতিকতা বা দেবদাসের আচমকা ঘৃণ্য মদ ধরার দৃশ্য পরিচালনার দুর্বলতাই প্রকাশ করে । দেবদাস মদ খাবে এটা জানা কথা কিন্তু তার মদ সন্ধ্যা প্রাথমিক তীব্র অনীহা যে প্যাচের উপর ভাঙা হয়েছে তা অতি-নাটকীয় হলেও দৃশ্যবস্ত্ত হিসেবে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়নি । তার জীবনের মূল্যবোধে চিড় খাওয়া ও প্রথম এই পা-পিছলানোর দৃশ্যটি আরো সুন্দর কল্পনার ক্রমবিকাশে জমিয়ে অতঃপর পরিণতির দিকে ঠেসলে বিশ্বাসযোগ্য ও আবেগবহ হত । যা দেখানো হয়েছে

তাতে যান্ত্রিকতা স্পষ্ট, পরিণতিটা অনিবার্য না লেগে মনে হয় আরোপিত। শিল্প প্রকাশে বা স্টাইলে গতানুগতিকতার ক্রটিটাই বেশি চোখে বেঁধে। যেমন একই সময় দু'জায়গায় দুজনকে, চন্দ্রমুখী ও পার্বতীর, দেবদাসের কথা স্মরণ করে বিচলিত হওয়ার দৃশ্য ক্রম-কাট করে দেখানো; দেবদাসের মুখের রক্তওঠা এবং বহুদূরে পার্বতীরও পড়ে গিয়ে কপালের রক্তপাত ইত্যাদি—এগুলি বড়ই সেকেলে ও দিনেমার অনুপযোগী কারুদা, অথবা ডুয়েট গানের মধ্যে এবং অন্তত পাখী দম্পতির বা একটি পাখীর সস্তা প্রতীকী shot. বলাই বাহুল্য বিমল রায়ের ছবি বলেই এই ক্রটিগুলি হতাশা জাগায়; নইলে সাধারণ ভারতীয় ছবির যা মান তাতে নিঃসন্দেহেই বলা যায় দেবদাস একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র। অনেক জায়গায় ছোটোখাটো কাজ; সুন্দর চিত্রময় কিছু ছোঁয়া, অভিনয় ও সর্বোপরি উপস্থাসের আদর্শ আবেদনটুকুতে মন আকর্ষিত হয়ে যায়। আশা থাকে ভবিষ্যতে বিমল রায় আরো অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও শিল্পসম্মত চিত্র তুলবেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় দিসীপের। তাঁর সংযত ভাবপ্রকাশ, মুখের বিষাদ, গলার গভীর প্রসাদ, বাচনভঙ্গী অত্যন্ত সুদয়গ্রাহী হয়ে মনে বাজে। তিনি ক্ষমতা ও বোধসম্পন্ন সত্যিকারের অভিনেতা বৃত্তিতে ভুল হয় না। তারপরই আসেন বৈজয়ন্তীমালা, তাঁর অনেক স্থানের সংযত চরিত্ররূপায়ণ ভালো লাগে। নাচেই যার খ্যাতি তিনি অভিনয়ের বোধও রাখেন দেখে খুশি হই। চুনীলালের ভূমিকায় মতিলাল সাবলীল কাজ করেছেন। প্রথম হিন্দী ছবির কাজ হিসেবে সূচিক্রা সেনও নিন্দনীয় নন। তাঁকে দিয়ে আগারএকটিং করানোর দরুণ তিনি অনেকক্ষেত্রে নিজের অভিনয়ক্ষমতাকে ছাপিয়ে উঠেছেন। তবে অবিবাহিতা পার্বতী হিসেবে তাঁকে বড় এবং শরীরের দিক থেকে ভারী দেখায়; পরে, বধূরূপে সেটা মানিয়ে যায়।

ক্যামেরার কাজ বেশ ভালো। আবহসংগীত মধ্যে মধ্যে মন্দ লাগে না। দু-এক জায়গায় পথের পাঁচালী চিত্রের প্রভাব চোখে পড়ে।

সবার উপরে : এম. পি. প্রোডাকশন্সের নিবেদন; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত; কাহিনী ও সংলাপ নিতাই ভট্টাচার্য; আলোকচিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ; সংগীত রবীন চট্টোপাধ্যায়; ভূমিকায় : সূচিক্রা, উত্তম, ছবি, শোভা সেন, জয়ন্তী সেন, পাহাড়ী, নীতিশ, কালী, তুলসী ও অনেকে।

অগ্রদূত পরিচালিত ইতিপূর্বের ছবিগুলির মতই গতানুগতিক ভঙ্গীতে সবার উপরে নির্মিত। বাংলা ছবির সবরকম আদিকগত কুসংস্কারই ছবিটিতে পুরোমাত্রায় বজায় আছে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতা ও বছরে দু'তিনটি চিত্র তুলেও অগ্রদূত পরিচালনাক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র উন্নতি করতে পেরেছেন এমন বদনাম লোকের আলোচ্য ছবি দেখেও দিতে পারবেন না। তাঁর ট্রিটমেন্টের ধারা, ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর ক্রমপরিণতি প্রকাশের রীতি ও চলচ্চিত্রকে মূলত চিত্রময় করে তোলা ক্ষমতা ভগবানের রূপায় ঠিক আগের মতই নিম্নধাপে

রয়েছে। তাঁর হৃদয় মহৎ, চিত্রের বক্তব্য যে শুভ ও মঙ্গলকর তা ছবির বক্তৃতাগুলি শুনলেই পরিষ্কার হয়; কিন্তু গোল বাঁধে শিল্পরূপায়নের কালে। যখন পরিচালক তাঁর বক্তব্যকে চিত্রে রূপান্তরিত করতে যান তখন প্রয়োজনীয় শিল্পবোধ ও বাস্তবজ্ঞানের স্থলে নৈল্পিক দীনতা এবং সিনেমা সম্বন্ধে কল্পনাহীন মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবার উপরে দেখতে দেখতে কেবলই মনে হয় থিয়েটার দেখছি বুঝি। চিত্রগুলি আপন আপন শরীর মনের কথা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সব সময়ই সুদীর্ঘ সংলাপের মারফৎ বর্ণনা করেন। প্রথম থেকেই মা ও ছেলের বাক্যালাপের নামে যে বক্তৃতামালা উপহার পাওয়া যায় তা মোটেই সিনেমার ধর্মে নয়। ভুলে গেলে চলবে না চলচ্চিত্রের মূল ভাষা কথার কৌজ নয়, চিত্রময় বর্ণনা। অর্থাৎ নাটকে যেটা মূলত সংলাপ দিয়ে বোঝাতে হয়, সিনেমার তার অনেকখানিই ছবির নিজস্ব আবেদনে মূর্ত করা প্রয়োজন। নইলে পর্দায় যা ভেসে ওঠে তা সিনেমা হয়না দাঁড়ায় ছবির থিয়েটার, বাক্যের ফুলঝুরি। পাত্র-পাত্রীর স্বল্প ব্যবহার, চকিতে পরিস্ফুট মৌখিক অভিব্যক্তি, দাঁড়ানোর ভঙ্গী, বসার, চলা এবং ঘটনার অর্থপূর্ণ খুঁটিনাটি চিত্রময় বর্ণনার সাহায্যেই মূলত চলচ্চিত্র জীবন্ত হয়; সেই জীবন্ত ভাবকেই আরো বেগবান ও বাস্তব করে তোলে সংলাপ। এই স্বল্প কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ চিত্রময় বর্ণনা কোশলেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে থিয়েটারের মৌলিক পার্থক্য। সেই পার্থক্যটুকু সবার উপরেতে প্রায় অস্পষ্ট, ফলে ছবিটি ক্লাস্তিকর ও সিনেমা হিসেবে নিকৃষ্ট। সংলাপ বাহুল্য বাদ দিয়েও ছবিটি এত বেশি গতানুগতিক সংস্কারে আচ্ছন্ন যে হতাশ হতে হয়। বাপের চিঠি পড়ার দৃশ্য, কৃষ্ণনগর সমাচার পড়তে পড়তে পিতার নির্দোষীতার বিচলিত হতে থাকা নায়কের হাস্তকর বিগ্ন ক্রোস আপ, প্রেমের দৃশ্যগুলিতে বাগান, টাঙ্গ, ফুল, বৃষ্টি এবং সর্বোপরি গান—এ সবই বাংলা ছবির ঐতিহ্য অনুযায়ী সবার উপরেতেও আছে। অমুহূ, কয়েকদিনের অভুক্ত বাস্তা-থেকে-ভুলে-আনা নায়ককে নায়িকা সপ্রেম হাতের স্পর্শে ঘুম পাড়িয়েই পাশের বারান্দায় গিয়ে সববে চাঁদের দিকে তাকিয়ে গান করতে থাকেন, একবারও মনে হয় না বেচারীর ঘুম ভেঙে যাবে—অমুহূ মামুহ, আহা, ভালো ভাবে নিবিবিলিতে ঘুমোক। তা মনে হলে দৃশ্যটি অনেক স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হত, মনে হত সত্যিকারের মানুষের জীবনের একটা দিক দেখা গেল। পরিচালকের যেন সেটাই ভয়, তাই তিনি তাড়াতাড়ি স্টুডিওর টাঙ্গ ও ফুল দিয়ে নায়িকাকে হাতছানি দিলেন, নায়িকা সুবেলা গলায় অর্জেট গায়ে গান ধরলেন। ঘটনাটার বাস্তবজগতের অমুহূপ্রেমিক নিশ্চয়ই মারা যেতেন কিন্তু উত্তমকুমার স্বভাবতই যাননি। দর্শকও দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছেন।

ছবির শেষাংশে, কোর্টরুমে, খুব থিয়েটার ঘেঁষা নাটকীয়তা আছে। সত্যিকারের খুনী আবিষ্কার করার সময়ের কয়েক জায়গায় সাসপেন্স ও। তাছাড়া সূচিত্রা সেনের সৌন্দর্য, আড়ষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গী (আগের থেকে অবশ্য কিছুটা শুধরেছে), উত্তম-সূচিত্রার জনপ্রিয়তার টান, এবং শিল্পশ্রী নায়িকা ও শিল্পশ্রীর পুত্র নায়কের চোখ বাঁধানো সাজ।

স্বল্পের শিক্ষিত্রীর ঘর দেখেও ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের জীবনধারণের উচ্চ মান সম্বন্ধে অন্ধা ও ঈর্ষা জাগে। এ ব্যাপারে হলিউডের কাছাকাছি আমরা পৌঁছেছি সম্ভব নেই।

অভিনয়াংশে শোভা সেন শুধু কেঁদেছেন। তা ছাড়া তাঁকে বলতে দেওয়া হয়েছিল বড় বড় সংলাপ সেগুলো যথাসাধ্য শুছিয়ে নির্ভুলভাবে বলার চেষ্টাও করেছেন। উত্তমকুমার আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন বক্তৃতার মাঝেও সু অভিনয় করা, কিছু জায়গায় তাঁকে ভালোই লাগে এবং বোঝা যায় উপযুক্ত চিত্রনাট্য ও পরিচালক পেলে তিনি আরো সার্থক হতে পারেন। সূচিঙ্গা সেনকে সুন্দরী লাগে আগাগোড়াই তবে শিল্পী বলে খুব বিশ্বাস হয় না; বলা বাহুল্য তিনিও খারাপ চিত্রনাট্য ও গতানুগতিক পরিচালনার অনেকটা মার খেয়েছেন। অশ্রুস্রবেরও একই হাল—আসলে দেশে আরো সত্যজিৎ রায় না বেরুলে কিংবদন্তি বাজারে এ ধরনের ডামাডোলই চলবে, অভিনয় শিল্পীরাও লোকের কাছে নিন্দাবাদ কুড়োবেন। আমরা আপাতত নতুন পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারদের আশায় বুক বাঁধব, নিশ্চয়ই আজ নয় কাল তাঁরা দেখা দেবেন।

অর্ধাঙ্গিনী : বিকাশ রায় প্রোডাক্সন্সের নিবেদন ; পরিচালনা বিকাশ রায় ; কাহিনী ও চিত্রনাট্য : পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্রশিল্পী : দেওজীভাই ; সংগীত : নটিকেশ্বর ঘোষ ; ভূমিকার : পাহাড়ী, বিকাশ, অসিত, জীবন, নির্মল, ভানু, সুন্দা, মঞ্জু, ভারতী, সাবিত্রী, সবিতা ও আরো অনেকে।

প্রথমেই নতুন কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালককে তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর জানাতে হয়। একটি যরোয়া গল্পকে তাঁরা যে অতিরিক্ত অতিরঞ্জন ও স্থূলতা বাদ দিয়ে উপভোগ্য চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন তাতে সিনেমা সম্বন্ধে তাঁদের বোধ ও কৃতি প্রমাণিত হল। বিকাশ রায়ের এই প্রথম পরিচালক এবং পাঁচুবাবুরও চিত্রনাট্যকার হিসেবে (আমরা যতদূর জানি) কাজ এবং তাতে তাঁরা যে যোগ্যতার নমুনা রেখেছেন তা অনেক প্রতিষ্ঠিত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারেরও আয়ত্ত করা বিধেয়। বাংলা ছবির মান তাহলে কিছুটা উন্নত হবে।

গল্পাংশ একান্বর্তী একটি পরিবারের পাঁচ ভাই ও তাদের পরিজন নিয়ে। পাঁচ ভাইয়ের অত্যন্ত হৃদয়তা ও মিল, তাই নিয়ে জাঁকও আছে। স্ত্রীদের অনেক সময়ই শোনানো হয় যে এমন ঘনিষ্ঠ একতা ও সহমর্মিতা একমাত্র পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভব ; তাদের হাতে, অর্থাৎ স্ত্রীদের হাতে সংসারের মূল ভারটুকু থাকলে পরিবারের এ একতা ভেঙে তখনই হয়ে যেত। এ ধরনের বড়াই শুনে স্ত্রীরা সলা করলে স্বামীদের অহংকার ভাঙতে হবে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাঁধিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে এই শান্তি ও সহযোগিতার মধ্যে তাদের অবদানও নগণ্য নয়। সেই অভিসন্ধি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী বোয়েরা তাদের স্বামীদের কানে নানান রকম মনগড়া লাগানিভাঙানি ভুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের কাজের কলও ফলল। ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ খানিক ভুল বোঝাবুঝি গিয়ে ঠেকল

সম্পত্তি ভাগাভাগির কিনারে। ঠিক ব্রহ্ম যুগুর্ভে অবশ্য স্ত্রীদের বড়বড় ফাঁস হয়ে যায় এবং উর্ন্তে তখন স্বামীরা একঘোটে হয়ে স্ত্রীদের জব্দ করে। এই নাট্যবস্তু কেন্দ্র করে ছবিটি তৈরী।

পাঁচুবাবুর সংলাপ ও মোটামুটি ঘটনা সংস্থাপনা প্রশংসা যোগ্য। বিশেষত তাঁর সংলাপ রচনার সিনেমাসম্মত বোধ পরিস্ফুট। এ ব্যাপারে পরিচালক বিকাশ রায়েরও কৃতিত্ব স্পষ্ট; এদের উভয়ের দক্ষতার পাত্রপাত্রী প্রায় কোথাওই বাংলাছবিস্থলভ দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার সুযোগ পায়নি। ঘটনা এগিয়েছে সাধারণত পরিস্থিতি ও পাত্রপাত্রীর ব্যবহারের মাধ্যমেই, অহেতুক টানা বক্তৃতা দিয়ে দর্শককে কিছু বোঝাবার হাত্তকর প্রয়াস হয়নি ছবিতে। তবু চিত্রনাট্যের যেটুকু দুর্বলতা তা ঘটনাসংস্থাপনাতেই; সাধারণ বাংলা ছবির তুলনায় সে ক্রটি এ ছবিতে অনেক কম হলেও, তা বর্তমান। এই ক্রটি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে স্ত্রীদের সলাপরামর্শের পর স্বামীদের একতা ভাঙানোর চেষ্টায় এবং তার পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা একটু বেশি সাজানো লাগে। মনে হয় আগে থেকে ছককাটা সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার একত্রে আরো অভিনব বিচিত্র পরিস্থিতি ও কল্পনাময় নাট্যধারার আধ্যাত্মিক প্রকাশ করলে ছবির মাঝামাঝি যে একটা একঘেয়েমির বেশ জমে তা দেখা দিত না। অন্তর্গত ছবি আরো প্রাণবন্ত ও সজীব হত। পরিচালকের পটুত্ব ও পরিমিতি বোনের জন্ত প্রায় কোনো দৃশ্যই (গান ছটির দৃশ্য বাদে) বিরক্তিকর বা বিলম্বিত মনে হয়না। এডিটরও এর জন্তে ধন্যবাদার্থ; যদিও, বলাই বাহুল্য, পরিচালকের পরিমিতি জ্ঞান ভিন্ন কখনোই ছবির গতির গাত্রা বা প্রকাশ সহজত থাকেনা। এবং এই সংহতি—বিশেষ একটি দৃশ্য কতক্ষণ পর্দায় থাকবে তার যথার্থ বোধ—বাংলা ছবিতে অত্যন্ত বিরল; সে দিক থেকেও অর্ধাঙ্গিনী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরিচালক ও শিল্পনির্দেশককে কিছুতেই ক্ষমা করা যায়না রান্নাঘরের বিপুলায়তনের জন্তে। পরে পাঁচটি হাঁড়ি আলাদা করতে হবে বলে যদি এ ধরনের গড়েরমাঠকে রান্নাঘর হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে তো তার থেকে কাঁচা কাজ আর ভাবা যায় না। আসলে ছবির মজা আরো বাড়ত, নাট্যের ক্রমবিকাশ লাগত আরো স্বাভাবিক যদি সাধারণ রান্না ঘরে পাঁচটি আলাদা হেঁসেল হতে পারল না বলে দেখানো হত বাড়ির অন্তর্গত নানান জায়গায় পাঁচটি হেঁসেল ছড়িয়ে পড়ল। তাহলে আলাদা রান্নার সময়কার ঘটনাগুলি তিস্মায়ালি বা ছবির মাধ্যমে আরো জমত; ছককাটা ভাবও অনেকটা কাটত। পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার আরো বিস্তৃত পটভূমিতে ও পরিস্থিতির মধ্যে পাত্রপাত্রীদের পরিণতির পানে চালিত করতে পারতেন।

অভিনয় মোটামুটি ভালো হয়েছে, শুধু নির্মলকুমার ডুবিয়েছেন। বিকাশ রায় পরিচালনায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অভিনয়ের ক্ষেত্রে তা অনেকটা ম্লান। তাঁর হাসি, ভুরু তোলা, মুখের কিছু ম্যানারিসিম বড়ই একঘেয়ে লাগে ইদানিং। এর একটা কারণ প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই তাঁর চরিত্রাভিনয়। পাহাড়ীও কিছুটা বৈচিত্র্যহীন।

অদিতবরণ এবং বিশেষত জীবন ভালোই করেছেন। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য চাকর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি তেমন চরিত্রে রূপ দিতে পেলেন এবং যোগ্য পরিচালকের সাহায্যে কতদূর যে যেতে পারেন ভাবা যায় না। মেয়েদের মধ্যে সুনন্দা ও মঞ্জু সব চাইতে ভালো করেছেন, তাঁদের সুযোগও ছিল। শুধু মঞ্জুদের মায়ায় নতুন অভিনয় এলেই তাঁর যুগের ক্লাস সটে যে অভিব্যক্তি দেখানো হয়েছে তা পরিচালক ও অভিনেত্রী উভয়েরই দূর্বলতার লক্ষণ। মানুষের মনের গূঢ় ফন্দি কিংবা অমন সস্তা চোখ যুগের ভদ্রীতে দেখানো কাম্য নয়। আলোকচিত্রশিল্প কিছু অভিনয় বা কল্পনাময় নয়, তবে বক্তৃকে তক্তকে পরিষ্কার ভাবটুকু আছে। মুড বা বিষয়বস্তুর আবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেটাকে ঘনীভূত করার কাজও যে ক্যামেরা এবং লাইটের ঠিকমত ব্যবহার অনেকটা করে এ কথা এখানে আলোকচিত্রশিল্পীদের কাছে আত্মোক্ত হইয়া খুব স্পষ্ট নয়। নইলে নাক ডাকিয়ে রাতে সেজকর্তা যখন ঘুমুচ্ছেন এবং স্ত্রী বড়বল্লী অনুযায়ী তাঁর মন তিস্ত করার চেষ্টা করছেন তখনো দিনের আলোর মত ঘরে আলো থাকবে কেন? বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অভিনয়ের গূঢ়ার্থের সঙ্গে এবং রাতের মুডের সঙ্গেও আবছায়া আলোআধারের খেলাই সূচু হত; তাতে শুধু নাট্যবস্তুর নিহিত বক্তব্যই আরো অর্থময় হয়ে উঠত না, কিংবদন্তি মৌল গুণও (visual aspect of film) আরো প্রাঞ্জল লাগত।

আমরা আশা করি পরবর্তী ছবিতে বিকাশ দায় আরো নির্ভর দেশী ফিল্ম ভগতের কুসংস্কারগুলি উপেক্ষা করে শিল্পীর সম্পূর্ণতা নিয়ে কাজ করবেন। তাঁর প্রথম ছবির গুণাগুণই তাঁর উপর আরো গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

চিত্রভাষী

॥ গ্রন্থ-পরিচয় ॥

লুইত পারের গাথা : অমলেন্দু গুহ : প্রকাশক—নতুন সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-২০। দাম একটাকা আট আনা।

উনিশটি কবিতার সমষ্টি। বাংলা কবিতার ভগ্নভাঙা 'লুইত পারের গাথা' এই প্রথম একটি নতুন রীতি বহন করে নিয়ে এল। 'অসমীয়া ভাষার মিষ্টি শব্দগুলির সংগে বাংলা ভাষার মিষ্টি শব্দ যোজনা করে' করে কবিতা গ্রন্থন—এ' এক নতুন রীতি। যেন এক নতুন বদানী। অর্থাৎ, কবিতাগুলো বাঙালী পাঠকের কাছে সহজবোধ্য। বাঙালী এবং অসমীয়া—দুই ভাষাভাষী কবিতা পাঠকের কাছে এ এক কোঁতুহল-উদ্দীপক বস্তু এবং তার চেয়েও বড় কথা, ভাষা-স্বন্দেহ বর্তমান কলুষিত যুগে এ সাহিত্য-কর্মটা সৌভাগ্যমূলক। শব্দের সংনিয়ন্ত্রণ কিরূপ লাগে, শুধুন :

'কখনো বা প্রথম বৈশাখে

শিপিনী কুমারী সাজে আনকোরা বিহামেখলার

কাটা শিমুলের মত কিষাণের উড়ে চলে মন,

বহাগীর আমন্ত্রণ

ফুটে ওঠে নাহরের শাখার শাখার.....(লুইত পারের গাথা)

লুইত অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র পারের গাথা বা গান। বাঙালী কবি অমলেন্দু গুহ আসামকে নিবিড়ভাবে ভালো বেসেছেন। আসামের নববর্ষ অর্থাৎ বৈশাখের বিছ উৎসবে মানুষ ও প্রকৃতির চিত্ত-চাকলা তিনি একান্ত হয়ে অনুভব করছেন। লুইতের জনপদে শিপিনী কুমারীর পরিচ্ছদেই কেবল নতুনত্ব আসছেন, সর্বত্র মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভাবোন্মাদ দেখা দিয়েছে। বাঙালী মনের সংগে অসমীয়া মনের মাধুরী মেশাতে গিয়ে কবি অসমীয়া কয়েকটি শব্দের সুন্দর আশ্রয় নিয়েছেন।

বইখানি মূলত কিন্তু বাংলা বই। এবং পুরোপুরি বাংলা কবিতার সংখ্যাই এতে বেশি। কয়েকটি কবিতার মধ্যে অসমীয়া শব্দগুলির সংযোজন করে কবি যেন একটা নতুন নিরীক্ষা-পরীক্ষার কথা আমাদের জানিয়ে দিলেন।

মুখ্যত এই কাব্য-গ্রন্থখানি ভাষের দিক থেকে প্রগতিশীল। যারা প্রগতিশীল কবিতার অনুরক্ত, তাঁদের কাছে এ বইখানি একটি নতুন আনন্দ আনবে। সারা বইখানি জুড়ে আকাশ ও মাটি, জল এবং হুল ও ফলের প্রতি এত মমতাময়-দৃষ্টি। বনের যত কপো অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর হুল, ঘাসের প্রতিটি শিশির বিন্দু, আকাশের সব নক্ষত্র; পাতার যত রঙ—

সবই যেন তাঁর চেনা। এ এক আশ্চর্য রিয়ার্সিজন। এই বাস্তববাদী দৃষ্টিদিয়ে কবি যখন যুদ্ধকে রুখতে চান, তখন তাঁর বলার ভংগিটি ভালো লাগে :

‘আমরা চাইনা যুদ্ধ, বনে বনে ছুটেছে কপো’ (লুইত পারের গাথা)

কিংবা তাঁর কল্পার মনের বর্ণনা দেন :

‘নতুন ছেয়েছি ঘর ফুলে-ভরা নাহরের নীচে।’ (বিহ)

সব কয়টি কবিতার ভেতর উজ্জ্বলতম ভাবোন্মাসের কবিতা হল ‘কমরেড গাডুলী’। কবি এখানে এত অন্তরংগ, এত বলিষ্ঠ যে, তাঁকে যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। কমরেড গাডুলী মফঃস্বল শহরে আসছেন। কবি তাঁর ক্ষণ উন্মুখ হয়ে আছেন। বলছেন :

‘হুনিবার মানুষটি বড় বেশী চেনা এ অঞ্চলে,

হুচোখে ছড়ানো তাঁর তবু এক নতুন বিষয় !

যে দীপ জীবন জ্বালে, তারি শীর্ষ ছোঁয়ানো কাজলে

সেই চোখে ভোর হয়-হয়।

অথবা কমরেড গাডুলী যখন বিকেলে বড়তা দেবেন, তখন অবস্থাটা কিরূপ হবে, তার বর্ণনায় :

‘বিকলে গোধূলি লগ্নে মাঠভরা জনতার ভিড়ে

একটি শানিত কণ্ঠে উৎসারিত আশার ফোয়ারা

সব ক্রেশ ধুয়ে ফেলে বন্ধকলা, মনের গভীরে

নদীহরে ভাঙবে কিনারা।’

আর একটি কবিতা আমার বড় ভালো লেগেছে। কবিতাটির নাম ‘ছেলেটি’। এত সহজ কবিতার মধ্যে এত আবেগ, এত বেদনা। স্থান ও কালকে পেরিয়ে কবিতাটি বহু দূরে চলে গেছে। পড়লে বারবার করে পড়তে উচ্ছে হয়।

মোটকথা, বইখানির স্বাদ ভুলবার নয়। ছাপা ও বাধাই মনোরম। লেখককে অভিনন্দন জানাই। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

জনসমুদ্র : রামেন্দ্র দেশমুখ্য—অগ্রণী বুক ক্লাব। দাম : একটাকা চার আনা।

এক সময় ছিল যখন কবিতা পাঠের সংগে মনে পড়তো চাঁদ, ফুল আর কয়েকটি গতানুগতিক শব্দ, উপমার কথা। পাঠক বিরক্ত হয়ে যেতেন। ইতিহাস এগিয়ে চলেছে অথচ কবিরা সেই পুরনো শব্দ, উপমা, ভাব এবং আঙ্গিকের মোহে আবিষ্ট হয়ে কবিতা রচনা করে চলেছেন। সময়ের সংগে রুচি এবং কৃষ্টির পরিবর্তন হয় একথা বিস্মৃত না হলেও, সচেতন ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি অনেকে। যুগের, দেশের কথা সমাজের পরিবর্তনের রূপ যে কবিতায় ধরা পড়ে না স্বার্থক সৃষ্টির পক্ষে তার অন্তরায় বহু।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য ইতিহাসের গতিশীলতার সংগে সাহিত্যের পরিবর্তনশীলতার মূত্র সম্বন্ধে সচেতন তাই তিনি বলতে পারেন—

“আজো যদি প্রকৃষ্টধনে কাব্যহর কেবলই শোভন,
চাঁদ ও কুসুমের হয় সংগীতের কবরী রচনা ;
নিদারুণ তবে পরিহাস ।” (আশা)

এবং সেজন্য নিছক সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি কবিতা লিখতে পিছিয়ে আসেন না । প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে সাময়িকতার ছাপ সুস্পষ্ট । কবি নিজেই বলেছেন “১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলার সচেতন কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের সংগ্রাম যে একটা বিশেষ রূপ নিয়েছিল, তারই স্বীকৃতি বহন করে যাত্রারস্ত হয়েছিল ।” এই সাময়িকতাকে কেন্দ্র করে কবিতাগুলিকে রসোত্তীর্ণ করতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি রামেন্দ্র দেশমুখ্যের । ঘটনা কোথায় রিপোর্ট হয় তা তিনি ভুল করে জানেন । সেজন্য একান্ত সাময়িক ঘটনা তাঁর কাছে অমূল্য সাহিত্যসম্পদ হিসাবে দেখা দেয় । “একশো চুয়াল্লিশ,” “সিংহ শিশু,” “বিস্ফোরণ” কবিতাগুলি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ।

জনসমুদ্রের কবিতাগুলিতে আশাবাদের সংগে মিশে আছে কবির মানবিকতা । “মজুর শিশুর প্রার্থনা” কবিতাটির মধ্যে শিশুর প্রশ্ন, উপলব্ধি এবং শেষে বলিষ্ঠ ঘোষণা “কাল যা তোমার দিতেই হবে সাড়া”র সমাপ্তি কবিতাটিকে প্রথমশ্রেণীতে উন্নত করেছে ।

একান্তভাবে বাস্তবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন এজন্য রামেন্দ্রবাবু শব্দচয়ন এবং উপমানির্বাচনে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন । রূঢ় বাস্তবকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি অবশ্য জটিল উপমা বা ইমেজের আশ্রয় নেন নি । সহজ, সরল কথার ছবিগুলি চোখের সামনে তুলে ধরেছেন । শুধু চিত্রই নয় তার সংগে প্রকাশিত হয়েছে অন্তর্দৃষ্টি—“চোখ” কবিতার চিত্রের সংগে পটভূমি, মানসিক পরিস্থিতি সবকিছু ভেসে উঠে—

“কখনো জল, কখনো আঙন, কখনো পাথর
মণি কাঁপে ধরোথর ।
নারী ও নরের, আশা ও ভয়ের চোখ
চোখের উপর আঙনের অক্ষর,
বিছাতে যেন ভাস্বর মেঘলোক ।” (পৃঃ ২৩)

তবে কয়েকটি কবিতায় রামেন্দ্রবাবু যথেষ্ট যুক্তিমান্য পরিচয় দিতে পারেননি বলে মনে হয় । কবিতাগুলি যেন statement হয়ে পড়েছে । “জংগী শ্রমিক,” “আমি এলাম,” “বেকার কবি” ইত্যাদি কবিতাতে কাব্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না । ব্যাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে ব্যঙ্গার্থে পৌঁছে দিতে অক্ষম হয়েছে কবিতাগুলি । কবি একজায়গায় অবস্থিতির যেন কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেছেন—

“এখানে বসতি করি, কাব্য লিখি অক্ষর আশার
জমে না রসের কাব্য জানি,
ফুটপাতে মরণের যতদিন চোরা হাতছানি—”

এই কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও কবিকে এর উদ্দেশ্য ওঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং বিজয়ীর মত সর্বশেষে এগিয়ে পাঠককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

জনসমুহের সবগুলি কবিতাই অমিল কবিতা। (গল্প-কবিতা কথাটার আমার আপত্তি আছে—আমার কাছে গল্প-কবিতা কথাটি সোনার পাথরের বাটির মত শোনায়। সেক্ষেত্রে আমি “অমিল-কবিতা” ব্যবহার করেছি)। বিষয় অনুসারে অমিল কবিতার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি কবিতায় মিল ব্যবহার করলে কবিতাগুলি আরো ভালো হতো। সন্দেহ নেই—এমন কি আবৃত্তি করার দিক থেকে কবিতাগুলি যথেষ্ট বলিষ্ঠ হতো বলে মনে হয়। “উদ্‌বাস্ত” কবিতাটির মধ্যে সচেতনভাবে মিলের প্রয়োগ নেই তবুও মাঝে মাঝে মিল এসে এর আবেদন ও অনুবণন দুটোই বাড়িয়ে দিয়েছে—

“চিনেছি কি শুকে ?

ভিন্কার বন্মীকে-চাপা এ সীতার হাসি শুধু সাড়া,
হাসি তার প্রাণান্ত আবেগ,
প্রমত্ত বিবেক,
ক্রুদ্ধ শিরদাঁড়া।”

“সাড়ার” সংগে “দাঁড়া”র মিল কবিতাটিকে এক অনবদ্য সমাপ্তি দান করেছে বলে মনে হয় তাই কবিতাটি পাঠ শেষ করেও মনে গুঞ্জনর বেশ থেকে যায়। “লাল-পাগড়ি” কবিতাটির মধ্যে মনোবিকলনের যে সুন্দর ছবিটি পাওয়া যায় তার সংগে যদি এই সুরের আমেজ মিশিয়ে দেওয়া যেতো তবে “লাল-পাগড়ি” কবিতাটিও “উদ্‌বাস্ত” মত একটি প্রথম-শ্রেণীর কবিতা বলে গণ্য হতো—তবুও কবিতাটির শেষে—

“সে আমার দিকে তাকাবে না

আমার লাল পাগড়ি”

কথাটির মধ্যে যে বেদনার সুর বেশানো আছে তাতে কবিতা পাঠের অনেকক্ষণ পরেও হৃদয়ের আত্মভাব সহজে কাটতে চায় না—মনে হয় যেন এখুনি কবিতাটি পাঠ করেছি।

ছাপা, বাধাই ভাল। আড়ম্বরহীন প্রচ্ছদপটটির পরিকল্পনা সুরুচির পরিচায়ক।

কার্তিক লাহিড়ী

রাহুলের লেখা বই

॥ জনপদের ছন্দ ॥

পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি নিজে পড়ুন এবং প্রিয়জনকে পড়ান। চার রঙা প্রচ্ছদপটে এবং পরিচ্ছন্ন ছাপায় বইখানি অপূর্ব। দৈনিক যুগান্তরে বইখানির সমালোচনায় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

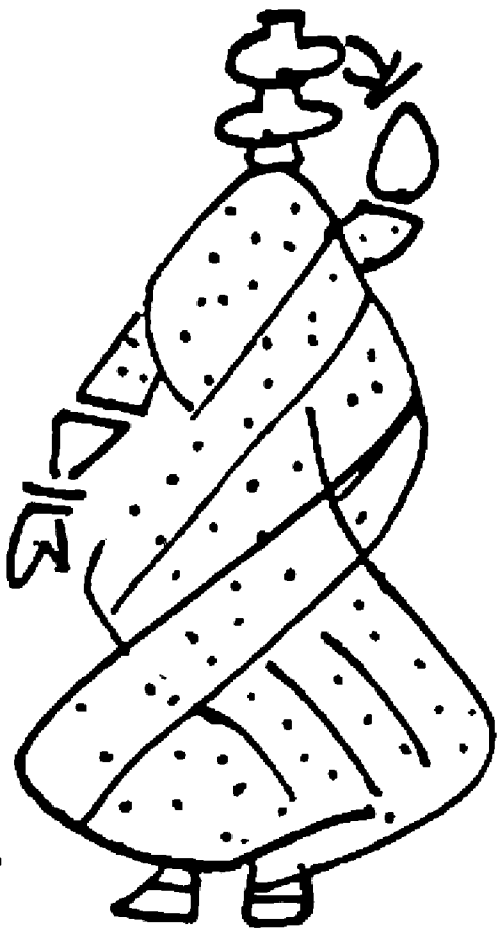
“আমলে ভ্রমণটা উপলক্ষ মাত্র, লেখকের আসল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজের দিকে। ভারতবর্ষের যে বিরাট মনুষ্যসমাজ বহু বিচিত্র নরনারীর মিছিল লইয়া ইতিহাসের এক পর্যায় হইতে অন্য পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেই গতিপথে সমাজের যে বিচিত্র ভাঙাগড়া চলিতেছে, শক্তিশালী লেখক সেই দিকটাই এই গল্পগুলিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল—বক্ষিত, দরিদ্র ও শোষিত মানুষগুলির জন্য তাঁহার যথেষ্ট দরদ এবং এই দরদের পরিচয় বহুদূর অতীতের বৌদ্ধযুগ হইতে আধুনিকতম কংগ্রেসী যুগ পর্যন্ত। শিলংগৈলের নাচের নর্তকী হইতে বোম্বাইয়ের মারাঠী বধূ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ও অনেক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন এই পুস্তকের নায়ক রাহুল; কিন্তু যে সমস্ত জীবনের রেখাচিত্র ইহাতে পড়িয়াছে, সেগুলি বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া আগামী যুগ পর্যন্ত পদক্ষেপ করিয়াছে।

‘রম্যরচনার যে নূতন ঢেউ আমাদের সাহিত্যে আসিয়াছে, এই বইটিও সেই প্রাবনের মুখে পড়িয়াছে। তবে, ভরসা এই যে, এগুলি রম্যরচনার অর্থহীন গল্প নহে। ব্যঞ্জনাগ্ন ও ভাবের গভীরতায় ইহা নূতন সমাজ ও নবসংস্কৃতির জন্য অপেক্ষমান। সেখানেই এই পুস্তকের সার্থকতা। লেখকের স্টাইল সহজ ও স্বচ্ছন্দ এবং গল্পগুলি মুখরোচক। যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তিনি ভারতীয় সমাজকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, উহার বিচিত্র নরনারীকে অবলোকন করিয়াছেন, তাহাতে খানিকটা চাপা বিজ্রপ হয়ত আছে, কিন্তু সেই বিজ্রপ আমাদের সমাজের ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত মনুষ্য সমাজের প্রগতির প্রতিই তিনি আস্থা রাখিয়াছেন—কেবল নৈরাশ্রের চিত্রই আঁকেন নাই। বইটির প্রচ্ছদপট সুন্দর।”

দাম সাড়ে তিন টাকা

অগ্রণী বুক স্টোর

৯৩, শিবনারায়ণ দাস সেন, কলিকাতা-৬



॥ দৃষ্টি ॥

॥ অষ্টম বর্ষ, ঘাঘ-ফাল্গুন, ১৩৬২ ॥

সম্পাদক : প্রফুল্ল রায়

॥ গল্প ॥

হুই আকাশ	... শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৫৮৫
শীতের ওক	... মুরি নজিবিন	৬২০

॥ উপন্যাস ॥

খাল-বিল-পারের কাহিনী	... কণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫২৫
----------------------	--------------------------	-----

॥ কবিতা ॥

নির্জনতা	... মানস রায়চৌধুরী	৬১৮
ফুল বলে	... শিবশঙ্কু পাল	৬১৯

॥ প্রবন্ধ ॥

সংস্কৃতি ও ভাষাগত রাজ্য	... শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	৫৭৯
কর্কট রোগ পরাজয় বরণ করিবে	... ডি, হ্যাব্রোভিৎস্কি	৬০৬
যাত্রা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র	... আশীষ বর্মণ	৬১১
সংস্কৃতির তথ্যকথা	... ভারতী চৌধুরী	৬৩২

॥ চলচ্চিত্র ॥

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি	... চিত্রভাষী	৬২৫
মাগরিকা	... চিত্রভাষী	৬২৬
অসবর্ণা	... চিত্রভাষী	৬২৮
ভোলানাষ্টার	... চিত্রভাষী	৬৩০

॥ সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ ॥

স্বত্বাধীর্ণ	... গুরুদাস ভট্টাচার্য	৬৩৯
--------------	------------------------	-----

॥ রংগমঞ্চ ॥

বনহংসী	... সত্যভাষী	৬৩৮
--------	--------------	-----

॥ বিয়োগ-পঞ্জী ॥

মেঘনাদ সাহা	... অক্ষয় রায়চৌধুরী	৬৩৬
-------------	-----------------------	-----

অগ্রণীর বই

ত্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ষ্টালিন' তৃতীয় সংস্করণ চলছে।

ষ্টালিনের জীবনকাহিনী এত সুন্দর ক'রে বাংলা ভাষায় আর লেখা হয়নি। চমৎকার ছাপা বাঁধাই। তিনখানি ছ'রঙা ছবি। ৬৮

অনুবাদগ্রন্থ : ম্যাকসিম গর্কীর লেখা ছোট ও বড় গল্প, ডায়েরীর বাছাই করা কয়েকটি অংশ, জবানবন্দী, একটি সম্পূর্ণ নাটক ও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন "শিল্প ও সংগ্রাম"। ৩৯০

রম্যা রলার ॥ 'আই উইল নট রেস্ট-এর' বাংলা 'শিল্পীর নবজন্ম'। ৫৮

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভেরকর ও ইউরোপের অন্যান্য বিখ্যাত কয়েকজন লেখকের গল্পসংগ্রহ "বিদেশী গল্প"। ২১০

লিও টলস্টয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাহিনী 'ক্রুয়েটজার সোনাটার' বাংলা অনুবাদ "রাহ"। ২৮

আধুনিক জার্মানীর শক্তিশালী লেখিকা আন্না সেঘেরসের সাবোতিয়ারস্—২৮

ছোট গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিস্থিতি' ; ২১০

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বেদিয়া-ছন্দ' ২৮

শান্তি দেবীর 'শান্তি' ১১০ ; সুবোধমোহন ঘোষের 'উৎস'—২৮

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'অপরিচিতার চিঠি' ২৮

উপন্যাস : গুণময় মাস্তার 'লখীন্দর দিগার' ৪১০ ; মিহির আচার্যের 'দিনবদল' ২৮

ব্রহ্মকথা : ডাঃ গৌরমোহন দাস-এর 'মহামুন্দের পরে মালয়' ২১০ ; রাহুলের 'জনপদের ছন্দ' ৩১০

কবিতা : মায়াকভ্‌স্কির কবিতা অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র ২১০ এঁরই স্বরচিত 'আকাশের মুখ' ১১০। চিত্ত ঘোষের 'অস্তরা' ১১০। রামেন্দ্র দেশমুখের 'জনসমুদ্র' ১১০

বিবিধ : সরোজ আচার্যের "মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান" ২৮

। অগ্রণী বুক ক্লাব ।

। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ ॥

অঙ্গী

অষ্টম বর্ষ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৬২

সংস্কৃতি ও ভাষাগত রাজ্য

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই রাজ্য মিশিয়ে এক রাজ্য গড়ার যে প্রাস্তাব শাসক কর্তৃপক্ষেরা দেশের কাছে উপস্থিত করছেন তার বিচারে ভারত রাষ্ট্র গঠনের গুটি কয়েক গোড়ার কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আমাদের সংবিধানের অষ্টম তপশীলের ভারতবর্ষের চৌদ্দটি প্রধান ভাষার একটি তালিকা আছে। তার মধ্যে সংস্কৃত ও উর্দু এই দুটি ছাড়া বাকি বারোটি ভাষা ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষা। ভারতবর্ষের বারোটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বিভাগের প্রতিটি বিভাগে এর একটি না একটি ভাষা একান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা, তাদের মুখের ভাষা, লেখার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। উর্দু এরকম আঞ্চলিক ভাষা নয়। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের কিছু লোক এ ভাষায় কথা বলেন, লেখেন ও সাহিত্য রচনা করেন। সে সব অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে এভাষার সম্বন্ধ নেই। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের আমলে রাজদরবারে এ-ভাষার সংস্কৃত রূপ সৃষ্টি হয়েছিল। এ-ভাষার সাহিত্য রচনা হয়েছিল, বার কিছু অংশ উর্দু শ্রেণীর সাহিত্য। রাজার ভাষা বলে অমুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এ ভাষা ব্যবহার করতেন এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিদায় হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গায় এক শ্রেণীর অমুসলমান লোকও এ-ভাষা ব্যবহার করতেন। যেমন উত্তর প্রদেশে অনেক হিন্দু ভদ্রলোকের মুখের ভাষা ছিল উর্দু। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল থেকেই কোথাও কোন শ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় লেখা নানা প্রাচীন শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা সেই সব শাস্ত্রের আলোচনায় সংস্কৃত পুঁথি রচনা করতেন, এখনও অল্প কিছু করেন, যাতে সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে পুঁথির প্রচার হয়। উর্দু ও সংস্কৃত বাদে বাকি বারোটি আঞ্চলিক ভাষা হচ্ছে—(১) অসমীয়া

(২) বাংলা, (৩) ওড়িয়া, (৪) হিন্দী (৫) কানাড়ী (৬) কান্মীরী (৭) মলয়ালম (৮) মারাঠী (৯) ওড়িয়া (১০) পাঞ্জাবী (১১) তামিল (১২) তেলেগু।

ভারতবর্ষের যে বারোটি ভৌগোলিক বিভাগের এই বারোটি ভাষা চলতি ভাষা তাহাদের যোগফল গোটা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মানচিত্রে এই বারোটি বিভাগ স্থাপন করলে ভারতবর্ষের আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৯৫০ সালে ইণ্ডিয়া ইন ম্যাপস্ নামে যে মানচিত্রের পুঁথি প্রকাশ হয়েছে তার দশম পৃষ্ঠায় ভাষার ভিত্তিতে ভাগ দেখিয়ে ভারতবর্ষের যে মানচিত্র আছে তা দেখলেই এজ্ঞান প্রত্যক্ষ হবে। ভাষার মাপকাঠিতে ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিভাগ আকস্মিক ঘটনা নয়। কোন রাজা বা রাজশক্তির প্রভাবে এ বিভাগ ঘটেনি। বহু শতাব্দী, অনেক জায়গায় হাজার বছরের উপরে, নানা ঐতিহাসিক শক্তি যা মানুষের সমাজ ভাঙে গড়ে, সেই সব শক্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের এই ভাষাগোষ্ঠীগুলিকে গড়ে তুলেছে। যে কারণে প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকের ভাষা এক, সেই কারণে তাদের আচার-ব্যবহার জীবনযাত্রা-প্রণালী মনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের মধ্যে যে ঐক্য অম্ল ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে ঠিক সে রকম ঐক্য সম্ভব নয়। এক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব যেমন আর্য সভ্যতা কি দ্রাবিড়সভ্যতা বহু ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে ও মনোভাবে ঐক্য এনেছে কিন্তু সে ঐক্য এক ভাষাভাষী লোকেদের মধ্যে ঐক্যের মত নিবিড় ও বহুব্যাপী নয়। কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর এই রকম অল্প লোকের সঙ্গে মনের আত্মীয়তা ঘটেছে। যেমন সংস্কৃত যখন আর্য সভ্যতার বাহক ছিল তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্তের পণ্ডিতের সঙ্গে অল্প প্রান্তের পণ্ডিতের মনের যোগ অনেক সময় নিজ নিজ ভাষাগোষ্ঠীর অপণ্ডিত জনসাধারণের সঙ্গে মনের যোগের চেয়ে গভীরতর ছিল। সেই রকম ইংরেজদের আমলে ইংরেজী ভাষা ও বিদ্যায় শিক্ষিত ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মনের ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির মিল এই নূতন বিদ্যায় অশিক্ষিত নিজ ভাষাগোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে মিলের চেয়ে বেশি ছিল, এবং এখনও আছে। কিন্তু প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের সঙ্গে অল্প ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের এ মিল কখনও ঘটেনি। কারণ ঘটান কোন উপায় ও কারণ ছিল না। যে জ্ঞান ও ভাব সংস্কৃত শিক্ষিত পণ্ডিতদের এক করেছিল, কি ইংরেজী শিক্ষিত লোকেদের এক করেছিল সে জ্ঞান ও ভাব তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে অতি অল্পই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হয়েছিল। এবং নিরক্ষর দেশে প্রচারের সম্ভাবনাও অতি অল্প ছিল।

সেইজন্য ইংরাজ রাজত্বের সময়েই যখন ভারতবর্ষের মনীষীরা ইংরেজযুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের কল্পনা করেছিলেন তখন প্রতি ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের শিক্ষিত করার জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, এবং রাষ্ট্রের কাজ চলবে এমন ভাষায় যা সেই শিক্ষিত জনসাধারণের নিজের ভাষা এই কল্পনা করেছিলেন। এবং সে কল্পনাকে রূপ দিতে হলে ভাষাকে ভিত্তি করে যে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিকে গড়া অবশ্যসম্ভাবী এ বিষয় তাঁদের মনে কোনই দ্বিধা ছিল না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই চিন্তাধারা ও কল্পনাকে রূপ দেবার প্রয়োজনেই বারবার ঘোষণা করেছে যে স্বাধীন ভারতবর্ষের গড়ন

হবে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সমষ্টি। আমাদের সংবিধান রচনা পর্যন্ত এই চিন্তাধারাই অব্যাহত ছিল। 'ইণ্ডিয়া জাট ইজ ভারত, শ্যাল বি এ ইউনিয়ন অব স্টেটস্' না-হলে এর কোন অর্থ হয় না যদি স্টেটগুলি হয় এক একটি ভৌগোলিক ভূমিখণ্ড মাত্র, যে ভূমিখণ্ডের লোকদের মধ্যে কেবল এইটুকু আত্মীয়তা যে তারা এক শাসনাধীনে বাস করে, যেমন ইংরেজের আমলে বা পাঠান মোগল আমলে করতো।

কিন্তু কংগ্রেসের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসার পর এখানকার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ইষ্ঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গড়া ভারতবর্ষের ঐক্যের পরিপন্থী। কোন বিজ্ঞ কংগ্রেসী এ রকম রাজ্য গড়ার নাম দিলেন লিংগুইজম্। কিন্তু নানা ভাষার আঞ্চলিক বিভাগে ভারতবর্ষের বিভাগ একটা কঠিন মানবীয় সত্য, যেমন উত্তরে হিমালয় ও পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র নিরেট প্রাকৃতিক সত্য। হিমালয়কে পরিহাস করে চিপি কি সমুদ্রকে ভোবা নাম দিয়ে চক্ষু বুজলেই তারা দূর হয় না। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর গড়ন এই রকম সত্য। তাকে অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। ক্ষমতার খেয়ালে অন্য রকম চেষ্টায় ভারতবর্ষের স্বাভাবিক গড়ন কিছুদিন পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কিছু হুঃখ ভোগের পর ঐ স্বাভাবিক গড়ন স্বীকার করতেই হবে।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সমষ্টি দিয়ে ভারত রাজ্য গড়নে যঁরা ভারতবর্ষের ঐক্য নষ্টের আশঙ্কা দেখেন এবং বহুভাষী লোকের এক রাজ্যই ঐক্যের উপায় মনে করেন, ঐক্যের যে নানা স্তর তাঁরা সে কথা চিন্তা করেননি। ইংলও কি ফ্রান্সের মত এক ভাষাভাষী দেশের রাষ্ট্রের যে ঐক্য বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের সে ঐক্য সম্ভব নয়। যঁরা সম্ভব মনে করেন তাঁরা অবাস্তব কল্পনাকে খেয়ালের বশে সত্য মনে করেন। তাঁরা মনে করেন বহু পরিবার ভেঙে এক পরিবার করলেই সকল পরিবারের লোকদের মধ্যে ঐক্য এসে যাবে।

ভারতবর্ষ যে রাষ্ট্র গড়বে তা পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রের এক নতুন রূপ। ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীগুলি বিস্তারে ও জনসংখ্যায় পশ্চিম ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের সমতুল্য। পশ্চিম ইউরোপ এক রাজ্য হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। আমাদের ইতিহাস ও আমাদের শুভবুদ্ধি ভারতবর্ষকে একরাষ্ট্রে গড়ে তোলা সম্ভব করেছে। নইলে বিহারীর সঙ্গে তামিলের মিল সত্যতায়, সংস্কৃতিতে, ভাষায় ফরাসীর সঙ্গে ইতালীয়ানের মিলের চেয়ে অনেক কম। আমরা ভারতবর্ষের এই বিচিত্র ভাষাগোষ্ঠীগুলিকে এক মহারাষ্ট্রে গড়ে তোলা সক্ষম করেছি। কোন রাজশক্তির বাইরের চাপে নয়, এর এক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর আধিপত্যের ফলে নয়। সকল ভাষাগোষ্ঠীর সমান অধিকারের ও সমান সহযোগিতার বন্ধনে। এই নূতন সৃষ্টির জন্য চাই নূতন নির্মাণ কোশল। পুরাতন ও পরিচিতের নকল এখানে অচল ও অনর্থকারী। এই মহারাষ্ট্রের সৃষ্টি ও স্থিতি সম্ভব হবে যদি প্রতি ভাষাগোষ্ঠীকে ভারত-রাষ্ট্রের ঐক্যের মধ্যে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভা অহুঁয়ালী নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়, যে ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিক রূপেই অপর ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছু মিল কিছু গরমিল। নানা ভাষাগোষ্ঠীর লোককে এক রাজ্যে এক শাসনে যেমন তাদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরম অনুরাগ।

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের উপর একরঙা তুলি টেনে ভারতবর্ষের সভ্যতার স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া তাকে নষ্ট করা। আয়বিকাশের বাধায় অসন্তোষের বীজ, এতে পলিটিশিয়ান ও রাজকর্মচারীদের এডমিনিস্ট্রেসন্-এর সুবিধা হয়। কিন্তু এডমিনিস্ট্রেসন্-এর নিবিশেষ মহাকাশে কোন প্রতিভার উদয় হয় না। কোন ভাব ও কর্মে বড় সৃষ্টি সম্ভব হয় না। সেখানে কেবল মোটা বেতনের কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও স্বার্থসর্বস্ব বণিকশ্রেণীর অবাধ বিচরণের স্থান। যারা সম্পূর্ণ লিংগুইজন্-এর বিরোধী নিরপেক্ষভাবে সকলের উপর ক্ষমতা চালনা ও সকলের অর্থে নিজের খলি বোঝাই হলেই তারা পরম তুষ্ট।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশে, এবং তার উপর কেন্দ্রীয় মুখ্য শাসকদের অঙ্কুত সব প্রস্তাবে ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে উগ্র প্রতিরোধ দেখা দিয়াছে। সে উগ্রতায় আমাদের শাসকরা মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন, এবং ভারতবর্ষের ঐক্যনাশের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়েছেন। এ প্রতিরোধ ডেকে এনেছেন তাঁরা নিজেরাই। কংগ্রেসের পূর্ব মনীষীরা সমস্ত দেশের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সম্ভব পুনঃপুনঃ প্রচার করে। বর্তমান শাসকেরা সে আকাঙ্ক্ষাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছেন, এবং সে রকম রাজ্য গড়ার প্রস্তাবকে বলছেন ভারতবর্ষের ঐকের পরিপন্থী। এই হঠাৎ মুক্তিবিহীন খামখেয়ালীতে দেশে প্রতিরোধ জাগবেই। তা যে কোন কোন রাজ্যে উগ্র ভাষোলেঙ্গের রূপ নিয়েছে তার প্রধান কারণ বর্তমান শাসনমুখ্যেরা ভারতবাসীকে ভাল করেই শিখিয়েছেন যে, তাঁরা মুখে শান্তি ও স্ববুদ্ধির স্বপাঠ করেন বটে, কিন্তু বিনা ভাষোলেঙ্গে নিজেদের মতলব থেকে চুলমাত্র নড়েন না। শ্রীডেবর উড়িছা ঘুরে গেলেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলা কি কলকাতায় আসা প্রয়োজন মনে করলেন না। কারণ, বাঙালীরা শান্ত ভদ্রতার সঙ্গে দেশব্যাপী হরতালে নিজেদের অসন্তোষ ও দৃঢ় একতা প্রকাশ করেছে। অবাঙালীর মাথা ভাঙেনি, দোকান লোটেনি, রেলের লাইন তোলেনি,—অতি শান্ত, স্তব্ধ কাপুরুষ জাত। ওদের দিকে চোখ দেবার প্রয়োজন নেই।

আমাদের বর্তমান শাসকেরা যদি বিনা বিধায় রাজ্য পুনর্গঠনের অর্থ ভাষাভাষী জনসংঘকে যেখানে একেবারে অসম্ভব নয় সেখানেই এক রাজ্যে স্থাপন করা প্রচার করতেন, এবং দৃঢ় সাহসের সঙ্গে তাকে কার্যে পরিণত করতেন তবে হয়তো যারা নিজেদের রাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু লোককে পদানত রাখতে চায় তাদের কেউ কেউ কিছু লোকের মাথা ভাঙতো দোকান নুঠতো, বাড়ি ঘর পোড়াতো, কিন্তু তার মূলে একমাত্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া কোন গভীর ও তীব্র অহুভূতি না থাকায় উপযুক্ত যুগ্ম শাসনে গোলমাল অল্প দিনেই থেমে যেতো। কেন আমাদের বর্তমান শাসকদের ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনে বিরাগ, যা ভারত রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র স্বাভাবিক ভিত্তি, এবং কেন বহুদিনের ও বহুজনের আকাঙ্ক্ষিত সে কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে তাঁদের সাহস ও দৃঢ়তার অভাব তার তত্ত্ব হয়তো গভীর গুহায় নিহিত। এরকম ভারত রাষ্ট্রে লোকদের মধ্যে ঐক্যের অভাব হবে এই আশঙ্কা একটি শ্লোগান মাত্র। তাঁরা যা কল্পনা করেছেন, বহুভাষাভাষী লোকদের এক রাজ্যে স্থাপন করে ঐক্য রক্ষা, তাই

হবে ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলে 'টাইম বম্ব'। বিস্তারণ হতে বেশি সময় লাগবে না। এই সব মিশ্রিত রাজ্যে ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত নেগেই থাকবে।

যারা হতো ভারত রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধ পাশাপাশি রাজ্য, তারা হবে এক রাজ্যে বিবদমান নানা দল। এক হিন্দীভাষী লোকদের রাজ্যগুলি ছাড়া। কারণ সংখ্যালঘু পশ্চিম-বাংলাকে বিহারভুক্ত করা ছাড়া হিন্দী ভাষাভাষীদের কোন রাজ্য ভেঙে মিশ্রিত রাজ্য সৃষ্টির কার্যকরী প্রস্তাব দেখা যাচ্ছে না যেখানে হিন্দী ভাষাভাষীরা হবে সংখ্যালঘু।

ভিন্ন ভাষাভাষী দুই ভিন্ন রাজ্যকে মিশিয়ে এক রাজ্য করার প্রস্তাব যে কত উদ্ভট, তা বঙ্গ-বিহার মিলন পালার মূল গায়ের শ্রীবিধান রায় মহাশয় দিনের পর দিন যে সব বেসুরো গীত গাইছেন তাতেই প্রমাণ। আড়াই কোটি বাঙালীকে চার কোটি বিহারীর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, যেখানে ভোটের ভিত্তিতে রাজ্য চলে সেখানে বাঙালীর অবস্থা কি হবে? রায় মহাশয় বলেন মাঠে:। বিহারীরা সংখ্যায় বেশি, কিন্তু আমরা বাঙালীরা গুণে বড়। গুণের জোরে সংখ্যাকে জিনে নেবো। রায় মহাশয়ের সিনিয়র পার্টনার বিহারের সিংহ মহাশয়ের এই তত্ত্ব সম্পর্কে মত কি জানা যায়নি। যাদের সঙ্গে মিলতে চাই তাদের উদ্দেশ্যে অভব্য বাচালতা বিধানবাবুকে করতে হয়েছে গরজে পড়ে। বাঙালীর অত্যন্ত স্বাভাবিক আশঙ্কায় যা হোক কিছু একটা ভরসার কথা বলতে হবে।

জনসংখ্যায় অল্প হলেও আমাদের পশ্চিম-বাংলার ধনোৎপাদন ও রাজস্ব বিহারের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের শিক্ষার ব্যয়, স্বাস্থ্যের ব্যয়, জনকল্যাণের কাজের ব্যয় বিহারের চেয়ে অনেক বেশি। দুই রাজ্যের রাজস্ব এক হলে হবে দারিদ্র্যের বণ্টন। রায় মহাশয় বললেন সে কি কথা? বাংলার ধন বাংলায় ব্যয় হবে, বিহারের ধন বিহারে। হাইকোর্ট এখন যেমন আছে তেমনি দুইটিই থাকবে। যার যার ভাষা তার তার থাকবে। কেবল বাঙালী ছাত্রেরা অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে হিন্দী শিখবে; বিহারী ছাত্রেরা বাংলা। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি রাজ্যে রাজকার্যের ভাষা হবে হিন্দী ও বাংলা। চমৎকার এক রাজ্য। আমরা তফাৎও থাকবো একও হবো। কেবল বাঙালী ছাত্রদের সকলের উপর, যার কোনও প্রয়োজন নেই, তার উপরেও আর একটা ভাষা শিক্ষার চাপ পড়বে। এবং বিহারী ছাত্রদের উপর বাংলা শিক্ষার চাপ। যেন জ্ঞান অর্জন কিছু নয়। পলিটিকাল প্রয়োজনে ভাষা শিক্ষাই মুখ্য কথা।

দুই রাজ্য মিলে এক রাজ্য হলে নাকি ইকনমিক সুবিধে অনেক। কিন্তু যেখানে ধন উৎপন্ন হবে সেইখানেই বণ্টন ও ব্যয় হবে। বাঙালীর উৎপন্ন ধনে বিহারী ভাগ চাইতে পারবে না, বিহারীর উৎপন্ন ধনে বাঙালী অংশ পাবে না। অথচ দুই রাজ্য মিলে এক হলে হবে ইকনমিক উন্নতি। কেন এবং কেমন করে কেউ জানে না। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রোগ্রাম আছে। যে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে ভারতবর্ষকে এক ইকনমিক ইউনিট করণা করলে, এবং তার ভার কেন্দ্রের উপর, রাজ্য-গুলির উপর নয়। বঙ্গ ও বিহার প্রতি রাজ্যে যেটুকু কাজের ভার সে ভার যে কেমন করে বাংলার কাজ বাংলায় না হয়ে বিহারের সঙ্গে এক সঙ্গে হলে এবং বিহারের কাজ বিহারে

না হয়ে বাংলার সাথে একত্রে হলে সহজসাধ্য হবে তা বিধানবারু কি সিংহ মাহাশয় এ পৰ্বন্ত ব্যাখ্যা করেননি। সম্ভব তার কোন ব্যাখ্যা নেই এবং মোটের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বঙ্গ-বিহার রাজ্যে বাংলার কাজ হবে বাংলা অংশে এবং বিহারের কাজ বিহারের অংশে। তবুও আমরা হবো এক রাজ্যের নাগরিক। মায়ার আর কাকে বলে।

মোট কথা আমরা পরস্পরকে অতি নিকটে মেলাবেশায় বিশ্বাস করি না। তবুও আমাদের দুই রাজ্য মিলিয়ে এক রাজ্য করতে হবে।

বর্তমান বিহার রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষী কিছু অংশ পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হোক এই প্রস্তাবে কিছু সংখ্যক বিহারী বীরপুরুষ সেখনকার বাঙালীদের পিটেছে, তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠেছে। এর কিনা সমাধান হচ্ছে বিহার পশ্চিম-বাংলাকে এক রাজ্য কর। তাহলেই বিহারী বীরপুরুষেরা বিহারী বাঙালী ভাই ভাই মস্ত্রে দীক্ষিত হবে এবং বাঙালীদের বিহারী ঐতি উথলে উঠবে। এরকম করনা তাঁদেরই সম্ভব মায়ার বোম্বাই শহরকে মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে সরিয়ে দিল্লী থেকে কর্মচারী পাঠিয়ে শাসনের সঙ্কল্প করেছেন। এসব সুস্থ মনের করনা নয়, অনাস্বাদিতপূর্ব ক্ষমতার মত্ততার উচ্ছ্বাস খামখেয়ালীর লীলানৃত্য। প্রত্যেক ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক-এর নাগরিকদের প্রথম কর্তব্য খামখেয়ালী শাসন ও ব্যবস্থা অসম্ভব করা যে পলিটিক্যাল দলের হাতেই যখন ক্ষমতা থাক না কেন। ভয়ে লোভে স্বার্থহানির আশঙ্কায় অজ্ঞানের মুঢ়তায় এ কর্তব্য অবহেলা করলে ভারতবর্ষের অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ভোগ আছে।

[ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবীতে সংযুক্তির বিরুদ্ধে সিনেট হলে মায়ার বাঙালী সম্মেলনে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।]

দুই আকাশ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বললাম, আপাতত হস্টেলে ফিরছি না। একটু ঘুরে ফিরবো।

যাবে কোথায় ?

চল না একটু সিগনেট ঘুরে যাই। কুত্তিবাস-এর খবরটা নেব, বইও কিনবো একসাথটা। তুমি চাইলে তোমার জন্তেও—

আর না চাইলে ? এরপর হাসল এষা। মাথাটাকে হেলিয়ে দিল অদৃঢ়ভিত্তি মলিন কোণ গৃহের মত। ওর হাসির বর্ণ যখন-তখন ঝট্টির মতই অবিশ্বস্ত। প্রতিবাদ জানাতে চাইলাম। কাণের পাশে লজ্জাহরণ ঘণ্টা বেজে উঠল সময়ের রূপার মত। হৃদয়কে চেতনার তীরে ছুঁড়ে দিল সেই যান্ত্রিক শব্দ।

কলেজ থেকে বেরিয়ে কাফি হাউসে মুখোমুখি বসে ডাবলাম, কাকি দিতে চেয়েছিলাম কি কাককে ? কাককে ভুল বুঝিয়েছিলাম ! কাপটাকে শব্দ করে নানিয়ে রাখলাম টেবিলে। এষা হাসল আবার। বিপর্যস্ত একমাথা কালো চুলের মত মুখে হাসতে গিয়ে অসহায় তাকিয়ে রইলাম প্রতীপবতিনীর দিকে।

তপতী তোমার বিতর্কের প্রশংসা করছিলো তীর্থ। পরিকার গলা, পূর্বেকার ক্রিয় হাসির অণুতন স্পর্শ নেই। তরংগে তরংগে আমায় একী আঘাত ! হাসতে পারলে মানাতো। বদলে সারা দেহ ভরে গেল অবশ-কাঁটার। চোখের উপর সন্ধ্যার আকাশের মত ত্রতচারী এক অরণ্যের মত স্তম্ভিত মুখের ছবি ভেসে উঠল। আলোআকাশছায়াজলে নব্র তপতীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এষা।

দোতলা থেকে কলেজের নীলনির্জন মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ছুদ্দিন নিরন্তর ক্লাসের পর রোববারের অবাধ ছুটির মত মাঠখানি আনন্দের গন্ধে গন্ধে ভরে ছিল। প্রফেসরকে বলে ক্লাসটিতে অনুপস্থিত থাকবো ভেবে তাঁর অপেক্ষা করছি। বেরুলে বলব। এষা এসে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে চলল ওয়াই এম সি এর দিকে। বলল, না বলেই অনুপস্থিত হও। একটু খারাপ হও দিকি। এত ভালো ভাল না। চা বীওয়াবে ? কেক—?

বললাম, ঝাওয়াব, ঝাওয়াব। ছুভিক্ষের দেশ থেকে আসছো নাকি ?

বিলম্বিত হাসিতে কঁপে কঁপে উঠছিল সে। বলল, বাঃ, বাঃ, এইতো কথাও ফুটেছে আজকাল ! তাকাও দিকি আমার দিকে একবার, মুখ তোলো। পারলে না নাঃ, এখনও অনেক সময় লাগবে দেখছি। সম্পূর্ণ পুরুষ হতে এখনও কিছু দেরী।

পারুন্ডর সংজ্ঞা নিয়ে বেশ জোরালো একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কলেজগেটের পাশেবসা চীনেবাদামওয়ালার কাছে যেতে যেতে বলল, এসো একটু ফোক্কালচার করি। পাঁচ পয়সার বাদাম দিন তো ? ঝালছুন—বেশি করে।

আমার হাতে কয়েকটা দিয়ে ঠোঙাটা নিতের কাছেই রাখল সে।

পিটার চেণী, অগাধা ক্রিয়ুতি আর সর্বকালিক বাংলাসাহিত্যের শিল্পসম্পত্তির বিক্রয়মান অস্তিত্বের পাশ দিয়ে পাবলিক রেস্টোরাঁর পৌঁছলাম হুড়নে।

মনে হল ওঠার গাঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপটা নড়ে উঠল একবার। সেই বকুলগন্ধের মত কোমল রহস্যময় মেয়েটি বসে আছে কোণের কেবিনখানায়। টেবিলে কাপ, পাশে বইখাতা রুমাল ক্ষীণ ব্যাগ। এষাকে দেখে নীরব হাসল মেয়েটি। ছুঁজনে এগিয়ে গেলাম কেবিনখানির দিকে। বসলাম। সংকুচিত হলেও সপ্রতিভ হাসল আবার। এত নীরব হাসি মেয়েটিকে মানালো সুন্দর। বলল, চা খাচ্ছিলাম। পাশে উপস্থিত বেয়ারাকে আরো দুকাপ আনতে বলল।

কুণ্ঠিতভাবে এষার দিকে তাকিয়ে বললাম, কিছু 'টা' আনতে দিই? প্যাটি বক্স দিতে বললাম বয়কে।

মেয়েটি সহজ সলজ্জ হেসে বলল, আমার কাছে কিন্তু খুব কম পয়সা—

এষা উভয়ত কুঠাকে প্রতিবাদ করে বলে উঠল, তুমি একটি পয়সাও দেবে না তপতী। তীর্থ আজ তিনমাসের স্কলারশিপ পেয়েছে একসঙ্গে। আজ ওই বা কে, নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্‌ই বা কে? আমার চীনেবাদামের পাঁচটি পয়সাও ফিরত দিয়ে দেবে।

তপতীর দিকে তাকিয়ে বললাম, দেখছেন কী ভয়ানক মেয়ে। আজকের বাড়ি যাবার বাসভাড়া দিতে হবে না? একটা অন্তরংগ হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা দুজন। আমিও কতকৌতুকে হাসলাম খানিক।

নাম জানতাম তার। ভ্রুবোর্গ থেকে এসেছে। বাংলায় অনার্স। এসমস্ত এই গ্রহরের সংগ্রহ। পাশ ইতিহাস ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে, লাইব্রেরী ঘরে, করিডোরে আর ডিবেট থিয়েটারে একে দেখেছি।

কলেজ আসতো শাস্তিনিকেতনী ব্যাগ কাঁধে, শাদাজমি গিরিমাটি পাড় কাপড়ে রজনীগন্ধার মত ঝলু সুকুমার দেহলতা ঘিরে। ছেলেদের সংগে কথা বলতে দেখিনি কখনো, মেয়েদের সংগে কদাচিৎ। এমন একটি মেয়ে, অস্বীকার করবো না, নজরে এসেছিল আমাদের। মেয়েরা ভাবত দপিতা, ছেলেরা বলত, অস্বিষ্ট আছে ওঁর কলেজের বাইরে। আলাপের পূর্বে ওঁর বিশিষ্টতার আকৃষ্ট ছিলাম। উত্তর-আলাপে বললাম, ভদ্রা, সুভদ্রা। আকৃষ্ট হলাম আরো নিবিড় ভাবে। তন্ময় হলাম মেয়েটির ইতিহাস ক্লাসে দেখা কোন চিত্রিত রূপাংগের স্মৃতিচয়নে।

বললেন, ইচ্ছা ছিল ইংরাজী নিয়ে পড়ার। কিন্তু—শক্ত হবে বলে।

আমার মনে হয় বাংলাই কঠিন বেশি। পাঠশুচী সাতসমুদ্র সতেরো নদীর মত বিপুল। আমি তো বাংলা নিলে ডাহা ফেল্ করতাম।

ঠোঁট উলটে এষা ব্যংগ করল, বিনয়ের অবতার। হাসল তপতী।

কাফাভিস, বুদ্ধদেব বসুর গল্প থেকে শিশির ভাঙুড়ি লোকা পর্যন্ত সংলাপ-কলাপে সময়ের নারীর সজ্জাসমাপ্তি করলাম যখন, তখন বিকেলের ছায়া সরে সরে গিয়ে কলেজের পরিসীমার এপাশে ঘাসের উপর কালো কাপড়ের মত স্থির। কলেজের করিডোরে দারোয়ানের ছোট ছোট ছেলেপুলে চোরপুলিস খেলছে। দারোয়ান খৈনি টিপছে খাটিয়ায়। এষা স্টারিসন রোড থেকে বাগ ধরেছে। তপতীর পাশে পাশে অপরিচিতের মত হেঁটে চলেছি আমি। ছুঁজনের কেউই কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। খোয়া ওঠা

পথের উপর মুখের ছুটি ছুটি চানচি প্রায়ের ধ্বনি শুনছি ছুতনে । আনি তপতীর । ওও নিশ্চিত আমার ।

সেন্ট্রাল এভিনিউর উপর এসে বাস করবে তপতী । একটু ঘুরে বাড়ি যাবে সে । বিদায়ের পূর্বে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলাম । মুখ ফিরিয়ে নিলাম । আবার হাসলাম ছুতনে । দুই আকাশ ভরে উঠল গাঙশালিখের নীড়ের মত নরন কোমল সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের গানে আর যামিনী রায়ের চিত্রচাক্ষুষে ।

ছোটগল্পের মত অল্পসঙ্গে বারবার সন্নিহিত হয়েছি ছুতনে । অসচেতন হবার প্রয়াস করেছি স্বপ্ন বারবার । তবু ঘুরে ফিরে অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার মত নিদিষ্ট আনন্দে সাক্ষাত হয়েছে তপতীর সংগে । ছুতনে হয়ত হেসেছি সুজনতায়, চোপমুখ দীপ্ত হয়েছে তবে, খুশিতে চক্কিত হয়েছি অংগে অপাংগে । ইতিহাস ক্রমে তবু কোন অজান্তার গম্ভীরস্বপ্নের ভাঙ্কর্ষে প্রস্তরিত নেয়েটা অধ্যাপকের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে আছে । কনসার্ট অব্‌ যুরোপ । মাঝে মাঝে ভুল বলল অধ্যাপক । বুঝতে পারল না । অনেক কিছুই বুঝতে পারে না ওরা । বুদ্ধিতে গাড়ীর চোখের মত বোকা সব । দুই আকাশের একদিক বিদেশী সুপারিগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা নিরুপায় রোদ, অপরদিক পুরুষের মত প্রখর, সূর্যশরমসুপেশিক্ত । এক রক্তকেশ অধ্যাপক চীৎকার করছেন মধ্যমায়, চন্দন লাক্ষিত কোন সংকীর্ণ সংস্কারের মত ।

একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন ।

পরদিন পাবলিক রেস্টোরাঁতে ছুতনে । এককেবিনে মুখোমুখি । ধূসরনীল মিল্লবর্ণের পর্দাখানা কেঁপে উঠছে বারবার, হাসিতে, গলে । ওয়েটার অর্ডার নিয়েছে, অযথা বারবার বিরক্ত করার থেকে নিবারণিতও হয়েছে ছুতবার । নূতন ওয়েটার । বিশাখাপত্তনের তীরভূমির অধিবাসীর বর্ণের মত সন্ধ্যা হল রেস্টোরাঁয় । তামিলপাষণ হল আলোকে আলোকে ।

সেদিন সুইনবর্ণের এক সংগ্রহ উপহৃত হল তপতীর নামে । প্রথমে যুহু আপত্তি করেছিল সে । তারপর একটু হেসে বলেছিল, দিলেন বটে, বুঝবো না এর কিছু । বোঝাতে হবে আপনাকেই ।

বলেছিলাম, সে আমি বুঝবো ।

সেদিন কাফি হাউসে এমা আমাকে আহত করেছে বারবার । বিচিত্র এক মৈশ গন্ধের মত আমার মনের চারপাশে ঘুরে ফিরছে সে । আমার দিক থেকে কোন সচেতন আয়োজন ছিল না ওকে ঘিরে । তবু আশ্চর্য, বড় আশ্চর্য লাগছে এমার সেই বাঁকা বাঁকা কথাগুলি । ও আমার নীসনির্জন শীতের মাঠ । ঘাসে ঘাসে জড়িয়ে ছিল ওর শিশিরের স্নিগ্ধতা, আসিদ্ধ করতো আমার দাহের দিন ছপুর্, ওর সাবনার চিরতা ছিল আমার পৃথিবীর মত আশার রাজ্য । দিনের পর দিন পড়াশুনা করেছি একসঙ্গে, গল্প করেছি, অবসর কাটিয়েছি, চা খেয়েছি, ডিবেট করেছি, প্রথম-দ্বিতীয় হয়েছি পরীক্ষায়, কলেজী ছেলেমেয়েদের নিয়ে অপক্ষপাত আলোচনা করেছি, ঠাট্টা করেছি ওকে, ও আমার পরমা । এমন বন্ধু আমার কেউ ছিলনা । ওর যদি দ্রবী জাগে তবে আমার লজ্জা, আমার লজ্জা ।

তপতাকে ওর কিসের ঈর্ষা ? তপতী অনেক দিকে ছোট ওর। ভীয়ে রাখা নাছ খুঁজে পেতে তল ঘোলা হল বিষম। শিঙিনাছের কাঁটার কাঁটার বিকৃত হাতে একি দুর্জয় জ্বালা। শরীরে মনে দুই আকাশ ভরে এ কোন্ প্রীত্বের স্তব।

চরম হল একদিনের ঘটনা, তপতী আর এষা উভয়ে ওয়াই, এম, সি-এতে চা খেতে চায়। হঠাৎ কি ব্যাপার জানি না তপতী নাকি কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মারে এষাকে। তারপর হেসে ওঠে পাগলের মত। আঘাত বেশি না হলেও কপালে ক্ষত হয়েছিল কিছু। জীবনে এত আশ্চর্য্যবিত্ত হইনি কখনও। পরদিন কলেজে আগেনি এষা। তারপর দিন এল। কাপালে ক্ষতের উপর প্লাস্টার করা। আমাকে দেখে এত সহজভাবে অন্যতর কথাবার্তা বলতে লাগল যে আমি বিস্মিত হলাম। তপতীর সংগে সম্পর্কের নিবিড়তায় ও যে ক্ষুণ্ণ ছিল ভুলে গেলাম। আবার বহুদিন পর সহজভাবে বহুতর আলোচনায় মগ্ন হলাম দুজনে। ওই রহস্যনিদ্ভিত ঘটনা সম্পর্কে সুস্থভাবে কিছু দ্বিভ্রাসাবাদ করা এতই অসম্ভব যে পারলাম না কিছুতে। এষাও সচেতন অভিনেত্রীর মত সেই বিস্মিত কালপ্রহরকে এড়িয়ে গেল। পড়াশুনোর কথা, কলেজ ভিবেট আর রাজ্য সীমানা নিয়ে অন্তরংগ আলোচনা চালানাম ঘণ্টাখানেকের উপর। তবু দুজনেই বুঝলাম দুজনকে। মনে আসছে দুজনে পাশাপাশি নটপরম শিশির ভাঙড়ির আলমগীর দেখেছিলাম একবার। সেই কালাপাহাড়ী দাণ্ডিকের দৃপ্ত স্বরচরিত্র ভুলিয়ে ছিল ইতিহাসবৃত্তির অনুসরিত বর্তমান। নাট্যসনাপ্রিতে দেখলাম চারিদিকে অবক্ষয়িত বর্তমান, পলিত আর্ত পটচিত্র আর ততোধিক প্রহার-প্রবুদ্ধ এক অতৃতীয় প্রজাপতি। লজ্জায় আনত হলাম বারবার। কালকৃত কঁক দেখে ব্যথায় ব্যথায় পীড়িত হয়েছিলাম দুজনে। আজও অবসন্ন আলোচনার মধ্যমাঝে স্পষ্ট হল দুজনের মধ্যে ব্যবস্থিত পৃথক। অবিলম্বে বেদনায় বিদ্ধ হলাম অন্তরে-বাহিরে। পরিতপ্ত আকাশ ভরে আমার চোখের জল নিরুপায় স্মৃতিকে মলিন করবার প্রয়াস পেল তারপর অনেক দিন দুপুর স্নাত্তির নির্জনে।

হস্টেলের ঘরে এক অরতপ্ত শরীরকে শ্রবণ করে রইলাম দীর্ঘদিন। গ্রাম থেকে মায়ের চিঠি পাই। পাঠাই ভাল আছি, সুস্থ আছি। বিছানার দাহে অস্থির হই দিন থেকে রাত। তবু আমার ঘরের খুলখুলিতে ধূসর সন্ধ্যার যুগলচড়ুই নীবারকণায় ঝঙ্ক হয়। বিশ্রান্ত সংলাপে আমার ঘরের অন্ধকারকে মথিত করে, উৎকর্ণ আমার অংগে অংগে একী দাহের জ্বালা ছড়ায় ওরা, দুইমুঠি অন্ধকারের মত প্রাণ।

হঠাৎ একদিন এক আশ্চর্য দুপুরের পর বিকেলে সেই শান্তিনিকেতনী ব্যাগ কাঁধে, গিরিমাটি জমির সজ্জায় সর্বাংগ ঘিরে তপতী হস্টেলের ঘরে এল। বলল, খবর দিতে নেই একটা ?

বলতে পারতাম, কি করে দেব, কাকে দিয়ে খবর দেব, তাকে দিয়ে লাভ ?

কিন্তু এসব মুক্তিসিদ্ধ উত্তরের কিছুই দেয়া হল না। অভিমান করার মাহেন্দ্র-প্রহরেও অভিমান করা যায় না প্রত্যক্ষ করলাম আজ জীবনে প্রথম।

বললান নীরস গাঙ্গে, কলেজের ছুটি হল ? আর কটা ক্লাস ছিল ? আর সোমবার, ইতিহাসের ক্লাসে অধ্যাপক এসেছিলেন কি না ?

জীবনের অভিজ্ঞতায় এত বড় অভিনয়ের স্বীকার আমার ছিল না। আকাশ রক্ত রোদ্রে ঝলোমলো তবু ঘরের ভিতর জানালাদ্বার রুদ্ধ করে প্রমাণ করলাম ঘরে-বাইরে সে কী আঁধার, কী বিস্তীর্ণ আঁধার !

বিছানার উপর উঠে এসে বসেছিল সে। আমি ওঠার চেষ্টা করতে ধমক দিয়ে শুইয়ে দিল। বলল, বাহাদুরি কোরো না। এখনো জ্বর আছে বেশ, শরীরটাও দুর্বল। আশ্চর্য, এতদিনের অসুখ আমাকে একটা খবর দিলে না ? ভাগ্যিস আমি নিজ হাতে এলাম।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া সরে সরে আসছে। তপতীর একখানি হাত আস্তে আস্তে আমার দুহাতের মধ্যে নিলাম। অনেকক্ষণ ধরে ঘামতে লাগল সেই পাখীর বুকের মত নরম হাত। তারপর অকস্মাৎ আমার সেবা-সাহাব্যের আকাশকে টেনে আনলাম বুকের কাছে, খুব কাছে। ঘরে-বাইরে নিকরপায় অন্ধকার। মুখের পরে ছোঁয়ালান অনেক অনেকবার, তারপর বিস্মিতভাবে দেখলাম তপতী কাঁদছে। দুহাতে ওর মুখ রেখে স্তম্ভিত দেখলাম, তপতী কাঁদছে ! সে কান্না আনন্দের নয়। আরো স্তম্ভিত করে আমায়, আরো আকুল কান্নায় ভাগিয়ে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর তীরের মত ছুটল ঘরের বাইরে। আমার গলার স্বর ফুটল না। এক প্রাগৈতিহাসিক জঙ্ঘর মত কালো ঘর-খানার ভেতরে আমার দুর্জয় দাহ আমাকে ঘিরে ঘিরে আঘাত করল বারবার।

তারপর কালের আহ্নিকে পৃথিবীর দিন থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে দিন। দিদিনার হাতের রুদ্ধাঙ্কের আহ্নিকের মত দিনের পর দিন কেটেছে। মায়ের চিঠি পেয়েছি, ভায়ের অসুখ খুব, তাড়াতাড়ি এসো। বাবারও চিঠি পেলাম। টাকা পাঠিয়েছি, বুঝে-সমঝে খরচ করো, হাত খরচটা কম কোরো এবার। পশ্টুর অসুখের জন্তে খরচ হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি, সংসারের টানাটানি, তাই কম পাঠালাম। যদি লাগে ধারধোর কত্তে নিও দুপাঁচ টাকা, পরের মাসে দেবার চেষ্টা করবো। তোমার মাতাঠাকুরাণী বলছিলেন, যদি আসতে পারো—দুএক দিনের জন্ত। আসোওনি তো অনেকদিন। দুএকদিন কামাই করলে কি খুব অসুবিধেয় পড়বে ? অবশ্য তুমি যা বুঝবে ভালো, কোরো। আশীর্বাদ ইত্যাদি। পুনশ্চ দিয়ে শরীরের যত্ন নিও। সুস্থ না থাকলে—ইত্যাদি।

কলেজ করছি আজ দুদিন। দূর থেকে তপতীকে দেখলাম। ইতিহাসের ক্লাস করল না সে। ভাবছি, গ্রামে যাবো। পশ্টু কেমন আছে, কে জানে ? সেবার আসার সময় দুপয়সার থিন্ এয়ারার্কট্ বিস্কুটের একখানা লুকিয়ে পকেটে দিয়ে দিয়েছিল, দুদিন পরে কোর্টের পকেটে পেয়েছিলাম। তখন মঁতিয়ে গেছে। অল্প একটু হেসে কেলে দিয়েছিলাম বাইরে। দুচোখ হঠাৎই জলে ভরে এল, অসুখ কী খুব কঠিন ? আট নবছর বয়স, দাঁত পড়ছে। কতদিন রাগিয়েছি নর্দমা নর্দমা বলে।

কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিলাম দুটো-একটা। আজ যাব। সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছাবো তাহলে। তপতী যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলছে। আবার তপতী ? চলুক,

এড়িয়ে চলুক সে। পল্টুর খুব অল্পখ। পিড়কী পুকুরের ছোট নোঙ্গা ডালের মত নরন নধর শরীরটুকুন তার।

সৃষ্টির দিনে নৌকো জাহাজ করতে কতো খাতাই না ছিঁড়ত সে। মারও খেত বিস্তর। উঠোন থেকে জল সরে গেলে কাগডের নৌকোজাহাজ হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থাকত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে আর্মাডা যুদ্ধের ছবিখানার মত উঠোনটাকে মনে হত তখন।

জামাকাপড় পরে নিলাম। ছোটো পাঁচের ট্রেন। এখান থেকে শিয়ালদহ হেঁটে যেতে দশমিনিট। পল্টুর জন্ম ফলমূল আর স্কুমার রায়ের হযবরল। তিন এগারোং তেত্তিরিশ। তেত্তিরিশের তিন নাবে, হাতে থাকে পেন্সিল। গল্প বলেছিলাম ওকে। অঙ্কর মাষ্টার মশাইকে উত্তর দেবার সময় বলতে গিয়ে চড়চাপড়ও খেয়েছিল। কেঁদে কেঁদে বলেছিল, দাদাকে জিজ্ঞেস করবেন? দাদাই তো বলল।

এরোপরে মিথ্যাবলার জন্ম মার খেয়ে কেঁদেছিল সে।

হাসি পেয়েছিল তীর্থর। বাংলাদেশের কুলমাষ্টার স্কুমার রায় পড়েনি। তাঁদের জন্ম দুঃখবোধও।

ইলিঅট রোড ধরে হন্ হন করে আসছি। বিকেল গড়িয়ে এসেছে সন্ধ্যার সীমায়। এদিকে গ্রামের এক মুসলমান ছেলের সংগে দেখা করতে এসেছিলাম, দেখা পাইনি তার। বাবা বলেছিলেন দেখা করতে। টাইশনির সন্ধান। পল্টু ভালো আছে।

হস্টেলের দিকে ফিরছি। হঠাৎ তপতীর সংগে দেখা রাস্তায়। আমি যাচ্ছি, ও আসছে। দূর থেকে দেখে ফুটপাথ বদল করলাম। হাসতে হাসতে এদিকে এসে বলল, চিনতে পারছো? ফিরলে কবে—গ্রাম থেকে? এদিকে আসো নাকি? কই বলোনি তো?

খুব গভীর হবার চেষ্টা করেও হেসে ফেললাম। তিনটের একসংগে উত্তর দিতে গেলে তোমাকে না দেখে যেমন যাচ্ছিলাম তেমনি চলে যাওয়াই সহজ।

হঠাৎ হাতছোটো ধরে হাসতে হাসতে বলল, বাক্বাঃ রাগ এখনো পড়ল না দেখছি। চল আমার বাড়ি কাছেই, ঘোলের জল করে দেই গিয়ে। টানতে টানতে নিয়ে চলল বিপরীত দিকে। তবুও বাধা দিলাম ওকে। না না, থাক, অন্য একদিন আসবো। কাজ ছিল একটু। বরঞ্চ চলো না রেষ্টুরেণ্টে বসে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিই। কাছাকাছি রেষ্টুরেণ্ট নেই? জিজ্ঞেস করলাম। পূর্বে যতবারই তপতীর বাড়ি আসার কথা বলেছি, জিজ্ঞেস করেছি থাকে কোথায় সে? বিভিন্ন রকমে এড়িয়ে গিয়েছে বারবার। ভেবেছি, হয়ত কোন অসুবিধা আছে বাড়িতে। আর পীড়াপীড়ি করিনি কোনদিন। আজও ভেবেছিলাম, ডব্রতা করছে শুধু। তাই বারবার নানা রকম অছিলায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম। এষাও নাকি জিজ্ঞেস করে উত্তর পায়নি। কেউই জানত না কলেজের।

ইলিঅট রোডের উপরই একটা দৌতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এইটা আমাদের বাড়ি। অনেকদিন চূণবালি স্পর্শ করেনি প্রত্যক্ষ করলাম। ভিতরে

চুকে সামনে একটু উঠোন। আগে বোধ হয় সম্বিত ফুলের কেয়ারি ছিল। এখন কোন জরতীর মনের মত জীর্ণ নীরস জমির উপর দুটি একটি ধূসর-সবুজ ঘাস। একতলার ঘরে পৌছুলাম হুজনে। একটা কাঠের টেবিল, হুদিকে দুটি চেয়ার, টেবিলের উপর ফ্লাওয়ার ভাসে প্রভাতেকেনা রজনীগন্ধার চার-পাঁচটি পর্ব। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের চিত্র, বামিনী রায়ের পট আর হরিণের সিং দুটি, ক্যালেন্ডার।

বলল, বোসো, আমি ভিতর থেকে আসছি এখুনি। চা খাবে তো? এই জার্ণালখানা নাড়াচাড়া করো ততক্ষণ। হাতের উপর ফরাসী কাগজ একটি দিয়ে গেল। সব ফরাসী লিখছি। উস্টেপার্টে অসীম আগ্রহে কিছুই উদ্ধার করতে পারলাম না।

ধূসর পর্দার উপর এক ভীত পলিত মুখ ভেসে উঠল। অপরম্পরা অর্ধহীন হাসি তার মুখে, শ্রাবণের রোগীর মত অসহায় দৃষ্টি চোখে তার। তাকিয়ে দেখতেই পর্দার আড়ালে ডুব দিল সেই মুখ।

আবার শব্দ।

আমি বিমূঢ় হয়ে বসে আছি চেয়ারে। এদিক-ওদিকে ভীত চোখ ফেলে ফেলে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। বললেন অপর শূন্য চেয়ারখানিতে। আর সমস্ত হয়ে তাকাতে থাকলেন দরোজা-জানালা আমার দিকে। তারপর আশ্চর্য সুন্দর গলায় বললেন, তুমি বুঝি খুকুর বন্ধু?

মাথা নাড়লাম।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবার এক অকস্মাৎ প্রশ্ন, তোমার বুঝি অনেক নেয়ে বন্ধু আছে?

কী উত্তর দেব চিন্তা করছি। সেই উপবিষ্ট জরতীর প্রশ্নব্যাকুল চোখ আমার উপর। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। হঠাৎ চমকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম তপতী চায়ের কাপ হাতে কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের কাছে সরে এল। শব্দ করে রাখল টেবিলের উপর। জরতীর মুখচোখ পাংশু হয়ে গেল একমুঠো ছাইয়ের মত। উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে জবাবদিহি করার চেষ্টা করছেন। ঠাঙ্গু ঠাঙ্গু করে চড় নারল তপতী তাঁর গালে, তোমাকে কতদিন না বারণ করেছি না—

তারপর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল অন্দরের দিকে। দরোজায় শিকল আঁটার শব্দ এল কানে।

কী যেন এক হৃৎস্পন্দ দেখছিলাম জেগে জেগে। যার অর্থ পাইনি। পারম্পর্ষ ধরতে পারিনি। তপতী কাছে এসে দাঁড়ালো। প্রতিষ্ঠিত ঘুণায় ওর দিকে তাকাতে ও আকুল কঁদে উঠলো। উঠে দাঁড়ালাম, চলি। হুই কম্পিত হাতে আমাকে বিঁধে শ্রাবণের গোপন কান্নার মত আমায় পুরুষের বুকে বলতে লাগল, আমায় ভুল বুঝে যেও না, যেও না—

এরোপরে বাংলা উপন্যাসের নায়কের মত ওকে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু নাটকের মত কিছুই করলাম না। ধীরে ধীরে আবার বসলাম চেয়ারে।

বাইরের সন্ধ্যা সরে এল, ঘরের ভিতরে। ওই আলোকস্তিমিত গ্রহরকে স্পর্শ করে এক প্রাচীন আকাশ ভেসে এল, আনন্দের ভাষা তার, বর্তমানের পশিত কোন্ মুখের মত সারা উঠোন ভরে উঠল মোসুমী ফুলে, মোসুমী গন্ধে।

প্রফেসর রজত সেন দুহাতে বুকে ভুলে নিলেন নেয়েকে। পাকা ধানের রঙের মত কৌকড়া কৌকড়া চুল মাথা ভাঙি। চোখ মুখ দুটোনি ভরা।

কিছুক্ষণ আদর করে নামিয়ে দিয়ে বললেন অধ্যাপক, সাবিত্রী, বিদ্যাসাগর ছেড়ে দিলাম আজ। স্কটিশে ডেকেছে। অনেক বেশি বেতন ওখানে।

সাবিত্রীর মুখখানি বর্ষপূর্ব আকাশের মত ধমধমে হয়ে উঠল। অতিকষ্টে হাসি ফুটিয়ে বললেন, তবুও পুরোনো জায়গা। অবশ্য তুমি যা ভালো বুঝবে—তার উপর.....

অধ্যাপক সামান্য বিব্রত বোধ করেন, না না, এ ভালো না। ব্যাপারটা আনন্দের বোঝা উচিত সবিতা। সংসার থেকে জন্মিয়ে রাখতে হবে কিছু কিছু। এখন তো আর দুজন না আমরা। খুকুর ভবিষ্যৎটাও—কীরে খুকু? হাত বাড়িয়ে আবার তাকে কাছে টেনে আনেন রজত। এ ব্যাপার নতুন নয় সাবিত্রীর কাছে। এ পর্যন্ত কতো কলেজ যে বদলেছেন রজত তার ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্য খেলাচরিত্রের মানুষ। ভালো না লাগলে কোন কিছুই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে না। মাঝে মাঝে ভয় হয় সাবিত্রীর। এ মানুষটিকে তবু তাঁর বিশ্বাসের সীমা নেই। রজত এক আশ্চর্য পুরুষ। ছাত্রজীবনে কৃতি ছিলেন। পিতা যথেষ্ট ধনী। সাবিত্রীকে তাঁর অন্তে বিবাহ করায় সম্পত্তিচ্যুত করেছিলেন। শেষ বয়সে কিন্তু যথেষ্ট টাকা রজতকে পাঠাতে থাকেন। কিন্তু এই বিদ্রোহী পুরুষ পিতার কণামাত্র দানও গ্রহণ করেননি। সম্মানের সংগে ফিরত পাঠান সে বিপুল অর্থ।

গ্রীক দেবতার মত গঠন। প্রখর নাখ, স্বপ্নাতুর চোখ, কঠিন অপরূপ দাঢ্য। সাবিত্রীর কলেজজীবন মনে পড়ে মাঝে মাঝে। তখন কতো ছেলেমানুষ ছিলেন তাঁরা। কতো বোকা। সময় অসময়ে কতপ্রহর কথা কাটিয়েছেন। ওয়াই-এম-সি-এ, নভেলটি, বসন্ত কেবিন আর কলেজ লন। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন অপলক কথা কুরোলে পর।

তারপর সে বিদ্রোহের দিন, দুপুর। কত চিন্তা, কত ভয়, কত দাহ।

একদিন সকল বাধার অবসান করে রজত এসে দাঁড়ালেন সাবিত্রীর দ্বারে, ভিক্ষুক শিবের মত। তারপর ঝরাবকুলের স্বপ্নে রাত্রি কাটল, স্বামীর প্রদীপ্ত বিশ্বাসের বুকে মাথা রেখে সাবিত্রী তাকিয়ে থাকতেন এই বিদ্রোহী পুরুষটির দিকে। তারপর তাকাতেই নিজের দিকে, কোথায় অনিত ঐশ্বর্য তাঁর।

রজত বলতেন, লজ্জা হয় সাবিত্রী। তোমার সেবার উপযুক্ত নই আমি।

পারের থেকে জুতো খুলে দিতে দিতে বলতেন সাবিত্রী, বোলো নাগো, এমন কথা মুখে এনো না ছিঃ। পাপ হবে আমার।

হাসতেন রক্ত। স্বান সে হাসিটুকু গোপন থাকত সাবিত্রীর কাছে। সুখ-গবিতার মনে মনে গান হয়ে ছড়িয়ে পড়ত রক্তের স্বর।

কলেজের পর আবার গোটা দুই ট্রাইশনি করে রক্তের ফিরতে রাত হত। স্বামীর ক্রান্তি সাবিত্রীকে ব্যথায় বেদনায় দগ্ধ করতো। আগেও বলেছেন, এত পয়সায় আমাদের দরকার নেই। তুমি ট্রাইশনি ছেড়ে দাও। শরীর যে দিনদিন ভেঙ্গে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না?

হাসতেন রক্ত। বলতেন, কষ্টটা কলেজে সাবিত্রী। ট্রাইশনি তো সুখের স্বর।

পরদিন থেকে সাবিত্রী দুধের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেন। ফলমূলসন্দেশ ভলখাবারের টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। স্বামী রাত্রি করে এসে বললেন, বাইরে খেয়ে এসেছেন। ছাড়ল না কিছুতে। খেতেই হল সেখানে। না খেয়ে শুয়ে পড়লেন, ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই প্রথম। সাবিত্রীর মনের কোথায় যেন মেঘ জমল, এত গোপন, খোঁজ পেলেন না তার।

এরপর থেকে এরকম রাত্রি প্রায়দিন হতে লাগল। তারপর রাত্রি করে আসাটাই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হল। রক্ত গল্প করতেন এসে, ওদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের একটা কানুচার আছে।

সাবিত্রীও চেনেন জানেন কাদের বাড়ির কথা স্বামী বলছেন।

অনেকে অনেক কথাবার্তা বলে আজকাল। সাবিত্রীও শুনতে পান অনেক। বিশ্বাস করেন না কিছু। হাসেন আর বলেন মনে মনে, আমি তো চিনি ঠুকে। অ-সাধারণ বলেই একটু বিসদৃশ। সাধারণেরা বুঝবে এর কোন অর্থ! অনেকে এসে অনেক কথা শুনিতেও যান সাবিত্রীকে।

প্রফেসর এবং তাঁর ছাত্রীকে নাকি অনেক জায়গায় দেখা যায়। সিনেমায়, মেমোরিয়ালে, চৌরঙ্গীতে।

সাবিত্রী বুঝতে পারেন না, এর মধ্যে কলুষ কোথায় দেখল সকলে।

এবুঝি পৃথিবীর মাঠ, যেতে যেতে একদিন তার সীমাক্রান্তি হল। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল সাবিত্রীর আকাশ। স্বামী বেরিয়ে যাবার অল্প পরেই সেই গন্ধময় দিনের শাড়ীখানি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পথে নামলেন। গোপন নিভৃত পদসঙ্কারের এক উত্তেজনার অর্থ আছে, এ একান্ত নিরর্থক।

বিরাট এক প্রাসাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন সাবিত্রী। হঠাৎ দৃষ্টি কেড়ে নিল এক চকিত হাসি। তাঁর একান্ত পরিচিত, প্রহরে প্রহরে পরিচিত।

তাকিয়ে রইলেন এক উচ্চ ঋল কুলবাগানের দিকে : তাঁর স্বামী এবং স্বামীর ছাত্রী। দুজনেই হাসছে অবিশ্রান্ত।

রক্তের হাসি শিককের নয়, আর মেয়েটির হাসিও ছাত্রীসুলভ নয়।

এক অন্ধকার লঙ্কায় সর্বাঙ্গ মুড়ে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। দেখলেন এবং দেখলেন তাঁর পুরুষপরমকে। এক হৃৎকম্প ঝড়ে কাঁপতে দেখলেন সমস্ত পৃথিবীকে। তার মাঝে পাখির অসহায় নীড়ের মত তপতীর ভীষন জুড়ে এক কালো আকাশের ভয়।

তপতীদের বাড়ির পাশেই থাকেন এক ইহুদি পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ছোটছেলে

ছুটি। এ-পরিবারের সংগে ইহুদিদম্পতীর ঘনিষ্টতা ছিল প্রতিবেশীর চেয়েও কিছু অধিক।

দোতলা ওঠার সিঁড়ি থেকে সাবিত্রীর হঠাৎ নড়ড়ে পড়ল ইহুদির ঘর। চমকে উঠলেন তিনি। পায়ে পায়ে আঘাত লাগার ভয়ে, বিস্ময়ে। তারপর ছুটে নেনে গেলেন নিচে।

এক যুতার মত গলিত চীৎকারে সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল।

ঘরের মাঝে এক বিরাট টেবিল। তাকে ঘিরে এক ভয়ানক পালা চলেছে।

ইহুদি পুরুষটাকে তাড়া করে চলেছে ইহুদি স্ত্রীলোকটি, তার হাতে রিভলবার। চোখ অগ্নিময়। সে কি দৃশ্য।

ভয়ে বিস্ময়ে লক্ষ্যনিবদ্ধ কুকুরের মত পুরুষটি চীৎকার করছে প্রাণপণে। স্ত্রীলোকটি পাগলের মত তাড়া করেছে তাকে। হাতে যুতার মত নিশ্চিত অস্ত্র।

প্রতিবেশিরা ছুটে এসে ধরে ফেলল ছুজনকে। নাটক ভুল না ভালো রকম।

সাবিত্রী শুনলেন, স্বামী অবিশ্বাসের কাজ করেছিল। তাই—

ইহুদি স্ত্রীপুরুষকে নিয়ে সকলে একতলায় নেনে এসেছে। টেবিলের উপর কালো চক্চকে যুতা। শাপের গা। ঘরে একা সাবিত্রী। আন্তে আন্তে টেবিলের নিকটে সরে আসছেন। নিকটে। আরো নিকটে।

হাত বাড়িয়ে দিলেন অস্ত্রখানার দিকে। দপ্‌দপ্‌ করে জলে উঠল প্রতি-শোধের চোখ।

হঠাৎ বুকের কাছে নিয়ে এলেন সেই নক্ষণ যুতার মুখ। হাসলেন একটু।

সরিয়ে নিলেন যুতার মুখ দেহ থেকে। আবার হাসলেন একটু। যুতাকে টেবিলের উপর রাখলেন। হাসলেন আবার। তারপর এক ভয়ংকর হাসিতে ফেটে পড়ল ঘরখানা। এক সংকুত পাগলের মত সে হাসি মাঝে মাঝে ইলিঅট রোডের এক পলিত গৃহের শূন্যলিত কক্ষে ভেঙে ভেঙে পড়ে আসতো। আর এক নবীন আকাশের দিকে সংক্রান্তিত হবার লক্ষ্য তার।

আমাকে ঘিরে এক বিপুল অন্ধকার কান্নায় গুঁড়ি গুঁড়ি চুলের মত। আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি চেয়ারের পর। ঘরের মধ্যে জায়গার জায়গায় ঘন হয়েছে এই স্ত্রীনিবিড় ভয়ঙ্করী রাত্রি। রাজহংসীর এক দপিত দেহরেখা বঙ্কিন হয়ে নত্র হয়েছে এখন যখন স্ত্রীর সময় তার। ভাবছি, কথা বলুক তপতী। নতুবা অনঙ্গপর হলে ঘরখানা আলোক-স্তূপ যেমন হঠাৎ দোড়ে পালিয়ে যায় তেমনি করে আমি পালিয়ে যাবো। উঠতে চেষ্টা করি। হুহাতের অবশতা দিয়ে ঠেলে দিতে চেষ্টা করি বেতসনির্মিত ছুটি চেয়ারের হাতল। তারপর শীতল হই আশ্চর্য ভরে। তাহলে এখন ওই স্তিমিত নারীর রেখা চক্কল হয়ে তার শানিত অবিশ্বাসের ছুরীতে যদি আমায় বিদ্ধ করে বাঁচবো না। চেয়ারের গুহার মধ্যে থেকে কটুকর্কশ চীৎকার করলার ভয়ে, আমাকে বিশ্বাস কর তপতী। আমি তোমার বিশ্বাসকে—

তীক্ষ্ণ শানিত এক চীৎকার হঠাৎ অন্ধকারের দেহখানাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিল, না না। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। আমার রক্তে স্ত্রী নেই, আমি স্ত্রী নেই।

ছুই কঠিন বাহ্যতে ওকে বিধলান এক শীলিত শবরের মত । বললাম, শুধকে
তুমি একা, আমি একা চিনবো কেনন করে ।

খাল-বিল-পারের কাহিনী

কনৌজনাথ দাশগুপ্ত

[৬]

দৌড়তে দৌড়তে দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে অক্ষয় এমন এক ভায়গাতে এসে
পৌঁচেছে যেখানে সবই তার অচেনা । চারিদিকে বুনো কাঁটালতার ঝোপ । আশে
পাশে কোন পথ নাই । শুষ্ক হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল । এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে
শুধু দৌড়েই এসেছে । ধরা পড়বার ভয়ে চেনা পথ ছেড়ে অজানা পথ ধরেছে ।
বাবুপাড়া, বিল, স্তম্ভিত ডোবা, না গৌসাইএর ঘাট সব এড়িয়ে সে সোজা গোয়েন্দার
চরে চুকে যেদিক চোখ গিয়েছে সেদিকেই ছুটেছে । এখন উপায় ? আর দাঁড়াতে
পারছে না । সামনে একটা কাঠের গুঁড়ি দেখতে পেয়ে অক্ষয় তার উপর বসে পড়ল ।

অক্ষয় বসে বসে ভাবতে লাগল, এখন সে করবে কি ? পুর্বের বিলে যেখানেই
সে লুকিয়ে থাক নটবর তাকে খুঁজে বের করবেই । তারপর একবার ধরতে পারলে
আর আস্ত রাখবে না । মেরে ঠাণ্ডা করবে । পাঠশালার ত্রিসীমানায় ত দূরের কথা
বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না । না—না মুচি সে হবে না । সে পড়বে, সে ভাল
কাজ করবে । তাহলে এখন সে যাবে কোথায়, কে তাকে লেখাপড়া শেখাবে, কে খেতে
দেবে ? সে ত পথ চেনে না, জানে না কউকে । জন্ম অবধি সে দেখেছে পুর্বের
বিল, তার অতিপরিচিত সীমাবদ্ধ কটি, পথ ঘাট । বাবা ঘুরেছে দেশে বিদেশে, কিন্তু
সে ত সঙ্গ পায়নি । সোনা, ভোলাদের মানাবাড়ি আছে । তার নাই ? হঠাৎ মার
কথা মনে পড়ল । মায়ের মুখ ত মনে পড়ে না, মনে পড়ে শংকরীর মুখ । কটা
শেমাল তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে পালিয়ে গেল । পেছনে গাছের উপর শব্দ হতে
তাকিয়ে দেখে বিরাট একটা বেড়াল । এ সেই বন বেড়াল । তার দিকে কেমন করে
তাকাচ্ছে দেখনা ! কানডাবে নাকি ? অক্ষয় উঠে দাঁড়াতেই বন বেড়ালটা পালিয়ে
গেল । নানা ধরনের রংবেরংএর পাখী ঝোপ ঝাপের ভেতর কিচিরমিচির করছে ।
ঐ হলুদ রংএর পাখীটার নাম কি ? দেখ, দেখ কত বেঙ্গীর বাচ্চা ! অক্ষয় ছুটে
গেল একটা যদি ধরতে পারে । না, পারল না, সব পালিয়ে গেল । পাকা
তালের গন্ধ আসছে নাকে । অসময়ে তাল এল কোথেকে ! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
অক্ষয় দেখতে লাগল । আরে ঐ ত তাল গাছ ! একটা নয় ছোটো নয় তিনতিনটে
দিবি জংগলের ভেতর মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । তালের গন্ধ নাকে আসতেই

অক্ষয় পেটে ক্ষিধে টের পেল। এতটা সময় পেটে কিছু পড়েনি এতক্ষণে মনে পড়ল। অক্ষয় এগিয়ে গেল যদি পাকা তাল হুঁ একটা পাওয়া যায় তাই দিয়েই ক্ষুধাশান্তি করবে। হুঁ হুঁটো তাল পেল তলায় কুড়িয়ে। কিসে খানিকটা খেয়েছে, হয়ত বেছীতে। তা হোক এই খেয়েই দিনটা কাটিয়ে দেবে সে। খাওয়া ত হবে কিন্তু এভাবে বসে থাকলে ত চলবে না। এখুনি কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তালখেয়ে অক্ষয় উঠে দাঁড়াল। পথ তাকে খুঁজে নিতে হবে।

লতা পাতা ডাল ঝোপ সরিয়ে আস্তে আস্তে অক্ষয় এগোতে লাগল। মাথার উপরে সটান গাছের প্রকাণ্ড একটা ডাল ঝুলে পড়েছে। হাত দিয়ে সরাতে গিয়েই ভয় পেয়ে পেছিয়ে এল অক্ষয়। ডাল বেয়ে যে লতাটি উঠেছে ঠিক যেন তার সঙ্গে মিশে রয়েছে। নতুন কচি পাতার নত ফিকে সবুজ গায়ের রং। সরু লাউএর ডগার মত দেহ। না নড়লে চিনবার উপায় নাই। অক্ষয় কিন্তু ঠিক ধরেছে। তাদের বাগানে দেখেছিল। শংকরী না বলেছিল, ওর নাম লাউডগা সাপ। উড়ে উড়ে লতাপাতার ভেতর দিয়ে ছুটে যায়।

আশে পাশে উপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অক্ষয় এগোতে লাগল। কোথায় যাবে সে? পথের কোন চিহ্ন নাই বরং জংগল যেন আরও ছর্ভেচ্ছ হয়ে উঠেছে। বড় বড় কোন গাছ নাই, আছে শুধু নাম না জানা হরেক রকমের ঝোপ ঝাড় বুনো কাঁটা লতা, বেত আর বাঁশ। অতিকষ্টে আরও একটু এগিয়ে এসে অক্ষয়ের যেন মনে হোল ভলের শব্দ হচ্ছে দূরে। নদীর ছোট ছোট পাতলা ঢেউ যেন পারের উপর এসে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে খেলা করছে। আনন্দে নেচে উঠল অক্ষয়, নিশ্চয়ই নদী হয়ত বা ভৈরবই। মনের আনন্দে কাঁটা গাছ ঠেলে সামনের দিকে ছুটে চলল অক্ষয়। চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরোচ্ছে, কাপড় ছিঁড়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নাই।

যা ভেবেছিল অক্ষয় ঠিক তাই। নদীই বটে—খুব বড় নদী। পুর্বের বিলের দর্শবারোপণ বড়। বাপের সঙ্গে ডিজিতে করে একবার বড় নদীতে এসেছিল অক্ষয়—তার নাম ভৈরব। এ ভৈরব না হয়ে যায় না, ঠিকই ভৈরব! নদীর ওপারে ছোট ছোট বাড়িগুলি কি চমৎকার দেখাচ্ছে! কি নাম ও দেশের? ঐ কি ছুঁচোহাটি—বড় ইকুল যেখানে আছে? আহা, সে যদি এখুনি ঐ ছুঁচোহাটির ইকুলে পড়তে পারত! বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল অক্ষয়ের।

আজকের আকাশে এতটুকু মেঘ নাই। ওপারের মাঠ ঘাট সব খাঁ-খাঁ করছে প্রখর রোদে। বেলা অনেকখানি হয়েছে। বুনো ঝোপ ঝাপের আড়ালে ছিল বলে কিছুই টের পায়নি। নদীর জল এই সময় ঝোলা থাকে—টানহয় একরোখা। আশে পাশের মজা হাজা নদী, বিলে বর্ষার জল পড়লে কচুরিপানা কেটে দিয়ে জল বের করা হয়। সেই কচুরিপানা ভেসে আসে বড় নদীতে। বিরামহীন, অনন্তকাল ধরে যেন চলবে তারা। সুল্লর বনের নোনা জলে একবার গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নাই। রাক্ষসের মত টেনে শুবে শুকনো করে দেবে। ঝাঁক বেধে, দল বেধে যায় কচুরিপানা। জোয়ালো ডাঁটার পরে ঘন সবুজ পাতার বাহার। তারসাদা-বেগুনে লম্বা ফলকের মত ফুল। গন্ধ নাই কিন্তু দেখতে বেশ। সহজে হটবে না পানার ধাপ। নৌকা একবার

আটকে গেলে কাটারি দিয়ে কেটে পথ বের করতে হবে। শুধু ফুল নয় সাপ থাকে ঐ বাপে, কখনসখন মড়াও ভেসে আসে। মড়ার লোভে ইলিশ মাছ থাকাও বিচিত্র নয়। জেলেরা সব ওৎ পেতে বসে থাকে।

অক্ষয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। হঠাৎ খেয়াল হোল, তাইত এইভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে! যাবে কোথায়? কে তাকে বাপের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। গোলপাতা বোঝাই একটা নৌকা চলেছে মাঝ নদী দিয়ে।

ও ব্যাপারী, ব্যাপারী ভাই, কনে যাবা?

ব্যাপারী গোন পেয়েছে। দিবি এক হাতে হাল ধরেছে আর হকা টানছে। উত্তর দিল না। হয়ত বা অক্ষয়ের কথা শুনতে পায়নি।

অক্ষয় দাঁড়িয়েই আছে। পায়ে মশা কামড়াচ্ছে। তাছাড়া পায়ের আঙুলে কাদা চুকে বিড় বিড় করছে। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়াতে হবে কে জানে!

হঠাৎ নদীর মধ্যে বাজনা শুনে কান খাড়া করল অক্ষয়। বাজনা বাজায় আবার কে এখানে! অক্ষয় ঝুকে পড়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

একখানা বড় পানসি আসছে পাড় ঘেসে লগি ঠেলে ঠেলে। নৌকার ছাদে বসে দু'জন লোক বিড়ি টানছিল। বনের এমন নির্জন ধারে সুন্দর একটি ছেলেকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা বিস্মিত হোল।

একজন বলল : এই খোকা, এখানে কর কি?

আর একজন শুধাল : বাড়ি কোথায়? যাবা কোথায় তুমি?

পুর্বের বিল বা নটবরের নামগন্ধ করলে চলবে না। শুধু শুধু মার খেয়ে মরবে তাহলে। একটু ভয় পেয়েই অক্ষয় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল : আমি হারায় গিছি মশায়।

নৌকা থামাতে বলে লোক দুটি সটান নৌকা থেকে নিচে নেমে এল।

হারায় গেছ। বাড়ি কোথায়?

বাপের নাম কি?

চোখ বুজে অক্ষয় মরিয়া হয়ে বলল : আজ্ঞে বাপ নেই। বাড়ি। বাড়ি হোল—

টোক চিপে মাথা চুলকে অক্ষয় ভোলার নামার বাড়ি নাম করে ফেলল : আজ্ঞে দৈবজ্ঞকাঠি।

দৈবজ্ঞকাঠি আছে কে তোমার।

আজ্ঞে—অক্ষয় লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল!

নাই কেউ।

জেরার চোটে ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত অক্ষয় শব্দ কেঁদে উঠল।

আরেকজন বলল : আহা, তাহলি ওর নেই কেউ!

লোক দুটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলল। তারপর একজন ফের নৌকায় উঠে ভেতরে চলে গেল।

নৌকার ভেতর গান হচ্ছিল। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আগেকার সেই লোকটির সঙ্গে একজন পাতলা লম্বা বাবরী চুলওয়ালা বেরিয়ে এল।

নতুন লোকটি অক্ষয়ের সামনে এসে প্রশ্ন করল, নাম কি রে তোর।

আজ্ঞে অক্ষয়।

অক্ষয় কি।

অক্ষয় রিশী।

বেশ, বেশ। তা এখানে এখন আলি কি করে

অক্ষয় আর কত বানিয়ে বলতে পারে! চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

নতুন বাবু লোকটি অক্ষয়ের হাত ধরে মোলারের স্তরে বলল, ছি ছি কাঁদিস কেন, চল—আয় আমার সাথে।

অক্ষয় আর কোন কথা না বলে তাদের সঙ্গে গিয়ে নোকায় উঠল।

নোকার ভেতরে নিয়ে এসে লোকটি বলল : এখন যাবি কোথায় বল : দৈবজ্ঞ কাঁচি যাবি না আনাগো সাথে যাবি।

অক্ষয় সাহস সক্ষয় করে বলল : তোমরা কনে যাবা।

আমরা যাব কুদিরনার বটতলায়। মস্ত বড় আড়ং বসবে সেখানে। কত লোক জন আসবে—গান—বাজনা কুতি হবে, পুজো হবে।

এবারে অক্ষয় হেসে ফেলল। এরা লোক তাহলে খুব ভাল। মেলা দেখতে যাচ্ছে। আহা, তাকে কি আর সঙ্গে নেবে! বড় মেলা দেখতে তার খুব ইচ্ছা। পুবের বিলে ছোট মেলা বসে কালী পুজো চড়কের সময়।

অক্ষয় বলে ফেলল : আমারে নিয়ে যাবা।

কেন নেব না, নিশ্চয় নেব! তোর বাড়িতে রাগ করবে না।

এবারে অক্ষয় নির্ভয়ে বলল : আমার ত কেউ নেই। রাগ করবে কেডা।

আগেকার একজন কাঠের উপর খাপড় মেরে বলল : কেমন বলিনি আমি।

নতুন লোকটি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে অক্ষয়কে বলল : তাহলি যাবি আনাগো সাথে, নোকো ছাড়ে দিলাম!

অক্ষয় মহাখুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে গায় দিল।

নোকা ছেড়ে দিল।

এতক্ষণ অন্য কেউ কথা বলেনি। নোকার ভেতর প্রায় কুড়ি পচিশ জন লোক। তার মত ছোট চার পাঁচজন আছে। নোকা ছেড়ে দিতেই যে লোকটি হারমোনিয়ম নিয়ে বসে ছিল সে বলল : ও মাস্টার এয়ে বনের মধ্য ঋষি বালক খুঁজে আনলে। আর তোমারে ঠেকায় কেডা! ওরে এই, গান জানিস।

ব্যাপারটা যে কি বুঝতে না পেরে অক্ষয় ফাল ফাল করে তাকিয়ে থাকল। কোন উত্তর দিল না।

লোকটি আবারও প্রশ্ন করল : এই, গান জানিস নে?

অক্ষয় এবার মাথা নেড়ে উত্তর দিল, না।

লোকটি বলল : এই সারিছে। এয়ে একেবারে রাঙা যুলো! যাক্ বাবা কথা যে বলতি পারিস এই ঢের।

বাবু লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল : বেশি ক্যাচোর ক্যাচোর করিসনে রাছেন। সবুর কর ছ'দিন ! আসো অক্ষয় আমার ধার বসো !

অক্ষয়ের চেহারা ভাল। গোরবর্ণ, বড় বড় চোখ, হুটপুটে চেহারা ! এ-যাত্রার দলে এমন চেহারা অভাবনীয়। যে কটি বালক দলে আছে তাদের বয়সেই বালকত্ব—বিড়ি খেয়ে রাত জেগে জেগে শরীরে পদার্থ নেই। অধিকারী রাধিকা গোঁসাই মনে মনে বড় খুশি হয়েছে। নৌকাতে এখনও তিনচারদিন কাটাতে হবে। এর মধ্যে সে অক্ষয়কে তৈরি করে-ফেলবে।

এবার অক্ষয় বেশ ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। কেউ শুয়ে পড়ে এক মনে বই দেখে গড় গড় করে সুর করে কি যেন পড়ছে, কেউ বা শুয়ে বসে তাস খেলছে, গল্প করছে। অক্ষয়ের বয়সী ছেলেগুলো সব গান শিখছে। অক্ষয়ের নিকট এ এক নতুন জগৎ—হকচকিয়ে গেছে সে !

কিছুক্ষণ বাদে গলায় ধপধপে সাদা একটা পৈতা পরে মোটা বেঁটে নিশমিশে কালো একটা লোক কলার পাতে কিছু চিড়ে গুড় এনে অক্ষয়ের সামনে রেখে গেল। ভাল খেয়ে কি আর ক্ষিধে মরে ! চিড়ে গুড় পেয়ে অক্ষয় কোন প্রশ্ন না করে গোত্রাসে গিলতে লাগল।

রাধিকা অধিকারী বলল : পেট ভরে খায়ে নে, ভাত পেতি সেই সন্ধ্যা। সাহেবের হাটে গিয়ে নৌকা বাঁধে তারপর সব রান্নাবান্না।

পরে সেই কালো লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল : ও অম্বুকুল, এই বেলা চাল ভাল ভরিতরকারীর একটা লিষ্টি করে ফেলো। হাটে গিয়ে যেন তাড়াহড়ো না করতে হয়।

অক্ষয় বুঝতে পারল, এ বেলা তবে ভাত জুটবে না। কিছু জুটবার আশা ত ছিল না, এই যে পেয়েছে সেই যথেষ্ট। খেয়ে দেয়ে অক্ষয় স্তম্ভ বোধ করল।

নৌকার ভিতর কত কথা, গান হচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নাই। নৌকার জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে অক্ষয় তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছে। নতুন দেশ, কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি ঘর, হাট বাজার। লোকজন নিয়ে খেয়া পারাপার করছে। চোড়া দিয়ে গল গল করে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে। এই বুঝি জাহাজ। শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে। অক্ষয় কোতুহলী হয়ে দেখছে। এমন সময় ষ্টীয়ারটা একটা সিঁটি দিল। অক্ষয় ভয় পেয়ে মুখ নৌকার ভেতরে নিয়ে এল।

সেই গানের মাষ্টার বলল : এই ছেমড়া, শব্দ হয়ে বস—নৌকা টালাবে এবার।

টালানোকে অক্ষয় ভয় করে না। মাথা নিচু করে জানালা দিয়ে চেউ দেখতে লাগল। ইস্, কত বড় চেউ দেখ ! গেল বুঝি সব তলিয়ে। অক্ষয় চোখ বুজে টালটা সামলে নিল। তারপর আনন্দে হেসে উঠল : এরে ইষ্টিম বোট কম না ?

গানের মাষ্টার বলল : ই্যা রে ই্যা, দেখে লে, নয়ন সার্থক কর।

নৌকা নাচতে শুরু করল।

অধিকারীর মাথার ব্যামো। সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। অক্ষয়ের আনন্দ আর ধরে না। যেন দোলায় চড়েছে সে। ষ্টীয়ারটা দানবের মত আওরাজ করতে

করতে বেরিয়ে গেল। একবার যদি সে ঐ জাহাজে উঠতে পারত তবে কত দেশ সে দেখতে পেত।

নৌকা স্থির হলে গান বাজনা আরম্ভ হোল বটে কিন্তু বেশকণ চলল না। রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। গানের মাষ্টারকে ঘুমে ধরেছে। ছোঁড়াগুলোও আনচান করছে। তারাও একটু বিশ্রাম চায়।

যে যেখানে পারে কাত হয়ে পড়েছে। একা কেবল অক্ষয় বসে। তার চোখে ঘুম নাই। তার মন ফিরে গেছে গাছপালা ঢাকা হারাণের সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে। শংকরীর জন্তে মন কেমন করছে! ভাত নিয়ে সে হয়ত বসে আছে।

রাধিকা একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে উঠে বসে বলল : ওরে অক্ষয়, গান তবে একটুও জানিস না ?

একটা বাধান খাতা খুলে নিয়ে অধিকারী বলল : তবে বল দেখি, মা মা, দেখ, দেখ, কী অপূর্ব রাজার কানন।

অক্ষয় বলবে কি ! অবাক হয়ে রাধিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাধিকা তাড়া দিয়ে বলল : বল, মা-মা—

এবারে অক্ষয় পুনরাবৃত্তি কবুল করল।

রাধিকা খুশি হয়ে বলল, আবার বল।

অক্ষয় আবার বলল।

খুশিতে খোসমেজাজে তখন রাধিকা ডাকল : ও রাজেন।

উঁ।

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল নাটার।

কেমন ?

পাশ ফিরে রাজেন বলল, সরেস, পারবে।

তবে ?

বসে খুব খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হাসল রাধিকা। তারপর আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে অক্ষয়কে কাছে ডেকে এনে বলল : এটা একটা গানের দল, বুঝলি। তোকে পাট করতে হবে।

অক্ষয় যে গানের দল একেবারে দেখেনি এমন নয়। গত বছর পুবের বিলে লক্ষ্মী পূজার সময় গান হয়েছিল। সে কী যুদ্ধ। আসরে সেনাপতিতে সেনাপতিতে যুদ্ধ বেধেছে—ঝঝঝ যুদ্ধের বাস্তব বাজছে। এমন সময় পেছনে হঠাৎ হুগা উঠল। লাঠি, ইট, পাটকেল নিয়ে সে কি মারামারি। কোন রকমে পরাণের কাঁধে উঠে আসর থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। সেই রকম ভয়কালো সাজ পোশাক পরে তাকেও যুদ্ধ করতে হবে নাকি ! বাঃ বাঃ বেশ হয় তাহলে কিন্তু।

রাধিকা বলল : তোর চেহারা ভাল, একবার গান শিখে নিতি পারলি আর পায় কেডা। পনেরো টাকা অবধি মাইনে হবে। কাপড় জামা পাবি, খাতি পাবি। এখন ভাবে স্তম্ভ। বাড়ি চলে যাবি ? সেখানে তোর আছে কেডা ?

অক্ষয় বলল : না, বাড়ি যাব কি জন্মি। তোমাগো সাথে যাবো। টাকা

আনি চাইনে। আনারে পাঠশালায় পড়াবে বলো। আনি পড়ব, লেখাপড়া শেখবো।

বাঃ বা, এইত কথার মত কথা। ও রাজেন শুনতিছিস? তা অক্ষয়, আনি তোরে পড়াব, বই কিনে দেব।

অক্ষয় আনন্দে হাসতে লাগল।

[৭]

গোনে, বেগোনে, তিনচারদিন পার করে নোকা এসে কুদিরমার বটভলার ঘাটে ভিড়ল। পুজা আরম্ভ হবে কাল থেকে কিন্তু উৎসব আরম্ভ হয়েছে দু'তিন দিন আগে থেকে।

পাড়ে উঠে অক্ষয় দেখে এলাহি কাণ্ড। জীবনে এমনটি আর সে কখনও দেখেনি।

প্রকাণ্ড বটগাছ। তার আশেপাশে প্রায় আধ মাইল জয়গা জুড়ে দরনার ছাপরা উঠেছে অসংখ্য। তাঁরু পড়েছে দশ বারোটা। টিন ও খড়ের ঘরও কিছু আছে।

নোকা থেকে জিনিসপত্র সব পাড়ে জমা হতে লাগল। বাক্সবন্দী সব সাজ পোশাক, পরচুর, চাল তরোয়াল, ঘুড়ুর, বাঁশী। তারপর বাঁয়াতবলা, খোল-মুদঙ্গ-চাকি, হারমোনিয়ম। এমন কত কি! গোকুর গাড়ী এসেছে। জিনিসপত্র বোঝাই করে সেই নাঠের ওপাশে ঝেতে হবে। তাদের বাসা বরাদ্দ হয়েছে ঐ দিকেই।

বাসায় পৌঁছে জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে হিসাব বুঝে নিয়ে রাখিকা ছেলেদের হুকুম দিল যা সব ঘুরে আয়গে। কাল থেকেত তিনদিন ছোড়নে থাকতি হবে।

ছেলের দল মেলা দেখতে বেরোল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো অমুকুল। অক্ষয়ও আছে। অমুকুল দলের দ্রোপদী কিন্তু আসরে কখনও যন, কখনও নির্বাক ভীম বা ঐধরনের আর কিছু। খাবার বিভাগের কর্তা বলে সবাই খাতির করে, বিশেষ করে ছেলেমহল। রাস্তায় বেরিয়ে সে সকলকে একটি করে বিড়ি উপহার দিল। অক্ষয় নিতে চাইল না। সে এখনও বিড়ি খেতে শেখেনি।

অমুকুল ধমক দিয়ে বলল : দূর হাঁদারাম। গানের দলে আসে এ নাহিলি কি আর চলে। রাত জাগবি কি করে? নে, ধর।

ভয়ে ভয়ে অক্ষয় নিল একটা।

বটগাছের বড় বড় শেকড় অনেকটা জায়গা ঘিরে রেখেছে। অসংখ্য ঝুরি নেমেছে বিভিন্ন ডাল পালা থেকে। ঝুরির মাথায় ছোট বড় ইট মুড়ি বাঁধা। ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী মশারীও বাঁধা রয়েছে। মানত করে বেঁধে দিয়ে গেছে কত বউ ঝি। কত খাল বিল নদী পেরিয়ে এসে বক্সা চেয়েছে সন্তান। রুগ্মা চেয়েছে স্বাস্থ্য, স্বামীপরিভাজা চেয়েছে স্বামীর সোহাগ। স্বামীর মঙ্গল, সন্তানের মঙ্গল পরিবারের মঙ্গল। কামনা, বাসনার আর শেষ নাই। তারাই ইট, মুড়ি,

মশারী বেঁধে রেখে গিয়েছে, মনস্কাম সিদ্ধ হলে পূজা দিয়ে গিঁট খুলে দিয়ে যাবে। গাছের গোড়ায় সিঁদুর লেপে দেওয়া হয়েছে। নতুন ঘট বসেছে। হোমের জন্তু কলা গাছ ফেলে মাটি দিয়ে বড় বেদী তৈরী হয়েছে। প্রধান পুরোহিত আর তাঁর সাতজন সহকর্মী ভ্রাম্মণ এসে পৌঁছে গেছে। বিরাট আয় তাদের। তিনদিনে সত্তর, আশিমাণ চাল নৈবেদ্য পড়বে। পয়সা, আনি, ছয়ানি, গুনতে গলদঘর্ষ হতে হবে। ভরিতরকারীও কম নয়। ফল মিষ্টি আছে। কাপড় চাদর গামছাও মেলে। অগ্রণী নিয়ে বাড়ি ফিরতে গোরুর গাড়ীর দরকার হবে।

পুরোহিত আসেন তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে। সারা বছরের মধ্যে এই তিনটি দিনই তাঁর প্রধান আয়। জাগ্রতা দেবী রণমক্ষিনী। সাত আট খানা গাঁয়ের মধ্যে প্রসিদ্ধি তাঁর। পূর্বে ছিলেন মাহুঘের সংসারে, ইট কাঠের মন্দির। এখন আছেন উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসীম আকাশের নিচে এই বটগাছকে আশ্রয় করে করে। সেও এক ইতিহাস।

চরম ভোগের মাঝখানে সেবায়েৎকে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী। —ওরে সংসারের এই কোলাহল আর সঙ্ক হয় না আমার!

সেবায়েৎ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এলেন বহু দূরের এই বটতলায়। সেখানে নতুন করে মন্দির তৈরী হোল।

আবারও স্বপ্ন দেখলেন সেবায়েৎ।

—ওরে বাছা, আবারও কেন বাঁধছিস আমাকে! এসব আমার সয়না।

পরদিন দেখা গেল নতুন মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে। ঝড়, ঝুট্ট কিছুই নাই। সেই থেকে দেবী এইখানেই এই ভাবে আছেন।

এ-কথা সবাই জানে।

অশুকুলের মুখে অক্ষয়ও গুনল এই গল্প। সবার দেখা দেখি সেও অগ্রণী করল।

ছধ রাখবার জন্তে প্রকাণ্ড একটা জালা বসান হয়েছে। চাল, ফল, তরকারীর জন্তু আলাদা আলাদা খোপ। পয়সা রাখবার জায়গাও আলাদা। বটতলার বা পাশে ভোগ রাখবার জন্তু ছাউনী পড়েছে। প্রসাদ বিতরণ হবে খিচুড়ী, ভাজা আর তরকারী। একদিন পরমাশ্রম হবে। প্রসাদ পাবার জন্তে বহুদূর থেকে নৌকা করে ছেলেবুড়ো মেয়ে মন্দ এসেছে। ডাক্তার বস্ত্রি যাদের জবাব দিয়েছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মরতে মরতে তারাও এসেছে। নদীর ঘাটে নৌকা রাখবার আর স্থান নাই।

ঘুরতে ঘুরতে তারা মেলার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। হরেকরকমের মিষ্টির দোকান। এত বড় রংবেরংএর মিষ্টি অক্ষয় এর আগে কখনও দেখেনি। তেলভাজা বাদাম ভাজার দোকানও কম নয়। মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা থেকে লোহার হাতা, বঁটি, দা, কুড়ুল কত সব প্রয়োজনীয় আর অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঠাসাঠাসি। বেতের, বাঁশের জিনিস আছে আর আছে সিগারেট-পান-বিড়ি-শরবৎ-এর দোকান। কেমন গোলাপী, সবুজ জল ভর্তি গ্রাস। একবার দেখলে তেঁটা পেয়ে বসে। অক্ষয়ের বড় ইচ্ছা এক চুমুক খায়। শরবৎএর দোকানে গোপনে আরেক রকমের পানীয়

সরবরাহ করা হয়। যে সন্ধান সকলে জানে না। অল্পকূল অবস্থা জানে কিন্তু শেয়ালের কাছে আঙ্গুর ফলের মত তার কাছে সেটা ছুপ্রাপ্য। গরম বিস্কুটের দোকানে ডিম সিদ্ধ আছে, মাংস আছে। পয়সা থাকলে খাওয়া কত বাবে। নরতে হয়ত মরনা খেয়ে। মেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মড়ক লাগে।

কাঁকা মাঠে আজব মজার তাঁবু পড়েছে। জোড়া মাঝুষ দেখাবে, এক ছাগলের তিন সিং দেখবে, কাটাযুগ্ম কথা বলবে—

আর পাশে সার্কাসের তাঁবু। হাড় জিরজিরে রুগ্ন একটা ঘোড়া বাইরে বাঁধা। ভেতরে নাকি বাঘ বাঁধা আছে। আর আছে কাঠের ঘোড়া, দোলনা—চার পরসা দিয়ে চড়ে বস গ্যাট হয়ে। দড়ি ধরে মালিক ঘুরিয়ে দেবে—বোঁ বোঁ করে ঘুরবে।

অক্ষয় ছুঁচোখ মেলে সব দেখছে আর অবাক বনে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কৌতুহল আর চেপে রাখতে না পেরে বলল অল্পকূলকে আজব মজা দেখাবে না? ঘোড়ায় উঠতি ত চার পরসা।

অল্পকূল তার কথা শুনে বলল : মাইরি আরকি ! যা না, অধিকারীর কাছে গিয়ে বলনা।

তাই বলবে অক্ষয়। এত লোক দেখছে আর তারা দেখতে পাবে না।

দলের ছোকরা একজন চুপি চুপি অক্ষয়কে বলল : তুই বলবি অধিকারীকে তোর কথা শোনবে।

অক্ষয় ঘাড় নেড়ে দিল। সে বলবে অধিকারীকে।

ঘুরতে ঘুরতে এবার তারা যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে ভিড় খুব বেশি। অল্পকূল ভিড়ের মাঝে ঢুকে পড়ল। অক্ষয় এগোতে পারল না। ছেলেদের কে উঁকি মেরে দেখে এসে বলল : জুয়ো খেলতিছে।

তিন চার জায়গাতে জুয়ার আড্ডা বসেছে। আরও বসবে। অল্পকূলের পকেটে পয়সা নাই। বিষয় মুখে সে সকলকে তড়া দিয়ে বলল : বাসায় চল—আর ঘুরতি হবে না!

মাঠের একবারে শেষপ্রান্তে কতকগুলি ছোট ছোট ঘর উঠেছে। সেখানেও অল্প বিস্তার ভিড়। কারা সব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাই দেখছে মজা।

অল্পকূলের আর যেন উৎসাহ নাই। ঘাড়গুজে সে চলেছে।

অক্ষয়ের কৌতুহল তখনও প্রচণ্ড। অল্পকূলকে ডেকে বলল : ওদিকে বাবা না?

ঝুঝতে না পেরে অল্পকূল বলল : কোন দিকি?

অক্ষয় আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল উই যে,—ভিড় হইছে।

অল্পকূল এবার তার কান ধরে বলল : ও-খাল চেনবার বয়স এখনও হইনি তোমার। কাঁজিল বেটা ক'নকার!

অল্পকূল যাচ্ছে আগে আগে। পেছনে ছেলের দল। বয়সে যেটি বড় সে অক্ষয়ের কানে কানে বলল : ওরা কারা জানিস না?

অক্ষয় বড় বড় চোখ মেলে বলল : নাত ?

বড় ছেলেটি মুচকি হাসল। আর সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়া করে হাসল অক্ষয়ের নিবু দ্বিতায়।

একজন আর পাণ্ডিত্য চেপে রাখতে পারল না : ওরা বেবুস্তে।

কে বেবুস্তে ? কিসের বেবুস্তে। বেবুস্তে বলে কাকে ! অক্ষয় ত জানে না। সে শুধু পেছন ফিরে আরও একবার সেই মহাবিস্ময়কর প্রাণীগুলিকে দেখে নিল।

উৎসবে-বাসনে, পুণ্য-পার্বনে-তীর্থস্থানে ওদের না হলে পূর্ণতা আসে না। মার্কাস জুয়া এসেছে, দোকান-পাট বসেছে। ওরাও এসেছে। এসে চালাঘরে সংসার পেতেছে। ছ'দিন বাদে তিন গুটিয়ে যাবে অল্প মেলায়। মেলা ফুরিয়ে গেলে শহরে গণ্ডে ফিরে যাবে। নিত্য নতুন ঘর, নতুন নতুন নাগর। ওদের মোহ নাই কিছুতেই। কলের পুতুল সব। নাচতে বল নাচবে কঁাদতে বল কঁাদবে।

[৮]

ভয়ে ভাবনায় শংকরী চোখের পাতা এক করতে পারল না। নটবর সেই বে ভোরে বেরিয়ে গেছে, রাত অবধিও ফিরল না। খোঁজ করতে পরাশর বেরিয়েছিল। সে ফিরে এসেছে। কোন সন্ধান পায়নি। কোথায় যে গেল ছেলেটা কে জানে ! পুতুনী মেয়েটা ভাল নয়। বেশি আগ্রহ দেখালে আবার সন্দেহ করবে ? সকলের অসাক্ষাতে সেও এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে খোঁজ করে এসেছে কিন্তু অক্ষয়ের খবর কেউ বলতে পারেনি।

মাথার বালিশ একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে। আর আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছে !

তখনও রাত শেষ হয়নি। হঠাৎ শংকরী ধড়মড় করে উঠে দোর খুলে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এলে হারাণ প্রশ্ন করল : অমন করে গিইলি ক'নে ?

শংকরী শ্বাল হেসে বলল : মনের ভিত্তি যেন বলল অক্ষয় আসেছে, তাই—

হারাণ গালাগালি দিতে লাগল : তোর মাথা খারাপ হইছে। পরের ছেলে— তার জন্মি ভাবে ভাবে শরীল নষ্ট করিস কেন !

কেশে বাঁকিয়ে কথাগুলি বলল বটে হারাণ। কিন্তু সেও জানে অস্বাভাবিক এমন কিছু করেনি শংকরী। বড় মায়া বসেছে ছেলেটার উপর তার। নিজের মত করে মানুষ করেছে পরের ছেলেটাকে। হারাণের ভয় নটবরের বিরূপতা। নটবর সাহায্য করে বলে তার সংসারটা টিকে আছে। শংকরীর স্নেহের আতিশয্যে সে তাই প্রমাদ গনে !

পুতুনীর যেন আর কোনো কাজ নাই। দিনের মধ্যে দশবার এসে অক্ষয়ের খোঁজ করে। অক্ষয়কে তারা নুকিয়ে রেখেছে এমনি একটা সন্দেহ তার চোখে মুখে। শংকরীর ইচ্ছা হয় খুব কড়া কথা শুনিতে দেয়। কিন্তু নটবরের ভয়ে বলতে মুখে বাধে।

পরদিনও যখন নটবর ফিরল না তখন পরাশর বেরোল। আরও একটা দিন নটবরের জন্তে সে অপেক্ষা করে বেরোবে ঠিক করেছিল কিন্তু শংকরীর তাগাদায় অস্থির হয়ে সে স্টেশনের দিকে রওনা হোল।

সিংহবাবুদের মোটরলক এ সময় বেলাইনে ভাড়া পাটে। কুদিরমার বটভলার স্বাত্রী অসম্ভব বেড়েছে। বারা কিছু বেশি পয়সা ব্যয় করতে পারে তারা তাড়াতাড়ি পৌছবার জন্তে টিকিট কেটে লক্কে চড়ে বসে।

নটবরের দোস্তু সহদেব চামড়ার পাইকারী মহাজন।

পরশর নটবরের খোঁজ করতে এল তার গদিতে।

—কি বাত্ আছে পোরাশর।

—নটবরদা গেল কেনে, জান? দু'দিন বাড়ি যায় না।

সহদেব হেসে বলল : সে শালা বদমাস আছে। যবে আখন যাবে না।

—কেন হইছে কি?

—আমার কাছে পাওনা ছিল। তাই ওসুল করে মেলায় গেছে—ফুতি টুতি কোরবে।

পরশর ব্যাধ হয়ে প্রশ্ন করল : কোন মেলায়? কুদিরমার বটভলায়?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ তবে আবার কি! বলল মন খারাপ আছে। পুজো-টুজো কোরবে। সব ঝুটা ছায়—শালা ফুতি করনে গিয়া—বলে চোখ মটকে অস্তুতভাবে হাসতে লাগল সহদেব।

পরশর কিছুকণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল : ওর ছেলেটা পলাইয়েছে। খুঁজে পাতিছি না। বড় মুকিলে পড়িছি আমরা।

সহদেব সব শুনে বলল : বহুত খারাপ বাত! তোমিও মেলায় যাও। নটবর আছে। রুপিয়া লেগা?

অগত্যা এই করা ছাড়া উপায় কি! সময়মত নটবরকে খবর দিতে না পারলে সে রাগ করবে। একমাত্র ছেলে তার—

হুটো টাকা সহদেবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পরাশর গিয়ে লক্কে উঠল।

[ক্রমশ]

কর্কটরোগ পরাজয় বরণ করিবে

ডি হাভোভিৎস্কি

প্রাচীনকাল হইতে মানুষের কর্কট রোগের সহিত পরিচয় আছে। মিশরের পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাহিত চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন মমির দেহে বৈজ্ঞানিকরা নারায়ক কর্কটের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন। সেই অর্বুদের আক্রমণে বহু 'ফ্যারাও'-এর অকালমৃত্যু ঘটে। চারহাজার বছর আগেও ঠিক আভিকার দিনের মত লোক কর্কট রোগে আক্রান্ত হইত।

। প্রথম প্রচেষ্টা ।

কর্কটের মূল কারণ সম্পর্কে কত তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাই যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণের সহিত ভূড়িত রহিয়াছে ইংরাজ অস্ত্রো-পচারক পি পটের নাম। ১৭৭৫ সালে তিনি চর্মের কর্কট রোগের ব্যাখ্যা করেন। চিননির ঝাড় দারদের মধ্যে ঐ রোগ প্রায়ই দেখা যাইত। রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য বহু দেশের গবেষকরা জীবজন্তুর দেহচর্মের উপর কয়লার ভুসা ও আলকাতরা লেপিয়া নারায়ক কর্কট জন্মাইর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল সেই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। দেড়শত বৎসর পরে যামাগিভা ও ইফিকাভা নামে দুইজন জাপানী বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে কর্কট সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। দেড় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা এক নাগাড়ে সপ্তাহে দুইবার করিয়া শশকের চর্মের উপর আলকাতরা ঘসিয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমে সেই জায়গার লোমগুলি খসিয়া পড়িতে লাগিল। ২।৩ মাস পরে স্থানীয় চর্ম স্থূল হইল এবং কতগুলি আঁচিল দেখা দিল। সেই আঁচিলগুলি শেষপর্যন্ত অর্বুদে রূপান্তরিত হইল।

সেই পরীক্ষা হইতে বুঝা গেল যে কর্কটের অর্বুদ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ওঠে এবং সেগুলির আবির্ভাবের পূর্বে প্রাক্কর্কট অবস্থা আসে।

জাপানী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বহু বৎসর পরে কুক ও কেনেওয়ে নামে দুইজন ইংরাজ রাসায়নিক নিজেদের পরিকল্পিত বর্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা গবেষণাগারে আলকাতরা হইতে এমন এক বিশুদ্ধ রাসায়নিক হাইড্রোকার্বন (উদ্ভান ও অঙ্গারের যৌগিক পদার্থ) তৈয়ারি করিলেন যাহা জানোয়ারের দেহে অর্বুদ সৃষ্টি করিতে পারে। সেই পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনের নাম দেওয়া হইল 'ক্যান্সারোজিন' অর্থাৎ কর্কটজনক পদার্থ।

। মানুষের যকৃতে ক্যান্সারোজিনের অস্তিত্ব ॥

গবেষণা চলিতে লাগিল। আচার্য এল. এম. শাবাদের পৌরোহিত্যে একদল সোবিয়েৎ গবেষণাকর্মী প্রতিপন্ন করিলেন যে মানুষের দেহের মধ্যে যে সকল ক্ষারীয় অম্ল ও অন্তঃপ্রাবী যৌনরস উৎপন্ন হয় বহু কর্কটজনক পদার্থের সহিত সেগুলির বিশেষ কোন গুণগত পার্থক্য নাই।

সুতরাং হয়ত বা কর্কটরোগগ্রস্ত লোকের দেহের মধ্যে সেই ধরনের পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে ?

কর্কট রোগে যুত এক ব্যক্তির যকৃৎ লইয়া শাবাদ ও তাঁহার সহকর্মীরা গবেষণা আরম্ভ করিলেন। নিভারের টিসুগুলিকে খেঁতো করিয়া তাহাতে বেঞ্চল ঢালা হইল। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কর্কটজনক পদার্থগুলি বেঞ্চলের মধ্যে সুন্দরভাবে গলিয়া যায়। তারপর যকৃৎ হইতে দ্রবীভূত পদার্থসহ বেঞ্চল দ্রব্যটি নিম্ন তাপে পাতন করার পর যাহা পাওয়া গেল তাহা ইঁহরের চর্মের নিম্নস্তরে সূচের সাহায্যে প্রয়োগ করা হইল।

প্রায় এক বৎসর পরে আচার্য শাবাদ আসিয়া ইঁহরগুলিকে দেখিতে গেলেন। একটির গায়ে হাত বুলাইতে গিয়া টের পাইলেন এক ভায়গায় তাহার চামড়ার নিচে কি যেন ছোট একটা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

উহা কি সত্যই অর্বুদ।

নিজের চোখকে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু দ্বিতীয়টির দেহেও এইরূপ একটি দানা দেখা গেল। তৃতীয়টির দেহে কিছু পাওয়া গেলনা। কিন্তু চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ...। নাঃ সন্দেহের আর অবকাশ নাই। সেগুলি সত্যই অর্বুদ, সেই ধরনের অর্বুদ যাহা বৈজ্ঞানিকরা ক্যান্সারোজিনের সাহায্যে উৎপত্তি করিতে শিখিয়াছেন।

মারাত্মক অর্বুদের অন্যান্য মূলের সম্ভাবন কিছুদিন পরে পাওয়া গেল। সেগুলি হইল রক্তন, অতিবেগুনি ও রেডিয়াম রশ্মি, এমনকি সৌররশ্মি পর্যন্ত।

তখন বৈজ্ঞানিকরা দেখিলেন যে কর্কটজনক পদার্থ ছাড়া অন্য কারণেও জীবদেহে কর্কট হইতে পারে। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা করা যায় কিরূপে। প্রশ্নটির স্পষ্ট জবাব পাওয়া গেল না।

॥ ভাইরাস ও কর্কটরোগের সমস্যা ॥

জীবদেহ হইতে আলপিনের মাথার মত ছোট একখণ্ড কলা বা টিসু লইয়া কোন পুষ্টিকর মাধ্যমের মধ্যে রাখিলে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উহা বাঁচিয়া থাকে। পুরাতন কোষগুলির স্থানে নূতন কোষের উৎপত্তি হয় এবং কলাটি বাড়িতে থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা যুক্তি দিলেন যে কর্কটজনক পদার্থগুলিই যদি কর্কটের মূল কারণ হয় তাহাইলে ছোট শিশির মধ্যে কোনো কলাকে জীয়াইয়া রাখিলে তাহাতে অর্বুদের উৎপত্তি হওয়া উচিত। এ. ডি. তিমোফিয়েভস্কি এবং এস. ডি. বেনেভোলেনস্কায়ানায়ে দুইজন সোবিয়েৎ বৈজ্ঞানিক মিশিলকোলানথিন নামে একটি অত্যন্ত তেজাল কর্কটজনক পদার্থের সাহায্যে এক বৎসর ধরিয়া যোজক কলার মধ্যে অর্বুদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেন।

তারপর বৈজ্ঞানিকেরা অন্য এক রকমের পরীক্ষা আরম্ভ করেন। একটি শিশির মধ্যে ইঁদুরের পয়ঃপ্রস্রার কৰ্কটের ভাইরাসের সহিত ইঁদুরের দেহের একখণ্ড কলা রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষাও ব্যর্থ হইল। কোষগুলির মধ্যে কোন মারাত্মক গঠন প্রকাশ পাইল না।

তৃতীয় পরীক্ষায় মিথিল কোলানথ্রিন ও ভাইরাস মিশাইয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল কৰ্কটজনক পদার্থ ও ভাইরাসের প্রভাবে স্বাভাবিক কোষগুলির গঠন শিশির মধ্যে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। দেখা দিল অৰুদ।

কিন্তু প্রশ্ন হইল কোন্ বস্তুটির প্রাধান্তে কৰ্কটের উৎপত্তি হইল, মিথিল-কোলানথ্রিনের না ভাইরাসের? আর ভাইরাসের ভূমিকাই বা কিরূপ?

। বিজাতীয় প্রোটিন ।

যে কোন জীবদেহের কোষের মত ভাইরাসেরও প্রধান উপকরণ হইল প্রোটিন। কিন্তু ভাইরাসের প্রোটিন ও জৈব প্রোটিনের গঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাইরাসের প্রোটিন জীবদেহের মধ্যে এক বিজাতীয় পদার্থ। সেজন্য অৰুদের মধ্যে ভাইরাস যদি ছদ্মবেশেও উপস্থিত থাকে (যাহার জন্য ভাইরাসের ব্যাধিপ্রদ রূপ প্রকাশ পায়না) তাহা হইলেও উহা বিজাতীয় প্রোটিন হিসাবে ধরা পড়িবে।

সোবিয়ৎ বৈজ্ঞানিক এল. এ. ভিলবার এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি বাহির করিয়া তাহার দ্বারা অৰুদের মধ্যে বিজাতীয় প্রোটিনের অস্তিত্ব দেখাইতে সমর্থ হন।

আজ একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে অৰুদের মধ্যে বিজাতীয় প্রোটিন থাকে। তথ্যটি শুধু তত্ত্বের দিক হইতেই যে চরুরী তাহা নহে। উহার ফলিত তাৎপর্যও অত্যন্ত অধিক।

। কৰ্কট-বিরোধী অনাক্রম্যতা ।

কৰ্কটের একটি কু-বৈশিষ্ট্য আছে। কখনও কখনও সাফল্যপূর্ণ অস্ত্রোপচারের দুই, তিন এমনকি পাঁচ বৎসর পরে যখন মনে হয় যে অৰুদটি সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়া গিয়াছে তখন হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে নূতন করিয়া এক বা একাধিক কৰ্কটের আবির্ভাব হইয়াছে হয়ত দেহের অন্য কোন একটি অঙ্গে বা যন্ত্রে। গোড়া হইতেই যুদ্ধং দেহি। কিন্তু লড়াই প্রথমবারের লড়াই অপেক্ষা অনেক বেশি কঠিন।

দেহকে এই রোগের পক্ষে অনাক্রম্য করিয়া তোলা, রোগের পুনরাবির্ভাব নিবারণ করা কি সম্ভব?

যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা অৰুদের মধ্যে বিজাতীয় প্রোটিনের অস্তিত্বের কথা জানিতেন না, ততদিন অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করার চেষ্টার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই ছিল না। আসল কথাটা এই যে অনাক্রম্যতা জিনিসটি মুখ্যত জীবদেহের উপর বিজাতীয় প্রোটিন প্রতিক্রিয়ার সহিত জড়িত, তাহার নিষেদের প্রোটিনের প্রতিক্রিয়ার সহিত অনাক্রম্যতার কোন সম্পর্ক নাই। যদি বিজাতীয় প্রোটিন না থাকে, তাহা হইলে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু বিজাতীয় প্রোটিন যখন পাওয়া গিয়াছে তখন অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করাও সম্ভব। কিন্তু জীবদেহের মধ্যে কি করিয়া তাহা করা সম্ভব হইতে পারে?

এল, এ, গিলবার, ছেড, এল, বাইদাকেভা, আর, এম, রাদতিকভকায়া প্রমুখ সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা এই দুর্ভাগ্যজনক সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। কর্কট-কোষ হইতে তাহারা অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রোটিন নিকাশন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জীবজন্তুর চর্মের নিম্নস্তরে কয়েকবার প্রোটিন সূচের সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে-ধরনের অবুদ হইতে সেই প্রোটিন লওয়া হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই জীবজন্তুগুলি সেই ধরনের অবুদের দ্বারা অক্রান্ত হয়না অর্থাৎ তাহারা অনাক্রম্য হইয়া ওঠে।

। ছুরি, রজনরশ্মি বা রেডিয়ানের সাহায্য না লইয়া ।

তারপর এক ব্যাপার ঘটিল মাস ছয়েক পূর্বে। ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের পরীক্ষা-মূলক রোগ নির্ণয় ও রোগ নিদান বিভাগের ক্লিনিকের হাসপাতালে আনাকে এক রোগী দেখান হয়। জানালার ধারে লোকটিকে অস্তিম শয্যায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছিল না।

আচার্য কন্বলটি অল্প একটু উঠাইলেন। রোগীর ঘাড়ে ডান দিকে নবজাত শিশুর মাথার মত আয়তনের একটি বিরাট অবুদ প্রায় প্রাবাস্থিটি ঘেসিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে।

লোকটির অণ্ডকোষে কর্কট (সেমিনোমা) হইয়াছিল। চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটায় কর্কট কোষগুলি লসিকানালীর মধ্য দিয়া দেহের অন্তান্ত যন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। এই ভাবে রোগজীবাণু প্রাবাদেশের লসিকাগ্রন্থিতে পৌছবার ফলে সেখানে নূতন অবুদ গজাইয়াছে। এই সেদিন পর্যন্ত এইরূপ রোগী সম্পর্কে কোনরূপ আশা পোষণ করা হইত না।

কয়েক মাস পরে বসন্তকাল আসিয়া পড়িল। একদিন সকালে আমি ইন্সটিটিউটে গেলাম। ওয়ার্ডের দরজাটি দালানের দিকে খোলাই ছিল। দরপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি শেষের বিছানাটি শূন্য। ভাবিলাম লোকটি “মরিয়া গিয়াছে”।

হঠাৎ কেহ আমার কাঁধে হাত দিল। ঘুরিয়া তাকাইয়া আমি অশ্চর্য হইয়া গেলাম। এ তো সেই লোকটি। এই তো সেদিন ঐ অস্তিম শয্যায় পড়িয়া ছিল। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হইয়াছে। ও হ্যাঁ, অবুদটি। কই সেটির তো চিহ্নমাত্রও নাই।

রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হয় নাই এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা তাহার কর্কট কলা পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সার্কোলিসিন নামে এক নূতন রসায়নের সাহায্যে কর্কট নির্মূল করা হইয়াছে।

এক ব্যাপক ও সুদীর্ঘ গবেষণার পরিণতি হইল সার্কোলিসিন।

। বিস্ময় হল ।

বিগত পঞ্চম দশকেই সন্নিহিত বাস্প হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন ক্লোরোথিলামিন রসায়নের রোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা লইয়া কতিপয় ক্লিনিকে পরীক্ষা চলিতেছিল। সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ একটি ঔষধ তৈয়ারি হয়। তাহার নাম এস্বিলিন।

কিন্তু পরীক্ষায় হউক বা ক্লিনিকেই হউক এম্বিলিনের ক্রিয়ায় অর্বুদ গলিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত কোথাওই পাওয়া যায় নাই। এমন কি রক্ত বা লসিকার রোগেও রোগের গতিরোধ করা ছাড়া এম্বিলিন আর কিছুই করিতে পারিল না।

এবার পরীক্ষকদের কর্তব্য হইল এমন একটি রাস্তা বাহির করা যাহা দিয়া বিষটি সরাসরি অর্বুদের মর্মভেদ করিয়া উহাকে ধ্বংস করিবে। প্রোটিনের “ইট ও খল” অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিনিক অ্যাসিডকে বিষের নাভিশক্তি হিসাবে বাছিয়া লওয়া হইল। প্রতিটি “ইটের” সহিত বিষাক্ত হল হিসাবে একটি করিয়া এম্বিলিনের “মলিকিউল” বা অণু লাগাইয়া দেওয়া হইল। এবার অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাহায্য লইয়া এম্বিলিন সোজা কর্কট কোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে গুলিকে মারিয়া ফেলিল কিন্তু দেহের অন্য কোন যন্ত্রের ক্ষতি করিল না।

এইভাবেই হয় সার্কোলিসিনের উৎপত্তি।

“ইঁহুরের কর্কট বিষ নং ৪৫” নামক মারাত্মক অর্বুদের বিষ অনেকগুলি ইঁহুরের গায়ে ফুঁড়িয়া দেওয়া হইল।

তিন চার বার সার্কোলিসিন ফুঁড়িয়া দিবার পরে প্রত্যেকটি ইঁহুরের দেহের সমস্ত অর্বুদ গলিয়া গেল। একটি ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হইল না। এই মৌলিক প্রক্রিয়া ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

অনুরূপ পরিকল্পনা অনুসারে সার্কোলিসিনের সঙ্গে সঙ্গে ডোপান নামে আর এক প্রকার রসায়ন প্রস্তুত করা হয়।

একটি স্ত্রীলোক রক্তের কর্কট বা মাইলয়েড লিউকিমিয়া রোগে ভুগিতেছিল। রক্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে যেক্ষেত্রে চার হাজার হইতে আট হাজার শ্বেত-কণিকা থাকা উচিত সে ক্ষেত্রে দুই লক্ষ শ্বেতকণিকা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটির অবস্থার মধ্যে আশা করিবার মত কিছু ছিল না। তাহাতে ডোপান দেওয়া হইল, ১৮ ঘণ্টা অন্তর একটি করিয়া বড়ি। দুই সপ্তাহ পরে শ্বেতকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক হইয়া গেল এবং স্ত্রীলোকটির প্রাণরক্ষা হইল।

রাষ্ট্রীয় হার্জেন ক্যান্সার ইন্সটিটিউটে আমায় কতকগুলি তালিকা দেখান হয়। অংক জিনিসটি বড়ই বেয়াড়া। সেগুলিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। দেখিলাম শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে চর্ম কর্কটের রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছে। রোগিনী যদি রোগের প্রথম দিকেই চিকিৎসকের সাহায্য ভিক্ষা করে তাহা হইলে শতকরা ৮০টি ক্ষেত্রে জরায়ুর প্রীবাদেরের কর্কট সারিয়া যায় এবং রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটনা। পয়ঃপ্রস্থির কর্কটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। এমনকি পাকস্থলীর কর্কটের মত কঠিন রোগেও যেসকল রোগীর উপর গোড়ার দিকেই অস্ত্রোপচার করা হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বহু বৎসর জীবিত থাকে।

কর্কট রোগ সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিবে তাহাতে বিশ্বমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে এবং যে সকল ক্রান্তিহীন বৈজ্ঞানিক বিপুল অধ্যবসায় লইয়া অনুসন্ধানকার্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন তাহারাই তো আমাদের ‘গ্যারান্টি’।

সোবিয়েৎ দেশের সৌজন্যে

যাত্রা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র

আশীষ বর্মণ

যাত্রা হত খোলা জায়গায়, চারিদিকে বসত দর্শক। দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে দিয়েই একদিকে একটা সংকীর্ণ রাস্তা রাখা হত, শিল্পীদের মধ্যে যাতায়াতের জন্তে। রাস্তা যে শুধু মধ্যে আসার জন্তেই ব্যবহৃত হত তা নয়, এই পথ বেয়ে আসতে আসতেই শিল্পী অভিনয় আরম্ভ করতেন। আর মঞ্চটি ঠিক রঙ্গমঞ্চ নয়, আসলে ভিড়ের ভিতরে একটুখানি খোলা জায়গা মাত্র। সেই খোলা জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়েই শিল্পীকে অথবা শিল্পীদের, একক দৃশ্যে অথবা মিলিত দৃশ্যে, আসন্ন যুদ্ধের ভয়ালতা, ভয়াল অরণ্যের নৈঃসঙ্গতা, বা বসন্তশোভা মর্মেরে চাঁদিনীর বর্ণনা দিয়ে অভিনয় করতে হত। আসে-পাশে দর্শকের ভিড়টুকু বাদে সব কাঁকা, পিছনে দৃশ্যসজ্জা বা স্টেজে ফাণিচার কিছুই থাকত না, স্মৃতরাং যাত্রা লিখিয়েরা এ অভাবমোচন করতেন লেখার মধ্যেই পরিবেশের বর্ণাটুকুও গাড়স্বরে প্রকাশ করে। যাত্রার শিল্পীরা সেই বর্ণনা, ঘটনাগত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই, যাত্রাস্থানে অভিনয় মারফৎ জীবন্ত করতেন। হয় তো গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোন দৃশ্যবস্তুর আরম্ভ, নায়িকাকে নায়ক তাদের পালিয়ে আগা নিরালা বনের স্বরূপ বোঝাতে ব্যস্ত, তাই আরম্ভ হল : এই ভয়াল অরণ্যানি, শত শত স্বাক্ষ লতাগুল্মে রুদ্ধ, দিবাভাগেও অন্ধকার। সূর্য পশে না হেথায়, হেথায় মনুষ্য নামক জীব নাই, আছে শ্মাপদসঙ্কুল ভয়াল জীবজন্তু, ব্যাস্র, ডল্লুক, সর্প, বন্যবরাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিনেতা হাত-পা নেড়ে, মুখেরভঙ্গীতে, চোখের চাউনি মারফৎ, গলারস্বরে এই অল্পপস্থিত ভয়াল অরণ্য সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টিকার্যে শুধু যাত্রা লিখিয়ের বর্ণনাই কাজে লাগে না, অরণ্য এবং তার ভয়ঙ্কর রূপকে দর্শকের কাছে সত্য করে তোলার জন্তে দরকার হয় শিল্পীর দক্ষতাও। এই দক্ষতা এবং লেখকের বর্ণনা দুয়ে মিলে দর্শকের মনে, কল্পলোকে, প্রাণপায় সত্যিকার বনাঞ্চল ; নায়ক নায়িকার সেই গা-কাঁপানো পরিবেশের মধ্যে কী অসহায় অবস্থা তা তারা আপন আপন শিহরিত শ্বাসযুতে উপলব্ধি করতে পারেন। অলীক কল্পনা, যা পরিবেশে নেই তাইই, মানুষের অনুভবে সত্য হয়ে ওঠে, যাত্রা জন্মে যায়। রাত কখন নিঃসাড়ে ঘোমটা খোলে, পূরবীর ক্ষীণ আলো দেখা দেয় চিকণ আকাশে, ভোরের তারারা সজল স্থিত চোখে চায়।

নাট্যের বিষয়বস্তুকে শুধু মূর্ত করা নয়, ঘটনা ঘটেছে যেখানে সেখানকার পরিবেশ রচনাও যাত্রার শিল্পী ও রচয়িতাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে তাদের মূলত দুটি বাধা, একটি খোলা জায়গায়, দৃশ্যসজ্জা ও অগ্ন্যস্ত্র সরঞ্জামবিলা শিল্পরূপায়ণ; দ্বিতীয়টি দর্শকদের কোনো নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত (পারস্পেক্টিভ) এর অভাব। দর্শকরা দেখছেন চারিদিক থেকেই, কোনো বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে নয়। এই দুই বাধা যাত্রার শিল্পীর কাটালেন বর্ণনার দীর্ঘতা ও অভিনয়ের আতিশয্যে। কাঁকা জায়গায় যাত্রা, দর্শক সর্বত্র ঘিরে, সেখানে বর্ণনার দৈর্ঘ্য ও অঙ্কুর এবং অভিনয়ের আতিশয্য নত্ন হয়ে চোখে-কানে লাগে, মনে হয় স্বাভাবিক। এটা হয় কাঁকাস্থানে অভিনয়, দৃশ্যসজ্জাহীন পরিবেশ ও দর্শকদের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের অভাবের দরুন। এই অভাববোধই দূর হয় বর্ণনার অতিকথনে ও দীর্ঘতায়, অভিনয়ের আতিশয্যে। দক্ষ অতিকথন বা আতিশয্যেই সৃষ্টি করে অনুপস্থিত পরিবেশের অনুভব, বলা যায় উপস্থিতির বোধ বা মায়া; এবং পরিপ্রেক্ষিতের অপ্রয়োজনীয়তা। মহাশূন্য আকাশের তলায় অতিরিক্ত হাত-পা নাড়া ও বাক্বাহল্য তাই আর অতিরিক্ত হয়ে বাজে না, শিল্পসৃষ্টির মায়ায় মনে স্পর্শায় যাত্রার স্বভাবগত স্বাভাবিকতায়।

শহরে থিয়েটারে এসে কিন্তু এ অতিশয্য হাক্কা হল, বহুলাংশে কমে গেল। কেননা থিয়েটার পেল তার পরিবেশ, থিয়েটার দর্শক তাঁদের পরিপ্রেক্ষিত। স্টেজের পিছনে দৃশ্য অনুযায়ী ঝুলল দৃশ্যপট; বনভূমি কিংবা হয় তো প্রাসাদের অন্তর্ভাগ। স্টেজের উপরেও উঠল খাট-পালক-চেয়ার টেবিল—এমনকি গাছ-গাছালি সমেত বনাঞ্চলের একাংশ অথবা ঢেউ খেলানো সমুদ্র ও নৌকা। বিদেশের স্টেজে তো ঘোড়া মোটর সবই ছোট্টে, কামানও দাগা হয়, কয়েক'শ লোক যুদ্ধও করে রীতিমত। আলোক ব্যবহারের নৈপুণ্যে দিনরাতও স্পষ্ট হল, ঝড়ঝটির ঝিলিক বা আকাশের গুরু গুরু দামামা, করাল রাত্রি কিংবা শুচি প্রভাত আলোক-যন্ত্রের সাহায্যেই প্রাণবন্ত হতে থাকল। ফলে, পরিবেশ যেহেতু প্রায় রচিত অবস্থাতেই পাওয়া গেল, মঞ্চ রইল না শুধু একফালি কাঁকা জায়গা, বরঞ্চ দৃশ্য অনুযায়ী বদলাতে থাকল তার ঠাট ও চমক্-চামক—নাট্যকারের দায়িত্ব ভিন্ন হল যাত্রা রচয়িতার থেকে, অভিনয়শিল্পীরও অভিনয়অঙ্গিক বা ষ্টাইল। থিয়েটার যত আধুনিক হতে থাকল, আপন স্বরূপ তার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল ততো—যাত্রা থেকেও সেই পরিমাণে পৃথক শিল্পমাধ্যমে সে নিজস্ব রূপ নিল। তাই নাট্যকার তাঁর চরিত্রের সংলাপে কখনো ডুইংক্রমের ফাণিচার কটা অথবা ঝড়-ঝটির হুর্যোগভাঙা রাতের দীর্ঘ বর্ণনা দেন না। যেটুকু দেন তা চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থা অর্থাৎ ভয়ভাবনা প্রকাশের অঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়, তার বেশি নয়। কারণ সেটা দর্শক চোখেই দেখতে পান, সংলাপে তার ফিরিস্তি বাহল্য ও ফলে হাস্যকর। এক কথায় যাত্রার অভিনয়শিল্পী ও রচয়িতাকে পরিবেশকে প্রাণময় করার যে পদ্ধতি ও অবশ্য-করণীয় দায়িত্ব নিতে হয়, থিয়েটারে সে-দায়িত্ব নাট্যকার ও অভিনয় শিল্পীর হাত হতে অন্তত মুক্ত হয়েছে। নাট্যকার ও অভিনয়শিল্পী তাই, থিয়েটারে, ঘটনা ও বিষয়বস্তুর ক্রমপরিণতি এবং চরিত্রগুলির স্ব স্ব চরিত্র রূপদানেই মগ্ন। পরিবেশ যথার্থ করার ভার মূলত অগ্রবিভাগের—দৃশ্যপট আঁকিয়ের, শিল্পনির্দেশকের,

আলোকসম্পাতকের এবং সর্বোপরি সমস্ত নাটকের দায়িত্ব যার, অর্থাৎ পরিচালকের। থিয়েটারেই হল দর্শকদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে দেখার বন্দোবস্তও, যাকে বলা যায় একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই নাট্যাভিনয় দেখার সূচনা। বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই যে শুধু দেখার সূচনা হল তা নয়, অন্তর্গত শুধু রঙ্গমঞ্চটুকুই দৃষ্টির সামনে রইল, খোলামেলা সমস্ত প্রকৃতি নয়। এই বিশিষ্ট স্থান থেকে দেখা এবং কেবলমাত্র বিশিষ্ট স্থানটুকুই দেখতে পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হল নাটক বহির্ভূত অন্তর্গত সাহায্য পরিবেশ রচনার প্রথা, অর্থাৎ স্টেজের বিভিন্ন আয়োজনাতি। শিল্পের এই প্রগতির প্রভাব যেমন পড়ল নাট্যকারের উপর তেমনি থিয়েটার পরিবেশন করার অন্য আঙ্গিকের উপরও। থিয়েটারের অভিনয় গেল পাণ্টে, বাধ্যত; কেননা স্টেজের উপর উঠে নায়ক যদি হঠাৎ হাত পা নেড়ে সাড়সুরে শুরু করে : “এই যে এতগুলি ল্যাজারাসের-এর আরাম কেদারা, চারটি টেবিল আটটি চেয়ার, এই যে ফ্যানিচারের ময়ূর চিকন পালিস, এই যে.....” নিশ্চয়ই তহলে নায়কের রঙ্গাভিনয় শেষ হবার আগেই স্টেজে দন্দাদন্ড জুতো পড়বে। অথচ এই আড়ম্বর ও বাহ্যিকেরই অবশ্য প্রয়োজন যাত্রায়, যাত্রাকে সত্য করে তোলার জন্যেই। থিয়েটারে স্টেজ, দৃশ্যপট, শিল্পনির্দেশক, আলোকসম্পাতক এবং দর্শকের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার ব্যবস্থা হয়। স্বভাবই প্রয়োজন হল চরিত্রদের অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক চিত্রায়ণ। তাদের সংলাপ, হাবভাব ব্যবহার, সবেতেই সংযমের বোধ স্পষ্ট করার দরকার টের পাওয়া গেল। হলও তাই, থিয়েটার পরিবেশনায় দেখা দিল স্বাভাবিকতার দিকে ঝোঁক; নাটকেই কেবল সম্ভবমত অতিকথন ত্যাগ নয়, অভিনয়ের ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃতভাবে আতিশয্য বর্জন করল। অভিনয়ে আতিশয্য থিয়েটারে অবশ্য সম্পূর্ণ বর্জন করা কঠিন এবং ফলে অসম্ভব, কেননা হাজার দর্শকের কথা মনে রাখতে হয়। মনে রাখতে হয় যে থিয়েটারের ভিতর কিছু সংখ্যক দর্শক যারা একেবারে সামনে বসে আছেন তাঁরা ছাড়া বেশিরভাগ দর্শকেই আছেন স্টেজ থেকে অনেকটা দূরে। তাঁরা অভিনয় শিল্পীদের মুখের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি, শরীরের সামান্য অর্থময় ব্যঞ্জনা, মুহূর্তের চকিতে মেলানো দ্রব্য আবেগের ছাতি, দূর থেকে ধরতে পারেন না, চোখ এড়ায়। ফলে থিয়েটারের পরিবেশনা এবং অভিনয়, তুলনায় স্বাভাবিকতার দিকে ঝুঁকলেও, মানানসই অতিশয্য গ্রহণ করতে বাধ্য। একই কারণে, অর্থাৎ যেহেতু মুখের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও শরীরের অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি—যেমন হাতের অঙ্গুলের মুহূর্ত কম্পন বা জুতোর পেরেক ফোটান প্রায় অদৃশ্য যন্ত্রণার প্রকাশ, দূর থেকে ধরা যায় না বলে নাটকে পাত্র পাত্রীর মনের অথবা শরীরের ভাব প্রকাশে সংলাপ ব্যবহার করতে হয়। চরিত্রের পায়ে পেরেক ফোটা এবং তার যন্ত্রণা সংলাপ মারফৎই মূলত দর্শককে জানানোর উপায় থাকে; সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে নয়। দর্শকদের থেকে স্টেজের দূরত্বের এই বাধার জন্যেই থিয়েটারে সংলাপের উপর ঝোঁক থাকে বেশি এবং অভিনয় পদ্ধতিতে খানিক আতিশয্য। এই অভিনয়ে আতিশয্যের সাহায্য নিয়েই নায়কের পায়ে জুতোর পেরেক ফোটান দৃশ্য থিয়েটারে দর্শককে দেখাতে হয়; দেখাতে হয় বেশি ঝুঁড়িয়ে হেঁটে, আঃ-উঃ করে,

কথা বলে । শুধু চোখের সামান্য বেদনার আভাসে, নাকের ও মুখের মধ্যে যন্ত্রণার একটা সূক্ষ্ম টানা কুঞ্জন নায়কের জুতোর গীড়ন থিয়েটার অর্থময় ও আবেগবহ করে তোলা অসম্ভব । দর্শকে দূরত্বের দরুন ধরতেই পারবে না এমন সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ । কাজেই, থিয়েটারে, বাস্তব ও সম্ভাব্য ঘটনাগুলিকে রূপায়ণের সময় কিছুটা নাটকীয় করতে হয় ; এই নাটকীয় বা অতিরঞ্জিত আকারেই নাট্যাভিনয়ের আবেগ দর্শক মনে চারানো সম্ভব ।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গিয়ে কিন্তু কথাটা আর খাটে না । চলচ্চিত্রে যদি দেখা যায় নায়কের পায়ের যন্ত্রণা সে অতিরিক্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কথা বলে, হাত নেড়ে প্রকাশ করছে তাহলে তৎক্ষণাৎ মনে হর ভাঁড়ামি হচ্ছে । বাড়াবাড়ি লাগে ঘটনাটা, এবং যে মুহূর্তে বাড়াবাড়ি লাগে সেই মুহূর্তেই দৃশ্যের তাৎপর্য হারায় । দৃশ্যটা হয় তো, ধরা যাক, গরীব নায়কেয় চাকুরীর উমেদারী করতে যাওয়ার বা ইণ্টারভিউয়ের । নায়কের পায়ে লাগছে মেরামতি করা ছেঁড়া জুতোর পেরেক অথচ যন্ত্রণা যাতে প্রকাশিত না হয় তার চেষ্টাতেই সে ব্যাকুল । একদিকে এই যন্ত্রণার আভাস আর অন্যদিকে তার আত্ম-গোপনের চেষ্টা সূক্ষ্ম, ছোটখাটো চিত্রময় বর্ণনার সাহায্যেই চলচ্চিত্রে সার্থক হয় । অতিরিক্ত খোড়ানো, বাক্বাহলা, বা থিয়েটার-ঘেসা অভিনয়ে জিনিসটার অন্তর্নিহিত বেদনা ব্যর্থ হয়ে যায় । কিন্তু কেন ? থিয়েটারে যা চলে সিনেমায় তা অচল কোন্ হিসেবে ?

হিসেবটা দু দিকের । এক হল চলচ্চিত্রদর্শকের পরিপ্রেক্ষিতের আর দ্বিতীয় হল সিনেমামাধ্যমের ভিন্ন আঙ্গিকের । চলচ্চিত্রদর্শক সিনেমাগৃহে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কেবলমাত্র যেটুকু তাকে সামনের পর্দায় দেখানো হচ্ছে শোনানো হচ্ছে (শোনানোর ব্যাপারটাও মনে হয় পর্দা থেকেই) সেটুকুই দেখতে শুনতে পান, তার এক চিলতে বেশি দেখা-শোনা তার ক্ষমতার বাইরে । সারা পর্দা জুড়ে যদি দেখানো হয় একটা পা, তিনি তাই দেখবেন, যদি দেখানো হয় একটা চোখ, তো তিনি তাই দেখবেন এবং যদি দেখানো হয় হাজার-হাজার সৈন্যদের যুদ্ধ তাহলেও তিনি তাই দেখবেন । অর্থাৎ সিনেমায় দর্শক কি দেখবেন না দেখবেন, কোন্ দেখার-শোনার জিনিসটায় কোন দৃশ্যে বেশি ঝোঁক দেওয়া হবে, সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত করেন অলঙ্কে পরিচালক, সিনেমা দর্শক নিজে নন ।

কিন্তু কি করে করেন নির্ধারিত অলঙ্কে পরিচালক ব্যাপারটা ? করেন সিনেমাআঙ্গিকের সাহায্যে, অর্থাৎ সিনেমা তোলার টেকনিকের হাত ধরে । সিনেমায় তিনিই ঠিক করেন কোন্ বিশেষ দৃশ্যের কোন্ বিশেষ ছবিটি তিনি বড় বা ছোটো করে লোকের চোখের সামনে উপস্থিত করবেন । সেটা ঠিক করেই তিনি লং শট, মিড শট, ক্লোস শট নেন, অথবা দরকার মত ফুল শট মিড ক্লোস, বিগ ক্লোস-আপ নিলেন তিনি একটা চোখের, দর্শক সারা পর্দা জুড়ে দেখতে পেলেন শুধু চোখ, চোখের ক্ষীণতম শিরাগুলি পর্যন্ত প্রায় । ফল দাঁড়ালো এই যে, সে-চোখের সামান্য কম্পনেরও যদি কোনো তাৎপর্য থাকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাহলে সে তাৎপর্য তখনই প্রত্যেকটি দর্শকের দৃষ্টিতে ধরা পড়তে বাধ্য—দর্শক সিনেমাগৃহে পর্দা থেকে যতই দূরে থাকুন । আর যেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল অমনি অন্তর্নিহিত বস্তুব্যাও দর্শকের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, বাক্য বিনেই ।

থিয়েটার থেকে সিনেমামাধ্যমের এই পার্থক্যের দরুনই, শিল্পবোধসম্পন্ন সিনেমা পরিচালক, কখনোই গরীব নায়কের পায়ের যন্ত্রণা থিয়েটারের আতিশয্যে (যেটা থিয়েটারে প্রয়োজনীয়) সিনেমায় রূপায়িত করবেন না। তিনি সূক্ষ্ম ও চিত্রময় বর্ণনার সাহায্য নেবেন বক্তব্য ও আবেগকে চারিত করার জন্যে। দৃষ্টবিশেষে হয় তো দেখা যাবে নায়কের জুতোশুদ্ধ পায়ের ক্রোস শট, তার পায়ের ঈষৎ বিব্রতভঙ্গী; তারপরে ইন্টারভিউ বোর্ডের ডিরেক্টরদের ফুল শট, তাঁদের কোনো প্রশ্ন; নায়কের মুখের ক্রোস শট, প্রশ্নের জবাব, একটু হয় তো ক্ষীণ হাসি; আর চকিতে খেলে যাওয়া মুখে যন্ত্রণার সামান্য আভাস। সঙ্গে সঙ্গে দর্শক বুঝতে পারবেন সমস্ত ব্যাপারটা, একান্ত অল্পভব করবেন নিজেরা নায়কের পরিস্থিতির সঙ্গে। তার পায়ের যন্ত্রণার বোধ দর্শকের অল্পভবের মধ্যে এনে দেওয়ার মধ্যে জুতো বা পা সম্বন্ধে কোনো সংলাপই অপ্রয়োজনীয়: বরঞ্চ, হয় তো, ডিরেক্টর বোর্ডের কর্তার রসিক প্রশ্নের মজার জবাবই নায়ক দিলে, হাসলেও, অথচ তার শারীরিক বেদনাও পরিস্ফুট হল নিছক চিত্রময় বর্ণনায়। কোনো বিশেষ পরিস্থিতির একই সময়কার এ-ধরনের রৈত স্বরূপ যতটা স্বাভাবিক ও তাৎপর্যপূর্ণ আকারে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা সম্ভব, থিয়েটারে তা অচল এবং অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে এই সূক্ষ্ম ও চিত্রময় বর্ণনার স্লোগান যেমন চলচ্চিত্রে বর্তমান, তেমনি এই স্লোগান গ্রহণ করার বোধও পরিচালকের থাকে বিধেয়। অর্থাৎ কোন ছবি কতক্ষণ পর্দায় রাখা ঠিক, কখন কোন্ ছবি আসা উচিত, ছবির কম্পোজিশন কি হবে, তার বক্তব্য ও আবেদন কি—এককথায় চলচ্চিত্রের গতি ও ছন্দের জ্ঞান (পেস এণ্ড রিদম)। এই জ্ঞানটুকুর অভাবে সূক্ষ্ম বর্ণনাও হাস্যকর দাঁড়ায়।

এদেশে অবশ্য এখনো চলচ্চিত্রে সূক্ষ্ম, চিত্রময় বর্ণনা বিরল, যেমন বিরল সত্যিকারের ভালো ছবিও। আমাদের ছবি এখনো থিয়েটার ঘেসে, অতিনাটকীয়, সংলাপ-বহুল। ফলে অভিনয়ের রীতিও মোটামুটি থিয়েটারকেই স্মরণ করায়, অঙ্গভঙ্গী, চোখ মুখের অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বরের ব্যবহার সিনেমার উপযোগী না হয়ে অতিনাটকে থিয়েটারী হয়ে যায়—মাঝে মাঝে যাত্রার মতও। এর মূল কারণ অপটু, বোধহীন চিত্রনাট্য ও পরিচালনা। নাটকের মত চিত্রনাট্যও সংলাপ সর্বস্ব হয়, পরিচালকও পাত্র পাত্রীকে দাঁড় করিয়ে কিংবা বসিয়ে, অল্প নাড়িয়ে চাড়িয়ে, সংলাপ মুখস্ত বলান। একজনের কথা বলা শেষ হলেই অন্যজনের বাক্য বেরোয়। ক্যামেরা প্রধানত মুখের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়, নায়িকার চোখের মণি ঘোরানো এবং নায়কের বিভিন্ন প্রকার যৌথিক আকুলি বিকুলি—চতুর বা ঞ্চাকা, অবস্থা ভেদে দুই ভিন্ন ধরনের সংলাপসহ—দর্শকের সমুখে উপস্থিত করাই রেওয়াজ। অথচ মানুষের মনের ঝড়, অন্তর্লীন চাপা আবেগ বা সুখঃখ, কেবল মুখভঙ্গীর অতিরিক্ত ভেংচিতেই ফোটে না; তার প্রকাশ হয় সারা অঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যম্পূর্ণ ব্যবহারে, গলারস্বরে, হয় তো একবার সামান্য চোখ তোলা ও নানানোয়। স্বাধীন ওপর স্ত্রীর সাময়িক ক্রোধ মুখ ঝামটার অতি নাটকে দৃষ্টে দেখিয়েই ক্ষান্ত হলে তা কখনো সত্য মনে হয় না। আসলে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালককে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় বিশিষ্ট চরিত্রের বিশিষ্ট আবেগ প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গীগুলি, তার তাৎপর্যময় ব্যবহার, নানসিক অবস্থা প্রকাশের সূক্ষ্ম শারীরিক ও

মৌখিক অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বরের তারতম্য প্রভৃতি। মানুষের মঙ্গল মানুষের ব্যবহারের ছোটো ছোটো, প্রায় চোখ এড়িয়ে যাওয়া বর্ণনা, মুখের ব্যঙ্গনা এবং স্বরের যথাযোগ্য সঙ্গিলিত প্রয়োগ আপাত-নগণ্য দৃশ্যকেও তীব্রভাবে জীবন্ত করে তোলে। আর এই অর্থপূর্ণ, সূক্ষ্ম, চিত্রনয় বর্ণনাই চলচ্চিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, থিয়েটারের সঙ্গে এখানে তার পার্থক্য। চলচ্চিত্রের ভাষা তাই মূলত চিত্রধর্মী, জালি কাজের মত প্রায়অদৃশ্য তারে তারে বাঁধা এর নিটোল, পূর্ণাঙ্গ রূপটি। যে সূক্ষ্মতা থিয়েটার আপন মাধ্যমের বাধায় ত্যাগ করতে বাধ্য, সেই সূক্ষ্মতাই এর প্রাণ। মানুষের চকিতে মেলানো ভাবপ্রকাশ—মুখের এবং শরীরের—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার ও ইঙ্গিত, চরম সাফল্যে চলচ্চিত্রে প্রাণময় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার শটের বিভিন্ন প্রকার আয়তন এবং আবেদনে সামান্যতম ব্যবহার বা মুখের ব্যঙ্গনার ছুটিও সমস্ত দর্শক ধরতে পারেন, দেখতে পান; পর্দার নৈকট্য বা দূরত্ব বাধা সৃষ্টি করে না।

নাট্যবস্তুর দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, সূক্ষ্ম বর্ণনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা যায় বলেই চিত্রনাট্য নাটকের মত সংলাপবহুল হয়। নাটকে যে ক্ষেত্রে সংলাপই সাধারণভাবে ঘটনা ও পাত্র-পাত্রীর ক্রমপরিণতি মূর্ত করে, পাত্র-পাত্রীকে স্বল্পপরিসর ও নাটকে ব্যবহারে, ভঙ্গীতে বদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়; চলচ্চিত্রে সেক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কাজের পটভূমি বিশাল। চলচ্চিত্রে বাস্তব জীবনে মানুষ মানুষের যে সমস্ত চকিতে মেলানো প্রতিক্রিয়া, ভাব, ব্যবহার, ভঙ্গী দেখে মনের কথা, মনস্তত্ত্বের কথা ধরে, বোঝে, সবই আরো পরিষ্কার ও অর্থপূর্ণভাবে দর্শকের চোখের সামনে এনে দেয়া সম্ভব, শটের বিভিন্ন ব্যবহারে। এই সম্ভাবনা থেকেই চিত্রনাট্যের চিত্রধর্মী রূপের প্রয়োজন হয়; সংলাপ বাহ্যিক তার প্রাণ নয়, বরঞ্চ চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে নাট্যবস্তুর প্রকাশ করাই চিত্রনাট্যের আপন বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ শুধু পরিবেশ এবং মূল নাট্যবিষয়টুকুই চলচ্চিত্রে দৃশ্যত্ব পায় না, ছবি হয়ে চোখের সামনে ভাসে না; পাত্র পাত্রীর সামান্যতম ভাব-ভঙ্গীও—যা অনেক সময় বাস্তবজীবনেও দৃষ্টি এড়ায়—পর্দায় শট ও কম্পোজিশনের মাহাত্ম্যে দর্শকহৃদয়ের স্পর্শীয়। নাট্য ও আবেগগত পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং সংলাপের প্রয়োজন চলচ্চিত্রে ততোটুকুই প্রায়—বিশেষ করেটি ক্ষেত্রে ঐষং কম-বেশি ছাড়া—যতটুকু দৈনন্দিন বাস্তবজীবনেও বাক্যলাপ কাজে লাগে। বাস্তবজীবনের কথা মনে করলেই দেখা যাবে যে মানুষ তার শোক-দুঃখ আনন্দ-উচ্ছ্বাস উপলব্ধি রাগ-রঙ্গ-প্রেম-বিরহ কেবল বাক্যে প্রকাশ করে না, পরন্তু প্রত্যেক বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় ব্যবহারে, ভঙ্গীতে, ভাবেও। সংলাপ ও আবেগ প্রকাশের অন্তান্য এই যুগ্মগুলি মিলেমিশে গিয়ে এক-একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হয়। তাই যেমন সংলাপ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পাত্র-পাত্রীকে কেবল ব্যবহার, ভঙ্গী ও চোখ মুখের ভাব প্রকাশ মারফৎ ঠাঁড় করাতে গেলে মনে হবে বোবা (বিশিষ্ট স্টাইল না হলে) তেমনি শুধু সংলাপের মাধ্যমেও তাকে জীবন্ত করা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে তাকে মনে হয় দম দেয়া পুতুল। আমাদের চলচ্চিত্রের এই পুতুলের সম্মানই বেশি মেলে; ব্যবহারে, চলাফেরা, আত্মশাসনিক কাজ এসব বাদ দিয়ে চরিত্রদের বসিয়ে, ঠাঁড় করিয়ে অথবা শুইয়ে বড় বড় সংলাপ বলানো হয়। ক্যানেরা সোজা মুখের

উপর তাকিয়ে থাকে, অভিনেতা অভিনেত্রী নানা রকম চোখমুখ করে এই দীর্ঘ সংলাপ-গুলির ভাবার্থের সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করেন মুখের ব্যক্ত্যনার সম্বন্ধ রাখার। বলাই বাহুল্য তা সম্ভব হয় না, পনের আনা ক্ষেত্রেই সংলাপ বা আরো সঠিক হয় বলে আবেগের ভাবের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তি সামঞ্জস্য হারায়। পাত্র-পাত্রীর মুখ কিছুটা রেখাহীন রবারের মত, কিছুটা বা নিম্প্রাণ যন্ত্রের মত লাগে। গ্যালাগালি খান চরিত্রাভিনেতা কিন্তু আদ্য ক্রটি থাকে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা দুটোই চলচ্চিত্রের সুরে বাঁধা হয়। চাই, চাই চিত্রময়, তাহলেই এ বিজ্ঞান কাটবে। বাংলা ছবি দেশে শুধু নয়, বিদেশেও ব্যবসায়িক অভিযান করতে সমর্থ হবে।

নির্জনতা

মানস রায়চৌধুরী

আশেপাশে একটানা কলরব শুরু হয়ে গেলে,
চড়ায়ের কিচিমিচি, ছাদে পায়রার চিৎকার
থেনে গেলে শুরু হয় অন্য এক সুরের বিস্তার।
অপরূপ শিল্পী কে সে, দক্ষহাতে মনের সেতারে
দোলা দেয়। সারঙের সুর ওঠে হৃদয়ের তারে।

কোনোখানে শব্দ নেই সবকিছু থেনে গেছে নিভে,
তবু দেখি মনের গভীরে কাজ চলে—মগ্ন চাষী
ভাবনার ধান বোনে। যন্ত্রণার রৌদ্রজলে ভিজে
সৃষ্টির ফসল তোলে, শ্রাবণে-অম্রাণে বারমাসই।

নির্জনের কাছে তাই বহুদিন ধরে আছি বাঁধা।
হৃদয়ের ভালোমন্দ, অভিমান হুঃখমুখ কাদা
সমস্ত পেরিয়ে তবু জেগে থাকে অন্য এক দেশ
প্রশান্তির, আনন্দের—ভালোলাগা যেখানে অশেষ।

ফুলবালে

শিবশঙ্কু পাল

(নিহির ঘোষদস্তিদার-কে)

ধন্য আমি মাটির স্নেহ পেয়ে
মাটির মাঝে নদীর উত্তাপ
ধন্য আমি সূর্যপানে চেয়ে
সূর্য ঘেন গানের পরিমাপ ।

তাইতো কোন দুঃখ নেই, হাসি
যায়না মুছে কোনই প্রতিকূলে,
পাপভিঙলো আলোর প্রতিভাস-ই
হাওয়ার গানে তাইতো হুলেহুলে
মুখর করি খুশির সঙ্গত :
জ্যোতির্ময় সূর্যদেখা পথ ।

দৃষ্টিদীপে তাইতো ঝলসিত
দীপাবিভা ইন্দীবর মুখ,
আশার প্রবতীর মত মৃত
অনেক মনে জাগাই উৎসুক :
ইচ্ছে দিয়ে সরস কর আদি
বাঁচার মাটি ; তুচ্ছ অবসাদই ।

ঝরতে পারি ধুলোর স্নানিমায়
তবুও অবনুষ্টি নেই ছেয়ে
কোথাও এই রঙের বস্তায়,
আনন্দের বাঁচি বাঁচার কামনায়
সূর্য আর মাটির স্নেহ পেয়ে ।

শীতের ওক

মুরি নজিবিন

ইশ্কুল ত মোটে সিকিমাইল পথ ।

দিদিমণি তাই শুধু কাঁধের ওপর একটা শীতের কোট ফেলে আর মাথায় একটা হালকা পশমের শাল জড়িয়েই যেতেন । বাইরে কনুকনে ঠাণ্ডা ; তুষার মেঘ জমানো হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় সারা গা মাথা ভিজে যেত একেবারে । তবে চক্ৰিশ বছরের শিক্ষয়িত্রী এর সবটুকু উপভোগ করতেন । তাঁর নাকের ডগায় আর গালের ওপর সেই তুষারের ঝাপটা বেশ লাগত । আর তাঁর বুকখোলা কোটের নিচে বাতাসের শীতলস্পর্শ ।

ঠাণ্ডা রানধনু রং । জানুয়ারী মাসের দিনগুলো সাধারণ ভাবে জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজের সম্পর্কেও বটে কেমন একটা উচ্ছল ভাবনা জাগিয়ে তুলত মনে । সবে দু'বছর হোল এখানে এসেছেন তিনি, একেবারে কলেজ থেকে সরাসরি । তবে ইতিমধ্যেই তিনি রুশভাষার একজন যোগ্য অভিনব শিক্ষয়িত্রী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন ।

এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনার প্রথম ঘণ্টা পঞ্চমশ্রেণীতে । ঘণ্টার তীব্র ঝনঝন শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে পড়া শুরু হোল । ক্লাসঘরে ঢোকবার সময়ও তার আওয়াজ বাড়িময় ছড়িয়ে যাচ্ছে । ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে স্বাগত জানাল তাঁকে তারপর যে যার যারগায় বসে পড়ল আবার । গোলমাল সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য থিতুয়ে গেল না । মাঝে মাঝে কোন ডেস্কের ওপরে হুমদাম্ শব্দ, তারপর হয়ত কোন বেকির কঁচাচ কঁচাচ আওয়াজ, কারো বা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস, হয়ত স্কুল বসবার আগে খুশির আমেজের সঙ্গে মিশে থাকে ঘর ছেড়ে আসার বেদনা ।

আজ আমরা শব্দরূপ পড়ব ।

এবার ক্লাস একেবারে চুপ । বাইরে থেকে শোনা যায় শুধু রাস্তার ছুটন্ত মটর গাড়ীর স্খুইস্ স্খুইস্ শব্দ ।

কোন ব্যক্তি যায়গা বা জিনিসের নামকে বিশেষ্য বলে, বুঝলে ? যেমন ঘরো ছাত্র, বই ।

ভেতরে আসবো ?

আধখোলা দরজাটার কাছে পশুলোনের ময়লা জুতো পরা একটা ছোট মূর্তি দেখা গেল । বরফের কণা চিকচিক করে জুতোর ওপর, দেখতে দেখতে গলে গিয়ে মিলিয়ে যায় । তার হিম উজ্জ্বল গোল মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন বীটের রসে মাখামাখি হয়ে আছে । ধূসর জরুগল, যেন কত বয়স হয়েছে ।

আবার দেয়ি করে এলে সডুশকিন । বয়স্ক শিক্ষয়িত্রীদের মত এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনাও একটু কড়া হতে চাইতেন । তবে আজ যেন তাঁর গলার স্বর অনেকটা করুণ শোনাল । দিদিমণির গম্ভীর মন্তব্যে কোলিয়া সডুশকিন চট করে নিজের ছায়গায় গিয়ে আঁটসাঁট হয়ে বসে গেল ।

এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা লক্ষ্য করলেন কিভাবে ছেলেটি বই রাখবার অয়েলরুথ থলেটা তার ডেস্কের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল। মাথা না হেলিয়ে পাশের ছেলেটিকে ফিসফিস করে কি একটা বলল। হয়ত জিজ্ঞেস করল দিদিমণি কি পড়াচ্ছিলেন ক্লাসে।

সভুশকিনের স্বভাবটাই কেমন চিলেচালা। এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা এতে বেশ বিরক্ত হতেন। চমৎকার শুরু হয়েছিল দিনটি, হঠাৎ যেন সব ভেসে গেল। ভূগোলের শিক্ষকও সভুশকিন স্কুলে দেরি করে আসে বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

যা বললাম সব বুঝেছ ত? এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা আবার পড়াতে শুরু করলেন।

সব! সব বুঝেছি! একসঙ্গে ছেলেরা জবাব দিলে।

আচ্ছা বেশ। তবে যা বললাম তার একটা উদাহরণ দাও দেখি।

কয়েক মুহূর্তধরে ক্লাস একেবারে শান্ত। তারপর জড়োসড়ো গলায় একজন বলে উঠল। বেরাল।

বেশ, এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা বললেন। তারপর যেন একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল।

জানালা, টেবিল, বাড়ী, রাস্তা!

বেশ, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ। এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা ওদের শান্ত করতে চান। ছেলেদের উদাহরণগুলো একবার করে আউড়ে যেতে হয়। সমস্ত ক্লাস খুশির উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনার বিশ্বয়ের সীমা নেই। ওদের পরিচিত জিনিসগুলোর নাম বলে ছেলেদের কত আনন্দ। যেন এক নতুন অস্বাভাবিক জগতের হদিশ মিলেছে।

আচ্ছা বেশ, ওতেই হবে। আমি দেখছি তোমরা সবাই বুঝেছ।

অগত্যা সবাই চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মত সভুশকিন দাঁড়িয়ে উঠল। গুন্‌গুন্‌ গলায় বললে : শীতের ওক!

একটা হাসির স্রোত খেলে গেল ঘরময়।

শীতের ওক। সভুশকিন আবার বললে। বন্ধুদের মজার হাসি সে কানেই ভুলল না। স্পষ্ট কথাগুলো অন্তর থেকে বেরিয়ে এল এক অপূর্ব রহস্যকে প্রকাশ করবার ব্যাকুলতায়। তাকে পরিপূর্ণ অন্তরে আর ধরে রাখা যায় না যেন। হঠাৎ এই ছেলেটির এমনিতর উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে না পেরে এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা বললেন : শীতের ওক বলছ কেন? শুধু 'ওক' বললেই ত হয়।

না না শুধু ওক বললে হবে না। এখন শীতের ওক—ওটাই ঠিক বিশেষ পদ।

বোসো সভুশকিন। ক্লাসে দেরি করে এলে এই হয়। 'ওক' হলো বিশেষ পদ। 'শীত' বললে এমন একটা পদ বোঝায় যা আমরা এখনও শিখিনি। ছুটির পর তুমি আমাদের ঘরে আসবে, কেমন?

আপনি ঠিক একটি শীতের ওক দেখতে পাবেন। পেছনের বেঞ্চি থেকে কেউ কেউ টিপ্পনি কাটলে।

দিদিমণি যা পড়াচ্ছিলেন আবার শুরু করলেন ।

লাইভেরি ধরে গিয়ে ছেলেটি আর্মচেয়ারে নতুনভাবে বসে নরম স্পিংএর ওপর একটু একটু দোল খেতে লাগল ।

আচ্ছা এবার বলো ত রোজ দেরি করে আসো কেন ?

সত্যি, আমি তা জানি না এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা, সে জবাব দিলে ঠিক বয়স্কের মত বিব্রত ভঙ্গিতে । স্কুল বসবার ঘণ্টাখানেক আগে আমি বাড়ি থেকে বেরোই ।

নিখো কথা বলছ ; তোমার লজ্জা হওয়া উচিত । তোমার বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় আসতে পনের মিনিট । তারপর আরো বড় জোর আধঘণ্টা ।

আমি ত ও রাস্তা দিয়ে আসি না । বনের ধার দিয়ে আরো তাড়াতাড়ি আসি । এমনভাবে কথা বলল যেন নিজেই অবাক হয়ে গেছে ।

ও, এত ভারী খারাপ । দাঁড়াও তবে তোমার বাবা, মার কাছে বলতে হবে ।

আমার শুধু মা আছে জানেন ত ? ছেলেটি হাসতে হাসতে বলল । সামান্য একটু অপ্রতিভ হলেন এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা । তাঁর মনে পড়ছে কোলিয়ার মা যুদ্ধের সময় তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন । ভদ্রমহিলা কাজ করেন এখন হাসপাতালে । অবশ্য আরো তিনটি ছেলেকে মানুষ করতে হয় । এমনিতেই হয়ত বিধবার নানা কষ্ট । যাহোক দিদিমণি একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন ।

আমার মনে হয় তোমার মার সঙ্গে একবার আমার দেখা করা দরকার ।

তাই করুন এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা । মা কিন্তু আপনাকে দেখে খুব খুশি হবে ।

আমি ত তাঁকে খুব খুশির খবর শোনাতে পারবো না । তোমার মা কি সকালে কাছে বেরিয়ে যান ?

না তাঁর বিকেল বেলায় কাজ, বিকাল তিনটায় হাজরি ।

বেশ ত । আমার ছুটায় ছুটি । স্কুলের পর তোমার সঙ্গেই যাবো'খন ।

কোলিয়া এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনাকে স্কুলের পিছন দিকের রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলল । রাস্তার পাশেপাশে এক ছোট ঝিরঝিরে নদী । কোথাও কোথাও পথ বেঁকে গিয়ে সরু হয়ে এসেছে নদী-উৎসের বক্ররেখায় । কোথাও বা উঠেগেছে সরীসৃশপের পিঠের মত ঝুঁকু বন্ধুর নদীতীর অনুসরণ করে । কোথাও নদী যেন তুষার ভারী কয়ল চাপিয়েছে গায়ে । কোথাও আবার নিরাপদে বাঁধা পড়েছে ঝলমল বরফের বন্ধবাসের ডলায় । এখানেসেখানে কোন বরফের রক্তপথে প্রাণপাওয়া জলরেখা মেলেছে হিংস্রটে কালো ইসারায় ।

এ কেমন ব্যাপার এ যায়গাটা বরফ ঘেরা নয় ? এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা জিজ্ঞেস করলেন ।

এই গরম ফোয়ারাটার জন্তেই এরকম হয়েছে । দেখুন না, ওই ছোট ঢেউ সমতলে এসে পৌঁছবার আগেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় ভেঙ্গে ওঁড়ো হয়ে ক্ষীণ স্রোতধারা নেমেছে নদীর উপত্যকায় । গড়িয়েপড়া জলের দাগ যেখানে । উথলে উঠেছে জল, কোণায় কোণায় বুদবুদের বিস্ফোরণ, ঠিক যেন উপত্যকার পথশ্রেণী । ওদের পায়ের কাছে এসে পড়ে ।

চারদিকে এই গরম ঝরনাটার যেন শেষ নেই, খুশিতে লাফিয়ে উঠে কোলিয়া বলছিল। তুষারের নিচেও নদী চিরকাল বেঁচে আছে। কোলিয়া তুষার সরিয়ে দেয়। কাল আলুকাটার মত স্বচ্ছ জল দেখা গেল। পথের পাশে কাঁটাবেড়ার ঝোপ, আর তারপরই যেন সহসা গাছগুলো কিছুটা বীথিপথ ছেড়ে সরে গেছে। তার মাঝখানে শাদা ঝলমলে পোশাক পরা মহান গীর্জের মত আকাশছোঁয়া এক বলিষ্ঠ ওক গাছ অরণ্য শিখরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় যেন চারপাশের গাছগুলো বিনীত হয়ে তাদের জ্যেষ্ঠবাতার জন্তে পথ ছেড়ে দিয়েছে। যাতে সমস্ত শক্তিতে সে নিজেকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করে দিতে পারে। আরো নিচে শাখাগুলি অরণ্যপথ জুড়ে তাঁবুর মত ছড়িয়ে আছে। তুষার নুকিয়ে পড়েছে সংকুচিত বহুল শীতের গভীরে। প্রকাণ্ড গুঁড়িটাকে জাপটে ধরতে তিনমানুষের হাত জুড়তে হবে। দেখলে ভ্রম হয়, যেন রূপালী পুতায় কে সেলাই করে রেখেছে। হেমন্তের শুকনো পাতা ঝড়ে পড়েনি। সোজা মগডাল পর্যন্ত এই বনস্পতি সেজে রয়েছেন তুষারশ্বেত পল্লব সমারোহে।

তাহলে এই হল ওর শীতের ওক। এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা সেই দৈত্যের সামনে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। অরণ্যপ্রহরী ধীরে শাখাবাহু হুলিয়ে আমন্ত্রণ জানানলেন তাঁকে। কোলিয়া জানে না তার দিদিমণির মনের খবর। সে গাছের তলায় কি একটা নিয়ে ব্যস্ত। যেন বহুদিনকার পরিচয়ের সান্নিধ্য।

এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা দেখুন এখানে কে।

কষ্ট করে ও মাটির চাওড় আর শুকনো ঘাসের চাপড়ায় চাপাপড়া এক প্রকাণ্ড কঠিন তুষারের চাঁই সরিয়ে ফেলল। একটুখানি ছোট কাঁপার ভেতর সামান্য একটু পচা-পাতার প্রলেপমাখা গোলপাকানো কি একটা রয়েছে। ঝাড়া শিরদাঁড়াগুলো দেখে এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা বুঝতে পারলেন এটা একটা বুনোশুয়ার। ও একটা কবলের বেশি আর কি?'' ছেলোট অতি সন্তর্পণে তুষারের আচ্ছাদনটুকু ঘুমন্ত পতঙ্গটির পিঠ থেকে সরাতে বললে।

তারপর তার দিদিমণিকে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি পরিদর্শন করানোর পালা। অনেক ছোট ছোট প্রাণী। টিকুটিকি, পতঙ্গ আরো নানাজাতের পোকামাকড়ে আন্তানা পেয়েছে ওকের গায়ে। কেউ কেউ সৈঁধিয়েছে শিকড়ের অনেক নিচে। কেউ-বা গা-ঢাকা দেবার মত ঠাঁই খোঁজে ছালের ফাটলে। তাতে এমন ক্ষয় ধরেছে, মনে হয় যেন এক গভীর ঘুমের মধ্যে শীতকে তারা জয় করেছে। বীর্ষবান বিরাট বনস্পতি এমনই এক প্রাণের উত্তাপে ভরপূর্ণ। কীটপতঙ্গ পশু পাখী যারা স্বচ্ছন্দে বাসা খুঁজে পায়নি সবাইকে আকর্ষণ করেছে নিজের কাছে। এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা হারিয়েছেন নিজেকে গভীর অরণ্যক রহস্যে। এমন সময় হঠাৎ কোলিয়া বলে উঠল, এই রে মা হয়ত এতক্ষণ চলে গিয়ে থাকবে। চমকে উঠলেন এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভনা। একবার তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটা দেখে নিনল। সঁতিনটে বেজে গেছে। তাঁর মনে হ'ল কাঁদে পড়েছেন। হায় ভগবান, ভাবলেন তিনি, একজনের অভাবের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর কি থাকতে পারে।

মনে পড়ল তাঁর আজকে পড়ার কথা। কী-এক নিরুদ্বেগ উদাসীন্য! মানুষের

ভাষা কথা, এসবের দিকে ত আচ্ছ তেমন মন ছিলনা তাঁর ! সে এমন একটি বস্তু যাকে বাদ দিলে পৃথিবীতে মানুষকেই হেঁয়ালি মনে হবে ! কোনদিন কল্পনার প্রকাশ ঘটবে না । জীবন যেমন সুন্দর আর সত্য তেমনি ভাষাও হবে পবিত্র মনোরম । অবশ্য এতদিন ধরে নিজেকে একজন যোগ্য শিক্ষয়িত্রী বলেই মনে করতেন তিনি । সেই পথ কোথায় কতদূরে ? সেই যে বাঁধভাঙ্গা আনন্দে ছেলেরা চেষ্টা করে উঠেছিল : “ট্যাক্টর, কুয়ো... পাখী...বাড়ি । তাঁর ক্ষীণ অশ্রুভূতিতে হয়ত ওই আনন্দই সে পথের প্রথম চিহ্ন ।

বাঃ বেশ একটুখানি বেড়ানো গেল সন্তুষ্কিন । তুমি নিশ্চয়ই এই রাস্তাটা নিয়ে শটকাট করতে পারো ।

ধন্যবাদ এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না ।

মুখ ওর লাল হয়ে উঠল লজ্জায় । বড় ইচ্ছে হ’ল যে দিদিমণিকে বলে আর কোনোদিন দেবি করবে না সে । কিন্তু ভয় হয় আবার, এ শপথ যদি না রাখতে পারে । কোটের কলার তুলে নিয়ে কোলিয়া পশমের টুপিটা নামিয়ে নিল । চলুন বাড়ির দিকে এগিয়ে দিই ।

ধন্যবাদ কোলিয়া, আমি ঠিক চিনে যেতে পারব ।

সে একটু সংশয়ে শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাইল । তারপর মাটি থেকে একগাছা লাঠি তুলে নিল । আর তার এব্রো-খেব্‌ড়ো আগাটুকু ভেঙ্গে নিয়ে এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভ্‌নার হাতে দিল ।

যদি দেখেন কোনো হরিণ ভেড়ে আসছে তবে উঁচিয়ে ধরবেন তার দিকে । দেখবেন কেমন লাফিয়ে পালায় । তবে ভাল হয় যদি ঠেঙ্গাটা একটুখানি তোলেন । নইলে বেচারীর যদি গা কেটে যায় আর ও একেবারে বন ছেড়ে পালায় ।

বেশ কোলিয়া, আমি মারব না ওকে ।

খানিকদূর যাবার পর এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না ওক গাছটাকে শেষবারের মত দেখবার জন্যে পিছন ফিরে চাইলেন । ঐ ত সেই শাদা গাছ ; অস্তমূর্ষের রশ্মিরেখায় সামান্য রক্তাভ । সেই বিশাল বনস্পতির পাদপীঠে একটি ছোট অঙ্ককারমূর্তি, কোলিয়া তখনও যায়নি । দূর থেকে চোখ রেখেছিল তার দিদিমণির গন্তব্যের দিকে । হঠাৎ যেন এ্যানা ভ্যাসিলিয়েভ্‌না তার সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে পারলেন যে এ অরণ্যের সবচেয়ে চোখে পড়ার মত জিনিস ওই শীতের ওক নয়, ওই জীর্ণপোশাক আর ময়লা ফেঁট বুট পরা ছোট ছেলোট । ভাবীদিনের অপূর্ব প্রতিভা । হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালেন তিনি । তারপর ধীর পায়ে আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে নিশিয়ে গেলেন দূরের অন্ধকারে ।

অনুবাদ : কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

॥ চলচ্চিত্র ৭

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত দেশী ফিল্ম ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য ছবি নিয়মিত দেখা এবং আলোচনা করা দেশী চলচ্চিত্রের উন্নতির দিক থেকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। ফলে যারা এ-ধরনের চেষ্টায় অগ্রণী হয়েছেন, ইতিপূর্বে, তাঁরা সংগঠিত সিনেমা মহল থেকে প্রায় কোনো রকম উৎসাহ পাননি, পরন্তু, অনেকক্ষেত্রে, ব্যঙ্গ-বিশ্রুপ কুড়িয়েছেন। নোটামুটি উপরোক্ত মনোভাবেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্ভোক্তারা। সাতচল্লিশ থেকে পঁচ বছর নানান অসুবিধা ও বিপাকের মধ্যেও আলোচ্য সোসাইটি, সমর্থক ও বিশেষভাবে কয়েকজন উদ্ভোক্তার অপরিসীম ধৈর্য ও সিনেমা শিল্পের প্রতি ভালো-বাসার কল্যাণে, বিভিন্ন দেশের সার্থক চলচ্চিত্র এবং কিছু আশাপ্রদ স্বদেশী ছবিও দেখিয়ে ছিলেন। শুধু ছবিই যে দেখানো হয়েছিল তা নয়, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে উপযোগী আলোচনাও করা হত। এই আলাপ-আলোচনা, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এই গভীর মনোযোগ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত শিল্পবোধ যে সিনেমার ভবিষ্যত তথা উন্নতির কতটা সহায়ক তার একটি উজ্জ্বল, বিশ্বয়কর দৃষ্টান্ত সত্যজিৎ রায় ও তাঁর দলের নতুন শিল্পীরা। পথের পাঁচালী মারফৎ এঁরা প্রমাণ করেছেন যে আজন্ম গতানুগতিক, শিল্পবোধহীন, কল্পনাহীন ছবি তুলে গেলেই নির্মাতাকে শিল্পী বলা যায় না; বরং আরম্ভেই যার কাছে থাকে রুচি, চলচ্চিত্রের জ্ঞান, নিষ্ঠা, অভিনবত্বের দীপ্তি তিনিই একমাত্র ভরসা, ত্রৈকান্তিক প্রদ্বার পাত্র। আর চলচ্চিত্রের এই জ্ঞান, দীপ্তি রুচি ইত্যাদি অনেকখানিই আয়ত্তে আসে চর্চায়, শিল্পমাধ্যম সম্বন্ধে সজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা ও একনিষ্ঠ প্রত্যয় থেকে। সেই জন্মেই সত্যজিৎ রায়, বঙ্কু চিদানন্দ দাশগুপ্ত, মনোজ মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মূল উৎসাহী ও সংগঠক ছিলেন। এই উৎসাহ ও চর্চাই একদিন অভাবনীয় সাফল্যে চিত্ররূপ নিল; চিদানন্দবাবু নিয়মিত লেখেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সিনেমা বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ; অগ্ন্যনেকেও ভালো ছবি দেখা ও তৈরী করার জন্যে ক্রমা-বয়েই বেশি বেশি আগ্রহ বোধ করতে আরম্ভ করেন। বেঙ্গল ফিল্ম সোসাইটি নামে একই উদ্দেশ্যে আর একটি সংগঠন কাজে নামেন। দেশের স্বহস্তর পটেও সিনেমা সম্বন্ধে মনোযোগী চিন্তার ছায়া পড়ে; ১৯৫২ সালের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শকরা বিপুলভাবে সাড়া দেন। বিভিন্ন দেশের আশ্চর্য সার্থক কিছু ছবি

সাধারণের চোখের সামনে এসে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটির কাজ, ফিল্ম ডিভিসনের স্বল্প সাফল্য, কেন্দ্রিয় ফিল্ম লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, সাধারণের ভালো ছবি সম্বন্ধে প্রাথমিক উৎসাহ এবং প্রত্যাশার সহায়ক হয়। উপরন্তু ইদানিং চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী এবং শিল্পী মহলেও ভালো ছবি করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তাঁদের সাহস ও কল্পনাকে কাজে লাগানোর অপেক্ষাকৃত ঝোঁক দেখা দিয়েছে, মনে মনে তাঁরাও চাইছেন সিনেমাকে শিল্পের মর্যাদায় তুলতে, এদেশেও। তাই, এই সুসময়ে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির গত ২৯শে জানুয়ারীর পুনরুজ্জীবন অনুষ্ঠান সমস্ত সিনেমা উৎসাহীর পক্ষেই আনন্দের সংবাদ। ঐ দিন, অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারী রবিবার সকালে সোসাইটি সিনেমায় বিখ্যাত সিনেমা সমালোচক শ্রীমতী মারী সেটেনের উপস্থিতিতে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি পুনরায় নিয়মিত কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আনন্দের বিষয় যে বেঙ্গল ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোক্তারাও একত্রে একই সোসাইটিতে রয়েছেন। কার্যকরী সমিতি ইত্যাদি এখনো বোধ হয় নির্দিষ্ট হয়নি, অদূর ভবিষ্যতেই আশা করা যায় সংগঠন সূচুরূপে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে।

সাগরিকা : এস, সি, প্রোডাক্সন্সের নিবেদন ; কাহিনীও সংলাপ : নিতাই ভট্টাচার্য, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : অগ্রগামী ; আলোকচিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ ; ভূমিকার : সূচিত্রা, উত্তম, নমিতা, জীবন, যমুনা, সলিল, তপতী, পাহাড়ী, ছবি ও অনেকে।

সূচিত্রার সৌন্দর্যের আকর্ষণ ও তাঁর এবং উত্তম জোড়ের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে সাধারণত যে ধরনের ছবি তৈরী হয় সাগরিকা তারই পুনরাবৃত্তি। নতুন পরিচালক ছবি তৈরী করেছেন শুনলে মনে আশা জাগে হয় তো গতানুগতিক ফরমুলার বাইরে চলচ্চিত্রের উপযোগী কাজ চোখে পড়বে, বলতে পারব পথের পাঁচালীর পর বাংলা চিত্রের নোড় ফিরেছে। সাগরিকা দেখে সে রকম দাবী করা অসম্ভব।

এরকম অবাস্তব, অবিবাস্তব গল্পকে ছবিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা প্রযোজক এবং পরিচালকের অর্বাচীন মনের পরিচয় দেয়। গল্পাংশের ছোটোখাটো অসঙ্গতির কথা নির্দেশ করতে গেলে কয়েক পৃষ্ঠায় কুলাবে না, লাগবে একটি সম্পূর্ণ বই। কিন্তু যে মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছবিটিকে ফেনানো হয়েছে, অর্থাৎ নায়কনায়িকার প্রেমের ভাবাক্ষিপিত সমস্তা, সে বিষয় একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে কতটা অপ্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধি থেকে এ ধরনের হাস্যকর প্যাঁচ কাহিনীকারের মাথায় আসে।

নায়ক পাকেচক্রে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে বিলেত গেল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে। কথা রইল শিক্ষা শেষে, দেশে ফিরে নায়ক ভদ্রলোকের কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে। এদিকে ইতিপূর্বেই সে হৃদয় দান করেছে আর একটি মেয়েকে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে কথা মেয়েটির কাছে কঁাস হয়ে গেলেও মেয়েটির মনের কথা নায়কের জানা হয়নি। নায়ক বিলেত যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমিকার কাছে প্রেমিকার জেঠু এলেন আপন কন্যাকে নিয়ে দেশ থেকে, বল্লেন নায়িকার হাতে তিনি ছ'বছরের জন্যে নিজের মেয়েকে রেখে যাচ্ছেন। মেয়ে তাঁর পাড়ারগেয়ে, কিন্তু তার বিয়ে ঠিক করেছেন

বিলীতি ডিম্বী আনতে যাওয়া অত্যন্ত গুণী ছেলের সঙ্গে, তাই ছেলের উপযোগী করে তুলতে হবে তার মেয়েকে নায়িকাকেই। নায়িকা ছেলের নামধাম শুনে তো মরনে মরে গেল, বুঝল এ তারই প্রেমিক, হৃদয়েন্দ্র। সে যাই হোক দাঁতে দাঁত টিপে সে বোনকে মানুষ করতে থাকল মায় তার হয়ে তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে বোনামে (বাগদত্তা স্ত্রীর নামে) পত্রালাপও চালাতে থাকল। প্রতি পত্রেই এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে থাকল যে নায়ক আসলে নায়িকাকেই ভালোবাসে, স্বপনে জাগরণে শুধু তারই চিন্তায় কাটায়, বাগদত্তা স্ত্রী তার হৃদয়ের ধারে কাছেও নেই। নায়িকা চিঠি পড়েন এবং কাঁদেন, অতিনাটকীয় ভাবভঙ্গী করেন, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন দেখান—কেননা তাঁরও তো ধ্যানে জ্ঞানে একটিনাত্র মুখচ্ছবিই অম্মান, এবং সেটি নায়কের। অথচ তিনি জানাতে পারেন না (মহাশ্বে লাগে) যে তার বাগদত্তা স্ত্রীর নামে চিঠিগুলো নায়ক পাচ্ছে সেগুলি আসলে লেখা তার প্রেমিকারই, নিয়তিরলিখনে তার বাগদত্তা স্ত্রী নায়িকারই জেঠতুতো বোন এবং তাকে মানুষ করে তোলার ভারও পড়েছে নায়িকার উপর। বেশ ভালো কথা, এতক্ষণ তবু নানান গোঁজামিল ও অপরিণত মনের সুস্পষ্ট ছাপ সহ্যও গল্পের ঘটনাস্রোতে একটা ক্ষীণ যুক্তির প্রয়াস ছিল, এরপর সব যেন লও-উও হয়ে গেল। যা ইচ্ছে তাই দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হল যে প্রেমের ক্ষেত্রে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত। তা সঙ্কটটা কি ধরনের? না খবর এল দুর্ঘটনায় নায়কের চোখ অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাগদত্তা স্ত্রী এবং তার বাবা বল্লেন এ ছেলেন সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। ছেলেও লিখলে সে সমস্ত রকম শর্ত থেকে তার বাগদত্তাকে মুক্তি দিয়েছে। আপনারা বলবেন; বাঁচা গেছে, এবাব ভালোয় ভালোয় যার সঙ্গে প্রেম তার সঙ্গে কাজটা সাদ্ধ হোক। আমরাও তাই বলতুম। কিন্তু কাহিনীকার ও পরিচালক তা হতে দিলেন না। তাঁরা অহেতুকভাবে প্রেমিকাকে আত্ম-গোপন করিয়ে রেখে তাকে কাঁদালেন, গাওয়ালেন, মহৎ কথা বলালেন। অর্থাৎ সোজা কথায় প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখালেন। এ সংকট কি বিশ্বাসযোগ্য, আবেগময়, অর্ধপূর্ণ—যেখানে ছুঁছনেই ছুঁছনের অন্য মরীয়া, কোনো যুক্তিসঙ্গত বাধাও নেই মিলনে, সেখানে মনগড়া ছেলেমানুষী পরিস্থিতি ও হাস্যকর দৃশ্যের কি মানে? এককথায় মানে নেই এ ধরনের ছবির। পরিচালক এবং কাহিনীকার মানের ধার ধারেন না। মনে আশা রাখেন সূচিচিত্র-উত্তম যখন আছে তখন ছবি মার খাবে না।

কাহিনী ছেড়ে পরিচালনা ক্ষেত্রে এসেও যে প্রশংসার কথা বলা যাবে সে উপায় নেই। সেই গড়পড়তা মামুলি ছবির ট্রিটমেন্ট সাগরিকাতেও। যত্নশয্যায় শায়িত ব্যক্তি নাটুকে বক্তৃতা শেষে টুপ করে মারা যায়; প্রথম দর্শনেই, যে ডাক্তার কখনো কোনো মেয়ের দিকে তাকায়নি সে খর্ড ইয়ারের ছাত্রীর প্রেমে হারুড়ু খায়, বাহুজ্ঞান হারিয়ে ছুঁছনে ছুঁছনের দিকে তাকিয়ে থাকে হাঁদার মত; প্রেমের দৃশ্যগুলিতে অবধারিতভাবে ধুঁড়ির চাঁদ, ফুল ইত্যাদি জন্ম জন্ম করে; বিরহিণী নায়িকা নায়কের ছবি হাতে বিলাপ করেন; অসুস্থ প্রেমিককে শুন পাড়িয়েই নায়িকার উচ্চকণ্ঠে গান শুরু হয়—এমন কি তিনি গান করতে করতে ধুমস্ত নায়কের কানের কাছে মুখ নিয়ে আসেন; অজস্র কান্নার মধ্যেও বিরহিণীর গলা দিয়ে অকাতরে সুরেলা গান বেরোয়। এককথায় বাংলা

ছবির যত রকম দুর্বলতা পরিচালনা ক্ষেত্রে দেখা যায় তা সবই অলোচ্য চিত্রটিতে বর্তমান।

স্বভাবতই এহেন অবাস্তব কাহিনী ও শিল্পবোধহীন পরিচালনার মধ্যে কোনো চরিত্রই অভিনয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। সবাই আন্তরিক চেষ্টা করেছেন অসহ্য জিনিসকে সহনীয় করে তোলার। জীবন বসুকেই সব থেকে স্বাভাবিক লাগে, তারপর উত্তমকে। সুচিত্রা সেন আপন ভঙ্গীতে নানাতাবে কেঁদে ব্যাপারটি দাঁড় করাবার প্রয়াস পেয়েছেন—যা মালমশলা পেয়েছিলেন তাতে তার বেশি আর কিছু করাও বোধকরি অসম্ভব। অন্যান্যেরা যাকে সহজ ভাষায় বলে চালায়ে পেছেন। আবহসংগীত অত্যন্ত কানে লাগে, আলোকচিত্রশিল্প সমামান্য কিন্তু বোধহীন।

এ ছবি তবু অনেকে দেখতে যাবেন সন্দেহ নেই, সুচিত্রা-উত্তমের ভাবভঙ্গার জন্যে, সুচিত্রার নতুন গয়নার প্যাটার্ন দেখবার লোভে, চুল বাঁধা শিখতে এবং শাড়ির ফেরতা দেয়ার নতুন কায়দা হল কি না জানতে, বড় বড় বাড়িঘর ফার্ণিচার দেখে মন ভরাবার জন্যেও বটে।

লাভ নিশ্চয়ই হবে প্রযোজকের, ভরসা করি এবং পরে এই ছবির খোলনলুচে পার্টে আর একটা সংস্করণ।

অসবর্ণা : আজ প্রোডাক্সন্সের নিবেদন ; কাহিনী ও সংলাপ : নরেন্দ্র নাথ মিত্র , চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায় : সংগীত : রাজেন সরকার ; ভূমিকায় : সুমিত্রা, বিকাশ, ছবি, রেণুকা, রেবা, সুপ্রভা, প্রকাশ রায় ও অনেকে।

গল্প উপন্যাসেই হোক বা চলচ্চিত্রেই হোক বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগের ক্রম-পরিণতির মধ্যে সংহত ও স্বাভাবিক যুক্তির প্রয়োজন। লেখকের ইচ্ছে হলেই তিনি যেমন কাহিনীর ভিতর যা ইচ্ছে তাই ঘটিয়ে আসর জমাতে পারেন না তেমনি চিত্রনাট্যকার পরিচালকের মজি মারফিক কয়েকটি খাপছাড়া পরস্পরের সম্বন্ধহীন দৃশ্য তুললেই তা চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে না। কাহিনীমূলক চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যেও চাই অনিবার্য যুক্তি। বিষয়বস্তুর এই অনিবার্য যুক্তি পরিস্ফুট করা হয় পাত্রপাত্রীর পরস্পরের সম্বন্ধের ক্রমপরিণত রূপের সচিত্র বর্ণনায়। কাহিনীকারের আকস্মিক ইচ্ছায় যেমন সুস্থ নায়ককে কলমের এক খোঁচায় বন্ধ উন্মাদ করা সার্থক গল্পে অসম্ভব তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধেও পরিচালকের ইচ্ছামত মিলন বিরহ আনা, স্বাভাবিক যুক্তিকে বাদ দিয়ে, ছবিকে মাঠে মারারই সামিল।

অসবর্ণায় এই যুক্তিরই অভাব ভয়ানক। প্রেমাস্পদের নিজ হাতে পরানো আঙুলের আংটি নায়িকা বিপদে পড়ে বাঁধা দিতে পারেন কিন্তু তার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে, অহরোধ উপরোধ সবেও, সে অপারগ। এই যুক্তিহীন অস্বাভাবিক আপত্তি কখন না যখন তাদের সমস্ত সংসার দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয়ে যায়-যায়। প্রেমিকও আশ্চর্য লোক, যার জন্তে সে রাজসিংহাসন ত্যাগ করার নজীরও দেখায় সেই প্রেমেরই লীলায় কেবল ছ'একবার নায়িকাকে আনৃতো আনৃতো সাহায্য করার কথা বলেই নিশ্চিত থাকেন। আমরা জানতুম প্রেম দুরূহ ঘোচায়, ছুটি ভিন্ন সত্তাকে একাত্ম করে—সাধারণ

লৌকিক বাধা বা সৌভাগ্যের প্রশ্ন সেক্ষেত্রে ওঠেই না। এ ছবিতে দেখি নায়ক ছ'একবার টি-টি করছেন এবং নায়িকা বড় বড় অর্থহীন কথা বলে গলে যাচ্ছেন। হৃষীকেশ নায়িকাদের সংসারের সব বিকিয়ে গেল, অনাহারের সম্মুখীন হল তারা, আর বিদ্বান নায়ক রাতে শুধু পায়চারি করে কাটালেন। তার কোনো জোর নেই, পেশীর জোরের কথা বলছি না, হৃদয়ের সম্বন্ধে জোর, একাত্তবোধের জোর নিজের যন্ত্রণার জোর। নায়িকারও প্রেমাস্পদের ওপর কোনো নির্ভরতা নেই—অসহায় অক্ষমের নির্ভরতা নয়—সব থেকে আপনজনের কাছে যে নির্ভরতা সেই স্বাভাবিক বৃত্তি; আস্থা নেই, যে আস্থার উৎস একমাত্র প্রেমই, যে আস্থা সব থেকে নিঃস্বার্থ কিন্তু অনিবার্য।

আসলে জোর করে চাপানো অবাস্তব ঘটনাবিহীন চিত্রনাট্যটি বেসামান্য হয়ে পড়েছে। একটি অবাস্তব ঘটনা ও পরিস্থিতি সামলাতে আরো পাঁচটি অবিদ্বান দৃশ্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কাহিনী হয়ে উঠেছে কৃত্রিম পারস্পর্যহীন যুক্তিশূন্য। পাত্র পাত্রীরও দাঁড়িয়েছে ফলে একই হাল—নায়ক প্রেমের জগৎ রাজ্য ছাড়তে রাজী থাকেন কিন্তু প্রেমিকা বিপদে আংটি বাঁধা দিয়েছে শুনে কাণ্ডজ্ঞান হারান, যা তা বলেন, একধাক্কায় অন্য একটি নৈরকে গিয়ে প্রেমের কথা শোনান। নায়িকার বধাটে বেয়াড়া ভাইয়ের নির্দোষ বাপ জেলে গেলেও চৈতন্য জাগে না কিন্তু হঠাৎ ডাল আনুভাতে খেতে বসে হতভূতি থাকিয়ে মার কাছে ছুঁচাটি ভালো কথা শুনে একেবারে জন্মান্তর ঘটে। নায়কের মিলমালিক দাদা নায়িকাদের সংসার ডুবিয়ে দিতে ছাড়েন না কিন্তু একটি রাত্রে নায়িকার উন্মাদ পিতার প্রলাপ শুনে তাঁর হৃদয় অকস্মাৎ ঝরনার মত তরল হয়ে ওঠে।

চিত্রনাট্যে এই অসার যুক্তিহীনতা ভিন্ন পরিচালনাক্ষেত্রেও খুশি করার মত কিছু নেই। নায়কনায়িকার প্রাথমিক ভালোলাগার অংশটুকু—যতক্ষণ তারা বারমাস জানালা দিয়ে পরস্পরকে দেখে ততক্ষণ—চিত্রনয় এবং প্রশংসনীয়। হৃদয়গ্রাহীও এই অংশটুকু। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে তাদের বাক্যলাপ আরম্ভ হয় অর্থাৎ পরিচয় তখন থেকে আর প্রায় সম্বন্ধ করা যায় না। লাইব্রেরীতে দুজনের যে ধরনের আলাপের মারফৎ প্রেমের ক্রমপরিণতি দেখানো হয়েছে তা শুধু কল্পনামূলক নয় পীড়াদায়ক।

অভিনয়ে প্রথমেই স্মিত্রা দেবীর নাম করতে হয়। তাঁকে আগাগোড়া শ্রীমতীই মনে হয়নি, উপরন্তু অভিনয়-বোধও (খারাপ চিত্রনাট্য ও অবিদ্বান চরিত্র সত্ত্বেও) তাঁর স্পষ্ট। তাঁর সংযমী কিন্তু ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি চোখে পড়ে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের পক্ষে সাজের বাহারটা অবশ্য কষ্টকর। গগলস চোখে নতুন বাড়িতে আসাটাও হাসি জোগায়। নবাগত প্রকাশ রায়ও হতাশ করেছেন। তাঁর মুখ অভিব্যক্তিহীন জোর জবরদস্তি করে মুখস্ত বলানো হচ্ছে মনে হয়। ছবি ও বিকাশ রায় আশা বা হতাশা কোনোটাই জাগাননি, স্প্রভা একঘেয়ে, অন্যেরা চলনসই।

ভবিষ্যতে স্মিত্রা দেবীকে আরো ভালো ছবিতে দেখার ইচ্ছা রইল এবং নরেন্দ্র নাথ মিত্রের গল্পের আরো পাকা চিত্রনাট্যরূপ।

ভোলামাষ্টার : কাহিনী : অয়কান্ত বক্সী ; চিত্রনাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য ; পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী ; ভূমিকায় : ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন, জীবন, চন্দ্রাবতী, প্রণতি, ভারতী, ও আরো অনেকে ।

ছবি দেখতে দেখতে মাথা ধরে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে এসে, চা খেয়ে, কপাল টিপে কিছুক্ষণ বসে থেকেও যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার মেলে না । কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক যৌথ ও একনিষ্ঠ কৃতিত্বে একটি নিখুঁত নিরুপেক্ষ চিত্র তৈরী করতে পেরেছেন । গল্প, চিত্রনাট্য বা পরিচালনার কোনো কঁাক দিয়ে যাতে বিমুগ্ধ শিল্পবোধ ছবিকে না স্পর্শায় তার জন্যে তিনজনেই অত্যন্ত সজাগ থেকেছেন চিত্রটির আগাগোড়া । কি গল্পের বিষয়বস্তু, কি গল্পকে প্রকাশ করার চিত্রনাট্যের কাঠামোয়, কি পরিচালনার আঙ্গিকে—কোথাও চলচ্চিত্রের বোধ সামান্যতম আঁচড় কাটাতে পায়নি ।

ছবিতে কি নেই ? মহত্ব, প্রেম, শঠতা, ঋণ, চরিত্রহীনতা, আদর্শ, মদ, খুনের চেপ্টা, দুর্ঘটনা, প্রায়উন্মাদ সাধু, গান—এককথায় বাজারের পরিবেশক ও প্রযোজকরা যাকে বলেন 'ড্রামা, তার সমস্ত মালমশলাই চিত্রটিতে ছড়িয়ে আছে । কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার যেন মানুষের প্রত্যেকটি স্বপ্নের ছোটবড় নানান আকারের বটিকা বানিয়ে তা শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে গুলে দিয়েছেন । মহত্ব হয় তো একপোয়া, প্রেম আধসের, শঠতা ছটাকখানেক, আদর্শ দেড় ছটাক—সব মাপা মাপা ; যখন যে জায়গায় পরিচালক এবং তাঁদের মনে হয়েছে এর একটা পদার্থের প্রয়োজন, সেখানেই দ্বিধাহীন চিন্তে ভাবনাচিন্তাবিনা তাঁরা কিছুটা তা ছিটিয়ে দিয়েছেন । ভোলামাষ্টারের ছেলে ছোটোবেলা থেকেই আই, সি, এস হবার প্রতিভা রাখে এটা প্রশ্ন করতে হবে ? দিলেন পরিচালক তোতাপাখীর মত বুলি সর্বস্ব তার কয়েকটা শট । ভোলামাষ্টারের আত্মগোপনহেতু এবং শঠতার জন্যে বিবেক দংশন দেখাতে হবে ? দেখাও তার পাথরে মাথা কোটা ও অতিনাটকীয় ভঙ্গীতে শূন্য চীৎকার, হে বিচারক তুমি আমার বিচার কর । প্রেম-প্রেম পরিবেশ রচনা ও চুলু চুলু কথা বলানো দরকার ? আনো বাগানের দৃশ্য, তাঁদের আলো । প্রামাণ্য নায়িকার বিরহযন্ত্রণা ও চোখের জলের প্রয়োজন ? দাও ঠেলে তাকে অল্পপস্থিত প্রেমিকের ছবির সামনে, চোখে ঝরাও গ্লিসারিনের কন্না, মুখে বিলাপ ।

দর্শক স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন কেন এ কান্না, বিরহ ? নায়ক কি আই, সি, এস হয়ে প্রমত্ত প্রেমিকাকে ভুলে গেছে ? জবাব : না । নায়ক তার পূর্ব প্রেম অটুট থাকা সত্ত্বেও কোনো শহরে আধুনিক মায়াবিনী পাষণ্ডীর মোহপাশে বদ্ধ ? জবাব : না । তবে কি উভয়ের প্রেম সম্বন্ধে গুরুজনদের আপত্তি এবং বাধা বর্তমান ? জবাব : না । তাহলে ? এ তাহলের কোনো জবাব নেই । নায়ক অহোরাত্রই নায়িকাকে স্মরণ করে, আধুনিক তার চোখে কোনো মায়ার ধোরই লাগাতে পারেনি, উভয়ের প্রেমে গুরুজনের শুধু সম্মতি নয় উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা বর্তমান, তবু কঁাদে রাধা একাকী বিজনে । হেতু ? একটু তাবলেই টের পাওয়া যাবে । পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের মনে হয়েছে . প্রেমের মধ্যে একটা সঙ্কট না থাকলে ব্যাপারটা লোকে

নেবে না, জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে, প্রযোজক হয় তো বলবেন ড্রামা কৈ। সুতরাং কারণ নাই থাকল প্রেমিকাকে কাঁদাও, ছবির গায়নে নিয়ে গিয়ে জলভরা কণ্ঠ ও চোখে বড় বড় কথা বলাও—দর্শক তো নির্বোধ, নিশ্চয়ই অশ্রুসজল হবে। শিল্প ফিল্ম বাজে কথা মশাই, মাথায় রাখুন, লোকে কি চায় আমাদের জানতে বাকী নেই। উপরি কয়েকটা গান দিন, আউট ডোর করুন একটু, (পথের পাঁচালীর পর থেকে) তারপর ছাড়ুন ছবিবাবুকে, বাস্ আর দেখতে হবে না।

বাস্তবিক দেখার কিছুই নেই। অবাস্তব, কল্পনামূলক, বিরক্তিকর এমন ছবি সংখ্যায় বেশি বেশি হলে বাংলা সিনেমাশিল্পের ভবিষ্যত অন্ধকার। এর একটি চরিত্র বিশ্বাস যোগ্য প্রাণময় নয়, প্রত্যেকটি যান্ত্রিক, মৃত, দমদেওয়া পুতুলের মত। একটি দৃশ্য নেই যা স্মরণীয়। একটি অভিনয়ও না। ছবি বিশ্বাসের যান্ত্রিক অতিনাটকীয়তা, চন্দ্রাবতীর প্রাণহীন চরিত্ররূপায়ন, কানুবাবুর অর্থহীন হাত-পা নাড়া কোনোটাই সিনেমা অভিনয়ের ধারে কাছে যায় না। এই অসাকল্যের জন্যে দায়ী অবশ্যই চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক, অভিনয়শিল্পী নন। ভালো চিত্রনাট্য ও পরিচালনার গুণে শিল্পী যে কতটা অভিনয়ে উদ্ভীর্ণ হতে পারেন তা কানুবাবুর এ ছবির অভিনয়ের সঙ্গে পথের পাঁচালীর চরিত্ররূপায়ন মনে করলেই সাধারণ দর্শকের কাছেও স্পষ্ট হবে।

অন্তান্ত বিভাগের কাজ যথা ক্যামেরা শিল্পনির্দেশনা সুরক্ষাটুকি কোনোটাই উল্লেখযোগ্য নয়। ক্যামেরার কল্যাণে ছবি অনেক সময়ই আউট অফ ফোকাস বা ভাসা ভাসা অস্পষ্ট দেখায়। ইন্ডোর আউটডোরে কাজও ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করে, মিলে যায় না আলোকচিত্র শিল্পীর দক্ষতার যাদুতে।

আমরা চিন্তিত হই প্রযোজকের ব্যবসার ফলাফল ভেবে।

চিত্রভাষী

সংযুক্তির তত্ত্বকথা

ভারতী চৌধুরী

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ “জ্যোতিষী” (তাঁর নিজের ভাষাতেই) নহেন। অথচ অমৃতসহর কংগ্রেসে তিনি গণনা কোরেছেন, “বাংলা-বিহার সংযুক্তি হচ্ছে এবং হবেই”।

রাজনৈতিক কারণে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সুবিধার অঙ্গুহাতে সংযুক্তির প্রস্তাব পণ্ডিত পন্থকে বে জোরের সঙ্গে সমর্থন কোরতেই হবে। জনসাধারণের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এর কি ফলাফল হবে তা ভাবার অবসর পণ্ডিত পন্থের মত লোকের নিশ্চয়ই নেই।

কয়েক বছর আগেও যেসব কংগ্রেসনেতারা ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের উগ্র সমর্থক ছিলেন, বোম্বাই ও উড়িষ্যায় জনতার “হিংস্র আচরণ” নাকি তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে! একটা চোখ কিন্তু তাঁরা নিজের থেকেই বন্ধ কোরে রেখেছিলেন—বোম্বাই ও উড়িষ্যার জনসাধারণ কেন হঠাৎ এত হিংস্র হয়ে উঠল তারই কারণ দেখার চোখটা। ঐ বোম্বাই ও উড়িষ্যাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবীর যে চরম অপমান তাঁরা কোরেছেন সে কথা নেহাৎই অবাস্তব। আর অন্ধদিকে দক্ষিণে যেখানে ‘রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন’ মোটামুটি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবী নেনে নিয়েছিলেন, সেখানে যে সম্প্রতি জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত শান্ত আছে, সে কথা তাদের মনেও এলো না।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ তাই ভারতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে দুইভাষাভাষী বা বহু ভাষাভাষী প্রদেশের নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করা হোলো। ডাঃ রায় ও ডাঃ সিংহের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবে স্বয়ং নেহরুও নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। আলাদীনের প্রদীপের মতই নাকি সংযুক্তি বাংলা বিহারের সকল সমস্তার রাতারাতি সমাধান কোরে দেবে। বাংলা-বিহারের ঋনিদ্বসম্পদ অচিরেই এই অঞ্চলকে “ভারতের ‘রুহুরে’” পরিণত করবে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অতি দ্রুত বেড়ে যাবে। কাউকেই আর ভাবতে হবে না—বেকারই হউন আর উদ্বাস্তুই হউন—সকলের সমস্তাই বিলকূল সমাধান হবে। দুইপ্রদেশ এক হওয়াতে শাসনতান্ত্রিক ঝরচ তো কমে যাবেই।

সংযুক্তি ভারতীয় ঐক্যের নিশ্চয়ই সাহায্য কোরবে। বিহার ও বাংলার বর্তমান শাসকশ্রেণীর ঐক্যই বড় কথা। তাতে দুই প্রদেশের জনসাধারণের অটনক্য ও বিশেষ অনেক গভীর হবে, আপত্তির কি আছে। চাকুরী, শিক্ষা সবক্ষেত্রে বিহারী ও বাঙালীরা মারামারি করুন তাতে বিধানবাবুর ও শ্রীকৃষ্ণবাবুর নতুন মিতালীর কোনও ক্ষতি হবে না। অন্ধ হবার আগে মাদ্রাজ প্রদেশে যেমন তেলেগু ও তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রত্যহই ঠোকাঠুকি লেগে থাকত সংযুক্ত বঙ্গ-বিহারে ঠিক তেমনটিই তো চাই।

নিশ্চুকেরা অবশ্য যুক্তি দেবে প্রদেশ যত বড় হয়ে উঠবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অস্বীকার করার ইচ্ছা ততো দ্রুত পাবে। সে যুক্তিতে বিধানবাবু ও শ্রীকৃষ্ণ

বারু নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন। তাঁদের যুক্তিতে প্রদেশ যত বড় হবে ভারতীয় ঐক্য ততই এগিয়ে আসবে।

কর্তাদের মতে বাংলা-বিহারের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সংযুক্তি ছাড়া হবেই না। জাতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব কিছুই নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৮ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইম্পাত থেকে আরম্ভ কোরে দেশের বড় বড় অনেক শিল্প যে ঐ সরকারের আওতায় যাচ্ছে সে তথ্য ভোলাই ভাল। শুধু মনে রাখতে হবে—সংযুক্তির ফলে আমাদের আর্থিক সম্পদ ও কারিগরীদক্ষতা রাতারাতি এত বেড়ে যাবে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনায়াসেই সংযুক্ত বাংলা-বিহারের দুটোর জায়গায় চারটে ইম্পাত কারখানা গোড়ে উঠবে।

নিম্নোক্তেরা হয়তো বলবে বিধানবাবুর বিরুদ্ধেই আছে সংযুক্তির পরেও দুই অঞ্চলে—বাংলা ও বিহারে—পরিকল্পনা হবে অনেকটা আঞ্চলিক ভিত্তিতে, এবং এক অঞ্চলের অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আর এক অঞ্চলে খরচ হবেনা। মহানানবিশ প্রস্তাব অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রতি বছরের নীতি নির্ধারণে দুই অঞ্চলের পরস্পরবিরোধী দাবীর সামগ্রিক কি কোরে হবে? এসব অকাজ নিয়ে বিধানবাবু ও শ্রীকৃষ্ণবাবুর কাজের সময় মাথা ঘামাবার কি দরকার!

সংযুক্তি হোতেই হবে। তা নাহলে অজয়ের জল বাংলার চাষীর উপকারে আসতে নাকি অরুণ বিহার বাধার সৃষ্টি কোরতে পারে। এত রেঘারেঘি থাকা সত্ত্বেও দামোদর উপত্যকার কাজ কেমন কোরে এগিয়ে যাচ্ছে বা পরস্পরের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে দুইপ্রদেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা কি কোরে হচ্ছে, এ-সব প্রশ্ন তো অবাস্তব।

জনসাধারণের জীবনধারণের মান তো বাড়বেই। দুটোজনে হয়তো তাকে দারিদ্র্যের বণ্টন নাম দিতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। যেমন, ১৯৪৯-৫০ সালে জন-কল্যাণের জন্য বিহারে মাথাপিছু সরকারী খরচ হোতো মাত্র বারো আনা এগারো পাই, বাংলায় হোতো তিনটাকা ছয় আনা দশ পাই। সংযুক্তির ফলে উভয় অঞ্চলেই যদি সমান খরচ করা হয়, তা হলে মাথা পিছু জনকল্যাণের জন্য খরচ হবে একটাকা দু আনা।

সংযুক্তির ফলে শাসনতান্ত্রিক খরচও নাকি কমবে। বিধানবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী দুটি আইনসভা, দুটি হাইকোর্ট, দুটি রাজধানী, দুটি আঞ্চলিক পরিষদ যদি হয়, তার খরচ কে দেবে, গোলমালে কথা বটে। কিন্তু সোজা প্রস্তাবে এত গোলমাল কেন?

সংযুক্ত প্রদেশে বাঙালীকে শুধু কোলকাতায় বা বিহারীকে শুধু পাটনায় চাকুরীর খোঁজে নিরাশ হোতে হবেনা। তখন যেখানে সেখানে হাত বাড়ালেই চাকুরী মিলবে। অবশ্য বিধানবাবু বোলেছেন, কয়েকটা বড় চাকুরী বাদ দিয়ে সংযুক্ত প্রদেশে সরকারী চাকুরীর প্রাধা মনোনয়ন আঞ্চলিক ভিত্তিতেই হবে।

উদ্বাস্তুদের তো ভাবনাই নেই। আর শেয়ালদা স্টেশনে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হবে না। বিহারের সব জমি তো তাদের জন্য। পৌহাড় আর জঙ্গল বাদ দিলে কিন্তু বাংলা ও বিহারের ঘনবসতির হারে বিশেষ কিছুই পার্থক্য নেই। উত্তরবিহার ঘন বসতির হিসেব ৮৫৯, পশ্চিমবঙ্গের সমভূমিতে ৮৯৭। অতএব গরমিল কৈ? উদ্বাস্তু

পাঠালেই তো বিহারটা বাংলা আর বাংলা বিহার হয়ে যাবে। এই তো একাক্ষরকরণ।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সংযুক্তি প্রস্তাবের পরেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শুধু বাংলায় বা পূর্বভারতে উদ্বাস্তুদের সকলের জায়গা পাওয়া সম্ভবপর নয়। যে সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেখানে বিধানবাবু নিজেরও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্মতি নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি সুদূর মহীশূরে, উদ্বাস্তুদের জন্য ঘনি মেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন।

এই সংযুক্তি প্রস্তাবের হোতাদেরও জিগীষাবৃত্তিরও কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না সংযুক্ত রাজ্যে। তাইতো বিধানবাবু সরবে বোলছেন বাঙালীরা বুদ্ধি দিয়ে বিহারীদের দাবীয়ে রাখবেন। আর শ্রীকৃষ্ণবাবুর বীরহৃদয়ও একই ভয়ে কম্পিত নয়, বিহারীরা সংখ্যার জোরে বাঙালীদের উপর এক হাত নিয়ে নেবে। আর হ্রস্বলব্ধানে তো উভয়েরই রক্ষাকবচ বাঁধা হবে। বিধানবাবুর কোন কোনও সমর্থকেরা আবার উঠে পড়ে প্রমাণ করার চেষ্টায় আছেন যে সংযুক্ত রাজ্যেও বাঙালীরাই সংখ্যায় বেশি হবেন, কারণ পূর্ববঙ্গে একবার ডাক দিলেই হয়, সব হিন্দুরা ভয়ভীতি বোধে চলে আসবে।

মিলন-প্রস্তাব পাশও হচ্ছে চমৎকার ভাবে। স্বয়ং নেহরুই যখন, আশীর্বাদ দিয়েছেন তখন না ভেঃ। জনসাধারণের মতামতের আর দরকার কি! বর্তমান আইন সভাই এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা সেখানে বিধানবাবু ও কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য। গত নির্বাচনে যে সংযুক্তির প্রণয় ছিলো না, সে-কথা মনে কোরে দিয়ে বামপন্থীরা কুৎসিৎ ননোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছে।

প্রস্তাবের গুঢ় উদ্দেশ্য আরও মহৎ। বিড়লাজীর কাগজ, পাটনার নামকরা 'সার্চলাইট' তো খোলাখুলি বোলেছে যে এর ফলে বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন মুছে যাবে। এর চেয়ে বড় লাভ আর কি হোতে পারে। মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী আরও বিশদভাবে বোলেছেন, 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অনুমোদন ১লা অক্টোবর কর্তৃকরী হলে কেবল এবং বাংলায় 'কমিউনিষ্ট সরকার' হবার নাকি সম্ভাবনা আছে। সে সব অপচিন্তাই তো দূর কোরতে হবে।

ব্যাপারটা অবশ্য গভীর ভাবে ভাবার কথা। এই যে সব বড় বড় শিল্পস্থাপনের কথা হচ্ছে দেশে তাতে তো আবার বেশুরো মজুরদের দলবান্ধবে, তাই তো আগে থেকে ঘর সামলাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। বহুভাষাভাষী প্রদেশ হলে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে তাতিয়ে দিলেই তো চলবে। যন্ত্র ইংরেজ, তারা তো এ বিশ্বে শিখিয়েই দিয়েছে। বাংলা-বিহার যখন ভারতের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল তখন তাদের সংযুক্তির প্রয়োজন তো সবথেকে আগে।

যুক্তির ধামা যখন ভরে উঠেছে তখন মূল কথাটাই ধামাচাপা দেওয়া যাক। এক ভাষাভাষী লোক নিয়ে রাজ্যগঠন জাতির কৈশোর-অবস্থায় স্বাভাবিক এটা অবশ্য সব ইতিহাস বলে। বাংলা ও বিহারের অর্থনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি যে সমান তালে হয়নি এ কথা যে ঐ কৈশোর অবস্থারই সাক্ষ্য দেয়, সে কথা আর বেশাগুর ভুলে যাওয়াই তো মজল। সমাজের উন্নতির জন্যে দুইপক্ষের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিয়ে পরস্পরের সৌহার্দ্যচর্চাবার কথায় কেন কথা কর্পপাত করা।

গাভারের জন্য নিজ নিজ পারিবারিক ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতার তত্তে অভিনবস্থ কোথায়, অতএব ঐ সকলের-জানা তত্তেও বাতিল ।

মুলতানী তত্তে ব্যাপারে জনসাধারণের মাথা গলাবার কি প্রয়োজন । মুহম্মদ তুঘলকের এক গ্রহরের লীলাতে জনসাধারণের কতটুকু ক্ষতি হতে পারে ? বাদশাহী সিংহাসন তো আর তাদের নয় । অর্বাচীনে কি বুঝবে যে এই সংযুক্তি প্রস্তাবে কত অমূল্য নুকানো আছে ।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মাব ও ফাস্তনের অগ্রণী একত্রে একসঙ্গে প্রকাশ করা হল । গ্রাহকরা সংখ্যার হিসাবে কাগজ পাবেন, অর্থাৎ যাদের যেমানে চাঁদা শেষ হচ্ছে তার পরের মাসের প্রতিমাসেও তাঁদের যাবে ।

এ-মানে অগ্রণী ছাপানো হত বাইরে, আমাদের নিজস্ব ছাপাখানার বন্দোবস্ত ছিল না । ফলে অনেক চেষ্টা সত্তেও অগ্রণীর প্রকাশ ঠিক সময়ম হয়নি, সব সময়ই পত্রিকার প্রকাশনাকাল পিছিয়ে থাকত । সম্ভ্রতি আমরা পত্রিকা প্রকাশের নিজস্ব ব্যবস্থা করেছি, এবং আশাকরি ভবিষ্যতে অগ্রণী প্রতিমাসেই সময়মত বেরোবে । সঙ্গে সঙ্গে কাগজকে নবপরিকল্পনায় সাজানোর ভারও আমরা নিয়েছি, যাতে অগ্রণী আরো জনপ্রিয় ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে । পাঠকদের অনুরোধ তাঁরা যেন অগ্রণীর ভালোমন্দ রূপান্তর সম্বন্ধে মতামত জানান ও উপদেশ দেন । ইতি—

সম্পাদক, অগ্রণী

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার স্মৃতিতে শুধু বিজ্ঞানের পথচারী-ই নয়, অতি সাধারণ মানুষও একজন পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনা বোধ করবেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার যে বিরল আদর্শ মেঘনাদ রেখে গেলেন, তা বহুকাল মানুষকে প্রেরণা দেবে। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে ঢাকা জেলার এক নগণ্য গ্রামে যে মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যে পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের জগতে অসামান্য কীর্তিবান হবেন একথা সম্ভবত কেউই কল্পনায় আনতে পারেননি। শিশু বয়সে পিতা জগন্নাথ চন্দ্রের মুদী-দোকানেও তাঁকে বসতে হয়েছিল এবং সে কাজে নিদারুণ ব্যর্থ হয়েছিলেন, এ কাহিনী হয়তো অনেকেরই জানা নেই। ছাত্রজীবনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সালে তিনি বিজ্ঞানের ডক্টারেট এবং ১৯২০ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্মৃতি লাভ করেন।

বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তিনি অননুসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পদার্থবিদ্যা তথা নভোপদার্থবিদ্যা (এস্ট্রো-ফিজিক্স) বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা বহুকাল স্বীকৃত থাকবে। তাঁর প্রধানজীবনে আবিষ্কৃত “তাপজ আয়নায়ন তর” (থিওরী অব থার্মন আয়নাইজেশন) তাঁকে পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর যে দশটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে তাঁর আবিষ্কৃত তরটি তার মধ্যে অন্যতম। সূর্য ও অন্যান্য তারকাদের বস্তুস্বরূপ জানার পথে এ-তর নতুন আলোকসম্পাত করেছিলো। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্রুভে বলেছিলেন যে, ‘কিরশফ-এর বর্ণালী বিশ্লেষণ (স্পেকট্রাল এনালিসিস) কিংবা ফ্রাউনহফারের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে আলোড়ন এনেছিলো, ডাঃ সাহার কাজ অনুরূপই যুগান্তকারী। তাঁর কাজ আমাদের সত্য প্রেরণা দেয়।’

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভালো নোবেল লরিয়েট কম্বটন নোবেল পুরস্কারের জন্য ডাঃ সাহার নাম প্রস্তাব করেন। স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কাজ করেছেন তিনি। ১৫ বছরের বেশি সময় তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। ইটালীয় সরকারের আমন্ত্রণে ভড়িংকোবের (ইলেকট্রিক ব্যাটারী) আবিষ্কৃত ডাক্তার শতবার্ষিক জন্ম-উৎসব উপলক্ষে ইটালীতে ও নিউটনের ত্রিশতবার্ষিক জন্মোৎসবে তিনি ইংলণ্ডে যান। এ ছাড়া ১৯৪৪ সালে আমেরিকা ও ’৪৫ সালে সোবিয়েৎ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউট তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করা ছাড়া সমগ্র জীবনে তিনি অগণিত সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানসেবীর মতো কেবলমাত্র গবেষণাগারের চারদেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি তিনি, ছঃখলাঙ্কিত মানুষের পক্ষ নিয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নেমেছিলেন। তাঁর যুক্তিপ্রবণ মতামত বানপন্থী রাজনীতিকে বহুসময় চালিত করেছে। পূর্ববাংলা থেকে আগত অগণিত ছিন্নমূল মানুষ তাঁকে স্মরণ করেন ইতিমুহুর্তে। পশ্চিম বাংলার মাটিতে তাঁদের নতুন ঘর-বাঁধার সংগ্রামে মেঘনাদ ছিলেন একজন অকৃত্রিম সাথী ও শুভানুধ্যায়ী।

তাঁর বহুমুখী কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন গভীর সমাজসচেতন কর্মী। সমাজকল্যাণ, রাজনীতি ও শিক্ষা প্রচারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তার সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর ভূমিকা আমাদের মুগ্ধ করে।

তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাধারণ মানুষের কাছে সুবোধ্য নয়। কিন্তু সমাজ গঠনের সংগ্রামে তাঁর অপরিণীত দক্ষতার পরিচয় পেয়ে বহু মানুষ তার অনুরাগী হয়েছেন। অসংখ্য সংগ্রামের পুরোভাগে তারা তাঁকে নেতার আসন দিয়েছে। এই কিছুদিন আগে বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধী সম্মেলনে তথ্যসম্বলিত এক সুনিপুণ বক্তৃতায় তিনি আমাদের মুগ্ধ করলেন। আর তারই তিন দিনের মধ্যে রেডিও তরঙ্গে খবর ছড়ালো, তিনি নেই। পরিকল্পনাকমিশনের সভায় যাবার পথে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে।

কোনো মানুষ অনন্তকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন এমন আশা পোষণ করা বৃথা। কিন্তু সমস্ত কাজ শেষ হবার বহু আগেই প্রকৃতি ছিনিয়ে নিলো তাঁকে। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আমাদের মধ্যে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর অগণ্য ছাত্র, সহকর্মী ও গবেষণাগারের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে রইলেন তিনি। শরীর বিনষ্ট হলেও মেঘনাদের জ্ঞানবান আত্মার বিনাশ নেই। পুস্তকের পৃষ্ঠায়, পদার্থবিজ্ঞানীর পরিক্ষাগারে এবং সর্বোপরি অগণ্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তিনি সঞ্চারিত রইলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

অজয় রায়চৌধুরী

॥ ১০৭২২ ॥

ইবসেনের ওয়াইল্ড ডাক্-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক “বনহংসী”।
রচনা : অরুণ বসু, পরিচালনায় : দেবব্রত সুরচৌধুরী। ভূমিকায় আছেন সতীপ্রসাদ বসু, নির্মল ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত, অজিত রায়, অজিত দত্ত, সুনীল সাহা, সাধনা রায়চৌধুরী, লীলা শর্মা ও গৌরী সেনগুপ্ত।

সৌখিন অভিনেতাদের দলের মধ্যে নবনাট্য সম্প্রদায়ের একটা সুনাম আছে। সেই জন্য ‘ওয়াইল্ড ডাক্’-এর মত একটা নাটক অভিনয় করা এঁদের কাছে দুঃসাহস না-হয়ে বরং একটা সার্থক সৃষ্টিই হয়েছে একথা সত্য। কারণ নাটক হিসাবে ‘বনহংসী’কে একটা সার্থক নাটক বলা যেতে পারে, যদিও যবনিকা সম্পর্কে বেশ একটু আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে।

অভিনেতাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সতীপ্রসাদ বসুর। অরবিন্দের মত একটা টিফ্ রোল-কে এইরকম ভাবে প্রাণবন্ত করার জন্য তিনি সত্যি অভিনন্দন যোগ্য। তিনি যে একজন শক্তিশালী অভিনেতা আর তাঁর চরিত্রের অভিনয় যে সত্যি মনে রাখবার মত, একথা সত্যি স্বীকার করতে হবে। হরেনবাবুর চরিত্রে রমেনবাবুর অভিনয় মোটামুটি ভালই। অভিনয়ে যেটুকু ত্রুটি ছিল তা তাঁর সুন্দর চেহারা আর বাচনভঙ্গীতে ঢেকে দিয়েছে। তাপসের চরিত্রে দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত আনাদের মনে তেমন রেখাপাত না-করলেও সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে তাঁর একটা প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অজিত রায়ের অভিনয় দেখে মনে হয় তিনি বোধ হয় প্রফুল্লবাবুর চরিত্রটিকে ভাল ভাবে বুঝতেই পারেননি। ভজহরির চরিত্রে বিভূতি মিত্রের অভিনয় তেমন সুবিধার না হলেও গদাধর চরিত্রে সুনীল সাহা ভাল অভিনয়ই করেছেন। সেই দিনকার অনেক দর্শকের সংগে আমিও একমত যে শচীনের চরিত্রের জন্য অভিনেতা নির্বাচনে পরিচালক মারাত্মক ভুলের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জন্যই নাটক অনেক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র সুঅভিনীত হয়েছে বীণার চরিত্রটি। এই চরিত্রে সাধনা রায়চৌধুরীর অভিনয় আর ভাবের অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী। শান্তির ভূমিকায় লীলা শর্মাকে প্রথমদিকে আমাদের ভালই লাগে। আর মীনু চরিত্রে গৌরী সেনগুপ্তার অভিনয় শেষের দিকে একটু অতিঅভিনয় দোষে ছুঁতে হলেও তার অভিনয়প্রতিভা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্য শেষের দিকে যে ধরনের সংলাপ দেওয়া হয়েছে তার মুখে ঐ ধরনের সংলাপ বেমানান লাগে। আলোকসম্পাত নাটকে কিছুটা সাহায্য করলেও মিউজিক তেমন কিছুই করতে পারেনি।

আর একটা কথা বলে শেষ করি। প্রোগ্রামের ব্যাপারটা অত্যন্ত সস্তা ক্রটিই পরিচয় দিয়েছে। ওতে কোনও শিল্পকৃতির পরিচয় নেই।

সত্যভাবী।

॥ গুণ্ডা-গুণ্ডা ॥

মৃত্যুভীর্ণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । লোকায়ত সাহিত্য চক্র, কলকাতা থেকে প্রকাশিত, দাম আট আনা ॥

লুই আরাগঁর কবিতা যখনই পড়ি, তখনই বাংলা কাব্যসাহিত্যের কথা মনে পড়ে । আরাগঁর সুস্পষ্ট প্রান্তরেখা-নিদিষ্ট কবিতাগুলি দ্বিপবিক—তার প্রথমভাগে একটি মনের বহুমনে প্রসারকামনায় বৈদ্যলীলা, দ্বিতীয়ভাগে, বহুমনের একটি মনে সংহতির মাধ্যমে সমাজচেতনার বিচিত্র প্রকাশ । আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয়-বস্তুও এই দুটি পর্বে বিভক্ত । তফাৎ এই, আরাগঁর ক্ষেত্রে প্রথমটির অতিক্রমণে দ্বিতীয়ের আবির্ভাব । বাংলা কাব্যে দুটি ধারাই পাশাপাশি (এমনকি, একই কবির মানসেও অনেক সময়) বহমান ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার কাব্যজগতে স্বপ্রতিষ্ঠিত ও সুস্বীকৃত । ব্যক্তিসাফিক রচনা তাঁর দুর্লভ নয় ; কিন্তু সমাজচেতনাই যে তাঁর ভাবনার মূল স্রস সম্প্রতি প্রকাশিত ‘মৃত্যুভীর্ণ’ কাব্যগ্রন্থে তার স্বাক্ষর বিদ্যমান ।

বিভিন্ন জাতের ও গোত্রের কবিতা এতে স্থান পেয়েছে কিন্তু সকলের সেই এক স্বায়ীভাব—‘সামাজিকতা’ । পতন অভ্যুদয়-বন্ধুরপন্থায় কাব্যজীবন ক্ষতবিক্ষত ।

তবু সে ভাস্বর, চিত্রে প্রতিমায় রঙের বিশ্বয়ে
দেখি তাকে অপরূপ প্রীতি সখা শপথ আশ্রয়ে ॥

(একটি কবির জন্ম)

বৈষয়িক বিচারে মৃত্যুভীর্ণের কবিতাবলী তিন শ্রেণীর । কতকগুলি স্মরণিকা—কবি ও কর্মী শিল্পী ও দেশসেবকের । কিন্তু শুধুই স্মরণ নয়, বর্তমানিকের প্রেক্ষাপটে আলোকিত করে তোলা—তাইতো তোমারি কণ্ঠে বেলাই শপথ গঙ্গোত্রীর

ধুম থেকে ক’লকাতায় গঙ্গা আজি বঙ্গোপসাগরে ।
(বিদ্যাসাগর)

কিংবা

ক্রান্তি বলয়ের পথ ধরে

সেগান ছড়িয়ে গেল সর্বত্র হাটে ও মাঠে, খামারে বন্দরে ॥

(মৃত্যুভীর্ণ, যতীন দাসকে নিবেদিত)

দৃষ্টিভংগির এই আধুনিকতাই ‘দময়ন্তী’, ‘নটরাজ’, ‘প্রহণ’ কবিতাগুলিকে ফ্যান্টাসীর প্রতীকবাহনে সাম্প্রতিক কোরে তুলেছে । কবিচিন্তের সেই পরিবেশ-চেতনার একই ধুয়া ‘দময়ন্তী’তে—

হায় ।

তোমার শূণ্যল আঁখি নিয়ে যদি দিত কেউ ছেঁড়া ময়লা একটুকরো বসন
হয়তো বাঁচতাম আমরা...কিন্তু বাক্য অবাস্তব । তোমার ধুম্যানো প্রয়োজন ।
কিংবা ‘নটরাজ’ কবিতায়—

অন্য নর্তকের

ছায়া নামে দক্ষযজ্ঞে, সমুদ্রমগ্নে—

তারি বার্তা দূরে ব'সে অন্নপূর্ণা শোনে ।

অন্যান্য কবিতাগুলি সমকালীন জীবনপ্রবাহের চলমান স্রোত থেকে মনের আধারে তুলে-নেওয়া । ভারতবর্ষ-১৩৫৯, 'নভেম্বর-৫৫,' 'চেতনা-সময়' ও ঘুড়ি দ্বিধাবিভক্ত শিবির-মানসের মেজাজ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে । বক্তব্যবিষয় নবাগত না হলেও প্রকাশ-ভংগিনায় বীরেনবাবুর স্বকীয়তা বর্তমান ।

এবং সেই স্বকীয়তার মধ্যে একটি হলুদ স্রের মীড় বীরেনবাবুর সবুজ আশার ফাঁকে মাঝে মাঝে কানে আসে । ব্যক্তিজীবনে দিশাহারী বিষমতা সমাজচেতনাকে হয়তো সচকিত করে, কিন্তু নিরাশাবাদী হওয়া তার উচিত নয় । বিশেষত বীরেনবাবুর বলিষ্ঠ লেখনীতে যা অনপেক্ষিত, সেই ধূসর বিষমতার ছায়াবিস্তার 'মৃত্যুস্তীর্ণ' কাব্যগ্রন্থকে মৃত্যুর কণ্ঠলগ্ন করেছে । যে কবি বলতে পারেন—

পৃথিবীর সর্বত্র হৃদয়

এসে গেল, গানে তার ভরে গেল গানের সময় ॥ (চেতনা-সময়)

তিনি যখন বলেন—

প্রাণের বিশ্বাস

চেতনায় পাবো বলে শীতের বিকেলে

রুদ্ধ জানালায় আঁকি ছরস্তু আকাশ—

তখন তো পালাতক মনকেই পাই অসফল স্বপ্নতৃষ্ণির আসরে । আবার অন্যদিকে এই মনকে তিনি পাঠিয়েছেন খামারে-বন্দরে জংগী জীবনের সানিল হোতে । এই অন্ধকার দিকের ব্যংগময় বাস্তব রূপই তাঁর হাতে ফোটে ভালো বলে আমার ধারণা । আর একটি অসুরোধ বীরেনবাবুর কাছে । তিনি প্রতীক-সংকেতের কুয়াশাঘেরা আবছায়ালোক থেকে আরও সরে এলে ভালো হয় । জানিনা, ফরাসীদেশের সাধারণ মানুষ আরার্নর কবিতাতে কতোটা রস আন্বাদন করতে পারে ; কিন্তু জনগণের কবিতাকে জনকয়েকের কোঠায় আবদ্ধ রাখা অসুচিত মনে করি ।

বীরেনবাবু দুর্বোধ্য কবি নন । তাই অথবা প্রতীক-বাহুল্যের দুর্লভবোধ্য রূপের সাধনা থেকে সরে আসা সহজ কবির দাবি রাখি তাঁর কাছে । তাযে তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় 'বেহলা-নাচানো স্বর্গ' কবিতাটি তার পরিচায়ক । এটিকে বাংলা কাব্যজগতের একটি ধনী সম্পদ বোলেই মনে করি ।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি পাঠশেষে যে অসুরগণ মনে থাকে, তা হোল—হুঃখদহনের কঠিন পালা থেকে হুঃখহরণের রক্তরঙীন শপথে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—এড়িয়ে নয়—মৃত্যুস্তীর্ণ হওয়া । তাই 'পালাতক মনের প্রতি তার নির্দেশ দান—

তবে ফিরে চল মন হুভিক্ষের মিছিলে বন্দরে ।

বীরেনবাবুর এটি তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ । প্রথম দুটির মতোই অলংকৃত । ক্ষীণ-কলেবর ও স্বল্পমূল্যের । এর দুটো সুবিধে । প্রথম, কেনবার সময় দ্বিধাটি কম থাকে, আর সুদৃশ্য লাইব্রেরীর শুশোভন বুককেসে সাজিয়ে রাখা যায় না ।

অঙ্গী

অষ্টম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৬২

ভেলরং

দেবকুমার মৈত্র

[গল্প আমি উত্তমপুরুষে ছাড়া আরম্ভ করতে পারি না কিছুতেই । এ আমার আঙ্গিকের দুর্বলতা । পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া, যাদের চলতি পথে দেখি প্রায়, তাদের বাদ দিয়ে একেবারে কল্পনার গজদন্তমিনার আমি তৈরী করতে পারি না । আর তাদের কথা লিখতে গেলে আপনা থেকেই আমার নিজের কথাও এসে যায় । কারণ, তাদের মধ্যে আমার নিজেরও কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে ।

কিন্তু পরিচিত ব্যক্তিচরিত্রকে নায়কের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে গল্প লেখাও আমার কাছে দুর্কর মনে হয় । প্রথমত এতে বহুবিশ্লেষের সম্ভাবনা থাকে প্রচুর, দ্বিতীয়ত অনাবশ্যক সেক্টিমেণ্টের সংক্রমণ থেকে কলমকে রক্ষা করাও কঠিন আর্ট । কমলেশকে নিয়ে গল্প লিখবো একথা আমি নিজে কোনদিন ভাবিনি । ছেলেটা অদ্ভুত আচার আচরণে বরাবরই, তবু কোনদিনই কল্পনা করিনি এমন একসময় আসবে যখন ওকে নায়কের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে গল্প লিখতে হবে আমাকে । একমাথা এলোমেলো চুল, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রং, দীর্ঘ বলিষ্ঠ পেশল শরীর, তীক্ষ্ণ বাঁকানো নাক, কথায় বার্তায় আচার আচরণে সাধারণ থেকে একটু অন্তরকম কমলেশই এ গল্পের নায়ক । আমার ভূমিকা দর্শকের । সত্যি কথা বলতে কি, হয়তো তা-ও নয় ।

কমলেশের কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে বিকটাকৃতি তিনটে কুকুরের চেহারা । এক কলেজের সময় ছাড়া, কমলেশ বাইরে বেরিয়েছে অথচ কুকুরগুলোর একটাও সাথে নেই এরকম দৃশ্য আমার মনে পড়ে না । পদ্মায় স্নানে গিয়েছে, সঙ্গে রয়েছে— বিকেলে মাঠে এসেছে আড্ডা-দিতে, সঙ্গে রয়েছে ; কুকুরসমূহ প্রাণ । সেই কমলেশ যখন প্রথম ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে এই খবর আমাদের বহুমহলে ঘোষণা করে আমরা

সকলেই চমকেছিলাম। আমরা সকলেই তখন কলেজের ছাত্র, সব ফোর্স ইয়ারে উঠেছি, বয়সও সামান্য। অতো কমবয়সে, পড়ুয়া ছাত্রজীবনে আমাদের কারোই বিয়ের সম্ভাবনা ছিলনা। কমলেশের বাবা ছিলেন উকিল, পসার ছিল প্রচুর। দুহাতে উপার্জন করতেন, দুহাতে খরচ করতেন। কিন্তু শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল বলেই অতো কমবয়সে কমলেশের বিয়ে দেবেন তিনি এটা আমরা ভাবিওনি। কমলেশও ভাবেনি। তাছাড়া, ওকে তো আমরা জ্ঞানতাম, মেয়েদের সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ভরপুর ছিলো ওর মন। মেয়েদের ও বিশ্বাস করতো না কোন কারণেই। ওর এক কাকীনা যৌবনে অন্য এক পুরুষের সাথে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে ওর অশ্রদ্ধার এবং ঘৃণারও সেই ছিলো মূল কারণ। ওর মনের সেই গভীর ক্ষতটা, যা ও অত্যন্ত সন্দোপনে লালন করতো মনে মনে, সেটা আর কেউ না-জানলেও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আর, শুধু যে মেয়েদেরকেই মনে প্রাণে ঘৃণা করতো ও তা নয়। যে সব ছেলেরা মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে ঘুরতো তাদের দুচক্ষে দেখতে পারতো না ও।

ছেলেবয়সের একটা ঘটনার কথা মনে আছে এখনও। ঝাউতলার ধার দিয়ে বাঁধানো সড়কির যে সড়কটা আমাদের পাড়ার রাস্তার সাথে এসে মিশেছে ঠিক সেই মোড়টাতে লাল রংএর একতলা একটি বাড়িতে সোনালী নামে একটি মেয়ে থাকতো। সোনালীর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবো না আমি। বর্ণনা দেবার মতো কিছু নেই। সাধারণ বাঙালী পরিবারের যে কোন মেয়ের মতো দেখতে। মুখের লাবণ্য ছাড়া! ওইটাই ছিলো সোনালীর সম্পদ। সোনালীর জন্মে অনেক ছেলেই ঘুরঘুর করে ঘুরতো ও বাড়ির আশেপাশে। একটি ছেলে, অন্য পাড়ার, তার মধ্যে বেশি লোন্টুপ ছিলো। একদিন বিকেলে খেলাধুলোর পর আমরা দু'জন পদ্মার তীরে এনব্যাকমেন্টের ওপর বসে ছিলাম, সূর্য খুনখারাপি রঙের হয়ে নেমে এসেছিলো নদীর বুকে—সমস্ত পশ্চিম আকাশ লালে লাল। যেন কোন অদৃশ্য শিল্পী তুলি বুলিয়েছে ক্রিমসন্ রঙে ছুপিয়ে। সাননে সুবিস্তৃত বিশাল নদী, ওপারে ধোঁয়ার মতো তীরের আভাস। গাঢ় গেরুয়া রঙের জল অতৃপ্ত আকাশায় ঢেউ হয়ে তীরে এসে মাথা কুটেছে। শহরকে পদ্মার প্রাস থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে উঁচু বাঁধ দিয়ে। বাঁধের নিচু দিয়ে সধবার সিঁধির মতো লাল রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। রাস্তার একধারে সেন্ট্রাল জেলের উঁচু ঢেউ খেলানো পাঁচিল, অন্যধারে বাঁধের উপর বাবুলার বন। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে বাক নিয়েছে ঠিক সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে সারি সারি ছবির মতো সরকারী অফিসারদের বাংলো। ক্রিমসন রং আকাশ, লজ্জায় লাল নদীর জল, সধবার সিঁধি রাস্তা আর দূর দিয়ে চলমান একটি ট্রামার, এই সবের জন্মই কিনা জামিনা, একটা অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছিলো। আমরা দুজনে কেউই কোন কথা বলছিলাম না, নীরব নিশ্চপ। পদ্মায় ইলিশমাছ ধরার নৌকাগুলো স্রোতে ভাটিয়ে যাচ্ছিলো জাল পেতে, আবার উজিয়ে আসছিলো বৈঠার টানে টানে।

ওই ছেলেটা, না রে অশোক? হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কমলেশ।

এঁটা চমকে তাকিয়ে বললাম।

ওই ছেলেটাই তো !

তখনও আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি । আবার প্রশ্ন করলাম, কিসের ?
অধৈর্য হয়ে কমলেশ বললো, আরে, সোনালীদের বাড়ির আশেপাশে ঘুর
ঘুর করে রাতদিন, এই ছেলেটাই তো !

বললাম, হ্যাঁ ।

হন্থন্থ করে হেঁটে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলো কমলেশ, আমিও গেলাম
পেছনে পেছনে ।

এই, শোনো । গম্ভীর স্বরে ছেলেটাকে ডাকলো ও । তারপর, এক
নিমেষের মধ্যে ঠাস করে একচড় বসিয়ে দিলো ছেলেটার গালে । কেমন যেন
ভাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলো ছেলেটি । ইতিমধ্যে কমলেশ তার কান ধরে আর এক
চড় বসিয়েছে । বাঘের উদ্ভূত খাবার সামনে ছাগলের মতো থরথর ক'রে কাঁপছিলো
ছেলেটি । একটা ঝটকা ধাককায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কমলেশ বললো, ফের যদি
কোনদিন তোনাকে আমাদের পাড়ায় দেখি নেয়ের গন্ধে ঘুরঘুর করতে তাহলে ঠ্যাং
ভেঙে দেবো । মনে থাকে যেন ।

কিছুক্ষণ পরে আমি কমলেশকে বলেছিলাম, শুধু শুধু ছেলেটাকে মারলি ও
আসে যায় তাতে তোর কি ।

এই সব মেনিমুখো ছেলে আমি ছুচক্কে দেখতে পারি না । একটু খেমে তারপর
কমলেশ বলেছিলো, তোরা যে যাই বলিস, ওই নেয়েটাকে—মানে সোনালী—আমার
খুব সুবিধের মনে হয় না । সকাল নেই ছপুর নেই রাতদিন হাঁ করে জানালার কাছে
কাঁড়িয়ে আছে ।

কমলেশের মুখে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এখনও শুনে সেই ঘটনাটা আমার
মনে পড়েছিলো । সেই সোনালীর সাথেই কিনা—!

খবরটা প্রথম শুনে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম, তুই বলছিস কি কমলেশ !

কমলেশ বললো, আমি ঠিকই বলছি ?

বললাম, তুই আপত্তি করছিস না কেন ?

কি করবো, বাবা কথা দিয়েছেন সোনালীর বাবাকে । ওকে তাঁর খুব পছন্দ
হয়েছে । আর, বাবাকে তো জানিস, একবার যখন কথা দিয়েছেন সমস্ত পৃথিবীও
যদি বিরোধী হয় তবু নড়চড় হতে দেবেন না তার ।

বললাম, কিন্তু এতো কমবয়সে বিয়ে কিসের ? তুই এখনও কলেজের ছাত্র ।
বাবাকে বলতে সাহসে না কুলোয় মাকে বুঝিয়ে বলতে পারিস ।

তুই বুঝতে পারছিস না অশোক । কমলেশ বললো, কোনউপায় নেই
আর ।

এসব অনেকদিন আগেকার ঘটনা । এখন লিখতে বসে মনে পড়ছে । কমলেশের
সাথে কলেজজীবনের পর পরই আমার ছাড়াছাড়ি । আমি চলে গিয়েছিলাম মজা
চাকরি করতে । আর কমলেশ আনন্দাবাদ । ছুটিছাটায় মাঝেমাঝে কখনও দেশের

বাড়িতে যেতাম, সে-ও প্রথম দিকে। তারপর বাবা মারা গেলেন। দেশের সাথে সম্পর্কও আমার সেইখানেই শেষ। তারপরও বছর দশেক কেটে গেছে। এইবারে এতোদিন বাদে আবার গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িটা এতোদিন ভাড়া দেওয়া ছিলো। স্থানীয় কলেজের একজন প্রফেসর থাকতেন। তিনি হঠাৎ চিঠি লিখেছিলেন আমাকে, আমার যদি সম্মতি থাকে তাহলে বাড়িটা তিনি কিনে নিতে চান। স্নাতক দামই দেবেন। এ প্রস্তাবে আমি আনন্দিতই হয়েছিলাম, কেন-না, দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের ও বাড়ির খুব কিছু দাম আমার কাছে ছিলো না। যদি বিক্রী হয়েই যায় তাহলে সেই টাকাতে এখানে কিছু করা যেতে পারে।

আমাদের বাড়ি আর কমলেশদের বাড়ি পাশাপাশি। এতোদিন বাদে আমি গিয়েছিলাম বলেই ভাড়াটে প্রফেসর ভদ্রলোক আমাদের বাড়িরই বাইরের দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন যে-কয়দিন ছিলাম সে-কয়দিনের জন্যে। কমলেশ এবং সোনালী এখনও ওখানে আছে আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিলো কমলেশ এখনও আমেদাবাদেই আছে।

মানুষে গড়া কৃত্রিম সীমান্ত এবং কার্টমসের বেড়াভাল ভেদ করে কলকাতা থেকে একশো সত্তর মাইল উত্তরে সেই ছোট শহরটাতে গিয়ে পৌঁছলাম একদিন সকালে। সেইদিনই বিকেলের দিকে কথায় কথায় প্রফেসরকে প্রশ্ন করেছিলাম আচ্ছা, ও বাড়িতে এখন কারা থাকে?

প্রফেসর বললেন, কেন, যাদের বাড়ি তারাই থাকে।

বললাম, তাদের তো আমি চিনি। সকলেই তো বাইরে চাকরি করে।

প্রফেসর বললেন, তাহলে আপনি চিনবেন। কমলেশবাবু এবং তাঁর পরিবার।

কমলেশ! আমি অবাক হয়ে বললাম, ওতো আমেদাবাদে চাকরি করে; এখানে আসবে কি করে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রফেসর বললেন, গত আটবছর থেকেই ওরা এখানে আছে। আমেদাবাদের চাকরি কমলেশবাবু ছেড়ে দিয়েছেন।

বললাম, আশ্চর্য! আমি তো কিছুই জানি না।

প্রফেসর বললেন, ভদ্রলোকের দুঃখবস্থা দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। স্নায়ু স্বাভাবিক একটা মানুষ মস্তিষ্কবিকৃতিতে কি হয়ে গেছে।

তারপর প্রফেসরের মুখে একে একে সব ঘটনা শুনলাম। কমলেশবাবু এখন পুরো পাগল। মাঝে মাঝে দু-চার মাসের জন্যে ভালো হয়, আবার পাগল হয়ে যায়। গত আটবছর ধরেই এরকম চলছে। কমলেশের জন্যে যতোটা দুঃখ পেলাম তার চাইতেও বেদনা বোধ হলো সোনালীর কথা ভেবে। কি নিয়ে দিন কাটছে ওর! ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো, আমরা যখন কলেজে পড়তাম সেই সময়ে কমলেশের একবার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছিল, সেই প্রধানবার বিয়ের কিছু পর। অবশ্য সেটাকে ঠিক পাগলামি বলা যায় না, ওরকম একটা আঘাত পেলে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হলেও হতে পারে। কিন্তু তারপর তো স্নায়ু হয়ে গিয়েছিলো কমলেশ, পুরোপুরি স্বাভাবিক মাসখানেকের মধ্যেই।

পরদিন সকালবেলা গিয়েছিলেন সোনালীর সাথে দেখা করতে, কমলেশের খবর জানতে। তার সাথে সোনালীর খবরও। সোনালী আমাকে চিনতে পারেনি প্রথমে। পরিচয় দিয়ে চেনাতে হয়েছিলো। অবশ্য ওর কোন দোষ নেই। কতোদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই আমাদের। আর আমার চেহারাও বদলে গেছে অনেক। রোগা পাতলা ছিলাম আগে, এখন শরীরের কানায় কানায় ঠাসা চর্বি। চুলের ছুঁচার জায়গায় ঝেঁষৎ রূপোলী ছোপ ধরেছে, বয়সের সাথে চোখের জ্যোতি কমে যাওয়াতে নিতে হয়েছে চশমা। অনেক পরিবর্তন। সোনালীর চিনতে না পারাই স্বাভাবিক।

কতোদিন পরে আমাদের দেখা। পরিচয় দিয়ে হেসে বলেছিলেন আমি।

আমুন। একটু ইতস্তত করে বললো সোনালী।

সোনালীর মুখচোখ দেখে আমার মনে হলো এতোদিন বাদে আমার হঠাৎ আসাতে ও খুব খুশি হয়নি। তার কারণ অবশ্য পরে জেনেছি। অভাব অনটনের সংসার। তার ওপর স্বামী পাগল। ওর সেই বিভ্রান্ত ছরবছার খবর আমি জেনে যাবো এই আশঙ্কায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলো সোনালী। আসলে কোন নেয়েই চায়না দুঃখহৃদশা এবং প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে এখন বাইরের লোককে জানাতে, সোনালীও চায়নি।

তবু স্বাভাবিক সৌজন্য অনুযায়ী আমাকে বসিয়েছিলো বাইরের ঘরে, কথা বলেছিলো ছুচারটে, চা এবং দোকানের মিষ্টি খাইয়েছিল। আর ওই ঘরে বসে আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিলো। এই বাড়িতে আমি আগে অনেকবার এসেছি। এতো বড় বাড়ি এদিকে কারো নেই। লোকজনে গম্গম করতো চারদিক। প্রতিটি ঘর, দেওয়াল, বাইরের উঠোন, বাগান ইত্যাদি তকতকে ঝকঝকে ছিলো। এখন বাইরে বাগানের চিহ্ন নেই, উঠোনে আগাছার জঙ্গল, ঘরগুলোতে কেউ বাস করে বলে মনে হয়না, কাঁকা, মেঝেতে কিচকিচে ধুলো—দেয়ালের চুনবালি ধ্বসে গেছে।

কমলেশ কেমন আছে? কথায় কথায় প্রশ্ন করেছিলেন।

কয়েক মুহূর্ত জবাব দেয়নি সোনালী। নিশ্চুপ গম্ভীর মুখে বসে ছিলো। তারপর চোখ তুলে বললো, এতোদিন বাদে যখন এসেছেন দেখা করে যান না বন্ধুর সাথে।

এসেছিই যখন দেখা করে যাওয়াই উচিত। বললাম, হ্যাঁ।

সোনালী ভেতরে নিয়ে গেলো আমাকে। ওদের বাড়ির অন্দরটা একটু অদ্ভুত রকমের, একেবারে সাবেকী আমলের হুর্গ যেন। অলিগলির গোলকধাঁধা। ছড়ানো ছিটোনো ঘর চারদিকে, কাঁকা, খাঁ খাঁ করছে। সোনালীর সাথে অলিগলি পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে গেলাম দোতলায়। দোতলার এক কোণে একটি খুপরি ঘর। বাইরে থেকে দরজায় শেকল তোলা।

সোনালী বললো, যান, ভেতরে যান।

বললাম, এর ভেতরে?

ও ঘরেই আপনার বন্ধু থাকে। যান, ভেতরে ঢুকে যান, ভয় কিসের?

বললাম, না না, ভয় কিসের। কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ কেন?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো সোনালী, সেটা ভেতরে গেলেই বুঝতে পারবেন।

কমলেশ শুয়ে ছিলো মেঝেতে। খালি গা, চুল এলোমেলো, চোখ বন্ধ। কেমন যেন রুদ্ধ বস্তু একটা চেহারা। ভীতিপ্রদ।

কে? আমার পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকালো কমলেশ। তাকিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, কে? কে তুমি? হু আর ইউ?

বললাম, আমাকে চিনতে পারছিস না কমলেশ।

না না! বিকট গলায় চৈচিয়ে উঠলো ও, না না।

আমি চিনি না তোমাকে। আই ভোর্ট নো ইউ।

আমি, আমি অশোক।

অশোক? এক মিনিট কি যেন ভাবলো কমলেশ। তারপর আবার চৈচিয়ে উঠলো, নো নো। আই ভোর্ট নো ইউ, গেট্ আউট্ গেট্ আউট অফ্ মাই হাউস্। আই ওন্ট এ্যালাও দিঙ্ থিংস্, আই এ্যাম সোনালীজ হাঙ্গব্যাও। গেট্ আউট, গেট্ আউট অফ্ মাই হাউস্।

সভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কি জানি, পাগলকে বিশ্বাস নেই।

সোনালী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দিয়ে বললো, দেখলেন, আলাপসলাপ হলো বন্ধুর সাথে?

আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। কমলেশকে এ অবস্থায় দেখবো কল্পনাও করিনি। প্রফেসরের মুখে শুনলেও সে যে এমন, এতোটা ভাবতে পারিনি।

বললাম, এরকম কতোদিন হয়েছে?

একটু খেমে হিসেব করে সোনালী বললো তা সাত আট বছর হবে। কেন আপনি জানতেন না?

বললাম কলেজে পড়ার আমলে একবার কমলেশের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিলো, তারপর সেরেও গিয়েছিলো, এটুকুই শুধু জানতাম। তারপর আমি চলে গেলাম মাদ্রাজ কমলেশ গেলো আমেদাবাদ—আর তো দেখা হয়নি আমাদের। আমার ধারণা ছিলো তোমরা এখনো আমেদাবাদেই আছো।

সোনালী বললো, আমেদাবাদে থাকতেই ওর এরকম হয়, সে আজ আটবছর আগেকার কথা।

শুধু এইটুকু বলেই খেমে গেলো সে। আর সোনালীর বলবার ধরনে আমি কেমন যেন কৌতুহলী হয়ে উঠলাম।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায়না আর। অশোভন কৌতুহল প্রকাশ হয় তাতে, সোনালী বিরক্ত বোধ করতে পারে।

এই পাগল নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে আমাকে বছরের পর বছর। আমি যখন চলে আসছি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললো সোনালী, কি স্নেহেই আছি দেখে গেলেন তো!

আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু এরকম হলো কি করে?

সোনালী আমার প্রস্নে অস্বস্তি বোধ করলো যেন । বললো সে এক ইতিহাস ।

সোনালীর মুখে সেই ইতিহাস পরে একদিন আমি শুনেছি । সাধারণত এসব কথা মেয়েরা অন্য পুরুষকে বলতে লজ্জা বোধ করে ! সোনালীও করেছিলো । কিন্তু বছরের পর বছর একা একান্ত সঙ্কোপনে এই দুঃখ—কমলেশের তাকে জঘন্য সন্দেহ করার মর্মান্তিক বেদনা—লালন করতে করতে সম্বের প্রায় শেষ গীণায় এসে পৌঁছেছিলো সে । কাউকে বলতে না পারলে নিজের নিরপরাধিতার কথা না জানালে যেন শাস্তি পাচ্ছিলো না সোনালী, দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর, বছরে বছরে আটবছর বন্ধ পাগল, ইতর সন্দেহের জ্বালায় জ্বলে যাওয়া একটি মানুষকে নিয়ে সোনালী ঘর করে চলেছে । দুঃখে ঘুণায়, ব্যর্থতার অক্ষমতায়, জীবনের প্রতি নিদারুণ বিভ্রমায় একটি মেয়ে মনে মনে পুড়ে থাকু হয়ে গেছে, তারই ইতিহাস সোনালীর মুখে শুনেছি । আমার সাথে এ গল্পের সংযোগ ওইটুকুই । সোনালীকে আমি দোষ দিতে পারিনি, পারি না ।

কমলেশকে যদি আমি সেদিন ওই অবস্থায় না দেখতাম আর সোনালী যদি সম্পূর্ণ ইতিহাসটা আমাকে না বলতো তাহলে এ গল্প আমি কোনদিনই লিখতাম না ।]

এই বিশাল চারমহলা বাড়িটাতে এখন সোনালী একা, তার সংসার নিয়ে । বাড়ির তিনটে মহল একেবারে খালি । বাইরের দিকে যেখানে হরমোহন বসতেন তাঁর মক্কেলদের নিয়ে—সেখানকার ঘর চারটে—একটাতে হরমোহন বসতেন, একটাতে বসতো মুহুরী, আর দুটোতে বড় বড় কাচের আলমারি বোঝাই মোটা মোটা বই এখনও আছে, আইনের বই—সে ঘরে গেলে পুরানো বইএর সৌন্দর্য গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনও ; ঘরগুলো এখন খালি । হরমোহন বেঁচে থাকতে ওই ঘরগুলো সকাল থেকে বেলা দশটা অবধি (হরমোহন কাছারি চলে যেতেন তারপর) আবার বিকেল ছটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত লোকজন ভরপুর থাকতো । মক্কেল । এখন চামচিকে আর গোলা পায়রার বাস । কড়িকাঠের কঁকে কঁকে, ভেন্টিলেটরের ধুলধুলিতে । পায়রার গুএর একটা বিলম্বিত গন্ধ চারদিকে ।

আর অন্দরমহলে তিনটে ভাগ । একটাতে সোনালী তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকে । তিনটে ঘর এ মহলে । আর একটা ছোট খুপরি ঘর । যেখানে কমলেশ বন্দী । এই মহলটাতেই যা কিছু মানুষের সাদা আছে । অন্দরের আর দুটো ভাগ খাঁ খাঁ করে । বাস করবার লোক নেই । এ বাড়িতে যাদের স্বপ্ন আছে দেশভাগের পর তারা সকলেই কলকাতা চলে গেছে । পড়ে আছে সোনালী, তার পাগল স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে । তার জন্মে আর কোথাও জায়গা নেই ।

এতোবড় বাড়ি সোনালী একা পরিষ্কার রাখতে পারে না, চারদিক তাই আগাছা আর জঙ্গলে বোঝাই হয়ে গেছে । সাপ খোপের আড্ডা ওইসব আগাছার জঙ্গলে । দিনহুপুରେই অনেকদিন দেখেছে সে উঠোনের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁক। গতিতে সাপের চলাফেরা । সাতবছর বাড়ি নেরামত হয়নি । দেয়াল থেকে চুণবালির পলেন্তারা

খসেপড়ে অনেক জায়গায় স্রষ্টি হয়েছে বড় বড় ফাটল, ইঁহুর ছুঁচোর বাসা। ইঁহুর ছুঁচোর লোভে গাপ আসে বাড়ির মধ্যে।

সোনালী অনেকবার ভেবেছে বাড়ির যে অংশগুলি খালি পড়ে আছে ভাড়া দিয়ে দেবে। তাতে সংসারের সাশ্রয় হবে। খেয়েপরে বাঁচবে তার ছেলেমেয়েরা। তবু সোনালী পারেনি। এ শহরে হরমোহনের নামডাক এবং সম্মান ছিলো অসাধারণ, এখনও আছে, হরমোহন রায়ের নাম করলে সশ্রদ্ধ হয়ে উঠে যে-কোন লোক। সেই নাম এবং সম্মানের ভিত্তিতে উঠবে এ বাড়ির খালি অংশগুলি যদি সোনালী ভাড়া দেয়। মনের সঙ্কল্প মনেই রয়ে গেছে, কার্কে পরিণত করতে পারেনি। ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি মন থেকে অহেতুক ঠুনকো সম্মানবোধকে।

ঠিক দুপুরবেলায়, যখন ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে থাকে, কমলেশ নিশ্চুপ শুয়ে থাকে আবদ্ধ ঘরে, তখন একা একা সোনালীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শরীরের কোষে কোষে অস্বস্তির শির শির বিদ্যুৎ অমুভূতি পাক দিয়ে ওঠে। বাইরের মহলে বাসা বাঁধা গোলা পায়রাগুলো বকম্ বকম্ করে। পেয়ারাগাছের ডালে ডালে বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তোলে। শূন্যতা আরও মর্মস্পর্শ মনে হয়।

অথচ সে যখন নববধু হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলো সারা বাড়িটা মানুষজনে গম্ গম্ করতো। প্রথমদিন তো সে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলো। কমবয়সে এ বাড়িতে বেড়াতে সে অনেকবার এসেছে। এ বাড়ির সকলকেই সে আগে থাকতেই চেনে। কোন নতুন লোকের পক্ষে এ বাড়িতে দিশা রাখাই কঠিন। এতো লোক বাড়িতে, তাদের মুখ মনে রেখে, কার সাথে কার কি সম্পর্ক, কে কোন ঘরে শোয় এইসব খবর পুরোপুরি আয়ত্তে আনতেই দিন পনেরো কেটে যাবে। কমলেশরা আটভাই তিনবোন, আশ্রিত আত্মীয়স্বজন, কমলেশের বড় বৌদি মধুমালা এবং তার দুই ছেলে এক মেয়ে, চাকুর ঠাকুর ঝি। সংসারের মাথায় শক্ত হরমোহন, শাওড়ী চন্দ্রমুখী। হাটবাজার বসলে যেমন মানুষের কল্কল শব্দ ওঠে, এ বাড়ি প্রথম এসে সোনালীর মনে হতো সেইরকম। কলরবে ভরপুর সব সময়। তার মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন হরমোহন এবং চন্দ্রমুখী। চন্দ্রমুখী সারাদিন কাটাতেন পুজোর ঘরে। আর হরমোহন বাইরের মহলে। সকাল থেকে রাত অবধি বাড়ির দিকে নজর দেবার সময় পেতেন না। মামলার নথি, আইনের বই, বক্সেল, এই ছিলো তাঁর জগৎ। আর ছিলো তামাক। যতোটুকু সময় বাড়িতে থাকতেন তামাকবিহীন অবস্থায় কোন সময়ে দেখেছে বলে সোনালীর মনে পড়ে না। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারি মানুষ। হরমোহনের সাথে হেসে কথা বলা বা গল্প করা তাঁর সাথে অমাবস্তার রাতে চাঁদ দেখবার মতোই অসম্ভব মনে করতো সকলে।

সংসারে অভাব ছিলো না কোন। হরমোহন প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, ভেমনই ব্যয় করতেন ছ'হাতে। সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতেই ফুরিয়ে যেতো সব টাকা। কিছু আমতব্যয়িতা ছিলো খরচে একথা ঠিক, কিন্তু হরমোহন তার জন্তো দ্বিধা বা কার্পণ্য করতেন না খরচ করতে। বড় ছেলে সত্যব্রত তখনই একটু একটু

ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, বৃদ্ধবয়সের জন্যে চিন্তা নেই। ইতিমধ্যে অন্যান্য ছেলেরাও দাঁড়িয়ে যাবে। হরমোহনের এই ছিলো ভরসা।

বলতেন টাকা দিয়ে আমি কি করবো? আমার আটটা ছেলের প্রত্যেকেই তো একটি এ্যাসেট।

এখন সেকথা মনে পড়তেই হাসি পেলো। এ্যাসেটই।

এই বাড়িটা ছেড়ে দক্ষিণে কিছুটা গেলেই সামনে আকাশ উদার উন্মুক্ত। বিস্তীর্ণ নদীরেখা : কীতিনাশা পদ্মা। দূরে বহুদূরে শীতের কুয়শার মতো অস্পষ্ট সবুজের ছোপ। সুবিশাল নদী শেষ। জানালা দিয়ে সোনালী তাকালো পদ্মার দিকে। নদীর পাড়ে পাড়ে চলে যাওয়া উঁচু এম্ব্যাকমেন্টের কালো প্রাচীরে ঝাঝা খেয়ে ফিরে এলো দৃষ্টি। এ এক আশ্চর্য নদী। এখন বর্ষায় কুমারী মেয়ের মতো পরিপূর্ণদেহে কানায় কানায় ভরা জল। কিন্তু আশ্চর্য! বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ এলেই পদ্মা শুকিয়ে হয়ে যাবে শীর্ণকায়। শীতে দেখা দেবে নাইল জোড়া বালির চর গ্রীষ্মের প্রখর তপন তাপে ওই বালির চরে হাঁটলে, সাহারা মরুভূমি কেমন সোনালী জানে না কিন্তু ওই ধু ধু বালির চরকেই মনে হবে মরুভূমি। গরমে তেতে বালির সান্নিধ্যের হাওয়া কেঁপে কেঁপে ওঠে জল থেকে, যেমন বাষ্প ওঠে, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জলাশয় ওখানে : মরীচিকা।

মনে মনে সোনালী একটা মিল খুঁজে পেলো। তার জীবনও অনেকটা ওই নদীর মতো। বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলো চোদ্দপনেরো বছর আগে। বিরাট পরিবারের স্বচ্ছলতা এবং কমলেশকে পেয়ে মনে হয়েছিলো যেন সার্থকতার বান এসেছে প্রাণে; ষোলবছরের কুমারীদেহের তৃষ্ণা শক্তিশালী পেশল সুপুরুষ কমলেশের সান্নিধ্যে তৃপ্ত হবে। মরুভূমির মরীচিকার মতোই হতাশ করেছে কমলেশ। সোনালীর জীবনে বর্ষা এসেছিলো যেমন আসে পদ্মায় কিন্তু ছ'দিনেই শুকিয়ে ধু ধু বালুচর হয়ে গেছে। এখন শুধু সূর্যের প্রখর রোদে বালির সান্নিধ্যের হাওয়ার মতো কেঁপে কেঁপে ওঠা।

ষোলবছরে তার বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের সম্বন্ধে তখন একটা অদ্ভুত কুহক ছিলো মনে, ওই বয়সের সব মেয়ের যা থাকে। সব দেহের তটে তটে যৌবনের বর্ষা চল নিয়ে এসেছে প্রথম। একগাছ ফাস্তনের কঙ্কচূড়া যেন। বিয়ের পর জীবন ফুলে ফলে ভরে উঠবে সোনালী ভেবেছিলো। ফলে ভরে গেছে তার জীবন ঠিকই। ছয়টি ছেলেমেয়ের মা। কিন্তু ফুল? ফুল বলতে সে বোঝে সুখ সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা। কোনোটাই পায়নি।

সাপে বোধহয় ব্যাং ধরেছে। ব্যাং-এর আর্ত আর্তনাদ ভীষণধার ছুরির ফলা দিয়ে শবব্যবচ্ছেদ করবার মতো রাত্রির হৃদপিণ্ডকে ফালা ফালা ক'রে দিচ্ছে। আর বাঁশির মিঠে মেঠো সুরের অমুরণন নেই আকাশে। এ রাতে ও সুর মানায় না, গভীর শোকাভূত পুরুষের সামনে নির্লজ্জ বেষ্টার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর মতোই বেমানান। তবু আশ্চর্য চাঁদ এখনও তেমনই জ্যোতির্মান। পাকা কমলার খোসার মতো রঙে

রঙীন। আর তাঁদের চেহারা দেখে আহ্লাদে আটখানা তারার ঝাঁক ভির করে ঝাঁড়িয়ে মিচিমিচি হাসছে।

নারকেল গাছটা যেন কেশরমাধা সিংহ। স্থির অনড় দেহে ওৎ পেতে আছে জানালার দিকে তাকিয়ে, বুঝি সুযোগ পেলেই খাবার ছোঁ মেরে ভুলে নেবে।

ব্যাংএর আর্ভনাদ খেমে গেলো, ধীরে ধীরে জীবন থেকে মৃত্যুর গভীরে পৌঁছে গেলো। কয়েক মুহূর্ত আগেও জীবিত ছিলো অথচ। তারও কিছু আগে হয়তো আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা ধরছিলো আগাছার ঝোপের নিচে। পোকার খাদক সাপের খাণ্ড হয়ে গেছে। সাপে ব্যাং খায় সাপকে খায় কিসে? গরুড় পাখী? না ময়ূর। ময়ূরকে? হয়তো মানুষ। মানুষকে মানুষেই।

পুরনো কথা ভাবতে বসে সোনালীর যেন নেশা লেগে গেলো। অতীতের পুকুরে স্মৃতির টোপ গাঁথা মনের ছিপ ফেলে নিশ্চল হয়ে ঝাঁড়িয়ে রইলো সে। চেতনাটা যেন ফতনা: একটু একটু ক'রে নড়ে উঠতে লাগলো। স্মৃতির টোপ গিলছে মরা ঘটনার মাছেরা।

বিরাট সংসারটা মেশিনের মতো মসৃণভাবে নিয়মিত ঘুরে ঘুরে চলতো। মেশিনেরও যেমন মাঝে হঠাৎ ব্রেকডাউন হয় এ সংসারেরও তাই। সূচুভাবে চলতে চলতে খনকে খেমে পড়তো হঠাৎ। নতুন করে তেল গ্রিজ লাগিয়ে—এখানে ওখানে ছ'এটা নাটবলটু এঁটে দিয়ে আবার চালিয়ে দেওয়া হতো পুরো গতিতে। দৈনিকের ইতিহাস এক। আজ যা কালও ঠিক তাই আবার পরশু দিনেও তেমনি।

এর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম কমলেশ। তার খাওয়া শোওয়ার ঠিক থাকতো না। হিসেব থাকতো না সময়ের। অনেকগুলো পোষা কুকুরবেড়াল ছিলো কমলেশের। ছিলো পাখী। টিয়া ময়না চন্দনা, ইত্যাদি। জন্তুজানোয়ার নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত। বিয়ে হয়েছে সবে, তবু সোনালীর সাথে এক রাতে শোয়া ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ ছিলো না।

কমলেশের পোষা কুকুরের জন্তু বাজার থেকে রোজ মাংস আসতো। পাখী-গুলির জন্তু ছোলা-ছাড়ু-লঙ্কা। আর পারশিয়ান বেড়ালদের জন্তু দৈনিক মাথাপিছু আধসের দুধের বরাদ্দ।

সোনালী রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে অনেকদিন হেসে বলেছে, ওগুলো আমার সতীন—তু চকের বিষ।

তা বলতে পারো। কমলেশ জবাব দিয়েছে হেসে।

সোনালীর যখন বিয়ে হয়েছিলো তখন কমলেশ ছাত্র, কলেজে পড়ে। সোনালী বিয়ে হয়ে এসে দেখেছে এক কলেজের সময় ছাড়া কমলেশ আর সবসময় পাখীগুলি নিয়েই মস্ত থাকে। কখনো এটাকে খাওয়াচ্ছে, ওটাকে আদর করছে। পাখীগুলি আশ্চর্য পোষ মেনেছিলো। খাঁচার দরজা খুলে দিলে উড়ে যেতো আবার খাঁচায় এসে চুকতো সন্ধ্যার আগেই। কুকুর-তিনটে বাঁধা থাকতো চেনে। কারণ, বাড়ি ভরতি

লোক । কামড়ে দিতে পারে । একমাত্র কমলেশ বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে ছাড়তো মাঠে নিয়ে গিয়ে । রবারের বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতো । কুকুর তিনটে দৌড়ে গিয়ে তুলে আনতো মুখে করে । আবার সকালবেলা কলেজে যাবার আগে কুকুর তিনটেকে স্নানে নিয়ে যেতো নদীতে । তিনটে চেন্ একসাথে হাতে ধরা, কমলেশকে কষ্ট করে হাঁটতে হতো না—কুকুরগুলোই টানতে টানতে হি চড়ে ছেঁচড়ে নিয়ে যেতো । সাবান ঘসে ঘসে লোমশ শরীর থেকে ধুলোবালি ময়লা সযত্নে নিংড়ে বার করে দিতো কমলেশ, আর কুত্ কুতে চোখ মেলে, যেন স্বর্গস্থ উপভোগ করছে, তাকিয়ে থাকতো সারমেয়ত্রয় । স্নান শেষ হয়ে গেলে শরীর ঝাড়া দিয়ে গা থেকে জলের ছিটে তাড়িয়ে দিতো তিনটেই, ওঁড়ো ওঁড়ো জলকণা বাতাসে উড়ে আঁকতো রামধনু রং । কোন কোনদিন কুকুরদের নিয়ে গভীর জলে সাঁতার দিতো কমলেশ । আবার কখনো কুকুরদের পাড়ের কাছে দাঁড় করিয়ে নিজে সাঁত্রে চলে যেতো শখানেক গজ দূরের বালির চরে । সেখান থেকে স্নেহতসূচক হাততালি দিয়ে হেঁকে উঠতো, টেডি জিম টাইগার, স্টার্ট ।

কুকুর তিনটেকে এমনভাবে শিখিয়েছিলো যে, হাততালি দেবার সাথে সাথেই তিনটে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো জলে—শুরু হতো সাঁতারের প্রতিযোগিতা । প্রতিযোগিতায় প্রথম হতো যেটা তার পিঠ চাপড়ে আদর জানাতো কমলেশ । কিন্তু কুকুরগুলো অত্যন্ত হিংসুক, একটাকে আদর করলে আর দুটো কুঁই কুঁই করতো । তাদেরকেও আদর করতে হবে ।

এছাড়া ছিলো পাখী । ময়নাটা ছড়া আওড়াতো । রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা শিখিয়েছিল কমলেশ, দিনের পর দিন অসীম ধৈর্যসহকারে । হয় পশুপাখীদের নাওয়ানো ঝাওয়ানো—নইলে, কোথায় কার বাড়ি এ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে, কার বাড়িতে আছে থ্রে-হাউন্ড, কোন বাড়িতে অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর ক্যানারি পাখী আছে—এই সব খবর সংগ্রহ করতেই সারাদিন ব্যস্ত । জোগাড় করতো সেইসব ভক্তজানোয়ারদের খুটিনাটি খবরও, তারপর মনে মনে তুলনা করতো নিজের পোষদের সাথে ।

সোনালীকে অনেকবার বলেছে, ওসব এ্যালসেশিয়ান ক্যান্সেশিয়ান কোন কর্মের নয়, তুলনা হয়না টেডি জিম টাইগারের সাথে । এমন ট্রেনিং দেওয়া যারতার কাজ নয় ।

তা গর্ব করবার কারণ কমলেশের ছিলো বৈকি । টেডি জিম টাইগারের মতো ট্রেন্ড কুকুর লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ । আর কমলেশের পোষা ময়নাটার মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মর করে আবৃত্তি করতে পারে কার পাখী ? কিংবা তার পারশিয়ান বেড়াল দুটির চেহারার বাহার !

কমলেশের আরও একটা কাজ ছিলো কার বাড়িতে কোন জাত-কুকুরের বাচ্চা হয়েছে তারও খবর জোগাড় করা । কি করে তার মধ্যে দু'একটা বাগিয়ে আনা যায় । তার জন্যে সেই সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস আরদালির সাথে আলাপ জমিয়েছিলো, মিশনারী ম্যাক্রিয়ড সাহেবের সাথে জমিয়েছিলো বন্ধুত্ব । ঘুরে বেড়াতো এইসব ধান্দায় । মনেই থাকতো না সোনাল বলে একটি মেয়ের অস্তিত্ব আছে বাড়িতে—যে সারাদিন তার নিবিড় সান্নিধ্যের উদগ্র আশায় আকুল হয়ে থাকে ।

একটা ঘটনার কথা সোনালীর মনে পড়লো এখন। মাঝখানে টাইগারের একবার অসুখ হয়েছিলো। কি অসুখ সোনালী জানে না। একেবারে নেতিয়ে পড়েছিলো কুকুরটা। আর কমলেশের চোখে ঘুম ছিলো না, ভুলে গিয়েছিলো নাওয়া খাওয়া।

সেদিন রাত্তিরে ঝির ঝির করে ঝুটি ঝরছিলো। কখন ঝুটি নেমেছে সোনালী টের পায়নি। ঘুমিয়ে ছিলো বিছানায়, হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো। বাইরে আমবাগানে পাতার পাতায় ঝুটির ঝন ঝন নুপুর বাজছে। ঘুম ভেঙে যেতে তড়ার ঘোরে সেই শব্দ সোনালীর কানে ভেসে এসেছিলো সুরেলা গানের মতো। খুব জোরে নয়, স্বহৃদ, বহুদূর থেকে যেন শব্দটা আসছে। ঘরের বাতাসে হিম হিম ঠাণ্ডা ভাব। শির শির করছিলো গা। একটা চাদর গায়ে জড়ালে বোধহয় আরাম লাগবে। শাড়ীর আঁচল গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছিলো সোনালী। না। ভুবু ঠাণ্ডা লাগছে। চোখ থেকে ঘুম ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোনালী উঠে বসেছিলো—চোখ ভুলে তাকাতেই চোখে পড়েছিলো কমলেশ বিছানায় নেই। ঘরের দরজা খোলা। হয়তো বাথরুমে গেছে। আলনা থেকে একটা শাড়ী নিয়ে ছুঁতামুঁত করে গারে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছিলো সোনালী। শুয়ে পড়লেও ঘুম আসেনি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছিলো বার কয়েক—এক পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে যখন কিছুতেই আসছিলো না ঘুম চোখের পাতার তখন মনে হচ্ছিলো—ওপাশ ফিরে শুলে বোধহয় ঘুম আসবে। আবার ওপাশ ফিরছিলো। এইভাবে কতোকণ সময় কেটে গিয়েছিলো সোনালীর মনে পড়ে না।

কিন্তু কমলেশ ফিরছেন কেন? এতোকণ তো বাথরুমে থাকার কথা নয়!

সোনালী আবার উঠে বসেছিলো। তারপর নিঃশব্দে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো বারান্দায়। অন্ধকার থাকলেও সে দেখতে পেয়েছিলো স্পষ্ট : বারান্দার এক কোণে বসে রুগ্ন টাইগারের গায়ে হাত বুলাচ্ছে কমলেশ পরম স্নেহে। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো সোনালী তেমনভাবেই আবার ফিরে গিয়েছিলো ঘরে। সারা-রাত অমনই বসে থাকবে টাইগারের পাশে এটা সে বুঝতে পেরেছিলো। ঈর্ষা। হ্যাঁ, ঈর্ষান্বিত হয়েছিলো। ওই পশুপাখীগুলোকে যতোটা ভালোবাসে কমলেশ, ওদের সঙ্গে যতোটা সময় ব্যয় করে, তার সিকিভাগ সময়ও সোনালীর সঙ্গে নেই। এই যে সে বেরিয়েছিলো বাইরে কমলেশ খেরালও করেনি। একটা মানসিক জ্বালায় তার বুক জলে উঠেছিল। কেন, সে কি জন্তুজানোয়ারেরও অধম! সেই মনের জ্বালায় জল বেরিয়েছিলো সোনালীর চোখ দিয়ে। ভিজ্জে জবজবে হয়ে গিয়েছিলো বালিশ।

ভুবু টাইগার বাঁচেনি। রোজ সকালে গাড়ী করে পশু হাসপাতালে নিয়ে যেতো কমলেশ। ওরুধ খাওয়াতো ঘড়ি ঘণ্টা ধরে। কিন্তু দিনে দিনে আরও নেতিয়ে পড়েছিলো টাইগার। প্রথম প্রথম ভুবু নড়তো চড়তো, বোঝা যেতো প্রাণ আছে। সাত আটদিনের রোগে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লো তারপর। মাঝে মাঝে যন্ত্রণাকাতর অব্যক্ত একটা শব্দ করতো, স্বহৃদ স্বহৃদ আন্দোলিত হতো লেজ। দশদিনের দিন ধেমে পেলো সব স্পন্দন।

নিঃশব্দে কুলে কুলে কেঁদেছিলো কমলেশ।

জানালা দিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেশরনাথ সিংহের মতো যে নারকেল গাছটার তুতুড়ে ছায়া দেখতে পাচ্ছে সোনালী এখন, তারই নিচে কবর দিয়েছিলো টাইগারকে ।

আগের চাইতে আর একটা কান্না বেড়ে গিয়েছিলো কমলেশের । অবসর সময় চুপচাপ ভ্রম্য হয়ে বসে থাকতো ঝিলঝিলি পাতা নারকেলগাছের ছায়ায়, টাইগারের কবরের পাশে । পরম আত্মীয় বিয়োগেও লোকে এতো শোকাভূত হয় না । চোখ তুলে তাকালেই বোঝা যেতো কমলেশের শরীর ঝরাপ হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে ; চোখের নিচে গভীর কালো, গাল ভেঙে গর্ত, তীক্ষ্ণ নাক তীক্ষ্ণতর, উগ্ৰকো খুগ্ৰকো চুল, হয়তো দশদিন ভেলেই পড়েনি ।

সামান্য একটা কুকুর মরেছে তার জন্যে তুমি দেখছি একেবারেই ভেঙে পড়লে । বিছানায় শুয়ে কমলেশের দেহ একহাতে জড়িয়ে ধরে সোনালী বলেছে । সামান্য কথাটার ওপর তোর দিয়েছে বলার সময় । ইচ্ছে করেই ।

সামান্য একটা কুকুর ।

সোনালীর কথার প্রতিধ্বনি করে কমলেশ বলেছে । হেসেছে । এক-রকম হাসি আছে যা কান্নার চেয়েও বর্ষস্তুদ । তারপর অর্ধশূন্য চোখে চেয়ে থেকেছে সোনালীর চোখে । সোনালী ভয় পেয়ে গিয়েছিলো । কেমন যেন নিখর ঠাণ্ডা কমলেশের দৃষ্টি, মরা যাচ্ছে চোখের মতো ।

কমলেশের এই পরিবর্তন বাড়ির অন্য লোকের চোখেও পড়েছে । আড়ালে হেসেছে তারা ।

আদিখ্যাতা ।

কিন্তু হাসলেও উদ্বিগ্ন হয়েছে মনে মনে ।

পুজোর ঘরে প্রদীপের স্বল্প আলোয় একদিন কমলেশকে ডেকে পাশে বসিয়ে-ছিলেন চন্দ্রমুখী । তার গায়ে মাখায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, কমল তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও ।

কমলেশ কোন জবাব দেয়নি ।

টাইগারকে তুমি ভালোবাসতে, তার হঠাৎ মরে যাওয়াতে দুঃখ পাওয়া আশ্চর্য নয় । তা বলে তুমি যদি এরকম করো তাহলে চলবে কি করে ? তোমার বি, এন্স সি পরীক্ষা সামনে ।

তবু কোন জবাব দেয়নি কমলেশ ।

কেউই চিরদিন বাঁচে না । আমিও মারা যাবো একদিন, তোমার বাবাও থাকবেন না চিরকাল । তোমাকে যা দেখছি তাতে তুমি তো পাগল হয়ে যাবে শোকে । অথচ, বেঁচে থাকতে গেলে এগুলো সহ্য করতেই হবে ।

চন্দ্রমুখীর কোলে মুখ গুঁজে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠেছিলো কমলেশ ।

মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরগুলিতে লঠনের টিমটিম আলো জ্বলছে এখনও । মাতালের একঘেয়ে বিলাপধ্বনি ভেসে আসছে ওখান থেকে । এ সেই মুসলমান যক্ষ-

ওয়ালাটা। সারাদিন দোকানের পর মদ খেয়ে ফিরেছে। আকণ্ঠ। কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে। কমলেশ-যদি পাগল হয়, তবে ওই যে মাতালটা কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে, ও কি? বউ খেতে না পেয়ে খুঁকছে টি বি-তে। একপাল ছেলে-মেয়ে কুকুরবেড়ালের মতো কামড়াকামড়ি করে নিজেদের মধ্যে, এক টুকরো রুটির জন্যে। হেঁড়া শতচ্ছিন্ন প্যাণ্ট্ জামা, কোন কোনটা পুরো উলঙ্গ। কি যেন নাম বউটার? হাঁ। হাঁ। জাহানারা। একসময় ফুটফুটে স্নন্দরী ছিলো। উজ্জল গোর গায়ের রং, টিকোলো নাক, বাঁকাধনু জু, পঞ্চমীর চাঁদ চোখ, ডালিমদানা ঠোট। আর এখন? শনের দড়ির মতো চুল, ফ্যাকাসে হলুদে গায়ের রং, গালে প্রকট হাড়ের স্বীপ, মরা ছাগলের মতো নিশ্শব্দ চোখ, পাতলা হিলহিলে পাটকাটির মতো দেহ—অস্থিসার, চামড়া ঝুলঝুল করছে। না যা ছিলেন, না যা হইয়াছেন। আর ওই ফলওয়ালা রহমান? বউএর চিকিৎসা করায় না, ছেলেমেয়েদের খেতে দেয়না পেটভরে। নিজে কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিলে আসে রোজ। সারারাত তারপর জাহানারার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদে ভেউ ভেউ স্বরে। খোদার কষম, আর কোনদিন খাবো না। তোর মাথার কষম। কিন্তু পরদিন আবার যে-কে সেই, ভুলে যায় সব, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ওই ফলওয়ালা রহমান, ও কি? ও যদি পাগল না হয় তবে গাগল কে?

এই পর্যন্ত এসে সোনালী খেই হারিয়ে ফেললো। তারপর। অনেক ঘটনার ভিড় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে জমে আছে। মনের অভলে নেমেছিলো স্মৃতির ডুবুরীরা। তারা পথ হারিয়ে ফেলছে।

কয়েক মিনিট।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এলো। ধনীভূত কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের আলোয় হেসে ওঠা প্রকৃতির মতো আবার ঝলমল করে উঠলো স্মৃতি।

আষাঢ় মাস। আকাশে বর্ষা ঝরঝর। বাতাসে বিয়ের গন্ধ। হরমোহনের বড় মেয়ে কুস্তলার বিয়ে। বাড়িতে সাজো সাজো রব। হৈ হৈ হনুস্থল। কেনাকাটা, ফর্দ তালিকা, পুরুত পণ্ডিকার সমারোহ। হরমোহন তবু মজেল, মামলা, নথি নিয়েই ব্যস্ত। অন্য দিকে নজর দেবার সময় নেই। বড় মেয়ের বিয়ে, তবু না। শুধু অর্থ উপার্জন করা কর্তব্য। দায়। বাকী সবকিছু সংসার দেখাশোনা, ঝক্কি ঝামেলা সামলানো বড়ছেলে—সোনালীর ভাস্কর—সত্যজ্বতর কাষ। সকলের হাত থেকে মুহুরীর হাতে, মুহুরীর হাত থেকে হরমোহনের কাছে, তারপর টাকা পয়সা সব সত্যজ্বতর জিন্মায়। সংসারের হাল তার দৃঢ়মুষ্টিতে। কিসে লাভ, কিসে লোকসান, তার খতিয়ান সত্যজ্বতর নখদর্পণে। কিভাবে খরচ করলে, কোন জিনিসে অপব্যয় বাঁচাতে পারলে সংসারের সাশ্রয় হবে সেটা সত্যজ্বতর বিবেচনা সাপেক্ষ। আর সত্যজ্বতর মানেই

তার স্ত্রী মধুমালা। মধুমালার অঙ্গুলিহেলনে সত্যভ্রতর চলাফেরা, আগা যাওয়া, কর্তব্য-
বুদ্ধি সবই নিয়ন্ত্রিত হতো।

মধুমালার কথা বলতো কম। যেটা বলতো পালিত হতো বেদবাক্যের মতো।
নামে সত্যভ্রত, কাজে মধুমালা সংসারের সর্বময়ী কত্রী। চন্দ্রমুখী সারাদিন পূজোর
ঘরে, অন্য কাজে নষ্ট করবার মতো সময় নেই। ন্যায়অন্যায় যাই হোকনা কেন মধু-
মালার বিবেচনা তা নিয়ে মাথা ধানাবার ফুরসুং ছিলোনা তাঁর। হয়তো ফুরসুং ছিলো,
হয়তো নজরে পড়তো সবকিছুই, তবু, দেখেও দেখতেন না। কারণ দেখলেই
অশান্তি।

আর মধুমালা কত্রী বলেই অনেক ঘটনা সকলকে মুখ বুজে সহ্য করতে হতো,
ন্যায় অন্যায়, আত্মপরিবোধ নাশ্বনাত্রেয়ই থাকে, সোনালীরও ছিলো। অন্ত্যায়ে ক্ষুব্ধ
হতো স্বার্থপরতা দেখে। যেমন, সকালবেলা চা-জলখাবার সকলের সাথে সত্যভ্রত,
মধুমালা, ছেলেমেয়েরা কেউই খেতো না। তাদের জন্তে আলাদা বন্দোবস্ত। দুধ গরম
হয়ে চলে যেতো মধুমালার ঘরে, পাউরুটি-ডিম-মাখন-ওভাল্টিন্-কোয়েকার ওটসু
আসতো তাদের জন্তে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে প্রাতরাশপর্ব সন্ধ্যা হলে তবে
বাইরে আসতো মধুমালা-সত্যভ্রত-ছেলেমেয়েরা। বাড়ির আর সকলের জন্তে আলাদা
বন্দোবস্ত। আটার রুটি, চা, এবং হালুয়া।

সবাইএর কথা সোনালী জানে না। সে ক্ষুব্ধ হতো এই নিল জ্ঞ স্বার্থপরতার।
কিন্তু সেই দুঃখ, মনের জ্বালা প্রকাশ করবার উপায় ছিলো না। এ বাড়ির বউ সোনালী।
এ কথা যদি সে বলে, সত্যভ্রত রাগ করবে, মধুমালা কেঁদে লাল ক'রে ফেলবে চোখ।
চন্দ্রমুখী বলবেন, ছি ছি, এতো ছোট মন তোমার!

সত্যিই সোনালীর মন ছোট না, না সে স্বার্থসর্বস্ব, এটা সকলেই জানতো।
জানতেন চন্দ্রমুখীও, তবু, সংসারের সুষ্ঠু নির্বাহে এই সামান্য কারণ থেকেই দেখা দিতে
পারে অশান্তি, এই বুঝেই চন্দ্রমুখী নীরব থাকতে চাইতেন। চাপা দিতে চাইতেন
সকলের মুখ। কিন্তু সেই অশান্তি, চন্দ্রমুখী যেটা সর্বদা এড়াতে চেষ্টা করেছিলেন,
এড়ানো যায়নি। কমলেশের মনের সবচাইতে দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছিলো
মধুমালা।

বাড়িতে একটি বিয়ে আসন্ন। তা-ও মেয়ের বিয়ে। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।
সংসারের জমাখরচ মধুমালার হাতে, কাজেই, যেখানে যেখানে ব্যয়বাহুল্য মধুমালা তা
নির্মম হাতে বন্ধ করতে লাগলো। দৈনন্দিন বাজারের সাথে কমলেশের কুকুরদের জন্তে
মাংস আনা বন্ধ হলো। বন্ধ হলো পারিশিয়ান বেড়াল দুটির জন্তে মুখাপিছু আধসের
দুধ।

তোমার কুকুরগুলো মাংস না খেলেও বাঁচবে। আর, বেড়ালকে আদিখ্যেতা
ক'রে রোজ আধসের দুধ খাওয়ায় কেউ জন্মে শুনি নি কোনদিন।

অপনি অনেক কিছুই শোনেননি। কমলেশ জবাব দিয়েছিলো।

মুহুর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো মধুমালা, কি বললে মেজঠাকুরপো?

বললাম, আনার কুকুরের মাংস বা বেড়ালের দুধ বন্ধ হলে চলবে না।

তুমি তো হকুম করেই খালাস। কতো ধানে কতো চাল যাকে সবদিক সামলাতে হয় সে-ই বোঝে। মধ্যবিস্ত ঘরে এতো নবাবী চলে না। তাছাড়া, তোমার দাদার হাতে অপব্যয় করবার মতো টাকা বাবা দেন না।

কমলেশ গুম্ব হয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলো, বাবা কতো টাকা দেন, আর সংসার খরচের ক্ষেত্রে কতো টাকা লাগে তার একটা আন্দাজ আমাদের আছে। শুধু শুধু মিছে কথা বলে লাভ কি?

আমি মিছে কথা বলি, তুমি একথা বললে মেজঠাকুরপো!

বললাম।

মধুমালার হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখ থেকে ঝরঝর জল ঝরিয়েছিলো।

মিছেই চোখের জল খরচ করছেন বৌদি। ওতে আর কেউ গলতে পারে, আমাকে গলাতে পারবেন না। বন্ধ যদি করতেই হয় আপনাদের সকালের দুধ-ডিম-মাখন-ওভারটিন এগুলো বন্ধ করেই নিদর্শন দেখান আগে। তারপর আমার কুকুরের মাংস আর বেড়ালের দুধ আমি মিছে থেকেই বন্ধ ক'রে দেবো।

কমলেশ আর দাঁড়ায়নি। মধুমালার বর্মমূলে আঘাত দিয়ে তামাবর্ণ মুখে চলে গিয়েছিলো দ্রুতপদে।

মধুমালার সারাদিন জলস্পর্শ করেনি সেদিন। কমলেশও ছিলো অভুক্ত। আর, সব শুনে সত্যতত্ত্ব জান খাওয়া না করেই কাছারি চলে গিয়েছিলো হরমোহনের সাথে।

সমস্ত বাড়িটাই নিষুম। গুমোট, ধনধন। কেউ কোন কথা বলছে না। শঙ্কাতুর সকলেই। কে জানে কোন কথা থেকে আবার নতুন ফুলিঙ্গ আগুন জলে উঠবে। সকাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ছপুর, ছপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে রাত হয়েছিলো।

তোমার এটা অন্যায় হয়েছে কমল। চন্দ্রমুখী ডেকে বলেছিলেন কমলেশকে।

কেন?

হাজার হলেও বড়বউমা তোমার গুরুজন। তাকে এমন কথা বলা তোমার কখনো উচিত হয়নি।

মা তুমি শুধু আমার অন্তায়ই দেখছো। বৌদিই বা এমন কথা বলবে কেন? সেটা তোমার বিচার্য নয়।

কিন্তু—

না। তোমাকে মাপ চাইতে হবে বড়বউমার কাছে।

মা!

আমি বলছি কমল, এতে তোমার মাথা হেঁট হবে না একটুও।

পুছোর ঘরে প্রদীপের টিমটিমে আলোয় চন্দ্রমুখী কমলেশকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পাশে বসিয়ে তার মাথার চুলে আঙুল বুলাতে বুলাতে (এটা চন্দ্রমুখীর সাধনা দেবার রীতি) বলেছিলেন, সংসারে কারণে-অকারণে অশান্তি হয় এটাই কি তোমরা চাও। সামান্য মুখের কথা খরচ করলেই যদি মনোমালিন্য মিটে যায়—

কথাটা আর শেষ করেননি, হেসেছিলেন ঈষৎ। সমস্ত মুখে চেটে দিয়েছিলো সে হাসির আভা। শুধু মুখের হাসিতে অসমাপ্ত বাক্যের বাকী কথাগুলি পরিকার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : তোনরা তো বড় হয়েছো, বোঝো সবই। কোন্টা ণ্মায় অন্মায়। বুঝি আমিও। কিন্তু কি করবো বলো। বুঝলেই, চোখ মেললেই তো অশান্তি। কাজেই এই পুজোর ঘরে চোখ বন্ধ করে বসে থাকি। স্নেহের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

কুকুর কাঁদছে কোথায়। টেনে টেনে। কিন্তু হঠাৎ কাঁদছে কেন, তা-ও কুকুর ? কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গল অলক্ষণের প্রারম্ভিক ঘোষণা। ভীষণ খারাপ লাগে, বিত্রী লাগে, অস্বস্তি লাগে। গা শিরশির করে। আকাশে বখন চাঁদের আলো কিংবা ঘন অন্ধকার তখন কুকুররা কাঁদে সাধারণত। দিনের বেলায় ওদের টানা টানা কান্না সচরাচর শোনা যায়না। কেন। অমঙ্গলের অলক্ষণেরও গন্ধ ওরা পূর্বাহ্নেই পায় নাকি ? হয়তো পায়। ওদের স্রাণেন্দ্রিয় কি এতো তীক্ষ্ণ ?

দুধ খবখবে জ্যোৎস্নায় মাঠ ভেসে যাচ্ছে। বাছুর যেমন চেটে চেটে চুষে চুষে দুধ খায় পত্রবহুল ডালপালা মুখ মেলে গাছগুলো তেমনই আকর্ষণ পান করছে চাঁদের আলোর মদ। অল্প অল্প হাওয়ায় ডালপালা ছলছে, বুঝি মাতাল হয়ে গেছে গাছেরা।

সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মাঠের দক্ষিণ দিকের হলুদে বাড়িটার বাইরের ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে এলো—ত্রস্তপদে হেঁটে পার হয়ে গেলো মাঠ—উত্তরের জানগাছের ঘনছায়ায় নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলো অবশেষে। হাঁটবার ধরন দেখেই বোঝা যায় মেয়েমানুষ। ওই হলুদে বাড়ির ঝি। দিনে বাসন মাছে ঘর ঝাঁট দেয়। কাছেই ওর বাড়ি। রাতে চারদিক নিশুতি হয়ে গেলে আবার আসে। ও বাড়ির বড়ছেলে আবহুল দরজা খুলে অপেক্ষা করে ওর জন্যে। ঘণ্টা দুই তিন থাকে। তারপর শেষরাতের দিকে লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায়।

পৃথিবীটা অজব জায়গা। চিড়িয়াখানা। যে ঘর নিজের নিয়েই ব্যস্ত। তার জন্যেই যতো উদ্ভ্রম, আয়োজন, মারামারি কাটাকাটি, গালাগালি প্রশংসা, লুকোচুরির গোপনতা।

ওই যে মেয়েটা আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে এখনি ত্রস্তপদে মাঠ পার হয়ে গেলো, ও কি ? ও যদি পাগল না হয় তবে পাগল কে ? শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়স্নেহের জন্যে রাতের পর রাত এই লুকোচুরি কি কোন স্নেহ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

শিশুবয়সে সোনালী একবার একটি প্রলয়ঙ্কর ঝড় দেখেছিলো। বৈশাখ মাস। আকাশ নির্মেষ। হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরো কালো মেঘ এসে জড়ো হলো আকাশের এক কোণে। কয়েক মুহূর্তে প্রাস করে ফেললো গোটা আকাশটা। শুরু হলো ঝড়ের মাতামাতি। আর ঝড়।

সোনালীদের বাড়ির অনুরে শিবমন্দিরের ধারে বিশাল এক প্রাচীন বটগাছ ছিলো সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কয়েক মিনিটের ঝড়ে মাথা কাত হয়ে গিয়েছিলো

তার। তারপর কয়েকদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো তার অস্তিত্বও। তখন কে বলবে : পথের ওই মোড়ে শিবনন্দিরটার মাথায় পঞ্চাশবছর ধরে একটি বটগাছ ছাতা মেলে রেখেছিলো।

পুরানো কথা ভাবতে গিয়ে সেই ছবিটাই আজ সোনালীর সর্বাগ্রে মনে পড়লো।

ওই বটগাছের মতোই এ সংসারের মাথায় ত্রিশ বছর ধরে ছাতা মেলে রেখেছিলেন হরমোহন। হঠাৎ ঝড়ে সেই সগৌরব শির কাত হয়ে পড়লো। অসুখ ডবল নিউমোনিয়া। প্রাণ সংশয়। ডাক্তার ওষুধ টাকার ছড়াছড়ি। এখনকার দিনে নিউমোনিয়া কিছু ভয়াবহ রোগ নয়। পেনিসিলিন আছে। অমোঘ ঔষধ। কিন্তু এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তা প্রায় তেরো বছর হবে। সেই অসুখ থেকে অবশ্য হরমোহন সুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আর একটি রোগ এসে বাসা বেঁধেছিলো। বুকে। হাঁপানী। কার্ডিয়াক এ্যাজমা। এক পা নড়াচড়া করতে পারতেন না। অসহ্য কষ্ট। একটু বাতাস। শুধু একটু বাতাসের জন্যে আঁকুপাকু করে কুসকুস। কোর্টে যাওয়া বন্ধ হয়েছিলো। অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো উপার্জন। জীবনে অনেক টাকা রোজকার করেছেন, ব্যয়ও করেছেন দুহাতে। একটা টাকাও সঞ্চয় করেননি। ফলে যে সংসারে স্বচ্ছলতা ছিলো সুপ্রচর প্রথম অর্ধকষ্ট দেখা দিলো সেখানে।

চন্দ্রীমুখা অনেক সময় বলেছেন, সব টাকাই উড়িয়ে দিচ্ছে, ভবিষ্যতের কথা কি চিন্তা করোনা কোনদিন ?

বর্তমান শুধু জানি, ভবিষ্যৎ নাহি মানি। বলতেন হরমোহন।

কিন্তু না মানলে তো চলে না মানুষের। আজ উপার্জন করছো কোন ভাবনা নেই। কিন্তু কাল যদি অক্ষম হয়ে পড়ো তখন ?

টাকা দিয়ে কি করবো আমি ? জবাব দিতেন হরমোহন, আমার আটটা ছেলের প্রত্যেকেই তো এক একটি এ্যাসেট।

এরপরেই সেই এ্যাসেটে হাত পড়লো। ছেলেদের মধ্যে এক সত্যত্বতই কিছুটা উপার্জন করে। তিনজন নাবালক; বাকী চারজনের কলেজ জীবনই শেষ হয়নি তখনো। কাছেই একমাত্র এ্যাসেট সত্যত্বত। বাকী সকলেই লায়াবিলিটি।

নদীর একপার যখন ভাঙে আর একপার গড়ে ওঠে, এই নাকি নিয়ম। পদ্মার ক্ষেত্রে সোনালী দেখেছে এমন। এপার ভাঙছে হু হু করে, ওপারে চর পড়ছে। হরমোহন কোর্টে যাওয়া বন্ধ করলেন, সত্যত্বতর প্র্যাক্টিস্ হু হু করে জমে উঠলো। সারাদিনে নিশ্বাস ফেলবার সময় পায় না। মামলা, মক্কেল, আর নথি। তার ওপর আবার যুদ্ধের বাজার। ডিফেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া ক্রলের মামলার সীমা সংখ্যা নেই ! কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি।

সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী অর্গেই মধুমাল। ছিলো, এখন আর কাঁধাই নেই। আগে সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ হরমোহন দিতেন, সেটা থাকতো সত্যত্বতের জিস্মায়, অর্থাৎ মধুমালার হাতে। তাহলেও, সকলের সমান দাবী ছিলো তাতে, কোন অসুবিধে হলে মুখ ফুটে জানাতে পারতো। জানাতোও। সংশয়বিধার প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু

চাকা ঘুরে গেছে । সত্যতর উপার্জনে সংসার চলছে, এখন কারও অসুবিধে হলে মুখ ফুটে বলে না কেউ । সত্যতর উপার্জিত অর্থে সবাই প্রতিপালিত হচ্ছে, তারা আশ্রিত, মধুমালার কথায় ব্যবহারে পরিকার বোঝা যেতো এই ইঙ্গিত । আগে মধুমালা সংসারের কত্রী থাকলেও চন্দ্রমুখী ছিলেন তারও কত্রী । সংসারের চাকাটা হঠাৎ থমকে থেমে পড়লে তেল গ্রিঞ্জ দিয়ে আবার চালিয়ে দিতেন তিনিই । এরপর নিজেকে একেবারেই সরিয়ে নিলেন পুজোর ঘরের চার দেওয়ালের অন্তরালে ।

আর, এই পরিবর্তনের কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে মধুমালার চেষ্ঠার ঝুটি ছিলো না । একটি বিশেষ ঘটনার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে সোনালীর । যুদ্ধের দরুণ দু'ভিক্ষু দেখা দিয়েছে । চাল ডাল অগ্নিমূল্য । সকলে খেতে বসেছে এক সাথে । লম্বা টানা বারান্দায় সার বেঁধে আসনের পর আসন । ঠাকুর সবাইএর পাতেই ভাত দিয়েছে । কমলেশের পাতে পরিমাণে কিছু বেশি । ও বরাবরই ভাত একটু বেশি খায় । শুধু ভাত কেন সব জিনিসই । ছ'ফিট লম্বা পেশল পাথর কুঁদে তৈরী মূর্তির মতো স্তম্ভাঙ্কিত দেহ । সেই দেহকে স্নান রাখতে খাওয়ার প্রয়োজন হবে সাধারণের চাইতে বেশি এ এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়...চন্দ্রমুখী সামনে বসে হাওয়া করছিলেন । পাতে মাছি না বসে । এটা তাঁর দৈনিকের অভ্যাস ছিলো । শতকাজ থাকলেও ছেলেদের খাবার সময় সামনে এসে বসবেনই ।

এই দু'ভিক্ষুর বাজার চাল ডালের দাম আগুন, উনি পর্যন্ত খাওয়া কমিয়ে ফেলেছেন ! যেন দেওয়ালকে উদ্দেশ্য করে বললো মধুমালা ।

কথাটা হঠাৎ মধুমালা কেন বললো, কাকেই বা বললো, অর্থ কি, প্রথমটা কিছুই ভলিয়ে ভাবেনি সোনালী । কিন্তু দেখেছিলো বাতাস করতে করতে চন্দ্রমুখীর হাত পাখা হঠাৎ থেমে গেলো ; কমলেশ পাত থেকে তুলে নিলো হাত । এক মুহূর্ত নিম্পলক তাকিয়ে রইলো মধুমালার দিকে । তারপর এক গ্রাস ভাতও মুখে না দিয়ে উঠে পড়েছিলো আসন ছেড়ে ।

চন্দ্রমুখী বসে ছিলেন নিম্পন্দ হয়ে । হাত থেকে পাখা পড়ে গিয়েছিলো মাটিতে ।

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে মধুমালা বলেছিলো, কি হলো মেজঠাকুরপো, খাবে না ?

না ।

কেন ?

আগুনঝরা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মধুমালার চোখের দিকে চেয়ে কমলেশ জবাব দিয়েছিলো, আমার কিদে নেই ।

কিদে নেই ? তাহলে শুধু শুধু এতো ভাত নষ্ট করলে কেন । ওতে হুজুন লোকের পেট ভরে যেতো । এই দু'ভিক্ষুর বাজারে চালের দাম আকাশ ছোঁয়া, তাও পাওয়া যায় না পয়সা দিলেই । চাল জোগাড় করতে উনি তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন । তোমরা যদি এইভাবে নষ্ট করো । বলে মধুমালা চলে গিয়েছিলো ঘরে ।

তখন সোনালী দেখেছিলো : চন্দ্রমুখীর আয়ত সুলভ চোখ দুটি জলে জলে টলমল । কান্না জিনিসটা ছোঁয়াচে । সোনালীর চোখেও জল এসে গিয়েছিলো । অসহ্য জ্বালায় বুক জলে উঠেছিলো । অথচ কিছু করবার নেই । ঘরে এসে লুকিয়ে কেঁদেছিলো সোনালী । তারপর থেকে খেতে বসে ভাতের গ্রাস মুখে দিলেই সোনালীর মনে হতো তেতো—বিস্বাদ, যেন ভাতের সাথে চিরতার নির্ধাস মেশানো আছে । না খেলে মানুষ বাঁচে না । স্বাস্থ্য রাখতে গেলে পাকস্থলীকে খাপ্প দিতেই হয় । সোনালীও দিতো । কিন্তু অনিচ্ছায়, অপমান বোধের সাথে ।

একটা টুকরো ঘটনা মাত্র । অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটাই মনে আছে সোনালীর । এই একটা ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় সবকিছু । কি ভাবে মধুমালা বুঝিয়ে দিয়েছে সংসারে সে-ই সব বিবেচনার মালিক । সত্যতর অর্থে সকলে আশ্রিত । তবে সকলের মধ্যে কমলেশের ওপরই মধুমালার আক্রোশ ছিলো বেশি । ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর থেকে সুযোগ পেলেই আঘাত করেছে কমলেশকে । নিকরুণ আঘাত, যে আঘাত মর্মমূলে বিঁধে জ্বালা ধরিয়ে দেয় সর্বাত্মক । কমলেশের কপালও মন্দ । একটার পর একটা সুযোগ না চাইতেই পেয়েছে মধুমালা । যেমন বি এস সি পরীক্ষার ফল বেরোতেই দেখা গেলো কমলেশ পাশ করতে পারেনি । অথচ তার আগে কোনদিন সে পরীক্ষায় ফেল করেনি । বরাবর ভালো ফল করে পাশ করেছে । ইন্সকুলে প্রাইজ পেয়েছে বছরের পর বছর । একটা কাচের আলমারি ভাঙি হয়ে গিয়েছিলো বইএ । অথচ সেই কমলেশ ফেল করলো অভাবিতভাবে । মধুমালা এ সুযোগ ছাড়েনি ।

বললো, কি করে পাশ করবে ? পাশ করলে যে সংসারের উপকার হবে । চাকরি বাকরি করতে পারবে । তাতে দুপয়সা আসার সম্ভাবনা আছে যে ! উনি তো ন্যাঙ্কিস্টেট সাহেবকে বলে চাকরি ঠিকই করে রেখেছিলেন । কিন্তু বাবু পাশই করতে পারলেন না । করবেই বা কি করে, সারাদিন বই সামনে নিয়ে বসে কখনো ! কুকুর আর বেড়াল আর পাখী । আদিখ্যেতা যতো ! আবার একটা বছর এখন কলেজের মাইনে টানতে হবে । উনি একা মানুষ, এতো টাকা আনবেনই বা কোথেকে ?

কমলেশ কোন জবাব দেয়নি । মাথা নিচু করে শুনেছিলো ।

চন্দ্রমুখী সেই সময় পুজোর ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন । প্রত্যেকটি কথা তাঁর কানেও গিয়েছিলো ।

বললেন, বউমা ।

তবু মধুমালা চুপ করেনি ।

আপনি কেন সব কথায় কথা বলতে আসেন মা ! আপনার অত্যাধিক আদর পেয়েই ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে গেছে ।

চন্দ্রমুখী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন । যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না নিজের কানকেও ।

এইখানেই মধুমালা থেমে যাননি । দিনের পর দিম নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন

করে কথার তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে বিঁধেছে কমলেশকে । শুধু কমলেশই বা কেন, সে হলো মাধ্যম ।

একদিন কমলেশ বাজার থেকে তার কুকুরের জন্তে মাংস আনা, বেড়ালের জন্তে বরাদ্দ দুধ ইত্যাদি বন্ধ হলে মধুমালার মুখের ওপর প্রতিবাদ করেছিলো । তখন হর-মোহন উপার্জনক্ষম ছিলেন, সেই সাহসেই কমলেশ প্রতিবাদ করেছিলো । কিছু অপ্রিয় কথা, যদিও সত্যি, বলেছিলো মধুমালাকে । তা নিয়ে প্রচুর অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো । তারপর চন্দ্রমুখী কমলেশকে মাপ চাইতে বলেছিলেন মধুমালার কাছে । মাপ চেয়েছিলো সে । চন্দ্রমুখীর কথা অবহেলা করতে পারেনি । তবু, কমলেশ মাপ চাইলেও, মধুমালার ভুলতে পারেনি সে-ঘটনার স্মৃতি ।

আর ভুলতে পারেনি বলেই বোড়ের কিস্তিতে দাবা মাত্ করবার মতো শেষ চাল দিলো মধুমালার । বাজার থেকে কমলেশের কুকুরদের জন্তে মাংস আনা আবার বন্ধ করে দিলো । বন্ধ হলো বেড়ালদের বরাদ্দ দুধ । পাখীদের ছোলা-ছাত্তুলক্ষা । মধুমালার জানতো ক্ষমতা তখন পুরোপুরি তার হাতে । আর কমলেশ প্রতিবাদ করবে না । প্রতিবাদের নেকড়ও ভেঙে গেছে ।

সত্যিই কমলেশ কোন প্রতিবাদ করলো না, কোন কথা বললো না । কুকুর দুটোকে চেন ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলো বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড়ের ভেতরে । একটা বাঁশঝাড়ের সাথে চেন দিয়ে বেঁধে রাখলো দুটোকেই । তারপর বাড়ির ভেতর বার করলো দো-নলা বন্ধুকটা । ভরে নিলো দুটো কার্টিজ । আবার চলে গেলো বাঁশঝাড়ের ভেতর ।

গুড়ুন ।

গুড়ু-উ-ম্ ।

পর পর দুটো প্রচণ্ড আওয়াজ এলো বাড়ির ভেতর ; দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হলো ।

চন্দ্রমুখী দুটে বেরোলেন পুজোর ঘর থেকে । চিৎকার করে উঠলেন, কমল !

সোনালী ভয় পেয়ে গিয়েছিলো । হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলো তার ।

না । কমলেশ আত্মহত্যা করেনি । কয়েক মুহূর্ত বাদেই দেখা গেলো মৃত কুকুর দুটোকে চেন ধরে টানতে টানতে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে নিয়ে আসছে । দুটো কুকুরেরই বুকের কাছে গভীর ক্ষত । রক্ত বেরোচ্ছে ভালকে ভালকে ।

সকলেই তখন পাখর হয়ে গেছে ।

বৌদি ।

কুকুর দুটোকে টেনে উঠানের মাঝখানে নিয়ে এসে চিৎকার করে মধুমালাকে ডাকলো ।

মধুমালার এসে দাঁড়ালো বারান্দায় ।

এইবার আপনি সন্তুষ্ট নিশ্চয়ই ।

হেসে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলো কমলেশ ।

সেইদিন রবিবার। সত্যভ্রত বাইরের মহলে কাছারিঘরে মকেলদের নিয়ে বাস্তু ছিলো। গওগোল শুনে বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর। উঠানের মাঝখানে তখনও কনলেশ দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে যত কুকুর ছোটো, বশুকটা একপাশে পড়ে। রক্ত চুইয়ে চুইয়ে উঠানের সাদা সিमेंট বয়ে গড়িয়ে গেছে নর্দমা অবধি। জমে ধকধকে ঘন হয়ে আসছে রক্তধারা। কিছুক্ষণ গভীরভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলো সত্যভ্রত। বারান্দার ওপরে খানের গায়ে হেলান দিয়ে মধুমালা নিশ্চল দাঁড়িয়ে। রাক্ষসরাজের রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় সব অল্পভূতি হঠাৎ যেন পাষাণ হয়ে গেছে। সেদিকেও একবার তাকালো সত্যভ্রত।

তারপর চন্দ্রমুখাকে এসে বললো, কমল আনার বউকে যে অপমান আজ করেছে তার পরে আমাদের এ বাড়িতে আর থাকা চলেনা একদণ্ড।

চন্দ্রমুখা শুনলেন। চুপ করে থাকলেন এক লহমা। তারপর অশ্রুট স্বরে বললেন, জানি অনেকদিন থেকেই ছুতো খুঁজছিো তুমি। আজ যা পেয়ে গেছো।

সত্যভ্রত তক্ষুপি বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। ফিরলো ঘণ্টা ছয়েক বাদে। আরম্ভ হলো জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা। মধুমালা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সত্যভ্রত বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো তখন বেলা তিনটে। না খেয়ে না দেয়ে। চন্দ্রমুখা পুজোর ঘর থেকে আর বেরোলেন না। সত্যভ্রতরা গেলো, তবু না। হরমোহন এ গওগোলের মাঝেও নীরব। বিছানার ওপর বসে, কোলে বালিশ একটা, হাতে ছাঁকোর নল। যেন কিছুই হয়নি।

চারিদিকে কঁাকা কঁাকা। সত্যভ্রতের ঘরে কেউ নেই। নিঃশব্দ। ওরা চলে গেছে, আর কোনদিন আসবে না এবাড়িতে, সোনালীর বিশ্বাস হচ্ছিলো না তবু। মনে হচ্ছিলো, হঠাৎ কোন দৈববলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ফিরে আসবে মধুমালারা, জোড়া লাগবে ভাঙা সংসার। পুজোর ঘরে চন্দ্রমুখার পাশে গিয়ে বসলো সে। চন্দ্রমুখা কোন কথা বললেন না। একটা হাত রাখলেন সোনালীর গায়ে। আর তারপর, সোনালী দেখলো, ঝরঝর করে কাঁদছেন চন্দ্রমুখা।

বিকেলের দিকে হরমোহন ডাকলেন সোনালীকে।

আমাকে ডাকছেন বাবা?

তোমার মাকে এককাপ চা করে আনতে বলো তো।

আমিই করে আনছি। সোনালী বললো।

আচ্ছা।

কিন্তু চন্দ্রমুখী বোধহয় শুনেছিলেন। তিনি সোনালীকে কিছুতেই চা করতে রান্নাঘরে যেতে দিলেন না। বললেন, না না, তোমাকে যেতে হবে না। আমিই করে আনছি।

আবার কয়েক মিনিট বাদেই ডাকলেন হরমোহন।

চা হলো?

হচ্ছে।

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আবার ডাকলেন, হলো চা?

হচ্ছে !

এক কাপ চা করতে এতো সময় লাগে ? হরমোহনের গলায় বিরক্তির কাঁজ ।

সোনালী বললো, না নিজে রান্নাঘরে গেছেন ।

তারপর নিজে রান্নাঘরে বসলো সে । উত্তুন থেকে কেটলি নামিয়ে টি-পটে জল ঢেলে চা ভিজিয়ে দিলেন চন্দ্রমুখী । সাজালেন কাপ প্লেট্ । এইরকম সময় হরমোহন নিজে এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন । সমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিলে সোনালী ।

চা হয়নি এখনো ?

এই তো হয়ে এলো । ভিজিয়ে দিচ্ছি । চন্দ্রমুখী জবাব দিলেন ।

হয়ে এলো, হয়ে এলো, হয়ে এলো ! সেই একঘণ্টা বরে শুনছি । চাইনা আমার চা ।

একটা প্রচণ্ড লাথি দিয়ে হরমোহন উল্টে দিলেন টি-পট্ । গরম জল চল্কে গিয়ে পড়লো চন্দ্রমুখীর হাতে । কাপ-প্লেট্ টি-পট্ ছিটকে পড়ে ভেঙে টুকরোটুকরো হয়ে গেলো ।

হরমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন নিমেষে । পরিশ্রমে এবং উদ্বেজনায শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিলো ।

সোনালী হতচকিত হয়ে গিয়েছিলো । হরমোহনের এরকম অদ্ভুত ব্যবহার আগে কোনদিন দেখেনি । চন্দ্রমুখী বিস্মিত হননি এতোটুকু । নীরবে ভাঙা কাপ প্লেটের টুকরোগুলি কুড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন বাইরে ।

এখন ওই ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে কার্যকারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সোনালী । হরমোহনের পয়লা নম্বর এ্যাসেট্ লিকুইডেটেড হয়ে গিয়েছিলো ওইদিন । সেই আশ-ভঙ্গ এবং মানসিক আঘাত প্রতিফলিত হয়েছিলো সেদিন হরমোহনের আকস্মিক এবং অদ্ভুত ওই আচরণে ।

ভীকু টলমল পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদ মাঝ আকাশ পর্যন্ত চলে এসেছে । বোকা বোকা ভাগর চোখ মেলে পৃথিবীকে ঠিক মাথার ওপর থেকে চেয়ে দেখছে বিস্মিত কৌতূহলে । এই বিরাট বিস্তীর্ণ নদীটাকে হয়তো ভাবছে রূপালী জরির ফিতে, গাছ-গুলো তার নক্সা । অতো উঁচু থেকে সত্যিই কি দেখতে পাচ্ছে কিছু ?...না পেলো অমন অনিন্দ্য চোখে চেয়েই বা থাকবে কেন ?

ঈশান কোণে একরাশ কালো মেঘ এসে জমেছে কোথা থেকে । ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে সেই মেঘের কালিনা, যেন হামাগুড়ি দিয়ে স্তম্ভপূর্ণে এগিয়ে আসছে, আকাশকে তার চাঁদ সমেত—চাঁদের আলোর রোশনাই সমেত—দখল করবার কুটিল আকাঙ্ক্ষায় ।

একটু, আর একটু, আধখানা, আরো, হ্যাঁ, এইবার গোটা আকাশটাই দখল করে ফেলেছে—বিশ্ব চরাচর ছেয়ে ফেলেছে নিকষকালো মেঘ তার বাহুডপাখার নিচে । কিছু আগেই আলো ছিলো, মিঠে মোহময় মন্দির আলো, দুধ ধবধবে জ্যোৎস্না চরাচর ব্যাপে,

এখন অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে মনে হয় এই অন্ধকারের আদি অন্ত নেই। অতলাস্ত। প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তু যেন হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিনুপ্তির অতল থেকে, শত্রু আলোকে অতকিত চোরা আক্রমণে পরাজিত নিহত করে।

বাতাস বইতে শুরু করলো হঠাৎ। শৌ শৌ। রুদ্ধ আক্রোশে মানুষ যেমন চাপা আওয়াজ করে, গভীর বনের বাঘ যেমন তীব্র ছন্টার দেয়, সেই রকম ঝোড়ো বাতাসের শব্দটা। আলোর শত্রু অন্ধকারকে ও দেশছাড়া করবে। করবেই। এখনই।

যেহ আর বাতাসের এই মল্লযুদ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো। পরিশ্রান্ত হয়ে ধেনে গেলো বাতাস। আর তার আগেই আন্নার কালিমার মতো কালো মেঘের পুত্র তার নিকষকালো বাছড়পাখা গুটিয়ে পালিয়েছে প্রাণভয়ে।

আবার হাসিমুখ চাঁদ দেখা দিলো, দেখা দিলো চোখ পিটপিট তারার ঝাঁক। ভেসে গেলো মাঠ ঘাট ছব ববববে জ্যোৎস্নায়। এখন নিশ্চিত বিশ্বাসে হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে বিনুপ্তির অতল থেকে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো যে অন্ধকার কণিকের জন্তু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো, শত্রু আলোকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত নিহত করে সে আসেনি, এসেছিল পেছন দরজা দিয়ে নুকিয়ে, চোরের মতো পা টিপে টিপে। আলোর অস্তিত্বের সান্নাধ্য ঘোষণাতেই আবার পালিয়েছে তাই। না কি আলো ইচ্ছে করেই কিছুক্ষণ নুকোচুরি খেললো অন্ধকারের সাথে?

গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে সেদিন ঘুম ভেঙেছিলো সোনালীর। স্বপ্ন দেখেছিলো : টেডি আর জিমের রক্তাক্ত মৃতদেহ দুটো উঠানের মাঝখানে পড়ে আছে, কমলেশ পাশে দাঁড়িয়ে বশুকহাতে। চুল এলোমেলো—চোখ রাঙা—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বৌদি।

চিৎকার করে মধুমালাকে ডাকলো কমলেশ। মধুমাল। এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

এইবার আপনি সন্তুষ্ট নিশ্চয়।

হেসে বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হাসতে গিয়ে কঁদে ফেললো।

সকালের দৃশ্যটা। স্বপ্নে দেখেছিলো সেইটাই আবার। তারপর দেখেছিলো : টেডি আর জিম যেন রক্তমাখা শরীরে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যন্ত্রণাকাতর কুঁই কুঁই শব্দ করছে।...ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো সোনালীর। ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানায় কমলেশ নেই। হরমোহনের ঘরেও আলো জ্বলছে উঁকি দিয়ে দেখলো, আলো জ্বলছে চন্দ্রযুখীর ঘরেও। হরমোহন এবং চন্দ্রযুখীর গলার আওয়াজ আসছে সে ঘর থেকে।

কেমন যেন ভয় ভয় করছিলো সোনালীর। গা ছম ছম।

চিৎকার করে উঠেছিলো, বা।

চন্দ্রমুখা সাড়া দিয়েছিলেন ওই ঘর থেকে, তোমার আবার কি হলো ?

ভয় করছে ।

এ ঘরে চলে এসো ।

বিছানা থেকে নেমে ও-ঘরে গিয়েছিলো সোনালী । চন্দ্রমুখীর বিছানায় হুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিখর হয়ে শুয়ে ছিলো কমলেশ । খাটের ধারে হরমোহন এবং চন্দ্রমুখা ছুতনেই বসে । চন্দ্রমুখী বাতাস করছিলেন পাখা হাতে ।

এখন তুমি স্নান বোধ করছো তো ? কমলেশকে জিজ্ঞাসা করলেন হরমোহন ।
হ্যাঁ ।

হরমোহন উঠে চলে গেলেন । চন্দ্রমুখীকে বলে গেলেন, তুমি আজকের রাতটা কমলেশকে এখানেই রাখো ।

আমার একা শুতে ভয় করছে । হরমোহন চলে যাবার পর বললো সোনালী ।

ভয় ? কেন ?

মনে হচ্ছে টেডি আর জিম্ যেন রক্তমাখা শরীরে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে । কমলেশ এতোকণ চুপ করে শুয়ে ছিলো । সোনালীর কথায় চমকে উঠে বসলো, এ আমি কি করলাম মা !

চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি এখন ঘুমোবার চেষ্টা করো ।

ঘুম যে আসছেনা কিছুতেই । চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছি টেডি আর জিম্ রক্তাক্ত শরীরে আমার মাথার কাছে ঝাঁড়িয়ে আছে । নিরীহ চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে যেন বলতে চাইছে : আমরা তো কোন দোষ করিনি । করেছি কি ?

ও তোমার মনের বিকার । চন্দ্রমুখী বললেন ছবাবে, হু'একদিন বাদে ঠিক হয়ে যাবে ।

চন্দ্রমুখী বলেছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক হয়নি । কমলেশ পাগল হয়ে গিয়েছিলো । প্রথমে এই মস্তকবিকৃতি ধরা পড়েনি । রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠতো : টেডি—টেডি, হ্যালো জিম্ ! কান হিয়ার ।—সোনালী ভাবতো ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেই এমন করে ও । কিন্তু কিছুদিন বাদে টের পাওয়া গেলো । হয়তো বসে আছে উঠানের বেঞ্চিতে বিকেলবেলা, হঠাৎ শূন্য হাত বুলিয়ে বলতে লাগলো : ইয়েস্, সিট ডাউন । ডোর্ট কোয়ারল ।

চন্দ্রমুখী দেখতে পেয়ে বললেন, ওকি কমল, অমন করছো কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত ফিরে এলো কমলেশের, এঁয়া ? না, ও কিছু না ।

চন্দ্রমুখী বললেন, যাও বাইরে বেরিয়ে এসো । মন ভালো থাকবে তাতে ।

কমলেশ উঠে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেলো । যাবার সময় হাতে করে রবারের বল দুটো নিয়ে গেলো ।

বাড়ির বাইরেই বড় মাঠ একটা । সোনালীর ঘরের জানালায় মুখ দিয়ে ঝাঁড়ালে দেখা যায় । সোনালী জানালায় মুখ রেখে ঝাঁড়িয়েছিলো । দেখলো, রবারের বল দুটো ছুঁড়ে দিলো কমলেশ । তারপর হাঁক দিয়ে উঠলো, টেডি এও জিম্ গো, পিক্ আপ দোজ বন্স্ !

কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোর উন্মাদ হয়ে গেলো সে। সারাদিন চিৎকার করে : টেডি—টেডি, জিম—জিম ! খায় না, খুমোয় না। চেহারাটাও কেমন ভীতিপ্রদ হয়ে গেলো। করমচা ফলের মতো লাল চোখ—তা-ও গর্ভে ঢুকে গেছে, এলোমেলো চুলের রাশ লুটোপুটি ঝাঞ্চে মুখের ওপর। শেষপর্যন্ত হাতে দড়ি বেঁধে তালি বন্ধ করে কমলেশকে আটকিয়ে রাখতে হয়েছিলো ঘরে। খোলা থাকলেই জিনিসপত্র ভেঙেচুরে একাকার করে ফেলেছিলো। হাতের সামনে একটা কাচের গেল্লাস পেলো অমনি ছুঁড়ে মারলো শুলে, যেন কোন শত্রু অদৃশ্য হয়ে এসেছে ঘরের ভেতর, তাকে হত্যা করতে।

গেট আউট, আই সে গেট আউট ! গলায় যতোটুকু জোর আছে সবটুকু দিয়ে চিৎকার করে উঠতো, গেট আউট, আর আই উইল কিল ইউ ! আ—উ—ট !

কান্দারি কাজকরা কাঠের একটা স্মৃশ্চ টিপয় ছিলো ঘরে, সেটা হুহাতে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে মারলো আবার সেই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে।

কিংবা কোন সময় হয়তো কঁাদছে, হুহাতে মুখ ঢেকে অমুনয় বিনয় করছে অদৃশ্য শত্রুর কাছে, টেডি, জিম তোরা তো জানিস তোদের আমি কতো ভালোবাসতাম। আমি নিজের হাতে তোদের খুন করেছি, তখন আমার মাথার ঠিক ছিলোনা। তার ক্ষম্মে তোদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে মাপ কর। ওকি, ক্ষমা করবি না ? আ, টেডি টেডি, আমার গলা কানড়ে ধরলি কেন ? ছেড়ে দে। উঃ, বড় লাগছে। আমাকেও মেরে ফেলবি ? টেডি—টেডি—টেডি—

এখন কতো রাত ? আকাশ দেখে বোঝবার উপায় নেই। চাঁদ দেখে বোঝবার উপায় নেই। তারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। ফেউএরা খেমে গেছে, শেয়াল ডাকছে না, আমগাছে বাহুড় নেই, হতোমর্ণ্যাচার ডাকও বন্ধ, খেমে গেছে মাতালের কান্না। শুধু নীরবতা। চাপধরা নৈশশব্দ। ছুঁচের মাথায় এই নৈশশব্দকে বোধকরি গঁথে তোলা যাবে। আর ফিকে হালকা অন্ধকার। অল্প একটা প্রাণীও কি জেগে নেই ? একা থাকার, একা জাগার, একা বেদনা পাবার মতো বেদনা আর কিছু নেই। এই একা থাকা, একা জাগা, বেদনায় বধির হয়ে যাওয়া অবশ্য শেষ হয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে আর কিছু পরেই, তখন সোনালী আর সোনালী থাকবে না জীবন্ত একটি প্রাণ জীবন থেকে পৌঁছে যাবে যত্নের গভীরে সেই ব্যাঙটার মতো। আঃ যত্ন, কঠিন শীতল যত্ন, খাসবন্ধকর যত্ন, তুমি এসে ছেয়ে দাও ব্যথা জরজর বেদনাবিবশ এই দেহকে তোমার নির্দয় আলিঙ্গনের প্রলেপ দিয়ে। হ্যাঁ, সেই ভালো, মোহ নেই আর জীবনে। কিসের মোহ, কার জন্যে আশায় বুক বাঁধবো আবার ? বন্ধ পাগল, ইতর সন্দেহের আলায় জলেযাওয়া একটি মানুষ, তাকে ঘিরে আর কতো স্বপ্নের জাল বুনেবো ? তার চাইতে তুমি এসো, যত্ন, নরম ঘুমের আবেশ নিয়ে আমার চোখে, তোমার অতল কালো গহ্বরে টেনে নিয়ে যাও আমাকে, তোমার বিশীর্ণ হাত দুটি বাড়িয়ে দাও, যত্ন। যত্ন, তুমি এসো।

কিন্তু এই যে আমি জীবনে আশা হারিয়ে যুত্মর হুয়ারে পালাতে চাইছি। আমি, সেই আমি কি? কমলেশ তো পাগল, আমিও কি পাগল নই?

প্রথমবারের মস্তিষ্কবিকৃতি থেকে কমলেশ ভালো হয়েছিলো। মাসখানেক পর। একেবারে সুস্থ। পরের বারে বি এসসি পাশ করলো ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পেয়ে। তারপর টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ট্রেনিং নিয়ে চাকরি পেরেছিলো আমেদাবাদে। সোনালীকেও আমেদাবাদে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন চন্দ্রমুখী।

ফ্যাক্টরি থেকে সুন্দর একটি বাংলো দিয়েছিলো কমলেশকে আর আমেদাবাদে এসে কুতিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো সোনালী। এতোদিনে তার সাধ পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে নীড় রচনা করবে সেখানে সে আর কমলেশ। আর কেউ নেই। মধুমালা এবং সত্যজিতর করাল কুণ্ডলী সংস্পর্শের আশঙ্কা থাকবে না।

সোনালীর বিয়ে হয়েছিলো তার প্রায় ছবছর আগে। কিন্তু বিয়ে হয়েও কমলেশকে নিবিড় করে পায়নি। কতগুলো কুকুর বেড়াল পাখী দেওয়াল ভুলে রেখেছিলো হুজনের মধ্যে। কমলেশ মত্ত থাকতো তাদের নিয়েই। সোনালী নামে একটি মেয়ে তার উত্তপ্ত সান্নিধ্যের আশায় আকুল হয়ে থাকে সারাদিন, এ ধরন রাখতো না। এখন তারাও নেই। এই সোনালী চায়, এই সে চেয়েছিলো। শুধু সে আর কমলেশ হুজনে। তৃতীয় কেউ নয়। তার আঠারো বছরের দেহের তটে তটে যৌবনের হুঃসহ চেউ তখন আছড়ে আছড়ে মাখা কুটছে। কমলেশ সুপুরুষ, শক্তিশালী, পেশল। ছফিট লম্বা, পাথরে কুঁদে তৈরী নৃত্তির মতো তার দেহ সুগঠিত। সোনালীর উচ্ছসিত হবার কারণ এই। এবার সে তৃপ্তি পাবে। কল্পনা করতেও রোমান্স লাগে, দেহ অবশ্য হয়ে আসে, শিহরণ লাগে রোমান্সে।

কিন্তু আর একবার হতাশ হলো সে। আগে ছিলো—কুকুর বেড়াল পাখী, এরপর হলো ফ্যাক্টরি—ফ্যাক্টরির কাজ নিয়ে ডুবে গেল কমলেশ। ও ছাড়া ধ্যান নেই, ও ছাড়া জ্ঞান নেই। সকাল সাতটায় পোশাক পরে বেরিয়ে যায়, সাড়ে সাতটা থেকে জেনারল্ শিফট্। পাঁচটায় শেষ। ভেঁা বাজে, পিলপিল করে গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাল্লুষের মিছিল। ক্লান্ত, শ্রান্ত। কিন্তু কমলেশ ফেরে না। কোন কোনদিন রাত ন'টা বেজে যায়। সোনালী উদাস চোখে চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে হয়তো রাত দশটার সময় বাড়ি ফেরে কমলেশ।

তোমার এতো দেরী হলো যে? সোনালী জিজ্ঞাসা করে।

বড্ড দেরী হয়ে গেছে, না? কমলেশ চেষ্টা করে হাসতে, একটা মেশিন ব্রেকডাউন হয়ে গিয়েছিলো কিনা, তাই।

রোজই কি তোমাদের মেশিনের ব্রেকডাউন হয়? কঠিনের উত্তাপ না এনে পারেনি সোনালী।

না রোজ কেন হবে। কমলেশ প্রশ্ন এড়াতে চেষ্টা করতো।

রোজই তো রাত ন'টা দশটা বেজে যায় তোমার ফিরতে।

তুমি বোঝোনা সোনালী। কমলেশ কৈফিয়তের সুরে বলতে চেষ্টা করেছে,

কতো কাজ । একটা রেসপনসিবল পোজিশনে প্রথমেই দিয়েছে আমাকে । আমার কপাল ভালো । এখন যদি কাজ না দেখাতে পারি, ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের নজরে না পড়তে পারি, ভবিষ্যতে উন্নতি করবো কি করে ?

বলে সোনালীর সামনে থেকে সরে গেছে সে । মুখহাত ধুয়ে, খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে বিছানায় । সাথে সাথে ঘুম । গভীর ঘুম । সারাদিন পরিশ্রমের ফল ।

ক্ষোভ, অভিমান, রাগ । তিনটে একসাথে ভিড় করে এসেছে সোনালীর মনে । চোখ দিয়ে জল ফেটে পড়তে চেয়েছে । কেন, কেন, কেন ! তাকে কি মানুষ বলেই গণ্য করেনা কমলেশ ।

তারপর । তারপরের ঘটনাটা সোনালীর পক্ষে দুঃসহ লজ্জার ।

কোন গাছকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে রেখে সেই ঘরের একটি জানালা দ্বিধা খুলে রাখলে কয়েকদিন বাদে দেখা যাবে আলোর দিকে ধীরে ধীরে ঝুকে ঝুকে যাচ্ছে গাছটি । এই ঘটনাটাও ঠিক সেইরকম ! পাশের বাড়িতে একটি ছেলে থাকতো : অসীম চৌধুরী । একটু একটু করে নিজের অভ্যন্তরেই সোনালী ঝুঁকেছিলো তার দিকে । বেঁটে খাটো চেহারা, কালো রং, ভোতা মুখ । কোন দিক থেকেই আকর্ষণীয় নয় । তবু.....! ছেলেটির বাবা কমলেশের সাথেই কাজ করতেন, বেশ বড় অফিসার । অসীম কলকাতায় ইস্টেলে থেকে পড়তো, এম্ এস্‌সি । আমেদাবাদে এসেছিলো সে সময় । পুজোর ছুটিতে কলেজ বন্ধ । পাশের বাড়িতে সোনালীর যাতায়াত ছিলো, সেই সূত্রেই আলাপ । আর পরিচয়ের সেই সূতো ধরেই অসীম আসতো । ছপুর বেলা, যখন কমলেশ কারখানায় । সোনালীর ভালোই লাগতো । নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মাঝে তবু অসীমের সাথে গল্পে সময় কাটে ।

জানেন বৌদি, এখানে আমার একদম ভালো লাগে না ।

অসীম চৌধুরী বলতো ।

কেন ?

কি জানি তা বলতে পারবে না । তবে কলকাতায় অনেকদিন থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে । হয়তো সেজন্যেই ।

সে তো নিশ্চয় । সোনালী বলতো, কলকাতার সাথে এখানকার তুলনা ।

তবু আপনি আছেন, এবার তাই সময় কাটছে । সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলতো সে, অন্তিম যেন বিজ্ঞী লাগে—

রোজ ছপুরেই অসীম চৌধুরী এসে এমন অর্থহীন গল্প করতো । না এলে সোনালীরই কেমন যেন সময় কাটতে চাইতো না । কঁাকা কঁাকা মনে হতো । শেষের দিকে সকাল ছপুর দুবেলাই আসতো সে । দিনের প্রায় সময়ই কাটাতো সোনালীর ঘরে ।

সে দিন বেলা এগারোটা । সোনালীর স্বান হয়নি । সকাল ন'টা থেকে গল্প করছিলো অসীমের সাথে । চন্‌চনে রোদ্দুর আকাশে, পথে লোকজন নেই ।

অনেক বেলা হয়েছে, এবার ভুমি বাড়ি যাও ঠাকুরপো । সোনালী বললো ।

ই্যা, যাই। উঠে দাঁড়ালো অসীম।

তারপর ওকে এগিয়ে দিতে বাইরের ঘরে এসেছে সোনালী। দরজার ছিটকিনিটা খুলেছে, পাশা ছোটো তখনো খোলা হয়নি, হঠাৎ, ই্যা, হঠাৎই—সোনালী চমকে উঠেছিলো। বিছাৎ শিহরণে শিউরিয়ে উঠেছিলো। কোন কথা বলতে পারেনি, আপত্তি করতে পারেনি। পেছন থেকে ছুঁহাত দিয়ে সোনালীকে জড়িয়ে ধরেছিলো অসীম। টেনে নিয়ে এসেছিলো ঘরের ভেতর। মোটা মোটা ঠোঁট ছুটি চেপে ধরেছিলো তার পাতলা, ঈষৎ লাল ঠোঁটের ওপর।

সোনালীর সর্বশরীর অবশ হয়ে গিয়েছিলো। অসীমের একটা হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরা, আর একটা হাতে পিঠ লেপটে ধরেছে।

হঠাৎ বেত্রাহত কুকুরের মতো চমকে সোনালীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলো অসীম। আর সোনালী পেছন ফিরতেই দেখতে পেয়েছিলো : খোলা দরজার সামনে কনলেশ দাঁড়িয়ে, পাখরের মতো অনড়।

অনেকগুলো কার্যকারণের একত্র সংযোগ—অসীমের সাথে আলাপ, তার সোনালীর দুর্বলতার স্বযোগ নেওয়া, আর সেইদিন সেই মুহূর্তেই স্বর গায়ে কনলেশের কারখানা থেকে ফিরে আসা। এতোগুলো ঘটনা একসময়ে কি করে ঘটেছিলো এমন ভাবলে অবাক লাগে। আর অসীম, সে-ই বা এতো সাহস পেয়েছিলো কোথেকে? সোনালীর মুখেচোখে হয়তো মানসিক অতৃপ্তির ছাপ দেখতে পেয়েছিলো সে। হয়তো নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পেরেছিলো সোনালীর মনের কোন ভাগগাটা সব চাইতে নরম। লজ্জায় মরনে মরে গেল সোনালী। কনলেশের সামনে মুখ দেখাবার উপায় নেই তার।

যদি কনলেশ পরে এ নিয়ে কোন কট্টকথা বলতো, রাগারাগি করতো, এমনকি ত্যাগ করতো তাকে, তাহলে তার বলবার কিছু থাকতো না। একটা সাধনা থাকতো মনের কাছে : কনলেশ ভুল বুঝেছে তাকে, ও-ব্যাপারে বাস্তবিকই তার কোন দোষ ছিলো না। অতর্কিতে, সোনালীকে কোন কিছু ভাববার সময় না দিয়েই, হঠাৎ, ই্যা, হঠাৎই, পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিলো অসীম চৌধুরী। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো সোনালী, অবশবিবশ হয়ে গিয়েছিলো তার সমগ্র চেতনা। কোন কথা বলতে পারেনি, বাধা দিতে পারেনি। ইতিমধ্যেই কনলেশ এসে গেছে, দেখেছে তাদেরকে ওই অবস্থায়। কিন্তু কোন কথা বলেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো দরজা খুলে, তেমনভাবেই চুকেছিলো ভেতরে, তারপর মুখ নিচু করে চলে গিয়েছিলো শোবার ঘরে। জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়েছিলো বিছানায়। জরে তার গা তখন পুড়ে যাচ্ছে।

তবু সোনালী সামনে যেতে পারেনি। কোন মুখে যাবে?

কনলেশ নিজে থেকেই ডেকেছিলো, সোনালী।

কোন জবাব না দিয়ে নতনেত্রে সে গিরে দাঁড়িয়েছিলো কনলেশের সামনে।

আমার মাথাটা একটু টিপে দেবে, বড় যন্ত্রণা করছে। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে বলেছিলো কনলেশ।

কমলেশের মাথা টিপে দিতে দিতে আর একবার সোনালীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়েছিলো। কেন কমলেশ কিছু বলছে না, ওর কি অহুভূতি বলে কিছু নেই, ঈর্ষাতে জ্বলা করেনা হৃদয়? না কি সোনালীকে মেয়েমানুষ বলে গণ্যই করে না।

অরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথা টিপতে টিপতে হাতের তালু আগুনগরম হয়ে উঠেছিল। কমলেশ চোখ বন্ধ করে নিথর হয়ে। একটু নড়াচড়া পর্যন্ত নেই। সোনালীর মনে হয়েছিলো : পাথর, একটা রোদে গরম পাথরের চাঙরে হাত বুলোচ্ছে সে। যে পাথরে হাত দিলে রোমাক্ক জাগেনা দেহে। নিরেট কঠিন অহুভূতি শুধু। তাপের জ্বলন্ত হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। বিতৃষ্ণা। কটুস্বাদ খাবার মুখে দিলে যেমন গা ঘুলিয়ে ওঠে, তেমন গা বমি বমি একটা অহুভূতি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছিলো শরীরের ভেতর।

একটার পর একটা ইঁট সাজিয়ে যেমন বাড়ি তেরী করা হয়, গরা ঘটনাগুলি মনের অভল থেকে খুঁজে বার করে তেমনভাবে সাজালো সোনালী। ঘুরে ফিরে দেখল উল্টে পান্টে।

কমলেশের প্রথমবারের মস্তিষ্কবিকৃতির কথা চিন্তা করে করুণা বোধ করলো। অমন আঘাত পেলে মস্তিষ্কবিকৃতি হলেও হতে পারে। সেই উন্মত্ততার মধ্যে ছিলো একটা করুণ দিক। কমলেশের জ্বলন্ত বেদনা বোধ করছে সকলেই। কিন্তু সে কমলেশের সাথে এখনকার কমলেশের মিল নেই কোন। এ অত্যন্ত হীনমনা, সন্দেহপরায়াণ, নীচ—এর কথা ভাবলে করুণ রসের জারকে আগ্রুত হয় না মন। ঘৃণা বোধ করে সোনালী।

তবু সোনালীর নিজেরও দোষ আছে। কমলেশের এই অবস্থার জ্বলন্ত মূলতঃ সে-ই দায়ী। সেবার ওরকম না ঘটলে হয়তো দ্বিতীয়বার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতো না কমলেশের। সুস্থ থাকতো চিরজীবন সোনালীর একটা ভুলে সন্দেহের বীজ অঙ্কুর মেলেছিলো কমলেশের মনে। ভুল। নিছক ভুল। অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু কমলেশ তা বিশ্বাস করতে চায়নি। ভেবেছে এ ভুল ইচ্ছাকৃত। সোনালীর মনের অভলে উয়ঙ্কর কোন মতলব আছে নিশ্চয়।

কমলেশের অর সেরে গিয়েছিলো কয়েকদিনেই। আর তারপর থেকেই লক্ষ্য করেছিলো সোনালী, রাত্তিরে ঘুমোয় না কমলেশ। সারারাত অস্থিরভাবে পায়চারী করে ঘরে।

অমন ছটফট করছে কেন? সোনালী জিজ্ঞাসা করেছে।

না, আমার ঘুম আসছে না, ভুমি ঘুমোও। কমলেশ জবাব দিয়েছে।

তখন বোঝেনি। এখন বোঝে সোনালী। সারারাত জেগে তাকে পাহারা দিতো কমলেশ।...নাসথানেকের মধ্যেই করমচা-লাল হয়ে এলো চোখ, ঢুকে গেলো গর্তে, চুলের রাশ এলোনেলো হয়ে ঝুলে পড়লো মুখের ওপর। আগেরবারের মতো চেহারা। পুরোপুরি উন্মাদ।...

সুস্থ স্বাভাবিক একটা মানুষ পাগল হয়ে যায় কি করে? মস্তিষ্কের কোন্ সুস্থ স্নায়ুতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়? একটা লোক বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, সংযতবাক, ধীর, স্থির কয়েকদিন বাদে সেই লোকটিই উদ্ভান, প্রগলভ, বন্ধু, উন্মাদ পণ্ড হয়ে যায় হঠাৎ—কেন? শরীরের শিরায় শিরায়, রক্তের কণিকায় কণিকায়, মস্তিষ্কের কোষে কোষে আঙ্গ যা ছিলো, কয়েকদিন বাদেও তাই তো থাকে, তবে? প্রকৃতির এ কি লীলা? আর যদি হয়ই, তবুও, অস্বাভাবিক রোগের মতো ওষুধ দিলেই সেরে যায়না কেন? কেন, কেন, কেন? বিজ্ঞানের গবেষণায় কতো কিছু আবিষ্কার হয়, হচ্ছে, বাষ্পীয় শকট থেকে পরমাণবিক বোমা, আর সানাতন একটা রোগের চিকিৎসা বা তার ওষুধ আবিষ্কার কি সম্ভব হয় না? এ রোগ কি এতোই মারাত্মক? এই উন্মাদ, সন্দেহপরায়ণ, হীনমনা, ইতর কমলেশ কালকেই বা তার পরের দিন সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যাবে আবার—যেমন আগে ছিলো—কোনদিন অসুস্থ হবেনা আর, একথা ভাবতেও ভালো লাগে, দেহ বোমাক্রিত হয়। আ, তা যদি হতো! কিন্তু হাজার ভাবলেও, কোনদিন তা হবে না, কমলেশ এমনই উন্মাদ থাকবে। বরঞ্চ ধীরে ধীরে রোগ বাড়বে আরো। আঙ্গ যা আছে কাল তার থেকেও ধারাপ হবে। এ সত্য, বিশ্বাস করতে বেদনা বোধ করলেও সত্য। নির্ভুর ক্ষমাহীন সত্য। এই বন্ধ পাগল, সন্দেহের আলায় জলে যাওয়া কমলেশকে নিয়েই দিন কাটাতে হবে। এমনভাবেই দিনে দিনে আটবছর পার হয়ে গেছে। কমলেশের পাগলামি সঙ্ঘ হয়ে গেছে—সঙ্ঘ করতে হয়েছে সোনালীকে। ভাগ্যকে দোষারোপ করে চিরকাল চলে না। মেনে নিতেই হয়। সেইরকম মেনে নিয়েছে সোনালীও। এককালে কমলেশ ভালো চাকরি করতো, তখন স্বচ্ছল অবস্থা ছিলো সোনালীর সংসারের। ছেলেমেয়েও ছিলো মাত্র দুটি। তারপর মস্তিষ্কবিকৃতির ফলে কমলেশের পক্ষে চাকরি করা আর সম্ভব হলো না। সংসারযাত্রার মান ধাপে ধাপে কমতে কমতে সর্বনিম্ন কোঠায় এসে পৌঁছেছে এখন। কিন্তু এসব কারণে সোনালীর ততো দুঃখ নেই। কষ্ট সহ করতে রাজী। করছেও। কমলেশ সুস্থ হোক—সুস্থ থাকুক চিরদিন—এর বেশি কিছু সে চায়না। সেটা বাস্তবে সফল হচ্ছে না, তার দুঃখ সেইজন্তেই। আর কমলেশের ওই সন্দেহ—ওধু মনে মনে সন্দেহ নয়—উচ্চস্বরে তার ঘোষণার ফলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাবা মা কারো ওপরেই প্রত্যাশা নেই। এইসব কারণে সোনালীও আঙ্গকাল ঘৃণা করে কমলেশকে।

হ্যাঁ, আমি ঘৃণা করি ওকে।

ফিস্ ফিস্ করে যেন নিজের আঙ্গার কাছেই স্বীকারোক্তি করলো সোনালী।

যদিও এই স্বীকৃতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক তবু অস্বীকার করা যায় না। অত্যন্ত নিঃশেষে আত্মার কাছে। সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের রূপাট্টা থেকে নিঃশেষে মুকিয়ে রেখেছে এতোদিন শুধুমাত্র এই কথা স্বীকার করতে হবে এই আশঙ্কায়, তার বিড়ম্বিত জীবনের দুর্ভাগ্য নিয়ে তারা রূপানিশ্চিত সুরে সমবেদনা জানাবে আর আড়ালে পুলকিত চিন্তে আলোচনা করবে নানা কথা, এই ভয়ে। নিম্ন নিম্নরূপ রাত্রে তারাভরা আকাশের দিকে চোখ রেখে জানালার গরাদ হুহাতে ভেমনই ধরে ঝরঝর করে কৈদে ফেললো সোনালী। আর পারছে না সহ্য করতে। মাঝে মাঝে সোনালীর মনে হয় যদিকে হুচোখ যায় পালিয়ে যাবে। কেন, কি দোষ করেছে সে, সারাজীবন কেন এমনভাবে চলবে থিকি থিকি !

যদিও ভাবে, তবু সোনালী জানে মনে মনে, এ সংসার ছেড়ে পালাবার উপায় নেই তার। কোথায় যাবে ? এই বিশাল সীমাহীন পৃথিবীতে তার জন্মে এতোটুকু জায়গা নেই আর কোথাও। যদি পথে পথে হঠাৎ হয়েও ঘুরে বেড়ায় কেউ আশ্রয় দেবে না তাকে। ঘুরে সামনে এনে ধরবে না এক প্রাস বাস্তুও। এবার তাই যত্নের আশ্রয় নেবে সে...(আঃ, বৃত্তা, কঠিন শীতল বৃত্তা, হাসবন্ধকর বৃত্তা, ভূমি এসে ছেয়ে দাও ব্যথা-ঝরঝর বেদনাবিষণ এই দেহকে তোমার নির্দয় আনিষ্টনের প্রলেপ দিয়ে। মোহ নেই আর জীবনে। কিসের মোহ, কার জন্মে আশায় বুক বাঁধবো আবার ? বন্ধ পাগল, ইতর মন্দেহের আলায় অলে যাওয়া একটি মানুষ, তাকে ঘিরে আর কতো স্নেহের জাল বুনবো ? তার চাইতে ভূমি এসো, বৃত্তা, নরম ঘূনের আবেশ নিয়ে আনার চোখে, তোমার অতল কালো গহ্বরে টেনে নিয়ে যাও আনাকে, তোমার বিশীর্ণ হাত দুটি বাড়িয়ে দাও, বৃত্তা। বৃত্তা, ভূমি এসো।).....

ভোরের নিচে থেকে চলচৌকিটা বার করলো নিঃশব্দে, টেবিলের ওপর সেটা রেখে উঠে দাঁড়ালো সোনালী। কড়িকাঠে হাত পৌঁছচ্ছে। এতোক্ষণ ধরে যে শাড়ীটা পৌঁচিয়ে পৌঁচিয়ে পাকিয়েছে তার একটা প্রান্ত বেঁধে নিলো গলায়, যে গলা এখন ঘামাচিতে লাল দগ্ধদগে হয়ে আছে।

গেট্-আউট্ ! আই সে গেট্-আউট্ ! একটা তীব্র চিৎকার ভেসে এলো কমলেশের ঘর থেকে, আই এ্যান সোনালীজ্ হাঙ্-ব্যাও—আই ওণ্ট্ এ্যানাও দিঙ্-থিংস্ ইন্-মাই হাউস্। গেট্-আউট্ অর আই উইন্-কিল ইউ ! গেট্-আ—উ—ট্ !

রাত্রির নিস্তব্ধতার বুক চিরে তীক্ষ্ণধার জুরির ফলার মতো কমলেশের চিৎকারের প্রত্যেকটি কথা এসে বিধলো সোনালীর হৃদপিণ্ডে। এরপরই অশ্লীল ভাষা আরম্ভ হবে সোনালী জানে। সারাদিন তালাবদ্ধ অবস্থায় ঘরের ভেতর বন্দী থাকে কমলেশ, চুপচাপ কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নামলেই শুরু হয় তার চোঁচামেচি। সোনালীর উদ্দেশ্যে অকথা, অশ্রাব্য গালাগালি। কিন্তু আশ্চর্য, সারাবছর এমন থাকে না কমলেশ। ছ'মাস পাগলাঘরির পর সুস্থ হয়ে যায়। চিহ্নমাত্র থাকে না মস্তিষ্কবিকৃতির। একেবারে রুচি-বান পুরুষ তখন। মাজিত কথায় বার্তায়। সেই সময় সোনালীও ভুলে যায় স্বপ্না বিবেক। আচারআচরণে নিবিড় হয়ে আসে হুজনে। ফলে দেড় বছর ছ'বছর বাদে বাদেই এখনও সন্তানের জন্ম দিচ্ছে সে। আরও আশ্চর্য, কমলেশের ওই সুস্থতাও

সাময়িক । বড়জোর পাঁচ ছ'মাস ভালো থাকে সে । আবার মস্তিক বিকৃত হয়ে যায় । শুরু হয় অশ্লীল চিৎকার । আবার সুস্থ হয় ছ'মাস পর । গত আটবছর ধরে এই একই জিনিষ চলছে । চক্রাকারে ।

শাড়ীর কাঁস গলায় জড়িয়ে বেঁধে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সোনালী । এইবার । পায়ের একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে জলচৌকি আর টেবিল । কয়েক মিনিট শুধু কয়েক মিনিটের জন্তে অবর্ণনীয় কিছু কষ্টে । শাড়ীর কাঁসে শাসনালীটা আঁকুপাকু করবে বাতাসের জন্তে । শূন্যে ছলতে ছলতে পা দুটো নিষ্কল অশ্বেষণে ছটফট করবে অবলম্বন খুঁজে । চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে কোটর ছেঁড়ে । ছিড্ মুখ থেকে ঝুলে পড়বে চার পাঁচ আঙুল । মরতে মরতেও শেষবারের মতো বাঁচতে চাইবে সোনালী । অথচ তখন আর উপায় থাকবে না ।

সেই ভালো । আর পারছি না আনি, এবার পরিত্রাণ চাই ।

শেষবারের মতো নিষ্পেক্ষে প্রস্তুত করে নিলো সোনালী । এইবার ।

কিন্তু পায়ের আঘাতে জলচৌকিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়েও ধমকে খেনে পড়লো সে । নেখেতে বিছানার ছেলেমেয়েরা ঘুনোচ্ছে নিঃসাদে । বিচিত্র ক্যানিভিক অঙ্গ-ভঙ্গিতে । সেদিকে তাকালো একবার । আর, একটা উচ্ছ্বসিত কান্না ঢেউ হয়ে বেরিয়ে এলো সোনালীর গলা দিয়ে । না না না । এদেরকে ফেলে জীবনের পেছন দরজা দিয়ে নির্লঙ্ঘ্য কাপুরুষের মতো পালিয়ে মৃত্যুর আশ্রয় নিতে পারবে না সে ।

গলার কাছে দলা হয়ে পাকিয়ে ওঠা অশুভুতিটা সোনালী বহুকষ্টে দমন করলো । ধীরে ধীরে গলা থেকে শাড়ীর বাঁধন ঝুলে ফেললো, ঝুলে ফেললো কড়িকাঠে শক্ত করে বাঁধা শাড়ীর আর একটা প্রান্ত । তারপর টলতে টলতে এসে বিছানায় শুয়ে কোলের মেয়েটাকে হুহাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে ।

চলচ্চিত্রে ব্যক্তিস্বরূপের সমস্যা।

আশীষ বর্মণ

নাটক গল্প উপন্যাসে যেমন, কাহিনীমূলক চলচ্চিত্রেও তেমনি, শেষ পর্যন্ত চিত্রায়িত করা হয় মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্যা। কাহিনীর পাত্র-পাত্রী পরস্পরের সঙ্গে কি সম্বন্ধে জড়িত, এই সম্বন্ধের কি সহায় এবং কি অন্তরায়, সেকথাই জীবন্ত করা উপরোক্ত শিল্প মাধ্যমগুলির আদং কাজ। এই কর্তব্যকে স্মৃষ্টিভাবে পালন করতে গিয়েই পড়ে সমাজ ও পরিবেশের ছাপ। কেননা, শুধু একটি নায়ক বা নায়িকা, অথবা নায়ক-নায়িকা দুজনকে নিয়ে পরিবেশ ও অন্যান্য সম্বন্ধ বাদ দিয়ে কিছুই দাঁড়ায় না। নায়ক-নায়িকার ব্যথা বা আনন্দ, সংঘাত বা সংহতি সব সময়ই কোনো স্থান ও কালের মধ্যে ঘটে, ঘটে পরস্পরের এবং সমাজের সম্বন্ধের নিত্য পরিবর্তিত জটিল ক্রমবিকাশের পথে। এককথায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্পর্ক, আদান প্রদান, তার পিছনে সদাই উপস্থিত পরিবেশ ও সমাজ—মা-বাবা-দাদা-কাকা বন্ধু-বান্ধব, খাওয়া পরা, চাকরী-বেকারত্ব, বাড়ি, মাঠ, আকাশ। তাই ব্যক্তিস্বরূপের সমস্যা শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত সম্পর্কের অর্থ ও কিস্তি নিত্য পরিবর্তিত পটভূমির মাঝেই ভাস্বর হয়।

গল্পাংশ হতে পারে কেবলমাত্র ছুটি তরুণতরুণীর প্রেম নিয়ে। কিন্তু যেহেতু তরুণতরুণী শূন্যে ভাসে না, হাওয়ায় হাওয়ায় প্রেম হয়না, সুতরাং পাত্রপাত্রীকে তাদের অগ্ন্যাগ্ন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধব অথবা ছয়ের সঙ্গেই সংযুক্ত করতে হয়। দেখাতে হয় তাদের পারিপার্শ্বিকের লোকেরা কারা, কি রকম, ধনী না দরিদ্র, বেঁটে বা লম্বা, মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন, সহানুভূতিশীল বা শত্রুপক্ষ ইত্যাদি। এবং এ-সমস্যার সম্মুখীন হলেই দেখা যাবে জনে জনে ভিন্ন, সবাই ছাঁচে ঢালা অভিন্ন মন ও মাপের মালিক নয়। প্রত্যেকের চরিত্রে কম বেশি পার্থক্য বর্তমান, ফলে একই ঘটনা, ধরা যাক এক্ষেত্রে দুজনের প্রেম, বিভিন্নজনকে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করেছে, বিচলিত, ক্রুদ্ধ অথবা অগ্ন্যপক্ষে আনন্দিত হচ্ছে কেউ। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ সংস্কারাচ্ছন্ন কেউ নয়, কুচুটেও যেমন আছে তেমনি রয়েছে সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই যে তফাৎ, বিরোধ এবং একান্তবোধ, অবস্থার বৈপরীত্য—এ সবই কাহিনীর প্রেমিক যুগলের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের নানান রকমফেরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অথবা বলি স্পষ্ট হওয়া উচিত। তাহলেই পাত্রপাত্রীর সমস্তাবলী, পরস্পরের সম্পর্কের গভীরতা, বিপত্তির মাঝে তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং অনুকূল আবহাওয়ার মাধুর্য—স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে—সত্য হয়ে উঠতে পারে। এই সমাজ ও ব্যক্তির বৃহত্তর সম্পর্কের মধ্যেই তাদের ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তা-আবেগও পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তব রূপ নেয়।

কথা হল এই বিভিন্ন চরিত্রকে তাদের বৈচিত্র্যের রঙে কি-ভাবে রূপায়িত করা শ্রেয়। সফল উপন্যাসাদিতে দেখা যায় সাহিত্যিক পরিবেশ রচনা করছেন, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীকে নানান ঘটনা পরস্পরা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধে যুক্ত করছেন এবং সর্বোপরি এইসব সম্বন্ধ ও ঘটনার ভিতর এক একটি চরিত্র এক

এক প্রতিক্রিয়ায় নূর্ত হচ্ছে। প্রথম চরিত্রের যা ভালো লাগছে দ্বিতীয় চরিত্রের তা লাগছে না, তৃতীয় ব্যক্তি সংলোক, চতুর্থজন স্বার্থপর, ইত্যাদি। ব্যক্তিস্বরূপের এই পার্থক্য ঘটনার আপাত স্রোতে স্পষ্ট হয় না, তাই সাহিত্যিক যান বিভিন্ন চরিত্রের মনের গভীরে। বিভিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মনোবিকলনে তিনি মগ্ন হন; কাহিনীর আপাত ঘটনার স্রোতের সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রেরও অঙ্গাঙ্গীভাবে ক্রমপরিণতি হতে থাকে। আসলে ঘটনার স্রোত তখনই তাৎপর্য পায় যখন তার অন্তর্ভূত চরিত্রগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ হৃদ-সমন্বয়ে বিকশিত হতে থাকে। চরিত্রগুলির এই ক্রমপরিণতি পরিস্ফুট হয়, সাহিত্যে, মূলত মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে। বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং গুণাগুণ, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে ও ঘটনাস্রোতের মধ্যে চরিত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের মাধ্যম যেহেতু ভাষা নয় ছবি, সুতরাং সেখানে সমস্যা অন্য রূপ নেয়। পাত্রের পর পাত্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার উপায় চলচ্চিত্রে নেই। চলচ্চিত্রে জানি কি ভাবলুম তুমি কি ভাবলে লিখে স্পষ্ট করার হাতিয়ার অনুপস্থিত। অথচ ব্যক্তিস্বরূপের বৈচিত্র্য না ফুটলে, তার হৃদ এবং ক্রম-পরিণতি না প্রত্যক্ষ হলে কাহিনীমূলক শিল্পমাধ্যম আবেগবহ হতে পারে না। তাই চাই না চাই, পরিচালক-চিত্রনাট্যকারমাত্রেরই সামনে চরিত্রের ক্রমবিকাশ, সূক্ষ্ম ও মোটা ভাব প্রকাশ, মানসিক চিন্তা ও আবেগের পরিবর্তন প্রভৃতি দর্শকের কাছে সত্য করে তোলার সমস্যা দেখা দেয়।

এদেশী চলচ্চিত্রে মোটামুটি এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয় সহজ ও স্থূল উপায়াবলী মারফৎ। প্রথমত ঘটনা সাজানোর দেখা যায় করুণাহীন, অবাস্তব ধারা; দ্বিতীয়ত সেই ঘটনার উৎসে উপস্থিত চরিত্রগুলিকে যন্ত্রবৎ ভাবভঙ্গী ও ব্যবহারের পাকে ফেলা হয়। উদাহরণত অগ্নিপরীক্ষা বা সাগরিকা ছবিতে নায়কনায়িকার পরিচয়ের সূত্রপাতের কথা ধরা যায়। দুটি ছবিতেই অপরিচিত দুটি শিক্ষিত ভদ্র যুবক যুবতী আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহে উভয়ের মুখোমুখি হয়, এবং দুই ছবিতেই তারা বিস্ময় বিমোহিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। একবার এর মুখ একবার ওর মুখ দর্শককে শট্ কাট করে দেখানো হয়। মনে হতে থাকে উভয়কে বজ্রাহত, নিখর ভঙ্গীতে দেখতে দেখতে একটা যুগ গত হল বুঝি।

অথচ এমনটা হবার কথা নয়। কেননা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সুযোগ যেমন নেই চলচ্চিত্রে—কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতীক বা রূপক শট্ ব্যবহার করা ছাড়া—তেমনি একথাও শিরোধার্য যে গল্প-উপন্যাসে যে সুযোগ অবর্তমান চলচ্চিত্রে সেই সুবিধাই বর্তমান। সুবিধাগুলির মধ্যে বস্তুজগতের দৃশ্যই প্রধান; অর্থাৎ, চলচ্চিত্রে মনে হয় বাস্তব জগতের উপস্থিতি চোখের সামনেই। ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই দেখা শোনার ভিতরে। পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে যেমন ভাষা ব্যবহার নিঃপ্রয়োজন তেমনি ঘটনা ও পাত্র-পাত্রীর ভাবাবেশ কেবল ভাষায় ব্যাখ্যাও। পরিবেশ তো দৃষ্টিপথেই বর্তমান, পাত্র-পাত্রীও বটে। এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর আবেগের টানাপোড়েন, গতি এবং পরিবর্তন অর্থময় করতে হয় তাদের চালচলনে,

বাক্যে ; হাসায়, স্বপ্ন চোখ তোলা বা নামানোয়, মুখের কাঠিন্য বা কোমলতায় —এককথায় অভিনয়ে । চলচ্চিত্রের অভিনয় কিন্তু থিয়েটারের অভিনয়ের মত নয় মূলত সংলাপ নির্ভর এবং আতিশয্যযুক্ত নয় । নয় কেননা চলচ্চিত্রে দর্শক কেবলমাত্র নিজের চোখ দিয়ে অভিনয় দেখে না, দেখে ক্যামেরার চোখে প্রতিফলিত ছবিটুকু । তাই মূলত ক্যামেরা অর্থাৎ অনক্ষ্য পরিচালক ঠিক করেন কখন কোন ভিনিস বা আবেগ প্রকাশের কোন ভঙ্গীর প্রতি দর্শকের সমস্ত নজর নিবদ্ধ করাবেন । দাম্পত্যকলহের মধ্যে অভিনায়ী স্ত্রীর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কেঁদে ফেলা পরিচালক চলচ্চিত্রে আনতে পারেন নানান ভাবে । এমন কি তার চোখমুখ না দেখিয়ে কান্নার আওয়াজ না শুনিয়েও । দেখানো হল তর্কাতর্কি করতে করতে উত্তেজিত নেয়েটি হঠাৎ স্বামীর কোনো বিশেষ কথায় শুরু হয়ে গেল ; মুখ পাথরের মত, অপলক থাকল চোখ এক নিমেষ ; তারপর, মুখে যখন তার প্রায় অদৃশ্য একটা আবেগ জাগছে এমন সময় আচমকা সে মুখ ডুবিয়ে নিল হাতের ভিতর, চেয়ারের পিছনে, শরীরটা শুধু কেঁপে কেঁপে উঠল কয়েকবার ।

সমস্ত দৃশ্যটি বিভিন্ন ধরনের শটের ব্যবহারে, কম্পোজিশনের দক্ষতায়, অভিনয়ের সূক্ষ্ম লীলায় এমনই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে যে ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়োজনই অনুভূত হবে না । কিন্তু চলচ্চিত্রে ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণের রাস্তাও নেই প্রয়োজনও নেই যেমন সত্য তেমনি উল্টো কথটাও মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য । অর্থাৎ ফিল্মের বিশ্লেষণ মূলত ভাষা না হলেও, বিশ্লেষণ বর্তমান, সে বিশ্লেষণ চিত্রময় বর্ণনার । যে-কাজ গল্প-উপন্যাসে কেবলমাত্র ভাষাই করে—আবেগকে পরিস্ফুট করা এবং জ্ঞানো—সে কাজ চলচ্চিত্রে করতে হয় নানান উপাদানের নিশ্চয় যোগফলে, চিত্রের ভিতর দিয়ে । উপযুক্ত সংলাপ, পরিবেশ, কম্পোজিশন, অভিনয় প্রভৃতি মিলেমিশে একত্রে হয়ে একটি অর্থও রূপ নেয়, পাত্র-পাত্রীর আবেগকে সত্য করে তোলে । কিন্তু এই সংলাপ, পরিবেশ, কম্পোজিশন অভিনয় প্রভৃতি একটি অর্থও সস্তা পেন কি না সেটাও বোঝা যায় একমাত্র চিত্র দারফৎই, পর্দায় যে-ছবি ভাসে তা মন্য করার পরই । তাই সিনেমা হল চিত্রধর্মী শিল্প, চিত্রময়তাই এর মৌল সত্তা—অস্ত্রাত্মক আনুশঙ্গিক কলাকৌশলের প্রয়োজন ততটুকুই যতটুকু সেগুলি এই চিত্রের গুণকে অর্থময় করে তোলে । সিনেমায় ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমবিকাশ স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে তাই যেমন দরকার আপাত ঘটনার সংহত বাস্তব গতি, তেমনি আবার এই গতির কেন্দ্রবিন্দুর চরিত্রগুলির পরস্পরের সম্পর্কের সংঘাতসমন্বয়ের, অর্থাৎ ক্রমশ পরিণত চরিত্রের অর্থময়, সূক্ষ্ম, পারস্পর্যে সংলগ্ন চিত্রময় বিশ্লেষণও । এই বিশ্লেষণ বা বর্ণনাই চলচ্চিত্রের মনোবিকলন, পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত করার দর্পণ । লং শট, মিড শট, ক্লোস শট প্রভৃতি হল এই আয়নার এক একটি মাপ ; খুব বড় প্রতিচ্ছবি পর্দায় আনত হ'বে, নেওয়া হল ক্লোস শট বা বিগ ক্লোস আপ ; অনেক দূরে চলে যাওয়া ছোট মানুষ বা দৃশ্য দেখাতে হবে, নেওয়া হল লং বা এন্ট্রান্স লং শট—মোক্ষা কথা পরিচালক বধন যে-দিক থেকে ইচ্ছে করবেন তখনই স্বহৃৎ থেকে সূক্ষ্মতম পদার্থ বা অভিব্যক্তি দর্শকের চোখের সামনে মেলে ধরতে পারেন । এমনিতে

চোখ এড়িয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম কোনো অভিব্যক্তিও ক্রোগ শটের মাধ্যমে অন্যান্য শট থেকে পৃথকভাবে পর্দায় প্রতিফলিত হওয়ায় অন্ধ বাদে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে চলচ্চিত্রে ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণ এবং ক্রমবিকাশ জীবনে আমরা যে ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, বুনি—কখনো চকিতে কখনো ধীর ছন্দে—ভেননিভাবে সত্য হয়। অন্তত, বলি, হয়ে ওঠা উচিত।

হয় না অবশ্য দুর্ভাগ্যবশতঃ। দেশীছবিতে চলচ্চিত্রের গল্প এবং পাত্র-পাত্রীর বিকাশ মূলতঃ মূর্ত করার পদ্ধতি হল সংলাপ। সংলাপের ভাবার্থের সঙ্গে চরিত্রগুলি প্রাণান্ত চেষ্টা পায় মোখিক অভিব্যক্তির সান্নিধ্য রাখতে। কিন্তু প্রধানত সংলাপ মারফৎ চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর ধারা বইয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে পাত্রপাত্রীর বাক্যালাপ প্রায় প্রলাপে দাঁড়ায়। প্রায়শই চরিত্রগুলি ছোটো খোটো বক্তৃতা দিতে থাকে। এবং এই ছোটো বড় বক্তৃতাগুলি যেহেতু সত্য-কারের ব্যক্তিবিশেষের নয়, অভিনয়রত শিল্পীদের, সুতরাং মুখস্তটুকু ঠিক বলা হচ্ছে কি না সে দিকেই শিল্পীর আদং খেয়াল রাখতে হয়, বক্তৃতার ভাবার্থের সঙ্গে আন্তরিক আবেগের বিচ্ছেদ ঘটে। তাই পর্দায়-বক্তৃতা-দিতে-থাকা চরিত্রগুলিকে অনেক সময়ই মনে হয় রবারের দম দেওয়া পুতুল। বলাই বাহুল্য ক্রটিটা মূলত অভিনয়শিল্পীদের নয়; চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের, ফিল্ম তোলার ভুল আঙ্গিক বা টেকনিকের।

ফিল্ম হল কাহিনীমূলক শিল্প মাধ্যমগুলির মধ্যে জীবনের সব থেকে কাছাকাছি যেটি সেই মাধ্যম। অর্থাৎ সমস্ত বাস্তব জগৎই, মায় মানুষ পর্যন্ত, চলচ্চিত্রে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাহিত্যে এই প্রত্যক্ষতা সৃষ্টি করতে হয় ভাষার যাত্নে, আনতে হয় এই বাস্তবতার বোধ বাক্যের তিল তিল চয়নে। ফিল্মে বাস্তবকেই টুঁড়িওর সেটে বা পথে বা সমুদ্রে বা অন্যত্র বিষয় অসুযায়ী সাজিয়ে মেলে দিতে হয় দৃষ্টির সমুখে। সত্যকে আমরা দেখানাত্রই চিনি, হৃদয়ঙ্গম করি। আর আমাদের দৈনন্দিন সত্যে, অর্থাৎ মানুষের জীবনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তার ভাব, অবেগ, বোধ কেবলমাত্র বাক্যের ফুলঝুরিতেই প্রকাশ পায় না; পায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা কখনো ছরস্তু ব্যবহারে, মোখিক ব্যঙ্গনায়, চলায়, বসায়—এককথায় তার পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব। জীবনে প্রেমিকপ্রেমিকা শুধু “তুমি কি সুন্দর,” “আমি তোমায় ভালোবাসি,” “যাও তুমি বড় ছুঁছুঁ” ইত্যাদি সর্মবিদারক কথায় ও খপ করে হাত ধরে প্রেমের প্রমাণ রাখে না। বহুক্ষেত্রেই সরাসরি প্রেমের কোনো আলাপই তারা করে না, বরঞ্চ এড়ায়; হাঁ করে পরস্পরের চোখের মধ্যে তাকিয়ে থাকে না, উল্টে হয় তো এটা ওটা নাড়ে, কলেঙ্গ বা বইয়ের বা বন্ধুদের বা অন্যকারুর প্রসঙ্গে টুকটুকি গল্প করে। বড় বড় গালভরা কথাই শুধু, কিংবা, অন্তপক্ষে একান্ত ব্যক্তিগত ঝাকা ঝাকা আলাপই হুহুনে করে না, হয় তো সাধারণ খুচরো কথা কয়। তবু তাদের অন্তরঙ্গতা চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে গন্ধের মত, নিজের কাছে তা যেমন স্পষ্ট বাজে অস্ত্রও তা দেখলেই বুঝতে পারে। এটা তাদের বসার নির্ভরভঙ্গীতে, হয় তো হাসির উজ্জ্বলতায়, সাধারণ কথার মধ্যে চকিতে চাওয়ায়, দৃষ্টি ঠাট্টায়, হঠাৎ দীপ্ত মুখের সুষমায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ফিল্মে এই জীবন্ত প্রত্যক্ষতাই কাম্য। দেশীছবিতে অবশ্য প্রেমের দৃশ্য মানেই ফুললতাপাতা,

বাগান, চাঁদ, নায়িকার গান, কপোতকপোতী বা ছুটি পাখীর প্রতীকা ব্যবহার, অসহ্য সংলাপ, চোখের ভঙ্গী, হাত-পা নেড়ে গানে গানে পরস্পরের কাছে আসা ও সরে যাওয়া ইত্যাদি। অথচ এ ধরনের দৃশ্য কখনোই সত্য এবং ফলে স্নিগ্ধ আবেগে প্রবল নয়; সব সময়ই লাগে অবাস্তব, পীড়াদায়ক, স্থূলভাবে সাজানো।

আদং কথা, হল গল্প-উপন্যাসে আনরা চরিত্রের আবেগের যে পরিবর্তন ও গভীরতা বুঝি সার্থক অন্তর্দৃষ্টির বিশ্লেষণে, ছবিতে সেই বিশ্লেষণই প্রয়োজনে অন্য উপায়ে, চিত্রের মাধ্যমে। জীবনে যেমন মানুষ অন্যের মন বোঝে তার সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বটুকুর প্রভাবে; তার কথায়, মুখের ভাবে, চোখের চাওয়ায়, গলার স্বরে, চলা-বসায়, শরীরের অন্যান্য সূক্ষ্ম আভাসে—তেমনি চলচ্চিত্রেও দাঁড় করাতে হয় একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবহারে, ভাবে, কথায়, স্বরের পার্থক্যে—চকিতে-খেল-যাওয়া মুখের এমন অভিব্যক্তিতে, যা নিম্নেবে অনেক কিছু অর্থময় করে তোলে। এটা সম্ভব যখনই যখন চলচ্চিত্রে ভাবপ্রকাশ বা গল্পের গতি নির্ধারিত কেবল সংলাপই করে না; অভিব্যক্তি বলতে যখন কেবল চোখ ঘোরানো বা মুখের ক্রোম আপই বোঝাবে না; যখন পাত্র-পাত্রী আবেগ ও ঘটনার ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজে কর্মেও লিপ্ত হবে, কথায় কিছু বলবে কিছু বলবে না, যখন তাকাতে শিখবে পরস্পরের দিকে আবার চোখ ফেরাতেও, যখন গভীরতম হৃদয়াবেগও ক্যামেরার দিকে পিঠ করে (দর্শকদের দিকে) শট ও কম্পোজিশনের সাহায্যে মূর্ত করা সম্ভব হবে। অল্পকথায় যখন যোগ্য পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের হাতধরে শিল্পী শুধু মুখের চোখের মাধ্যমেই অভিনয় করবেন না, ভাব প্রকাশ করবেন সমস্ত অন্তঃকরণের সাহায্যে। সংলাপই যে সময় কেবলমাত্র বাধ্য নয়; হাতের ভঙ্গী, আঙুলের কম্পন, চোখের ছায়া এবং আলো, চলা-বসা-দাঁড়ানোর আকৃতি, কর্মের ছন্দ, মুখের সূক্ষ্ম মোটা অভিব্যক্তিও সংলাপের সঙ্গে মিলিত সুরে বাজবে। মানুষের অভিব্যক্তির এই সব ঝুঁকু ঝুঁকু মুদ্রা তাল লয় মুদ্রা বা গল্পের ভাষায় বলা যায় ভঙ্গী পারস্পর্যে সংলগ্ন হয়ে একটি সংহত রূপ নেয়—যে রূপের মধ্যে তার ভাবাবেগ ও মনস্তত্ত্বের বৈচিত্র্য ভাস্বর—এবং এই পূর্ণ প্রতিকৃতিটাই ব্যক্তিত্বরূপ। ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যোগফল।

দেশী ছবিতে মুদ্রাদোষগুলিকে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ভাবা হয় এবং বারংবার একই মুদ্রাদোষ বিভিন্ন চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রের গায়ে লেবেলের মত এঁটে দেওয়ার কাজ চোখে পড়ে। বরসাত ছবিতে নাগিস কয়েকবার আফ্রাদের দৃশ্যে নাক টেনেছিলেন সদি হওয়ার মত। তারপর থেকে বোধ হয় কয়েক'শ হিন্দী ছবির নায়িকাদের একই ভঙ্গী করতে দেখা গেছিল। বাংলা ছবির জনৈক অভিনেতা একটি ছবিতে ভিলেনের অভিনয়ের সময় বাকী হাসি হেসে, একটু চিবিয়ে কথা বলে নাম করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর প্রায় বেশিরভাগ ছবিতেই বাক্য ও হাসির ভঙ্গী ওই এক ধারায় বইল। অথচ ছবিই শুধু আলাদা নয়, চরিত্রগুলিও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ফলে অভিনয়ে তাঁর এক ঘেয়েমী প্রকট হল। কিন্তু দোষটা অভিনয়শিল্পীর যতটুকু তার অনেকগুণ বেশি পরিচালকদের, কেননা পরিচালকদের করণায় বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিত্বের রূপ স্পষ্ট থাকলে নিশ্চয়ই অভিনয়শিল্পীকে যথাযথভাবে নির্দেশ ও চরিত্ররূপায়ণে সাহায্য করতে

পারতেন। আসলে সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, কোনো বিশেষ চরিত্রের কোনো বিশেষ মুদ্রাদোষ অন্যচরিত্রেও যত্নবৎ আরোপ করলেই চরিত্রচিত্রণ হয় না। চলচ্চিত্রে চরিত্রচিত্রণ করতে হলে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালককে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ চরিত্রের ভাবপ্রকাশের সম্ভাব্য ব্যবহার ও মুদ্রা, শুধু মৌখিক অভিব্যক্তি নয়, সারা অঙ্গের বা অস্তিত্বের চারিত্র্যের সঙ্গে পারস্পর্যে সংলগ্ন ব্যঞ্জন। পারস্পর্যে সংলগ্ন ব্যঞ্জন না-হলে, অথবা বলি, চরিত্রের সমগ্র স্বভাবের সঙ্গে মানানসই সম্ভাব্য ব্যঞ্জন না-হলে হঠাৎ কিছু একটা বাইরে থেকে তার ব্যক্তিত্বে আরোপ করলে, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তারিকি, গম্ভীর ব্যক্তি হঠাৎ অকারণে মুখ ভেংচাচ্ছে দেখালে যা হয়। আবার অন্যপক্ষে, চরিত্রের ব্যক্তিত্বে এই পারস্পর্যের সংলগ্নতা আনা অসম্ভব যদি না চিত্রনাট্যে যুক্তির সংহতি থাকে, যা ইচ্ছে তাই না-ঘটিয়ে যদি-না নাট্যের ধারাতেও সম্ভাব্য ঘটনার ক্রম-উদঘাটন থাকে ; থাকে পারস্পর্য, গতির অর্থ, বাস্তবতা।

খাল-বিল-পারের কাহিনী

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

নটবর পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। এমন সময় দেখে লোকজন নিয়ে পরমা-সুন্দরী এক মেয়েছেলে পুজো দিতে আসছে। নটবর খনকে দাঁড়াল। কোথায় যেন দেখেছে একে !

মনে পড়েছে। সেবার শেষ রাতে সেই বছরার পরে দেখেছিল বউটিকে।

নটবর কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে লোকজনদের একজনকে কাছে পেয়ে প্রশ্ন করল : ও ভাই, কনখে আসতিছ ?

লোকটি গোঁপে চাড়া দিয়ে বলল : বুনোবয়রার রাজবাড়ী !

বিশ্বয়ের মাত্রা বেড়ে গেল নটবরের। তবে উনি কে ? না, আর ত ভুল নাই চোখে ! এ-ই সেই-ই।

আসে পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন চুপি চুপি নটবরের কানে বলল : কি দেখে ওস্তাদ ?

নটবর বলল : চিনি চিনি মনে হতিছে ! তুমিও বুনোবয়রার ?

—হ।

উনি ?

—রাজার রানী। আমাগে জমিদারের ইস্ত্রি।

—বটে ! তা এমন রূপ হবে না কেন ! আমি চিনিলাম ঠিকই।

—তুমি ?

—নটবর রিশী। সাকিন পুবার বিল।

—কেনন করে চিনলে ?

—বছরার উপরে দিখিলাম। আর এক বাবু ছেলেন—আমার নৌকায় ঠেলে উঠিলেন।

—হ ধরিছ ঠিক। ওর সোয়ামী—আমাগো জমিদার। বন্ধ পাগল !

—পাগল নাকি ? তবে ত বুঝতি পারতিছি সব !

নটবর সেদিনকার রাতের ঘটনাটি আগাগোড়া মনে আনবার চেষ্টা করল।

আহা এমন রূপ, এত গুণ ! মান সম্মান, টাকা পয়সার অভাব নাই অথচ দেখ শাস্তি নাই মনে ! নটবরের বড় ইচ্ছা হলো রানীর সঙ্গে একবার কথা বলে। এত বড় লোক তাদেরও ত সে একদিন উপকার করেছিল। উপকার বলে সে অবশ্য মনে করেনি। করেছিল রানী নিজে। নটবরের মনে গর্বও এল। এতগুলি লোক ভাববে সেও একটা কেটে বিট্টু হবে। রানী কি আর যার তার সঙ্গে কথা বলে।

নটবর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। রানীর পুজো শেষ হোক। আলাপের চেষ্টা সে একবার করে দেখবে।

পুজার শেষে রানী বেরিয়ে আসছিল। পথের দুধারে লোকের ভিড় জমে গেছে। পেয়াদারা আছে সব লাঠি হাতে।

নটবর একরকম গায়ের জোরেই ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

রানী আসতেই নাখা প্রায় নাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল : চিনতি কি পারেন না ?

মহিলাটি তাকে চিনতে না পেরে পেয়াদাদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

পেয়াদারা হৈ চৈ করে উঠল।

নটবর কিন্তু ভ্রক্ষেপ করল না। হাত দুটি ছোড় করে বলল : সেই সেবার গণেশপুর বাজারের কাছে আপনাগো বজরা ছেল। শেষ রাত্তিরে আমি আসতেছিলাম ভিজিতে—

—ও হো, ই্যা, ই্যা,—

নটবরকে আর বলতে হোল না।

—তোমার নামটি যেন কি ?

অধীনের নাম নটবর রিশী, সাকিন পুকের বিল।

—তা ভাল আছ নটবর ? এসো প্রসাদ নেবে।

নটবর ততক্ষণে বিগলিত হয়ে চারিদিকে নজর দিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করছে।

ধারে কাছে পুকের নেই কেউ। কে দেখবে এসব। রানী তাকে কেমন খাতির করছে দেখুক সব। পাইকরা পর্যন্ত ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

নটবর সেই যে হাতছোড় করে রানীর পেছু পেছু চলল, হাত আর নামল না।

রানীর বজরায় বসে নটবর দিবা প্রসাদ খেয়ে এল। চিড়ে, দই, প্রসাদী ফল-কলা-নিটি, কিছুই বাদ গেল না। এবার কিন্তু সে-বাবুটিকে দেখতে পেল না নটবর। একজন গোমস্তা চুপি চুপি বলল : আছেন ভিতরে—ভারী ব্যামো।

ব্যামো যে কি সেত জেনে ফেলেছে নটবর। আহা, রানীর মত মানুষের এত কষ্ট !

ঘুরতে ঘুরতে নটবর মেলার একেবারে শেষপ্রান্তে এসে পড়েছে। আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছিল নটবর।

পেছন থেকে কে যেন ডাকল : নটবর দা না ? ও নটবর দা—

নটবর চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। কে ডাকল না তার নাম ধরে ? কিন্তু এখানে আবার এমন সুরে ডাকবে কে তাকে। নটবর চলতে শুরু করল।

—হ। তোমারেই ডাকতিছি। শোন—শোন—ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে নজর করল নটবর। একনজরেই এসব মেয়েদের সে চিনতে পারে—এ ছাপরাও তার অজানা নয়। এমন কত মেলায় রাত কাটিয়ে সে কুতি করে এসেছে। কিন্তু এমন করে নাম ধরে ডাকে কে।

নটবর এগিয়ে এল মেয়েটির কাছে।

আরে, এয়ে সেই স্টেশনের বাজারের পুপ—হারাণের বউ।

—কি খবর ঠারোন, এখানেও আইছে ?

—না আসে আর করি কি । তারপর খবর ভাল তোমাগো ?

—ভাল । তুমি ভাল ত ?

পুষ্প বলল : সব বলতিছি—আসো না ঘরের ভিতর ।

—আজকেই বাড়ি যাব সময় নাই ।

পুষ্প হেসে তার হাত ধরে ফেলল ! বলল : যায়েনে বাড়ি । আসো, বসো এটুখানি ।

বায়ুনের মেয়ে এসে হাত ধরেছে নটবর আর না করতে পারল না । পুষ্পকে সে ঠিক বাজারের মেয়েমানুষ বলে মনে করতে পারল না । হারাণ ঠাকুরদের সবাই সে জানে ।

নটবর এসে ঘরে বসল ।

চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল নটবর । পুষ্পর অবস্থা বেশ ফিরেছে । বাহারে ক'খানি শাড়ী ঝুলছে দড়িতে । একটা সুন্দর নতুন তোরঙ্গ । গয়না গিল্টি করা হলেও সংখ্যায় কম নয় ।

পুষ্প বসে বসে অনেক গল্প করল । সেই ত মাত্র একদিনের পরিচয় । অথচ নটবরকে মনে হয় কত অন্তরঙ্গ । স্টেশনের বাজারের সেদিনকার মত আজ আর কোন ছলা কলা নাই । আজকে যেন ছুঁচোহাটির বউঝি গল্প করেছে দেশের লোকের কাছে । কত অবিচার হয়েছে, কত অমানুষিক অত্যাচার করেছে তার উপর—সেই সব কথা বলতে লাগল পুষ্প । নটবর ত সব জানে না । শুনতে শুনতে তার মাথায় রক্ত চড়ে ওঠে ।

নটবরের ভাব দেখে পুষ্প হাসে ।

আজ আর তার ভয়-ভাবনা নাই । বেশ আছে, নির্ঝঙ্কাট ।

পুষ্প এক কাপ চা এনে দিল । সঙ্গে এক বাটি মুড়কি ।

—না—না, চা আমি খাইনা ।

পুষ্প বলল : এখানে আসে চা কেউ খায় না । শরীর খারাপ হোলি আমি খাই এটু । নেও, খাও ! শরীরে যুত পাবা ।

নটবর চা খায় না । ওর কথায় খেল ।

কিছুক্ষণ বাদে পুষ্প এসে সুগন্ধি একটা তেলের শিশি এনে নটবরের সামনে রাখল ।

—যাও নদীতে নাইয়ে আসোগে ।

বিস্মিত নটবর অবাক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল । পুষ্প হেসে বলল : তোমাংরে আজ আমি রাঁধে খাওয়াব । যাও, নাতি যাও ।

নটবর কোন কথা বলতে পারল না । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কি ভেবে তেল মাখতে বসল ।

স্নান সেরে পথে আসতে আসতে কত কি ভাবতে লাগল নটবর । এ সংসারে মানুষ চেনা দায় । কতরকমের মানুষই না দেখল । কুমুদ, শংকরী, পুতুনী, বুনো-

বয়রার রানী, স্টেশনের বাজারের খেতি, পটেশ্বরী, মাখন, পুস্পরানী, সহদেব, হারিক, পরাশর, হারাণ, তারিণী কত নাম আর করবে। সবাই মানুষ অথচ দেখ কেউ কারো সঙ্গে মেলে না।

ঘরের একপাশে তোলা উলুন। নূতন মাটির হাড়ি, মালশা এনেছে, কড়াই বোধহয় সঙ্গে ছিল। পুস্প রান্না করতে বসেছে।

নটবরকে আসতে দেখে বলল : আসো, আসো। বসো এখানে। গল্প করতি করতি রান্না শেষ করি।

পুস্প বলল : প্রসাদ জুঠলি দিনেও বড় রাঁধি না। রাত্তিরে দোকানের খাবার আনি। আমাগো খাওয়ার কথা আর কও কেন। মেলায় এখন কে কত পরসা কামাই করে তার পাল্লা চলতিছে।

পুস্প হেসে হেসে কথা বলে বটে আসলে তার গলার সুর ভিজে। চোখে সহজে এখন জল আসে না।

কলার পাতে পুস্প ভাত বেড়ে নটবরকে দিল। গরম গরম ভাত, ডাল সিদ্ধ, লক্ষা বেগুনভাজা আর পুঁটিমাছের ঝাল, টক।

বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেল নটবর।

খেয়ে এঁটো পরিষ্কার করছিল সে।

পুস্প বলল : থাক না ওসব।

নটবর জিব কেটে বলল : ছিঃ ছিঃ, এমন কথা কয়োনা, চোদ্দ পুরুষ নরকে যাবে।

পান খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে নটবর বলল : এবার তাহলি যাই ?

পুস্প বলল : বড় আনন্দ হইছে তোমারে দেখে। ইষ্টিশনের বাজারে একদিন দেখা করো।

—নিশ্চয়। তোমরা হলে আপনার লোক।

নটবর ঘর থেকে বেরিয়েও বেরোচ্ছে না। কেমন যেন ইতস্তত করছে।

পুস্প বুঝতে পেরেছে। মিটি মিটি তাই হাসছে।

নটবর আমতা আমতা করে বলল : দাদা বলে ডাকিছ যদি বুড়ি বলে—

পুস্প আর কথা না বলে পারল না : হ, হ, বুঝিছি। সে সব হবে ইষ্টিশনের বাজারে। যাও এখন দাদা।

নটবর আর সাহস করল না। তার দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বেরিয়ে গেল।

মনটা আনন্দে ঝলমল করতে লাগল নটবরের। বড় ভাল লাগল মেয়েটিকে। আজ যেন নতুন করে চিনল ওকে। কিন্তু একটা কথা বার বার ভেবেও তার কোন হদিস পেলনা মনের ভিতর। পুস্প তাকে এত খাতির করল কেন ?

সে ত তার কোন উপকার করেনি। আলাপ ত মাত্র সেই একদিনের। মানুষের চরিত্রে এমন সব বিস্ময়কর ব্যবহার আছে যার কারণ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিন স্টেশনের বাজারে পুস্পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তার দিকে সে

টাকা ছুঁড়ে দিয়েছিল আত্ম কিস্ত সে সাহস হয়নি। অনেক দ্বিধা নিয়ে যদিবা সে কিছু বলতে চেয়েছিল পুষ্প তাতে বাধা দিয়েছে। পুষ্পকে আত্ম তার মনে হোল পরমায়ী ; সে যেন তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিল। মনটা খুশিতে ভরপুর ছিল। নটবর গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে মেলার মধ্যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরতে লাগল।

নৌকায় ফিরতে অনেক সময় নেবে। লঞ্চে এসেছে আবার লঞ্চেই ফিরে যাবে। খোঁজ নিয়ে জানল লঞ্চ ছাড়বে খুব ভোরে—তার আগে নয়। পুষ্প আর একটু বসতে বলেছিল। তাড়াতাড়ি এসে কোন ফল হোল না। বেশ মেয়ে ভাল মেয়ে পুষ্প। ওকে বাজারে নেয়েনাম্বু বললে মনে করতে ইচ্ছা হয় না তার। বড় ঘরের বউ ঝি ছিল। আত্ম দেখে হুঁদশা, মুচির ছেলের পাত কুড়াতে চায়। নটবর এঁটো নেবার সময় হেসে পুষ্প বলেছিল : আমাগো আবার জাত আছে নাকি ! শুনে নটবরের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এবারে মেলা খুব জমকালো হয়েছে। নটবরের ইচ্ছা ছিল আরও একটা দিন থেকে যায়। কিন্তু নিশ্চিত হয়ে থাকবার উপায় নাই। বাড়িতে ছেলেটার জন্মে উৎসব আছে। তার মাথায় এই পুজার প্রসাদ আর কুল-বেলপাতা ছোঁয়াতে হবে—যদি সুবুদ্ধি ফিরে আসে। পাঁচ সাতটা নয় ঐ তার একমাত্র সম্ভাবন। বাড়িতে আটক করে রেখে এসেছে। আবার কি দৌরাশ্য করে বসেছে কে জানে। বড় হুঁসুট ছেলে অক্ষয়।

হঠাৎ মেলার মধ্যে বেনেখানারের স্বজাতিদের ক'জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারা দল বেঁধে এসেছে কুতি করতে। যাবার সময় পুজো দিয়ে যাবে। বহুদিন পরে নটবরের সঙ্গে ওদের দেখা।

—আর নটবরদা যে ! আসো আসো—

ওরা নটবরকে ডেকে নিয়ে কাঁকায় এসে এক গাছতলায় বসল। পান বিড়ি খায় আর গল্প করে—ব্যবসার গল্প, ঘরোয়া গল্প। তারপর বসল তাস খেলতে।

বড় গুরুভোজন হয়ে গেছে পুষ্পর ওখানে। মাটির উপর চাদর পেতে নটবর শুয়ে পড়ল।

খুম ভাঙতে দেখল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেলার ভেতর কড়া কড়া সব বাতি জ্বলছে। বেনেখানারের অন্য সবাই উঠে চলে গেছে। ছ'জন মাত্র বসে গোলগল্প করছে। তাদের একজন বলল : ও নটবরদা গান শুনতি যাবানা ?

নটবর আড়মোড়া ভেঙ্গে সবে একটা বিড়ি ধরিয়ে বসেছে। তার কথা শুনে দ্বিতীয়জন বলল : যাত্রা গান কবি গান অনেক আসেছে। আত্ম নামবে পুঁটিমারির রাধিকের দলের গান। বড় সুরেশ গায় দাদা।

নটবর বলল : আমার ফিরতি ত সেই ভোর। তা চল শুনিগে এটু।

ক'পা মাত্র এগিয়েছে এর মধ্যে পরাশর ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। পরাশরকে দেখে নটবর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল : কিরে পরাশর হইছে কি ? পরাশর হাঁপাচ্ছে। তার ঘাম ঝরছে

—অনেক খুঁজে পাইছি তোমারে। বানেশ্বরের পেছাদ না বললি ত ফিরেই যাতেছিলাম।

ব্যগ্র হয়ে নটবর বলল : সমাচারডা কি ?

পরশর তার হাত ধরে বলল : অক্ষয় পরাণে বেঁচে আছে ত ?

—সে জানলা ভাঙে পলাইছে । পুবির বিলি তার পাতা নাই ।

নটবর থমকে দাঁড়াল । কোন কথা না বলে মাথার চুল টানতে লাগল ।

খানিক পরে বলল : এ নিরুঃশের বেটারে নিয়ে আমি করি কি বল তো !

এমন শালার ছেলে দিয়ে আমার গুটির কি পিণ্ডি গেলাব !

পরশর বলল : ও কথা ছাড়ান দাও । এখন তারে খুঁজে ত বার করতি হবে ।

পুতুনী ছিল বুড়োও কি চোখি ঝাঞ্ঝনি ? হারাণে গো বাড়ির ওরা ঘানে না কেউ ?

—না । কেউ না । বাবুপাড়ায় পাঠশালাতেও খোঁজ নিছি ।

হঠাৎ দপ্ করে জলে উঠল নটবর : ঐ শালার পাঠশালায় আগুন দিতি না পারলি আমার সোয়াস্তি নাই ।

পরশর হেসে বলল : ও তোমার রাগের কথা ! এখন কি শলাপরাশর্ষ করবা ক'ও ।

—হঁ ।

আর কোন কথা নাই নটবরের মুখে । পরশরও কোন কথা আর বলল না । ভাবতে ভাবতে ছুঁকনে এগিয়ে চলল ।

প্রকাণ্ড সামিয়ানার নিচে বড় বড় আলো জলছে । আসরে বাজনা শুরু হয়ে গেছে ।

নটবর পকেট থেকে পয়সা বের করে বলল : এই নে, হোটেলের খে খায়ে আয় গে । আমি আছি এখানে ।

পরশর খেয়ে এসে দেখল নটবর বসে বসে হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঝিমচ্ছে ।

নটবরের গায়ে হাত রেখে পরশর বলল : ও লটবরদা, শরীল কি খারাপ হয়েছেন । শোবা এটু ?

নটবর উঠে দাঁড়াল ।

—না-না, হয়নি কিছু । ও পরশর, শোন এটা কথা । তুই এখানখে নড়িস না ! তোরে আমি আসে ডাকে নেবানে ।

নটবরের কাজই এই । স্থির হয়ে বসতে পারে না ।

—কনে যাতিছ ?

—যাই এটু ঘুরে আসি ।

নটবরের মাথায় ভুত চেপেছে । তাই সোজা এসে চুকল শরবৎ-এর দোকানে । সামনে অবশ্য শরবৎ—লাল, হলদে চিনির জল । পেছনে আছে কিন্তু শরবৎ নয়—সরাব ।

দোকানী অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল : আসো ওস্তাদ । পর্দা সরিয়ে ভিতরি যাও । বেশি খেল না নটবর ।

দোকানী বিশ্বয় প্রকাশ করে বলল : সে কি হয়ে গেল ?

নটবর হেসে বলল : বিদেশে আসে কি বেসামাল হওয়া যায় মাস্টার ।

পাওনা মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল নটবর । এখন সে যাবে কোথায় ? এ অবস্থায় পুষ্পর ওখানে যাওয়া যায় না । না, ওদিক আর সে মাড়াবে না এখন । মনে দুর্বলতা আছে, আবার গিয়ে হয়ত কোন ঘরে উঠবে । পরাশরের সঙ্গে তাহলে বাড়ি ফেরা হবে না । বাড়ি তাকে ফিরতেই হবে । ছেলেটার খোজ নিতে হবে । অক্ষয় তারে ত শাস্তি দেবে না । মা মরা ছেলেমেয়ে এমনই হয় ।

নদীর পাড়ে এসে ঘাসের উপর বসল নটবর । মিশমিশে কালো আঁধারে নদীর জল ঠাণ্ড করা যায় না । ছোট ছোট ঢেউ পাড়ে এসে, নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ে শব্দ তুলছে কল কলাৎ, ছল ছলাৎ । কত কি ভাবনা ছড় ছড় করে আসছে—মাথার মধ্যে এসে যেন সব আছড়ে পড়ছে । ছেলেকে মানুষ করতে পারেনি বলে নিজেকে গালাগালি দিল নটবর । বদ সঙ্গে মিশে মদ গাঁজায় আর মেয়ে মানুষের পেছনে টাকার পর টাকা নষ্ট করেছে । সংসারের দিকে নজর দেয়নি ।

অনেক দিনের অনেক কথা মনে আসতে লাগল । কুমুদের কথা ঘুরে ঘুরে মনে আসতে লাগল । কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারধোর করেছে, ঝগড়া করেছে । আবার ভালও বেসেছে । বউ এসে যেন লক্ষ্মী হয়ে ঘরে ঢুকেছিল । ব্যবসায় উন্নতি হোলে—বাড়ি তুলল । সেই যে বাজারের মতি তাকে বশ করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছিল তার হাত থেকে মুক্তি পেল এই বউএর রূপায় । সেই বউএর অপঘাত যত্ন হোল,—তার কপাল পুড়ল, ছেলেটা হোল বখাটে !...নটবর কাঁদতে শুরু করল ।

হঠাৎ খেয়াল হোল রাত শেষ হয়ে আসছে । খুব ভোরে লঞ্চ ছাড়বে । নটবর যাত্রার আসরে ছুটে চলল ।

এসে দেখে পরাশর উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছে ।

নটবর এসে দাঁড়াতেই ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল : নটবরদা রে অক্ষয়েরে যেন পাইছি ।

নটবর চমকে উঠে বলল : কস কি, কেন ?

যাত্রা গান শেষ হয়ে গেছে । দলের লোকেরা তাদের সাজসরঞ্জাম সব গোছাচ্ছে । পরাশর নটবরের হাত ধার হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল ওদের সাজঘরে ।

প্রথম নজরে চিনতে পারা কঠিন । মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা । পরনে লাল চেলি, গায়ে হলুদ রংএর উড়ুনি । নটবর একবার ওকে দেখে আর একবার পরাশরের মুখের দিকে তাকায় ।

অক্ষয় ওদের দেখতে পায়নি । একটা ছোট বেঞ্চির উপর বসে সে শিমচ্ছিল ।

নটবর আর কোন কথা না বলে দৌড়ে ঘরে ঢুকে অক্ষয়ের কান ধরল গিয়ে ।

অক্ষয় হকচকিয়ে গেল । চোখ ভাল করে মেলে দেখল, আর কেউ নয়, তারা বাবা আর পরাশর দাঁড়িয়ে সামনে । ভয় পেয়ে সে চেষ্টা করে উঠল, হাত ছাড়িয়ে একবার পালাবারও চেষ্টা করল কিন্তু পারল না ।

চিংকার শুনে রাধিকা এল, অম্বুকুল রাজেন এল, আরও কজন এল দৌড়ে।

—কি ব্যাপার, ওর কান ধরিছ কেন ?

—কেডা তুমি ? কনখে আসতিছ ?

—নটবর কটমট করে রাধিকার দিকে চেয়ে বলল : ঐ হারামজাদারে দ্বিজঙ্গা কর কেডা আমি।

পরশর বলল : ওনার ছেলে। বাড়ির থে পলায়ে আসেছে।

—ছেলে ? তবে যে বলল ওর বাপ মা নাই; বাড়ি দৈবজ্ঞকাঠি।

—দৈবজ্ঞকাঠি

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে একটা খাণ্ড কষেছিল আর কি। পরশর সামনে পড়ে হাতটা ধরে অম্বুনয়ের সুরে বলল : ছাড়ান দেও দাদা।

রাধিকা বেশ বুঝতে পারল ব্যাপারটি বড় সুবিধার নয়। ঘর পালান ছেলে সে বুঝতে পেরেছিল কিন্তু ঘটনাটি যে এভাবে গড়াবে সে ভাবতে পারেনি। সারারাত পরিশ্রমের পর ভোর রাতের এই ঝামেলা বড় ভাবিয়ে তুলল তাকে।

রাধিকা সকলকে তড়া দিয়ে বলল : নে-নে সব গোছায়ে এবার গাড়ীতে উঠ।

তারপর নটবরের দিকে ফিরে বলল : তাহলি ছেলে তোনার মাতব্বর ? চল একবার আমাগো বাসায়। ছেলেও নেবা তামাকও খাবা। ছেলে তোনার চুরি করিনি। চল, সব খুলে বলরানে।

নটবর তাদের সঙ্গে চলল। অম্বয়ের হাত ধরে পরশর চলল পেছু পেছু।

রাধিকা সব ঘটনাগুলি খুলে বলল, রেখে চেপে বলল না। না বলে উপায় নাই। একবার এই রকম একটা ব্যাপারের জন্তে বাগেরহাটের কোর্টে গিয়ে জরিমানা পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

নটবর লোক ভাল। ছেলে পেয়ে সে খুশি হোল। রাধিকাও স্বস্তি পেল। নটবরকে তারা ছাড়ল না। সকালটা কাটাতে হোল তাদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পান বিড়ি খেয়ে আর তাস খেলে।

হুপুরের প্রথম দিকে আর একটা লঞ্চ ছাড়বে। সেইটাতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

[ক্রমশঃ]

নেপথ্যনায়ক

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দধীচি একবার মরে । নির্লজ্জ ইন্দ্রও
তার বেশি আত্মত্যাগ চাইতে লজ্জা পায় ।
কিন্তু তোমার লোভ হৃদমনীয়
জনমে জনমে বাঙালীর অস্থি চায় ।

ইন্দ্রের প্রত্যাশা ছিল একদা তোমার
বাংলা তাই ছিন্নমস্তা নিজরক্তে স্নাত ।
তারোপর হীন স্বার্থে তুমিই আবার
তার মৃত্যু চাও, কী আশ্চর্য অবিনীত ।

যদিও অধিকতর বিষয় র'য়েছে
আমাদের জন্য, দেশবিভক্ত-স্বশানে ।
মস্তিষ্ক-প্রসাদে তুষ্ট বাঙালী গোয়েন্দা
জননীর মুক্ত ক্ষতে গুপ্ত ছুরি হানে ।

কর্মক্ষেত্রে ক্রব উন্নতির নাকি এই
সোজা পথ, শিখেছে সে তোমার কাছেই ।

কোথা যাই

মানিক মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

জীবিকার মাঠে এলো
হানাদার বগা,
আমরা সে কলে পড়ে
ঘুরি যেন চরকি !
খটাখট্ খটাখট্
সবদোরে খিল,
কোথা যাই কি যে করি
শূন্য নিখিল ।
অসহ, না খাওয়া সে
মুখটা শিশুর,
বর মাগে কেউ শিব
কিন্মা যীশুর !
কেউ বুক চাপড়ায়
ঈদ মুবারকে,
লড়াইয়ে নামে কেউ
কেউ তদারকে !
জাতীয় নেতারা এসে
যুদ্ধ ছুটায়,
আল্গোছে সরে ফের
বল্গা গুটায় !
সাম্রাট হাঁচে ঢালা
শাসনে এ শাস্তি,
না ভৈ কদাচন
দুঃখম্ নাস্তি ।

। ২ ।

মাঠ মাটি আছে তেতে
আসে এপ্রিল,
কানটা কি হোলো কালা ?
কোথায় কোকিল !
দাঁড়াবার মাটি নেই,
ভয়ে কারো রা'টি নেই
আকাশের বুকে ওড়ে
ক'টা গাং চিল ।

। ৩ ।

বাংলার মসূন্দে
জ্বালেমের দিন,
ফালুগুন ত্রিয়মান
স্বত আশ্বিন !
জ্বালেমের অন্তরে
হল্লা সেলাম,
চারিদিকে সোরগোল
: গেলাম গেলাম !

। ৪ ।

কোথা যাই, কোথা যাই,
কোন পথ খোলা ?
রমনার মাঠ থেকে
আরমানি টোলা,
নাকি স্বেচ্ছা চলে যাবো
লছ্‌মন খোলা ।

ঐতিহাসিক

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

ইতিহাসের ঋগ্বেদে পাতার উপর দিয়ে
ওদের গরুর গাড়ি আসছে গড়িয়ে,
অন্ধকারে সংখ্যা বোঝা যায়না গাড়ির ।

আমি তো এইমাত্র জেগেছি,
জানলা দিয়ে দেখছি নিস্তরু গাছের সারি,
ঘাসে, বাতাসে, আকাশে হিমহিম ভাব,
ঈশ্বর অন্ধকারে ওদের লঠন জলছে,
ওরা হেঁটেও আসছে ।

মেয়েরা গাড়িতে, পুরুষেরা হেঁটে,
কারো বোরখা, কারো বা ঘোমটা,
মাঠের উপর বন্ধুর পথে পথে
পাঁক ও পল্লবনের জাঙাল ঘেঁটে
কেবল শেষরাতের লুকোচুরি লগ্নে
ওদের দংগলের লাখ লাখ লোক
কোথায় হেঁটে যাচ্ছে ।

আকাশের তারা যদি বা গোণা যায়,
এদের গোণা যায়না,
শরতের বুকচেরা ছায়াপথের মত
আকাশের আদিগন্ত এরা প্রসারিত ।

আমি তো এই মাত্র জেগেছি

এইমাত্র আমার অস্তিত্বে

আমার সামনের চলমান চরাচর,

আমার গ্রাম,

এমন শত সহস্র গ্রামের ধানী বাঠ

চাষের গরুর চোখের মত করুণ ।

চোখের আদিয় নীহারিকায় সহসা

আগুন ধরিয়েছে উষা ।

ভাষা ও রাষ্ট্র

বুদ্ধদেব বসু

আমি রাজনৈতিক নই, কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নই, আরাম-কেন্দারায় ব'সেও রাজনীতির চর্চা আমি করি না। এবং আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি বলেই তার মধ্যে ষড়ৈর্ষ্য দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি'—এই হৃদয়াবেগে আমার মন কখনো সাড়া দেয় না।

আমি লেখক, বাঙালি লেখক না-হ'লেও বাংলা ভাষার লেখক। কাজের কথা, বুদ্ধির কথা, এমনকি হয়তো মনের কথাও কখনো-কখনো অন্য ভাষায় বলতে পারি, কিন্তু প্রাণের কথা বাংলায় ছাড়া বলতে পারি না। এবং এই প্রাণ, বা অচেতন মন, তার কম্পনগুলিকে ভাষায় মূর্ত ক'রে তোলাই আমার নিরন্তর প্রয়াস। তার ফলে আমি একটি অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত হ'য়ে আছি সেই কয়েক কোটি মানুষের সঙ্গে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঙালির এবং বাংলা দেশের সঙ্গে এই ভাষাই আমার প্রধান বন্ধন। এমনকি হয়তো একমাত্র।

এর মানে এ-কথা হ'লো না যে আমার মনোলোক থেকে অবাঙালি বাদ পড়ছেন। আমি ইংরেজ নই, য়োরোপীয় নই অথচ ইংরেজি ভাষার সাহায্যে পশ্চিমী লেখকদের সঙ্গে নিত্য-নূতন সৌহার্দ্যবন্ধন আবিকার করছি। ঠিক তেমনি, যিনি বাংলা ভাষা শিখবেন, তাঁর জন্মস্থান যেখানেই হোক না, তাঁরই সঙ্গে আমার মানসিক বাণিজ্য চলতে পারবে এবং যিনি তাঁর নিজের ভাষায় আমার রচনা অনুবাদ ক'রে নেবেন, তাঁর সঙ্গেও। কিন্তু প্রধান উচ্চারণ মাতৃভাষাতেই হ'তে হবে সেখানে লেখক (চিত্রশিল্পী একান্তভাবে তা নন) বিতাড়িত, নির্বাসিত বা দৃশ্যত স্বদেশবিরোধী হ'য়েও, স্বদেশের সঙ্গে ক্ষমাহীনভাবে যুক্ত থাকেন। লেখকের মতো এমন অনিচ্ছক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক আর নেই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়েও এই কথা। আধুনিক জগতে নেশন নামে যে-ধারণা প্রচলিত আছে তার ভিত্তি কোথায় খুঁজতে গেলে ভাষা ছাড়া আর উত্তর পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু জাতি বাস করছে সেই বিচিত্র প্রজাতিসমূহকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ইংরেজি ভাষা। ইংরেজ, স্কট, ওয়েলশ ও আইরিশে স্থানীয় ঐতিহ্যগত প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে (বাকুড়া ও শ্রীহট্টের হিন্দু বাঙালিতেও প্রভেদ কম নয়), কিন্তু বাইরের জগতের কাছে তারা সকলেই 'ইংরেজ' নামক একটিমাত্র ধারণার মধ্যে গৃহীত হ'তে পারে : ওয়ার্টার স্কট, ইয়েটস, ডিলান টমাস, এরা তিনজনেই 'ইংরেজি' সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছেন, এবং আয়র্লণ্ডের পূর্ণস্বাধীনতা লাভের পরেও আইরিশ ও ইংরেজ পরস্পরের কাছে কোনো অর্থেই 'বিদেশী' হ'য়ে যায়নি। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রিক অবস্থা সাম্প্রতিক ইতিহাসে বহুবার বদলেছে, কিন্তু যেহেতু 'অস্ট্রিয়ান' নামক কোনো ভাষা নেই, পৃথিবীর কাছে অস্ট্রিয়া জর্মানদেশেরই অন্তর্গত অস্ট্রিয়ার কবি

রিলকে বা সুইৎসারল্যান্ডের কবি স্পিটেলার—এঁরা স্বর্মন মানসেনই সম্ভান ও প্রতিভা । যে-দেশের স্বকীয় ভাষা নেই বা সে-ভাষা পরিণত নয়, অথ একটি বড়ো ভাষাকে আশ্র-সাৎ ক'রেই সে মনের দিক থেকে বাঁচতে পারে । এর আর একটি উদাহরণ ফরান্সি-ভাষী বেলজিয়ম ।

বলতে চাচ্ছি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রধান বন্ধনই হ'লো ভাষা । ধর্ম এক না হ'তে পারে, স্বরকল্পার অভ্যাসও ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু যে-প্রজাসমূহ এক ভাষার কথা বলে তারাই একটা 'দেশ' বা 'রাষ্ট্র'র স্বাভাবিক অভিজ্ঞান ; সেই সহজাত ভাষার উপরেই 'রাষ্ট্র' নামক পরিকল্পনার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা । এবং 'রাষ্ট্র' ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু ভাষা ছাড়া পারে না ।

আমাদের ইংরেজ শাসকরা ভারতীয় ভাষাগুলিকে অবজ্ঞাভরে 'ভায়ালেট্টে' বা 'ভার্গাকুলর' বলতেন কিন্তু (আর বোধহয় তারই প্রতিঘাতে) ইংরেজ আমলের আরম্ভেই বাঙালি তার ভাষা বিষয়ে সচেতন হ'লো, সচেতনভাবে তার ভাষাকে ভালোবাসলো । এ-ঘটনা ভারতের অন্য কোথাও তখন ঘটেনি, এখনো সর্বত্র ঘটেছে ব'লে মনে হয় না । বাংলার হুর্দাত্ত 'সাহেবিয়ানা'র সময়েই বাংলা গদ্যের জন্ম এবং পদ্যের পুনর্জন্ম হ'লো ; য়োরোপের অভিঘাতের ফলে বাঙালির মন ইংরেজি ভাষার মধ্যে আশ্রবিলোপ চাইলো না, চাইলো মতৃভাষার পরিণতিসাধন । এবং এরই ফলে বাঙালির মধ্যে যে-সংহতিবোধ জেগে উঠলো, তা-ই ব্যপ্ত হ'য়ে ক্রমশ পরিণত হ'লো ভারতীয় জাতীয়তাবাদে, সর্বভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সেখানেই উৎস । বাংলা ভাষা যেখানে-যেখানে বলা হয়, সেই সমস্ত অংশ নিয়েই বাংলাদেশ, এই বিশ্বাসের প্রেরণাতেই সে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করেছিলো, আর দ্বিতীয় বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনাও ভুলতে পারলো না । নিশ্চয়ই, পছন্দ ছুই তীরেই, এমন মানুষ অনেক আছেন যাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান বাংলার ননোলোকেরই অংশ । রাষ্ট্রের বদল রাতারাতি হ'তে পারে, কিন্তু রক্তের বদল কত দুঃসাধ্য তার প্রমাণস্বরূপ বাংলা ভাষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাতের উল্লেখ করা যায় ।

কোনো ছুই দেশ দূরবর্তী হ'য়েও এক ভাষায় কথা বললে তারা আত্মীয় হয়, যেমন উত্তর আমেরিকা ও ইংলও, স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকা । এবং যদি ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকে, তা'হলে ভিন্ন রাষ্ট্র হ'লেও তারা সমানুভূতস্বায়ী না-হ'য়ে পারে না । কিন্তু যেখানে ভৌগোলিক সান্নিধ্য আর ভাষার সমতা দুটোই আছে, সেখানে প্রজাসমূহ আত্মীয় নয় একাত্ম হয়ে ওঠে । পূর্ব ভারতের যেখানে-যেখানে বাংলা বলা হয়, তা সবই মাটির এবং জলের অণুতে-অণুতে পরস্পরসম্পৃক্ত—সেটাই যথার্থ বাংলা দেশ—রাষ্ট্রনীতির স্বায়ত্বশ্রমে তার যখনই যা নামকরণ হোক না । সেই দেশে বাংলা ভাষা যদি প্রাধান্য না পায় তাহ'লে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে ।

ইংরেজ আমলে যা ছিলো 'ভার্গাকুলর', স্বাধীন ভারতে তার নুতন নাম হয়েছে 'রিজিওনাল' বা 'আঞ্চলিক' ভাষা । এই বিশেষণের অর্থ কী, তা ভেবে পাওয়া শক্ত, কেননা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই 'আঞ্চলিক', কোনো-কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সচল—ইংরেজি, এবং অংশত ফরান্সি ছাড়া আর কোনো ভাষাকেই জাগতিক বলা যায় না ।

ইতালিয়ান, নরোয়েজিয়ান বা জাপানি ভাষার প্রচার খুব বেশি নয়, কিন্তু কেউ তাদের 'আঞ্চলিক' বলে উল্লেখ করে না, এক সভ্য দেশের ভাষা রূপেই তারা স্বীকৃত ও সম্মানিত। বাংলা, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার স্বাভাবিক মর্যাদাও সেই রকম, কিন্তু এই নূতন নামকরণে তাদের আভিহাতাই শুধু উপেক্ষিত হয়নি, সত্যেরও অপলাপ ঘটেছে। ভারতের কোনো একটি ভাষাও যদি 'আঞ্চলিক' হয় তাহলে প্রত্যেক ভাষাই তা-ই ; সারা ভারত স্বাভাবিকভাবে কোনো-একটি ভাষাও বলে না, এবং এই ভাষাগুলি যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা কোনো-এক ক্ষেত্রেও অন্যদের তুলনায় অত্যধিক নয়। অথচ 'আঞ্চলিক' বললেই অধিকার সংকুচিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, শুধু ভারতের রক্ষণাবেক্ষণ নয়, এমনকি সেই ভাষার আপন সীমানারই মধ্যে। পাছে এই আশঙ্কা রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়, সে-কথা ভেবেই বাঙালির মন আজ বিচলিত। বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বিষয়ে প্রথম কথা হ'লো এই : তাহ'লে বাংলা ভাষার অবস্থা কী হবে ?

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেখিয়ে বলা যায় যে ভারতবাসীকে নেশনে পরিণত করার জন্য সারা দেশে একটা সাধারণ ভাষা চালাতেই হবে—প্রয়োজন হয় তো কিছুটা জুসুম করে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মাকিনদেশের ভৌগোলিক আয়তনে আর জাতিগত বিশ্রণে মিল থাকলেও অল্প কিছুতেই মিল নেই। মাকিন দেশ নতুন ; মুষ্টিমেয় 'ইণ্ডিয়ান' বাদ দিয়ে তার সমগ্র প্রজাবৃন্দ মাত্র কয়েক পুরুষ আগে বিভিন্ন বিদেশ থেকে এসেছিলো, এবং যন্ত্রবহুল মাকিন সভ্যতার বিশেষ ক্ষমতাই এই যে নানা দেশ থেকে প্রজা গ্রহণ ক'রে সকলকেই এক অভিন্ন মাকিন ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিতে তার দেরি হয় না। ভারত সুপ্রাচীন, তার উপর বিভিন্ন জাতিগত ও স্থানগত বৈচিত্র্যকে সে কখনো অস্বীকার করেনি, বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য ফুটিয়ে তুলেছে। এখানেই ভারতের প্রতিভার ও সাধনার বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার আয়তন ভারতের প্রায় ত্রিগুণ ; সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে মোটের উপর একই রকম জীবনের ধারা দেখতে পাওয়া যায় : একই রকম খাওয়া, পরা, দোকান, রাস্তা, ব্যবহার, আশ্রয়প্রদান। কিন্তু ভারতে প্রত্যেক তিন শো বা চার শো মাইল পর-পরই জীবনের গড়ন বদলে যাচ্ছে, আর প্রত্যেকটি ছোটো-ছোটো বৈশিষ্ট্যের পিছনে বহু শতকের ইতিহাস সঞ্চিত হ'য়ে আছে। যে-বিশেষ বলে আমেরিকায় এই সমীকরণ সম্ভব হলো, সারা দেশে একই ভাষার প্রচলনও তারই অকৃত্রিম ফল। পক্ষান্তরে, প্রানাদের বিভিন্ন ভাষা, এবং বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার, এগুলোই ভারতের নিহিত স্বষ্টি, তার চরিত্রলক্ষণ। ভারতকে তার ভবিষ্যৎ বিবর্তনের পথে সকলভাবে নিয়ে যেতে হলে এই বৈচিত্র্যের ছন্দকে স্বীকার করে নেয়া চাই।

অর্থাৎ সারা ভারত এক রাষ্ট্র হলেও কার্যত আমরা এক-একটি সুনির্দিষ্ট ভাষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে বসবাস করি, অনেকটা য়োরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশের মতো। ইংরেজ, ফরাসি, ফরানি যেমন আলাদা, অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ ইতিহাসের পটভূমিও ব্যাপ্ত হয়ে আছে, পাশ্চাত্য, গুজরাতি, বাঙালি, ইত্যাদিকেও সেই রকম ধারণা করলে ভুল হয় না। য়োরোপীয় বা ভারতীয় সংস্কৃতি নামক একটা সমগ্রকে আমরা অঙ্গভব করতে পারি, কিন্তু তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশের ব্যক্তিস্বরূপও সুস্পষ্ট। ক্যাথলিক

ধর্ম ও লাতিন ভাষা বা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার বন্ধনে ইওরোপ অথবা ভারতবর্ষ অতীতে যে-ভাবে এক হ'তে পেরেছিলো, আজকের দিনে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে কোনো আদর্শ নেই, যা কোটি-কোটি মানুষ একবাক্যে মেনে নিতে পারে। ভারতে শেষ সুযোগ পেয়েছিলো ইংরেজরা, তাদের সভ্যতা অনেক বিষয়ে উন্নত ছিলো, এবং ভারতের উপকূলে আধুনিক জগৎকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারাই নিয়ে এসেছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতবাসীকে তাদের নিছ-নিছ ভাষা আর জীবনধারা ভুলিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রথিত ক'রে ফেলতে তারা যে পারলো না তার কারণ তাদের অক্ষমতা নয়, ভারতের প্রতিভা। আর আজকের দিনে সে-রকম কোনো কল্পনারও আর স্থান নেই, বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেছে তার পক্ষে, চারদিকেই আশ্বচেতনা তীব্র।

তথাকথিত প্রাদেশিকতা ভুলে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় বলে অহুভব করার উপদেশ আজকাল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে বাঙালি বা মারাঠি বলে ভাবা যদি প্রাদেশিকতা হয়, নিজেকে ভারতীয়, বা ইংরেজ বা চৈনিক বলে ভাবাও কি তা-ই নয়—এই আজকের দিনে, যখন এক পৃথিবীতে এক মানুষের আসন রচিত হচ্ছে দিকে-দিকে? কিন্তু যেহেতু 'য়োরোপীয়' বা 'ভারতীয়' নামক কোনো ভাষা নেই, তাই ফরাসি, জার্মান, ইংরেজ, রাশিয়ানের মতো আনাদেরও প্রথম পরিচয় হবে তামিল, কানাড়া, মারাঠি, বাঙালি, গুজরাতি বলে। সেটা প্রকৃতিরই বিধান, আমার গায়ের রং কালো বলে যেমন নালিশ করা চলে না, এও সেই রকম। এবং এই বৈচিত্র্যের অর্থ বিরোধ নয়, বিচ্ছেদ নয়; এই বৈচিত্র্যই ভারতের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, তার চিন্ময় সম্পদ। বিভিন্ন পক্ষের বৈশিষ্ট্য লোপ ক'রে দিয়ে মিতালি গ'ড়ে ওঠে না; চারিত্রিক ঐশ্বর্য বিকশিত হ'লেই সত্যিকার মিলন সম্ভব হয়। বন্ধুকে ভালোবাসি ব'লে তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাসা বাঁধতে চাই না। নিছ-নিছ পারিবারিক বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকলেই বন্ধুতা সফল হতে পারে। এ-কথা সকলের পক্ষে সমান সত্য; বিহারি, আসামি, উড়িয়া, মলয়ালি যে-কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হ'লে তাতে ভারতেরই অঙ্গহানি হবে। আজ ভারতের প্রত্যেক ভাষা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, চায় আত্মবিকাশের চরম অধিকার, নিজেকে ফলিয়ে তুলতে চায় স্বহস্তম কর্মজীবনে। সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত ক'রে রাজ্যের সীমানা কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে চাইলে মানুষের মর্মস্থলে আঘাত করা হয়। এ-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার সুবিধের কথাটা বড়ো করে ভাবলে চলবে না; কেননা রাষ্ট্র একটা যন্ত্র হ'লেও তার অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয়—তারা মানুষ—পাঠ্য বইয়ের কাল্পনিক 'ইকনমিক ম্যান' বা 'পলিটিক্যাল ম্যান' নয়—রক্তমাংস-হৃদয়-মন-সম্পন্ন জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তারা শুধু খেয়ে-প'রে বাঁচতে চায় না, শুধু কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচতে চায় না, চায় প্রকাশিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে, দুঃখ পেতে, ত্যাগ করতে। তাদের শুধু খিদে পায় আর খিদে মিটলেই খুশি-পায় তা নয়, তারা চিন্তা করে, অহুভব করে, সংগ্রাম করে; আদর্শ আছে তাদের, সেই আদর্শ উপলব্ধি করার চেষ্টাও আছে। তার সেই আন্তরিক জীবনে রিঙ্গ খটলে তার ক্ষতিপূরণ অথ কিছুতেই হ'তে পারে না।

‘ডয়েস অব বেঙ্গল’-এর সৌন্দর্য

॥ চন্দ্র ৭

টন্সিল : বাণীচিত্রনের নিবেদন ; কাহিনী ও সংলাপ : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তপন সিংহ ; আলোকচিত্রশিল্পী : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ; ভূমিকায় : কালী ব্যানার্জি, জহর রায়, ভানু, অল্পপকুমার, গতা, অতনু, মাধুরী, যমুনা ও আরো অনেকে !

বিভূতিভূষণের কাহিনী অবলম্বনে তোলা ছবি বরষাত্রী ইতিপূর্বে অত্যন্ত জন-প্রিয় ও প্রশংসিত হয়েছিল। দর্শকে আনন্দ পেয়েছিলেন প্রচুর। আলোচ্য ছবিও যথেষ্ট হাসায়, মন হালকা করে। ঘন ঘন হাসির ঢেউ ওঠে ছবি দেখতে দেখতে, প্রেক্ষাগৃহ ভরে যায় আনোদে।

দেশী হাসির ছবির পক্ষে এধরনের সাফল্য কম কৃতিত্বের কথা নয়। হাসির ছবিতে, কি দেশী কি বিদেশী, সাধারণত অতিরঞ্জন অবশ্যস্বাভাবী, চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ এবং হাবভাবও বাস্তবধর্মী হয় না, হয় আতিশয্যে চিত্রিত। পরিস্থিতি আর ঘটনাতেও থাকে অতিশয়োক্তির ঝোঁক, কিছুটা বাড়িয়ে বলা। এই বাড়িয়ে বলার ঝোঁকে বা চরিত্রগুলির অতিরঞ্জিত রূপায়নে দর্শক কিংবা সমালোচকের আপত্তি করার কিছু থাকে না, বরং জিনিষটা উপভোগ্য ও সফলই হয়, যদি কাহিনী ও চরিত্রের এই আতিশয্যের ঝোঁক সম্ভাব্য ঘটনা ও চরিত্রেরই অতিরঞ্জিত প্রতিচ্ছবি হয়ে চলচ্চিত্রে আসে। অর্থাৎ যে যে ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি ও কাহিনীর ঘটনা, পরিস্থিতি, চেনা চেনা মনে হয়, প্রায় লাগে বাস্তব—যদিও অনেকটা বাড়িয়ে বলা, দেখানো বেশ চড়া সুরে—সেই সকল ক্ষেত্রেই হাসির ছবি হাসিরও হয়, আবার তার মাত্রাও থাকে। মাত্রার অভাবই দেশী ছবিতে সব থেকে বেশি, তাই বেশি সংখ্যক হাসির ছবিই হয়ে ওঠে স্থূল, কষ্টকল্পিত, পারস্পর্যহীন গৌজানিল। আর সঙ্গে মেশে রুচির দৈন্য এবং স্থানে স্থানে অশ্লীলতা।

টন্সিল চিত্রের সব থেকে বড় বাহাহুরী এখানেই। এ ছবির গল্পের প্রবাহ এবং চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত, বাস্তবধর্মী নয়, কিন্তু অতিশয়োক্তি বেশির ভাগ সময়ই মনে হয় সম্ভাব্য পরিস্থিতি ও চেনা চেনা চরিত্রের মাধ্যমেই সম্পন্ন। তাই বাড়াবাড়িতে বিরক্তি জমে না, কোতুকবোধ জাগে, গম্ভীর ব্যঙ্গেরও অন্তর্নিহিত যে শিশুস্থূলভ সারল্য বিস্তৃমান তা আনোদে হাসে। এই সম্ভাব্য পরিস্থিতির মধ্যেই চরিত্রের আতিশয্যের প্রকাশ বলে ছবিটি স্থূল বা অশ্লীল হয়ে ওঠেনি, সমস্তটাই মাত্রার পরিধিতে বদ্ধ থেকেছে। এর জন্যে কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যরচয়িতা-পরিচালক ধন্যবাদার্থ। কাহিনীকারের সরস সংলাপও উল্লেখযোগ্য।

পরিচালক তপন সিংহ এ পর্যন্ত যে কটি ছবি তুলেছেন আলোচ্য ছবি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। এ ছবির পরিচালনায় তিনি যে পাত্র-পাত্রীর অতিরঞ্জিত চরিত্র-রূপায়ন পরিমিত ও পরিমল সীমার মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়েছেন তা বিশেষভাবে

লক্ষ্যণীয়। চরিত্রগুলি কয়েকটি চালু মুদ্রাদোষ বা ন্যানারিজিনের সহজ অভিব্যক্তির মধ্যে যাতে না নেমে যায় সে দিকে মনে হল তিনি যথাযথ্য চেষ্টা করেছেন। ফলে গল্পা, ঘোঁসনা, ও কে গুপ্তর ভূমিকায় যথাক্রমে কালীবাবু, জহর, ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাদোষ অনেক কাটিয়ে অভিনয় করেছেন। এঁদের মধ্যে যদিও, তুলনায়, জহর রায়ের ভূমিকায় কয়েকটি সহজ চাল বা মুদ্রাদোষ স্পষ্ট, তবু অগাধ সমস্ত ছবির থেকে তাঁকে টেন্সিলেই আমাদের সব থেকে ভালো লেগেছে। অভিনয়ে শিরোপা পাবেন অবশ্য কালীবাবু, তিনি অভিনয়ে যে ধরনের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে আশা করব বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর যোগ্য সমাদরের বিলম্ব হবে না। ভানু ও অল্প স্বভাবসিদ্ধ যোগ্যতা দেখিয়েছেন—যদিচ তা অপেক্ষাকৃত একধেয়ে, মুদ্রাদোষযুক্ত। পরিচালক এবং অল্পবাবু গোরচাঁদের ক্ষিদে পাওয়ার দৃশ্যেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন, ওখানে বিরক্তি বোধ হয়। নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা ও অতঃকুমার সুবিধে করতে পারেননি তবু, নায়িকার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগও মেলেনি। পরিচালক তপন সিংহ ছবির আঙ্গিক বা স্টাইল সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে কাৎ হন নি। ছবির আগাগোড়া টি ট্রেনেটই সম্ভাব্যের অভিরঞ্জে, হঠাৎ আচমকা চড় নারার মত রিয়ালিষ্টিক দৃশ্যের অবতারণা নেই। ফলে স্টাইলগত ক্রটিতে চিত্র বেনামান হয়নি, বেশিরভাগ তথাকথিত রিয়ালিষ্টিক ছবিতে আকস্মিক থ্রি-চাকরের প্রেমের ভাঁড়ানি বা ঐ জাতীয় দৃশ্যবস্তুরে যা ঘটে। আলোকচিত্রশিল্পের কাজ নোটামুটি ভালোই, শুধু আউটডোর ইন্ডোর শটগুলির পার্থক্য, অন্তত আলোর দিক দিয়ে, আরো একটু কম পরিষ্কার হওয়া কাম্য ছিল। আবহ সঙ্গীত অনেক জায়গায় বেজায় কানে লাগে, চোখের সামনে ইমেজগুলিকে ব্যাহত করতে থাকে, তা ছাড়া পা টিপে চুপে চুপে চলা ইত্যাদির দৃশ্যের আবহসঙ্গীত প্রতি ছবিতেই প্রায় এক রকম হবে কেন? এ ধরনের যান্ত্রিকতা সঙ্গীত বিশারদের দৈন্যের প্রমাণ।

কাহিনীকার বিভূতিভূষণ, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও পরিচালক তপন সিংহ এবং প্রধান অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের প্রাপ্য সাধুবাদ জানাই।

সাহেব বিবি গোলাম : সরকার প্রোডাক্সন্সের নিবেদন ; কাহিনী : বিনয় মিত্র ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কাতিক চট্টোপাধ্যায়, আলোক চিত্রশিল্প : অমূল্য মুখোপাধ্যায় ; শিল্পনির্দেশনা : সৌরেন সেন ; সঙ্গীত : রবীন চট্টোপাধ্যায় ; ভূমিকায় : সুমিত্রা, উত্তম, ছবি, কানু, অম্বুতা, পাহাড়ী, নীতিশ, জহর গাঙ্গুলী ও আরো অনেকে।

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলা চিত্র জগতে যে ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রের মাইন লেগেছিলো তাতে রীতিমত শঙ্কা জাগা স্বাভাবিক। একধরনের ছবি হচ্ছিল সূচিরা-উত্তমের জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে যুক্তিহীন চিত্রনাট্য ও কল্পনাহীন পরিচালনা নির্ভর, আর অল্পগুলি এই ছোটের চমকটুকুও হারানো, একেবারে কানা, অবাস্তব, স্থূল জোড়াতালি দেওয়া ছবি। তারই মধ্যে কিছু দিন আগে বিকাশ রায় আনুলেন নতুনদের আমেজ নিজের পরিচালিত চিত্রে, অনেকটা সংযম ও চিত্রের উপযোগী গুণের স্বাক্ষর দেখা দিল। কিন্তু অতঃপর আবার যে কে সেই, আগের হালেই যেন আমরা ফিরে

গেলুম । দেখা যায় না এমন ছবির ভীড় লাগল । সেই ভীড়ের মধ্যেই হঠাৎ সাহেব বিবি গোলাম পুনরায় আশা নিয়ে এল । ছবির পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, আলোক চিত্রশিল্পী, ও অভিনয় ক্ষেত্রের শিল্পীরা আলোচ্য চিত্রের সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন লাভ করবেন নিশ্চয়ই ।

সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসটি সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হলেও মূলত চটকদার লেখা নাত্র । উপন্যাসিক দুর্বলতা এত্রে অভ্যস্ত প্রকট । দুর্বলতার যে অংশ চলচ্চিত্রের পক্ষে সব থেকে ক্ষতিকর হয়েছে তা হল এর পাত্র পাত্রীর অস্পষ্ট ব্যক্তিস্বরূপ । ভুতনাথ জবা পটেশ্বরী বোঠান কেউই সম্পূর্ণ জীবন্ত ও সত্য নন ; সকলের মধ্যেই অবাস্তবতা ও ধোঁয়াটে কঁাকি আছে । যার জন্যে সাতটাকা মাইনের কর্মচারী ভুতনাথের সঙ্গে জবার দুদিন পরেই ঝাওয়া নিয়ে একটা অতিনাটকে দৃষ্টিকটু ঘটনার অবতারণা লেখক করতে বাধ্য হন ; সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন সব থিয়েটারী বাক্যালাপ ছুটি চরিত্রের মধ্যে করান যা তৎকালীন (এবং একালীনও) সর্বজনস্বীকৃত প্রেমিক প্রেমিকাও নটকে শোনাতে বলে করতে লজ্জা পেতে বাধ্য । শেষাংশে জবার হঠাৎ উধালানো হিংস্র-মানিও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য । যেমন উল্লেখযোগ্য ভুতনাথের জবা এবং পটেশ্বরী বোঠান সম্বন্ধে সদা দোহল্যমান অনিশ্চিত হৃদয়াবেগ । না সে, না পাঠকে ঠিক করতে পারে আদতে ভুতনাথ কার প্রেমাসক্ত । পটেশ্বরী বোঠানের ও কথাবার্তায় ব্যবহারে বারবারই মনে হয় তিনি ভুতনাথের সহৃদয়তা ও মনুষ্যত্বের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন । অথচ সমগ্র উপন্যাসে পটেশ্বরী বোঠান যা করেন তা নাকি স্বামীকে গোলানোর জন্যে পাওয়ার জন্যে । কেন ? না তিনি ছোটোবাবুকে বড়ই ভালোবাসেন, ছোটোবাবুই তাঁর হৃদয়ের স্বামী । কিন্তু তাহলে ভুতনাথের সঙ্গে বড়বাড়ির বো হয়ে অর্ধশতাব্দী আগে ও রকম আচার আচরণ, কথা, এমন কি আপন স্বীকারোক্তির কি মানে ?

আসলে উপন্যাসে মানেটা গৌড়ামিল । চরিত্রেগুলির ব্যক্তিত্বের অভাব, তাদের পরস্পরের সম্পর্কের অনিশ্চিত দুর্বল চরিত্রায়ণ ; এবং ফলে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর এক এক সময় এক এক রকম স্বরূপ, হৃদয়াবেগের কখনো ঝোঁক ডাইনে কখনো বাঁয়ে । এই পটেশ্বরী বোঠান টানেন তো এই জবা , এই ছোটোবাবু টানেন তো এই ভুতনাথ । জবার প্রথম দর্শনে ভুতনাথকে দেখে হাসি এবং দ্বিতীয় দর্শনে প্রেম । প্রায় আনকোরা নতুন একটি কর্মচারীকে ঝাওয়াতে বসে এলোপাখাড়ি দ্বিধা প্রকাশ করা

উপন্যাসের উপরোক্ত দুর্বলতাগুলি চিত্রনাট্যেও বর্তমান । তবু অভিনয়, পরিবেশ, ও চলচ্চিত্রের নিজস্ব আবেদনে, অর্থাৎ দৃশ্যত্বের আবেদনে দুর্বলতাগুলি কিছুটা হাক্কা দেখায় । জায়গায় জায়গায় থেকে থেকে মনে খট্কা লাগলেও, অবাস্তব মনে হলেও, পরপর ক্রম পরিবর্তিত দৃশ্যগুলি এসে সে বোধটুকু বারবারে ভুলিয়ে দেয় । পটেশ্বরী বোঠানের ভূমিকায় সুমিত্রাই সব থেকে বেশি উপন্যাসের চরিত্রের দুর্বলতা ঢেকেছেন । ছবিতেও যদিচ পটেশ্বরীকে ভুতনাথের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ দেখা যায়, তার সম্বন্ধেই তাঁর আবেগ বেশি স্বাভাবিক লাগে, তবু, সুমিত্রার সুঅভিনয়ে ও পরিচালকের দক্ষতায় স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা অনেকটা সত্য লাগে । সুমিত্রার

অভিনয়, গলার সুর, জায়গার জায়গার অভিব্যক্তি, দস্তরমত ভালোলাগে। বোঝা যায় তিনি আরো অনেক কৃতিত্ব দেখাবেন সুযোগ ঘটলে। পটেশ্বরীর নাৎনামির দৃশ্যগুলি কিন্তু কিছুটা ছকে ফেলা মনে হয়। উত্তরের অভিনয়ের সংযম ও নাত্রা উল্লেখযোগ্য। কাহ্নাবুর কুঁজো হয়ে প্রত্যেক ছবিতে চলার মুদ্রাদোষ কাটানো উচিত, নইলে ওঁকেও খারাপ লাগে না। অল্পভা দুর্বল চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। পাহাড়ীরও একই হাল। তবে ছবার স্বামীর চরিত্রকে কাতিকবাবু একেবারে হাস্যকর করে তুলেছেন। ছেলেটি আপন ভোলা, সরল ও মেধাবী ছিল, কিন্তু ও রকম হাস্যকর জীব নয়। তাছাড়া মোসাহেবদের অভিনয়ে ভাঁড়ামি না করিয়ে বিশিষ্ট চরিত্র বা টাইপ ক্যারেক্টার দেখানো উচিত। একটি দুটি টাইপ উঁকিও মারে ছবিতে। ছোট ভূনিকায় ছবি বিশ্বাস মন্দ করেননি, নীতিশাবু তো প্রায় নেইই। জহর গাঙ্গুলী বেশ নাটকীয়।

পরিচালক আবহসঙ্গীত জায়গায় জায়গায় বেশ ভালো প্রয়োগ করেছেন, এবং যেটা সব থেকে বড় কথা ছবিকে চিত্রময় করার চেষ্টা পেয়েছেন, সাফল্যও লাভ করেছেন অনেকটা। শটের পরিমিতিবোধ চোখে পড়ে, পাত্র-পাত্রীকে পরিচালক সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করারও সুযোগ দিয়েছেন। তবে মাঝে মাঝে একজনের ক্লোজআপ থেকে অন্যের ক্লোজআপে যাওয়াটা ধাক্কা দেয় ক্রটিপূর্ণ কম্পোজিশনের দরুন, পটেশ্বরী বোঠান ও ভুতনাথের কথাবার্তার সময় এ ব্যাপারটা বোধহয় বেশি চোখে পড়ে। তবুও জমিদার গৃহের অবক্ষয়ের মধ্যে; লাম্পট্য, শঠতা, আলস্য, অকর্মণ্যতা ও অপচয়ের ভিতর একটি প্রাণীর—পটেশ্বরীর—স্বপ্ন, সহজ, প্রেমে সম্পূর্ণ জীবন করায়ত্ত করার ব্যর্থ ব্যাকুলতা দর্শককে শেষাবধি ব্যথিত ও গম্ভীর করে দিয়ে যায়। ঐতিহাসিক ও সামাজিক সর্বগুণবজ্রিত, বিদেশীশাসন আরোপিত, জমিদারতন্ত্র যে শুধু সাধারণেরই সর্বনাশ করেছে তা নয়, নিষেদেরও সংহতিহীন, মানবিক সম্পর্ক বিরহিত, উচ্ছৃঙ্খল, অলস দিনধারায় কোনো সুগঠিত জীবনছন্দ্রের প্রসার ও আনন্দ ছিল না, দেখে মনে হয় এ ব্যবস্থা এতকাল কেন কায়মন করে রাখা হল ?

সৌরেন সেনের কাজ স্বল্প ব্যয়ের মধ্যে বদ্ধ, তাই যখনই সত্যিকারের বড়বাড়ির সঙ্গে ঝুঁড়িওর সেট আসে তখনই তা ধরা খুঁড়ে। পটেশ্বরী বোঠানের ঘরের সামনের বারান্দা এবং ঘরটি ততো চোখে লাগে না, যত যাতায়াতের সুড়ঙ্গ পথ, আস্তাবল, জজরাখালের থাকার জায়গা, উঠানের ঝি চাকরের জমায়েৎ লাগে। কোনো সময়ই আসল বড়বাড়ির সঙ্গে এগুলি মেলে না, বোঝা যায় সেট। অথচ এধরণের ছবিতে তৎকল্যের ছাপ ও পরিবেশের যথাযথ উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী; তাতে আবহাওয়া তৈরী হয়, ঘটনাগুলি সাজানো জায়গায় ঘটছে মনে না হয়ে লাগে বাস্তব পটভূমিতে সত্য। আবহাওয়া ও পরিবেশের উপলব্ধি ঘটনা বা বিষয়বস্তুকেও আরো আবেগবহ করে। আসলে সত্যিকারের কোনো পুরানো বড়বাড়িতে অথবা অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেটে সাহেব বিবি গোলামের যথার্থ রক্ষা পেত।

আলোক চিত্রনির্মীর কাজ বেশ ভালো। তবে মাঝে মাঝে সোর্শ অফ লাইটের। ব্যাপারে গুণগোল দেখছিলাম। একবার তো, চোরকুঠুরীতে যখন ভুতনাথ

প্রথম এল ভখন, জ্বলতে থাকে আলো হিসেবে টেবিলে দেখানো হয়েছিল একটামাত্র মোমবাতি অথচ সারাঘরে ঔজ্জ্বল্যের বাড়াবাড়িতে ননে হচ্ছিল হাজারো ঝাড় প্রদীপ্ত পরিবেশে ।

অনেকদিন পর আবার একটি উল্লেখযোগ্য দেশী ছবি দেখে ভালোলাগল । আশাকরি সরকার প্রোডাক্শন্স ভবিষ্যতে আরো ভালো ছবি দর্শককে পরিবেশন করবেন । বাংলা তথা ভারতীয় ছবির নান উন্নত হবে ।

চিত্রভাষী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

॥ নবম বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা ॥

অন্যান্য বছরের মত এবারও বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহে অগ্রণীর বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করা হবে । গল্প কবিতা ও আলোচনায় পত্রিকাটি সুন্দরভাবে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । কলেবর বাড়লেও দাম বাড়ানো হবে না ।

॥ এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতারা যোগাযোগ করুন ॥

কার্যাব্যাহক, অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

পুস্তক-পরিচয়

টনির স্বপ্ন : লেখক—হাওয়ার্ড ফাষ্ট, অনুবাদ—প্রমুদ বসু, প্রকাশক : সাহিত্যায়ন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২. দাম—একটাকা চার আনা।

হাওয়ার্ড ফাষ্ট-এর 'টনি এ্যাণ্ড দি ওয়াটারফুল ডোর'-এর অনুবাদ এই টনির স্বপ্ন। এটি একটি কিশোর উপন্যাস। এই লেখকের বড়োদের উপন্যাসের সংগে পরিচয় নেই, শিক্ষিত বাঙালী পাঠক এমন কমই আছেন। কিন্তু তাঁর ছোটদের জন্যে লেখা কোন বইয়ের সংগে এতদিন কারো পরিচয় ছিল না। এই প্রথম তাঁর একখানি কিশোর উপন্যাসের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটল, সেজন্য প্রমুদবাবু ধন্যবাদই।

একবছর আগে এই উপন্যাসের অনুবাদ শারদীয় আগামীতে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি তখনই অনেকের ভাল লেগেছিল। প্রথম অনুবাদ হিসাবে অনুবাদকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

গল্পের নায়ক টনির চরিত্রটি লেখকের প্রকাশ-বিশ্বাসের মাধ্যমে ঋজুতায় যেমন বলিষ্ঠ, সরলতায় ঠিক তেমনি স্পষ্ট ও সহজ। কিশোরদের কাছে এই চরিত্রটি তাদের অত্যন্ত আদরের জন হয়ে দেখা দেবে বলেই আমার ধারণা। কারণ, চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে কিশোর মনের প্রচুর খোরাক। শুধু কিশোরদেরই নয়, তাদের অভিভাবক-দেরও কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে লেখকের সৃষ্ট এই চরিত্রটির বিকাশ-বিশ্লেষণের মাঝে।

বইখানির ছাপা বাঁধাই ভালো। তিনরঙা প্রচ্ছদটি মনোরম হওয়ায় বইটি উপহারেরও উপযোগী হয়েছে। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। প্রফ সংশোধনকালে প্রকাশক আরো একটু যত্নবান হলে বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতো। ছোটদের বইয়ে ছাপার ভুল আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার বাংলা : সম্পাদনা—শ্রী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক : ক্যালকাটা ইউথ ফোরাম, ২৮, কবীর রোড, কলিকাতা, মূল্য চার আনা।

সময়োপযোগী এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মুখবন্ধে শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : রাষ্ট্রনীতির স্বার্থের খেলায় দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ আজ নূতনতর ও গভীরতর চক্রান্তে সামগ্রিক অবনুষ্ঠির মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলার সর্বনাশা বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমরা এই অশুভ ও অসাধু প্রচেষ্টার প্রতিবাদে বর্তমান কবিতা-সঙ্কলনটি প্রকাশ করিতেছি। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) হইতে শুরু করিয়া বাংলার আধুনিক তরুণ কবি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা সম্পর্কে কী গভীর অনুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্কলনে তাহারই একটি আংশিক চিত্র তুলিয়া ধরিলাম। এই শ্রদ্ধা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মনিবেদনকে বাঙালী হইয়াও যাহারা চিরদিনের মত গ্লানি ও অপমানের পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া দিতে চায় তাহাদের হীন প্রচেষ্টার সর্ববিধ প্রতিরোধে আজ বাঙালী কবিরাজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্গবিরোধী এই সর্বাঙ্গিক অপপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবেই পরাজিত এবং ব্যর্থ হইবে।

পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

অগ্রণী । নিয়মাবলী

বৈশাখ থেকে চৈত্র হচ্ছে অগ্রণীর বছর । বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বছরের সড়াক টাঁদা ছ টাকা, ছমাসের জন্য তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা আট আনা । মনিঅর্ডার কুপনে নাম ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখবেন ।

বাংলা মাসের শেষ-তারিখে অগ্রণী প্রকাশিত হয় । কোনো মাসের পত্রিকা নিয়মিত সময়ে না পেলো, ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে পরবর্তী মাসের দশ তারিখের মধ্যে জানাবেন—যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে । ঠিকানার যে কোন পরিবর্তন বাংলা মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে আনাদের জানাবেন ।

চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন ।

ভালো গল্প ও কবিতা সাদরে গৃহীত হবে । অমনোনীত রচনা যদি ফেরৎ চান তবে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দেবেন । অমনোনীত কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না । পাকিস্তানের ডাকটিকিট পাঠিয়ে লাভ নেই, কারণ সেগুলি এখানে অচল । পাকিস্তানের লেখক-লেখিকার নকল রেখে রচনা পাঠাবেন ।

এজেন্সীর নিয়মাবলী

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা এজেন্সি-গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । এজেন্সির নিয়ম সংক্ষেপে হচ্ছে এই : কমপক্ষে পাঁচকপি নিতে হবে এবং কপিপিছু একটাকা হিসাবে জমা রাখতে হবে আমাদের কাছে । বিক্রয়ান্তে দাম পাঠাতে হবে । বিবরণের জন্য পত্র লিখুন ।

বিজ্ঞাপনের জন্য পত্রালাপ করুন ।

চিঠিপত্র, রচনাদি ও টাকাকড়ি পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

কার্যধ্যক্ষ : অগ্রণী

১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

একমাত্র প্রগতিশীল কিশোর পত্রিকা

॥ আগামী ॥

৫ম বর্ষ চলছে । বৈশাখ সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে বারোজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের লেখা একটি বারোয়ারী উপন্যাস । লেখকদের মধ্যে আছেন : মাবিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, সুশীল জানা, ননী ভোমিক, সমরেশ বসু প্রভৃতি ।

এছাড়া বৈশাখ থেকে নিয়মিতভাবে লিখছেন : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ প্রমুখ জনপ্রিয় লেখকরা ।

প্রতি সংখ্যায় থাকে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, রূপকথা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, বাঁধা ইত্যাদি ।

* আপনার ছেলেমেয়েদের গ্রাহক করে দিন ।

* সবাই এজেন্সি চাই ।

প্রতি সংখ্যা—১২০ বাধিক—৫২ টাকা

আগামী

৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯